আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

ষষ্ঠ খণ্ড, ১২৮৭।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্, এ,
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৩০৯ নং
ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত।

সূচি-পত্র।

মূল্য-প্রাপ্তি-স্বীকার।

সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, নিম্নোক্ত মহোদয়গণ আর্য্যদর্শনের মূল্য প্রদান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

[১২৮৮র ৩০এ আষাঢ় হইতে, ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত প্রাপ্ত টাকা।]

কলিকাতা।

১২৮৫ সাল।

বাবু অতুলচন্দ্র সিংহ	১॥০

১২৮৭ সাল।

বাবু অমৃতলাল দত্ত	১৲
,, রামচরণ ঘোষ	৩৲
,, কৃষ্ণচন্দ্র দাস	২৲
,, বিষ্ণুচন্দ্র রায়	১৲
,, রাজবল্লভ মিত্র	৸৹
,, মাখনলাল মল্লিক	৩৲
বাবু অতুল চন্দ্র সিংহ	॥০
,, মৃগেন্দ্রনাথ দে	২৲
,, মহেন্দ্রনাথ দাস	৩৲
,, লালমোহন ঘোষ	৩৲
,, কালীকুমার চৌধুরী	১৲
,, যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী	৩৲
,, হরিমোহন রায়	১৲
,, দেবেন্দ্রনাথ পাল	১৲
,, ফণীন্দ্রভূষণ বসু	১৲

মফঃস্বল।

১২৮৪ সাল।

বাবু শ্যামলাল দত্ত ; হেড্ মাষ্টার, দেওঘর	৩।৶০
,, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, এম, এ বি এল, উকীল, মজঃফরপুর	৪৸৶০
,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; সি, এস সেসন জজ, করওয়ার	৪৸৶০
,, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ; রায়না	১৸০
,, নন্দকিশোর দাস ; এসিঃ সুপা গড়জাতমহল	৪৸৶০
,, বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী ; এসিঃ সার্জ্জন, ঢেঙ্কানল.	৪৸৶০

১২৮৫ সাল।

বাবু শ্যামলাল দত্ত ; হেড মাষ্টার, দেওঘর	২।৶০
,, ত্রৈলোক্যনাথ বসু, এম, এ বি এল, উকীল, মজঃফরপুর	৪৸৶০
,, প্রিয়নাথ ঘোষ ; আলাটি স্কুল	২।০
,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; সি, এস্, সেসন জজ, করওয়ার	৪৸৶০
,, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ; রায়না	৩৶০
,, নন্দকিশোর দাস ; এসিঃ সুপাঃ গড়জাতমহল	৪৸৶০
,, জগন্মোহন রায় ; ডেঃ কলেক্টর, কটক	

,, জগন্মোহন রায়; ডেঃ কলেক্টর, কটক ৪৸৶০
,, হরিবল্লভ বসু, বি এল, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, কটক ৩৶০
,, কালিদাস চট্টো; ঘাটিভোগ ॥০
,, সতীশচন্দ্র মজুমদার; জগন্নাথপুর ৪৸৶০
,, বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী; এসিঃ ঢেকানল ৪৸৶০
,, হরিবল্লভ বসু; বিএল, গবর্ণঃ প্লিডার কটক, ৩৷৶০

১২৮৭ সাল।

বাবু পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী; চাতরা ৩৷৶০
,, নবীনকৃষ্ণ পালিত; সব্ জজ, আক্না ৩৷৶০
,, ত্রৈলোক্যনাথ বসু; এম, এ বি এল, উকীল, মজঃফরপুর ৪৸৶০
বাবু গোপালচন্দ্র রায়; ইস্লামগাতি ৩৷৶০
,, দুর্গানারায়ণ চৌধুরী; নড়াল ১৶০
,, যদুনাথ রায়; বগুড়া ৩৷৶০
,, শরচ্চন্দ্র সান্যাল; বগুড়া ৩৷৶০
,, প্রিয়নাথ ঘোষ; আলাটি স্কুল ৸০
,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; সি, এস, সেসন জজ, করওয়ার ৪৷৵১০
,, নন্দকিশোর দাস; এসিঃ সুপাঃ গড়জাতমহল ৪৸৶০
,, জগন্মোহন রায়, ডেঃ কলেক্টর, কটক ৪৸৶০
,, হরিবল্লভ বসু, বি এল; গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, কটক ৩৷৶০
,, কালিদাস চট্টো; ঘাটিভোগ ৩৷৶০
,, বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী; এসিঃ ঢেকানল ৩৷৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর্য্যদর্শনের কতকগুলি গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী আছে। তাঁহাদিগের প্রত্যেককে তিন চারি খানি করিয়া পত্র লিখিয়াছি, এক খানিরও উত্তর পাই নাই। তাঁহাদিগের নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বাধিত করেন। কোন ওজর বা আপত্তি থাকে, জানাইলে আমরা তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে পারি। আমাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, অতঃপর হিসাবাদি কোন বিষয়ে গোলযোগ না থাকে। আর্য্যদর্শন যাহাতে উপযুক্ত সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। পূজা সন্নিকট; গ্রাহকগণ শীঘ্র ১২৮৮র মূল্য পাঠাইবেন।

অতি উৎকৃষ্ট নূতন পুস্তক।

আর্য্যদর্শন-সম্পাদক-প্রণীত :—

হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলি			...	১৲	ডাক মাশুল	/০
শিক্ষাসোপান	১ম ভাগ	...	...	/৫	,,	৴১০
,,	২য় ,,	...	...	/১০	,,	৴১০
,,	৩য় ,,	...	...	৵০	,,	৴১০

২৫, ২৬ ও ২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বি, বানর্জি কোং নিকটেই প্রাপ্তব্য।

Hridayochchhvas (হৃদয়োচ্ছ্বাস); or, Papers on India. By Jogendra Nath Bandopadhyaya, Vidyabhushan, M.A. Compiled by Mahendranath Roy. The nine papers, embodied in the work before us, were originally published by their writer in the columus of the *Aryadars'an*, of which he is the editor. These have now been published as a separate work, partly to give them a permanent stability, and partly to prevent plagiarists from appropriating and using them, as has already been done with some of these papers, as their own. The papers are all on the present and past condition of India and cognate subjects and have been, for the most part, written with marked ability and with an eye to effect, and though there is much in them with which we may not be prepared to be at one, the fact cannot be denied that they are characterised by a good deal of thoughtfulness, researching powers, and above all, unflinching patriotism.—*Indian Mirror*, *April 21, 1881*.

ভ্রান্তি-শুদ্ধি।

১২৮৭র কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যক আর্যদর্শনের মফঃস্বলের মূল্য-প্রাপ্তি-স্তম্ভে—বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জমিদার, উলা, ১২৮৫ সালে ৩।৵০ না হইয়া ১২৮৭তে ৩।৵০ আনা হইবে।

আৰ্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

১ ম সংখ্যা। | বৈশাখ ১২৮৭—এপ্রেল ১৮৭৯। | ৬ষ্ঠ ভাগ।

অতীত ও বৰ্ত্তমান ভারত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের **পতনের প্রধান কারণ** ব্রাহ্মণদিগের অলৌকিক স্বধর্ম্মানুরাগ, অবিচলিত স্বশ্রেণী-হিতৈষিতা এবং অদ্ভুত আত্মীকরণনৈপুণ্য। যখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়; তখন তাঁহারা আপনাদিগের ধর্ম্মের জন্য, স্বশ্রেণীর গৌরব রক্ষার জন্য—প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হইলেন। শঙ্করাচার্য্য ও তৎসদৃশ আচার্য্যমুখ্যগণ চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আধিপত্য রক্ষার জন্য আর্য; ধর্ম্মের নূতন করিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন। যেমন বৌদ্ধেরা বেদিতে বসিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ বেদিতে বসিয়া বৈদিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। বৌদ্ধেরা যেরূপ বিপ্রেতর বর্ণকে বিনয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ অনার্য্য জাতি সকলকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। এই অসভ্য আদিম নিবাসীরা সাকারোপাসক ছিল। ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের তুষ্টিবিধানার্থ তাহাদিগের দেব দেবীকেও আপনাদিগের দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইলেন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" সাধকেরা নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় অসমর্থ, তাহাদিগের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত নিরাকার ব্রহ্মের রূপকল্পনা করা গেল—এই বলিয়া তাঁহারা আর্য্য ধর্ম্মের অদ্বৈতবাদের সহিত এই নবাবতারিত পৌত্তলিকতার সামঞ্জস্য বিধান করিলেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের দ্বিতীয় কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের আড়ম্বর-শূন্যতা। সাকারোপাসনার সহিত হিন্দু-ধর্ম্মে নানাপ্রকার উৎসব আসিয়া জুটিল, কিন্তু বৈরাগ্য-মূলক বৌদ্ধধর্ম্মে কোন-প্রকার উৎসব, কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না। সংসার-বৈরাগ্যই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল মন্ত্র, বাহ্য বস্তুতে অনাস্থাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান মুক্তি-সাধন। সংসারী লোকসাধারণও শূন্য-আড়ম্বর-প্রিয়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম বহুকাল লোকসাধারণের তৃপ্তিপ্রদ রহিল না। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের বাঁদ ভাঙ্গিতে লাগিল।

লোক সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা আর একটী যন্ত্রের উদ্ভাবনা করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞান-মূলক। সুতরাং এ ধর্ম্মের ধারণায় চিন্তাশক্তির কিঞ্চিৎ উদ্দীপনা চাই। লোক-সাধারণ চিন্তাশক্তির পরিচালনে নিতান্ত অনিচ্ছুক; সুতরাং অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ নীরস বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এমন সময় ব্রাহ্মণেরা প্রচার করিতে লাগিলেন যে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েতেই মুক্তি; জ্ঞানবানের মুক্তি জ্ঞানে, অজ্ঞানের মুক্তি ভক্তিতে। ভক্তির মোহিনী শক্তি প্রভাবে অশিক্ষিত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণ আবার ফিরিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের চতুর্থ কারণ প্রচার-কার্য্যে অবহেলা। যখন ব্রাহ্মণেরা প্রাণবিসর্জ্জনেও বৌদ্ধদিগের উচ্ছেদ-সাধনে ব্রতী ছিলেন, তখন বৌদ্ধেরা প্রধানতম শ্রাবকদিগকে দেশ-দেশান্তরে প্রচার-কার্য্যে পাঠাইলেন। কেবল মঠধারীরা প্রচার-কার্য্যের নিমিত্ত দেশে রহিলেন। কিন্তু রাজ-প্রদত্ত ধনে মঠধারীরা অতিশয় ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রচার-কার্য্যের সহিত তাঁহাদিগের জীবিকার কোন সম্বন্ধ না থাকায়, তাঁহারা ক্রমে প্রচার-কার্য্যে অতিশয় উদাসীন হইয়া উঠিলেন; এদিকে প্রচার কার্য্যের সহিত ব্রাহ্মণ-দিগের জীবিকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে জনসাধারণকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পঞ্চম ও শেষ কারণ বৌদ্ধদিগের অন্তর্বিচ্ছেদ। যে অবিচলিত স্বশ্রেণী-হিতৈষিতা নিবন্ধন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অদ্যাপি ভারতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, বৌদ্ধদিগের মধ্যে সে স্বশ্রেণীহিতৈষণা বড় অধিক দেখা যায় না। প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা স্বশ্রেণীর লোক নাস্তিক হউক বা প্রকৃতিবাদী হউক, নিরাকারবাদী হউক, বা সাকারবাদী হউক, সকলকেই স্বশ্রেণী-ভুক্ত বলিয়া আলিঙ্গন করিতেন; কিন্তু বৌদ্ধেরা সামান্য মতভেদ লইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে অনেককে সম্প্রদায়-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে লাগি-লেন। কিন্তু বহিষ্কৃতের সংখ্যা ক্রমে এত বাড়িতে লাগিল, যে তাঁহারা

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইলেন। এইরূপে শাক্যসিংহের মৃত্যুর দুই শত বৎসরের মধ্যেই বৌদ্ধগণ অসংখ্য সম্প্রাদয়ে বিভক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নব-জীবন-প্রাপ্তি, অন্য দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের এই ভীষণ সাম্প্রদায়িকতা। সুতরাং এই সকল কারণে অচিরকাল মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে বিলুপ্ত হইল।

ভারতেব দ্বিতীয় সাম্যাবতার গুরু গোবিন্দ সিংহ। নানক শিখসম্প্রদায়েব জন্মদাতা মাত্র, গুরুগোবিন্দই এই সম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় উন্নতিবিধাতা। ইনিই শিখসম্প্রদায়কে একটী সামান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে একটী প্রকাণ্ড রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত করেন। তাঁহারই সাম্যমন্ত্রের মোহিনী শক্তিপ্রভাবে অতি অল্পদিনের মধ্যেই শিখগণ একটী নগণ্য ধর্ম্মসঙ্ঘ হইতে অদ্ভুতজীবনীশক্তি বিশিষ্ট একটী প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত হয়। গুরুগোবিন্দ একজন সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক না হউন, বুদ্ধ খ্রীষ্ট ও নানকের ন্যায় তিনি অতি মহান্ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত না হউন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সার্ব্ববিষয়িক সংস্কারক ভারতে আর দ্বিতীয় জন্মে নাই। এরূপ বিশ্বজনীন সাম্যের ভাবে ভারতে আর কোন সংস্কারক কখন উদ্দীপিত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। আমরা এ প্রস্তাবে যতপ্রকার বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য ভিন্ন আর সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যের মূলে গুরুগোবিন্দসিংহ কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ ছিল না; হিন্দু মুষলমাণ ভেদ ছিল না। ; রাজা প্রজা ভেদ ছিল না; ধনী নির্ধন ভেদ ছিল না; এবং পণ্ডিত মূর্খ ভেদও ছিল না। এক ভাষা, *এক ধর্ম্ম, এক সমাজ, এক শাসন,* এবং *এক প্রাণ্*। শিখসম্প্রদায়ের হৃদয় যেন এক তারে গাঁথা। একের উন্নতিতে সাধারণের উন্নতি, একের সুখে সাধারণের সুখ, এবং একের দুঃখে সাধারণের দুঃখ। একটী শিখের গাত্র স্পর্শ কর, সমবেদনাব মোহিনীশক্তি-প্রভাবে তাড়িত বেগে সমস্ত শিখ-সম্প্রদায়ে বেদনা অনুভূত হইবে। প্রধান আচার্য্য হইতে সামান্য মন্ত্রশিষ্য পর্য্যন্ত, সকলেই ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত। সমস্ত শিখসম্প্রদায় যেন একটী প্রকাণ্ড পরিবার। সকলেরই এক লক্ষ্য, এবং এক উদ্দেশ্য। মাতৃভূমি ও ঈশ্বর সকলেরই সমান উপাস্য। মাতৃভূমির উদ্ধারসাধন সকলেরই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের প্রধান সাধন, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববন্ধন। সেই ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করিবার নিমিত্ত শিখেরা আপনাদিগকে এক জননীর গর্ভ-সম্ভূত বলিয়া ব্যক্ত করিতেন। হিন্দু, মুষলমাণ, য়িহুদী, খ্রীষ্টান—যিনিই এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, তিনিই "খাল্‌সা" পবিত্র বা

বিমুক্ত—সংজ্ঞায় আখ্যাত হইবেন। দীক্ষার দিন হইতেই শিখমাত্রকেই কয়েকটী গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাকে জাত্যভিমান, কুল-মর্য্যাদা, বর্ণভেদ, পণ্ডিত-মূর্খভেদ, ইতর-ভদ্র-ভেদ ভুলিয়া; বিভিন্ন ক্রিয়াপদ্ধতি বিভিন্ন ধর্ম্মশাসন পরিত্যাগ করিয়া, এক রন্ধনে ও এক পংক্তিতে ভোজন করিতে হইবে;—এক ঈশ্বরের উপাসনায় নিমগ্ন হইতে ও এক ধর্ম্মশাসনের অধীন থাকিতে হইবে;—দুশ্ছেদ্য একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া, এক প্রাণে জীবনবিসর্জ্জনেও মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন করিতে হইবে; এবং মাতৃভূমির দাসত্ব-প্রদায়িনী যবন জাতির উচ্ছেদ-সাধনে সতত বদ্ধপরিকর থাকিতে হইবে।

যে শিখসম্প্রদায় এতদিন নিরীহ যোগীর ন্যায় নির্জ্জনে কেবল ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, গুরুগোবিন্দের মন্ত্র-প্রভাবে সেই শিখ-সম্প্রদায় এক্ষণে একটী মহান্ জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইলেন। প্রত্যেক শিখ এক্ষণে এক একটী দুর্জ্জেয় রণবীর হইয়া উঠিলেন। দুর্দ্দান্ত আরঞ্জীবের সিংহাসন টলিল। সমস্ত ভারত খাল্‌সা সৈন্যের সিংহনাদে কাঁপিয়া উঠিল। শিখসম্প্রদায়ের পবিত্রতা, একতা, ও তেজঃ-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অসংখ্য হিন্দু মুষলমাণ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিলেন। আরঞ্জীবের ধর্ম্মান্ধতা ও কঠোর ব্যবহার নিবন্ধন দীক্ষিতের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ধর্ম্মান্ধ সম্রাটের নয়ন উন্মীলিত হইল। কিন্তু গুরুগোবিন্দ যে অনল জ্বালিয়াছিলেন, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। বরং মোগল সৈন্যরূপ ইন্ধনে সে অনল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। অজেয় শিখ সেনা মোগল সেনাকে পরাস্ত করিয়া যবনাধিকৃত দুর্গসকল দখল করিতে লাগিল। কিন্তু ভারতের অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য অধিক দিন থাকিবার নহে। শিখসম্প্রদায় একটী পরিণত জাতি না হইতেই আরাধ্য গুরুগোবিন্দ সিংহ কোন ঘাতকের অতর্কিত অস্ত্রাঘাতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ভারতের পিটার ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাদর নামক স্থানে এইরূপে অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে, ভারতের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। যদি গুরু-গোবিন্দের স্থান পূরণ করিতে সমর্থ শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একজনও থাকিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না।

কিন্তু শিখ-সম্প্রদায় গুরুগোবিন্দ সিংহের নিকট হইতে যে সঞ্জীবনী শক্তি পাইলেন, তৎপ্রভাবেই ভারতে একটী অজেয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই জাতির রণপ্রতিভা রণজিৎ সিংহের সময়েই সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ইহাঁদিগের সাহায্যে রণজিৎ সিংহ ব্রিটিশ

সিংহের নিকট হইতেও "পঞ্জাব-সিংহ" উপাধি প্রাপ্ত হন। রণজিতের মৃত্যুর পর এই অজেয় জাতি উপযুক্ত অধিনায়ক অভাবে বিশীর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল। এই জাতি মরণকালেও চিলেন-ওয়ালা ও হলদিঘাটে আপনাদিগের অদ্ভুত রণনৈপুণ্যের ও অবিচলিত আত্মত্যাগের প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছে। ঐ চিলেনওয়ালা ও হলদিঘাট ভারতের থার্ম্মাপিলি ও মেরাথন!

এখনও ভারতে শিখসম্প্রদায় আছে বটে, কিন্তু এ শিখসম্প্রদায় গুরু-গোবিন্দের শিখসম্প্রদায় নহে। হিন্দু-ধর্ম্মের অদ্ভুত মহিমায় আবার সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য, সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে, এবং বৈষম্য, ও সাম্প্রদায়িকতার অনুচর দাসত্বও সেই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ ও রণজিতের শিখদল জাতীয় স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক শিখদল ভারতচরণে বৈদেশিক শৃঙ্খল দৃঢ়বদ্ধ করিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে!

ভারতের তৃতীয় সাম্যাবতার চৈতন্য। নানকের ন্যায় চৈতন্যও একমাত্র হরি-ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। গুরু-গোবিন্দের ন্যায় চৈতন্যও ব্রাহ্মণ শূদ্র ও হিন্দু মুসলমান—এক ঢাল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি হিন্দু, কি মুসলমান—ভক্ত মাত্রই চৈতন্যের নিকট সমান আদরণীয়। চৈতন্যের নিকট স্ত্রীজাতিও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন না। বুদ্ধের ন্যায় তিনিও প্রচারকের উচ্চ আসন স্ত্রীজাতিকে প্রদান করেন এবং অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে পত্নীনির্ব্বাচনে পুরুষদিগের যেমন অধিকার, স্বামী-নির্ব্বাচনেও স্ত্রীলোকদিগের সেইরূপ অধিকার। স্ত্রী ব্যভিচারিণী বা প্রতিকূলাচারিণী হইলে পুরুষ যেমন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্বামী ব্যভিচারী বা প্রতিকূলাচারী হইলে স্ত্রীও সেইরূপ স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। পত্নীবিয়োগে স্বামীর যেমন পুনর্ব্বার পত্নী গ্রহণে অধিকার, পতিবিয়োগে স্ত্রীরও পুনঃপরিণয়ে সেইরূপ অধিকার। বৈষ্ণবীদিগের অবরোধবন্ধন নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংস্পর্শে স্ত্রী শূদ্র সর্ব্বপ্রকার অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত। অধিক কি—যে চণ্ডাল ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য, যে বেশ্যা সকল সমাজেরই পরিত্যজ্যা, তাহারাও ভক্ত হইলে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে *। বৈষ্ণব মাত্রকেই পরস্পরের অন্নগ্রহণ ও পরস্পরের সহিত আদান প্রদান করিতে হইবে। আধুনিক বৈষ্ণবেরা যাহাই হউন্, প্রাথমিক বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কোন-প্রকার বৈষম্য ছিল না। তথাপি

* চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ।

এ সম্প্রদায়ের এত শীঘ্র অবনতি, ও এ ধর্ম্মের এত শীঘ্র পতন কেন হইল?

তিনটী কারণে এ সম্প্রদায়ের এত শীঘ্র অবনতি, ও এ ধর্ম্মের এত শীঘ্র পতন হইল। প্রথম কারণ— বৈষ্ণবদিগের নিরবচ্ছিন্ন-ভক্তি মূলতা। চৈতন্যের মতে নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিতেই মুক্তি। বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানমূলক হওয়ায় জনসাধারণের নিকট নীরস বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, বৈষ্ণব ধর্ম্মও সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিমূলক হওয়ায় জ্ঞানী জনের অশ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিল। জ্ঞানী লোকে অন্ধ-ভক্তি-পরবশ হইতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন, সুতরাং জ্ঞানী ও পণ্ডিত এ ধর্ম্মসম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন না, কেবল অশিক্ষিত স্ত্রী পুরুষেই এ সম্প্রদায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এই অশিক্ষিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়- চৈতন্যের অদ্বৈতবাদ ভুলিয়া ক্রমে ঘোর পৌত্তলিক হইয়া উঠিল। রোমান্ ক্যাথালিকেরা যেমন যিশু ও মেরী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহারাও সেইরূপ চৈতন্য ও চৈতন্য-জননীর উপাসনা আরম্ভ করিল। অন্ধ বিশ্বাসে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমেই অধিকতর হীন প্রভা ধারণ করিল। আধুনিক বৈষ্ণবগণ ইহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অবনতির ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের **পতনের দ্বিতীয় কারণ** বৈষ্ণবসাধারণের সংসার-বৈরাগ্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বৌদ্ধেরা স্বসম্প্রদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন—মঠধারী, শ্রাবক ও আশ্রমী। বৌদ্ধধর্ম্মের পরিপুষ্টি সাধন ও প্রচার-কার্য্য প্রথম দুই শ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত থাকিত। ইহাঁরাই সংসারত্যাগী ও জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত পর-প্রত্যাশী। আশ্রমী বৌদ্ধদিগের সহিত তুলনায় ইহাঁদিগের সংখ্যা নগণ্য মাত্র। বৌদ্ধ আশ্রমীরা বৈষয়িক উন্নতি বিষয়ে সতত রত থাকিতেন, সুতরাং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় দারিদ্র্য ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ কোন শ্রেণীবিভাগ নাই।

বৈষ্ণবমাত্রই অনাশ্রমী, বৈষ্ণবমাত্রই ভিক্ষোপজীবী। বৈষ্ণবেরা বিবাহ করিতে পারে বটে, কিন্তু বৈষ্ণব বৈষ্ণবী উভয়কেই ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যে সম্প্রদায়ের সকলেই ভিক্ষুক, সে সম্প্রদায় জগতে, কখন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। সুতরাং ক্রমে বৈষ্ণবেরা সকলেরই অশ্রদ্ধার পাত্র, সকলেরই বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠিল।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবনতির ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের **পতনের তৃতীয় কারণ** বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জাতীয় ভাবের অভাব। গুরুগোবিন্দের ন্যায় চৈতন্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে একটী প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত করিবেন বলিয়া কখন ভাবেন নাই। এ মহান্ ভাব তাঁহার সঙ্কীর্ণ ও ধর্ম্মান্ধ অন্তরে স্থান পায় নাই।

সুতরাং মহান্ জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় তাঁহার ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কখন অনুপ্রাণিত হয় নাই। নানকের ন্যায় তিনি একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাত্র। চৈতন্য গুরুগোবিন্দের ন্যায় সমস্ত ভারতকে এক ধর্ম্মশাসন ও এক রাজনৈতিক শাসনের অধীনে আনিবার মহৎ সঙ্কল্প কখন মনে ধারণা করিতেও সমর্থ হন নাই। তাঁহার অপরিপক্ক বুদ্ধিবৃত্তি এরূপ প্রকাণ্ড ভাব ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। এই জাতীয় ভাব-বিরহেই বৈষ্ণবসম্প্রদায় অচিরকাল-মধ্যেই আপনাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইল। ক্রমে ক্রমে ইহা হিন্দুজাতির একটী ক্ষীণ শাখারূপে পরিণত হইল। হিন্দুধর্ম্মের সংস্রবে সেই সকল বৈষম্য অনেক পরিমাণে আসিয়া জুটিল। এই জন্য এখন আমরা বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ-শূদ্র পার্থক্য দেখিতে পাই।

বুদ্ধ গিয়াছেন, গুরুগোবিন্দ গিয়াছেন, চৈতন্য গিয়াছেন—এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের অতুল কীর্ত্তিও বিলুপ্তপ্রায়। ভারত আবার ঘোরতর তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ-প্রচারিত ঘোর বৈষম্য আবার ভারতবাসীর স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। আবার সেই বর্ণভেদ, সেই জাতিভেদ, সেই ধর্ম্মভেদ! আবার ব্রাহ্মণ শূদ্রে ও হিন্দু মুসলমানে সেই ঘোরতর বিদ্বেষ! স্ত্রীজাতির প্রতি আবার সেই ঘোর অত্যাচার! জাতীয় ভাবের অভাবে আবার সেই ছত্রভঙ্গতা! আবার স্ত্রী শূদ্রের শাস্ত্রে অনধিকার!

একটী প্রকাণ্ড জাতীয় ভাবের অভাবে সমস্ত ভারতবাসী সহস্র জাতিতে, সহস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত রহিয়াছে। একটী জাতীয় ভাষার অভাবে ভারত অসংখ্য প্রাদেশিকতায় পরিণত হইয়াছে। একটী সমগ্র ভারত-ব্যাপী ধর্ম্মের অভাবে, অসংখ্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি পরস্পর বিদ্বেষ-বিশিষ্ট! বিদ্যাবৈষম্যে পণ্ডিত মূর্খ পরস্পর বিদ্বেষ-বিশিষ্ট! স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্যে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর-সহানুভূতি-শূন্য! জেতৃ বিজিত-বৈষম্যে আমরা মর্ম্মপীড়িত!

সমস্ত ভারত এক শাসনের অধীন না হওয়ায় ভারতে বিশ্বজনীন সমবেদনা নাই। দুর্ভিক্ষে কাশ্মীর উচ্ছিন্ন হইল তাহা কয় জন শুনিলেন, তদ্বিষয়ে কয় জন ভাবিলেন, কয় জন তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত একটী কপর্দ্দকও পাঠাইলেন? মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের সময় কত সভা, কত চাঁদা! কিন্তু কাশ্মীর-দুর্ভিক্ষের জন্য কয়টী সভা হইয়াছিল, কি চাঁদা উঠিয়াছিল? সভা দূরে থাক, চাঁদা উচ্ছিন্ন যাউক, কই এ বিষয়ে কোন কথোপকথনও ত শুনিতে পাই নাই। কেন না কাশ্মীর স্বতন্ত্র, কাশ্মীর স্বাধীন, কাশ্মীরের সহিত আমাদের জাতীয় সমবেদনা নাই! কিন্তু কাশ্মীর স্বাধীন কিসে? কাশ্মীরের রাজা ইংরাজের

গোলাম, তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান ইংরাজ ইঙ্গিতে চালিত; কাশ্মীরের প্রজাসাধারণ এই গোলামের গোলাম; সুতরাং তাহাদিগের অবস্থা আমাদিগের অপেক্ষাও শোচনীয়। তাহাদিগকে দাসত্বের সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, অথচ তাহারা ইংরাজ সভ্যতার ফলভোগে অনধিকারী। যখন দাসত্ব অনিবার্য্য, তখন প্রবলতম দাসপতির অধীনে থাকাই সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর, তখন সুসভ্য দাসপতির অধীনে থাকিয়া সভ্যতা শিক্ষা করা প্রার্থনীয়, তখন সাম্যবাদী দাসপতির অধীনে থাকিয়া সাম্যের মোহমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়াই ভাল। আমাদের এক্ষণে জাতীয় শিক্ষার সময়, এ সময় একটী প্রবল-পরাক্রান্ত সভ্যতম শাসন-সমিতির অধীনে থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে ইংরাজ আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছেন। যত দিন এই প্রয়োজন থাকিবে, যত দিন আমাদের একতা-বন্ধন পূর্ণ না হইবে, ততদিন ইংরাজ আমাদের উপর রাজত্ব করিবেন, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে ইংরাজ আপনিই যাইবেন; আপনি না যান, যে প্রাকৃতিক বা দৈবী শক্তি প্রভাবে তাঁহারা ভারতে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই প্রাকৃতিক বা দৈবীশক্তি প্রভাবেই তাঁহারা ভারত হইতে বিদূরিত হইবেন। সে সময়ের এখন অনেক বিলম্ব আছে; সুতরাং সে ভাবনায় আমাদিগের এখন প্রয়োজন নাই।

আমাদের ভাবনার আরও যথেষ্ট জিনিস আছে। যে যে উপাদানসামগ্রীতে জাতীয় জীবন গঠিত হয়, আমাদিগকে এক্ষণে সেই উপাদানসামগ্রীর আহরণ করিতে হইবে। আমাদের এক্ষণে আমাদিগকে এক ভারতীয় জাতি বলিবার অধিকার নাই। ভৌগোলিক একতা ভিন্ন আমাদের এখন আর কোন একতা নাই। আমাদিগকে নূতন করিয়া একটী ভারতীয় জাতি গঠিতে হইবে। সমস্ত ভারতে এক ধর্ম্ম, এক সাধারণ ভাষা সংস্থাপন করিতে হইবে। ধনী নির্ধন, ও পণ্ডিত মূর্খ অভিমান ভুলিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষে সমতা বিধান করিতে হইবে। এক সমবেদনা-সূত্রে সমস্ত ভারতকে অনুস্যূতে করিতে হইবে। এই মহতী সিদ্ধি বহুকালব্যাপি-প্রগাঢ়-সাধনা-সাপেক্ষ। সুতরাং আমরা এক্ষণে সেই সাধনায় নিমগ্ন হইব।

এক্ষণে দেখি আমাদের কি সাধন-সামগ্রী আছে। আমরা কোন্ ভিত্তির উপর বসিয়া এই সব সাধন করিব? হিন্দু ধর্ম্ম অতি প্রাচীন ও অতি প্রকাণ্ড ভিত্তি বটে, কিন্তু সে ভিত্তি অতি জীর্ণ, আর বিশেষতঃ তাহা আত্ম-পৃষ্ঠোপরি সকল জাতিকে ধারণ করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং প্রিয় হইলেও অগত্যা আমাদিগকে সে

ভিত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। সে ভিত্তি পরিত্যাগ করিব বটে, কিন্তু সে ভিত্তির যে উপাদান-সামগ্রী সতেজ আছে তাহা গ্রহণ করিব। মুষলমাণ ধর্ম্মও অতি বিদ্বেষম্পূর্ণ, সুতরাং সে ভিত্তিও পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও যে সজীব উপাদান আছে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্ম বিজেত্রী জাতির ধর্ম্ম, সুতরাং সে ধর্ম্ম কখন বিজিত জাতির প্রীতিকর হইবে না। সুতরাং সে ভিত্তিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অথচ সে ভিত্তিরও গ্রহণযোগ্য উপাদান-সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মের অভ্যন্তরেও অনেক রত্ন নিহিত আছে। সেই সকল উপাদান-সামগ্রী লইয়া একটী নূতন ধর্ম্মভিত্তি গঠিতে হইবে। মুল ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সকল উপাদানে গঠিত, সুতরাং একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মেরই ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম হইবার সম্পূর্ণ অধিকার। যদি একটী লৌকিক ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে, ত ব্রাহ্মধর্ম্মই ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম হইবে। কারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্মেরই— বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্মের-সারসঙ্কলন মাত্র; এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য, ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই আদরণীয়। সুতরাং এ ধর্ম্ম গ্রহণে ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহের বিশেষ আপত্তি হইবে না। এতদ্ভিন্ন আর একটী কারণ আছে। উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ একটী প্রকাণ্ড ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত, সে ভিত্তি সাম্য। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ব্যতীত বর্ত্তমান ভারতের আর কোন প্রাচীন ধর্ম্মের সহিত বিশ্বজনীন সাম্যের ভাব মিশ্রিত নাই। কারণ সাম্যমূলক বৌদ্ধ শিখ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতে এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সকল ধর্ম্মে এখন আবার বিবিধ বৈষম্য আসিয়া জুটিয়াছে।

কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে শাক্য সিংহ, খ্রিষ্ট বা গুরুগোবিন্দের ন্যায় একজন অলৌকিক-প্রতিভাশালী নিষ্কাম, ও আত্মত্যাগী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক নাই। এই জন্যই এত অল্পদিনের মধ্যে ইহাতে এত দলাদলি ও এত মতভেদ ঘটিয়াছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ৪। ৫ শত বৎসর পরে উপযুক্ত নেতা বিরহে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, এই নবোদিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্কুরেই সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কৈশব ব্রাহ্মধর্ম্মের আরও দুই একটী দোষ ঘটিতেছে। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের ন্যায় কেবল ভক্তি-মূলক হইয়া উঠিতেছে। এরূপ হইলে ইহা অচিরকাল-মধ্যেই শিক্ষিত সমাজের অসেব্য হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ ইহা আবার স্ত্রীপুরুষ-বৈষম্যে আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ন্যায় ইহাতে বৈরাগ্যও আসিয়া জুটিতেছে। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মের ন্যায় ইহার পতন অনিবার্য্য। এই সকল দোষ পরিহার করিয়া উন্নতিশীল নূতন

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইতেছে। আমরা ইহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ইহার কৃতকার্য্যতার উপর ভারতের অনেক মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এ গুরুতর কার্যের উগযোগী নেতা কই? উন্নতিশীল ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ে বুদ্ধ বা গুরুগোবিন্দ কই? যে বিনয়ধর্ম্মে শাক্যসিংহ পাষাণও দ্রবীভূত করিয়াছিলেন, সে বিনয় কই? যে বিশ্বপ্রেমিকতা বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্মের বীজমন্ত্র, সে বিশ্বপ্রেমিকতা কই? ধর্ম্মভ্রাতা ও অ-ধর্ম্মভ্রাতায় পূর্ণ সমবেদনা কই? মানব দুঃখে বুদ্ধ-হৃদয় যেরূপ কাঁদিত, ব্রাহ্ম-হৃদয় সেরূপ কাঁদে কই? যে আত্ম-বিস্মৃতিতে বুদ্ধের হৃদয় স্বর্গীয়ভাব ধারণ করিয়াছিল, সে আত্মবিস্মৃতি কই? যে মাহাত্ম্যে গুরুগোবিন্দ বিদ্বেষপূর্ণ যবনদিগকেও নিজ সম্প্রদায়ে আনিয়াছিলেন, সে মাহাত্ম্য কই? এই প্রকাণ্ড জাতীয় ব্রতের উদ্যাপনার নিমিত্ত ব্রাহ্মদিগকে বুদ্ধের নিকট বিনয়াদিধর্ম্ম ও গুরুগোবিন্দ সিংহের নিকট মাহাত্ম্য শিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে আত্মাভিমানে ও সাম্প্রদায়িকতায় পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে হইবে। এই সকল সাধনায় সিদ্ধ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা ভারতের কার্য্য সংসিদ্ধ হইবে; অন্যথা, তাঁহাদিগের পতন অনিবার্য্য।

ভারতের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে আর একটী রমণীয় ধর্ম্মের বৈদ্যুতিক আভা প্রতিভাত হইয়াছে। এ ধর্ম্মের জ্যোতিঃ অতি সমুজ্জ্বল। বিদ্যুৎ-বিকাশ যেমন নয়ন ঝলসিয়া দেয় সেইরূপ ইহা নিজ প্রচণ্ড আলোকে, মানব-হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম চন্দ্র-কিরণের স্নিগ্ধকারক, কারণ ইহা ঐহিক দুঃখ-যন্ত্রণার বিনিময়ে, পুণ্যবান্‌দিগের পক্ষে স্বর্গসুখ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। অনুতাপে পাপীর পক্ষেও স্বর্গভোগ বলিয়া দেয়, পরীক্ষারাজ্যে যে অনুপাতে দুঃখ ভোগ, পুরস্কার রাজ্যে সেই অনুপাতে সুখভোগের আশা প্রদান করে। কিন্তু এ কঠোর নিষ্কাম ধর্ম্মে পুণ্যের পুরস্কারের আশা নাই। মানব-প্রেম সে ধর্ম্মের বীজমন্ত্র। নিরভিসন্ধি পূর্ব্বক মানবের উপকার সাধন সেই ধর্ম্মের একমাত্র ব্রত। নিষ্কামভাবে মানবহিতে জীবন আহুতিদান এই ধর্ম্মের একমাত্র সাধনা। সেই সাধনায়, সেই ব্রত উদ্যাপনায়, এবং সেই বীজমন্ত্রের অনুধ্যানে যে বিমল আনন্দ, সেই ইহার স্বর্গ। ইহার বিপরীতাচরণে যে দুঃখ, সেই ইহার নরক। ইহাতে স্বতন্ত্র পারলৌকিক স্বর্গ নরক নাই। ইহাতে—প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ঈশ্বরমূলক নহে; সৎকার্যে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, স্বর্গে সিংহাসন প্রদাম করিবেন; অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে তিনি বিরক্ত হইবেন, এবং নরকের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন—এরূপ প্রলোভন ও ভীতি-প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি জন্মাইবার চেষ্টা নাই।

সৎকার্য্য কর আপনিই সুখী হইবে, বিমল আনন্দ লাভ করিবে; অসৎকার্য্য কর, আপনিই দুঃখ পাইবে, আপনিই অসুখী হইবে। পাপ পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন কর, তৎক্ষণাৎ কি কিছুদিন পরে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে, অনুতাপে সে দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের আশা নাই। পরের অনিষ্ট কর, মন নবকময় হইবে; সকলে তোমাকে ঘৃণা করিবে, পাপের শাস্তি হাতে হাতে পাইবে। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তোমার অন্তর স্বর্গময় হইয়া উঠিবে, তুমি সকলের প্রীতিভাজন হইবে, স্বর্গ-সিংহাসন তুমি এখানেই পাইবে। ঈশ্বর থাকেন ভালুই, না থাকেন তাহাতেও আপত্তি নাই। সে বিষয়ে আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। আমাদের কর্ত্তব্যসাধন করিয়া আমরা চলিয়া যাই। এই ধর্ম্ম এখনও ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয় নাই; সুতরাং ইহা দ্বারা এখন ভারতের সমীকরণ হওয়া কতদূর সম্ভব বলিতে পারি না।

যাহা হউক সম্পূর্ণ জাতীয় জীবনের আস্বাদ পাইবার পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ এক্ষণে এক-প্রকার আংশিক জাতীয় জীবন আস্বাদন করিতে পারেন। অন্যান্য সহস্র বিষয়ে ভারতের অনৈক্য থাকুক, ভারত এক্ষণে এক বিষয়ে মিলিতে শিখিতেছেন। ইংরাজকৃত অত্যাচারের প্রতিবাদ বিষয়ে সমস্ত ভারতের ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাদান-সামগ্রী লইয়া ভারতসভা ভারতবাসিদিগের অন্তরে এক আংশিক জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতি উপযুক্ত পাত্রগণের হস্তেই এই উদ্দীপনাকার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। ভারতসভার নেতৃবৃন্দের প্রতিভা এই সাধনার সম্পূর্ণ উপযোগিনী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে ভাষায় তাঁহারা এই উদ্দীপনা-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বৈদেশিক ভাষা। সুতরাং ভারতীয় জাতিসাধারণ কখন সেই উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইবেন না। এই জন্য একটী ভারতীয় সাধারণ ভাষা চাই। হিন্দী ভিন্ন আর কোন ভাষাই ভারতীয় ভাষা হইতে পারে না। কারণ হিন্দী ভারতবাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই কিছু কিছু বুঝিতে পারে। আর সকল ভাষা অপেক্ষা এই ভাষাই ভারতের অধিক লোকের মাতৃভাষা। সুতরাং আমরা ইচ্ছা করি বঙ্গদেশে তাঁহারা বঙ্গভাষায়, তদ্ভিন্ন ভারতের আর সকল স্থলে হিন্দীতে এই উদ্দীপনা-কার্য্য আরম্ভ করেন। কারণ জাতীয় ভাষায় উদ্দীপনা ব্যতীত জাতীয় জীবনের কোন সম্ভাবনা নাই।

ভারতের ধনিবৃন্দ! আমরা যেমন ব্রাহ্মণদিগকে নামিয়া শূদ্র ও যবনের সহিত একত্র মিশিয়া একটী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইতে বলিতেছি, সেইরূপ আপনাদিগকে ধনগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের দীন দুঃখী প্রজাসাধা-

রণের সহিত এক সমভূমিতে নামিয়া তাহাদিগের দুঃখ বিমোচনে আপনাদিগের অর্থের সদ্ব্যয় করিতে আহ্বান করিতেছি। যদি আপনারা ভারতের প্রকৃত হিতৈষী হন, যদি ভারতকে একটী প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জাতিতে পরিণত দেখিতে চান, তবে বিলাসভোগে অর্থব্যয় না করিয়া কোটী কোটী দীন দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিয়া, এবং তাহাদের সুশিক্ষা বিধান করিয়া তাহাদিগকে উচ্চেতে তুলিতে চেষ্টা করুন্। জানিবেন তাহারাও একদিন আপনাদিগকে অতি উচ্চ রাজনৈতিক শিখরে তুলিবে। এ বিশ্বব্যাপী পতনের সময়, এ বিশ্বজনীন দাসত্বের সময়, আপনাদিগের এ বিলাস কেন? এ রোদনের সময় এ ধনোন্মাদ কেন?

আর ভারতের সুশিক্ষিত সম্প্রদায়! আপনাদিগকে বলি, ভারতের ভবিষ্য মঙ্গলের জন্য হিন্দুদিগকে যেমন জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের সহিত সমভূমিতে আসিতে হইবে, ধনিবৃন্দকে যেমন ধনগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া দীন দুঃখী প্রজাসাধারণের সহিত এক মহানুভূতি-সূত্রে অনুস্যূত হইতে হইবে, তেমনই আপনাদিগকেও বিদ্যাভিমান ও জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের অশিক্ষিত কোটীনিচয়ের সহিত এক সমভূমিতে নামিয়া তাহাদিগের অজ্ঞানতিমির দূর করিতে হইবে, তাহাদিগের দুরবস্থা বিমোচনের চেষ্টা করিতে হইবে; তাহাদিগের শোকতাপে ও দুঃখ যন্ত্রণায় তাহাদিগকে অন্তরের সহানুভূতি দেখাইতে হইবে। জানিবেন যে সেই অগণ্য জনসঙ্ঘ পতিত থাকিতে ভারতের কোন আশা নাই। জানিবেন যে সেই অগণ্য জনসঙ্ঘকে না লইয়া আপনারা কখন উঠিতে পারিবেন না। উঠিতে চেষ্টা করিলেও আপনাদিগকে তাহাদিগের গুরুভারে আবার নামিয়া পড়িতে হইবে।

আপনাদিগের মস্তকে আর একটী গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে। ভারতীয় নারী জাতির উদ্ধারের একমাত্র আশাস্থল আপনারা। যখন রাজনৈতিক দাসত্বের নিদারুণ যন্ত্রণা আপনারা স্বয়ং অনুভব করিতেছেন, তখন ভারতীয় জাতির অর্দ্ধাংশকে সামাজিক দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা আপনাদিগের ভাল দেখায় না। পুরাকালে ভারত-ললনার যেরূপ অবস্থা ছিল, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিকতর শোচনীয়। স্বাধীনতা ব্যতীত কখন শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয় স্ফূর্ত্তি পায় না। সে স্বাধীনতায় পুরাকালে ভারতের রমণীরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন না। তাঁহারা ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র স্বামীর অনুগমন করিতে পারিতেন। অধিক কি তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত এক চতুষ্পাঠীতে পড়িতেও পাইতেন। উত্তররামচরিতে লিখিত আছে বাল্মীকির আশ্রমে থাকিয়া আত্রেয়ী কুশলবের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিয়া-

ছিলেন। স্ত্রীজাতির স্বয়ম্বরও স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার পরিচায়ক। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা দুর্গাবতী ঝানসীর রাণী প্রভৃতি বীর নারীগণের বীর্য্যবত্তার পরিচয় পাইতাম না। স্পার্টার অতি গৌরবের সময় স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল; অধিক কি স্ত্রীপুরুষ প্রকাশ্যস্থলে পরস্পর মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেও লজ্জা বোধ করিত না। স্পার্টার রমণীর স্বাধীনতা ছিল বলিয়াই, স্পার্টান্ রমণী বীর-প্রসবিনী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা যে শুদ্ধ বীর সন্তান প্রসব করিতেন এরূপ নহে, বীর পুত্রদিগকে উদ্দীপনা-বাক্যে রণোৎসাহে মাতাইতেন। স্পার্টান্ রমণীরা যুদ্ধ যাত্রাকালে প্রাণসম প্রিয়তম পুত্রের হস্তে ঢাল দিয়া তাহাকে অবাধে বলিতেন—"যাও পুত্র! যাও! হয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া এই ঢাল হাতে জয়োৎসাহে জননীর চরণ বন্দন করিও, অথবা যুদ্ধে হত হইয়া ঢালোপরি জননীর নিকট আনীত হইও।" জননীর মুখোচ্চারিত এ উদ্দীপনা বাক্যে কোন্ পুত্রের হৃদয়ে বীর্য্যবহ্নি সন্ধুক্ষিত না হয়? যখন রাজবারায় স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল, তখন রাজপুত রমণীরাও একদিন এইরূপ উদ্দীপনা-বাক্যে পুত্রগণের ভস্মাচ্ছাদিত বীর্য্যবহ্নি প্রজ্বালিত করিতেন। সে সময় অনেক রাজপুত-রমণীর অসি অনেক যবনকে শমনসদনে প্রেরণ করে। কিন্তু আজ ভারত-ললনার কি দশা? আজ ভারত-সন্তান অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে চাহিলেই ভারত-জননী বাধা দিতে উদ্যত, কেন না অন্তঃপুরের বাহিরের খবর তিনি কিছু জানেন না; সুতরাং কোন্ প্রাণে তিনি প্রাণসম পুত্রকে অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করেন?

ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান উন্নতির অনেকটা কারণ স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতার সহচরী। স্ত্রীস্বাধীনতা ব্যতীত স্ত্রীশিক্ষা পূর্ণ হইতে পারে না। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ব্যতীত যেমন পূর্ণ শিক্ষা হয় না, সেইরূপ সাহস ও বীর্য্যাবত্তাও স্ফূর্ত্তি পায় না। আমরা ইউরোপীয় ইতিহাসে এলিজেবেথ, কাথেরাইন, মাডেম রোলাণ্ড, এণ্টয়নেট, জোসেফাইন প্রভৃতি যে সকল অদ্ভুত রমণীর ইতিবৃত্ত পাঠ করি, তাঁহারা সকলেই স্ত্রীস্বাধীনতার ফল। কয় জন রাজা এলিজেবেথ ও ক্যাথেরাইনের ন্যায় রাজসিংহাসন সমুজ্জ্বল করিয়াছেন? ফরাশি বিপ্লব-কালে মাডেম্ রোলাণ্ড জিরণ্ডিষ্ট দলের জীবন-স্বরূপিণী ছিলেন, এবং এণ্টয়নেটী রাজতান্ত্রিক দলের একমাত্র নেত্রী ছিলেন। জোসেফাইন বীরচূড়ামণি নেপোলিয়নের সমর-বিষয়িণী প্রতিভার জনয়িত্রী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যে ইতালীক্ষেত্রে নেপোলিয়ন অসংখ্য বিজয় লাভ করেন, সেই সকল রণক্ষেত্রে জোসেফাইন্ নেপোলিয়নের পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিতেন। গারিবল্ডী-

পত্নীও জাতীয় সমরাঙ্গণে অশ্বপৃষ্ঠে সতত স্বামি-সহচারিণী থাকিতেন।

ভারতবাসী পতিত আর্য্য! পতিত অনার্য্য? যদি ভারতকে আবার উন্নতির উচ্চশিখরে তুলিতে চাও, যদি আবার ভারত-জননীকে বীরপ্রসবিনী দেখিতে চাও, তবে অগ্রে ভারত-ললনাকে স্বাধীনতা প্রদান কর; স্বাধীনতা প্রদান করিয়া জ্ঞানালোকে তাহার অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন অন্তরকে সমুজ্জ্বলিত কর। দেখিবে এই সঞ্জীবনীশক্তি প্রভাবে ভারতে নব জীবন সঞ্চারিত হইবে। বীর জননীর কুক্ষি হইতে বীর সন্তান প্রসূত হইয়া ভারতগগনে অপূর্ব্ব সৌভাগ্য-রবি সমুদিত করিবে; এবং অসংখ্য মাডেম্ রোলাণ্ড, অসংখ্য জোসেফাইন, অসংখ্য এলিজেবেথ—ভারতের তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে অসংখ্য পূর্ণচন্দ্ররূপে উদিত হইবে।

ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! ভারতের আত্মরক্ষিণী শক্তি! এ ভীষণ বিপৎকালে আমাদিগকে রক্ষা কর;—ত্বদাশ্রিত ছিন্ন ভিন্ন জাতিনিচয়কে পরস্পর-বিদ্বেষ-শূন্য একটী প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত কর; এ ঘোর দাসত্বের সময় আমাদিগের মন হইতে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতা, সর্ব্বপ্রকার জাত্যভিমান, এবং সর্ব্বপ্রকার আত্মাভিমান বিদূরিত কর; সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়কে এক সমবেদনা-সূত্রে একরূপে অনুস্যূত কর, যেন একটী হৃদয়ে বেদনা লাগিলে, সকল হৃদয় মর্ম্মপীড়িত হয়; আরাধ্য গুরু গোবিন্দ সিংহকে যে মহান্ জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিলে, আমাদিগের অন্তরেও সেই মহান্ জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা কর;—সমস্ত শিখজাতিকে, যে ভ্রাতৃত্বভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলে, সমস্ত ভারতবাসীকে আজ সেই ভ্রাতৃত্বভাবে অনুপ্রাণিত কর। এই মহান্ জাতীয় ভাবের অনুপ্রবেশে, এই উদার ভ্রাতৃত্বভাবের সঞ্চারে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিবে;—যবন হিন্দুর প্রতি, এবং হিন্দু যবনের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিবে;—ধনী ধনগর্ব্ব, ও জ্ঞানী জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগ করিবে;—উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর প্রতি চিরলালিত ঘৃণার ভাব পরিত্যাগ করিবে। এই সঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে মৃতপ্রায় ভারতে আবার নব জীবন সঞ্চারিত হইবে। ভারতের এই শ্মশানভস্ম হইতেই আবার রণবীর, জ্ঞানবীর ও ধনবীর—অগণ্য সংখ্যায় সমুদ্ভূত হইবে। এই জাতীয় জীবনের অরুণোদয়েই ভারতের ওয়াসিংটন্, ভারতের গ্যারিবল্ডি, ভারতের কাবুর ভারতক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবেন!

যখন ইতালী পড়িয়া দুইবার উঠিয়াছে, গ্রীস পড়িয়া আবার উঠিয়াছে, দাস

আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছে, ঘৃণিত জাপান ধুঁইয়া উঠিতেছে, নিপীড়িত আয়র্লণ্ড মাথা তুলিয়াছে,—তখন কার সাধ্য বলে পতিত ভারত আর উঠিবে না, জগতের গৌরব ভারত আর বাঁচিবে না ?*

বিদায়।

১

তবে ফের গৃহে হয়েছে সময়।—
বিদায়ের ভেরী বাজে উভরায়!
বিপক্ষ-বিজয়-পতাকা শূন্যেতে
হের আজি উড়ে গরব ভরে!
ইংলণ্ড-ত্রিদিবে, দৈত্য-স্থিতিশীলে
নৈতিক সংগ্রামে, দেবতা-মণ্ডলে
নামোন্নতিশীল,—করি পরাজয়,
বিজয় ঘোষিছে দেবতা নরে!

২

জিত দৈত্যরাজ! স্বর্গ-সিংহাসনে
আজি দেবরাজ!—লাজে, অপমানে
আজি ম্রিয়মাণ, সদনে দৈত্যেশ
ছাড়িয়া ত্রিদিব নিরয়ে ধায়!
তুমি দৈত্যরাজ আশ্রিত, পালিত,
দৈত্যেশ-আজ্ঞায় সতত চালিত;
তোমারও পয়াণ হয়েছে বিহিত,
সময়, ঘটনা তাহাই চায়!

৩

তুমি ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি
হে লর্ড লীটন দৈত্যেশ-সহিত
তোমারও ত আজ হলো অধোগতি,
সময়, ঘটনা ইহাই চায়!
সময়, ঘটনা স্রোতের কারণ
ছিলে একদিন তোমরা, এখন
সময়, ঘটনা স্রোতের গতিতে
ভাসিয়া চলিলে কোথায় হায়!

৪

ভাসিয়া চলিলে তৃণের মতন!
ভারত-অদৃষ্টে বিধাতা যখন
ছিলে, তবে কিহে ভ্রমেও কখন
ভাবিতে আসিবে এমন দিন?
হায়! ধরা-গর্ব্ব প্রাচীন ভারত
জননী মোদের, এখন পতিত!
তোমারও পতনে সরল হৃদয়ে
কাঁদে ভারতের তনয়গণ!

---

* এই প্রস্তাবটী বঙ্গভাষা সমালোচনী সভায় পঠিত হয়। বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভার অধ্যক্ষগণ বঙ্গভাষার চর্চ্চার জন্য যেরূপ যত্ন ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে দিন দেখিব যে অন্যান্য সভার অধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগের উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া, বঙ্গভাষায় বক্তৃতাদি আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিন বুঝিব যে আমাদিগের প্রকৃত জাতীয় জীবন আরম্ভ হইয়াছে। সঃ।

৫

কাঁদে ভারতের যত সুতগণ !—
হায় !—কিন্তু বল কাহার কারণ ?
তোমার কারণ, ভ্রমেও যে জন
ভারতের হিতে ছিলেনা রত !
পতিত মহত্বে দেয় যে অর্চ্চনা
দূরে থাক্ তাহা ! কৃপা ? কি লাঞ্ছনা !!
যে স্বত্ব সুসভ্য সমাজের প্রাণ
তোমা হতে তাও ভারত-চ্যুত !

৬

ইতিহাসে বলে প্রাচীন ভারত
যে জ্ঞানের বীজ করেছে রোপিত,
আজিকার প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সভ্যতা
সকলি তাহ'তে পেয়েছে প্রাণ !
নৈতিক উন্নতি সে ভারতে নাই !
শিখেছ এ কথা বল কার ঠাঁই ?
এ নূতন কথা শুনায়েছ তুমি
বিঁধিয়া ভারত-তনয়-মন !

৭

দিল্লী রাজস্থয়ে রাজ-সিংহাসনে
বসি, বুঝি হায় ভেবেছিলে মনে—
আর্য্যের গৌরব, মহত্ব সকল
পদতলে তুমি দলিলে ছার !
ধর্ম্ম-ভীত, রাজ-ভকত যে জাতি,
দণ্ড অবিচার করি তার প্রতি,
পশুর সমান করি হেয় জ্ঞান
অবিশ্বাসী নাম রেখেছ তার !

৮

ছিল আশা মনে, ভারত-তনয়
বৃটিশ-ছত্রের শীতল ছায়ায়
আবার লভিয়া নব অভ্যুদয়,
ছড়াবে ধরায় জ্ঞানের জ্যোতি !
কই, আর তাহা হলো না সাধন !
হায়' ! তুমি তার হয়েছ কারণ !—
সম্বাদপত্রিকা-স্বাধীনতা-ধন
হরেছ যখন কঠিন-মতি !

৯

পতিত ভারত-তনয়-হৃদয়ে,
যে আঘাত তুমি করেছ প্রদান
কালের প্রলেপে শুকাবেনা কভু !
রহিবে অনন্ত, সময় যথা !
মনোবেদনার উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস,
অনন্ত কালেও হবেনা শীতল !
অপূর্ণ লালসা প্রতিবিধিৎসার
ভীষণ যেমন, ইহাও তথা !

১০

আধির ঔষধ সুধুই রোদন !
মনেতে রহিবে মনের বেদন !
কিন্তু তাহা বলে এত হীনচেতা
নহেক ভারত-তনয়গণ !
মনেতে রহিবে মনের বেদন !
ক্ষমে তোমা যত আর্য্য-সুতগণ !
যাও নিরাপদে, গৃহে ফিরি যাও !
আজিও দয়ার্দ্র ভারত-মন !

১১

বৃটন আমরা স্বর্গ বলে মানি !
সভ্যতার খনি বৃটন তা জানি !
সতত বৃটন-উন্নতি, স্থায়িত্ব
সরল হৃদয়ে কামনা করি !

বৃটনের কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন,
অপূর্ব্ব, সুন্দর, পবিত্র কেমন!
বৃটন-সমাজে, জীবিত-চেষ্টার
স্বাধীনতা জয়ী, সদাই স্মরি!

১২

বার্ক, সেরিডেন, ধীর গ্লডষ্টোন্,
ফসেট্, ব্রাইট্, কব, কার্পেণ্টার
—নরদেব-রূপী,—ভারতের হিতে,
রত অনুদিন সদাই তাঁরা!
প্রত্যেক ভারত-তনয়-হৃদয়ে
কৃতজ্ঞতা ভাগীরথী-বারি দিয়ে,
পূজে অনুদিন দেবতা ভাবিয়ে
ভারতের হিতে নিয়ত যাঁরা!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সমর-শেখর।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ততঃ শুশ্রবাদূরতঃ গম্ভীরমশনিস্বনম্।"

একি! এ ঘোর রজনীযোগে এ ভীষণ প্রান্তরস্থ বৃক্ষের তলায় একাকী এ সশস্ত্র অশ্বারোহী পুরুষ কি নিমিত্ত অবস্থিত রহিয়াছেন? একে গভীর রাত্রি তাহাতে এই বিজন প্রান্তর মধ্যে কম্মাপি জনমানবের সমাগম নাই। নিকটে লোকালয়ও নাই। চতুর্দ্দিকে তিন চারি ক্রোশ ব্যাপিয়া ধূসরবর্ণ ক্ষেত্র ক্ষীণ চন্দ্রালোকে ধূ ধূ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী বৃহৎ বৃহৎ শাল বৃক্ষ গগণ স্পর্শনমানসে উন্নতশির্ষা হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে: নিকটে কোন জলাশয় নাই; কেবল এক ক্ষীণা তটিনী এই জনহীন প্রদেশের মধ্য দিয়া ঈষদ্ বক্রভাবে কুলকুলস্বনে গমন করিতেছে। স্বভাব স্থির, নিস্তব্ধ ও গম্ভীর। চতুর্দ্দিকে কোন জীবজন্তুর সাড়া শব্দ নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে আহারান্বেষী ফেরুপালের বিকট চীৎকার-ধ্বনি নৈশগগণ ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে। অদ্য ষষ্ঠী তিথি, শুক্লপক্ষ। নিশানাথ আস্তে আস্তে পশ্চিমাচলে শয়ন করিতেছেন। আকাশ ঈষৎ নীল, ঈষৎ শাদা। এক খানি শ্বেত বর্ণ মেঘ ধীরে ধীরে সরিয়া সরিয়া, শয়নোন্মুখ চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল।

"বাল্য কাল হইতে মাতৃহীন ও পিতৃবর্জ্জিত হইয়া অব্যবস্থিত ভাবে

দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি। কোথাও একাদিক্রিমে এক পক্ষ সুস্থির থাকিতে পারি না। নিরুদ্দেশ পিতৃদেবের অনুসন্ধানে চঞ্চল মন প্রতিনিয়তই ধাবমান হইতে চাহে। শুনিতে পাই এ হতভাগ্যের জন্মদিন হইতেই জনক রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন। এবং সেই শোকে স্নেহশীলা জননীও চিরতরে ভবধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতি শৈশব হইতে পরগৃহে প্রতিপালিত, সুতবাং আপনার পিতৃরাজ্যের নাম ও অবস্থিতি সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ। জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ বলিয়া দেয় না। হায়! এরূপ অপরিচিত ভাবে আর কত কালই বা দিন যাপন করিব। কতকালই বা পিতৃদেবের শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় নিপীড়িত হইব! পরম-প্রেমাস্পদ সমর আমায় সোদর-নির্ব্বিশেষে স্নেহ কবিলেও এ গুহ্য বিষয় কিছুতেই প্রকাশ করিতে চাহে না;—ইহারই বা কারণ কি?—" অশ্বারোহী বীর পুরুষ মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে নদীকূল হইতে এক ঘোর, বন্দুকধ্বনি উত্থিত হইয়া নৈশ নিস্তব্ধতাকে বিদূরিত করিল। পথিক চমকিত হইলেন; অবশিষ্ট বাক্যগুলি তাঁহার মনোমধ্যেই বিলীন হইল। ত্রস্তভাবে অশ্বের রজ্জু আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে বহির্গত হইলেন এবং বিস্ফারিত লোচন দ্বারা চতুর্দ্দিক্ চঞ্চল নয়নে অবলোকন করিলেন। কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল প্রশস্ত লোকালয়-শূন্য ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে দিগন্ত রেখার সহিত মিলিত রহিয়াছে দৃষ্টিগোচর হইল। আবার কি ভয়ঙ্কর! সেই বজ্রনাদ নদীব অন্য পার্শ্বে পুনর্ব্বার ধ্বনিত হইল! পুনর্ব্বার প্রশান্ত জগৎ কাঁপিয়া উঠিল। পথিক পুনর্ব্বার চমকিয়া উঠিলেন, ভয়শূন্য হৃদয়ে শব্দ নির্দ্দিষ্ট দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন,—কিন্তু এবারেও কিছু দেখিতে পাইলেন না। কি আশ্চর্য্য! এই নিশীথ কালে এ স্থানে কি নিমিত্ত বন্দুকধ্বনি হইল! পথিক বিষম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে অশ্বকে সেই দিকে চালিত করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

Instant his sword was in his hand;—
—Yet, dubious still, opposed he stood
To him that issued from the wood:—
"Rokeby."

বিষময় সংশয় চিরজীবনের জন্য যাহার মনোমধ্যেই পরিপোষিত থাকে সে কিসের সাহসী? এ কাল-ভুজঙ্গ-দংশনে যাহার হৃদয় বিষে জরজরিত অথচ উপায়ান্তরে ইহার সংহার সাধন না করে,—সে কিসের সাহসী? পর-নিন্দা, পরগ্লানি, পরভাগ্যাসহিষ্ণুতা যাহার অন্তঃকরণের অলঙ্কার স্বরূপ, আত্ম-সুখ ও স্বার্থপরতা যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য,—সে কিসের সাহসী?

আমরা মানবজাতি: শোক, তাপ, চিন্তা, দুঃখ প্রভৃতি আমাদের জীবনের অনেক প্রকার শত্রু আছে। কিন্তু এ সমুদয় হইতে আর কোন ভাবী বিষময় ফলোৎপত্তির আশঙ্কা থাকে না। 'যে রূপ কার্য্য করিয়াছি তদুপযুক্ত ফল পাইলাম' এই প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে এই সকল শত্রুকে হৃদয়াগার হইতে দূরী ভূত করিতে পারি। কিন্তু সংশয়? এ কালভুজঙ্গ কি ঈদৃশ মন্ত্রৌষধিতে পরাভূত হইতে পারে?— পারে। উপেক্ষা করিয়া তাহাকে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিলে, হয়; কিন্তু অমূলক না হইলে চিরজীবনের জন্য নহে। কোন না কোন কালে ইহা নিজ মূর্ত্তি পুনর্ব্বার ধারণ করিয়া জীবন বিষময় করিবেই করিবে। যে ব্যক্তি বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সংশয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, সে এ সংসার মার্গের উপযুক্ত পথিক নহে।

নিশানাথ অস্তগত, কিন্তু এখনও নিশাবসানের অনেক বিলম্ব। যে দুই এক খানি সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ মেঘ-খণ্ড এতক্ষণ সুধাংশুর সহিত ক্রীড়া করিতেছিল, সে গুলি এক্ষণে তাঁহার অনুগামী হইয়াছে। গগণ পরিষ্কার,—নীলাম্বর-মণ্ডিত, তন্মধ্যে উজ্জ্বল তারকাবাজি শত শত হীরক-খণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। জগৎ অন্ধকারময়ও নয়, উজ্জ্বলও নয়; অথচ নিকটস্থ বস্তুকে চিনিতে পারা যায়। পথিক অশ্বারোহণে চলিতেছেন। যে ক্ষণ হইতে তিনি এই ভয়ানক প্রান্তর মধ্যে দুইটী বন্দুকের ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, সেইক্ষণ হইতে তাঁহার অন্তঃকরণ এক মুহূর্ত্তের জন্য সুস্থির নয়। সেইক্ষণ হইতে তাঁহার হৃদয়-কাননে প্রবল দাবাগ্নি জ্বলিতেছে; এ অগ্নি আশু নির্ব্বাপিত হইবার নহে। পথিক সন্দিগ্ধ-চিত্তে চলিতেছেন। অকস্মাৎ যেন কি দেখিলেন। অমনি অশ্বের বল্গা টানিয়া গতিরোধ করিলেন, এবং স্থির নয়নে সেই বস্তু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন দুই জন ব্যক্তি একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় দণ্ডায়মান হইয়া তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। পথিক অবিলম্বে নিজ পিস্তল হস্তে লইলেন এবং ব্যক্তিদ্বয়কে নির্দ্দেশ করিয়া শব্দ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ব্যক্তিদ্বয় একপদও সরিল না, যেখান-কার সেই খানেই রহিল। এবং উহাদের মধ্যে এক জন যেন ঈষদ্ধাস্য করিল! অগ্নিতে ঘৃতাহুতি! নির্ভীক পথিকের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; সুতীক্ষ্ণ ফলক হস্তে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল। পথিক ভ্রূকুটি করিয়া তুরঙ্গ সেই দিকে সবেগে চালিত করিলেন। অবশেষে যাহা দেখিলেন তাহাতে বীরেন্দ্রের বীরগর্ব্ব ঈষৎ নম্র হইল। দেখিলেন, যে, যে বস্তুদ্বয়কে মনুষ্য বলিয়া তাঁহার অনুমান হইয়াছিল, তাহা দুইটী শাখাশূন্য বৃক্ষমাত্র; ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে তাঁহার মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তিনি ঈষৎ লজ্জিত হইলেন।

লজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। তরঙ্গের উপর তরঙ্গাঘাতে তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইল, তদুপরি সংশয়-পবন প্রবাত হইয়া স্রোতোবেগ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিল। আর থাকিতে পারিলেন না, "কে কোথা আছ, শীঘ্র বল, নতুবা শত্রু হও আর মিত্র হও, অদ্য আমার হস্তে কখনই নিস্তার পাইবে না।" গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন। আবার সেই হাস্য! পুনর্ব্বার সেই বিকট হাস্য যেন বৃক্ষান্তরাল হইতে বহির্গত হইল। মনুষ্য নাই অথচ হাস্য! এ হাস্য কে হাসিল? স্বভাব নিস্তব্ধ, বাতাসের নাম গন্ধ কিছুই নাই যে, পত্রঘর্ষণে হাস্যানুরূপ শব্দ বহির্গত হইবে। তবে কে হাসিল? পথিক বিস্মিত হইলেন। বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না; অথচ থাকিয়া থাকিয়া সেই হাস্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে! এত কাল গেল, এক দণ্ডের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্যও 'ভুত' কি প্রকার এ অনুভব তাঁহার হৃদয়াগারে স্থান পায় নাই। আজ তাহা দেখিলেন, স্বচক্ষে দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান হইল —জ্ঞান বিশ্বাসে পরিণত হইল। তাঁহার বাল্যকালের পিতামহী কথিত ভুতের গল্প স্মরণ হইল, বুঝিলেন পৃথিবীতে ভুত আছে। কিন্তু তাহা ভাবিয়া ভীত হইলেন না, বরং বিস্মিত হইলেন। যে বিষময় সংশয়-ভুজঙ্গ তাঁহার হৃদয়কে নিরন্তর দংশন করিতেছিল, তাহা এই ভুতাস্তিত্ব-বিশ্বাস-মন্ত্রে নীত হইল। পথিক সুস্থির হইলেন। সুস্থচিত্তে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পার্শ্বস্থ জঙ্গল হইতে কে তাঁহার হস্তস্থিত ফলক ধরিয়া টানিয়া লইল! আর নিস্তার নাই। "পামর আজ তোরা কিছুতেই নিস্তার পাইবি না" বলিয়া তাড়িত বেগে অসি নিষ্কোষিত করিয়া ঘোটক হইতে লম্ফ দিয়া ভূমে পতিত হইলেন। এই অবসরে পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল "কুমার ভয় পাইয়াছ?" এই ব্যক্তি ভিন্ন ইহাঁকে কুমার বলিয়া আর কেহ সম্বোধন করিত না। পথিক 'কুমার' নাম শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন "সমর! তুমি এখানে কি করিতেছিলে?"

"সে কথা পরে বলিব। এখন তোমার সাহস দেখিবার জন্য—" সমর ঈষদ্ধাস্য করিয়া উত্তর করিলেন। এই সেই হাঁসি।

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমিই কি বন্দুক ছুড়িয়াছিলে?

"না, আমি ছুড়িনাই। বন্দুক কি? এখানে বন্দুক?"

কুমার 'তবে কে ছুড়িল?'

"আমি বন্দুকের শব্দ শুনিনাই, বলিতেও পারি না।" সমর অন্য মনে উত্তর করিলেন।

ক্ষণকাল উভয়েই নিস্তব্ধ রহিলেন।

পরে অকস্মাৎ সমরের মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি স্বীয় পার্শ্ববর্ত্তীর মুখমণ্ডল স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "কুমার! আর কত দিন এরূপ অবস্থায় থাকিবে? স্বধনে বঞ্চিত হইয়া এ বেশে আর কতকাল যাপন করিবে? বিবেচনা কর, যদ্যপি তোমার মাতৃদত্ত ধন কিছুই না থাকিত, তাহাহইলে কি এতদিন এই অবস্থায় কাল কাটাইতে? আজই যেন তুমি সেই ধনে আবশ্যকীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেছ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ কাল কি হইবে? দুই দিবস পরেই বা কি হইবে? ভাই কাল উপস্থিত। আর বিলম্ব করিও না। বিলম্ব করিলে নিশ্চয় তোমাকে পরে কষ্ট পাইতে হইবে। আর একবার সেই বাক্য স্মরণ কর, তোমার মাতার মৃত্যু-শয্যায় বসিয়া যে কথা বলিয়াছিলে তাহা একবার স্মরণ কর।"

"সমর!" পথিক উত্তর করিলেন এবং ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তাহার বলগা ধারণ করতঃ পুনর্ব্বার বলিলেন "সমর। আমি সে কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হই নাই। আর এত দিন হইয়াছে এক বারও তোমার প্রতি আমার অবিশ্বাস জন্মে নাই। ভাবিয়া দেখ, যখন আমরা উভয়েই টালিকট ক্ষেত্রে রামরাজ্যের সৈন্য-দলে একত্রে এককার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, তখন তোমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতাম' এখনও সেই ভাব আমার অন্তঃকরণে বর্ত্তমান রহিয়াছে ও পরেও থাকিবে। কিন্তু তোমার পূর্ব্ব-ভাব? বিচার করিয়া দেখ সে ভাবের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! যে দিবস হইতে মা আমার পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন,—আজ প্রায় দশ বৎসর হইল—সেই দিবস হইতে, বলিতে পারি, স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, এক দিনের জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার প্রতি অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা জন্মে নাই। তবে প্রতিজ্ঞা? তাহা এতদিন সম্পন্ন হইত, যদ্যপি———"

সমর এই স্থানে বাধা দিয়া বলিলেন, "কুমার! তুমি কি তোমার মাতৃসমক্ষে তাঁহার মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা করো নাই যে, সেই দিন হইতে আমার অনুগামী হইবে?"

কু। "হাঁ করিয়া ছিলাম, এখনও করিতেছি, কিন্তু যদ্যপি তুমি এ কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও।"

সমর। "কি কুপথ কুমার?"

কু। "জঘন্য দস্যুবৃত্তি!—ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ পাপাচরণ!

স। "কুমার! যদ্যপি আমি ভীষণ পাপমার্গে পদার্পণ করিয়া থাকি তাহা এক্ষণে অত্যাজ্য। স্বার্থ সাধনের জন্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ইহা হইতে প্রত্যাগমন করা এক্ষণে দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু ইহা কুপথই হউক বা সুপথই হউক, তিন মাস পরে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে

পারিবে। ভ্রাতঃ, এক্ষণে আমি বিদায় হই। প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুশীলনে কখন নিশ্চিন্ত থাকিও না।"

কু। "সমর! এখন তুমি কোন্ কার্য্যে গমন করিবে?"

স। "ভাই! দস্যুদিগের আর অন্যবিধ কার্য্য কি?" ঈষদ্ধাস্য করিয়া সমব প্রয়ানোদ্যত হইলেন। কুমার তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,"সমব! আর কত দিন আমাকে এই ঘোর অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রাখিবে? স্বদেশ ও স্বজন পরিচয়-জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া আর কত কাল দুঃসহ হৃদয়-বেদন সহ্য করিব?"

"আর অধিক দিন নাই। শীঘ্রই তুমি এ যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এক্ষণে আর আমি বিলম্ব করিতে পরিনা" বলিয়া সমর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"দৃষ্টাপি সা হ্রীবিজিতা ন সাক্ষাৎ
বাগ্ভিঃ সখীনাং প্রিয়মভ্যনন্দৎ।"

রঘুবংশম্।

দিবা অবসান প্রায়। দিবাকর এক-খানি তাম্র থালের ন্যায় দেখিতে দেখিতে পশ্চিম সাগরে ডুবিয়া গেলেন। গগন পরিষ্কার। কেবল পশ্চিমদিকে দুই এক খানি সিন্দুর-বর্ণ মেঘ স্থাপিত হইয়া সুনীল গগণ-পটের চিত্রকার্য্যের অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিতেছে। যেন কোন সুনিপুণ চিত্রকর এতক্ষণ নীল নভোস্থলে একটী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছিল, সহসা সূর্য্যের তিরোভাব দর্শন করিয়া চিত্রকার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া গমন করিয়াছে। মেঘগুলি ক্রমে ক্রমে বহুরূপীর ন্যায় রূপ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। একবার ধূসর বর্ণ বেশ ধারণ করিল; আবার তখনই সে বর্ণ গলিয়া গলিয়া অবশেষে নীলাম্বরে মিশিয়া যাইল। এই সময়ে চারিজন বাহক একখানি শিবিকাস্কন্ধে করিয়া শাল-ঘাটের দুরন্ত প্রান্তর দিয়া গমন করিতে-ছিল।

অপর চারি জন বাহক ও একজন বলিষ্ঠ ভৃত্য তৎপশ্চাৎ যাইতেছিল। চন্দ্রদেব এখনও উদিত হন নাই। ক্রমে দেখিতে দেখিতে দুই একটী করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র উদিত হইয়া তারা-কান্তের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। জগৎ এক সূক্ষ্ম তিমিরজালে আবৃত। এই অনতিগভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া যতদূর মানবদৃষ্টি অগ্রসর হইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত শালঘাটের এইস্থান হইতে কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে রাশি রাশি অন্ধকারময় ধূম বহির্গত হইয়া এই দুরন্ত প্রান্তরকে ব্যাপিত করিতেছে। যেদিকে নিরীক্ষণ করা যায়, সেই দিক্ হইতেই যেন ঘোর অন্ধকার উত্থিত হইয়া চারিদিক্ আক্রমণ করিতেছে। প্রান্তর বিজন ও নিস্তব্ধ! কেবলমাত্র বায়ুর শন শন শব্দ ও রাত্রিঞ্চর বিহঙ্গমকুলের কর্কশ

কলরব থাকিয়া থাকিয়া শ্রুত হইতেছে। কি সর্ব্বনাশ! কোন্ সাহসে এই বাহকেরা এই ভীষণ কান্তারে পদার্পণ করিয়াছে! উহাদের অন্তঃকরণে কি আশঙ্কার লেশমাত্রও নাই? এই ভীষণ, দুস্তর পথ যে নৃশংস দস্যুগণের আক্রমণ স্থান! এখনি হয়ত উহাদের কপাল ভাঙ্গিবে। দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-হস্তে পতিত হইয়া জীবন হারাইতে হইবে। না জানি কোন্ হতভাগিনীকেই বা উহারা বহন করিতেছে! না জানি এই হত-ভাগিনীর মাতা, পিতা, ভ্রাতা বা বন্ধুগণ না বুঝিয়া ইহাকে বিদায় দিয়াছে! সে বিদায় হয়ত চিরবিদায়ে পরিণত হইবে! না, না। পরম কারুণিক পরমেশ্বর রক্ষা করুন;—যেন এ দুর্ভাগা অবলার অদৃষ্টে এরূপ না ঘটে! ক্রমে ক্রমে নিবিড়ান্ধ-কারবসনা বিকটদশনা নিশা জগতে একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপন করিল। আশঙ্কায় বাহকগণের প্রাণ উড়িল; প্রাণপনে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল; স্কন্ধের ভার ভার বলিয়াই জ্ঞান হইল না। ত্বরিতবেগে নিজগ্রামাভিমুখে ছুটিতে লাগিল। নির্ব্বোধেরা! গ্রাম কোথায়? এখনও লোকালয়ের কিছু দেখা যাইতেছে না। কোন্ সাহসে তোমরা এই অনাথা অবলাকে এই ভয়ঙ্কর স্থানে আনয়ন করিয়াছ? ঐ দেখ, বুঝি তোমাদের সর্ব্বনাশ ঘটে।" কে তোরা? পালকি থামা!" এই হৃদয়-বিদারক কঠোর অনুজ্ঞা নিকটস্থ জঙ্গল হইতে বহির্গত হইল। অমনি ক্ষণেক-মধ্যে পালকির উপরে চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘন ঘন লাঠিবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাহকেরা ভয়ে পালকি ভূমে রক্ষা করিল, কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিল না। প্রাণপণে যানের দুই পার্শ্বস্থ দ্বার রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। কিন্তু রমণী? সেই হতভাগিনী এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দুর্ঘটনা দর্শন করিয়াও এখনও কি সচেতনা রহিয়াছে? যে সুকুমারী জন্মেও দস্যু কেমন তাহা নয়নে দেখে নাই, আজ স্বচক্ষে দেখিল সেই বিকাটা-কার নরহন্তারা তাহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিয়াছে! এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবলোকন করিয়াও কি এখনও চৈতন্য সম্ভোগ করিতেছে? না। সে কুসুম-কলেবরা দুর্বৃত্তদিগের কঠোর আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই শিবিকা মধ্যে মূর্চ্ছিতা হইয়াছে; এখনও সেইভাবে রহিয়াছে!

এদিকে বাহকেরা প্রাণপণে যান রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কি করিবে, তাহাদের কোন প্রকার অস্ত্রাদি ছিল না যদ্দারা দস্যুদিগকে প্রত্যাঘাত প্রদান করিবে। যে এক মাত্র ভৃত্য পালকির সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, তাহারই নিকট কেবল একগাছি যষ্টি ছিল। সে তদ্দারা এতক্ষণ নৃশংস-দিগকে পালকির দ্বার স্পর্শ করিতে দেয় নাই, এবং এখনও যষ্টিচালন-নৈপুণ্যে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু একাকী আর কতক্ষণ চারিজন লাঠিয়াল দস্যুর গতিরোধ করিতে সক্ষম

হইবে? অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। যে যষ্টি এতক্ষণ বজ্রমুষ্টিতে বদ্ধ হইয়া চারিজন অস্ত্রচালনবিৎ দস্যুকে আক্রমণ-বিমুখ করিতেছিল, তাহা অবশেষে হস্তস্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, ভৃত্যও অকস্মাৎ বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া ভূতলশায়ী হইল। এই সময়ে অদূরে, ঘন ঘন অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। সকলে চমকিত হইয়া দেখিল এক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে সেই দিকে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী পুরুষ নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাহা দেখিয়া দুরাত্মা দস্যুগণ আত্ম-কার্য্যে তৎপর হইল; এবং ভীষণ চীৎকার করিয়া সবেগে বাহকদিগের প্রতি পতিত হইল। নিরস্ত্র বাহকেরা আর কতক্ষণ তাহাদিগের ভীষণাঘাত সহ্য করিবে? নৃশংসদিগের বজ্রযষ্টি প্রহারে একে একে দুইজন হতভাগ্য ভূপতিত হইল, তদ্দর্শনে অবশিষ্ট ছয়জন ঘোর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। "ভয় নাই, ভয় নাই" জগদীশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই আশ্বাস-বাক্য সকলে নিকট হইতে শুনিতে পাইল, এবং দেখিল সেই অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলেন; দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইলেন; "নৃশংস, রাক্ষসগণ! দাঁড়া তোদের সমুচিত দণ্ডবিধান করিতেছি" এই বলিয়া ভয়-চকিত একজন দস্যুকে লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ ফলক নিক্ষেপ করিলেন লক্ষ্যীভূত হতভাগ্য পামর উন্মূলিত তরুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। অবশিষ্ট তিন ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। বীরপুরুষ অশ্ব ফিরাইয়া তাহা-দিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাহা-দিগকে ধরিতে না পারিয়া প্রত্যাগত হইলেন। "তোমরা কোথা যাইবে?" তিনি বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বাহকেরা উত্তর করিল "রঘুনাথ পুরে"। তাহারা বীরপুরুষের অসীম বিক্রমদর্শনে এতক্ষণ মৃৎপুত্তলির ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল। অশ্বারোহী অশ্ব হইতে ভূতলে নামিলেন।

"তোমাদের কয় জন আহত হইয়াছে?"

"আজ্ঞা এই তিন জন" বাহকেরা কাতরস্বরে উত্তর করিল এবং আহত ব্যক্তিত্রয়কে দেখাইয়া দিয়া রোদন করিতে লাগিল। "তোমরা রোদন করিও না; ইহাদের মধ্যে কেহই মৃত হয় নাই। ক্ষণমধ্যেই সকলে সংজ্ঞা লাভ করিবে" অশ্বারোহী আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং বিচেতন ব্যক্তিত্রয়ের নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া কহিলেন "তোমরা শীঘ্র একজন একটু জল লইয়া আইস"। তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি গমন করিয়া নিকটস্থ দীর্ঘিকা হইতে এক পত্রপুটে জল আনয়ন করিল।

অচেতন ব্যক্তিত্রয়ের মুখমণ্ডলে জল-সেক করা হইলে, তাহারা একে একে তিন জনেই সংজ্ঞা লাভ করিল। কিন্তু

আহত ভৃত্যটীর অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ বলিয়া অনুমিত হইল। হতভাগ্য, নরপিশাচ দস্যুকর্ত্তৃক এরূপ আহত হইয়াছিল যে তাহার আর উত্থানের সামর্থ্য ছিল না।

"তিন জনেই যে প্রকার বলহীন হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় এক পদও কেহ চলিতে পারিবে না। আর এ পালকির ভিতরে বোধ হয় কোন কুল-কামিনী থাকিবেন। উঃ কি ভয়ঙ্কর!" যুবক শিহরিয়া উঠিলেন "নৃশংস দস্যুরা হয়ত কামিনীকে কতই ক্লেশ—"

"বাবা গো! কোথা গেলে" এই আর্ত্তনাদ অকস্মাৎ শিবিকাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইল।

"কি হইল!—কি হইল! দেখ, দেখ।" সকলে বিপন্নস্বরে বলিয়া উঠিল। অবিলম্বে পালকি-দ্বার মুক্ত হইল। সকলেরই নয়ন তদ্দিকে ধাবমান হইল,—দেখিল সুকুমারী বালিকা নিশ্চেষ্টাবস্থায় উপবিষ্টা রহিয়াছে, নয়ন পলকহীন, তন্মধ্য হইতে অনর্গল অশ্রুধারা বহির্গত হইয়া অপাঙ্গ বহিয়া হৃদয়াবরণকারী বসনে মিশাইতেছে, মুখে বাক্য নাই, শরীরে সাড় নাই। "সর্ব্বনাশ!" বলিয়া বাহকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল।

"ভয় নাই। উনি আশঙ্কায় ওরূপ হইয়াছেন, এখনি আরাম হইবেন; তোমরা শীঘ্র জল আনয়ন কর। আর একজন ঘন ঘন ব্যজন কর।" যুবক আশ্বাসবাক্য প্রদানে তাহাদিগকে শান্ত করিলেন। এবং শিবিকাভ্যন্তরে থাকিলে পাছে শুশ্রূষার অসুবিধা হয় তজ্জন্য তাঁহাকে তাহা হইতে বাহির করিতে আদেশ করিলেন। রমণী শ্যামল দূর্ব্বাশয্যায় শায়িতা হইলে যুবক গণ্ডূষ-দ্বারা বারি গ্রহণ করিয়া কুমারীর নিষ্প্রভ বদনমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে বিকৃত মুখচ্ছবি স্বপ্রভা পুনঃপ্রাপ্ত হইল। নয়নদ্বয় ক্ষণকাল মুদিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য কুরঙ্গনয়নদ্বয় মুদিত হইয়া স্থির ভাবে রহিল; আরক্ত ওষ্ঠাধর ক্ষণকাল বিকম্পিত হইল, যেন মনে মনে কি বলিতেছে,—পুনর্ব্বার উভয়ে সংলগ্ন হইল। কুমারী নয়নদ্বয় উন্মীলন করিল, একবার সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিক্ অবলোকন করিল, জগৎ শীতল হইল, বাহকদিগের আনন্দ বাড়িল, যুবকের মোহ ঘটিল। একজন অপরিচিত পুরুষকে নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়া ব্রীড়াশীলা ঈষৎ লজ্জিতা হইল, বিব্রতভাবে উঠিয়া বসিল এবং বসনাঞ্চলে মস্তকাবৃত করিয়া ভূপতিতলোচনে অঙ্গুলিদ্বারা পৃথিবীকে ক্ষত করিতে লাগিল। বালিকা-হৃদয়ে অদ্য এক নূতন বীজের অঙ্কুর হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"Clo—Thou art a robber,
A law breaker,—a villain:—yield thee, thief.
Gui—To who?—to thee? what art thou?"
CYMBELINE.

গোয়া নগরীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে পশ্চিমঘাটের একটী অনতিদীর্ঘ শাখা

বহির্গত হইয়া বেলগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই পর্ব্বতাংশটী অতিশয় অসম ও অরণ্যময়। রুদ্রাণী নাম্নী এক অতি বেগবতী নদী ইহার নিম্নদেশ ভেদ করিয়া বহির্গতা হইয়াছে। এই প্রস্তরময় প্রদেশের কাঠিন্য নিবন্ধন রুদ্রাণী অধিক প্রশস্তা ও গভীরা হইতে পারে নাই; কিন্তু স্বভাবতঃ এরূপ বেগবতী যে ভূধরচ্যুত বৃক্ষাদি ঘটনাক্রমে তাহার স্রোতোমধ্যে পতিত হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া একবারে দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যায়। পশ্চিমাচলের এই অঙ্গকে সচরাচর সকলে "পাঞ্জোর' এই অভিধা দিয়া থাকে; আমরাও ইহাকে পাঞ্জোর বলিয়া আখ্যাত করিব।

পাঞ্জোর, দুইটী বৃহৎ ও একটী ক্ষুদ্র শৃঙ্গে বিভক্ত। এই ক্ষুদ্র শৃঙ্গটী বৃহৎ শৃঙ্গদ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত। বিবিধপ্রকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরণ্য পাদপ নিকর উত্থিত হইয়া এই স্থানকে চতুর্দ্দিক্ হইতে এরূপ গাঢ়তর আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, বেলাধিক্য না হইলে এই স্থান হইতে দিবাকর-মুখ কেহই দেখিতে পায় না। রাত্রি প্রায় দশঘটিকা অতীত। নিশানাথ যতই ক্রমে ক্রমে উচ্চে আরোহণ করিতেছেন ততই তাঁহার সুধাময় করনিকর জীবগণের হৃদয়কে পুলকিত ও শীতল করিতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও পাঞ্জোরের ক্ষুদ্র শৃঙ্গটী সে সুখে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত; কেবল দুই একটী সুধাংশুরেখা বৃক্ষপত্রের বিবরতাবশতঃ মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ একটী প্রস্তরময় অসংস্কৃত ক্ষুদ্রবাটীর স্থানে স্থানে পতিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। এই বাটী চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া প্রবেশদ্বার। ইহাদের মধ্যে একটী প্রকোষ্ঠের ভিতর দুইজন মনুষ্য একখানি কাষ্ঠময় খাটিয়ায় উপবিষ্ট হইয়া অনন্যমনে পাশক্রীড়া করিতেছে। সম্মুখে এক মৃণ্ময় দীপাধারে একটী অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছে। গৃহটী চতুষ্কোণ। চতুর্দ্দিকের ভিত্তি গুলি অতীব অসম; মধ্যে মধ্যে প্রস্তরখণ্ড বহির্গত হইয়া অযত্নকৃত গৃহনির্ম্মাণের বিলক্ষণ প্রমাণ দর্শাইতেছে।

সুধাকর ক্রমশঃ বৃক্ষান্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া গগণাঙ্গনে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন অধিকার করিল। ক্রমে পাঞ্জোরের শৃঙ্গ, বন, ও প্রস্তরবাটী সুধাংশুর শ্বেতচ্ছটায় হাস্য করিতে লাগিল। এই সময় গৃহের বহির্ভাগে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শ্রুত হইল। উভয়ে চমকিত হইয়া দ্বারদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, দেখিল এক সশস্ত্র পুরুষ ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিয়া সকলের প্রাণ উড়িল, শশব্যস্তে পাশাদি লুক্কায়িত করিল, এবং পূর্ব্বভাব গোপন করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যার্থনার্থে গাত্রোপান করিল। এই সসজ্জিত পুরুষ আর কেহই নহেন,—

আমাদের সমর। সমর গম্ভীর ভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বদন আরক্ত; ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত; ললাটদেশ ক্রোধব্যঞ্জক রেখাত্রয়ে বিভিন্ন; দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে কোপদৃষ্টিতে গৃহের চতুর্দ্দিক্ একবার নিরীক্ষণ করিলেন। একে অসময়ে আগমন, তাহাতে আবার এইরূপ ভীমমূর্ত্তি। ভয়ে সকলের হৃদয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। উভয়েরই ইচ্ছা কারণ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু ভয়ে কাহারও মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না।

সমর পার্শ্বস্থ খাটিয়ায় ক্রুদ্ধভাবে উপবিষ্ট হইলেন, এবং উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে এক জনের প্রতি রোষ-কষায়িত লোচনে কর্কশ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "রুদ্রসিংহ! এসব কি শুনিতেছি? দিন দিন তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে! ভাল, দেখা যাউক। আজ তোমাকে কিছুই বলিব না। আর একবার দেখিব; তাহার পর আবার যদ্যপি শুনিতে পাই তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে সমরের এই করাল তরবার তাহার নিয়মহন্তার শোণিতে স্নান করিবে।" কোষ হইতে অমনি তরবার সবেগে বাহির করিলেন। প্রোজ্জ্বল দীপালোকে সুচিক্কণ অস্ত্রফলক বিজলীর ন্যায় সকলের নয়ন ধাঁধিয়া দিল। তাহারা স্তম্ভিত হইয়া চিত্রিতের ন্যায় স্থিরব্যাপিত নয়নে সমরের প্রতি চাহিয়া রহিল। সমর তৎপরেই তরবার খাটিয়ার উপর রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার সেই স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘো কোথা? তোমরা কেহ জানত শীঘ্র বল।"

যে ব্যক্তিকে প্রথমে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহার এবিষয়ে উত্তর করিতে সাহস হইল না। তৎপার্শ্বস্থ ব্যক্তি (যাহার নাম বলভদ্র) বিনীতস্বরে উত্তর করিল "প্রভো! আমরা তাহা যথার্থ বলিতে পারিলাম না। তবে এইমাত্র অনুমান হয় যে, আমাদের নিয়ম-নিষিদ্ধ কোন গর্হিত কার্য্যে গমন করিয়াছে। কেন না যাইবার সময় আমাদিগকে কিছুই বলিয়া যায় নাই; আর সম্প্রতি যে এক কার্য্য করিয়াছে, তাহা আমাদের সম্প্রদায়ে নিতান্ত নিয়মবিরুদ্ধ। তবে এ কার্য্যে তাহার একাকীর সম্পূর্ণ দোষ নাই, আমার ও রুদ্রসিংহের কিয়ৎপরিমাণে আছে। প্রভো! সত্য কহিব ইহাতে দাসের প্রতি আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় দণ্ডবিধান করুন্। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে রঘু বলিল "এই সময় শালঘাটের মাঠে যাইতে পারিলে অনেক লভ্য হয়. এই বলিয়া সে আমাদের দুই জনের অভিমত লইতে আসিল। রুদ্রসিংহ সর্ব্বাগ্রেই তাহাতে সম্মত হইল" (রুদ্রসিংহের বদন ক্রমশঃ মলিন হইয়া আসিতে লাগিল) "আমি বলিলাম ভাল যদিও আমরা যাই তথাপি প্রভুর আজ্ঞা ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না" রঘু তাহাতে বিরক্ত হইয়া কহিল "প্রভুত অমনি সর্ব্বজ্ঞানী

নন যে, আমারা যাহা করিব তাহাই জানিতে পারিবেন। আর পারিলেই কি আমাদিগকে শূলে দিবেন?"

সমরের বদন গাঢ়তর আরক্ত হইল, ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ ফুলিতে লাগিল; তিনি দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না,—কেবল "আচ্ছা তাহার পর" এই বাক্যটী চর্ব্বিত স্বরে উচ্চারণ করিলেন।

"তাহার পর প্রভো!"বলভদ্র সেই ভাবেই প্রত্যুত্তর করিল "এক অতিশয় গর্হিত কার্য্য করা হইয়াছিল, তাহা বলিতে আমার সাহস হইতেছে না, কারণ সে প্রকার কার্য্য করিতে আপনি ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের প্রতি আক্রমণ! কিন্তু, প্রভো বলিব কি? অর্থই আমাদের অনর্থের মূল হইয়াছে!—রঘু আমাদিগকে নানা প্রকার লোভ দেখাইতে লাগিল। হায়! এই লোভেই আমাদিগের এক দিন জীবন হারাইতে হইবে!—তাহার পর, সেই লোভে ভুলিয়া আমরা চারিজনে শাল ঘাটের মাঠে গিয়া একটা বনের ভিতর লুকাইয়া রহিলাম। ক্ষণেক পরে, দেখিলাম কয়েকজন বেহারা একখানি পালকি লইয়া আসিতেছে। দেখিয়া রঘুকে বারণ করিলাম যে, বোধ হয় উহাতে স্ত্রীলোক আছে, অতএব ও বিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ এ বিষয়ে আমাদের স্বামীর মত নাই। কিন্তু রঘু না শুনিয়া আমাদিগকে এক কঠোর দিব্য দিল————"

"বড় কুকার্য্যই করিয়াছিলাম? অশ্বারোহী না আসিলে দেখ্‌তিস্ প্রভুকে কেমন সেই নূতন সামগ্রী আনিয়া দিতাম" বলিতে বলিতে এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সকলে বিরক্ত হইয়া দেখিল—রঘু। সমরের সর্ব্বশরীর ক্রোধে দ্বিগুণতর স্ফীত হইল। তিনি তরবার হস্তে তুলিয়া ঘোর কর্কশস্বরে বলিলেন "তুই চুপ কর, চণ্ডাল! তোর কথা শুনিতে চাহি না। যখন বারম্বার নিষেধ করাতে তুই শুনিস নাই, তখন তোর গ্রহ সন্নিকট। আর আমি তোর একটী কথাও শুনিব না।"

"না শুনিলে ত আমার সব ক্ষতি হইল;" রঘু চর্ব্বিত বাক্যে নিম্ন স্বরে কহিল।

"রঘু, তুই এখন চুপ কর্! নতুবা সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। আর সহ্য হয় না। একবার, দুইবার, তিনবার সহ্য করিয়াছি। কিন্তু আর পারি না। সম্মুখে নিয়মভঙ্গ! এতদূর অপমান! অন্য বিষয়ে হইলে হইত। কিন্তু এক সামান্য অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য এক গর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কলঙ্কের ভাগী হওয়া কতদূর নির্ব্বোধের কর্ম্ম! বল্ দেখি, আমার সম্মুখে সত্য করিয়া বল্ দেখি, আমাদের সাম্প্রদায়িক নিয়মাবলীতে কি প্রকার লিখিত আছে?—আজ প্রায় তিন বৎসর হইল

তোমরা দলভুক্ত হইয়াছ। তৎকালে কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা একবার মনে করিয়া দেখ। 'আমার অনুজ্ঞা-ব্যতিরেকে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না,' এই সত্য গ্রহণ করিয়াছিলে কি না তাহাও মনে করিয়া দেখ। সেই সত্যের কি অবশেষে এই প্রকার রক্ষণ! সেই নিয়ম রক্ষার জন্য কি এই প্রকার কর্ম্ম, যে সামান্য অকিঞ্চিৎকর ফল লাভের নিমিত্ত সহায়হীনা বালিকার প্রতি আক্রমণ! যে অসামান্য মহদ্ব্যাপার আমাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, এবং তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে, সে মহৎ বিষয়ে তাচ্ছিল্য করিয়া ভীরুর ন্যায় এক নিন্দার্হ, জঘন্য, নীচ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ! আমরা সকলে একত্রিত হইয়া এক নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়ার পর তিন মাস অতীত হইতে না হইতে রুদ্রসিংহ ও তুমি, তোমরা দুই জনেই সর্ব্বাগ্রে সেই শৃঙ্খল ভগ্ন করিলে; কিন্তু তখন তাহা নির্ব্বাকে সহ্য করিয়াছিলাম; তাহার পর, দ্বিতীয়বার নিয়মভঙ্গ করিলে তাহাতেও কিছু বলি নাই, তৃতীয়বার করিলে তাহাতে উভয়কে সতর্ক করিয়া দিলাম; তাহাতে রুদ্রসিংহ যদিও নিরস্ত হইয়াছিল, তুমি পুনর্ব্বার তাহাকে এক অতি নিকৃষ্ট বিষয় সাধনে উৎসাহিত করিয়া আমাদের নিয়মের যৎপরোনাস্তি অপমান করিলে; ইহাতে বোধ হইতেছে তোমারই অধিকতর দোষ;—এবং তোমার এ প্রকার কুস্বভাব চির-জীবনেও অপনীত হইবে না, বরং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইবে। অতএব তোমার এ প্রকার দুরাচার আর উপেক্ষিত হইবার নহে। এক্ষণে তোমার কি অভিমত শীঘ্র প্রকাশ কর।" এই বলিয়া সমর ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে রঘুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডলের কুটিল-ভাব সমভাবেই রহিল।

"ইচ্ছা আর কি? আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।" রঘু কর্কশস্বরে প্রত্যুত্তর করিল।

"তবে কোথা যাইবে?" সমর রঘুর দিকে কিঞ্চিদগ্রসর হইলেন

"সে আমার ইচ্ছানুসারে, আমি কাহারও আজ্ঞাধীন নহি।"

"তবে তুই এ সাম্প্রদায়িক নিয়মে পদাঘাত করিতে চাস?"

সমর রঘুর দিকে আরও অগ্রসর হইলেন এবং নিজ তরবার হস্তে তুলিয়া লইলেন।

"সাম্প্রদায়িক নিয়ম আবার কি? এক পরধনাপহারক দস্যুর আবার নিয়ম কি, যে তাহার মতে কার্য্য করিতে হইবে? আমি কাহারও নিয়ম গ্রাহ্য করিব না।" বলিয়া রঘু দণ্ডায়মান হইয়া সমরের দিকে কুটিল নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

এই কঠিন মর্ম্মভেদি বাক্য সমরের অঙ্গে অঙ্গে লৌহ শলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইল। ভুজঙ্গ-দষ্টের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। শিরায় শিরায়

অগ্নিকণাবর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি বাণ-বিদ্ধ সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, "দুরাত্মন্! আর তোর কিছু-তেই নিস্তার নাই" ঘোর চীৎকার করিয়া হস্তস্থিত তরবারাঘাতে রঘুর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন!!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

The soul's affection can be only given
Free, unextorted, as the grace of Heaven.
COWPER.

বোধ হয় কোন কালে, কোন দেশে, কোন কবিই এপ্রকার লেখনী ধারণ করেন নাই যে তিনি সংসার-সাগর-নিধি প্রণয়ের বিষয় একবারও না উল্লেখ করিয়াছেন। সত্য—পবিত্র প্রণয়ের তুল্য রমণীয় পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই, কিন্তু কয় জন মনুষ্য ইহার যাথার্থ্য প্রণিধান করিয়াছে? ও কয় জনই বা ইহার সুবিমল সুখানুভব করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছে? তথাপি সংসারে এমন কোন লোক নাই যে চিরজীবনের মধ্যে এক দিন আপনাকে প্রণয়ী বলিয়া সম্ভাষণ না করিয়াছে। প্রত্যেক মূর্খ ও দুষ্ট লোক অজ্ঞানতাবশতঃ আপনাকে প্রণয়ী বলিয়া পরিচয় দেয়; কিন্তু জানে না যে, তাহারই স্বীয় কার্য্যকরণ সে পবিত্র নামাধিকারের পার্শ্বে দুর্জ্জয় বৈরি-বেশে অনুক্ষণ অবস্থান করিতেছে। প্রত্যেক লম্পট ও ভোগবিলাসী সদা সর্ব্বক্ষণ প্রণয়ের কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে। কিন্তু সে কি জানে যে, সে স্বয়ংই আপনার হৃদয়কানন হইতে সে সুধাময় বৃক্ষকে উৎপাটন করিয়া চিরজীবনের জন্য অনিবার্য্য অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে? প্রণয় অমূল্য ও দুর্ল্লভ। তুমি বিপুল ধনশালী, অকাতরে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিতে পার;—কিন্তু তাহা বলিয়া কি তুমি সমস্ত কোষাগার শূন্য করিয়াও একটী অমূল্য নিধি প্রণয়রত্ন ক্রয় করিতে পারিবে? তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, প্রজাপীড়ক ভূস্বামী! বলপ্রয়োগে নিঃসহায় প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে পার, যখন যাহা আবশ্যক দুর্ভাগাদের রক্তশোষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্পন্ন করিতে পার; তাহা বলিয়াই কি তুমি ইচ্ছা করিলেই বল প্রয়োগে স্বাধীন প্রণয়-নিধি কাড়িয়া লইতে পারিবে?—না, কখনই নয়। প্রণয় স্বাধীন, পবিত্র ও স্বর্গীয়।

প্রভাতকাল। নবোদিত দিবাকরের বালার্ক-কিরণ-মালা রঘুনাথপুরের উচ্চোচ্চ পাদপকূটে ও সৌধশিখরে ক্রীড়া করিতেছে। বিহঙ্গমকুল কুলায় ছাড়িয়া আহারান্বেষণে চারিদিকে ধাবমান হইতেছে এবং কলরব করিয়া আপনাপন সহচরদিগকে আহ্বান করিতেছে। নিশাদূতী তামসীগণ সূর্য্যকর-প্রতাড়িত হইয়া ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। গিরিগহ্বর, নিবিড় দ্রুমালয়, যে যেখানে

পাইল সে সেই-খানেই লুক্কায়িত হইল। প্রভাত-সমীর আস্তে আস্তে বহির্গত হইয়া সুপ্ত-জীব সকলকে সুশীতল করস্পর্শে জাগরিত করিতেছে। কমলিনীর কাণে কাণে কি মন্ত্র দিল, অমনি কমলিনী হাসিয়া উঠিল; সারা রাতি নিদ্রা হয় নাই, কুলবধূকে ধীরে ধীরে ব্যজন করিয়া ঘুম পাড়াইল,—কামিনী ঘুমাইল, এই অবসরে গাত্রাবরণ আস্তে আস্তে উন্মুক্ত করিয়া শরীর-সুষমা দেখিয়া লইল, সুচিক্কণ অলকরাজি লইয়া সুবদন সাজাইয়া দেখিল সুন্দর হইল, একবার অলক্ষে চুম্বন করিয়া লইল, রমণী চমকিয়া উঠিল! বিশ্বাসঘ্ন! তোর কি এই কার্য্য!

এই সময়ে রঘুনাথপুরের একটী বাটীর এক কক্ষ-মধ্যে এ লাবণ্যময়ী রমণী কে? এ কি দেবী না মানবী? কমলা কি ভক্ত-মনোরথ-সিদ্ধার্থে ছদ্মবেশে ধরাধামে আবির্ভূতা হইয়াছেন? না কোন বিদ্যা-ধরাঙ্গনা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ শাপ-ভ্রষ্টা হইয়া মহীতলে নিক্ষিপ্তা হইয়াছেন? এরূপ অতুল সুষমারাশির একত্র সমাবেশ ধরাধামে অতি বিরল। আমার এমন কি শক্তি আছে যে, সেই সুবিমল সৌন্দর্য্যের যথাযথ বর্ণন করিয়া পাঠকের সম্মুখে সেই মোহিনী মূর্ত্তির প্রতিমা গঠিয়া দিই। পাঠক! আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। পাছে সে সুন্দর নিষ্কলঙ্ক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে গিয়া তুলিকা বাঁকিয়া যায়, এই ভয়ে তাহাতে হস্তার্পণ করিতে সাহস হইল না। পাঠক! জীবনে কি কখন কোন অনুপম রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া আপনার হৃদয় মোহিত হইয়াছিল? যদ্যপি হইয়া থাকে তবে অনুমান করুন্ এ রূপ তাহা হইতেও সুন্দর। ঐ দেখুন্ সেই রমণী আসনোপরি উপবিষ্টা হইয়া একখানি পত্রপাঠ করিতেছেন। প্রলম্বিত কেশ গুচ্ছাগ্র শ্রোণিদেশ স্পর্শ করিতে না পাইয়া ভূমে লুণ্ঠিত রহিয়াছে। প্রভাত সমীরণ তাহা-দিগকে দুই এক গাছি করিয়া তুলিয়া তুলিয়া রমণীর স্কন্ধ দিয়া উন্নতবক্ষস্থলে স্থাপন করিতেছে। রমণী চম্পক-কলিকা-বিনিন্দিত সুগোল অঙ্গুলিদ্বারা তাহা-দিগকে আবার যথাস্থানে রক্ষা করিতে-ছেন। পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। নিহারসিক্ত প্রভাতোৎপল-সদৃশ নয়নদ্বয় অকস্মাৎ অশ্রুজলে পূর্ণ হইল; কামিনী বসনাঞ্চলে তাহা মার্জ্জনা করিলেন।

"গিরিবালা! কাঁদিলে কেন"? নিকট হইতে শ্রুত হইল। রমণী চমকিয়া দেখিলেন তাঁহার গৃহের দ্বারদেশে এক নবীন পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। যুবকের বয়ঃক্রম অন্যূন বিংশতি বৎসর হইবে; কিন্তু আকৃতি দেখিলেই হঠাৎ দ্বাবিংশতি বলিয়া অনুমান হয়। পরিধান পায়জামা গাত্রে আজানুলম্বিত, বিচিত্রকারুকার্য্য-সন্নিবেশিত সাটিনের অঙ্গরাখা। মস্তকে উষ্ণীষ। যুবক কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কামিনীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া মৃদুস্বরে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "গিরিবালা, কাঁদিলে কেন?"

"সে কথা তোমাকে বলিলে কি হইবে?--তুমি কি আমাব সুখদুঃখের সমভাগী?" গিরিবালা বিপন্ন স্বরে উত্তর করিলেন।

যুবক। "সে কি গিরিবালা! ও কথা বলিও না যে, রমেশ তোমার সুখদুঃখের সমভাগী নয়!"

গিরি। "রমেশ যদি আমার সুখ-দুঃখের সমভাগী হইত, তাহা হইলে এরূপ কঠিন বজ্রপ্রহার করিয়া গিরিবালার হৃদয় ভগ্ন করিত না।" আকর্ণবিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে পুনর্ব্বার দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। গিরিবালা গোপনে তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। রমেশ তাহা দেখিল না!

রমেশ। "কেন, কেন, গিরিবালা, আমি এমন কি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি যে তোমার হৃদয় ভগ্ন হইল?'

গিরি। "তুমি যে প্রকার হৃদয়বিদারক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, তাহা শক্রতেও পারে কি না সন্দেহ। তোমার সহিত না বিবাহ হইলে চিরজীবনের জন্য অভাগিনী গিরির ঐহিক সুখের পথে কণ্টক পড়িবে। রমেশ, তুমি কি এই প্রকারে গিরিবালার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইবে? বাল্যকাল হইতে তোমাকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া আসিতেছি, ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর যতদূর ভালবাসা থাকিতে পারে, তদধিক তোমার প্রতি তাহা আছে। আপন পিতার কোন কষ্ট হইলে বরঞ্চ তাহা সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার কোন প্রকার ক্লেশ অদ্যাবধি সহ্য করিতে পারি নাই, তোমার দুঃখের সময় আমার চক্ষে জল আসিয়াছে; তোমার আনন্দের সময় আমার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়াছে, আমি হাঁসিয়াছি, দেবতা দিগকে পূজা দিয়াছি। তোমারও আমার প্রতি স্নেহের কিছুই বিকার অদ্যাবধি দেখি নাই; তোমার ভাব দেখিয়া আমি আনন্দিত হইতাম, ভাবিতাম রমেশ আমাকে যথার্থ কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসে। কিন্তু সে মুখমিষ্ট স্নেহ যে অন্তরে হলাহলে পরিপূর্ণ তাহা একদিনও বুঝিতে পারি নাই। এত কালের জন্য এক মুহূর্ত্তও আমার মনে মনে কখন এরূপ সন্দেহ হয় নাই যে রমেশ অন্তরে অন্তরে আমার এমন সর্ব্বনাশের কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে।" গিরিবালার চক্ষে জল আসিল; এবারে আর গোপন করিতে পারিলেন না। কাঁদিলেন—নীরবে কাঁদিলেন।

রমেশ লজ্জিত হইল। "গিরিবালা, ক্ষমা কর, আমার এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর। আর কখন তোমার প্রতি ও রূপ বাক্য প্রয়োগ করিব না। আমি তোমাকে যথার্থ ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসি কি না তাহা জগদীশ্বর জানেন; কিন্তু সেই ভালবাসা অবলম্বন করিয়া এক দুর্ল্লভ রত্নলাভের আশা মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিলাম, ও তাহারই উৎসাহে না বুঝিয়া তোমার সরল হৃদয়কে দুঃখিত করিয়াছি। এক্ষণে

প্রতিজ্ঞা করিলাম আমার জীবন সত্তে তুমি আর কখন ও রূপ বাক্য শুনিতে পাইবে না। কিন্তু গিরিবালা আমি আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। তোমার কাহার সহিত বিবাহ হইবে?"

গিরিবালা দুঃখিতা হইলেন। ভাবিলেন অঙ্গার শতবার দুগ্ধে ধৌত করিলেও তাহার মালিন্য কিছুতেই দূরীভূত হইবার নহে। তাঁহার বদন গম্ভীরভাব ধারণ করিল, "রমেশ! এ প্রকার প্রশ্ন করিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই এবং আমিও ইহার উত্তর দিতাম না,—কিন্তু তোমার প্রতি আশৈশব স্নেহ আমাকে বাধ্য করিল, আমি ইহার উত্তর দিব। যে স্নেহের চক্ষে তোমাকে এতাবৎকাল ভ্রাতার ন্যায় দেখিয়া আসিতেছি, সহস্র সহস্র ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিলেও চিরকাল তোমাকে সেই এক ভাবেই দেখিব, ও অদ্য সেই ভ্রাতৃ-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার এ নীরস প্রশ্নের উত্তর করিব। কিন্তু এক্ষণে নহে।" গিরিবালা দণ্ডায়মান হইলেন এবং আর কোন কথা না কহিয়া সত্বর গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

She was an only child; from infancy
The joy, the pride of an indulgent sire.
Her mother dying of the gift she gave,
That precious gift, what else remained to him?

ROGERS.

গিরিবালা কে? যে লাবণ্যময়ী প্রতিমা হইবার হইবেশে পাঠকের সহিত সাক্ষাৎ করিল—সে কে? এই প্রশ্ন পাঠকের মনে একবারও উত্থিত হইয়া থাকিবে। তদুত্তরে এক্ষণে আমরা ক্ষণকাল প্রবৃত্ত হইলাম।

ভারতভূমি অতি প্রাচীন কাল হইতে সমস্ত সভ্য জগতের আদর্শস্বরূপ অবস্থিতা রহিয়াছে। বোধ হয় এমন কোন দেশ নাই যাহার লিপ্সাবৃত্তি ভারতের ঐশ্বর্য্য রাশি অবলোকন করিয়া এক দিন না উত্তেজিত হইয়াছে, এবং এমন কোন প্রাসাদও নাই যাহা রত্নপ্রসূ ভারতের একটীও রত্নদিয়া পরিশোভিত না হইয়াছে।

আধুনিক সভ্যতাভিমানী ইউরোপীয়েরা যৎকালে পশুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অপক্ক পশুমাংসে বা বন্য কন্দমূল ফল ও বৃক্ষপত্রে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দিগম্বর বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিত এবং আরণ্য লতারসে গাত্রালঙ্কৃত করিয়া সৌবর্ণ ও রাজতালঙ্কারসাধ নিবৃত্তি করিত, তৎকালে ভারতের মুক্তামণ্ডিত বসনরাশি ও খনিগর্ব্ভজাত হীরক-নিকর সাগর-তরঙ্গে বহমান হইয়া আরব, মিসর, গ্রীস, রোমক প্রভৃতি সুসভ্য রাজ্যোপকূলে বিকীর্ণ হইত। এই সমস্ত বহুমূল্য রত্নরাজি অধিকাংশই—কালিকটনগরে একত্রীভূত হইত এবং তৎপরে সে স্থান হইতে নানা দেশে পরিচালিত হইত। এই রূপে বহুদিবসাবধি ভারতমাতা আপনার অলঙ্কার লইয়া সহচরীদিগকে

মনের সাধে সাজাইলেন। এইরূপে বহুদিবস ব্যাপিয়া তাঁহার সহচরী-সন্তানগণ নির্ব্বিবাদে ভারতসন্তানদিগের সহিত সদালাপ ও সুসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু লোলুপ ইউরোপবাসী নাবিকগণের ঈর্ষ্যানয়নে তাহা সহ্য হইল না! ভারতের গৌরবশালী শান্তি সূর্য্যের একমাত্র দুর্জ্জয়, আদি রাহু—ইউরোপ!!

খ্রীষ্ট শকের পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুঃসাহসী পর্টুগিজ নাবিকেরা বিশাল দুস্তর বারিধি-তরঙ্গ বিলোড়ন করিয়া অন্ধকূপনিহিত, মানবজ্ঞানদুর্গম নানা প্রকার নূতন নূতন দেশকে জগতের বিস্মিত নয়ন সমক্ষে ধারণ করিল। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বার্থালম্ দায়েস নামা সুবিখ্যাত পর্টুগিজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণোপকূল দিয়া ভারতাগমনের এক সুগম জলপথ আবিষ্কার করেন। এবং তাহার দ্বাদশ বৎসর পরেই সুনিপুণ ভাস্কোদেগামা কালিকটের পশ্চিমোপকূলে অর্ণবপোত সংলগ্ন করেন। এই সময়ে কালিকট এক হিন্দুরাজা সামরিণের অধিকারভুক্ত ছিল। সামরিণের দুইটী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। প্রথম ভবানীশঙ্কর,—দ্বিতীয় শশিশেখর। ভবানী শঙ্করের অন্তঃকরণ জটিল,—ঘোর কলঙ্কময় দুষ্প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ; শশিশেখরের অন্তঃকরণ সরল, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল গুণনিচয়ে বিভূষিত। ভবানীশঙ্কর, পরের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলে সুযোগ পরিত্যাগ করেন না, শশিশেখর পরের মঙ্গল সাধনের সদুপায় অনুসন্ধান করেন। ধার্ম্মিকবর শশিশেখর অল্পকালের মধ্যেই অধিপতি সামরিণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। রাজা মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাটীতে বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী পারিতোষিক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার এক অতুল সৌন্দর্য্যশালিনী দুহিতা জন্ম গ্রহণ করেন। এতদিন সন্তান না হওয়াতে শশিশেখর সর্ব্বদা ক্ষুণ্ণমনে থাকিতেন, "সন্তানাদি কিছুই হইল না, এ অতুল ধনসম্পত্তি কে উপভোগ করিবে" এই দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় দিবানিশি প্রপীড়িত হইতেন। "কবে সন্তান হইবে, এই সমস্ত অতুল ঐশ্বর্য্য অধিকার করিবে, দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করিব" এই আশায় কত দেব দেবীর পূজা করিলেন; এক্ষণে সেই চির আশার সুসার ফলপ্রাপ্ত হইয়া শশিশেখরের হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইল। অকাতরে রাশি রাশি ধনদান করিতে লাগিলেন। নৃপতিও তদীয় অঙ্গজাজননবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরম প্রহৃষ্ট হইয়া স্বয়ং রঘুনাথপুরে সচিববরের বাটীতে কন্যাদর্শন মানসে আগমন করেন, এবং তাহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যাবলোকন করিয়া তাহাকে "গিরিবালা" নাম প্রদান করেন। দুরাত্মা ভবানীশঙ্করের কালকূট-পূর্ণ হৃদয়ে এ সমস্ত কিছুই সহ্য হইল না। "কিসে শশিশেখরের সর্ব্বনাশ হয়,—কিসে তাহার প্রতি রাজার বিরাগ জন্মে, সে

রাজার চক্ষুঃশূল হয়” এই ভাবনায় দুষ্টের রাত্রিতে নিদ্রা হইত না। দুর্জ্জয় খলের বিষময় চাতুরীর অগম্য কিছুই নাই। এই সময়ে পর্টুগিজেরা কালিকট আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। নৃশংস ভবানীশঙ্কর এই অবসরে নিষ্কলঙ্ক-হৃদয় শশিশেখরের সর্ব্বনাশের সুযোগ পাইল। দুষ্ট একখানি অমূলক কৃত্রিম পত্র প্রস্তুত করিয়া সামরিণকে জানাইল যে, শশিশেখর গোপনে গোপনে পর্টুগিজদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া রাজ্যের রহস্য-নিচয় তাহাদিগকে বলিয়া দিতেছে, সদসদ্ বিচার-বিহীন সামরিণ অগ্রপশ্চাৎ না বিচার করিয়া নিরপরাধে শশিশেখরকে পদচ্যুত করিলেন। একে পদচ্যুতি, তাহাতে আবার বৃদ্ধবয়সে এ ঘোর কলঙ্ক! ধর্ম্মপরায়ণ শশিশেখর অনুমাত্রও ইহাতে বিহ্বল বা বিচলিত হইলেন না। সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতি দোষাদোষ বিচারের ভার অর্পণ করিয়া অবিকৃত চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই বিপদের সময় তাঁহার পরম প্রেমময়ী বণিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যাশয়ানা প্রসূতি স্বীয় জীবনস্বরূপিণী দুহিতাকে কম্পিত হস্তে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বারম্বার চুম্বন করিলেন; অনন্তকালের জন্য হৃদয় পুত্তলীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন—সুকুমারী দুইবৎসরের বালিকা অতি শৈশবাবস্থাতেই মাতৃহীনা হইল। কে আর ক্ষুধা হইলে যত্নকরিয়া খাওয়াইবে, ক্রন্দন করিলে কে আর স্নেহভরে স্তন্যদুগ্ধ পান করাইয়া শান্ত করিবে, দুঃখের সময় কে আর সান্ত্বনা বাক্য প্রদান করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবে, এখনও সংসার সাগর কি, সে চিত্র তাহার মনোমধ্যে অণুমাত্রও অঙ্কিত হয় নাই,—ইহার পর কি হইবে, সে উত্তাল তরঙ্গের উপর কে সযতনে, সতর্কে তাহাকে রক্ষা করিবে এই সমস্ত ভাবনা এককালে তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হওয়ায় তিনি সর্ব্বদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিলেন। দরদর বেগে অশ্রু ধারা বিগলিত হইয়া শয্যা আর্দ্র করিল। তিনি স্বহস্তে শশিশেখরের হস্ত গ্রহণ করিয়া কুমারীকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন “স্বামিন্—হৃদয়নিধি—আমি যাই—আমি চলিলাম—ধরুন্—হৃদয়ের প্রাণ-পুত্তলি গিরিবালাকে—জন্মের মত অভাগিনীর হৃদয় হইতে চিরজীবনের মত ধারণ করুন্। দেখিবেন সাবধান—আমার গিরিবালা—আমার যতনের ধন,—যেন কিছুমাত্র ক্লেশ না পায় এই একমাত্র নিবেদন। মা গিরিবালা আমি যা—আই—আ—আ—মি—চলি ই—ই—লাম।” বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। শশিশেখর দেখিলেন তাঁহার প্রণয়প্রতিমা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন; তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার ধন দুহিতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সেরপুর স্কন্ধাবার।

সেনা গণের প্রতি জেনারল রবার্টস।

১

যোধগণ! হল এক সপ্তাহ অতীত,
আত্ম রক্ষা হেতু আজ তোদের সহিত
ত্যজিয়া কাবুল দূরে
আমি এই সেরপুরে
সত্য বটে করিয়াছি শিবির স্থাপন
সত্য বটে করিয়াছি পশ্চাতে গমন
নীচ পরাভব তাহে ভেব না কখন।

২

নায়ক সেনানী সবে পায় এই শিক্ষা
প্রথমে করিতে শত্রু-বলের পরীক্ষা
শত্রু মহাবলী হলে
ত্যজি সে সমর স্থলে
না করিয়া অপচয় সেনা অকারণ
করিতে উচিত হয় পশ্চাতে গমন।
রণক্ষেত্রে সেনানীর নৈপুণ্য লক্ষণ।

৩

বিংশতি সহস্রাধিক শত্রুদল মাজে
পঞ্চ সহস্রের রণ কখন কি সাজে?
জুলু ক্ষেত্রে সেনা মত
সবে হইতাম হত
কেহ না বাঁচিত দিতে স্বদেশে সংবাদ
হইত কি ভয়ানক জাতীয় বিষাদ!!!
এ যে ধর্ম্মযুদ্ধ যার মূলেতে জেহাদ।

৪

কোরাণের এক অঙ্গ জেহাদ বিশেষ
বিধর্ম্মীর সহ রণ করিতে আদেশ
সমরে বিধর্ম্মী বধি,
যদি কোন মহম্মদী
নিপতিত হয়, তার চির-স্বর্গবাস
যবন জাতির এই ধর্ম্মের বিশ্বাস,—
জেহাদের বীজ মন্ত্র কাফের বিনাশ!

৫

বলিহারী মহম্মদী জাতির মহিমা
সে রাজনৈতিক ধর্ম্মে অপূর্ব্ব গরিমা!
ধন্য মহম্মদ তুমি
সমগ্র ইস্লামী ভূমি
কোন্ কালে লয় প্রাপ্ত হত ধরাধামে
কিছু না রহিত তার শেষ পরিণামে
যদি না সৃজিতে মন্ত্র জেহাদের নামে।

৬

কাহার লাগিয়া বল আফ্গান গণ
সমান উৎসাহে সবে করিতেছে রণ?
ত্যজি সিংহাসন আজি,
কিরীট ভূষণ ত্যজি,
আমীর তাপস বেশে করেছে গমন,
য়ীয়াকুব বন্দীভাবে ভারতে এখন,
তবে এ তুমুল রণ কিসের কারণ?

৭

কি বৃদ্ধ বালক যুবা পামর-শিক্ষিত,
আজি সে জেহাদি মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
তরবারী লয়ে কক্ষে,
লইয়া বন্দুক বক্ষে,
সকলে করিবে রক্ষা, করিয়াছে পণ,
মাতৃভূমি আর সেই স্বাধীনতা ধন।
ভাব দেখি সেই রণ ভীষণ কেমন!!

৮

হীন বল বলি তাই সেরপুরে আসি,
জেনারল গফ্ লাগি রহিয়াছি বসি।
কাঁপাইয়া শৈল গুহ
সেই সেনানীর ব্যূহ
আসিতেছে দেখ ওই, মিসি ছুই বলে
আক্রমিব এই দণ্ডে বিপক্ষের দলে।
জয় পরাজয় কিন্তু কার সাধ্য বলে?

৯

রে ব্রীটিস্ সেনাগণ! ভাব দেখি মনে
তোমাদের এই হিন্দু যোধ ভ্রাতা গণে,
সমর সজ্জায় সাজি
কিরূপ উৎসাহে আজি
হইয়াছে সকলেই সমর উৎসুক!
লইয়া সঙ্গিন কক্ষে বক্ষেতে বন্দুক
করিবারে সমুজ্জ্বল ব্রীটেনের মুখ।

১০

বিদেশী বিধর্ম্মী আর বিজিত হইয়া
হিন্দু সেনাদল যদি ব্রীটেন লাগিয়া
পার্থিব প্রেমের পাত্র
পিতা মাতা দারা পুত্র
জীবনের মায়া আদি ত্যজিল সবাই,
তোমাদের স্বার্থ ত্যাগ কত গুণ চাই,
প্রকাশিতে হেন ভাবে মর ভাষা নাই॥

১১

সত্য কি হিন্দুরা মুষ্টিমেয় অন্ন লাগি
এসেছে কাবুলে আজি হয়ে সর্ব্বত্যাগী?
স্মরিলে এ পাপ কথা
হৃদে উপজয় ব্যথা
ঘৃণায় লজ্জায় হয় দেহ রোমাঞ্চিত!
নহে কি রে বীর-মৃত্যু এদের ঈপ্সিত?
এ যে সেই আর্য্যবহ্নি ভস্মে আচ্ছাদিত!!

১২

কার না হৃদয় হয় আনন্দে মগন,
ইহাদের রাজভক্তি করিলে স্মরণ?
নাভা পাতিয়ালা সবে
আফ্গান মহাহবে
যাহার যেমন শক্তি আপন আপন
ক্ষুদ্র সেনাদলে রণে করেছে প্রেরণ;
নহে কি এ কাজ রাজভক্তির কারণ?

১৩

তথাপি রে যোধগণ! তোরা বিনা আর
মাতৃ-ভূমি ব্রীটেনের চির-অহঙ্কার
তোরা বিনা কোন্ জাতি
ব্রীটিস্ গৌরব-ভাতি,
নশ্বর জগতে বল কে আর রক্ষিবে?
তোরা বিনা কে তোদের নিয়োগ সাধিবে?
ক্যাভেগ্নারীর মৃত্যু এখনি ভুলিবে।

১৪

ক্যাভেগ্নারীর মৃত্যু স্মর একবার
স্মর দেখি সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার!
হীনবল পেয়ে তায়
নির্ম্মম দস্যুর ন্যায়
কপট পামর শঠ এ আফ্গানগণ
কিরূপে সে বীরকুলে করিল নিধন;
শুষ্ক হয় নাই তার শোণিত এখন!

১৫

অয়ি হিন্দু যোদ্ধ দল! তোমাদের কাছে
আমার ব্রীটন ভূমি চির ঋণী আছে।

দেখরে জগৎবাসী!
রণকীর্ত্তি-অভিলাষী,
আছে কি না আর্য্যজাতি দেখ একবার,
আছে কি না আর্য্য-বীর্য্য, আর্য্য-অহঙ্কার,
এই যে "কুইন্স ওন্" গোর্‌খা আমার।

১৬

এই যে "কুইন্স ওন্" গোর্‌খা আমার
যাহাদের বাহুবল জগতে প্রচার!
কি আর কহিব আমি,
বীরপ্রসূ বীর ভূমি,
স্বাধীন নেপাল স্বতঃ বলে বলীয়ান্
পশ্চিমে কাশ্মীর রাজ্য পূর্ব্বেতে ভোটান,
মধ্য হিমাচল যাহাদের বাস স্থান।

১৭

সমগ্র ভারতে সাত শতাব্দ ব্যাপিয়া
দুর্দ্দম যবন-স্রোত বেগে প্রবাহিয়া
প্লাবিল ভারত-রাজ্য
বিনাশিল আর্য্য-কার্য্য
ধরাধামে আর্য্য-নাম হইল বিলীন—
স্বাধীন নেপালে হয় নাই কোন দিন,
অপবিত্র যবনের পতাকা উড্ডীন্॥

১৮

সে দিনের কথা হায় বিদ্রোহ-অনলে
পতিত অযোধ্যা যবে শত্রু-করতলে
এক রণ-অনুরাগে
সঙ্গিনের অগ্রভাগে
শ্রীনাথ ভৈরব পশুপতি দল আদি,
কি হইত ব্রীটেনের, এই গোর্‌খা যদি
নাহি দিত অযোধ্যার দ্রোহিদলে বধি?।

১৯

ব্রীটেন-ভরসা গোর্‌খা যোধদল অয়ি,
কাবুল সমরে তোরা প্রথম বিজয়ী!
দুর্দ্দম পাঠান ভূমে
নিজ ভুজ-পরাক্রমে
পদানত করেছিলে; আর এক বার
দেখাও হিন্দুর বীর্য্য, হিন্দু অহঙ্কার
উদ্ধারি কাবুলে পুনঃ, মিনতি আমার।

২০

দেখাও সে বাহুবল, রুশিয়া দানবী
দেখুক ব্রীটেন্ নয় সামান্যা মানবী,
দেখুক আশিয়া খণ্ড
ব্রীটেনের মেরুদণ্ড;
হিন্দু জাতি, হয় নাই বিলয় আজিও!
আর এক কথা এই ধ্রুব মানি লও,
অয়ি রে সৈনিকগণ যে হও সে হও!

২১

মহম্মদ জানে আজ যে যোদ্ধা জিনিবে,
দুর্দ্ধর্ষ যবনে যেই জীবন্ত আনিবে,
তারে প্রেম-অনুরাগে,
লিটনের বাম ভাগে
বসাইব, লভিবে সে সুবর্ণ-পদক
যাহে রবে আঁকা এই অক্ষর-স্তবক
কাবুল-সমরক্ষেত্রে-বিজয়ী যুবক!

২২

দেখিতেছ কাবুলের পতাকা-লালিমা
উড়িতেছে প্রচারিয়া যবন-গরিমা?
পসিয়া বিপক্ষ-দলে,
আপনার বাহু-বলে

যে যোদ্ধা ধরিবে ওই শক্রর নিশান,
দোলাইয়া বীর গর্ব্বে শাণিত কৃপাণ,
অনুগামী সেনাদলে করিবে আহ্বান,

২৩

নিশ্চয় এ হেন যোধে দিব পুরস্কার;
পার্থিব বাসনা-ভূমি বাজ্ঞী রেজিনার
স্ুবর্ণ প্রশংসা-পত্রে,
লেখা রবে ছত্রে ছত্রে,
হীরক অক্ষরে, বীর-রস-উদ্দীপক,
সেই গীত, যাহে মুগ্ধ হইবে ভূলোক,
কাবুল-সমরক্ষেত্র-বিজয়ী যুবক।

২৪

সেই যোধ লভিবারে সুযশ অক্ষয়
রণ কীর্ত্তি, আহা যাহা বিনশ্বর নয়!
কাবুলের দুর্গোপরে
সর্ব্ব অগ্রে বাম করে
উড়াইবে ব্রীটেনের পতাকা মহান্
সস্নেহে করিয়া তারে আলিঙ্গন দান
পরে দিব ব্রীটেনের জাতীয় সম্মান।

২৫

সকলের আগে যেই বৈর ব্যূহ ভেদি
আগে আফগান তোপ-রক্ষিদলে ছেদি
কক্ষোপরি ভীম কোপে
উঠাইবে শক্র-তোপে
পাইবে সে অসি, যার আমুষ্টি ফলক,
অঙ্কিত হইবে গীতে বীর-রসাত্মক
কাবুল-সমরক্ষেত্র-বিজয়ী যুবক।

২৬

অকস্মাৎ পূর্ব্ব তুঙ্গ শৈলের উপরি
জ্বলিল ভীষণ বহ্নি ধক্ ধক্ করি!
বিপক্ষ কর্ত্তৃক আহা!!
সমর ইঙ্গিত তাহা
অমনি ব্রীটিস্ তোপ উদ্গারি অগনি
চক্ষের নিমিষে তোপ ছাড়ি ভীম ধ্বনি
আহ্বানিল রণ-শক্র কাঁপায়ে মেদিনী।

২৭

অমনি উঠিল শক্র জলধি-কল্লোলে
'আল্লাহো আক্‌বর'ধ্বনি, পবন হিল্লোলে
পশিল গগণ-গর্ভে
চতুর্গুণ বীর-গর্ব্বে
শক্রর দ্বাদশ তোপ অমনি নাদিল
যুগপৎ ব্রীটেনের তোপে উত্তরিল,
প্রত্যেক সৈনিক হৃদি নাচিয়া উঠিল!

দারজিলিং
৩ মার্চ্চ
ইং ১৮৮০ } শ্রীশ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যোগ।

সংসার-সাগরাত্তর্ত্তুং যদীচ্ছেদ্যোগি পুঙ্গবঃ।
সুগুপ্তেনির্জ্জনে দেশে বদ্ধমেনং সমভ্যসেৎ॥

সংসার-সাগর হইতে যদি কেহ উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন তবে অতি যত্ন সহকারে অতি সুগুপ্ত নির্জন স্থানে এই মূলবদ্ধ যোগ যেন অভ্যাস করেন। এযোগ

অভ্যস্ত হইলে যোনিমুদ্রা যোগীর অত্যন্ত আয়ত্ত হয়। যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হইলে সকল মুদ্রা সিদ্ধ হয়।

মূলবন্ধের ক্রম।

পাদমূলেন সংপীড্য গুদমার্গং সুযন্ত্রিতং।
বলাদপানমাকৃষ্য ক্রমাদূর্দ্ধং সমভ্যসেৎ।
কল্পিতোঽয়ং মূলবন্ধো জরামরণনাশনং॥

যোগী ব্যক্তি স্বীয় পাদমূল দ্বারা গুহ্য দ্বারকে সংপীড়ন করত আবদ্ধ অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিবে ইহাতে জরা মরণ নিবারণ হয়। সর্ব্বত্র কুম্ভকের আবশ্যক। ইহারি নাম মূলবন্ধ। সকল কর্ম্মের মূলবন্ধ করিতে হয় বলিয়া যোগ-ক্রিয়ারও মূলবন্ধন তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মূলবন্ধ ব্যতীত তাবৎকার্য্যই অচিরস্থায়ী হয়।

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং প্রকরোত্যধিকল্পিতং
বন্ধেনানেন সুতরাং যোনিমুদ্রা প্রসিধ্যতি॥

যিনি কুম্ভক দ্বারা অপান ও প্রাণ বায়ুকে প্রকৃতরূপে ঐক্য করিতে পারেন তিনি এই মুদ্রা দ্বারা যোনিমুদ্রায় সিদ্ধ হন। উক্ত বায়ুদ্বয়কে ঐক্য করিতে হইলে মূলবন্ধ মুদ্রার আবশ্যক, মূলবন্ধ ব্যতীত প্রাণাপানের ঐক্য হইতে পারে না। ইতি মূলবন্ধ।

অতঃপর বিপরীত করণমুদ্রা। ইহার ক্রম সহজ।

ভূতলে স্বশিরো দত্বা খেলয়েচ্চরণদ্বয়ং।
বিপরীতকৃতিশ্চৈষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতং॥

কুম্ভক করিয়া ভূতলে আপন মস্তক রাখিয়া ঊর্দ্ধে চরণদ্বয়কে অবক্রভাবে রাখিবে, পরে ঐ চরণদ্বয় চতুর্দ্দিকে খেলাইবে। অর্থাৎ পাদদ্বয়কে চারিদিকে ঘুরাইবে। এই মুদ্রা সর্ব্বত্র গোপনীয় এই মুদ্রার ফল অসামান্য। যথা

এতদযঃকুরুতেনিত্যং অভ্যাসং যামমাত্রকং
মৃত্যুং জয়তি স যোগী প্রলয়ে নাবসীদতি॥

এই বিপরীত করণ মুদ্রা প্রভাবে মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়। প্রত্যহ এক প্রহর কাল কুম্ভক করিয়া এ যোগ অভ্যাস করিতে পারিলে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া মহা প্রলয়াবসান পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। মহা প্রলয়াদিতে সকলের যেমন অবসাদ প্রাপ্তি হয়, এযোগ-সাধকের তাহা হয় না।

বিপরীত করণ মুদ্রার অপর ফল এই; এই মুদ্রা বন্ধন করিয়া যে যোগী স্বীয় শরীরস্থ অমৃতধারা পান করিতে পারেন তিনি যাবতীয় সিদ্ধগণের সমতা লাভ করেন এবং সর্ব্বলোকীয় সিদ্ধি তাঁহার করতলস্থ হয়। প্রমাণ।

কুরুতেঽমৃতপানংযঃ সিদ্ধানাং সমতামিয়াৎ।
সসিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ॥
ইতি বিপরীত-করণমুদ্রা-ফলং।

অতঃপর উড্ডীন বন্ধমুদ্রার বিষয় বলা যাইতেছে।

নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।
উড্ডীনবন্ধএষঃস্যাৎসর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ।
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ।
উড্ডীনাখ্যোঽয়ংবন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥

নাভির ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে ও পশ্চিম

অর্থাৎ পশ্চাদ্দ্বারকে সমভাবে কুঞ্চিত করিবে। অর্থাৎ নাভির নিম্নস্থ নাড্যাদিকে কুম্ভক দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধভাগে উত্তোলন করিবে। এই উড্ডীনবন্ধ সমস্ত ক্লেশ-নাশক। উদরের অধোভাগে স্থিত যে সকল চক্রস্থ বিষয় আছে সে গুলিকে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে নাভির ঊর্দ্ধদেশে উত্তোলন করাকে উড্ডীনবন্ধ বলে। এই যোগ-প্রভাবে মৃত্যু পলায়ন করে।

নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনেং।
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃস্যাদ্যেন শুদ্ধোভবেন্মরুৎ॥
ষন্মাসমভ্যসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং।
তস্যোদরাগ্নির্জ্জ্বলতি রসবৃদ্ধিস্তু জায়তে॥
অনেন সুতরাং সিদ্ধির্ব্বিগ্রহস্য প্রজায়তে।
রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনোভবতি ধ্রুবং॥

যে যোগী কুম্ভক করিয়া প্রত্যহ চারি-বার করিয়া এই যোগ অভ্যাস করেন তাঁহার নাভিদেশ পরিষ্কার হওত নিশ্চয় বায়ু পরিষ্কার হয়। এইরূপে ছয়মাস-কাল অভ্যাস করিলে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হওয়ায় মৃত্যু পলায়ন করে। এবং যাহা যাহা খাওয়া যায় তৎসমুদায় সুন্দররূপে পরিপাক হওয়ায় শরীরে রস বৃদ্ধি হওত হৃষ্ট পুষ্টও হওয়া যায়। সুতরাং ইহাতে সমস্ত দেহের সিদ্ধিলাভ হয়। অর্থাৎ শরীরে কোন আধিব্যাধি ও অলসতা থাকে না। প্রত্যুতঃ শরীর স্ববশে থাকে। যেমন বৈদ্যশাস্ত্রে অনুপান দ্বারা ঔষধের বীর্য্য অধিক হয়, তদ্রূপ যোগ সাধনা পক্ষে যোগাঙ্গ সাধনা না করিলে যোগের কোন ফল দর্শে না। মুদ্রা সমুদায় যোগাঙ্গ। মুদ্রাসাধন করিতে পারিলে যোগসাধনা সহজ ও সিদ্ধ হয়।

বৈদ্যশাস্ত্রে যেমন রোগের চিকিৎসা বিহিত থাকায়, বৈদ্যেরা দৈহিক জ্বরাদি তদ্দ্বারা প্রতিকার করিয়া থাকেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাধি যেমন তেমনি থাকে, তাহার প্রতিকার করিতে পারেন না; তেমনি যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করিলে আধ্যাত্মিক রোগ বিদূরিত ও তৎসমভিব্যাহারে দৈহিক রোগও ক্ষয় হয়। ইহা অঙ্কশাস্ত্রের ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ-ফলদায়ক।

পূর্ব্বে দশটি মুদ্রা-বন্ধনের বিষয় লেখা যাইতেছে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়া-ছিল তন্মধ্যে মহামুদ্রা প্রভৃতি ৯ নয়টী মুদ্রা লেখা গেল, কেবল বজ্রোণী বন্ধন মুদ্রা লেখা গেল না। বজ্রোণীমুদ্রার ক্রম গুলি অতি গুহ্য ও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ হেতু এ প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। যে সকল মুদ্রাবন্ধনের বিষয় লেখা গেল ইহারা স্ব স্ব প্রধান। প্রত্যেকেরই ফল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। যোগীরা উহার যে কোনটির সাধনা করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। শেষমুদ্রার নাম শক্তিচালন মুদ্রা। এই-স্থলে সেই মুদ্রা বন্ধনের বিষয় লেখা যাইতেছে। যথা—

শক্তিচালন মুদ্রা।

আধার-কমলে সুপ্তা চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াং।
অপানবায়ুমারুহ্য বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্॥

শক্তি চালন মুদ্রেয়ং সর্ব্ব শক্তি প্রদায়িনী॥

মূলাধার পদ্মে প্রসুপ্তা ভুজগাকারা কুণ্ডলিনীকে জ্ঞানবান্ যোগী কুম্ভক করিয়া অপানবায়ুতে আরোহণ করাইয়া বলপূর্ব্বক চালনা করাইবে। অর্থাৎ ষটচক্র ভেদ করিবে। ইহার নাম শক্তিচালন মুদ্রা।

কুম্ভকাবস্থায় যোগীর উদরস্থ পঞ্চবায়ু একত্র মিলিত হয়। তখন সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে যোগী যে বায়ুকে পূরণ করেন তাহার নাম অপান-বায়ু। সেই বায়ুদ্বারা ঐ নাড়ীর মধ্য দিয়া কুণ্ডলিনীকে চেতন করাইয়া মূলাধার হইতে উর্দ্ধে উর্দ্ধে উঠাইয়া সহস্রারে লইয়া যাইতে পারিলে শক্তি চালন করা হয়। ইহারি নাম শক্তিচালন মুদ্রা। সাধকমাত্রেরই এই মুদ্রাবন্ধন করা কর্ত্তব্য। এই মুদ্রার ফলবিশেষ লেখা যাইতেছে। ইহা অতিশয় গুপ্ত। যথা—

শক্তিচালনমেনংহি প্রত্যহং যঃ
সমাচরেৎ।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনং॥
বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয়মূর্দ্ধেভবেৎ খলু।
তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা
সিদ্ধিমিচ্ছতা॥
যঃ করোতি সদাভ্যাসং শক্তিচালন-
মুত্তমং।
যেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাদনিমাদিগুণপ্রদা॥
গুরূপদেশ-বিধিনা তস্য মৃত্যুভয়ং কুতঃ।
মুহূর্ত্তদ্বয়পর্য্যন্তং বিধিনা শক্তিচালনং।
যঃ করোতি প্রযত্নেন তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ।
যুক্তাসনে নকর্ত্তব্যং যোগিভিঃ
শক্তিচালনং॥
এতত্তু মুদ্রাদশকং নভূতং ন ভবিষ্যতি।
একৈকাভ্যাসনে সিদ্ধিঃ সিদ্ধোভবতি
নান্যথা॥

এই শক্তিচালন মুদ্রার দ্বারা কুণ্ডলিনী নিজেই নিদ্রা হইতে উর্দ্ধে অর্থাৎ সহস্রারে উঠিতে থাকেন এবং প্রত্যহ এই মুদ্রাবন্ধন প্রভাবে যোগীর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অধিকন্তু তাবত রোগ বিনষ্ট হয়। এজন্য এ যোগ সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে। এই উত্তম যোগ যে ব্যক্তি অভ্যাস করেন তিনি অণিমাদিগুণ-সম্পন্না বিগ্রহসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। এই যোগ যিনি গুরুর নিকটে উপদিষ্ট হইয়া অভ্যাস করেন তাঁহার কোন প্রকার মৃত্যু-ভয় থাকে না। আর যিনি দুই মুহূর্ত্তকাল একাসনে বসিয়া এ যোগ সাধনা করিবেন তাঁহার এই যোগ-সিদ্ধি অতি নিকটে উপস্থিত হয়। নিরাসনে উপবিষ্ট কি দণ্ডায়মান হইয়া কোন যোগাভ্যাস করিবে না। কেবল বিপরীত-করণ ও বজ্রোণি বন্ধন মুদ্রাসাধনে কোন আসনের নিয়ম নাই। ইতি শক্তি-চালন-মুদ্রা।

ইতি শিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে
মুদ্রাদশকং।

ভোগ-বিঘ্ন।

অতঃপর যোগসাধনায় ভোগবিঘ্ন কি তাহা বলা যাইতেছে।

নারীশয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্য বিড়ম্বনং।

তাম্বূল ভক্ষণং যানং রাজ্যৈশ্বর্য্য-
বিভূতয়ঃ।
হেমং রৌপ্যং তথাতাম্রং রত্নঞ্চাগুরুধেনবঃ।
পাণ্ডিত্যং বেদশাস্ত্রাণি নৃত্যং গীতং
বিভূষণং।
বংশী বীণা মৃদঙ্গাশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ববাহনং।
দারাপত্যানি বিষয়া বিঘ্না এতে
প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ভোগরূপা ইমে বিঘ্না ধর্ম্মরূপানিমান্
শৃণু॥

স্ত্রী-সহবাস, বিচিত্র শয্যা, অপূর্ব্ব বস্ত্র পরিধান, নানা বিধ ধন সম্পত্তি, তাম্বূলাদি ভক্ষণ, (অর্থাৎ তাম্বূল ও আসব দ্রব্য সকল) রথ শকট ও শিবিকাদিতে আরোহণ পূর্ব্বক গমনাগমন, রাজ্যৈশ্বর্য্য ইহারা—প্রত্যেকে মুক্তিপথের দস্যু। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র হীরক প্রবালাদি দ্রব্য সকল, অগুরু প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য, গোধনাদি সম্পত্তি, বেদ শাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ, নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি শ্রবণ, দর্শন, নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ, বীণাদি বাদ্যযন্ত্র বাদন, ও তচ্ছ্রবণাদিতে অনুরাগ, হস্ত্যশ্বাদি বাহনে আরোহণ, স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারে অত্যাসক্তি ইত্যাদি বিষয় সকল যোগ-বিঘাতক। অপর ধর্ম্ম-রূপ বিঘ্নগুলি বলা যাইতেছে।

ধর্ম্ম বিঘ্ন।

স্নানং পূজাতিথিহোমং তথা মোক্ষময়ী
স্থিতিঃ।
ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥
ধ্যেয়ধ্যানং তথা মন্ত্রদানংখ্যাতির্দ্দিশাসুচ।
বাপীকূপতড়াগাদিপ্রসাদারামকল্পনা॥
যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রংতীর্থানি বিষয়াণিচ।
দৃশ্যন্তেচ ইমা বিঘ্না ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ॥

স্নান পূজা অতিথি করা ও হওয়া, এবং হোম ব্রত নিয়ম উপবাস করা, মৌন হইয়া থাকা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা সাকার ধেয় বিষয়ের ধ্যান, মন্ত্রদান, সর্ব্বত্র যশঃ-কীর্ত্তিপ্রকাশ পুষ্করিণী ও দীঘি ও কূপ প্রতিষ্ঠা ও উদ্যানাদি নির্ম্মাণ করতঃ তাহা ভোগকরা, দেব-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সাকার দেবতা প্রতিষ্ঠা করা, অট্টালিকা ও উপবন নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা ভোগকরা, অশ্বমেধাদি কোন যজ্ঞকরণ, পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করণ, তীর্থ পর্য্যটন, বিষয়কর্ম্মের রক্ষণা-বেক্ষণ, এই সকল যোগীদিগের ধর্ম্মরূপে মহাবিঘ্ন কথিত হইয়াছে। ইহা তন্ত্রোক্ত নিষেধ। শিবসংহিতা দেখ।

জ্ঞান বিঘ্ন।

পিণ্ডস্থং রূপসংস্থঞ্চ রূপস্থং রূপবর্জ্জিতং।
ব্রহ্মৈতস্মিন্মতাবস্থা হৃদয়ঞ্চ প্রশাম্যতি।
ইত্যেতে কথিতা বিঘ্না জ্ঞানরূপেব্যবস্থিতা॥

পিণ্ডস্থ অর্থাৎ দেহস্থ রূপসংস্কার আর রূপসত্ত্বে রূপ পরিত্যাগ ও জগতীয় তাবত পদার্থ ব্রহ্ম এই মতাবলম্বী হওয়া আর মনকে অযথা প্রশমন করা ইত্যাদি বিঘ্ন সকল যোগীদিগের পরিহার্য্য।

গোমুখোদ্ধাসনং কৃত্বা ধৌতী প্রক্ষালনং
বসেৎ।

নাড়ী-সঞ্চার-বিজ্ঞানং প্রত্যাহারবিবোধনং।
কুক্ষিসঞ্চালনং ক্ষিপ্রং প্রবেশ ইন্দ্রিয়াধ্বনা।
নাড়ী কর্ম্মাণি কল্যাণি ভোজনং শ্রূয়তাং মম॥
নবং ধাতুরসং ছিন্ধি শুণ্ঠীকাস্তাড়য়েৎ পুনঃ।
এককালং সমাধিঃ স্যাল্লিঙ্গভূতমিদং শৃণু॥

অধুনা জ্ঞান-বিঘ্ন সকল বলা যাইতেছে। জপাবরক গোমুখের বিসর্জ্জন করিয়া ধৌতী যোগে অন্তঃ প্রক্ষালনার্থ উপবিষ্ট হওয়া, নাড়ী সকলের সঞ্চরণ কি প্রকারে হয় তদনুসন্ধান করণ, নানা শাস্ত্র বিচার ও প্রত্যাহারোপায় ও চৈতন্যের উদ্দীপনার্থ কুণ্ডলিনী বোধন চেষ্টা করণ, এবং উদরসঞ্চালন ও শীঘ্র ইন্দ্রিয়-পথে প্রবিষ্ট হইবার উপায় ও নাড়ী শুদ্ধির কারণ পথ্যাপথ্য বিচার করণকে—যোগশাস্ত্রে জ্ঞান-বিঘ্ন বলা হইয়াছে। যখন আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে তখন জপাবরক গোমুখের বিসর্জ্জনকরতঃ ধৌতীযোগে অন্তঃপ্রক্ষালনার্থ উপবিষ্ট হইতে হইবে না, এবং এইরূপ অপরাপর কার্য্য কিছুই করিতে হইবে না।

তদনাথায় ঐ সকল অসিদ্ধাবস্থায় সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। যেমন বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হইলে পুষ্প থাকে না, ফলের পূর্ব্বে মুকুল হয়, সেই মুকুল হইতে পুষ্প হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে যোগাঙ্গসকল যোগীদিগের সাধনীয়। ঐরূপ দৃঢ় জ্ঞান জন্মান যোগসাধনার চরম ফল। যতক্ষণ যোগ সিদ্ধ না হইবে ততকাল নূতন বস্তুর রস ভক্ষণ ও শুণ্ঠীচূর্ণ ভোজন ও গব্য ঘৃত ও মধুপান করিবে যোগসিদ্ধ হইলে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে ওরূপ আহার ও বিহারের প্রয়োজন থাকিবে না। তখন "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥" অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত পথে যে বিচরণ করে তাহার বিধিইবা কি নিষেধইবা কি। যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—তিনি ত্রিগুণাতীত পথের পথিক, তাঁহার নিকট শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ কিছুই নাই।

যোগ-চতুষ্টয়।

যথা। মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগ স্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃস্যাৎ সদ্বিধাভাববর্জ্জিতঃ॥

যে যোগে গুরুমন্ত্র ও সাধকের ঐক্য হয় তাহাকে মন্ত্রযোগ বলা যায়। এ যোগের ফল এই যে দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া সাধ্য সাধক আর গুরুকে সেই দেবতারূপ জ্ঞানদ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়; তাহাকে মন্ত্রযোগ বলা যায়। মন্ত্রযোগ সিদ্ধ হইলে তত্তদ্দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। মন্ত্রযোগ-সিদ্ধ ব্যক্তির চরমে সারূপ্য গতি প্রাপ্ত হওয়া বৈ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয় না। উহা একরূপ স্বর্গভোগ হয় মাত্র। ভোগান্তে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আগমন করিতে হয়। ইহা হইতে লয়যোগ শ্রেষ্ঠ। লয়যোগের ফল

এই যে, যেব্যক্তি নিরঞ্জন পরমাত্মার চিন্তা করত দেহক্ষয় করেন তিনি পরমাত্মায় বিলীন হন। এজন্য যোগীরা সাকার চিন্তা করত দেহক্ষয় করেন না। তবে ষঠচক্র চিন্তাকালে কুণ্ডলিনীকে যে সাকাররূপে চিন্তা করিতে কহা হইয়াছে সে কেবল যোগের প্রথমাবস্থায় মনঃস্থিরের কারণ। যোগ শাস্ত্রে প্রতীকোপাসনাকে লয়যোগ বলে। এইক্ষণ সেই প্রতীকোপাসনা যে প্রকার তাহা বলা যাইতেছে।

শিব সংহিতা।

প্রতীকোপাসনা কার্য্যা দৃষ্টা দৃষ্টফলপ্রদা।
পুনাতি দর্শনাদত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

যিনি লয়যোগে সিদ্ধ হইতে বাসনা করেন, তিনি যেন প্রথমে পবনাভ্যাসে কৃতকার্য্য হইয়া প্রতীকোপাসনায় প্রবৃত্ত হন। ইহাতে কার্য্যাকার্য্যের বিচার নাই। এ উপাসনায় দৃষ্টাদৃষ্ট উভয়-প্রকার ফল লাভ হয়। প্রতীক দর্শন হইবা মাত্র দর্শক পবিত্র হয়। প্রতীক দর্শনের অর্থ প্রতিবিম্ব দর্শন। সূর্য্যমণ্ডলে পরমাত্মার ছায়ার ন্যায় সন্দর্শন হওয়াকে প্রতিবিম্ব দর্শন বলে। বহু পরিশ্রমে উহা ঘটিতে পারে। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে।

গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমৈশ্বরং নিরীক্ষ্য নিষ্কলিতলোচনদ্বয়ং। যদানভঃ পশ্যতি স্বপ্রতীকঃ নভোঙ্গনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি।

প্রতীক-দর্শনাভিলাষী যোগী অগ্রে প্রাণায়াম সাধনা করিয়া নিষ্পাপ হইলে পর আর পঞ্চাগ্নি সেবায় দেহ ও দেহস্থ অন্তরিন্দ্রিয় পবিত্র হইলে উত্তরায়ণকালে দিবাভাগের মধ্যাহ্ন সময়ে বিহিত পদ্মাসনাদি করিয়া কুম্ভক করত প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিয়া শনৈঃ শনৈঃ সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টি করিতে করিতে ৬ মাস মধ্যে প্রতীক দর্শনের ক্ষমতা জন্মিলে চক্ষুর অব্যাঘাতে সূর্য্যমণ্ডলে ঐশ্বর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবেন। যখন ঐশ্বর প্রতিবিম্ব দর্শনের ক্ষমতা হইবে, তখন গগনমণ্ডলে আত্মপ্রতিবিম্বও দেখিতে পাইবেন স্বচ্ছ দর্পণাদিতে যেরূপ বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া প্রকৃতিসিদ্ধ, তদ্রূপ যোগারূঢ় হইয়া আকাশস্থ আদিত্য-মধ্যে আত্ম ও পরমাত্মার প্রতিকৃতি সন্দর্শন করা যায়। ইহার ফল-শ্রুতি ঃ—

প্রত্যহং পশ্যতে যো বৈ স্বপ্রতীকং নভোঙ্গনে।
আয়ুর্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য ন মৃত্যুঃস্যাৎ কদাচন॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ একবার করিয়া নিজ প্রতিবিম্ব সূর্য্য-সন্নিহিত আকাশতলে দেখিতে পান, তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারেন।

যদ্বাপশ্যতি সম্পূর্ণং স্বপ্রতীকং নভোঙ্গনে।
তদাজয়মবাপ্নোতি বায়ুং নির্জ্জিত্য সঞ্চরেৎ॥
যঃ করোতি সদাভ্যাসং চাত্মানং বিন্দতে পরং।
পূর্ণানন্দৈকঃ পুরুষঃ স্বপ্রতীকঃ প্রসাদতঃ॥
যাত্রাকালে বিবাহে চ শুভে কর্ম্মণি সঙ্কটে।
পাপক্ষয়ে পুণ্যবৃদ্ধৌ প্রতীকোপাসনঞ্চরেৎ॥

সাধক যখন আকাশমণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে

আত্মার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবেন তখন সর্ব্বপ্রকার বায়ুর উপর জয়লাভ করিয়া সর্ব্বস্থানে সঞ্চরণ করিতে পারেন। অপর যিনি সর্ব্বদা এই যোগাভ্যাস করেন তিনি জ্ঞানগম্য পরাৎপর পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। সেই পরমাত্মা স্বপ্রতীকরূপে দর্শনপথের পথিক হয়। এরূপ দর্শন লাভ কেবল স্বপ্রতীকের প্রসাদেই হয়।

যাত্রাকালে বিবাহে, মঙ্গল কর্ম্ম করণে, বিপদে, পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করণ কালে, এবং পুণ্য বৃদ্ধ্যর্থে প্রতীকোপাসনা করিবে। তন্ত্রভিন্ন শ্রুতিতেও প্রতী-কোপাসনার প্রশংসা করিয়াছেন। যথাঃ— "অগ্নিণী সূর্য্যমণ্ডলে হৃদ্দহরে আত্মা উপাস্য" ইতি। চক্ষুতে সূর্য্যমণ্ডলে ও হৃদয়ে আত্মাকে উপাসনা করিবে। যে হেতু চক্ষে, সূর্য্যমণ্ডলে ও হৃদয়াকাশে পবিত্র হেতু আত্মাকে চেষ্টা করিলে সামান্য চক্ষুতেও দেখা যায়। এসকল স্থানে যদিচ আত্মার প্রতিবিম্ব বৈ স্বরূপ দেখা যায় না তথাপি ঐ প্রতিবিম্ব স্বরূপের সদৃশ কার্য্য-কারক। প্রাচীন আর্য্যশ্রেষ্ঠ মুনিবা আত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইতেন। প্রতিবিম্ব-দর্শন যোগসাপেক্ষ, বিনাযোগে এরূপ দর্শন হইতে পারে না।

অপরঞ্চ।

নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাদন্তরে পশ্যতি ধ্রুবং।
অতো মুক্তিমবাপ্নোতি যোগীনিয়তমানসঃ॥

যিনি নিরন্তর প্রতীকোপাসনা যোগ সাধনা করেন তিনি নিশ্চয় স্ব-প্রতীক দর্শন করত নিয়ত মানস-যোগী মুক্তি লাভ করেন। এরূপ যোগীকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। আর প্রতীক-দর্শক যোগীর দেহ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে পারে, মৃত্যুও তাঁহার ইচ্ছার বশীভূত হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া বাহ্য জগতে ক্রীড়া করিতে ও ঐ দেহ ক্ষণমাত্রে পরিত্যাগ করিতে পারেন। যোগিগণ যোগসিদ্ধ হইলে সর্প-নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত-বৎ দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। যোগিরা জানেন ভৌতিক ভোগ দেহ সূক্ষ্ম দেহের মূল স্বরূপ। তজ্জন্য ভোগ-দেহে স্নেহশূন্য হইয়া পরমাত্মায় ক্রীড়া করেন। যথা।

নির্ম্মোকস্তেব সর্পস্তু যোগৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ।
বিহায় দেহং যোগেশঃ যযৌ ব্রহ্মে সনাতনে॥

ইহাকে যোগশাস্ত্রে লয় যোগ কহে।

অতঃপর রাজ-যোগের বিষয় লেখা যাইতেছে। এই রাজযোগ-প্রভাবে সিদ্ধ যোগিগণ সম্যক্ রূপে সত্ত্ব, রজ-স্তমো গুণ-বর্জ্জিত হইয়া নিস্ত্রৈগুণ্য পথে অবস্থিত হইয়া আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মকে হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা জ্ঞানগম্য করিতে পারেন।

যোগক্রম।

অঙ্গুষ্ঠাভ্যা মুদে কর্ণে তর্জ্জনীভ্যাং
দ্বিলোচনে।
নাসা রন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যাং অনামাভ্যাং
মুখে দৃঢ়ং।
নিরুদ্ধং মারুতং যোগী যদৈব কুরুতে
ভৃশং।

তদা লক্ষণমাত্মানং জ্যোতিরূপং
প্রপশ্যতি ॥

যখন অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা নেত্রদ্বয় মধ্যাঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা বদনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কুম্ভক দ্বারা শরীর মধ্যে বায়ুকে অনবরত রোধ করিতে পারিবেন তখন যোগীবর স্বহৃদয় মধ্যে জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরমাত্মাকে সুস্পষ্ট দেখিয়া মানব-জন্ম সফল করিতে পারিবেন। সকল-প্রকার যোগসাধনার ফল লাভের ছয়মাসই পরিশ্রম-সাপেক্ষ।

জন্মান্তরীণ যোগজ পুণ্য প্রভাবে ৬ মাসের পূর্ব্বোক্ত যোগফল লাভ কর্‌্যা যাইতে পারে।

যত্তেজো দৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিরাবিলং
সর্ব্ব-পাপ-বিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং
গতিং ॥
নিরন্তর-কৃতাভ্যাসাৎ যোগী বিগতকল্মষঃ।
সর্ব্ব-দেহাদি-বিস্মৃত্য তদভিন্নঃ স্বয়ং ভবেৎ।
যঃ করোতি সদাভ্যাসং গুপ্তাচারেণ
মানবঃ।
সবৈ ব্রহ্মে বিলীনঃ স্যাৎ পাপকর্ম্ম-রতো
যদি ॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয়-কারকঃ।
নির্ব্বাণ দায়কো লোকে যোগোঽয়ং
মম বল্লভঃ ॥
নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যা-
সতশ্চবৈ।
মত্তভৃঙ্গ-বেণুবীণা-সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ ॥

যে সাধক এই রাজযোগে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাঁহার যাহা যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা বলা যাইতেছে। যিনি ক্ষণমাত্র পূর্ব্বোক্ত ক্রমে কুম্ভক দ্বারা অনিরোধ স্বচ্ছ আকাশতুল্য তেজঃ-পদার্থ হৃদয়ে দেখিতে পান তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মাতে বিলীন হইতে পারেন।

নিরন্তর যে যোগী বিশুদ্ধ চিত্তে এ যোগের অভ্যাস করেন তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহ-ধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে যখন ইচ্ছা লিপ্ত হইতে পারেন। ইহাতে যে সুখ হয় তাহা তিনি বৈ আর কেহই অনুভব করিতে পারে না।

যে ব্যক্তি গুপ্তাচারে অর্থাৎ গোপনভাবে সর্ব্বদা এই রাজযোগ অভ্যাস করেন, তিনি অত্যন্ত পাপী হইলেও উক্ত যোগ প্রভাবে পরমাত্মায় বিলীন হইতে পারেন। মহামুনি বাল্মীকি বাল্য হইতে যৌবন পর্য্যন্ত কেবল দুষ্কর্ম্ম করিয়া চিত্ত বিনোদন করিতেন। ইনি দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি কুকর্ম্ম করিতে ত্রুটী করেন নাই। যখন মহাপাপে লিপ্ত ছিলেন, তখন ইহাঁকে রত্নাকর বলিয়া সকলে ডাকিত, জন্মান্তরীণ পুণ্য-পুঞ্জ প্রভাবে যোগাদি তপস্যাতে সিদ্ধ হইলে বাল্মীকি নাম প্রাপ্ত হইলেন।

বল্মীক শব্দে উই পোকার সংগৃহীত মৃত্তিকার ঢিবী অর্থাৎ ঐ মহামুনি এমনি রাজযোগে প্রবৃত্ত ছিলেন যে কতকাল অরণ্যমধ্যে একাসনে বসিয়া পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহার ঠিক

হয় না। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একেবারে অন্তর্দ্ধান হওয়ায় শরীর উই মাটীতে আচ্ছাদিত হইয়াছিল বলিয়া বাল্মীকি নাম পাইয়াছিলেন।

রাজযোগের ন্যায় সদ্য-প্রত্যয়-কারক যোগ আর নাই। এই যোগ শিবের বড়ই প্রিয়। এই যোগ কেবল নির্ব্বাণ-মুক্তিদায়ক ও নাদ-উৎপাদক। এ যোগ যতই অভ্যস্ত হইবে ততই ক্রমশ নাদোৎপাদন করিবে।

নাদশব্দার্থ শব্দ। প্রথমে মত্ত মধুকরের শব্দ, তৎপরে বংশ-বেণুর শব্দ, তৎপর ঘণ্টা-শব্দ, তৎপরে মেঘ-নির্ঘোষতুল্য ভয়ানক শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। যথা—

মত্তভৃঙ্গ-বেণুবীণা-সদৃশঃ প্রথমোধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনঃ॥
ঘণ্টানাদসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘরবোপমঃ
ধ্বনৌ তস্মিন্ মনো দত্বা যদা তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ।
তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে॥

যোগী উক্তরূপ ধ্বনি কর্ণগোচর হইলে তাহাতে মনোনিবেশ করতঃ নির্ভয়ে যোগ সাধনা করিতে পারিলে মুক্তি-দায়ক লয় প্রাপ্ত হইবেন।

তত্র নাদে যদা চিত্তং রমতে যোগিনো ভৃশং।
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহ শাম্যতি॥

যখন সেই নাদে যোগীর চিত্ত নিরন্তর রমণ করিতে থাকে তখন বাহ্য বিষয় সকল বিস্মৃত হওয়ায় ঐ নাদের সহিত শমতা প্রাপ্তি হয়।

এতদভ্যাসযোগেন জিত্বা সর্ব্বগুণান্ বহূন্।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চিদাকাশে বিলীয়তে।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

মানবতত্ত্ব।

কর্ত্তব্য নিরূপণের উপায়।

বিশ্বের অপরাপর পদার্থ সকলের ন্যায় মানবও একটী পদার্থমাত্র। অন্যান্য পদার্থের যেরূপে উৎপত্তি মানবেরও সেইরূপ, এবং অন্যান্য পদার্থের যে পরিণাম মানবেরও সেই পরিণাম। তবে বহু শক্তির সমাবেশহেতু মানব পরিজ্ঞাত বিশ্ব মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ। মানবের পূর্ব্ব, বর্ত্তমান ও পরকাল অপরাপর পদার্থ হইতে কোন মতে ভিন্ন প্রকারের নহে, সর্ব্বথা মানব বিশ্বেরই একটী পদার্থ। কোন বিষয়েই উহা অন্য পদার্থ হইতে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী নহে। মানবের কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিতে হইলে অগ্রে তাহার উদ্দেশ্য কি জানা আবশ্যক। মানব যখন অন্যান্য পদার্থের সমধর্ম্মী অর্থাৎ মানবের উৎপত্তি ও পরিণাম প্রভৃতি যখন অপর পদার্থের ন্যায়, তখন উহার উদ্দেশ্যও তাহাদিগের তুল্য হইবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে

বিশ্বের পদার্থ সকলের উদ্দেশ্য কি, অর্থাৎ কোন্ কার্য্য সাধন জন্য পদার্থ সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা দেখিতে হইলে এইমাত্র জানা যায় যে বিশ্বের কার্য্য সমূহ সাধন জন্যই বিশ্বান্তর্গত পদার্থ সকলের আবশ্যকতা, সুতরাং তাহাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। মানবও যখন বিশ্বান্তর্গত একটী পদার্থ, তখন মানবেরও উদ্দেশ্য তদ্ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু বিশ্বের কার্য্য যে কি তাহা স্থির করা দুরূহ। কার্য্য শক্তি প্রকাশের নামান্তর। সুতরাং কার্য্য বলিতে হইলে পদার্থের শক্তি প্রকাশ মাত্র বুঝায়। পদার্থ-বিশেষের শক্তি ভিন্ন। যে পদার্থের যে শক্তি আছে, সেই শক্তি প্রকাশ করাই তাহার কার্য্য। চুম্বকের শক্তি লৌহ আকর্ষণ করা; উহাই উহার কার্য্য; সুতরাং বলিতে হইবে যে লৌহাকর্ষণ উদ্দেশে চুম্বকের অবস্থিতি। এইরূপে দেখা যায় যে যে পদার্থে যে শক্তি বা গুণ আছে, তাহাই প্রকাশ করা তাহার কার্য্য, এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সেই কার্য্য সাধন জন্য তাহার প্রয়োজন। সুতরাং মানবেরও আপন শক্তি প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। অর্থাৎ বিশ্ব রক্ষা অথবা বিশ্বের যে কার্য্য সাধন জন্য অপরাপর পদার্থের শক্তি প্রকাশ যেরূপ আবশ্যক, মানবের শক্তি প্রকাশও সেইরূপ আবশ্যক।

যাহার যে শক্তি আছে তাহা অবাধে প্রকাশ করিতে পারাকে স্বাধীনতা বলে; স্বাধীনতা চরিতার্থের অপর নাম সুখ। সুতরাং দেখা যাইতেছে সুখই মানবের উদ্দেশ্য। সুখ সাধন হইলেই মানবের তৃপ্তি হয়, কিন্তু যখন বহুযন্ত্রের সংযোগে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন মানবে নানা প্রকার শক্তি নিহিত আছে। যত প্রকার শক্তি মানবে আছে, তৎসমুদায়েরই শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলে মানব সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতে পারে, অর্থাৎ তদন্তর্গত সমুদায় যন্ত্রেরই স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। কিন্তু তদন্তর্গত শক্তি সকলের কতকগুলি এরূপ পরস্পর-বিরোধী যে একের তৃপ্তি সাধন করিতে হইলে অপরের বিরোধাচরণ করা হয়; সুতরাং এক বিষয়ে সুখী হইতে হইলে অপর বিষয়ে অসুখী হইতে হয়, এবং মনুষ্য সকল পরস্পর সমধর্ম্মী প্রযুক্ত একের শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে অপরের শক্তি প্রকাশের বাধা হয়। সুতরাং একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মে; কিন্তু যখন প্রত্যেক মনুষ্য ও প্রত্যেক শক্তি বিশ্বের কার্য্য সাধন জন্য নিযুক্ত, তখন কাহারও স্বাধীনতা নষ্ট করা কখন উদ্দেশ্য হইতে পারে না; আবার যখন একের শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে অপরের শক্তি প্রকাশের বাধা জন্মে, তখন শক্তি সকলের সামঞ্জস্য ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না। এক শক্তি উদর পূরণে ব্যস্ত, অপর শক্তি শরীর

রক্ষণে নিযুক্ত, এ স্থলে এইরূপ সামঞ্জস্য করিতে হইবে যে এরূপ দ্রব্য এরূপ পরিমাণে ভোজন করিতে হইবে যে অধিক বা কুদ্রব্য ভক্ষণে শরীর নষ্ট না হয়। এইরূপে নিজের ও পরস্পরের শক্তি সকলের সামঞ্জস্য করাই বিশ্ব-নিয়মের উদ্দেশ্য ; সুতরাং কর্ত্তব্য বলিতে হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে যাহাতে শক্তি সকলের সামঞ্জস্য হইয়া বিশ্বকার্য্য সুনিয়মে চলে। শক্তি-সামঞ্জস্য করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য এতদ্ভিন্ন মানবের আর কর্ত্তব্য নাই।

শক্তি-প্রকাশ করিবার পূর্ব্বভাবের নাম ইচ্ছা। কোন বাধা না পাইলে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়। মনুষ্য গঠনের পদার্থ সকলের তারতম্য ও অবস্থানের প্রকার বিশেষ অনুসারে মনুষ্য ভেদে শক্তি ভিন্ন প্রকার। যাহার দেহে পূর্ব্বোক্ত কারণে যেরূপ শক্তি নিহিত আছে, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপ। তজ্জন্য সকল মনুষ্যের প্রকৃতি সমান রূপ নহে। শক্তির নামান্তর বৃত্তি। কতকগুলি বৃত্তি মানব মাত্রেই আছে। সে গুলি মানবের সাধারণ বৃত্তি ও ভিন্ন ভিন্ন মানবে ন্যূনাধিক পরিমাণে থাকে। যখন শক্তি প্রকাশ হয় তখন অবশ্য তাহা বিশ্বের পদার্থের উপর প্রকাশিত হইয়া থাকে। চুম্বকের শক্তি লৌহ আকর্ষণ করা, কিন্তু যদি একদিকে এক খণ্ড বৃহৎ ও অপর দিকে এক খণ্ড ক্ষুদ্র চুম্বক রাখিয়া মধ্যে লৌহ রাখা যায়, তবে উভয় চুম্বকেই লৌহকে আকর্ষণ করার শক্তি সত্ত্বেও বৃহৎ চুম্বক ক্ষুদ্রের বলকে পরাস্ত করিয়া লৌহকে স্বাভিমুখে আনয়ন করে। এ স্থলে বৃহতের স্বাধীনতা রক্ষা হইল, ক্ষুদ্রের হইল না। মানব জাতি সম্বন্ধেও ঐরূপ। যাহাতে ঐরূপ শক্তি-সকলের সামঞ্জস্য হয় তাহারই নাম কর্ত্তব্য কার্য্য। অনেকে বলিতে পারেন যে লোকে কর্ত্তব্য পালনে যত্ন করিবে কেন? যখন কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে আপনার স্বাধীনতা ও সুখের হানি হয়, তখন তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে কেন? ঈশ্বর-ভয়েই লোকে সুখনাশে প্রবৃত্ত হয়, সে ভয় না থাকিলে—পর-কালের ভয় না থাকিলে—লোকে নিজের সর্ব্বস্ব ধন সুখের ব্যাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইবে কেন? প্রত্যুত ঈশ্বর-ভয় না থাকিলে মানব সকল স্বেচ্ছাচারী হইবে ও তাহাতে বিশ্বসংসারে মনুষ্যের বসবাস কঠিন হইয়া উঠিবে, এ নিতান্ত জঘন্য কথা; যে প্রাকৃতিক নিয়মে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা প্রভৃতির স্থিতি হইতেছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকিয়াও স্বচ্ছন্দ বিহার ও বিশ্বকার্য্য সমাধা করিতেছে, সেই অপ্রমেয় শক্তির নিয়ম যে মনুষ্যের উপরে প্রভুতা করিতে পারিবে না একথা অতি অশ্রদ্ধেয়। কোন্ ব্যক্তি জীবন রক্ষা পরম ধর্ম্ম

ও সেই ধর্ম্ম পালন জন্য আহার করিয়া থাকে? এবং কেই বা পুন্নাম নরক হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বিবাহ করে? এইরূপে দেখা যায় মানব যে সকল কার্য্য করে তৎ-সমুদায়ই স্বভাব-শক্তি-প্রেরিত হইয়া করিয়া থাকে, বিশ্বের সমাজ-রক্ষিণী শক্তি এত দুর্ব্বল নহে যে তাহা মানব ইচ্ছা করিলেই ভঙ্গ করিতে পারে। মনুষ্যের বিশ্বাস ও শক্তির অধীন বিশ্ব-শক্তি নহে। মনুষ্য-শক্তি বিশ্ব-শক্তির অন্তর্গত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে যে সকল নিয়ম ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া সমাজ-রক্ষায় প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার সকলই প্রাকৃতিক নিয়ম। ঈশ্বর না মানিলেও মনুষ্যকে সেই সকল নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। ঐ সকল নিয়ম যাহারা লঙ্ঘন করিবে, তাহারা ঈশ্বর মানিলেও করিবে, যাহারা পালন করিবে তাহারা ঈশ্বর না মানিলেও করিবে। যাহার শরীরে দয়া আছে ঈশ্বর না মানিলেও তাহার পরদুঃখ-কাতরতা কোথায় যাইবে? সে যে তাহার স্বাভাবিক সহজাত! যে নিষ্ঠুর, ঈশ্বর-ভয়ে তাহার চিত্তবৃত্তি কি প্রকারে ফিরিবে? যদি ঈশ্বর-ভয় প্রকৃতি ফিরাইতে পারিত তাহা হইলে এই সংসারে নিত্য কোটী কোটী কুকর্ম্ম সম্পন্ন হইত না। সকলেইত জানে ঈশ্বর ও পরকাল আছে, তবে লোকে এত দুষ্কর্ম্মে লীন হয় কেন? যে যে প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার সে প্রকৃতি কখন যাইবে না। ব্যাঘ্র ও মেষ উভয়েরই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে সমান জ্ঞান; তবে ব্যাঘ্র এত হিংস্র কেন, আর মেষই বা এত নিরীহ কেন? মনুষ্যও সেইরূপ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। ঈশ্বর ও পরকাল ভয়ে কখন নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান্ হইবে না, ও বুদ্ধিমান্ নির্ব্বোধ হইবে না; তেজস্বী নিস্তেজ হইবে না, ও নিস্তেজ তেজস্বী হইবে না; দয়ালু নিষ্ঠুর হইবেনা, ও নিষ্ঠুর দয়ালু হইবে না। অনেকে বলেন মনুষ্যের সহজাত কোন শক্তি নাই। সকলই মানবের স্বোপার্জ্জিত। আবার কেহ কেহ কতক-গুলি শক্তি সহজাত বলিয়া থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ শক্তি স্বোপার্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে বাল্যকাল হইতে মনুষ্য যেরূপ সংসর্গে বাস করে, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপ হয়। আরও বলেন বাল্য-কালে যাহার যে শক্তি আদৌ ছিলনা, শিক্ষা-বলে সে তাহা প্রাপ্ত হয়। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে যদিও ঐ সকল-প্রকার কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে উহার অলীকত্ব স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে মানবের স্বকীয় কিছুই নাই। তাহার দেহ তাহার প্রাণ তাহার সমুদয় শক্তি প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত। পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদির

ন্যায় তাহারা বিশ্বের একটী জীব ভিন্ন কিছুই নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে মানবের বহুশক্তি সমাবেশ হেতু শক্তির আধিক্য ভিন্ন অপর কিছুই প্রভেদ নাই। তবে মানবের স্বকীয় সম্পত্তি কোথা হইতে আসিবে? যখন মানব নিজেই আপনার নহে, তখন তাহার অংশ বিশেষ শক্তি কিরূপে আপনার হইবে? যখন যন্ত্রাধিক্যই মানবের প্রাধান্যের কারণ, তখন যে মানবে ঐ যন্ত্রাধিক্য নাই সে কিরূপে প্রধান হইবে? যখন সপ্রমাণ হইতেছে পূর্ব্বে পৃথিবী বাষ্পময় ছিল, পরে তাহার দ্রবত্ব ক্রমে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল, ও ক্রমে বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী মানব উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ বাষ্পময় পদার্থ বিশেষ হইতে পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই নির্ম্মিত হইয়াছে, অথচ পদার্থ সকলের শক্তি পরস্পর এত বিভিন্ন যে কিছুতেই বিবেচনা করা যায় না যে তাহারা একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পদার্থ সকল বাষ্পময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থের ন্যূনাধিক পরিমাণ সংযোগ ও অবস্থিতির প্রকার ভেদে উৎপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। নতুবা যদি একই প্রকারে সমুদায় পদার্থ নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে তাহাদিগের আকার প্রকার প্রভৃতি সর্ব্বাবয়বে একই প্রকার হইত। তাহা না হইয়া প্রস্তর স্বর্ণ গো অশ্ব পক্ষী মানব নানা প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু সকলেরই উপাদান সেই বাষ্পময় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সহজাত শক্তি না থাকিলে প্রস্তর অথবা অশ্বকে শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য করা যাইত। কিন্তু তাহা করা যায় না, কেননা মানবে যে সকল যন্ত্র আছে ঐ সকল পদার্থে তাহা নাই। ঐরূপ সকল মনুষ্য সমান রূপ যন্ত্র লইয়া জন্ম গ্রহণ করেনা। যদি করিত তাহা হইলে কেহ কৃষ্ণ কেহ শ্বেত বর্ণ হইত না; কেহ স্থূল কেহ কৃশ হইত না; কেহ উন্নত কেহ খর্ব্বকায় হইত না, কেহ মধুর কেহ কর্কশ-কণ্ঠ হইত না। শতমন সাবান দিয়া ধৌত করিলে কৃষ্ণ বর্ণ শুভ্র বর্ণ হইবে না। এক মন ঘৃত ভোজন করিতে দিলেও কৃশকায় ব্যক্তি স্থূল হইবে না। নিত্য বীণার সহিত মিলাইয়া স্বর পরিচালন করিলেও কর্কশ কণ্ঠ মধুর কণ্ঠ হইবে না। এইরূপ বহুবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যায়। যখন ঐ সকল বাহ্যিক শক্তি পরিবর্ত্তন করিবার কাহারও অধিকার নাই অর্থাৎ মানব নিজে বর্ণাদি উপার্জ্জন করিতে পারে না, তখন আন্তরিক শক্তি যে উপার্জ্জন করিবে তাহার প্রমাণ কি? সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে কবি হয় সে বাল্যকাল হইতেই কবিতায় নিপুণ, যে গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয় সে বাল্যকাল হইতেই তাহাতে

আসক্ত। যে বীর হয় বাল্যকালেই তাহার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়; যে ভীরু হয় সে বাল্যকাল হইতেই গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারে না। অতএব সহজাত শক্তি যে সকলের মূল তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে কি মানবের কোন শাসনের আবশ্যক নাই অথবা শিক্ষার কোন ফল নাই? আছে মানবের আত্ম-শাসনই সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়া দিবে। স্বার্থই সেই শাসনের ভিত্তি। সুখে ও নিরাপদে থাকিব ইহাই সকলের ইচ্ছা। কিন্তু আমি যদি তোমার সুখের ব্যাঘাত করি, তবে তুমিও আমার সুখের ব্যাঘাত করিবে; এবং আমি যদি তোমার উপকার করি, তুমিও আমার উপকার করিবে; সুতরাং নিজের স্বাধীনতার হানি করিবার ইচ্ছা না থাকিলে তোমার স্বাধীনতার হানি করিব না এবং নিজে উপকার পাইবার প্রত্যাশা করিলে তোমার উপকার করিব। আমাদের পরস্পরের এই নিয়মের নাম সামাজিক নিয়ম। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে স্বার্থপরতাই পরার্থপরতা ও পরার্থ-পরতাই স্বার্থ-পরতা। বিশ্বের যে সকল আবশ্যক কার্য্য ঈশ্বর বা নীতি-ভয়ে সম্পন্ন হয় তৎসমুদায়ই স্বার্থ বা পরার্থ-পরতা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু সকলের বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তি সমান নহে। সুতরাং সকলে সামাজিক নিয়ম ও স্বার্থতত্ত্ব ভাল বুঝিতে পারে না এজন্য অধিকাংশের মতে সামাজিক নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ফল কর্ত্তব্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহা শক্তি-সামঞ্জস্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই উপায়ে কর্ত্তব্য সকলের বিস্তারিত বিবরণ করিবার পূর্ব্বে শিক্ষা, শাসন, সভ্যতা, উন্নতি প্রভৃতি বিবেচনা করা আবশ্যক।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

আমার জীবনের ইতিহাস।

(কৈশোর)

আমার জীবনের পূর্ব্বকাহিনী তোমাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সুবিধা পাইনাই। আজি সেই ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিব। হৃদয়ের ভিতরে দিবা নিশি যে অগ্নি জ্বলিতেছে বোধ হয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিলে তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইবে। এই বিস্তীর্ণ সংসার-মরুতে তুমি আমার এক মাত্র ছায়াবৃক্ষ। সংসার শুদ্ধ লোকে ঘৃণা করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং ঘৃণাই বা না করিবে কেন, কিন্তু তোমার দয়া ও অনুগ্রহ অদ্যাপি অচল। অতএব হৃদয়ের যাতনা অভাগিনী তোমাকে না জানাইয়া আর কাহাকে

জানাইবে? আমার আখ্যায়িকা শুনিয়া হয়ত মধ্যে মধ্যে তুমি ভাবিবে আমি অতি লজ্জাহীনা, কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যে ভদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া কুলটা হইয়াছে, যে পিতার ও শ্বশুরের অকলঙ্ক কুল কলঙ্কিত করিয়াছে, যে স্নেহপূর্ণ স্বামীর অন্তরে শেল বিদ্ধ করিয়াছে, তাহার কঠোর হৃদয়ে কি কখন লজ্জা বসতি করিতে পারে?

আমার বাল্যাবস্থার অনেক কথা তুমি বিদিত আছ, সুতরাং সে সকল সবিস্তার বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি পিতার—ছিছি কি কুকর্ম্ম করিলাম! সেই মধুর সেই পবিত্র নাম এ পাপ মুখে আনিয়া কেন কলঙ্কিত করিলাম! পিতার আমি একমাত্র সন্তান। তিনি নিতান্ত অসঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, অথচ কোন কালে অপর্য্যাপ্তধনশালীও ছিলেন না। লোকে কহে পিতার অপেক্ষা মাতার ভাল বাসা অধিক, কিন্তু আমার পক্ষে ইহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছিল। অবশ্য আমি এমন কথা বলিতেছিনা যে আমার জননীর হৃদয়ে বাৎসল্য-ভাবের কিছু অভাব ছিল। সন্তানকে যতদূর ভাল বাসিতে হয় আমার মাতা আমাকে তদপেক্ষা অল্প ভালবাসিতেন না; কিন্তু পিতার স্নেহের কথা মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি তাঁহার প্রাণবায়ু, তাঁহার জীবনের জীবন ছিলাম। কার্য্যোপলক্ষে গৃহত্যাগ করিবার সময় পিতা যদি আমাকে উপস্থিত না দেখিতেন তাহা হইলে তাঁহার মন কতই উদ্বিগ্ন হইত; আবার প্রত্যাগত হইলে যতক্ষণ আমাকে না দেখিতে পাইতেন ততক্ষণ তাঁহার মন শান্ত হইত না। আহারের সময়, নিদ্রার সময় আমি উপস্থিত না থাকিলে আহার নিদ্রায় তিনি সন্তোষ পাইতেন না। অধিক কি পিতা ভাবিতেন আমিই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব, তাঁহার সংসার-যাত্রার একমাত্র সার পদার্থ। আমার প্রতি পিতার স্নেহ ত এইরূপ প্রবল ছিল. কিন্তু আমিকি তাঁহাকে যথোচিত ভাল বাসিতাম?—হায় সে কথা এখন কোন্ মুখে বলিব, আর বলিলেই বা বিশ্বাস করিবে কে? অসতীর হৃদয় কোন কালে স্নেহ-কোমল ছিল ইহা বলিলে কে না হাসিবে? সুতরাং সে কথার আর প্রয়োজন নাই। আমি পিতাকে ভাল বাসিতামনা,—আমি তাঁহাকে শত্রুজ্ঞান করিতাম।

ক্রমে আমার বয়স একাদশ বৎসর হইল। আমি বালিকা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিতাম এবং গৃহে শৈশবোচিত ক্রীড়ায় দিবসাতিপাত করিতাম। এ পর্য্যন্ত পিতা আমার বিবাহের বিশেষ কোন চেষ্টা পান নাই। মাতা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বলিতেন বটে, কিন্তু তিনি মৃদু হাসি হাসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতেন, এবং আমাকে লজ্জাবনতমুখী দেখিয়া আবার মৃদুহাসি হাসিতেন, ও জননীর মুখের দিকে স্থির

দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। আমি পিতার একটী বিষয় দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইতাম। আমি যখনই তাঁহার দিকে চাহিতাম তখনই তাঁহার মুখ সহাস্য ও প্রফুল্ল দেখিতাম, এবং বিস্ময়ের সহিত মনে মনে ভাবিতাম জগতে কি এমন কিছুই নাই যাহাতে এক দিন এক মুহূর্ত্তের তরে পিতাকে উদ্বিগ্ন করিতে পারে। কেমন করিয়া পিতা দিবা রাত্রি এমন প্রফুল্ল থাকেন আমি কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতাম না। এইরূপে কিছুকাল যাইলে পরে একদিন আমি তাঁহাব মুখ হঠাৎ গম্ভীব ও বিষণ্ণ দেখিলাম। তখন তিনি কার্য্যস্থল হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে ছিলেন। তাঁহার মুখের সেই নূতন ভাব দেখিয়া আমি তাঁহার দিকে আব চাহিতে সাহস করিলাম না। আমার মনে কেমন এক-প্রকাব ভয় হইতে লাগিল, আমার বোধ হইল তিনি যেন জানিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার মুখ চির-প্রফুল্ল দেখিয়া আমি হিংসা করিতাম, তাই যেন তিনি সে প্রফুল্লতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যভাব ধারণ করিয়াছেন এবং সেই ছলে আমাকে তিবস্কার করিয়া বলিতেছেন যে পৃথিবীতে লোকের দুঃখ প্রভৃতি মানসিক কষ্টের অভাব নাই। আমি সাহস করিয়া আর এক বার তাঁহার দিকে চাহিলাম, কিন্তু তিনি আমার দিকে চাহিলেন না, আমাকে প্রিয় সম্ভাষণও করিলেন না। আমার বুকের ভিতর শুকাইয়া উঠিল। পিতার হঠাৎ এরূপ বিকাব হইল কেন? হঠাৎ তিনি আমার উপর এমন নির্দ্দয় হইলেন কেন? কিছুই স্থিব করিতে না পারিয়া আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম এবং পিতা ও ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মাতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতাব এই নূতন ভাব লক্ষ্য করিয়া ছিলেন কি না এবং লক্ষ্য করিয়া থাকিলে কিছু সন্দেহ করিয়া ছিলেন কি না আমি তাহা বলিতে পাবি না। কিন্তু সে দিন কোন কথাই শুনিলাম না এবং কিছু বুঝিতেও পারিলাম না।

এইরূপে চারিদিন অতীত হইল। পঞ্চম দিবসে পিতা নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে কার্য্যস্থল হইতে প্রত্যাগত হইলেন। আমি সেদিন সাহস করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম। দেখিলাম তাঁহার মুখ-মণ্ডল বিষণ্ণ ভাব ত্যাগ করিয়া অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। পিতা জননীর পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন, এবং আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া একটু অন্তরালে দাঁড়াইলাম। উভয়েব কি কথা বার্ত্তা হইল সমস্ত শুনিলাম এবং যাহা শুনিলাম তাহাতে মস্তক ঘুরিতে লাগিল। পিতা কখন চাকরি করেন নাই। তাঁহার একটী ব্যবসা ছিল এবং সেই ব্যবসাতে একজন সঙ্গী ছিল। এইব্যক্তি প্রথমে অতি দরিদ্র ছিল, এবং পরে পিতার অনুগ্রহে তাঁহার ব্যবসার বখরাদার

হইয়াছিল। আমরা জানিতাম যে ইহার মত আত্মীয় পৃথিবীতে আমাদের আর কেহ ছিল না। বস্তুতঃ যে দুইদণ্ড কাল তাহার সহিত আলাপ করিত তাহারই বিশ্বাস হইত যে এরূপ মায়িক লোক অতি বিরল। উঃ এই সংসার কি ভয়ানক স্থল! যাহাদের নরকেতেও স্থান নাই তাহাদের এই পৃথিবীতে স্থান আছে। যাহাকে আমরা পরম মিত্র বলিয়া জানিতাম, যাহার হস্তে আমরা প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিতাম, সেই শেষে আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। এই ব্যক্তির উপরে পিতার অসীম বিশ্বাস ছিল। সে সেই সুযোগ পাইয়া ব্যবসার লাভ-ভাগ আত্মসাৎ করিয়া এত দেনা ফেলিয়াছিল যে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় না করিলে তাহার পরিশোধ হইবার উপায় ছিল না। মাতা এই অশুভ সম্বাদে যাহার পর নাই কাতর হইলেন। আমি বুঝিলাম যে উভয়েরই চিন্তার কারণ এক, এবং সেই কারণ এই হতভাগিনী। আমার তখন বিবাহের বয়স হইয়াছিল অথচ বিবাহের কিছুই স্থির হয় নাই। দরিদ্র হইয়া কিরূপে কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবেন এই চিন্তার কাছে আর সকল চিন্তা পরাভূত হইল। পিতা যদি পৃথিবীর আচরণের মত আচরণ করিতে জানিতেন তাহা হইলে তিনি উপায়ান্তর করিয়া সেই বিপদে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন ভিক্ষা উপজীবিকা করিতে হয় সেও ভাল তথাপি কপর্দ্দক থাকিতে কাহাকেও বঞ্চিত করিবেন না। সততার ফল সততা, অর্থবৃদ্ধি নহে। সুতরাং পিতা অচিরে ঘোর দারিদ্র্যে পতিত হইলেন।

বিবাহ।

আমার বোধ হয় অনেক দুঃখের কারণ সুখ। যদি সুখ না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক দুঃখভার কমিত। পিতা মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি বিস্তর সুখের কারণ বটে, কিন্তু মনুষ্যের যদি এসকল সম্বন্ধ না থাকিত, মনুষ্য পৃথিবীর মধ্যে যদি একা থাকিত, তাহা হইলে কত কষ্টের—কত হৃদয়-বেদনার লাঘব হইত। আমি অন্নাভাবে মরি তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাদের মুখ ম্লান দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়, তাহারা অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইতেছে দেখিলে কত ক্লেশ! যাহার কেহ নাই সে অনায়াসে মরিতে পারে, কিন্তু যদি বৃদ্ধ পিতা মাতা অথবা যুবতী স্ত্রী অথবা অসহায় শিশুসন্তানকে পশ্চাতে রাখিয়া মরিতে হয় তাহা হইলে সে মৃত্যুর কত যন্ত্রণা! তাই বলিতেছিলাম সুখ না থাকিলে পৃথিবী এত দুঃখ-ভারে প্রপীড়িত হইত না।

পিতা দরিদ্র হইলেন বটে, কিন্তু এই

হতভাগিনী যদি না থাকিত তাহা হইলে তাঁহার উৎকণ্ঠার বিস্তর লাঘব হইত। সুস্থ-শরীর কোন্ ব্যক্তি না আপনার উদর-পূর্ত্তি করিতে সক্ষম? এবং যে আপনার উদর পূর্ত্তি করিতে সক্ষম সেই সঙ্গে সে হৃদয়ার্দ্ধভাগিনীরও ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম। কিন্তু সন্তান—বড় শক্ত কথা। যদি মনুষ্য পুত্র কন্যা লইয়া বিব্রত হইয়া না পড়িত তাহা হইলে বল দেখি পৃথিবীতে কত কষ্ট কত পরোপাসনার হ্রাস হইত? আমি বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজিতে পারিব, শীতের অস্থিভেদী হিম-বায়ুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিব, অনাহারে মরিতে পারিব—এ সমস্ত পারিব, তথাপি পরোপাসনা করিতে পারিব না। আমি আজি দর্পের সহিত এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, কল্য আমার একটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। বল দেখি তখন আমার সেই দর্প, সেই প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আমি আর স্বাধীন নহি—আমি অর্থের জন্য আমার শরীর, আমার স্বাধীনতা বিক্রয় করিব, এবং বিক্রয় করিয়া শিশুসন্তানকে পালন করিব। কিন্তু এ দোষ কাহার—সন্তানের না পিতা মাতার? পিতা মাতা বলিবেন সন্তানের। কিন্তু সন্তানের কেমন করিয়া? সন্তান কি আপন ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসিতে পারে? সে যাহা হউক কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি। সম্পত্তি-বিহীন হইয়া পিতা মাতা আমার জন্য চিন্তায় অকূল সাগরে পড়িলেন। কেমন করিয়া আমাকে পাত্রস্থা করিবেন, কেবা দরিদ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে, এই উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া গেল। দিবা নিশি কেবল এই ভাবনাই ভাবেন, অথচ কিছুই স্থির করিতে পারেন না। দেখিতে দেখিতে আমি একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ বৎসরে পড়িলাম। দুই একটী সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু সেরূপ পাত্রের হস্তে পিতা মাতা প্রাণ ধরিয়া কন্যা সমর্পণ করিতে পারেন না, অথচ উপায়ান্তরও নাই। এমন সময়ে একটী নূতন সম্বন্ধ আসিল হায়! অভাগিনী সে সম্বন্ধ, সে পাত্র, সে বিবাহের কথা আজি কেমন করিয়া বলিবে? নিশ্চয় আমার আমার হৃদয় পাষাণময়, ইহা কখনই রক্তমাংসে গঠিত নহে,—নহিলে সে সকল কথা মনে হইয়াও বুক ফাটিতেছে না কেন? ঈশ্বর, অপরাধ লইও না, একবার তোমার নামোচ্চারণ করিব। দেব, আর কতকাল বাঁচিব, কতকাল এ যাতনা সহিব? আমার নূতন সম্বন্ধের কথা বলিতেছিলাম। পিতা জননীকে সব বলিলেন, ইহা অপেক্ষা ভাল পাত্র আমাদের এ অব-স্থায় ঘটিয়া উঠা অসম্ভব। কোন কালে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবেনা—তবে পাত্রটীর বয়স কিছু অধিক। আমি তখন অদূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতে-ছিলাম। বয়স অধিক শুনিয়া আমার হৃদয়ের ভিতরে কেমন করিতে লাগিল।

হায়! এ জন্মে সে দিনের কথা ভুলিতে পারিব না। যে দিন হইতে এ পাপ-জীবন দুঃখ, কলঙ্ক ও অনুতাপময় হইল; সে দিনের কথা হৃদয় হইতে যাইবার নহে। আমার এমন এক একবার মনে হয় তখন কি এমন কেহ হিতৈষী ছিল না, যে বালিকার হৃদয় হইতে এই দুর্ব্বুদ্ধি উৎপাটিত করিয়া তাহাকে চির দিনের জন্য রক্ষা করে? সকলই অদৃষ্টের কথা। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন পাত্র-টীর বয়স আন্দাজ কত হইবে? আমার হৃদয়ের ভিতরে কেমন করিতে লাগিল, এবং বোধ হইল যেন, পিতার প্রত্যুত্তরের উপরে আমার জীবন মৃত্যু নির্ভর করি-তেছে। পিতা বলিলেন আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, জগৎ অন্ধকারময় বোধ হইল। মাতা অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, পরে স্বীকার করিলেন যে সেই সম্বন্ধেই ভরাভর করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। ছাই সম্বন্ধ! আমার সে সময়ে ইচ্ছা হইল, যদি হঠাৎ বজ্রাঘাতে প্রাণ যায় তাহা হইলে আমার জীবন জুড়ায়। হায়! কে আমার এমন দারুণ শত্রু ছিল যে আমার মনে এই দুর্ব্বুদ্ধি দিয়া আমাকে চির জীবনের জন্য দুঃখিনী করিল! হে ঈশ্বর তুমি জ্ঞান ও প্রেমময় তাহা আমি জানি, কিন্তু তথাপি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। যখন তরুণমতি বালক বালিকার মনে প্রথমে দুষ্ট অভিসন্ধি প্রবেশ করে, তখন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি কি উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছ? তাহাদের নিজের হৃদয় এত সবল নহে যে তদ্দ্বারা তাহারা প্রলোভনের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে, অথচ কিছু দিন অতীত না হইলেও আত্মীয়বর্গ তাহাদের অভিসন্ধির দুষ্টতা বুঝিতে সক্ষম নহে। তবে কি দেব! তুমি স্বয়ং তোমার সবল দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর? কিন্তু দেব, একথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম কৈ? তাহা হইলে এত সুন্দর সুন্দর অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ও ঈষৎ-প্রস্ফুটিত কুসুম-কলিকাতে কীট প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য নষ্ট করিতে পারিবে কেন? সকলই তোমার ইচ্ছা।

এক্ষণে আমার বিবাহের কথা বলিব! যে দিন হইতে সম্বন্ধ স্থির হইল সে দিন হইতে আমার মনের যে কিরূপ অবস্থা হইল তাহা পিতা মাতা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু আমি তাঁহাদের মনের ভাব বিলক্ষণ বুঝিতাম। আশু কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া কন্যা দায় হইতে মুক্ত হইবেন এই আনন্দে তাঁহাদের মুখমণ্ডল আবার পূর্ব্ববৎ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। আমার মনের ভিতরে যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাঁহারা একবার স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের মত আমারও হৃদয় আনন্দচক্রে ঘূর্ণিত হই-তেছে। জননীর নিকটে যাইয়া কেমন করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিব

কয়েক দিন ধরিয়া এই চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তাহাতে কৃতকার্য্য হইল না। যতবার প্রতিজ্ঞা করিলাম এইবার নিশ্চয় বলিব, ততবারই কে যেন আমার মুখ চাপিয়া ধরিতে লাগিল, সুতরাং সে সঙ্কল্প ছাড়িয়া দিলাম। ক্রমে যত বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই আমার হৃদয়ের ভিতর শুকাইয়া যাইল। আমার বোধ হইল আমি যেন অকূল সমুদ্র-তীরে বাঁধা রহিয়াছি, এবং সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ নিচয় আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমি পলাইবার জন্য ছট্ ফট্ করিতেছি, কিন্তু পলাইতে পারিতেছি না। অবশেষে আমার বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল—বিবাহ!—কি সর্ব্বনাশ! এইস্থলে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। পরিণয়-বিষয়ে লোকের উৎসাহ ও প্রফুল্লতা দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হই। আমার বোধ হয় বিবাহের মত কঠিন ব্যাপার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। ভাবিয়া দেখ দেখি দুই ব্যক্তি, যাহাদের মধ্যে পূর্ব্বে কোন সম্বন্ধ ছিল না, যাহারা সম্ভবতঃ পূর্ব্বে কেহ কাহাকে কখন দেখে নাই—ভাবিয়া দেখ এরূপ দুই ব্যক্তির অদৃষ্ট-সূত্র এক ঘণ্টার মধ্যে চিরদিনের জন্য একত্র বদ্ধ হইল। এরূপ গুরুতর ব্যাপার পৃথিবীতে আর কি আছে? যাঁহারা বিবাহ করেন ও যাঁহারা বিবাহ দেন তাঁহাদের পক্ষে এ দিন উৎসাহ ও আনন্দের দিন, না গভীর চিন্তার দিন? যাহা হউক, এক্ষণে আমি আমার আপনার বিবাহের কথা বলিব। সে দিনে—আমার জীবনের সেই চির-স্মরণীয় দিনে—পিতামাতার আনন্দ, প্রতিবেশিবর্গের উৎসাহ এবং এই হতভাগ্য হৃদয়ের শয্যাকণ্টক, এ সকল বিষয় লইয়া আমি সময় নষ্ট করিব না। আমি একটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। দেখিতে দেখিতে শুভদৃষ্টির—আমার পক্ষে সেই ঘোর অশুভ দৃষ্টির—সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। হায় তখন যদি জানিতাম আমার জন্য ভবিষ্যৎ-গর্ভে কি নিহিত আছে, তাহা হইলে এ হতভাগ্য জীবনের আজি এত দুর্দ্দশা হইত না। শুভ দৃষ্টির সময় কি আনন্দের, কি দুঃখ ও হৃদয়বেদনার সময়। মনুষ্যজীবন কি বিচিত্র! এক ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের উপরে কত সুখ দুঃখ নির্ভর করে। আজি সেই দিনের কথা মনে হইয়া চক্ষুতে জল আসিতেছে এবং ইচ্ছা হইতেছে পুনরায় একবারের জন্য সেই মুহূর্ত্ত ফিরিয়া আসুক। দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকা তখন যে কুকর্ম্ম করিয়াছিল, পঞ্চবিংশ-বর্ষীয়া রমণী তাহা আজি অনুতাপের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে সংশোধন করিবে। সে সময়ের কথা আর অধিক কি বলিব, কোন্ মুখেই বা বলিব? আমার হৃদয় বেগে বক্ষস্থলে আঘাত

করিতে লাগিল, মনে কেমন এক-প্রকার আশঙ্কা হইতে লাগিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হইল যেন পৃথিবী আমার নিম্নভাগে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! তখন যদি কেহ আমার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া লইত, তাহা হইলে সে কত প্রিয় কার্য্যই করিত। পরে যখন গুরুজন শুভদৃষ্টি হেতু চক্ষু উন্মীলিত করিতে বলিলেন—তখন কি হইল, কি করিলাম, কি দেখিলাম?—ক্ষমা কর, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আর বলিতে *পারিব না—ক্ষমা কর! হায় তখন* যাঁহাকে বৃদ্ধ বলিয়া ঘৃণা—হাঁ ঘৃণা করিয়াছিলাম, কোন কথা লুকাইব না—যাঁহাকে ঘৃণা করিয়াছিলাম আজি ইচ্ছা হয় একবার তাঁহাকে দেখি, একবার তাঁহার চরণ-পদ্ম হৃদয়ের উপর ধারণ করি, করিয়া হৃদয় জুড়াই। তাঁহার শান্তিময় গৃহে দাসী-বৃত্তি কত মধুর, দিবসান্তে একবার এক মুষ্টি অন্ন কত তৃপ্তিকর! হে ঈশ্বর, সে সুখত আর হইবার নহে, তবে তাহার জন্য মন এত ব্যাকুল কেন?

স্বামীর গৃহ।

আমার বিবাহের কথা তোমাকে বলিয়াছি। পরদিবস আমি স্বামী কর্ত্তৃক তাঁহার গৃহে নীত হইলাম, দেখিলাম সেখানে কিছুরই অভাব নাই। যাহা যাহা দৃষ্ট-গোচর হইল, সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। যখন যাহা আবশ্যক, দাস-দাসীতে তখনই তাহার আয়োজন করিতেছে। গোলমাল ঝঞ্ঝাট সে সকলের নাম মাত্র নাই। স্বামীর সেই বিভব, পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ সেই গৃহের আমি একেশ্বরী হইলাম। তিনি আমায় কত আদর করিলেন,—বলিলেন 'যাহা কিছু দেখিতেছ সকলই তোমার। তুমি যাহার উপরে সন্তুষ্ট হইবে সেই এই গৃহে স্থান পাইবে, যে তোমার অপ্রীতি-ভাজন হইবে, আমার সংসারে তাহার একদিনের জন্যও স্থান নাই।' তিনি *আরও কত কি বলিলেন, কিন্তু হত*-ভাগিনী তখন মনে মনে কি ভাবিতে লাগিল? স্বামীর স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া তাহার হৃদয় কি প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল?—কেমন করিয়া সে সকল কথা বলিব, কেমন করিয়া আপনার মুখ আপনি পোড়াইব! স্বামী যত বলিতে লাগিলেন, আমি মস্তক অবনত করিয়া স্তম্ভের মত তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার হৃদয়ে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। একবার ভাবিলাম পিতা মাতা যাঁহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিলেন, তাঁহাকে কেন না ভাল বাসিব, তাঁহারা কি আমার শত্রু, না তাঁহারা নির্ব্বোধ? কিন্তু এ তর্কে কোন ফল হইল না। তর্ক ও যুক্তি করিয়া কে কোন্ কালে ভাল বাসিতে পারিয়াছে? ক্রমশঃ দুষ্ট সরস্বতী আমার মনে প্রবল হইতে লাগিল, সুমতি, আর তিলার্দ্ধ স্থান পাইল না। স্বামীর সেই বিস্তীর্ণ গৃহ

আমার পক্ষে অন্ধকার-পূর্ণ ক্ষুদ্র কারাগার হইল, বিভব-চিহ্ন সকল বন্ধনচিহ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সত্যই পৃথিবীতে মায়া নাই, কৃতজ্ঞতা নাই, ভাল বাসা নাই; নহিলে দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকার হৃদয় এত শুষ্ক ও কঠোর হইল কেমন করিয়া? সত্যই মনুষ্যের অন্তর প্রস্তরে গঠিত, এবং আমি তাহার জীবন্ত উদাহরণ। অথবা পৃথিবীর দোষ দিতেছি কেন? সংসারে সকলই কি মরু, অরণ্য ও পর্ব্বতময়? মধুরসলিলা স্রোতস্বতী, সুকোমল কুসুম, এসকল পৃথিবীতে কি নাই? কত সাধ্বী কোমল-হৃদয়া রমণীর স্নেহ, মমতা ও ভাল-বাসায় কত ভগ্যবান্ পুরুষের জীবনযাত্রা নিরবচ্ছিন্ন সুখে অতিবাহিত হইতেছে। আর যাহারা আমার মত পাপীয়সী তাহারা?—হায় কত কাল আর এ মৃত্যু-যন্ত্রণা সহিব! সত্য করিয়া বল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি? বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক,—মনুষ্য একবার যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে সে অপরাধের মার্জ্জনা আছে কি? দিন আসে দিন যায়, কিন্তু তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না কেন?—হৃদয়ের ভিতরে একবার যে অগ্নি জলিয়াছে তাহার আর নির্ব্বাণ হয় না কেন? নরক—নরক আর কোথায়? মনুষ্যের অন্তরে, যে বহ্নি, তাহাই নরকাগ্নি। সে অগ্নির অন্ত নাই, উপশম নাই। জল-সেচনে তাহার নির্ব্বাণ হয় না। ঈশ্বর! শুনিয়াছি যে হতভাগ্য জীব এই অগ্নিতে দগ্ধ হয় তাহার এক মাত্র ঔষধ তোমার করুণা-বারি। দেব একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে হতভাগিনীর উপরে সকরুণ হও। এই ঔষধে আজি তাহার বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে।

নদী পর্ব্বত হইতে নামিয়া যত দূরে যায় ততই বিস্তীর্ণ ও প্রকাশিত হয়। সেইরূপ যত পুরাতন হইতে লাগিল, ততই আমার প্রতি স্বামীর ভালবাসা বাড়িতে লাগিল। সেই ভালবাসা কত প্রকৃত, কত প্রগাঢ় তখন বুঝিতে পারি নাই। যদি তাহা পারিতাম, ভালবাসা কি বস্তু তাহা যদি জানিতাম, তাহা হইলে আজি এ দুর্দ্দশা হইত না। যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, কার সাধ্য তাহা খণ্ডন করে? বিধির ইচ্ছা লইয়া বিরোধ করিবে মনুষ্য-সন্তানের মধ্যে এমন বীর্য্যবান্, এমন মহাপুরুষ কে কবে জন্মিয়াছে? সেই সকলইত রহিয়াছে। সেই গৃহ, সেই সংসার, সেই আত্মীয়-স্বজন, কিছুরইত পরিবর্ত্তন হয় নাই। যে ইন্দ্রভবনে এক কালে আমি ইন্দ্রাণীর মত ছিলাম, তাহা এখনওত তেমনই সুন্দর রহিয়াছে। তবে হতভাগিনীর অদৃষ্টে এই ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল কেমন করিয়া? সংসারবাসিনী হইয়া আমি অরণ্যবাসিনী হইয়াছি। সহস্র সহস্র মানব-সন্তানের মধ্যে থাকিয়াও আমি জনশূন্য! সত্য বলিতেছি এক এক বার বোধ হয় আমি যেন কোন

ঘোর নারকীয় মৃত আত্মা। বন্ধুহীন হইয়া এই বিস্তীর্ণ সংসারে বিচরণ করিব এই আমার শাস্তি। ঈশ্বর! এ শাস্তির কি অন্ত নাই—অবধি নাই? হায় কত কথাই আজি মনে উঠিতেছে—মনের ভিতরে কত আগুণ জ্বলিতেছে! এ জন্মে সে সকল কথা কি ভুলিতে পারিব, সেই স্নেহ, সেই মমতা এ জন্মে কি হৃদয় হইতে কখন যাইবে?

একদা আমার এক শক্ত পীড়া হইয়াছিল। বেলা দুই প্রহরের সময় আমি শয্যায় গিয়া শুইলাম, অমনি অচেতন হইয়া রহিলাম। কখন সন্ধ্যা হইল কখন রাত্রি হইল, আমার কোন জ্ঞান রহিল না। অনেক রাত্রিতে ঈষৎ চৈতন্য হইল। তখন দেখিলাম—হায় কি দেখিলাম তাহা কোন্ প্রাণে বলিব? আমার বুকের ভিতরে যে কেমন করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন বুক ফাটিয়া গেল—তখন দেখিলাম যে আমি যাঁহাকে ভাল বাসিবনা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তিনিই আমার জন্য ব্যাকুল হইয়া সেই ঘোর নিশিতে আমার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। হায় এ কঠিন হৃদয় এ জীবনের মধ্যে সেই মুহূর্ত্তে একবার কোমল হইয়াছিল। আমার চক্ষুতে এক বিন্দু জল আসিল—আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম এই বার ভাল বাসিব। আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া স্বামীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারও লোচনদ্বয় জলে ভাসিতে লাগিল। হায় সেই মুহূর্ত্ত কি পবিত্র! এ পাপ জীবনে তেমন আর কি হইবে? তখনই যদি আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইত—সেই মুহূর্ত্তই যদি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত হইত—তাহা হইলে অভাগিনীর ইহকাল পরকাল রক্ষা হইত। কিন্তু তখন আমি মরিলাম না। আমি যদি মরিব ত কলঙ্কিনী হইবে কে? ক্রমশঃ আমি আরোগ্য লাভ করিলাম। ক্রমশঃ আমার হৃদয় আবার প্রস্তরময় হইতে লাগিল। আবার আমার অন্তরে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আমি মনে করি ভাল বাসিব, কিন্তু কে যেন আমার মনকে বেগে অন্য দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এইরূপ সংগ্রাম করিতে করিতে আমি ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলাম এবং আমার অধঃপতনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। যে দিন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্ম-পথ ছাড়িলাম, সে দিনের কথা মনের ভিতরে জ্বলিতেছে। অধিক বলিব কি যদি বুক চিরিয়া দেখাইবার হইত তাহা হইলে দেখিতে পাইতে হৃদয়াভ্যন্তরে জ্বলন্ত অঙ্গার সঞ্চিত হইয়া অভাগিনীর অন্তরাত্মাকে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে!

শ্যাম——

ক্রমশঃ

অদ্বৈতবাদ।

যে কোন বিষয়ের বর্ণনা হউক না কেন, তাহার পরিভাষা ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। অদ্বৈতবাদের প্রকৃতি বা পরিভাষা পরিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বাভাস উল্লিখিত হইতেছে।

ভারতের তাবৎ ঘটনার মূলে প্রায়ই বেদ। সেই বেদ (শ্রুতি), অদ্বৈতবাদের ইতিবৃত্তে প্রলিপ্ত কি না দেখিতে হইলে আমাদিগকে অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হয়। মূল শ্রুতিতে 'অদ্বৈতবাদের আড়ম্বড়ের অসদ্ভাব। বেদ ছাড়িয়া উপনিষৎ-বিভাগে প্রবেশ করিতে করিতে অদ্বৈতবাদের অস্ফুট উক্তি আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইতে থাকে। উপনিষদের অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক সেই সেই অংশ উদ্ধৃত ও সমালোচিত করিবার অগ্রে, অদ্বৈতবাদের পরিভাষা ও তাহার প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা যাউক। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনোক্ত অদ্বৈতবাদের ভাবার্থ, উপনিষৎ-প্রোক্ত ব্যাখ্যানের পর আন্দোলন করা যাইবে।

বেদান্তদর্শনের মতে, জগৎ মিথ্যা; জীবাত্মা অসংস্কৃত ভাব হইতে মুক্ত হইলেই পরমাত্মা-পদ-বাচ্য হয়। অদ্বৈতবাদের বৈদান্তিক ব্যাখ্যা এই। অপর সাধারণ মতের নিষ্কর্ষ যে, পরমাত্মাই সত্য, অন্য সকল মিথ্যা। কোন কোন মত আছে, তাঁহাতে "সোঽহং," "অহমেব ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যই প্রধান। ক্রমশঃ সেই বাক্যাবলি এবং ঔপনিষদিক উক্তির আলোচনা করিতেছি।

১। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদের শেষভাগে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" বাক্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখানে পরিশুদ্ধ মানবীয় বিবেককে ব্রহ্ম অভিধান প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চদশীয় মতে, ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব মানব বুদ্ধিরও ব্যাপক, সুতরাং এই বাক্য প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বৈত-ভাবাপন্ন। ফলে, অদ্বৈতবাদের সূচনার এই সূত্র পাত।

২। যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে, "অহং ব্রহ্মাস্মি," বাক্য আছে। পঞ্চদশীয় ব্যাখ্যামতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা দুই স্বতন্ত্র। "সোঽহং" "অহং ব্রহ্ম" "ব্রহ্মাহং" ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। এই প্রকার অর্থ বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহা অদ্বৈতবাদিগণের দ্বিতীয় গৎ।

৩। সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের ৮ হইতে ১৫ খণ্ড পর্য্যন্ত যে বর্ণনা রহিয়াছে, তদ্দ্বারা উদ্দালক ঋষি, স্বপুত্র শ্বেতকেতুকে লক্ষ্য করিয়া "শ্বেতকেতো! ত্বং তৎ (ব্রহ্ম) অসি" (তুমিই সেই ব্রহ্ম) এই কথা ভূয়োভূয়ঃ ব্যবহার করিয়াছেন। পশ্চাৎ যথাস্থানে এ বিষয়ের নির্য্যাস দৃষ্ট হইবে।

৪। "একমেবাদ্বিতীয়ং।" ন্যায় ও বৈশেষিক গ্রন্থের ব্যাখ্যানে এইবাক্য সুস্পষ্ট দ্বৈতবাদাত্মক বাক্য। 'অদ্বৈতং

ব্রহ্ম' স্পষ্ট দ্বৈতবাদ প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

৫। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ঈশ্বরের ব্যাপকতা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাস্থলে ইহার মীমাংসা দ্রষ্টব্য।

"সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম" প্রভৃতি যত কেন অদ্বৈতবাদমত-পোষক মত থাকুক না, আমরা উপরে যে যে বাক্য সংগ্রহ করিয়াছি, অদ্বৈতবাদীরা তদতিরিক্ত যতই কেন প্রমাণ সংগ্রহ করুন না, তাঁহাদের উদ্ধৃত বাক্য স্বতঃই খণ্ডিত হইয়া যায়, তাহার জন্য বিশেষ প্রয়াসবান্ হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে নাই।

যুক্তি ও প্রাচীনতম শাস্ত্রীয় প্রমাণে, পশ্চাৎ অদ্বৈতবাদের নিরাস করা যাইতেছে; সম্প্রতি, মহাভারত (গীতা), বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য উদ্ভট্‌শাস্ত্র কি কি যৌক্তিক বচন প্রদান করেন, একবার তাহার সমালোচন করিতে হইবে। যথা,—

"সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।"

(বিষ্ণুপুরাণ।)

এই জগৎ বিষ্ণুময়, বিষ্ণুব্যতিরেকে অন্য সব অসত্য।—ইহার তাৎপর্য্য, ঈশ্বরের সর্ব্বত্রব্যাপ্তি-স্বীকার বৈ আর কিছুই নহে।

"সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।"

এই দৃশ্যমান পৃথিবী ব্রহ্ম-পূর্ণ।—এই শ্লোকপাদ যে প্রকরণে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে, তাহা জাতিভেদ-অপহ্নব-জনক বচন। ব্রাহ্মণজাতি, শূদ্রজাতি ইত্যাদি বিভেদ অসঙ্গত; কেন না, ব্রহ্ম কর্তৃক কোনও বিভিন্নতা নির্দ্দেশিত হয় নাই। ঐ শ্লোকের সমগ্রাংশ এই :—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং
সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি,
কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতঃ॥

অতএব, "সর্ব্বং ব্রাহ্ম মিদং জগৎ" কি প্রকারে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক বাক্য হইতে পারে? কেহ কেহ,

"ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন,
যথা স্থাপিতোঽস্মি তথা করোমি।"

এই বচনার্দ্ধকে দ্বৈতবাদ ভিন্ন অন্য অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; অথচ দ্বৈতবাদ, ইহাতে স্ফুটীকৃত।

আর্য্য শাস্ত্র হইতে বাইবেলে আসিয়া উপনীত হইলে দৃষ্ট হয়, মহাত্মা ঈশা বলিয়াছিলেন।

"I and my Father is One."

আমি ও আমার পিতা (ঈশ্বর) উভয়ে এক।—ত্রিত্ববাদীরা বলেন, খৃষ্ট ঈশ্বর-নন্দন হেতু তাঁহার ঐ উক্তিতে যোগ্যতা একেশ্বরবাদাবলম্বীরা ক্রাইষ্টের ও ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের তুল্যতা অঙ্গীকার করেন। বস্তুতঃ, তাহা সম্যক্ প্রশস্ত মত নয়। কিন্তু, ইহুদিগণ জিজসের ঐ কথা শুনিয়া যখন তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে প্রস্তুত হয়, তখন তিনি সরলপ্রাণে

বলিয়াছিলেন, "হে ইহুদিগণ! তোমরাও সকলে ঈশ্বর।"—সুতরাং খৃষ্ট প্রকৃত পক্ষে এক জন অত্যন্ত সহজ বিশ্বাসী ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, তিনি তাহার দেহে ঈশ্বর-অস্তিত্ব বোধগম্য করিতে সমর্থ ছিলেন। ফল, উহা অদ্বৈতবাদাত্মক উক্তি নহে।

অদ্বৈতবাদের প্রকৃতি, তাহার অর্থ, ভাব এবং তৎ-পক্ষের যুক্তি-বল, প্রমাণবল সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল; এক্ষণে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মবীরেরা, কিরূপ প্রণালীতে উভয় মতের সমন্বয় করেন, এক বার তাহা বিবেচিত হউক।

শঙ্করাচার্য্যকে অদ্বৈতবাদ-মতের প্রথম ও প্রধান প্রচারক বলা হয়। শঙ্কর যে কি ভাবে অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা বোধ করি, অনেকেরই হৃদ্গত হইতে পারে নাই। ঐতিহাসিক ঘটনায় অনভিজ্ঞতা, শাস্ত্রার্থের যথার্থ জ্ঞানাভাব, পবিত্র স্পষ্ট অদ্বৈতবাদকে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। লোকহিতের জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জগৎপাতার গম্ভীর সত্তা-সাগরে অবগাহন করিয়া, তাঁহার প্রেমপূর্ণ নির্ম্মল মুখচ্ছবি নিজে দেখিয়াছেন, সেই প্রসন্ন সৌম্যমূর্ত্তি অপরকে কোথায় দেখাইবেন, না--ফল, তার সম্পূর্ণ বিপরীত! যে অর্থে যে প্রকারে অদ্বৈতবাদকে লোকে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে, শঙ্করাচার্য্যে তাহার বিষময় ফল আদৌ ছিল না। দেহী ও ঈশ্বরের মধ্যে বিভিন্নতার ভূমি স্বল্পই বলিতে হইবে। উপনিষদের বিমল-ভাবোৎপাদক সপ্রেম অদ্বৈতবাদ, মহর্ষি বাদরায়ণ স্বপ্রণীত বৈজ্ঞানিক-রীতি-প্রবর্ত্তক স্বীয় সূত্রগ্রন্থে ব্যাখ্যাত করিয়া গিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাহারই ভাষ্যকার। ভাষ্য, শঙ্করের প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। শারীরিক ভাষ্য--উদ্ঘাটন করিয়া দেখ, তিনি কেমন সৎ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া লোকহিতকর ব্যাপারে স্বীয় আত্মাকে দীক্ষিত—উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। আমাদের উদ্যমের অভাব, অবকাশের অভাব, তাই লোকমুখে শুনি, আর বলি, অদ্বৈতবাদ নামক সর্ব্বনাশের মূলে শঙ্করাচার্য্য। স্বকীয় ব্যাখ্যানপুস্তক-মধ্যে, তিনি স্পষ্টবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা তমঃ ও প্রকাশবৎ বিরুদ্ধ-স্বভাব। তাই বলিয়া, আপাত-প্রতীত অদ্বৈতবাদ, শঙ্করের গ্রন্থে নাই, আমরা বলিতে পারিব না। উভয়ই আছে; তাহার সামঞ্জস্যও আছে। দ্বৈতবাদ, সেই অদ্বৈতবাদ হইতে, বিলক্ষণ সমর্থিত, দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, পাঠ করিলে বুঝা যায়। সাধারণ্যে শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী অদ্বৈতবাদের 'নবীন অদ্বৈতবাদ' আখ্যা দান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ১০২০ সালে, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সদানন্দ যোগীন্দ্র, বেদান্তসার নামক এক গ্রন্থ, কাশীতে

রচনা করেন*। ভারতী-তীর্থ-বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর প্রণীত পঞ্চদশী গ্রন্থ, 'নবীন অদ্বৈতবাদ'—শ্রেণীস্থ। ফল, পঞ্চদশীর এমন বহু স্থল আছে, যাহা অদ্বৈতবাদের পরিবর্ত্তে, দ্বৈতবাদের পক্ষ সমর্থন করে।

শঙ্করাচার্য্যের মৃত্যুর ৩৫০ বৎসর পরে (একাদশ শতাব্দের মধ্য ভাগে), দক্ষিণাবর্ত্তে পেরুম্বুর গ্রামে রামানুজ, জন্ম গ্রহণ করেন। বেদান্তসূত্রের ইনি যে ভাষ্য প্রস্তুত করেন, তাহার নাম রামানুজ-ভাষ্য। শঙ্করের সহিত, রামানুজের বিভিন্নতা এই যে, প্রথমোক্ত, ঈশ্বরকে নিত্যকাল হইতে চিৎ (জ্ঞান)-অচিৎ (অজ্ঞান)-বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় তাহা স্বীকার করেন। মূলে, কোনও বিভেদ উপলক্ষিত হইবে না। রামানুজের মতে, ঈশ্বর অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানবান্, ঈশ্বর্য্য, শৌর্য্যাদির আধার। "তত্ত্বমসি" অর্থস্থলে, রামানুজ বলিতেছেন— 'শ্বেতকেতো! তোমার জীবনের কর্ত্তা যিনি, তিনি পরমাত্মা।' শঙ্করাচার্য্যের মতেরও এই তাৎপর্য্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যের অর্থে, ঈশ্বরের দ্বিত্বাভাব প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—জগৎ ও সৃষ্ট অপরাপর প্রাণিগণ, ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন। পৃথিবীর সহিত ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ উভয় বুঝাইতেছে।

শঙ্করাচার্য্যের তিরোভাবের কিঞ্চিদূন প্রায় ৪০০ বর্ষ পরে (১১২১ শকাব্দে), দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতী তুলব প্রদেশে শ্রীমান্ মাধ্বাচার্য্যের * জন্ম হয়। ইনি দ্বৈতবাদী। মাধ্বাচার্য্যের ভাষ্য, দ্বৈতবাদ-সূচনায় পরিব্যাপ্ত। অনেকের অনুমানে, মাধ্বাচার্য্য, শঙ্করের শিষ্য। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে ইঁহার দ্বিতীয় আখ্যা, আনন্দতীর্থ। যাহা হউক, "তত্ত্বমসি"-র তিনি, দ্বৈতবাদ-পক্ষে সুন্দর অর্থ করিয়াছেন। শ্বেতকেতু, তুমি তাঁহার (ব্রহ্মের); মাধ্বাচার্য্য এখানে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসে স্বকীয় মনোভাব ব্যাখ্যা করেন। সামান্যাকারের অবেক্ষণ দ্বারা, বাহ্যিক দৃশ্যে প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদের মনোহর গূঢ় ভাব ও রামানুজের ভাষ্যান্তর্গত এই ব্যাখ্যান, পরস্পর অবিরোধী, বলিতে পারা যায়।

অতঃপর, শতাব্দের ৫০০ বর্ষে (শঙ্করাচার্য্যের ৮০০ বৎসর পরে) মহামতি বল্লভাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। ইনি তৈলঙ্গ দেশীয় পণ্ডিত। জীব ও জগৎ, ঈশ্বরের পরিণাম। শংকর-অনুচরেরা পৃথ্বীকে ভ্রম মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; ইঁহার মত, তাহার বিপরীত। জগৎ, জীব এবং ব্রহ্ম এই তিন বল্লভের মতানুসারে, ভ্রান্তিমাত্র।

* ১০৮৫ সালে নৃসিংহ সরস্বতী, সুবোধিনী ও রামতীর্থ দণ্ডী, বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী নামক দুই টীকা করেন।

* মাধবাচার্য্যের নামের সঙ্গে, ইঁহার আখ্যার সাদৃশ্য হেতু, কেহ কেহ উভয় নাম, স্বতন্ত্র না বলিয়া, এক মনে করেন, তাহা নিতান্ত ভ্রান্ত মত।

এই খানে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মতের উপসংহার করিয়া, মূল বেদসংহিতার দিকে ক্রমশঃ কটাক্ষ করিব।

ভগবান্ বেদব্যাস, বেদান্ত দর্শনের * রচয়িতা। সূত্র গ্রন্থের প্রকৃতি, সচরাচর যেরূপ সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্টার্থ হইয়া থাকে, তদনুসারে এই গ্রন্থের ভাষা ও ভাব দুর্ব্বোধ-গম্য; সুতরাং ব্যাখ্যান আবশ্যক হইল।—পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহার ভাষ্য লিখিলেন। সেই ভাষ্য, শারীরক সূত্রের ব্যাখ্যা বলিয়া, তাহার নাম শারীরক ভাষ্য। শঙ্করাচার্য্য যখন দ্বাদশ বয়সে, পিতৃহীন হন, তখন তিনি দেখিলেন, অধিকাংশ লোক নাস্তিকতায় উন্মত্ত। তিনি আর্য্য ঋষিগণের শাস্ত্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে, শঙ্করকে সংসার ত্যাগ করিতে হয়। ফলতঃ বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনাদি শাস্ত্র যে প্রকার প্রকাণ্ড, ঈশ্বর মাহাত্ম্য-ঘোষণা যেরূপ বহু-শ্রম-সিদ্ধ দুর্ঘট কার্য্য, নরনারীর আয়ুঃ যাদৃশ স্বল্পস্থায়ী, সমাজ-সংস্কার যদ্রূপ দুরূহ, অথচ অবশ্য-কর্ত্তব্য মনোরম বিষয়, সাংসারিক-গৃহ-কার্য্য—অধ্যয়ন, অধ্যাপন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির যেরূপ অন্তরায়, তাহাতে সামান্য বস্তুর মমতা ত্যাগ না করিলে, কোনও মতেই চলিতে পারে না। যিনি জগতের উপকারে দৃঢ়সংকল্প হন, তাঁহাকে সংসার হইতে বিচ্যুত থাকিতে হইবেই হইবে। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, অনুপ্রাণিত ভাবে কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে উচ্চতম বিষয়ের উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়।—যে কোন সমাজ-সংস্কারক——ধর্ম্মবীরের জীবন অধ্যয়ন, আলোচন কর না কেন, এই ঘটনা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। ভারতীয় মহামতি বুদ্ধদেব ঐ শ্রেণীর অন্তর্ব্বর্ত্তী। শঙ্করাচার্য্য, স্বপথ-প্রদর্শক বুদ্ধদেবের এবং চৈতন্য, শঙ্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, অনুসরণ করিয়া ভারতের কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, নির্দ্দেশ অত্যুক্তিমাত্র †।

অদ্বৈতবাদের সঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের জীবনের সংস্রব, এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, শঙ্করকে ছাড়িয়া, অদ্বৈতবাদ তিষ্ঠিতে পারে না। কেন না, অদ্বৈতবাদের জন্মদাতা, শঙ্কর। স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আমরা এই প্রবন্ধে শঙ্করাচার্য্যের জীবনী প্রকটন করিব না, ঘটনাগত-কার্য্য-স্রোতে যেখানে শঙ্করের জীবনী নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে, অগত্যা তথায় সংক্ষিপ্ত জীবন প্রকটন করিতে হইবে।

* পণ্ডিতেরা বেদান্ত দর্শনকে, বেদান্ত বিজ্ঞান, বেদান্তমীমাংসা, বেদান্তসূত্র, বেদান্তগ্রন্থ, বাদরায়ণ সূত্র, ব্রহ্মসূত্র, শারীরক সূত্র, উত্তর মীমাংসা ও উপনিষৎ মীমাংসা ইত্যাদি অভিধায় আখ্যাত করেন। এই প্রস্তাবে ঐ সকল নামের অন্যতম যে কোন আখ্যায় হউক, আমরা, ব্যাসদেবের দর্শনের নামোল্লেখ করিব।

† বর্ত্তমান কালেও ইহার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ইহা স্পষ্টই নির্দ্দেশিত হওয়া উচিত, দার-পরিগ্রহ বা সংসারাবদ্ধ হইলে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত।

শঙ্করাচার্য্য, শারীরক সূত্রের ভাষ্য করিতে,এমন অনেক স্থলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যেখানে অদ্বৈতবাদের আভাস বর্ত্তমান। সেই অদ্বৈতবাদের আভাস, (কিন্তু, কি ভাবের) উত্তর কালের লোকেরা, তাহার বিশেষ অনুধাবন না করিয়া অদ্বৈতবাদে, অদ্বৈতবাদ হইতে, "অহংব্রহ্মে"—এবং তাহা হইতে এক প্রকার নাস্তিকতায় উপস্থিত!। উপনিষদের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-কাল পর্য্যন্ত যে কেহ বিলক্ষণ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিবেন, যে অসঙ্গতি পরিহারের কারণ, বেদব্যাসের প্রয়াস, তাহার অংশতঃ নিরাকরণ হইয়া, পুনরায় প্রকারান্তরে আবার সেই অভাবের ভাণ্ডারে গিয়াই ভারতীয় মনীষার পতন। বিশেষ এই, সমাজ বেদ-বিরোধী, ঈশ্বর-অবিশ্বাসকারী ছিল ব্যাসের পূর্ব্বে, নামমাত্র ঈশ্বর মান্যকারী হইল, শঙ্করাচার্য্যের পরে। এই দুই অভাব-সংমোচনের এই বিভিন্নতা। অদ্বৈতবাদ—বেদমূলক, কি বেদে না হউক, বৈদিক কালে, তাহার ভিত্তি, এ বিষয় এক বার ভাবিয়া দেখা যাউক। ভারতবর্ষ যেরূপ দেশ, বেদের মান্য ভারতে যেমন, উপনিষৎ সমস্ত যে প্রকার গভীর-ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচায়ক, তাহাতে অদ্বৈতবাদ যদি, ঐ সকলের মূল-সম্বন্ধ না হইত, কখনই তাহার অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়া, কালে বৃক্ষাকারে পরিণত হইতে পারিত না। স্থির হইল, বৈদিক সময়, তাহার অভিভাবক। দেখা যাউক, কোন্ বেদ-বেদান্ত কি ভাবে এই বিষয়ের উপদেশ দেন, আর কোন্ শ্রুতি, কোন্ উপনিষৎ তাহার খণ্ডন বা অস্বীকার করেন।

বেদ (শ্রুতি)-সংহিতা (মন্ত্রভাগ) হইতে ক্রমান্বয়ে ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদর্শিত হইবে যে, দ্বৈতবাদই বাস্তবিক বৈদিক-কাল সম্মত ধর্ম্ম; অদ্বৈত বাদ তর্কযুক্তিমূলক; কিন্তু তাহাও সর্ব্বথা সম্মত নহে।

বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং,
যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্ক ভাবদুত্তরং সধস্থং,
বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়॥" *
[ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ২১ অধ্যায়, ১৫৪ সূক্ত, ১ শ্লোক।]

* আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি স ইমান্ লোকান্ সৃজত।

(ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষৎ।)

ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন; তৎপূর্ব্বে তিনি একাকী ছিলেন। এই প্রকার উপনিষৎ-বচন ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ঋক ১ম, ১অ, ৫৭, ৩ শ্লোক দেখ। পরমাত্মাও জীবাত্মা দুই স্বতন্ত্র। কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালরচিত গোতমের ন্যায়-শাস্ত্রে এবং কণাদের বৈশেষিক দর্শনের সূত্র গ্রন্থে, পরমাত্মা, পরমাণু ও জীবাত্মা নিত্য, স্বীকৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ না হউক, ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমতী ক্ষমতার অপলাপ করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদের মত প্রতিবাদ করার যে কারণ,

নরগণ! যত শীঘ্র পার, সেই সর্ব্ব-ব্যাপী ঈশ্বরের অপার শক্তির গুণ গান করিতে থাক। তিনি উপাসকগণের বাসোপযুক্ত সত্য লোক এবং অন্যান্য জড় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহার সমস্ত পরাক্রম আছে; যাঁহারা সাধু, তাঁহারা, তাঁহারই প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করেন।—ঈশ্বর জগৎ কর্ত্তা, এই সূক্তে তাহা স্ফুট।

'যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদান্য-
ক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি।
য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুতদ্যা-
মেকোদাধার ভুবনানি বিশ্বা॥'

(ঋক্ ১মঃ, ২১ অঃ, ১৫৪ সূঃ, ৪ শ্লোক।)

ভূলোক, দ্যুলোক ও জীবগণের ধারণ কারী সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের অমৃতময় পদ জীবদিগকে আপ্যাইত করিয়া থাকে।—সুতরাং জীব ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রার্থী,—ঈশ্বর হইতে নিকৃষ্ট।

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্য—
নশ্নন্নন্যো হভিচাকশীতি॥'

(ঋগ্বেদ, ১মণ্ডল, ২২ অধ্যায়, ১৬৪ সূক্ত ২০ শ্লোক।)

আলঙ্কারিক ভাষা হইতে, ভাব সংগ্রহ করিলে, এই ঋকে জীবত্মা আর পরমাত্মার দ্বৈত-ভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। রূপক ভেদ করিয়া আমরা দেখিতেছি, বিজ্ঞানপুরুষ (জীবাত্মা) সংস্কৃত অবস্থায়, পরমাত্মাতে অবস্থিত; ২ জনে একত্র রহিয়াছেন। জীবাত্মা দেহ-বদ্ধ, পরমাত্মা তথায় বন্ধু,—সহচর-রূপে উপস্থিত। অদ্বৈতবাদীরা হাজার কেন সমানাধিকরণ বলুন না, ২ সংখ্যা এখানে সুব্যক্ত। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই, জীবাত্মা, স্বকৃত ফল-ভোগ করেন, পরমাত্মা তাহার সাক্ষী। (পক্ষীশব্দ এখানে রূপক ভাবে প্রযুক্ত।)

যো নঃ পিতা জনিতা যোবিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো বেদানাং নামধা এক এব
তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যান্ত্যন্যা॥ *

ঋগ্বেদ, ৮ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ১৭ বর্গ।

যিনি আমাদের পিতা (জনক), বিধাতা; যিনি সর্ব্বজ্ঞ, দেবতাদের জনয়িতা ও অদ্বিতীয়, তাঁহা হইতে বিভিন্ন এই জগৎ তাঁহাকে অনুসন্ধান করে।

এই মতের প্রতিবাদেরও সেই কারণ। পরমাণু নিত্য, বিজ্ঞানের এই মত এখন সর্ব্ববাদি-সম্মত। ভারতীয় দর্শনের বিচারে, বিশেষতঃ, অদ্বৈতবাদ-সমালোচনায় তাহার অবতারণার অপ্রাসঙ্গিকতা হেতু বিশেষ বর্ণন উপেক্ষিত হইল।

* এই ও যজুর্ব্বেদাদির অন্যান্য সূক্তের বচন সমালোচন করিতে করিতে, আমাদের বহু কালের একটী মহান্ সংশয় অপনীত হইয়াছে। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করা, আর্য্যশাস্ত্রে নাই, আমাদের এই দৃঢ় প্রতীতি ছিল। প্রত্নতত্ত্বা-লোচনায় সে ভ্রম অপসারিত হইল। অপ্রাসঙ্গিক হউক, কৌতুহলাবিশিষ্ট চিত্তে, আমরা এই সংবাদ পাঠকের গোচর করিলাম।

ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগ ত্যাগ করিয়া, এক্ষণে আমরা যজুর্ব্বেদের দিকে মনোনিবেশ করিতেছি।

স নো বন্ধুর্জনিতা, স বিধাতা।

(যজুর্ব্বেদ সংহিতা)

তিনি আমাদের জনক, মিত্র ও বিধাতা এতদ্দ্বারা মানব (জীবাত্মা) ঈশ্বরের পুত্রত্ব স্বীকার করিতেছেন।

স বা অয়মাত্মা, সর্ব্বস্য বশী,
সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ,
সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি।
যদিদং কিং ন স ন,
সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্যো॥
এবা সাধুনা কনীয়ানেষ
ভূতাধিপতিরেষ লোকেশ্বর এষ
লোকপালঃ স সেতু র্বিধরণ
এষাং লোকানামসম্ভেদায়॥

(যজুর্ব্বেদ, ১৪ প্রপাঠক, ৭ অধ্যায়, ২ প্রাতিশাখ্য, ১৪ শ্লোক।)

সেই পরমাত্মা সকল হইতে স্বতন্ত্র, সকলের নিয়ন্তা, সমস্তের রাজা। তিনি দৃশ্যমান বস্তু নহেন। সৎ কার্য্য করিলে মনুষ্য তাঁহাকে পায়; তিনি সেতুস্বরূপ হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন।

পিতা নোঽসি পিতা নোবোধি।

(যজুর্বেদ।)

ঈশ্বর! আপনি আমাদের পিতা; পুত্রকে জ্ঞান দাও।

১ম ও ৩য় বচনে ঈশ্বরকে পিতা বলা হইয়াছে. সুতরাং মনুষ্য ঈশ্বরের পুত্র হইল। এই পবিত্র সম্বন্ধ হইতে আরো যখন নিকটতর হয়, তখনি ভক্ত আমি তাঁহাতে বলিয়া আনন্দিত হয়। ফল, তাহা অদ্বৈতবাদ নহে। দ্বৈতবাদ যথার্থতঃ; অদ্বৈতবাদ কথায় মাত্র।

নিম্নোক্ত উপনিষৎ বচনে ঈশ্বর ও জীব উভয় ভিন্ন; যথা,—

ঋতং পিবন্তৌ, স্বকৃতস্য লোকে,
গুহাং প্রবিষ্টৌ, পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ, ব্রহ্মবিদো বিদন্তি,
পঞ্চগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥"

কৃষ্ণযজুঃ (তৈত্তিরীয় সংহিতা) অন্তর্গত কঠোপনিষৎ ১ম অধ্যায়, ৩য় বল্লী,
১ শ্লোক।

'এই শরীরে উপাধি অবস্থাতে বিম্ব প্রতিবিম্বের ন্যায় দুই আত্মাকে স্বীকার করিয়া কহিতেছেন। আপনার কৃত যে কর্ম্ম তাহার ফলকে দুই আত্মা ভোগ করেন অর্থাৎ বিম্বস্বরূপ যে পরমাত্মা তেঁহ ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন আর প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে জীবাত্মা তেঁহ সাক্ষাৎ ভোগ করেন, আর ঐ দুই আত্মা এই শরীরের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন; তাঁহাদের মধ্যে জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায়, আর পরমাত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিরা পঞ্চাগ্নিহোত্রি—গৃহস্থেরা ও ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন অর্থাৎ উপাধি অবস্থাতে জীবাত্মার ও আত্মার অত্যন্ত প্রভেদ করিয়াছেন।' *

* পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ ও বাবু রাজনারায়ণ বসুর প্রকাশিত রামমোহন রায়ের ২য় সংস্করণ কঠোপনিষৎ ৫৬৬ পৃষ্ঠা, ৫—১৬ পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতবাদের আধুনিকতা প্রতিপাদনার্থে সমীক্ষণ করা যাইতেছে। এই তত্ত্বের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, উৎপত্তি স্থান লক্ষ্য করা বিধেয়। (যথাস্থানে তাহা বর্ণিত হইবে।)

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় (তৈত্তিরীয় সংহিতা) শ্বেতাশ্বর উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে ব্রহ্ম, জগতের পক্ষে, সমবায়ী কারণ (উপাদান বা পরিণামী কারণ), অসমবায়ী কারণ, নিমিত্ত কারণ না বিবর্ত্ত-উপাদান কারণ এই প্রশ্ন দেখা যায়।—ঐ উপনিষদে এই প্রশ্ন ব্যতিরিক্ত বিস্তর জিজ্ঞাসা রহিয়াছে। সর্ব্ব-প্রথমে সেই কয়েকটী কারণের সরলার্থ প্রকাশ করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

১ম, সমবায়ী বা উপাদান কারণে, এই বুঝায়ঃ—যেমন, বস্ত্রের সমবায়ী কারণ সূত্র; এতাবতা বুঝাইতেছে যে, পৃথিবীর সহিত ঈশ্বরের কি এই রূপ সম্বন্ধ? অর্থাৎ পৃথিবী লইয়া কি ঈশ্বর, না ঈশ্বর লইয়া পৃথিবী? অর্থাৎ সৃষ্ট পৃথিবী; ও স্রষ্টা ঈশ্বর অসমবায়ী কারণের অর্থে, অদ্বৈতবাদের অভাব। যদি ঈশ্বর পৃথ্বীর সম্বন্ধে নিমিত্ত কারণ হন, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্বর ও জগৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন নামে প্রমাণিত হয়। নিমিত্ত কারণের অর্থ,—তন্তুবায় বস্ত্রের প্রতি যদ্রূপ, ঈশ্বর, জগতের সম্বন্ধে তাদৃশ হইলে, নিমিত্ত কারণের ভাবে দ্বৈতবাদ সূচিত হইয়া থাকে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই প্রশ্নের অবতারণা রহিয়াছে। ঋষিরা সময়ান্তরে তাহার প্রত্যুত্তর সমাধান করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত স্থলে প্রসঙ্গক্রমে পশ্চাৎ তাহার উদ্ধৃত ও আলোচিত হইবেক। উল্লিখিত উপনিষদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা;—আমরা (মনুষ্যগণ) কিরূপে, কি নিয়মে উৎপাদিত? স্থিতিই বা আমাদের কোন্ স্থানে? আমাদের নিয়ন্তা কে? সময়, প্রকৃতি, দৈবঘটনা পঞ্চভূত (১), জীবাত্মাদির একতম কেহ কি এই পৃথিবীর সৃষ্টির হেতু? (এস্থলে উত্তর বা সংশয়-চিহ্নস্বরূপ বলিতেছেন, "অথবা এই সকলের সংযোগেও তো সৃষ্টি অসম্ভব; আত্মা বলবিহীন, সুখদুঃখের আয়ত্ত, অতএব তাহাই বা কি প্রকারে জগৎ কারণ হইবে?")

ঋষিরা প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তরে, ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি, জগৎ-উৎপত্তির হেতু বলিয়াছেন। পরম-পুরুষ তাহার নেতা। "কি কারণং ব্রহ্ম" এই বাক্যে আড়ম্বর পূর্ণ বৈদান্তিক অদ্বৈবাদের সূচনা। ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি, বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রের এই তাৎপর্য্য। উপনিষদে ইহার রাশি রাশি প্রমাণ বিরাজমান রহিয়াছে। বৈশেষিক দর্শন ও ন্যায়সূত্রের সহিত এ মতের সামঞ্জস্যের অভাব। শঙ্করাচার্য্য-কৃত ব্যাখ্যান-গ্রন্থে বেদান্ত মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই

(১) পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পঞ্চভূত (Five Elements) ভ্রান্ত মত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে বিষয় বিশেষের বিচারে এখানে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র।

তারতম্য ব্যাপ্ত। মুণ্ডকোপনিষদে একটী শ্লোকে এ বিষয়ের সুন্দর উপমা আছে। ঊর্ণনাভ, স্ব-দেহ হইতে যাদৃশ তন্তু সৃষ্টি করে, এবং পুনরায় তাহা প্রত্যাহরণ করে *, মনুষ্য-শরীরে যেমন কেশ জন্মে, তদ্বৎ এই ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। কথাটী সহজ, বিশ্বাস বা যুক্তি তত সুগম কৈ? তাৎকালিক পণ্ডিতগণের মধ্যে ঐ বিষয়ের আন্দোলনে বহু দিন অতীত হইয়া গিয়াছিল। ঊর্ণনাভের (মাকড়-সার) দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে, জগৎ-সৃষ্টি, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহার বিনাশও সেই শক্তি-পরতন্ত্র। উপনিষৎ-মতে ব্রহ্ম, জগতের একমাত্র কারণ। বেদান্ত, শ্রুতি বা উপনিষদের অনুগত হউক, তাহার মতে ঈশ্বর জগতের সম্বন্ধে বিবর্ত্ত-উপাদান কারণ। কোনও উপাদান-সাহায্য না লইয়া উৎপন্ন করিয়া দিবার যে শক্তি, তাহাই ঐ উপাদানের ভাবার্থ।

ন তং বিদাথ য ইমা,
জজানান্যৎ যুষ্মাক—
মন্তরং বভূব।
(শুক্লযজুঃ (বাজসনেয়)—সংহিতা)

তোমরা তাঁহাকে জানিতেছ না, যিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এ সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা হইয়া, তোমাদের (সৃষ্ট বস্তুর) অন্তরে বাস করিতেছেন।

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মা—
দন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ,
যত্তৎপশ্যসি তদ্বদ॥
(কঠ ১ অঃ, ২বঃ, ১৪ শ্লোক)

নাচিকেতা যমকে কহিতেছেন:—

ব্রহ্ম, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, ফল, অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠাতা, অধর্ম্ম কার্য্য,প্রকৃত্যাদি কারণ, ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান কাল হইতে প্রভিন্ন জানিবে।

সামবেদের তলবকার উপনিষৎ বলেন,

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি,
নো মনো ন বিদ্মো ন ন বিজানীমো,
যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব।
তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং
যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥ ৩ শ্লোক।

তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইতে সম্পূর্ণ সংভিন্ন।

অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ গ্রন্থাবলিতে উক্ত হইয়াছে।—

এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা,
মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানত্মা পুরুষঃ।
স পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে॥
(প্রশ্নোপনিষৎ ৪র্থ প্রশ্ন, ৯ম শ্রুতি)

বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা, অনশ্বর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ঘ্রাণকর্ত্তা, স্পর্শ-কর্ত্তা ইত্যাদি।

* যথোর্ণনাভঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ,
যথোষধয়ঃ সম্ভবন্তি যথা স্বতঃ।
পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবন্তীহ বিশ্বং।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো—
ঽনীষয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ—
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
মুণ্ডকোপনিষৎ ৩ মুণ্ডক, ২য় খণ্ড,
২ শ্লোক।

জীবাত্মা, দেহ-ভিতরে মগ্ন থাকিয়া, দীনভাবে শোক করে; ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারে তাহার শোক থাকে না।

উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম,
আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।
(মনু।)

জীবাত্মা যাঁহাতে অবস্থাপিত, তিনি উপাস্য ব্রহ্ম।—এই থানে দ্বৈতবাদের প্রমাণ-সংগ্রহের বিরাম। এক্ষণে অদ্বৈতবাদের মূল ও তাহার প্রমাণের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখা যাউক।

এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রীয় কোন বিশেষ প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য এই মতের প্রবর্ত্তক। তিনি বেদান্ত সূত্রের দোহাই দিবেন। ঐ ভাষ্য আবার উপনিষদের অধীন। উপনিষৎ সম্পূর্ণ না হউক, কতক পরিমাণে বেদের মান্য করেন। শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ডকে উপনিষৎ নিন্দা করেন। ঋগ্বেদ হইতে, আরম্ভ করিয়া যে সমস্ত প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনটীই অদ্বৈতবাদের পোষকতায় নহে। কথা হইতে পারে, যদি অদ্বৈতবাদের সূত্রপাত না থাকিবে, তবে কেন দ্বৈতবাদ লইয়া শাস্ত্র এত কাণ্ড করিয়াছেন। এ তর্ক-প্রণালী সম্যক সত্য নহে। সাধকেরা ভাব-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া 'ঈশ্বরে তন্ময় হইলাম' বলেন। শঙ্করাচার্য্যও সে ভাবের ভাবুক। অদ্বৈতবাদের ভাব যাহা, শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় যাহা, তর্ক ও যুক্তির অনুরোধে তাঁহাকে তাহা উচ্চারণ করিতে দেখা যায় না। বেদ-উপনিষদাদি অধিক কি, বৈদিক কাল দূরে রাখিলে, পৌরাণিক যুগে ঐ ভাবের দুই চারিটী বাক্য শ্রুতি গোচর হইতে থাকে।

পরিশেষে, রাজা রাম মোহন রায়ের বেদান্ত টীকার সমালোচনা করিয়া এই বিষয়ের মীমাংসার উপসংহার করিতেছি। ১৭৩৭ শকে রামমোহন রায় ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে বেদান্ত গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করেন। পৌত্তলিকতা ও অদ্বৈতবাদ-নিরাকরণ, বেদান্ত ও উপনিষদ্-প্রচারের কারণ। বাস্তবিক, অদ্বৈতবাদ ঘোর নাস্তিকতা অপেক্ষা ভীষণতর লোমহর্ষণ কাণ্ড। বুদ্ধের যে নিরীশ্বর মত, তাহাতেও সুনীতি আছে; কপিল, ঈশ্বর অমান্যকারী হউন, ক্ষতি নাই। কপিলসূত্রের মধ্যে, সৎ-নীতির এত প্রাচুর্য্য যে, তত নীতি, কোন আস্তিক পুস্তকে আছে কি না সন্দেহ। "অহং ব্রহ্মে" না আছে ঈশ্বর-সম্মান, আর না আছে, নীতি—হিতশিক্ষা। আছে, কেবল স্বেচ্ছাচারিতা। এমন অবস্থায়, ভারতের পক্ষে, এক জন সাম্যবাদীর নিতান্ত প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। রামমোহন রায়, সেই সাম্যের নায়ক।

তাঁহার কৃত বেদান্ত ভাষ্য (অনূদিত ব্যাখ্যান গ্রন্থ), কেবল বেদ বা জ্ঞান কাণ্ডের ভৃত্য নয়, তাহার মধ্যে গম্ভীর যুক্তি প্রকাশিত। আমরা, পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকার গৌতম—কণাদের মত, দ্বৈতবাদ-সম্মত। তাহা এবং পতঞ্জলির মত, এবং স্থলবিশেষে যথাস্থানে আমাদের অভিপ্রায় যাদৃশ প্রকটিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এত কাল অভিলাষানুরূপ সুব্যক্ত ফল প্রসূত হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইয়াছে। তিনি বলেন, জীব, ব্রহ্ম ও জগতে পার্থক্য বিলক্ষণ আছে।—"সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" কি, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ঈশ্বর ব্যাপকতার দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ, ঈশা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কথোপকথনকালে আপনাদিগকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম,—বক্তারা ঈশ্বর-ভাবে গদ্‌গদ হইয়া ঈশ্বরের আবির্ভাব, নিজ অন্তরে অনুভব করিয়া থাকেন, এ প্রযুক্ত ঐরূপ উক্তি। তাঁহারা কদাচ দেহ-বিশিষ্ট ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার নহেন। এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে,—জীব, অন্য পদার্থ, বা জগৎ কেহই ব্রহ্ম নন, অদ্বৈত-মত-প্রতিপাদক শাস্ত্রেরও এই ভাবার্থ। রামমোহন রায়ের এই প্রশংসনীয় মত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তদানীং সাদরে গৃহীত হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অদ্বৈতবাদের প্রাদুর্ভাব যে অনেকাংশে হ্রাস হয়, রাজা রামমোহন রায় কেবল তাহার হেতু।*

যুক্তিমাত্রকে আশ্রয় লইলে, দুই চারি কথায় এই প্রস্তাবের মীমাংসা হইয়া যাইত। আমরা কেবল বেদবেদান্ত-মান্যকারীদিগের মনস্তুষ্টির কারণ শাস্ত্রের দোহাই দিবার জন্য, বেদসংহিতা ও উপনিষৎ হইতে, প্রমাণ উল্লেখ করিলাম না; প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত-অনুশীলনে তত্ত্বের উপযোগিতা কত কার্য্যকারী, তাহা প্রদর্শন করা, এই প্রবন্ধের প্রথম বা মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই প্রস্তাবে, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে লেখকের বিশ্বাস অতি অল্প, অথবা কিছুই নাই।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।

* রামমোহন রায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উক্তরূপ যুক্তিমার্গ ধরিয়া তর্কযুদ্ধে জয়ী হন। বিচারের পর, কথিত আছে, তিনি 'শঙ্কর-বেদীতে' বসিবার অধিকার পান।

পিকিন হইতে কাণ্টন পর্য্যন্ত।

(অথবা কোন আইরিস ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত।)

আমাদিগের ভ্রমণকারী ব্রহ্মদেশ হইতে পিচিলি উপসাগরে পৌঁছিলেন; তৎপরে পিহুনদীর মুখপ্রান্তের চর বহিয়া টাকুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পিহু নদী দিয়া যাইতে যাইতে কতিপয় চীন-রমণীর সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ ঘটিল; রমণীগণ নদীধারে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকেই দেখিতেছিল। এই রমণীগণের ক্ষুদ্রপাদদেশ দেখিবামাত্র তাঁহারা চিনিতে পারিলেন ইহারা চীন-রমণী। চীনে সমস্ত ভদ্রমহিলার চরণ-দেশ ক্ষুদ্রতর; কেবল অতি দরিদ্র ও ও নীচজাতীয় রমণীগণের সেরূপ নহে। এজন্য চীনে পাদদেশ বড় হওয়া অভদ্র ও দরিদ্রের চিহ্ন বলিয়া গণনীয় হয়।

টাকুর ঘাটে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা একটী প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। সেই প্রান্তর পারে পিকিন সহর। অতি ক্ষুদ্র ও নীচু দুই চাকার এক খানি গাড়ি ভাড়া করিয়া অতি কষ্টে সৃষ্টে তাঁহারা পিকিনের দ্বারদেশে পৌঁছিলেন। সহর দেখিবার জন্য যুগপৎ আনন্দ ও কৌতুহলে তাঁহাদিগের হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া একান্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কোন খানে তাঁহারা এতদুর জনতা দেখেন নাই। একদা জনতার কোলা-হলে তাঁহাদিগের শ্রবণ বধির হইয়া গেল। কারণ পৃথিবীর আর কোন সহরের লোক-সংখ্যা এত অধিক নহে। এস্থানে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস।

সহর দুই ভাগে বিভক্ত—একের নাম চীনপল্লী, অন্যতরের নাম তাতারপল্লী। পূর্ব্বে এই দুই ভাগ দুইটী বিভিন্ন নগর বলিয়া গৃহীত হইত, কারণ ইহাদিগের মধ্যদেশে একটী বৃহৎ প্রাচীর ছিল। সেই প্রাচীরের এখন ভগ্নাবস্থা; ক্রমে পড়িয়া যাইতেছে। চীন পল্লীর প্রসর প্রায় নয়বর্গ মাইল এবং তাতার পল্লীর পরিমাণ চৌদ্দ বর্গমাইল হইবে।

সহরের মধ্যদেশ দিয়া আড়াআড়ি দুইটী বৃহৎ রাজপথ গিয়াছে। ইহা-দিগের দৈর্ঘ্য পরিমাণে ৪ মাইল এবং প্রসর ১২৩ ফিট হইবে। অপরাপর রাস্তা অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য। তাহা-দিগকে গলি বলিলেই ঠিক হয়। কোন রাস্তাই পাকা নয়; সকলই বালু ও ধূলীময় কিন্তু সর্ব্বদাই পরিস্কৃত ও বারি-সিক্ত রাখা হয়। বড় দুইটী রাজপথের ধারে ধারে অসংখ্য বিপণি-শ্রেণী। এই ব্যবসায় গৃহ সমুদয় অতি সুসজ্জিত ও পরিপাটী হওয়াতে রাজপথকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। বিপণির বহির্দ্দেশে অনেক পণ্য দ্রব্যাদি সজ্জিত রাখা হয়।

প্রতি দোকানের সম্মুখে একটী করিয়া দারুনির্ম্মিত সুন্দর স্থান আছে, সেই থানে এক এক কাষ্ঠ-ফলকে ব্যবসায়ীর নাম ও পণ্যদ্রব্যের বিবরণ স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে এবং তাহার শিরোদেশে নানাবর্ণের পতাকা উড্ডীন হইয়া বিপণির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। দেখিলে অনুমান হয় যেন সমস্ত নগরময় সৈনিকাবাস সংস্থাপিত রহিয়াছে।

অন্যান্য পথধারে দোকান পসার কিছুই নাই। এজন্য সে পথের শোভাও নাই। লোকের আবাস-গৃহ ঐ দুই বৃহৎ রাজ-পথ হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা রাজ-পথ হইতে একটু অন্তরে স্থিত। রাজপথ হইতে একত্রে প্রতি গৃহের এক একটী প্রাচীর মাত্র দেখা যায়। কারণ এই সকল গৃহের দ্বারদেশ পশ্চাদ্‌ভাগে। রাজপথের দিকে কেবল একটী দেওয়াল দেওয়া থাকে। এই প্রাচীর-পার্শ্বে উঠান, উঠানের পর গৃহ-শ্রেণী এবং সেই দেল দিয়া এই গৃহশ্রেণী মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। চীনদিগের গৃহগঠন-প্রণালী যখন আমাদিগের গঠন প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন অবশ্য বলিতে হইবে এই প্রাচীরই তাহাদিগের গৃহের পশ্চাদ্দেশ। এই প্রাচীর সমান উঠিয়াছে, উহাতে কোন গবাক্ষ অথবা জানালা দরজা সন্নিবেশিত নাই। অতএব রাজপথ হইতে দেখিলে তুমি আর কিছুই দেখিতে পাইবে না, কেবল উচ্চ উচ্চ প্রাচীর-শ্রেণী দণ্ডায়মান আছে।

উল্লিখিত রাজপথে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে স্থানে স্থানে দুই একটী অতি সুন্দর ও সুশোভনীয় অট্টালিকা দেখিতে পাইবে। এই হর্ম্ম্যাবলি নগরীর সাধারণ গৃহ। *এই সমস্ত গৃহ কোন প্রয়োজনে* আইসে না; কেবল শোভার্থ, আশ্চর্য্য ঘটনা অথবা প্রতিপক্ষ জনগণের মরণার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। চীনে কোন মুদ্রা প্রচলিত নাই। কেবল খাঁটি রূপার চাক্তি মাত্র মুদ্রারূপে প্রচলিত আছে। এই সমস্ত চাক্তি নানা আকারের হইলেও ইহাদিগের ওজন ও মূল্য সমান। পিকিন সহর দিল্লীর মত প্রাকার-বেষ্টিত। যে প্রাচীর ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা উর্দ্ধে প্রায় চল্লিশ ফিট হইবে। ইহার ভিত্তি প্রায় ২২শ ফিট এবং শির প্রায় ১২শ ফিট হওয়াতে ইহার দুই পার্শ্ব ক্রমে নিম্ন হইয়া গিয়াছে। সহরের অভ্যন্তরে এই প্রাচীরের পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে এক একটী অত্যুচ্চ মন্দির চৌকি স্বরূপ নির্ম্মিত আছে। বহির্দ্দেশে প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া বরাবর একটী বৃহৎ খাত খনিত হইয়াছে। এইরূপে গড়বদ্ধ থাকাতে চীনেরা মনে করে তাহাদিগের রাজধানী অভেদ্য কবচে বেষ্টিত আছে।

সহরের বাহ্য বেশ এক প্রকার অবলোকন করিয়া আমাদিগের ভ্রমণ-কারীর রাজবাটী দেখিতে ইচ্ছা হইল। সম্রাটের অনেক গুলি রাজবাটী আছে। সহরের মধ্যে একটী, এবং দেশের রমনীয় স্থানে স্থানে অন্য অন্য রাজবাটী

স্থাপিত আছে। রাজধানীর রাজবাটী সংবের প্রাচীর মধ্যেই অবস্থিত। এই রাজবাটীর সঙ্গে অনেক গুলি ক্রীড়া-ভূমি আছে। এই ক্রীড়া-ভূমি ও রাজবাটী একটি ক্ষুদ্র পীত বর্ণের প্রাচীর-বেষ্টিতা। এই প্রাচীরের শিরোদেশ পীতবর্ণের টাইলে আচ্ছাদিত বলিয়া ইহাদিগকে পীতবর্ণ প্রাচীর কহে। এই সমস্ত টাইল চিক্কণীকৃত হওয়াতে দূর হইতে রৌদ্রাভায় সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলিত দেখায়। এই পীত প্রাচীর প্রায় একবর্গ মাইল ভূমি বেষ্টন করিয়া আছে। তন্মধ্যে কত কৃত্রিম সরিৎ ও পাহাড় সংরচিত আছে। কৃত্রিম সরিৎ সমূহে নল দ্বারা বারি বাহিত হয়। কৃত্রিম পাহাড় মৃত্তিকাময় এবং নানাবিধ তৃণ-পুষ্প-আচ্ছাদিত ও সুন্দর-কুটীর-শোভিত। কৃত্রিম সরিতের মধ্যে মধ্যে দ্বীপ আছে। বাস্তবিক এই নাগরিক রাজবাটী অতি রমনীয় দেশ। সম্রাটের এই রূপ রাজবাটী রাজধানীর বাহিরে আর একটি মাত্র আছে। অপরাপর রাজবাটী এবম্বিধ নহে। তাহা অন্য প্রকারে সংরচিত এবং অন্য শোভায় শোভিত।

সম্রাট্ এখন জিহুলের রাজবাটীতে অবস্থিত ছিলেন। জিহুল একটী পার্ব্বতীয় উপত্যকা দেশ। এবং পিকিন হইতে প্রায় সপ্তাহের পথ অন্তর। ইহা চীনের এক প্রান্তদেশে তাতার রাজ্যের উপকণ্ঠে স্থিত।

ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি আমাদিগের ভ্রমণকারীকে রাজ দর্শন করাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই জন্য তিনি মহা রাজাকে সম্বাদ পাঠাইয়া একদা প্রাতঃ-কালে এক খানি ইংরাজী চারি ঘোড়ার গাড়ীতে কতিপয় চীন ভদ্রলোক ও ভৃত্যাদির সহিত জিহুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই গাড়ি দেখিয়া পথে সকলেই তাকাইয়া রহিল। কথিত আছে ব্রিটিশ রাজ একবার মহামূল্যের এক-খানি সুন্দর ইংরাজী রাজকীয় গাড়ী সম্রাটকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। কিন্তু চীনে তাহা প্রেরিত হইলে দৃষ্ট হইল তাহার কোচবাক্স সম্রাটের বসিবার স্থান হইতে উচ্চতর। এজন্য সমুদায় রাজকর্ম্মচারী তাহা উপঢৌকনের অনুপযুক্ত বিবেচনা করাতে তাহা আর উপহাররূপে প্রদত্ত হয় নাই।

সম্রাট্ পূর্ব্বেই সম্বাদ পাঠাইলেন যে পথধারে অনেক রাজপ্রাসাদ আছে, আবশ্যক ও ইচ্ছা হইলে ইংরাজগণ তন্মধ্যে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং আমাদিগের ভ্রমণকারী ও তৎ-সহচর-বর্গের কোন কষ্ট হয় নাই। যাইতে যাইতে রাজপ্রতিনিধি অনেক চীন ভদ্রলোককে গাড়িতে চড়াইয়া লইতেন। তাহারা আগ্রহের সহিত উঠিয়া পাছে তাহা উল্টাইয়া পড়ে' বলিয়া এরূপ সঙ্কুচিত ও ভীত হইত যে তাহাদিগের ভাব দেখিয়া আমাদিগের ভ্রমণকারী রাজ-প্রতিনিধির প্রতি চাহিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারেন নাই।

চতুর্থ দিবসে ভ্রমণকারী সুবিখ্যাত চীন প্রাচীর দেখিতে পাইলেন। এই প্রাচীর প্রায় সার্দ্ধ সহস্র মাইল বিস্তৃত। ইহা পর্ব্বত, উপত্যকা নদী এবং সর্ব্বপ্রকার ভূমির উপর দিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে। দূর হইতে ইহা একটি রেখা রূপে প্রতীত হইল। উপত্যকা হইতে ইহার উচ্চতা স্থানে স্থানে ৩০শ ফিট পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। পর্ব্বতের পার্শ্বে ইহা উর্দ্ধে অন্যূন বিশ ফিট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কোন খানে ইহা উঠিয়াছে, কোন খানে নামিয়াছে, কোন স্থলে নদীর খিলানের উপর অবস্থিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুর্গ-মন্দির সকল নির্ম্মিত আছে; এবং প্রসর দ্বিগুণিত ও ত্রিগুণিত করা হইয়াছে। যুদ্ধকালে এই সমস্ত দুর্গমন্দিরে সৈন্যের সমাবেশ হয়।

ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি যেখানে গেলেন সেই স্থলেই তাঁহাকে উপযুক্ত সৈনিক-সম্মান প্রদত্ত হইয়াছিল। তাতার-উপকণ্ঠস্থিত পর্ব্বতীয় দেশে আমাদিগের ভ্রমণকারী এক প্রকার বহুরূপী খরগোশ দেখিতে পাইলেন। ইহারা শীত ঋতুতে শ্বেতবর্ণ হইয়া যায় এবং গ্রীষ্মকালে আবার স্বাভাবিক পিঙ্গল বর্ণ হইয়া পড়ে।

সপ্তম দিবসে আমাদিগের ভ্রমণকারী জিহুল সম্মুখে উপনীত হইলেন। জিহুল উপত্যকা দেশের মধ্যস্থলে জিহুল নামক ক্ষুদ্র নগর এবং সেই নগরের উপকণ্ঠে রাজবাটী ও ক্রীড়াভূমি। ঐ রাজবাটীর নাম "সুখের শীতল নিকেতন" এবং ক্রীড়া-ভূমির নাম "অযুত বৃক্ষ কানন"। সম্রাট এই কাননের কোন উচ্চদেশ হইতে সামান্য বেশে আমাদিগের ভ্রমণ-কারী ও রাজপ্রতিনিধিকে আসিতে দেখিতে ছিলেন। তজ্জন্য রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রতীক্ষা করেন নাই। কতিপয় অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ আসিয়া যথোচিত প্রত্যুৎগমন-পুরঃসর দর্শকগণকে লইয়া গেলেন। অশ্বা-রোহীরা পীতবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত, এমত কি তাহাদিগের উষ্ণীশ পর্য্যন্ত পীতবর্ণের; চীনেরা পীতবর্ণের বড় প্রিয়।

জিহুল নগরীর সন্নিকটেই দর্শকগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাজ-দর্শকের জন্য দিন স্থির হইল। তজ্জন্য সম্রাটের সেই "অযুত-বৃক্ষকানন' দেশই সজ্জীভূত হইল; কারণ সেই স্থানেই তিনি দর্শকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। পটমণ্ডপ সন্নিবেশিত হইল, আহারীয় সমস্ত আয়োজন হইল এবং অতি প্রত্যূষে সম্রাট্ আগমন করিলেন। চীনে প্রত্যূষেই রাজদরবারের সময়।

অরুণোদয়ের প্রাক্কালে আমাদিগের ভ্রমণকারী ও ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি রাজ দর্শনার্থ যাত্রা করলেন। গিয়া দেখিলেন, পটমণ্ডপ অতি প্রশস্ত, রাজসভা অতি পরিপাটী। এক দিকে রাজসিংহাসন, অপর দিকে তাতার রাজ-বংশধরগণের বসিবার স্থান এবং সম্মুখে দর্শকগণের আসন সুসজ্জিত রহিয়াছে।

সূর্য্যোদয় হইবা মাত্র নানাবিধ তুরী ভেরী ও বাজনা বাজিয়া উঠিল। এমত সময় দূর হইতে কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল এবং সম্বাদ আসিল, সম্রাট্ আগত প্রায়। অমনি দেখা গেল, সারি সারি অনেক লোক রাজবাটী হইতে নামিয়া আসিতেছেন; কারণ রাজবাটী অতি উচ্চদেশে সংস্থিত ছিল। দেশীয় রীত্যনুসারে অগ্রে নকিবেরা মহারাজার জয়ধ্বনি ও প্রশংসা রব তুলিয়াছে। পশ্চাতে রক্ষিবর্গ, বাদ্যকর, ভৃত্যগণ, এবং আর কয়েক জনে নিশান উড়াইয়া আসিতেছে। মধ্যে সম্রাট্ এক অনাবৃত অথচ সুসজ্জিত ষোড়শবাহন-বাহিত শিবীরথে চড়িয়া আসিতেছেন। তাহার দেহ স্বদেশীয় কৃষ্ণবর্ণ পট্ট-পরিচ্ছদে আবৃত এবং শিরোমণিভূষিত মকমলের তাজ।

সম্রাট্ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, সভ্য জনগণ যথা স্থানে নিজ নিজ আসন পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে একজন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি ও ভ্রমণকারীকে রাজসমীপে লইয়া গেলেন। রাজ-প্রতিনিধির সহিত কিয়ৎক্ষণ সম্ভাষণ হইল, তৎপরে উপহার প্রদত্ত হইল। অনন্তর রাজ-প্রতিনিধি ও ভ্রমণকারী নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ভোজন-সামগ্রী আনীত হইতে লাগিল। নিজে সম্রাটও ভোজনে বসিলেন, মধ্যে মধ্যে কোন কোন সামগ্রী রাজ-প্রতিনিধিকে দিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই অতি নীরবে স্থির হইয়া *ভোজন পান করিতে লাগিল।* কথা মাত্র নাই। পান ভোজন শেষ হইলে চীনসম্রাট্ গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত রীত্যনুসারে প্রস্থান করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

রাজ-প্রতিনিধি জিম্বলবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, সম্রাটের নিকট হইতে কতিপয় চীন পট্টবস্ত্র, বাসন এবং অনেক চা উপহার পাইয়া ছিলেন। তৎপরে আমাদিগের ভ্রমণকারীর সহিত তিনি পুনরায় পিকেন যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ।)

সোম-যাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনন্তর মণ্ডপের মধ্যে সমান চারিটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার আগ্নেয় (অগ্নিকোণ স্থিত) প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে হস্ত প্রমাণ সমচতুরস্র (স্কোয়ার) রেখা কল্পনা করিয়া প্রত্যেক কোণের প্রান্ত প্রদেশে বিস্তারে অর্দ্ধ হস্ত এবং গভীরতায় এক হস্ত এরূপ চারিটী গর্ত্ত করা হয়। গর্ত্তের মুখে বরুণ কাষ্ঠ অথবা যজ্ঞডুম্বুর

কাষ্ঠের ৪ খানি ফলক দ্বারা পুটিত অর্থাৎ আবদ্ধ করিয়া তদুপরি বৃষচর্ম্ম, তদুপরি শিলাপট্ট (পাথরের পাটা) রাখা হয়। তাহাতেই রস নিষ্কাষণের নিমিত্ত সোম পেষণ করা হইয়া থাকে।

"হবির্ধান" মণ্ডপের সম্মুখে "পৃষ্ঠ্যা" নামক স্থানের দক্ষিণে "হবির্ধান" মণ্ডপের ন্যায় "সদোমণ্ডপ" রচনা করা হইয়া থাকে। এই মণ্ডপ দশ অরত্নি প্রমাণ পূর্ব্বায়ত, নয় অরত্নি দীর্ঘ, চতুরস্র, শুভ্র সুশোভিত এবং সুপরিষ্কৃত করা হয়। এতাদৃশ সদোমণ্ডপের ঠিক মধ্যস্থলে যজমানের তুল্য প্রমাণ একটী ঔদম্বরী স্থূলা (যজ্ঞডম্বুর কাষ্ঠের খোঁটা) প্রোথিত করা হইয়া থাকে। পশ্চাৎ আগ্নিধ্রশালার নির্ম্মাণ এবং তাহা সদোমণ্ডপ ও হবির্ধান মণ্ডপ এই দুয়ের উত্তর ভাগেই হইয়া থাকে। ইহার আয়তন ও বিস্তারাদি প্রায় পূর্ব্বের মত। পূর্ব্ব পশ্চিম দীর্ঘা ইহার এক অর্দ্ধাংশ বেদীর প্রান্ত প্রদেশে প্রবিষ্ট এবং অপর অর্দ্ধাংশ বেদীর বাহিরে নিঃসৃত থাকে। ইহার দুইটী দ্বার থাকে, দক্ষিণ দিকে একটী ও পূর্ব্বদিকে একটী।

উল্লিখিত সদোমাণ্ডপে যে আগ্নিধ্রশালায় মৃত্তিকা ও কাঁকরের হস্ত প্রমাণ যে সকল বেদী নির্ম্মাণ করা হয়, যাজ্ঞিকগণ সে গুলিকে "ধিষ্ণ্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আগ্নিধ্রশালার দুইটী "ধিষ্ণ্য" অর্থাৎ দক্ষিণ ভাগে একটী (ইহার নাম মার্জ্জালীয়) উত্তর ভাগে একটী (ইহার নাম আগ্নিধ্রীয়) অপিচ হোতার ১, মৈত্রাবরুণের ১, প্রশাস্তার ১, ব্রাহ্মনাচ্ছংশীর ১, পোতার ১, নেষ্টার ১, এবং আচ্ছাবাকের ১, এই সাতটী ধিষ্ণ্য সদোমণ্ডপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

মহাবেদীর সম্মুখ ভাগে এবং আহ্বনীয় কুণ্ডের সন্নিকটে যজ্ঞীয় যূপস্তম্ভ উচ্ছ্রিত করা হয়। *

মহাবেদী নির্ম্মাণ সমাধা হইলে, বৈসর্জন নামক হোমের পরে "অগ্নিষ্টোমীয়" পশুযাগের প্রারম্ভ। এই যাগটী সোম যাগের পূর্ব্বাঙ্গ। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রাগ্বংশশালায় উত্তর বেদীস্থিত সোমলতা সকল আনীত হইয়া হবির্ধান মণ্ডপে স্থাপিত করা হয়। পরে যাজ্ঞীয় পশুটীকে পবিত্র জলে স্নান করাইয়া যূপের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে স্থাপন করতঃ কুশ পিঞ্জীলযুক্ত প্লক্ষ শাখার দ্বারা উপাকরণ অর্থাৎ মন্ত্রপূত করা হয়। এই উপাকরণ কার্য্য হইলে সংজ্ঞপন অর্থাৎ বধ করা পর্য্যন্ত ক্রিয়া কলাপের নাম পশ্বালম্ভন।

জাতদন্ত, অবিকৃতাঙ্গ, রোগ শূন্য এবং বিশেষরূপে পুষ্ট এতাদৃশ ছাগ পশুই যজ্ঞ কার্য্যে গৃহীত হইত।

* যজ্ঞীয় যূপ সকল অষ্টাস্রী অর্থাৎ আট পোয়ালে করা হইত। যজ্ঞবিশেষে ইহার উচ্চতার তারতম্য আছে। সোম যাগে যূপের উচ্চতা পঞ্চ অরত্নি হইতে পঞ্চদশ অরত্নি পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। খদির কাষ্ঠ হইলে ভাল হয়, অভাবে পলাশ কাষ্ঠ।

কথিত প্রকারের পশু যখন বধ্য স্থানে নীত হয়, ঋত্বিকেরা তখন উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র গান করিতে থাকেন। সেই গীয়মান মন্ত্রের অর্থ এই রূপ———

"হে বিস্তীর্ণ ইন্দ্রিয়-সমূহ! এই পশুর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত অর্থাৎ প্রাণবায়ু প্রভৃতি এবং জীবাত্মার সহিত তোমরা আমাদের "হবি" অর্থাৎ হোম দ্রব্য প্রদান কর। পশ্চাৎ এই পশুর ভবিষ্যৎ-দেব-শরীরের সহিত সংযুক্ত হও।" সংজ্ঞপন * কার্য্য সমাধা হইলে তাহার নিম্ন লিখিত অঙ্গ সকল উৎকর্ত্তন করিয়া লইয়া "শামিত্র" নামক অগ্নিকুণ্ডে তাহা পাক করিয়া মন্ত্র গান করতঃ আহুতি প্রদান করা হইত। হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয়, বাম হস্ত, পার্শ্বদ্বয়, দক্ষিণশ্রোণী, পায়ুনাম, বপন, এবং বসা প্রভৃতি আরও কএকটী অঙ্গ ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা হোম করিতে হইত। এতদন্ত কার্য্য-কলাপের নাম "অগ্নিষ্টোমীয়" পশু-যাগ।

ইহার পরে পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা চাত্বান ও উৎকর ভুমির উত্তর ভাগে অবস্থিত বহমান জলাশয় হইতে জল আহরণ করিয়া যজ্ঞশালায় স্থাপন করেন। এই আহৃত জলের বৈদিক নাম "বসতীবরী"। এই দিবসের রাত্রিতে যজমান জাগরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট নানা প্রকার পুরাতন ইতিহাস ও দেবচরিত্র শ্রবণ করিয়া থাকেন; সেই কারণেই এই দিনের নাম "উপবসথ।"

তৎপর দিবসের নাম "সুত্যাদিবস।" তদ্দিনের প্রাতে অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া এই দিবসের বৈধ কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। * যথা———

হবির্ধান শকট হইতে সোম আহরণ করিয়া উপবর স্থলে স্থাপিত করা হয়। অধ্বর্য্যু অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হোতাকে "প্রেষ মন্ত্রে" উদ্বুদ্ধ করেন। হোতাও প্রাতরনুবাক পাঠ করতঃ অশ্বিনী-

* যে কোন ব্যক্তি সংজ্ঞপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। খড়্গের একাঘাতে যেমন পশু-বধ করার প্রথা প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে বিনাশ করা হইত। তাদৃশ প্রকার বিনাশ করার নাম "সংজ্ঞপন"।

* আমরা সোমলতা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ঐতিহাসিক রহস্য ২য় ভাগের বেদ প্রস্তাবে লিখিয়াছি। তাহাই এক্ষণে কোন কোন যশো-লুব্ধ ব্যক্তি অবিকল বা কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়া প্রস্তাবে বা গ্রন্থান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা স্পষ্ট লিখিতেছি যে, সোমলতা সম্বন্ধীয় যে সকল বৈদিক প্রমাণাদি আমাদিগের বেদ-প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে সে গুলি পূর্ব্বে ইউরোপীয় পণ্ডিত বা বঙ্গদেশীয় কোন ব্যক্তির গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় নাই।

সোমলতা—যাহা এক্ষণে যজ্ঞ-কার্য্যে ব্যবহার হয় তাহা Asclepias acida of Roxburgh. মিসেস্ ম্যানিং কহেন ইহার আকৃতি লতা বাঁসের ন্যায় এবং স্বগ্রন্থে ইহার এক প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে Sarcostema viminatis বলেন। ইহা "হাড়যোড়া" গাছের ন্যায় ডাঁটা বিশিষ্ট এবং অল্প স্বল্প পত্রযুক্ত। ইহার পুষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ এবং সুগন্ধযুক্ত। রক্সবর্গ কহেন

কুমারকে স্তব করিতে থাকেন। আগ্নিধ্র পুরোডাশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। উন্নেতা সোম-পাত্র সকল সজ্জিত করিতে থাকেন। *

অনন্তর হবির্ধান শকটের অক্ষ প্রদেশে দুই খানি ঊর্ণ বস্ত্র অর্থাৎ মেষ-লোম-রচিত কম্বল, সোম-রস শোধনের (ছাঁকিবার) জন্য স্থাপনা করা হয়। তাহার এক খানি প্রাদেশ পরিমাণ এবং দ্বিতীয় খানি অরত্নি-পরিমাণ।

অপিচ দক্ষিণ হবির্ধান শকটের নিম্নে মৃণ্ময় দ্রোণ কলস স্থাপনা করা হয়। এবং উত্তর হবির্ধান শকটের উপরে অন্য দুইটী বৃহৎ কলস; তাহার একটীর নাম উপভৃত এবং অপরটীর নাম আধবনীয়। পুনরপি উত্তর শকটের নিম্নে ১০ খানি কাষ্ঠময় চমস এবং মৃণ্ময় ৫টী ঘট রক্ষা করা হয়। এই সমস্ত কার্য্য উন্নেতাই করিয়া থাকেন।

অনন্তর অধ্বর্য্যুর অনুজ্ঞা ক্রমে যজমান পত্নী এবং চমসাধ্বর্য্যু উল্লিখিত ঘট দ্বারা জল আহরণ করেন। পুরুষেরা যে জল আনয়ন করে, তাহার নাম "একধন" এবং পত্নী যাহা আনয়ন করেন তাহার নাম "পান্নেজল"। অধ্বর্য্যু এই দুই প্রকার জল পূর্ব্বোক্ত বসতীবরী জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লন। পরে যজমান, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, এবং অধ্বর্য্যু এই কএক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া সোম পেষণের শিলাপট্টের নিকটে উপবিষ্ট এবং হস্তে উপলখণ্ড (পাথরের লোড়া) ধারণ করিয়া বাক্য সংযম করিয়া থাকেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রথমে অধ্বর্য্যু পাঁচ মুষ্টি সোম সেই পেষণ-ফলকে স্থাপনা করিলে, প্রতিপ্রস্থাতা তন্মধ্য হইতে ছয়গাছি সোমতন্তু উঠাইয়া লইয়া তিন অঙ্গুলির সন্ধিতে দুইগাছি করিয়া ধারণ করেন। পশ্চাৎ সেই সকল সোমের পেষণ আরম্ভ হয়। এই প্রকারে সোম পেষণ করার নাম সোমাভিষব। ইহা প্রত্যেক দিনে ৩ বার করা হইয়া থাকে। প্রাতে প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্নসবন, সায়াহ্নে সায়ংসবন।

প্রাতঃসবনের সোমরস সূর্য্যকে আহুতি দেওয়া হয়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ৬ কাণ্ডের ৪ প্রপাঠকের ৫ অনুবাকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সবনে হস্ত দ্বারা সোমরস গৃহীত হইয়া সোমীয় অংশু দ্বারা পবিত্র করিবার বিধি আছে *।

ইহার ডাঁটায় দুগ্ধ নির্গত হয় এবং তাহার আস্বাদ ঈষৎ অম্ল। ইহা পঞ্জাবের স্থান বিশেষে, বোলন পাশে, পুনা এবং চোল মণ্ডলে জন্মিয়া থাকে। আমরা সত্বরেই ইহার একটী সজীব লতা পুনা হইতে প্রাপ্ত হইব।

* সোম পাত্র দুই প্রকার। গ্রহ ও স্থালী। গ্রহ গুলি কাষ্ঠ-রচিত এবং স্থালী গুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত। দুই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত করিবার বিধি আছে।

* "কস্মাৎ সত্যাৎ এবং পশূনাং হন্তাদানাঃ সেই বিধি মন্ত্রটী এই—পুরুষো হন্তা মর্কটঃ" ইতি। এই মন্ত্রে পুরুষের পশুত্ব উক্তি থাকায় এবং "ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণ মালভেৎ" এই ব্রাহ্মণ বাক্যে স্পষ্টরূপে ব্রাহ্মণালম্ভনের বিধি থাকায় জানা যাইতেছে যে, অতি প্রাচীন কালে নরমেধ যজ্ঞ করা হইত। ঋগ্বেদের শুনঃশেপ উপাখ্যানেও মনুষ্য-বধ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা আছে।

আহুতির উপযুক্ত সোমাভিষব সমাপ্ত হইলে পুরোহিতগণ দ্বারা তখন একটা মহাভিষব অর্থাৎ ভূয়ঃ পরিমাণে সোম পেষণ করা আরম্ভ হয়। প্রতি-প্রস্থাতা প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া পিষিতে থাকে, অধ্বর্য্যু তাহাতে জলসিঞ্চন করিতে থাকেন। উত্তমরূপে পেষণ করা হইলে, তাহা আধবনীয় কলসে ফেলিয়া আলোড়ন করিয়া পরে তাহা বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া লওয়া হয়। সেই রস ক্রমে "গ্রহ" "চমস' ও কলসে পূর্ণ করা হয়। নানা-প্রকার মন্ত্র ও স্তুতি পাঠ হয়। এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হইয়া থাকে।

সোম-যাগের দেবতা—সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনী-কুমার, বিশ্বদেব, ইন্দ্র, মহেন্দ্র, বৈশ্বানরাগ্নি, চৈত্রাদি চতুর্দ্দশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা * ইন্দ্রাগ্নি মরুদ্গণ সহিত ইন্দ্র, ত্বষ্টৃ সহিত অগ্নিপত্নী স্বাহা বা অগ্নায়ী।

এবম্প্রকারে অনুষ্ঠানের পর পুরোহিতেরা এবং যজমান সোমরস পানে আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। †

পুরোহিত ও যজমানের সোম-পান প্রভেদ এই যে, পুরোহিতেরা প্রত্যেক সবনেই অবশিষ্ট সোম-পান করিতেন; যজমান কেবল সায়ং সবনে পান করিতেন।

যাগ সমাপ্ত হইলে যজমান পূর্ব্বোল্লিখিত সদোমণ্ডপে গিয়া পুরোহিতগণকে দক্ষিণা দান করিতেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দক্ষিণা বিভাগ ক্রমে ১২০০ দ্বাদশ শত গাভী *, সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ, মেষ, ছাগ, অন্ন, যব ও মাসকলায় দিবার বিধি আছে।

যে যে পুরোহিতকে যে যে প্রকার দক্ষিণা দানের বিধি আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

ব্রহ্মাকে ১২ টী (গাভী) কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবর্ণ ইত্যাদি।

উদ্গাতাকে ঐ ঐ

হোতাকে ঐ ঐ

অধ্বর্য্যুকে ঐ ঐ

ব্রহ্মণাচ্ছংসীকে ৯ টী (গাভী) ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবর্ণ প্রভৃতি।

প্রস্তোতাকে ঐ ঐ

মৈত্রাবরুণকে ঐ ঐ

প্রতিপ্রস্থাতাকে ঐ ঐ

পোতাকে অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৬টী (গাভী) এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবর্ণ প্রভৃতি।

প্রতিহর্ত্তাকে ঐ ঐ

অচ্ছাবাককে ঐ ঐ

নেষ্টাকে ঐ ঐ

* প্রকৃত মাস দ্বাদশ এবং দুই প্রকার মলমাস। এইরূপে ১৪ মাসের গণনা। ইহার দ্বারা নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, বৈদিক সময়ে জ্যোতিষেরও উন্নতি হইয়াছিল।

† গোপথ ব্রাহ্মণের উত্তর-ভাগ-গত দ্বিতীয় প্রপাঠকে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি সঙ্কল্প অর্থাৎ "মাস্কন্ত প্রচরত প্রাতর্ব্বাবাহদ্যাহং সোমং সংস্থাপয়ামি" এই মন্ত্রার্থ স্মরণ রাখিয়া সোম পান করে "নাস্তি সৌমং স্কন্দতি" তাহার সোম ক্ষরিত হয় না। সোম-রস ভূমি-পতিত হইলে নাকি দোষ হইয়া থাকে।

* অভাবে শত গাভী, তদভাবে মূল্য দেওয়ার প্রথাও আছে।

অগ্নিধ্রকে, চারি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৩টী (গাভী) ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবর্ণ ইত্যাদি।

সুব্রহ্মণ্যকে	ঐ	ঐ
গ্রাবস্তুৎকে	ঐ	ঐ
উন্নেতাকে	ঐ	ঐ

অবশিষ্ট গো এবং হিরণ্যাদি অন্যান্য যজ্ঞ-কার্য্যের সাহায্যকারী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ চমসাধ্বর্য্যু ও সদস্য প্রভৃতিকে যথাশাস্ত্র বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

এই সময়ে অন্যান্য প্রার্থী অনাহূত ব্রাহ্মণ, অন্ধ, পঙ্গু, অনাথ, প্রভৃতি দীন দুঃখীকে অন্ন বস্ত্র ও সুবর্ণাদি (শক্ত্যনুসারে) বিতরণ করা হয়।

যজ্ঞ সমাপ্তির পর আর একটী কার্য্য আছে, তাহার নাম অবভৃত স্নান। এই স্নান-কার্য্যটী মহাসমারোহে সম্পন্ন করা হয়। পুরোহিত, বন্ধু, বান্ধব, সুহৃৎ এবং তাঁহাদের পত্নীবর্গ সকলে সমবেত হইয়া যজমানকে লইয়া স্নানার্থ কোন এক মহানদী পুণ্য জলাশয়ে গমন করিতে থাকেন। গমনকালে প্রস্তোতা নামক পুরোহিত অগ্রে অগ্রে সামগান করিতে করিতে যান, আর যজমান প্রভৃতি পুরুষেরা এবং তৎপত্নী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার নিধন বাক্য গাইতে থাকেন *। জল-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে অগ্রে একটা হোম করা হয়, পরে মহাসমারোহের সহিত জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। এই অবভৃত স্নানটী সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের অঙ্গ। এই স্নানে নাকি ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ অপনীত হইয়া থাকে।

ঋক প্রভৃতি সর্ব্ববেদীয় সাধারণ অংশ গ্রহণ করিয়া এই সোমযাগ প্রস্তাবটী প্রকাশ করা গেল। বস্তুতঃ প্রত্যেক শাখাধ্যায়ীদিগের সোমযাগানুষ্ঠান বিষয়ে কোন২ অংশে ইতর বিশেষ আছে, তাহা বিচক্ষণ পাঠকগণ বৌধায়নী অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি, সামবেদীয় অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি প্রভৃতি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

অপিচ এই প্রবন্ধ বিমল ভট্টের পুত্র ভট্ট যজ্ঞেশ্বর বিরচিত গ্রন্থ, গোপথ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ সংহিতা অধ্যাপক হোগ প্রকাশিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বিবিধ অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি, এবং ইংরাজী মিসেস ম্যানিং কৃত প্রাচীন ভারতবর্ষের বিবরণ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইল।

শ্রীরামদাস সেন।

---

* গানের প্রত্যেক পর্য্যায়ে যেটী সমানরূপে গীত হয়, সামগানের সেই ভাগকে নিধন বলে। বর্ত্তমান-কালিক লৌকিক গানের ধূয়া তাহারই পরিণাম। ইংরাজীতে ইহার নাম "কোরস্"।

রাজার ক্ষমতা কে দিল ?

রাজার ক্ষমতা কে দিল ? রাজশক্তির মূল কি ? এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা ইউরোপীয় ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে রক্তাক্ষরে সুব্যক্তরূপে লিখিত রহিয়াছে। সে মীমাংসা এই ঃ—**রাজক্ষমতা প্রজাদত্ত, প্রজাসাধারণই রাজশক্তির মূল, রাজা প্রজাবর্গের প্রতিনিধি ও সেবক।**

যাঁহারা সমাজতত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট এ উত্তর স্বতঃসিদ্ধ বোধ হইবে। রাজগণ যে প্রজাদিগের প্রতিফলিত আলোকে প্রভাশালী, রাজশক্তি যে প্রজাসমষ্টিরূপ মূল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, রাজক্ষমতা যে প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক, পরোক্ষভাবেই হউক প্রজা কর্ত্তৃক দত্ত, তাহা বুঝাইতে বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন করে না। যে দেশে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত সেখানেত রাজশক্তি স্পষ্টই প্রজাদিগের হস্তে ন্যস্ত, রাজকার্য্য প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রজাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে; যিনি সাধারণতন্ত্রের অধ্যক্ষ বা সভাপতি, যিনি বস্তুতঃ রাজস্থানীয়, তিনি ত প্রজাগণ কর্ত্তৃক সাক্ষাৎভাবে আপন পদে অভিষিক্ত হন, হইয়া নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আপন ক্ষমতা উপভোগ করেন, এবং কাল সমাপ্ত হইলে অপরের জন্য স্বপদ হইতে অবসৃত হয়েন। যত কেন নীচ-কুল-সম্ভূত হউন না, উপযুক্ত পাত্র হইলে যে কেহ তৎস্থান অধিকার করিতে পারেন। তন্তুবায় হউক, ক্ষৌরকার হউক বা চর্ম্মকারই হউক, জন-সাধারণের অনুমোদিত হইলেই যে কেহ রঘু বা পুরু, টিউডর বা হ্যাপ্সবর্গ, গুয়েল্‌ফ বা হোহেনজলারন প্রভৃতি জগৎ-পূজ্য কুলের নৃপতিবর্গের সমান অধিকার, সমান পদ, সমান মর্য্যাদা পাইতে পারে। প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কলন, আডামস্‌ বা টিয়র্স, রাজকুলোদ্ভব রাজা না হইয়াও ক্ষমতাংশে উইলিয়ম্‌ বা এলেক্‌জাণ্ডর বা বিক্টোরিয়ার ন্যূন কিসে ? প্রথম কন্সল নেপোলিয়ন্‌ হইতে সম্রাট্‌ নেপোলিয়নের প্রভেদ কি ? ফলতঃ মর্য্যাদা—এডাম্‌স, টিয়র্স, বিক্টোরিয়ার অথবা রাঘব, পৌরব বা গুয়েল্‌ফ বংশের নহে, কিন্তু ইহাঁদের যিনি যে জাতির প্রতিনিধি তাহার গৌরবানুসারে ইহাঁদিগের গৌরব। নাগা প্রদেশের সর্দ্দার ও রুষের জার উভয়েই সমান কুলীন, সমান স্বাধীন, স্বদেশমধ্যে উভয়েই সমান "পূজ্যতে," কিন্তু সেই কারণেই বৃটিষ সিংহ একের

নিকট সঙ্কুচিতলাঙ্গুল ও অপরের নিকট বিকট-দন্ত।

যেখানে রাজতন্ত্র প্রচলিত, পিতার পর পুত্র, তাহার পর তৎপুত্র এই রূপ পুরুষপরম্পরানুক্রমে এক নির্দ্দিষ্ট বংশ দেশের অধিপতি, সেখানেও রাজক্ষমতা প্রজাদত্ত। প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রে বিশেষ এই যে প্রথমোক্তটিতে শাসন-ভার প্রজাদিগের হস্তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ন্যস্ত, দ্বিতীয়টিতে পরোক্ষভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। শান্তির সময়ে ও সাধারণ অবস্থায় রাজা প্রজার এ সম্বন্ধ আমরা হঠাৎ উপলব্ধি করিতে পারি না। তখন রাজা প্রজা এ উভয়ের মধ্যে বিস্তর অন্তর লক্ষিত হয়; তখন এক জনকে জন সাধারণের অপেক্ষা এত উচ্চ ও এত অন্তরে স্থিত বোধ হয় যে উভয়কে বিভিন্ন লোকের অধিবাসী বলিয়া প্রতীতি জন্মে। দেবতা ও মনুষ্য, প্রভু ও দাস, সেবিত ও সেবক, বাহ্য ও বাহন এবং ভোক্তা ও ভোজ্যে যে সম্বন্ধ, রাজা ও প্রজার সেই রূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তদপেক্ষা নিকটতর সম্বন্ধ তাহাদিগের মধ্যে আছে বলিয়া সহজে বোধ হয় না।

রাজা প্রজার এই দূর সম্বন্ধ বিধাতা কর্ত্তৃক অপরিবর্ত্তনীয় রূপে বিহিত বোধ হয়। কারণ সমাজের নিয়ম কি?—কর্ত্তৃত্বভার এক নির্দ্দিষ্ট বংশের উপর ন্যস্ত, তাহাই কেবল দেশের উপর আধিপত্য করিবে। উত্তরাধিকারের যে ক্রম আছে কোন মতেই তাহার ব্যতিরেক হইবে না। দুগ্ধপোষ্য শিশুই হউক বা গলিতেন্দ্রিয় বৃদ্ধই হউক, অত্যাচারী নররাক্ষসই হউক বা কুসুম শরীরী বিলাসীই হউক, জড়বুদ্ধি স্ত্রীই হউক বা বিবেকবিহীন বালকই হউক, যে কেহ বর্ত্তমান রাজার উত্তরাধিকারী সেই তাহার পরে সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে; যে প্রজা, সে যত কেন বড় হউক না, যত কেন সদ্‌গুণবিভূষিত হউক না, কখনই রাজার বংশাবলী বর্ত্তমান থাকিতে রাজসিংহাসনের সম্মুখীনও হইতে পারিবে না। সুতরাং এই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, বিধাতৃবিহিত নির্দ্দেশ বলিয়া বোধ হয়। যে বিধাতা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সোপান-পরম্পরা স্থাপিত করিয়াছেন, যিনি ছোটকে ছোট, বড়কে বড় করিয়াছেন, তিনিই রাজাকে রাজা এবং প্রজাকে প্রজা করিয়াছেন। বাস্তবিক প্রাচীন শাস্ত্র সমূহে রাজাকে ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি ও দেবতার অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। মনুতে রাজাকে ঈশ্বর বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে:—

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্
সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য
রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥
ইন্দ্রানিলযমার্কাণা-
মগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব
মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥

* * * * *

*বালোঽপি নাবমন্তব্যো
মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতাহ্যেষা
নররূপেণ তিষ্ঠতি *॥

ভগবান্, প্রজাবর্গের রক্ষণার্থ ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এই কয়েক দেবতার অংশ লইয়া রাজাকে সৃজন করিয়াছেন। * * * বালক হইলেও রাজাকে মানুষ বলিয়া অবমাননা করিবে না, কেননা তিনি মানুষ নহেন, কোন মহাদেবতা নরাকার ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। শাস্ত্রে আরও বলে দেব-সেবা বা দেব-দর্শনে যে পুণ্য, রাজ-সেবা বা রাজ-দর্শনেও সেই পুণ্য। রাজার অবজ্ঞা করা অথবা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হওয়া মহাপাপ। মন্বাদি-প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র অদ্যাবধি এ দেশে প্রচলিত, মনু যে শিক্ষা দিয়াছেন, আজিও খাঁটি হিন্দুরা রাজাকে দেবতা হইতে অভিন্ন ভাবেন।

শুদ্ধ মনু কেন, বাইবেলও রাজাকে "ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিষিক্ত" "Lord's anointed"—বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আজিও তিন শত বৎসর অতীত হয় নাই ইংলণ্ডের প্রতি ধর্ম্মাধিকরণ হইতে ধর্ম্মযাজকগণ "রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি" "King is the Vicegerent of God" এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। জেমস্ও "রাজার স্বর্গীয় অধিকার" "Divine right of Kings" বজায় রাখিবার জন্য যত্নের ক্রটি করেন নাই। কিন্তু স্মৃতি ও বাইবেলের শিক্ষা ইতিহাসের শিক্ষা কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসপাঠী আজি আর রাজাকে দেবতার প্রতিনিধি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহার চক্ষে রাজা "Lord's anointed" নহেন, যিনি এক্ষণে "People's anointed" "প্রজা কর্ত্তৃক অভিষিক্ত" ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শান্তির সময়ে ও সাধারণ অবস্থায় রাজা-প্রজার প্রকৃত সম্বন্ধ সহজে বোধগম্য হয় না। কিন্তু যখন বিপ্লব-বায়ু প্রজাসাগর সন্ক্ষুভিত করে, যখন বিরাগাগ্নি স্তরে স্তরে নামিয়া প্রকৃতিমণ্ডলীর নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত করিয়া তুলে, তখন যে অগ্নিকাণ্ড, যে প্রলয়-ব্যাপার সমুপস্থিত হয়, তাহাতে রাজাপ্রজার পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া পড়ে; তখন রাজার দেবত্ব, প্রভুত্ব, অলঙ্ঘ্যত্ব সমুদায়ই পুড়িয়া ভাসিয়া যায়। যত মহান্, যত প্রভাবশালী, যত দৃঢ়মূল হউক না কেন, এমন কোনও রাজত্ব নাই প্রজামণ্ডলী বিচলিত হইলেও যাহা অবিকম্পিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। এমন কোন সর্ব্বজনীন বিদ্রোহ, রাজনৈতিক মত পরিবর্ত্তন বা জাতীয় অভ্যুত্থান দেখিবে না যাহা সমাজকে "টানিয়া ছিঁড়িয়া নূতন করিয়া" না গড়িতে পারে। ইহার বলেই মুষ্টিমেয় ওলন্দাজ "ভিক্ষুক" * দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ

* মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়।

* Vide Motley's History of the Dutch Republic.

লুইকে হলণ্ড হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিল; ইহার বলেই পরপ্রত্যাশী কতিপয় আমেরিক বিপুলবিভব ইংলণ্ডকে আটলাণ্টিক পার করিয়া দিয়া নূতন মহাদ্বীপে জগদ্বিস্ময়কর এক মহান্ প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়াছে; সূর্য্যালোকে নীহাররাশির ন্যায় প্রজা সংঘর্ষণে বোর্বোঁ বংশ বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। নীরো নর-মশাল জ্বালিয়া, মহম্মদ জোনা খাঁ নরপশু শিকার করিয়া, আওরঙ্গজেব করিপদে প্রজামণ্ডলীর মস্তক বিচূর্ণিত করিয়াও রেহাই পাইয়াছে, কিন্তু ইহার বলেই পার্লিয়ামেণ্টের অধিকার লঙ্ঘন জন্য চার্লস্‌কে নিজ শোণিতে বধ্য ভূমি অভিষিক্ত করিতে হইয়াছে, জেম্‌স্‌কে ইংলণ্ডের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সেণ্ট জর্ম্মেণ প্রাসাদে ফ্রান্সের বৃত্তিভোগী হইয়া কালাতিপাত করিতে হইয়াছে। আবার ইহার বলেই মরু-চারী চীরধারী কতিপয় আরব আটলাণ্টিক হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত, সাহারা হইতে ডানিউব পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সংসারত্যাগী 'নির্ব্বাণ'-প্রয়াসী কতিপয় পরিব্রাজক ভারতে, ব্রহ্মে, সিংহলে, চীনে, সুদূর জাপানে নৈতিক বিজয়-নিশান প্রোথিত করিতে পারিয়াছিল, ও চির-নিগৃহীত সদ্যোদাসত্বমুক্ত ফরাসীগণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতম ইউরোপে একচ্ছত্র স্থাপন করিয়াছিল।

জনসাধারণের সমবেত বল এই কয়েক স্থানে মহতী কার্য্যকরী শক্তি। বিপ্লবমন্থনে মথিত হইয়া জন-সাধারণের অন্তর্নিগূহিত শক্তি বহিঃপ্রস্ফুরিত হইয়া এক কেন্দ্রীভূত হইলেই তাহার কার্য্যকারিত্ব বিকাশিত হয়। সে অবস্থায় সেই শক্তি যে দিকে পরিচালিত হয় সেই দিকেই কৃতকার্য্যতা লাভ করে; সেই শক্তি সমাজকে যেরূপে সংগঠিত করিতে চায় সমাজ সেই রূপেই সংগঠিত হয়; তখন সহস্র মনু, সহস্র বাইবেলের অন্তরালে থাকিয়াও কোন সমাজপদ্ধতি সেই শক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইলে তৃণবৎ ভাসিয়া যায়। অতএব রাজপদই বল, আর রাজশক্তিই বল, প্রজাসমষ্টিরূপ মূল ভিত্তির উপর উহা সংস্থাপিত।

ভারতবর্ষে এইরূপ সর্ব্বজনীন অভ্যুত্থান অতি অল্পই হইয়াছিল। রাজনৈতিক বিষয়ে সর্ব্বজনীন মতবিপ্লব ভারতবর্ষে কখন হয় নাই। মনুর সময়ে যেরূপ ছিল, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও রাজতা-বিষয়ে লোকের মত সেই রূপই ছিল; আচার ব্যবহারে যত দূর প্রভেদ হউক না কেন, সমাজের সংগঠন-প্রণালী এক রূপই ছিল। রাজা প্রজার সম্বন্ধ মনু যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিযোগী শিক্ষা ভারতবাসী পায় নাই। ভারতে জাতীয় ইতিহাস নাই, ইতিহাসের যে জ্বলন্ত, জীবন্ত শিক্ষা—ভারতবাসী তাহা কখন প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং ত্রিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতবাসী আজিও সেই রূপ অভিজ্ঞ। ভারত কখন ইতিপূর্ব্বে

প্রজাতন্ত্র দেখেন নাই; ভারত কখন প্রজাবিপ্লব দেখেন নাই, কখন জেম্‌স্‌কে তাড়াইয়া উইলিয়মকে রাজসিংহাসনে আহ্বান করেন নাই, কখন প্রকৃতিরূপী মহাশক্তির সমক্ষে চার্লসকে বলি দেন নাই, কখন বিপ্লব-হুতাশনে পৌরাণিক-কালের রাজবংশতিলক লুই ও লোকললামভূতা এণ্টইনেটের মুণ্ড আহুতি দেন নাই; বল্টেয়র ও রুষো, দান্তে ও মিল্টন, প্যাট্রিক হেনরী ও ম্যাটসিনি ভারতে বিপ্লব-ভেরী বাজান নাই; ভারতীয় প্রকৃতি কখন রাজগ্রাস হইতে আপন স্বত্ব ও অধিকার বজায় রাখিবার জন্য অজস্রধারে হৃদয়শোণিত দান করেন নাই, সুতরাং মন্বাদির শিক্ষা ভুলিতে পারেন নাই। ভারতে রাষ্ট্র-বিপ্লব বা জাতীয় সমুত্থান একবারেই হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু যে যে স্থলে তাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কোনও মতে সর্ব্বজনীন নহে। শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত মগধ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতিমণ্ডলীকর্ত্তৃক ঐ উচ্চপদে উন্নীত হন নাই, প্রতিহিংসাপরবশ কূট-মন্ত্রি এক ব্রাহ্মণের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়াছিলেন মাত্র। মুসলমান কালে রাজন্যপদও প্রতি মুহূর্ত্তে হস্ত-পরিবর্ত্তিত হইত; ভারতের সিংহাসন দাসের পর খিলিজি, তৎপরে তোগলক, এইরূপে ক্রমান্বয়ে সৈয়দ, লোদী ও তৈমুর বংশীয়দিগের হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনে প্রজাসাধারণের কি হস্ত ছিল? ১৮৫৭ অব্দে যে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল ভারতীয় কয় জন প্রজা তাহার উদ্দীপনার সহায়তা করিয়াছিল? আর গুরু নানক যে শিখ-সমিতির বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ যাহাতে জল সিঞ্চন করিয়াছিলেন, রণজিৎ যাহাকে সুমহান্ অমৃত-ফলপ্রসূ বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা কিসের বলে? আবার নানক, গোবিন্দ ও রণজিতের অবর্ত্তমানে সেই মহাবৃক্ষ ভূমিসাৎ হইল কি জন্য?—যে জন-সাধারণ ঘনীভূত হইয়া মহতী শিখ-সমিতিতে পরিণত হইয়াছিল তাহারই বিচ্ছেদে উহা এক্ষণে ভূতলশায়ী হইয়াছে। মহানুভাব শিবজী যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, সে সাম্রাজ্য আজি কোথায়,—কি জন্যই বা বিগলিত হইয়াছে? আর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এককালে যে স্বাধীনতা-বীজ রোপিত হইয়াছিল তাহাই বা শত অত্যাচারী, শত স্বেচ্ছাচারীর বাধা ও পীড়ন সত্ত্বেও আজি ফল-প্রসূ হইয়াছে কেন? ইংলণ্ডে প্রজার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অন্তর্বিদ্রোহের কাল হইতে তিন বার প্রজাবিপ্লবের প্রয়োজন হইয়াছিল। ফ্রান্সে তিন বার অন্তর্বিপ্লবের পর তবে এক্ষণে সাধারণতন্ত্র দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়াছে।

রাজশক্তি প্রজাদত্ত, এ তত্ত্ব যে বিপ্লব-কালেই প্রতিপন্ন হয় তাহা নহে। বিপ্লব কালে যেরূপ, সুখ শান্তির কালেও

ইহা সেইরূপ সমভাবে প্রবল থাকে। তবে উভয় অবস্থায় প্রভেদ এই যে, বিপ্লবকালে ইহা ব্যক্তরূপে কার্য্যকরী হয়, আর সাধারণ অবস্থায় নিঃশব্দ ও নিভৃত ভাবে কার্য্য করে। রাজা রাজ্যশাসন করিতেছেন কিসের বলে?—স্পষ্টতঃ প্রজার অভিপ্রায় ও সম্মতি ক্রমেই তিনি আপন কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ। রাজা যেরূপ আদেশ করিতেছেন, প্রজাগণ বিনা ওজরে তাহা সম্পাদন করিতেছে, যেরূপে পরিচালন করিতেছেন তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে, যেরূপে দণ্ডাদি প্রয়োগ করিতেছেন কখন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে না, এবং যখন যেরূপে আবশ্যক তখন সেইরূপেই সাহায্য করিতেছে, এই জন্যই রাজকার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইতেছে। ফলতঃ কোনরূপ শাসন-তন্ত্রের অস্তিত্বের জন্য তিনটি বিষয়ের* প্রয়োজনঃ—(১ম) যেখানে যেরূপ শাসন-তন্ত্র প্রচলিত, তত্রত্য জন-সাধারণ কার্য্যতঃ সেই তন্ত্র অনুমোদন করিবে, অথবা অনুমোদন নাই করুক, অন্ততঃ তৎপ্রতি এতদূর বিরক্ত হইবে না যাহাতে তাহার বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হইবে; (২য়) ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা তাহাদিগের থাকিবে; (৩য়) ইহার অভিপ্রায় ও প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিবার জন্য যাহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা তাহাদিগের থাকিবে। এই কয়টি সংসিদ্ধ না হইলে কোন তন্ত্রেরই অস্তিত্ব সম্ভাবনা নাই। এ স্থলে "করা" ও "কর্ত্তব্য" শব্দে কার্য্যে প্রবৃত্তির ন্যায় নিবৃত্তিও বুঝিতে হইবে। প্রজাগণ যাহা করা আবশ্যক তাহা করিবে এবং যাহা হইতে নিবৃত্ত থাকা আবশ্যক তাহা হইতেও নিবৃত্ত হইবে।

প্রথমতঃ, শাসন-প্রণালী জন সাধারণের অনুমোদিত হওয়া চাই। প্রজাগণ সম্মত না হইলে শাসন করিবে কাহার উপর? যেখানে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট, সেখানে পাশব বল প্রয়োগ ব্যতীত তাহাদিগকে বশে রাখিবার অন্য উপায় নাই। বল-প্রয়োগেও বশীভূত করিয়া রাখা যায় না। পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি আছে। তাহারা বরং নির্ব্বাসন অথবা নির্ম্মূল হওয়া স্বীকার করিবে তথাপি কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিবে না। পৃথিবীতে এমন অনেক অর্দ্ধ-সভ্য জাতি আছে যাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবে না। তুর্কিস্থানের প্রব্রাজক জাতি সমূহ অদ্যাপি কাহারও শাসন মানে না; রোম-জয়ী বর্ব্বর জাতীয়েরা বহু শতাব্দীর শিক্ষার পর তবে আপন প্রধান-গণের বশে থাকিয়া ব্যবস্থিত জীবনে অভ্যস্ত হইয়াছিল। অতুল-বিক্রম সীজর এত করিয়াও প্রজাতন্ত্রী রোমের সম্রাট্ হইতে পারেন নাই। মহামতি ক্রম্‌ওয়েল এত করিয়াও

* Mill's Representative Government.

ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র দৃঢ়মূল করিতে পারেন নাই। ওলন্দাজেরা হলণ্ড-ভূমি সাগরজলে ভাসাইয়া দিয়াছিল, তথাপি লুইএর বশ্যতা স্বীকার করে নাই। রাজপুতেরা চিতোর ভস্মীভূত করিয়াছিল, তথাপি আকবর-হস্তে ইহা সমর্পণ করে নাই। তাই বলি, প্রজাগণ সম্মত না হইলে শাসন করিবে কাহার উপর?

দ্বিতীয়তঃ, প্রজার কেবল সম্মতি হইলেই যে হইল তাহা নহে; সম্মতির উপর আরও কিছু চাই। শাসন-তন্ত্রকে বজায় রাখিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা তাহাদিগের থাকা চাই। আলস্য বশতঃ হউক, অনিচ্ছা বশতঃ হউক, আর অসামর্থ্য বশতই হউক প্রজাগণ ইহার রক্ষায় অশক্ত হইলে কোন শাসন-তন্ত্র মুহূর্ত্তমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রু অনেক, সে শত্রু নিপাত প্রজা করিবে। প্রজাকে অনেক পিসিস্ট্রেটস্‌কে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, অনেক সীজরের বক্ষ বিদারণ করিতে হইবে, অনেক চার্লসের মুণ্ডচ্ছেদন করিতে হইবে, অনেক রবস্পিয়রকে গিলোটিনের পরিচিত করিতে হইবে। স্বদেশ রক্ষার্থে অনেক পৃথু, অনেক প্রতাপ, অনেক লিয়নিডাস, অনেক ওয়াসিংটন, অনেক ম্যাট্‌সিনির প্রয়োজন। যে দেশে এ প্রয়োজন সংসাধিত হইবে, সেই দেশই সগর্ব্বে উন্নত শিরে বিজয়-নিশান ধরিয়া অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইবে, নচেৎ রিপুপদদলিত হইয়া চিরকাল শোণিত উদ্গীরণ করিবে। যদি হস্তিনায় এক জন পৃথুর পরিবর্ত্তে দুই জন পৃথু থাকিত, যদি বঙ্গে লাক্ষ্ণেয়ের পরিবর্ত্তে লিয়নিডাস্ থাকিত, তাহা হইলে কি আর ভারতের আজি এই দুর্দ্দশা হইত?

তৃতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিবার জন্য যাহার যাহা কর্ত্তব্য তৎসম্পন্ন করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রজাবর্গের থাকিবে। দণ্ড-বিধান রাজপুরুষের কার্য্য; প্রজার কর্ত্তব্য এ স্থলে রাজপুরুষের সহায়তা করে, এবং নিজে দণ্ড-প্রয়োগে বিরত থাকে। তাহা না হইয়া যদি জনসাধারণ আপন হস্তে দণ্ড-প্রয়োগের ভার লয়, তবে দেশের অবস্থা কিরূপ হয়? অথবা যদি তাহারা অপরাধীকে বিচারাধীনে না আনিয়া রাজ-দণ্ড হইতে তাহাকে আচ্ছাদিত করিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলেই বা কিরূপ হয়? প্রজার কর্ত্তব্য, সাধারণ ধনাগারে নিয়মিতরূপে আপন আপন অংশ দান করা; কিন্তু যে দেশে নীতিজ্ঞান এত অল্প যে সকলেই সেই দেয় হইতে এড়াইবার জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা অবলম্বন করে, সে দেশের শাসনকার্য্য কিরূপে চলিবে? যুদ্ধ-যাত্রা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যে জাতি আপন অঙ্গুলিচ্ছেদন-ক্লেশ পর্য্যন্ত স্বীকার

করিত, * সে জাতির অস্তিত্ব কি সম্ভবপর হয়?

অতএব যে কোন তন্ত্র বল তাহার অস্তিত্ব সম্ভাবিত হওয়ার পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন সংসিদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই তিন প্রয়োজনের মূল জন-সাধারণ। অতএব জন-সাধারণই রাজশক্তির মূল।

শ্রীযোগেন্দ্র——

বিলাতযাত্রীর পত্র।

লণ্ডন, ১৯এ মার্চ।

যখন লণ্ডনে আসিয়া পঁহুছিলাম তখন বড়ই মন অস্থির হইল। সম্পূর্ণ নূতন স্থান, নূতন লোক, নূতন প্রণালী। কাহাকেও চিনি না, কোথায় যাইব, কিছুই স্থির নাই, এরূপ নানা চিন্তায় মন অস্থির হইল। * যিনি আমার সহিত আসিয়াছিলেন, তিনিও কিছুই জানেন না, সুতরাং রেবরেণ্ড হণ্টর সাহেব যাঁহার চার্য্যে তিনি আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত চলিয়া গেলেন। * * * আমিও কষ্টম হাউস্ হইতে ভূমধ্যস্থ রেল (underground rail) দিয়া লণ্ডনের ভিতর একটী ষ্টেশনে নামিলাম। সেখান হইতে এক খান গাড়ি লইয়া একটী হোটেলে গিয়া উঠিলাম। নিয়মাদি না জানায় খরচ কিছু অধিক হইল। কিন্তু তাহা ভিন্ন উপায় নাই। এখানকার অধিকাংশ হোটেলের নিয়ম এই যে তাহারা ঘর ও প্রাতে খাইতে দেয়, রাত্রিতে নয়। সুতরাং সে দিন রাত্রিতে আর কিছু খাওয়া হইল না। তাহার পর দিন এক খানি গাড়ি লইয়া টেম্পলে উপেন্দ্র দাসের সন্ধানে চলিলাম, কোন সন্ধান পাইলাম না। হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। এক খানি মানচিত্র দেখিয়া দিক্ স্থির করিয়া লইয়া কতক ওমনিবাসে কতক হাঁটিয়া পথ সহচরের ঠিকানায় গেলাম। দেখা হইল। সেখান হইতে হণ্টর সাহেবের সঙ্গে ওয়েষ্টমিনষ্টর আবি দেখিতে গেলাম। যাহা দেখিলাম তাহা অতি গভীর মূর্ত্তি। বাটীটী দেখিতে যেরূপ হওয়া উচিত ঠিক সেইরূপ, নিকটে গেলেই কেমন এক রূপ গম্ভীর ভাবের উদ্রেক হয়। উচ্চ উচ্চ খিলানের নিম্নে পিট্, নেল্সন্, ফক্স প্রভৃতির মনুমেণ্ট অতি মহান্।

* * * *

লণ্ডন, ২রা এপ্রিল।

যখন লণ্ডন ডকে আসিয়া পঁহুছিলাম তখনকার মনের অবস্থা বুঝিতে পারেন।

---

* রোমের অধঃপতন কালে সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব বিলাসিরা এইরূপ করিত।

একটু পরেই লণ্ডনের মত সহরে একা পড়িতে হইবে। কোন স্থান চিনি না, কাহাকেও জানি না, রীতি নীতি কিছুই জানি না, প্রত্যেক পদক্ষেপে বদমায়েসদের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা। জাহাজের লোকদিগের নিকট লণ্ডনের বদমায়েসদের বিষয় যথেষ্ট শুনিয়াছিলাম, এবং এক জন নূতন লোকের পক্ষে ভদ্র লোক ও বদমায়েস চেনা যত দুরূহ তাহাও শুনিয়াছিলাম। এইরূপ মনের অবস্থায় ডক হইতে নামিয়া কষ্টম হউস হইতে ফেনর্চ্চ নামক ষ্টেশন পর্য্যন্ত ভূমধ্যস্থ রেলওয়ে দ্বারা চলিলাম। পরে সেখান হইতে এক খানি গাড়ি করিয়া তাহাকে পার্কারের হোটেলে লইয়া যাইতে বলিলাম। আমাদের জাহাজের ডাক্তার আমাকে এই হোটেলের কথা বলিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া থাকিবার কথা বলায় তাহারা বলিল যে শোওয়া ও প্রাতঃকালে খাওয়া এই দুইয়ে তাহারা চারি শিলিং করিয়া চার্জ্জ করে। আমি অনন্যোপায় বোধে কোন আপত্তি করিলাম না। গাড়িভাড়া এখানে প্রতি ঘণ্টায় ২ সিলিং ৬ পেনি। হোটেলে যাইতেও আমার উহা লাগিল। জাহাজ হইতে কষ্টম হাউসে পোর্টমাণ্টো লইয়া যাইতে এক জন মুটে ২ সিলিং লইয়াছিল। যে হোটেলে গিয়া পঁহু-ছিলাম, তাহাদের রাত্রিতে খাওয়ার কোন বন্দোবস্ত নাই। সে দিন প্রাতে আহার করিয়া তাহার পর আর কিছু খাওয়া হয় নাই। হোটেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে একটু সম্মুখে গিয়া তাহার পর ডান হাত ইত্যাদি গেলে সেখানে খাওয়ার সুবিধা হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে লণ্ড-নের প্রথম রাত্রিতে রাস্তায় বাহির হওয়া অপেক্ষা অনাহারে থাকাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলাম।

* * * *

বুধবার প্রাতে সিটি অব ম্যান্‌চেষ্টারের ডাক্তার আমার ঠিকানায় আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। তিনি আমাকে দুই চারিটী দেখিবার মত স্থান দেখাইবেন বলিলেন। সুতরাং আমি তাঁহার সহিত বাহির হইলাম। সে দিন Aquarium অর্থাৎ কতক জল-জীবের সংগ্রহ স্থান, জুয়লজিকাল গার্ডেন, জুলু স্ত্রীলোক-দিগের যুদ্ধ ইত্যাদি কতকগুলি দেখাই-লেন। * * * যে তিনটী জুলু স্ত্রীলোক-দিগকে দেখিলাম, তাহাদিগকে Cetawaya's কন্যা বলিয়া পরিচয় দিতেছে। তাহাদিগকে ও কতকগুলি জুলু পুরুষকে লইয়া টাকার প্রলোভনে বানরের মত খেলাইতেছে, এবং টিকিটে যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিতেছে। তাহাদিগের সাধারণ যুদ্ধপ্রণালী ধনুর্বিদ্যা ও বিবাহ-প্রণালী এই গুলিই তাহাদের দ্বারা দেখাইল। এই তিনটী স্ত্রীলোক বস্তুতঃ Cetawaya's কন্যা কিনা আমার সন্দেহ। আমি ডাক্তারের সহিত অনেক তর্ক করিলাম এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের

প্রাচীন রোমের ন্যায় বিজিতের প্রতি এরূপ ব্যবহারের অনেক নিন্দা করিলাম। তিনি বলিলেন, গবর্ণমেণ্টের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহারা ব্যবসাদার; টাকা দিয়া আনাইয়াছে; জুলুরাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসিয়াছে। সুতরাং ইহাতে কাহারও দোষ হইতে পারে না। ইহাতে আমার যে আপত্তি, তাহা তাঁহাকে বলিলাম, কিন্তু তিনি দোষ স্বীকার করিলেন না।

* * * * *

আমরা পার্লিয়ামেণ্টের ইলেক্সনের সময় আসিয়া তাহার বিষয় অনেক জানিতে পারিলাম। আমার পত্র যাইবার পূর্ব্বেই আপনি জানিতে পারিবেন যে লিবারেলরাই জিতিয়াছে। আমি এক দিন একটী লিবারেল মিটিংএ গিয়াছিলাম। কন্‌সর্‌বেটিবরা গিয়া গোলযোগ করে বলিয়া টিকিট করিয়াছিল। আমাদের টিকিট দেখিতে চাইল। আমাদের টিকিট ছিল না, কিন্তু টিকিট-সংগ্রাহকের দিকে না তাকাইয়া চলিয়া গেলাম, সে আর কিছু বলিল না। সেণ্ট জেম্‌স হলে সে মিটিং হয়। সার আর্থার হব্‌হাইস্‌ ও 'ফর্ট নাইটলীর' সম্পাদক জন্ মর্লে—ইহাঁরা ইলেক্টরদিগকে আড্রেস্ দিলেন। জন্ মর্লের বক্তৃতা অতি সুন্দর হইয়াছিল। সভাগৃহে অন্যূন চারি হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। চারি দিকে গ্যালারি, মধ্যস্থল কতকটা সমতল। এত লোক অথচ দেখিতে অতি সুন্দর শৃঙ্খলা, লোকের চীৎকারে বক্তৃতা মধ্যে মধ্যে এক মিনিট দুই মিনিট বন্ধ হইয়া যায়। যখনই ডিজরেলী ও তাঁহার অনুচরের নাম হইতে লাগিল, তখনই তাহারা বিড়ালের মত একরূপ ডাকিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিল। আর গ্লডষ্টোন ব্রাইটের নাম হইবামাত্র হাততালি, three cheers এবং টুপি খুলিয়া Hurrah Hurrah প্রভৃতি শব্দ হইতে লাগিল—সে দৃশ্য দেখিতে বড় আমোদ। সেই সভায় আমরা দুই জন ইণ্ডিয়ান গিয়াছিলাম, আমাদিগকেও মধ্যে মধ্যে তাহাদের চীৎকারে আপনা হইতে যোগ দিতে হইয়াছিল। আবার একটী কন্‌সরভেটিব মিটিংএ ঠিক ইহার বিপরীত। ইলেক্সনের পূর্ব্বে এখানে সকলের সংস্কার ছিল যে, কন্‌সরবেটিব মিনিষ্ট্রীর জয় হইবে। এক্ষণে ফলতঃ অন্যরূপ দেখিয়া সকলে কিছু আশ্চর্য্য হইবে।

এখানে গুটি কতক এসোসিয়েশন আছে সে গুলিতে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ন্যাসনেল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন তন্মধ্যে প্রধান। লর্ড নর্থব্রুক, সার আর্থর্ হবহাউস, মনিয়র উইলিয়মস্ প্রভৃতি তাহার কমিটির মেম্বর; মিস্ ম্যানিং সেক্রেটরি; ইহার উদ্দেশ্য এদেশস্থ ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত ইংরাজদিগের অধিক মেশামিশি, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইহার মিটিংএ বক্তৃতাদি, এবং ভারতবর্ষীয়দিগকে লইয়া ইংলণ্ডের

বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান সকল দেখান; এবং ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য এই সভা হইতে স্কলার্‌সিপ প্রভৃতি দেওয়া।

দিন কত হইল ইহার একটী মিটিংএ ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেন শিল্প বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয় না সেই বিষয়ে একটী বক্তৃতা হয়। বক্তার (ইংরেজ) মতে দেশীয়দিগের চেষ্টার অভাবই ইহার কারণ। তাহার পরে অনেক ভারত-বর্ষীয় ইংরাজ আপন আপন মত বলিলেন। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে দুই এক জন বেশ বলিতে পারেন। প্রমথ-নাথ বসু বেশ বলেন। তিনি বলিলেন যে মূল ধনের অভাবই ইহার কারণ,এবং পার্লেমেন্টের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স আনিয়া facts and figures দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে ভারতবর্ষ হইতে যে শোষণ চলিয়াছে ইহা ক্রমাগতই বাড়িতেছে, এবং ইহা থাকিতে আর আমাদের মূলধনের আশা করা বৃথা। আপনি শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন, কিন্তু সে দিন আমিও দুই চারি কথা বলিতে সাহসী হইয়া-ছিলাম। কিরূপ বলিয়াছিলাম তাহা জানি না, কিন্তু সকলে আমার কথা দশ মিনিটেরও অধিক স্থির হইয়া শুনিয়া-ছিলেন। সভা ভাঙ্গিয়া গেলে সেক্রে-টরি মিস্‌ ম্যানিং আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন, এবং তাহার পর এক দিন তাঁহার বাটীতে যাইতে বলেন। যে দিন যাইবার কথা ছিল, সে দিন যাইতে পারি নাই। গত সোমবার রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। প্রতি সোমবার রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে অনেক ভারতবর্ষীয় ও ইংরাজ নিমন্ত্রিত হন। সেখানে সকলে একত্র হইয়া নানাবিধ গল্প করেন। আমি গেলে মিস্‌ ম্যানিং খানিক নিজে কথা বার্ত্তা করিয়া ক্রমে ক্রমে দুই চারিটী লেডির সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। কারণ আলাপ করাইয়া না দিলে কেহ কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে না। ঘরের মধ্যে একটী টেবিল তাহার উপর নানাবিধ পুস্তক, ছবি ও ফটোগ্রাফ ইত্যাদি রহিয়াছে, কেহ কেহ সে গুলি দেখিতেছেন। ঘরের চারি পার্শ্বে চেয়ার, সেখানে সকলে বসিয়া গল্প করিতেছেন। গল্পের পর এক একটী লেডিকে এক একটী পুরুষের সহিত মিস্‌ ম্যানিং যুটাইয়া দেন, সেই লেডিকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া যাইতে হয়। সেখানে টেবিলের উপর খাদ্যাদি থাকে। প্রত্যেককে তাঁহার সহচারিণী লেডি কি খাইবেন, না খাইবেন জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচর্য্যা করিতে হয়, এবং অবশ্য সেই সঙ্গে নিজেও একটু একটু খাইতে পান। সেখানে দুইটী মান্দ্রাজী স্ত্রীলোক দেখিলাম, তাঁহারা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মত কাপড় পরিয়া আসিয়া-ছিলেন। ভিতরে জ্যাকেট ও উপরে বোম্বাই সাড়ি। তাঁহারা আপনাদের মধ্যেই অধিক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগি-লেন; ইংরাজীতে ভাল কথা কহিতে

পারেন না বলিয়া বোধ হইল।

আর একটী সভা আছে, তাহার নাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন। ইহারও উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনাদি করা। ইহার একটী মিটিংএ এক দিন সর্ ডেভিড ওয়েডারবরন্ M. P. ভারতবর্ষে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী (Popular Reprsentation in India) সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। অনেকেই ইহার পক্ষ দেখিলাম। দুঃখের বিষয় দুই এক জন ভারতবর্ষীয় উঠিয়া বলিলেন প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী ভারতে প্রবর্ত্তিত হইবার সময় এখনও আসে নাই। তবে তাঁহারা শাসনকর্ত্তাদিগকে পরামর্শ দিবার উপযুক্ত এবং তাহাদিগের সেই সকল পরামর্শ শাসনকার্য্যে গৃহীত হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। তাঁহারা আপাততঃ অধিক আশা করেন না। মিটিংএ সেই আমার প্রথম দিন বলিয়া আমি আর সে দিন কিছু বলিতে সাহস করি নাই।

শ্রীম—

দার্জ্জিলিঙ যাত্রা।

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥ মেঘদূতম্।

আমরা শিলিগড়ি হইতে টঙ্গাযোগে প্রাতে দার্জ্জিলিঙাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদিগের রথ তীব্র বেগে হিমাচলাভিমুখে ধাবমান হইল। সম্মুখে অনন্ত বনরাজি ও ধবলমেঘমালাসমাচ্ছন্ন সুনীল শৃঙ্গমালা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাস বপ্রক্রীড়ায় রত হস্তীর সহিত যে শৃঙ্গসংলগ্ন মেঘখণ্ডের তুলনা করিয়াছেন, তাহাতে অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি উভয়েরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ আষাঢ়মাসের প্রথমে যাঁহারা পার্ব্বত্য প্রদেশ না দেখিয়াছেন, তাঁহারা কালিদাসের এই উপমার চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। মেঘখণ্ড সকল দূর হইতে দেখিলে বস্তুতঃই ভ্রম জন্মে যে হস্তী সকল দলে দলে সানুগাত্রে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে।

দার্জ্জিলিঙ্ গিরিক্ষুণ্ণ পথ (Hill-cut road) ইংরাজ বুদ্ধির ও ইংরাজশিল্পের একটী চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই পথ বনরাজিসমাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ভীষণ উপত্যকাপ্রদেশের মধ্য দিয়া সরলভাবে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে উঠিয়াছে। এই উচ্চতার ক্রম এত অল্প, যে উঠিবার সময় উচ্চে উঠিতেছি বলিয়া বোধ হয় না। কেবল পথের নিম্ন দিকে তাকাইলে কতদূর উঠিয়াছি জানা যায়। এইরূপে ক্রমশঃ উঠিয়া এই পথ সানুপ্রদেশে সংলগ্ন হইয়াছে। তথা হইতে পর্ব্বতের গায় গায় বেণীর আকারে সানুপ্রদেশ বেষ্টন করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়াছে। সিলিগড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্ প্রায় পঞ্চাশ মাইল। এই পঞ্চাশ মাইলের সাত আট মাইল পথ উপত্যকা-প্রদেশে। অবশিষ্ট সমস্ত পথ অধিত্যকাপ্রদেশে।

অদ্য আষাঢ় মাসের প্রথম দিন।

দার্জ্জিলিঙ্ যাইতে অনেকগুলি শৃঙ্গ অতিক্রম করিতে হয়। ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে উঠিতে হয়। সকল শৃঙ্গগুলির পরস্পরের সহিত যোগ আছে। কারণ সকলগুলিরই ভিত্তিভূমি এক। একটী শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে যাইতে হইলে বেণীভূত গিরিক্ষুণ্ণ পথ দিয়া নিম্নতর শৃঙ্গকে অনেকবার প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়া উভয়শৃঙ্গ-সংযোগকারী অপেক্ষাকৃত সমতল পর্ব্বতবিভাগে আসিয়া পড়িতে হয়। সেই গিরিক্ষুণ্ণ পথ তাহার উপর দিয়া উচ্চতর শৃঙ্গে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছে। সেই উচ্চতর শৃঙ্গকে বার বার প্রদক্ষিণ করিয়া আবার উচ্চ সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া তদপেক্ষা

উচ্চতর আর একটী শৃঙ্গগাত্রে সংলগ্ন হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ উচ্চতর কয়েকটী শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া তবে দার্জ্জিলিঙে আসিয়া পৌঁছিতে হয়।

আমরা পূর্ব্বে ইংরাজকীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ যে অদ্ভুত গিরিপথের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রস্তুত করিতে অগণ্য মুদ্রা ও অসংখ্য প্রাণ ব্যয়িত হইয়াছে। পর্ব্বতের গায় দাঁড়াইবার স্থান ছিল না, সুতরাং ক্রমাগত হুক মারিয়া হুক ধরিয়া ও হুকের উপর পা রাখিয়া সেই অত্যুচ্চ সানুপ্রদেশে উঠিতে হইয়াছিল। হুকের উপর দাঁড়াইয়া হুক ধরিয়া পর্ব্বতের গায় ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর বারুদ পুরিয়া তাহাতে অগ্নি দিয়া উপরের পাথর উড়াইয়া দিতে হইয়াছিল। সেই সকল পাথর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেকের প্রাণসংহার করিয়াছিল। কিন্তু অবিচলিত অধ্যবসায়ের নিকট পর্ব্বতের অলজ্ঘ্যতাও পরাস্ত হয়। এক স্থানের পাথর উড়াইয়া দিয়া অধ্যবসায়শীল মানব তাহার উপর দাঁড়াইয়া ক্রমশঃ বারুদের দ্বারা পাথর উড়াইতে উড়াইতে অগ্রসর হইতে লাগিল; এইরূপে ক্ষুদ্র গিরিপথ দ্বারা শৃঙ্গমালা প্রদক্ষিণ করতঃ নরলোকের অগম্য দেবভূমি হিমাচল-বক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; যে প্রদেশে মেঘের উৎপত্তি ও স্থিতি, সেই মেঘপ্রদেশে আসিয়া অপূর্ব্ব নগরী সংস্থাপন করিয়াছে; এবং গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় মেঘপ্রদেশে বিহার করিতেছে। ধন্য মানব! তোমার ক্ষমতার ইয়ত্তা করে কাহার সাধ্য?

ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যেরা বুদ্ধিমত্তাতে কোন মতেই ইংরাজদিগের ন্যূন ছিলেন না। এই সকল অগম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিবার নিমিত্ত তাঁহারাও উপায় উদ্ভাবন করিতে ক্রটি করেন নাই। এই সকল দুর্লঙ্ঘ্য পার্ব্বত্য প্রদেশেও তাঁহাদিগের রথের গতি অপ্রতিহত ছিল। রাজা দুষ্মন্ত দৈত্যসমরে দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যার্থে যখন ইন্দ্রালয়ে গমন করেন, তখন তিনি মাতুলি-চালিত দেবরথে আরোহণ করিয়া গিয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক নাটকে স্পষ্ট অভিহিত আছে যে এই রথে অশ্ব যোজিত ছিল।* আবার সপ্তর্ষিগণ যখন মহাদেবের সম্বন্ধ করিতে†, এবং যখন মহাদেব পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণার্থ ‡ হিমবৎপুরে আগমন করেন, তখন

* অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভিঃ
হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ননেমিঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

† তে সঘনি গিরের্বেগাদুন্মুখদ্বাঃস্থবীক্ষিতাঃ
অবতেরুর্জটাভারৈর্লিখিতানলনিশ্চলৈঃ॥
গগনাদবতীর্ণা সা যথাবৃদ্ধপুরঃসরা।
তোয়ান্তর্ভাস্করালীব রেজে মুনি-পরম্পরা॥
‡ খে খেলগামী তমুবাহ বাহঃ
সশব্দচামীকরকিঙ্কিণীকঃ।
তটাভিঘাতাদিব লগ্নপঙ্কে
ধুন্বন্ মুহুঃ প্রোতঘনে বিষাণে॥

কুমারসম্ভবম্

তাঁহারা শূন্যমার্গে গমন করিয়াছিলেন, কুমারসম্ভবে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আধুনিক ব্যোমযান বা তদনুরূপ কোন যান ব্যতিরেকে শূন্যমার্গে গমন করা অসম্ভব। অন্যান্য কাব্যেও এই বিমান বা ব্যোমযানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন তিনি বিমানে আরোহণ করিয়া সীতাকে নিম্নস্থ বিবিধ পদার্থ-নিকর দেখাইতে দেখাইতে আসিয়াছিলেন রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে এরূপ উল্লেখ আছে *। আবার নারদ দক্ষিণসাগরের উপকূলস্থিত দেবাদিদেব মহাদেবকে বীণা বাদন দ্বারা প্রীত করিতে আকাশ-মার্গে গমন করিয়াছিলেন † রঘুবংশের অষ্টমে তাহার উল্লেখ আছে। সুতরাং নারদও যে ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন আর্য্যগণ পার্ব্বত্য প্রদেশে রথ ও ব্যোমযান এই দুইএর অন্যতর বা উভয় দ্বারা গমনাগমন করিতেন। অশ্বচালিত রথে আসিতে হইলেই গিরিক্ষুণ্ণ পথের প্রয়োজন। সুতরাং অনুমান হয় যে পুরাকালে এরূপ গিরিক্ষুণ্ণ পথও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কালে সে সকল বিলীন হইয়াছে। বস্তুতঃ অবিশ্রান্ত জীর্ণসংস্কার না করিলে অচিরকাল মধ্যেই এই সকল গিরিপথের পূর্ণ বিলোপের সম্ভাবনা। এখনও সর্ব্বদা পাথর পড়িয়া ইংরাজ-ক্ষুণ্ণ গিরিপথ সর্ব্বদাই স্থানে স্থানে ভগ্ন হইতেছে। অবিরত জীর্ণ সংস্কার হইতেছে বলিয়াই ইহার বিলোপ ঘটিতেছে না।

সিলিগড়ি হইতে প্রত্যেক পাঁচ মাইল অন্তর টঙ্গার ঘোঁড়া বদল হয়। পার্ব্বত্য ঘোটক অতি বেগে সেই ক্রমশঃ উচ্চ পথে ধাবিত হয়। এক্ষণে ট্রামওয়ে লাইন পড়ায় ঘোটককে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে সেই লাইন অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ট্রামওয়ে সেই বেণীভূত গিরিপথে সর্পগতিতে গমন করিয়াছে; সুতরাং টঙ্গাকে প্রতিবক্রেই ট্রামওয়ে অতিক্রম করিতে হয়। এই জন্য টঙ্গায় গমনাগমন করা আজ কাল অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে, যেরূপ ধাক্কা লাগে, তাহাতে ক্ষীণজীবী লোকের প্রাণান্ত। অশ্বারোহণেও যাওয়া যায় বটে, কিন্তু বর্ষাকালে ইহাতে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া সকলে ইহাতে যাইতে সাহস করে না। যাহাদের উপায় আছে, তাহারা টঙ্গায় যায়। অবশিষ্ট লোকে

* অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ
পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জায়াং
রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ।

† অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ
শ্রিতগোকর্ণনিকেতমীশ্বরম্।
উপবীণয়িতুং যযৌ রবে-
রুদয়াবৃত্তিপথেন নারদঃ॥

হয় বৃষযানে নয় পদব্রজে গমন করে। বর্ষা ভিন্ন অন্য কালে অশ্বারোহণেই অধিক লোক যাতায়াত করে। বস্তুতঃ বর্ষাভিন্ন অন্যকালে অশ্বারোহণেই গমন করা অতি রমণীয়। আমরা বিগত অক্টোবর মাসে আর একবার দারজিলিঙ যাত্রা করিয়াছিলাম। তখন অশ্বারোহণে গিয়াছিলাম। অশ্বারোহণে পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রকৃতির শোভা পর্য্যবেক্ষণে ঠিক্ স্বর্গসুখ! নির্ঝরের ঝর্ঝর শব্দ, বিহঙ্গকুলের ঐকতানিক গান, পতঙ্গ-নিচয়ের ঝিল্লীরব শুনিতে শুনিতে এবং অত্যুঙ্গ শৃঙ্গরাজির গগনভেদী মহিমা ও প্রকাণ্ড অনন্তকালস্থায়ী তরু-রাজির অনন্ত দ্রাঘিমা দেখিতে দেখিতে অশ্বপৃষ্ঠে গমন করায় যে কি সুখ, তাহা বর্ণনা করা যায় না! যখন অশ্বখুরক্ষুণ্ণ গৈরিককণাসকল উত্থিত হইয়া শৃঙ্গকলেবর বর্দ্ধিত করে, তখনই কালিদাসের

"ততো গৌরীগুরুংশৈলং আরুরোহাশ্বসাধনঃ।
বর্দ্ধয়ন্নিব তৎকুটান্ উদ্ধূতৈর্ধাতুরেণুভিঃ॥"

এই শ্লোকের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি। বিশেষতঃ অশ্বারোহণে গমন করিলে সরল পথে (Short cut) পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করার সুখ অনুভব করা যাইতে পারে। দার্জিলিঙ্ যাইবার তিনটী পথ আছে। একটী বেণীভূত, দ্বিতীয়টী অধিকতর সরল, এবং তৃতীয়টি সরলতম। যেটি বেণীভূত এবং পর্ব্বতকে বার বার প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়াছে, সেইটী দিয়াই টঙ্গা ও অন্যান্য শকট গমনাগমন করে। যেটী অধিকতর সরল, সেটী এক আধবার পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া, প্রায়ই সরলভাবে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়াছে। এই পথের ইংরাজী নাম সর্টকট বা সংক্ষিপ্ত গিবিক্ষুণ্ণ পথ। এপথও অনেক ব্যয়ে কাটিয়া প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইহার পরিসর এত অল্প, যে ইহাতে দুই জন অশ্বারোহী পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া যাওয়া অতি ক্লেশকর। এই পথে পদব্রজে বা অশ্বারোহণে ভিন্ন অন্যরকমে যাওয়া যায় না। ইহার লম্বতা এত অধিক যে ইহাতে শকটাদি সহজে যাইতে পারে না। এই পথে গমন করিলে দার্জিলিঙের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল কমিয়া যায়। তৃতীয়টী সরলতম ও প্রাকৃতিক। পার্ব্বতীয়েরা লম্বভাবে বৃক্ষ ধরিয়া ধরিয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করে। এইরূপে একটী পাদপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পাদপথ দিয়া পার্ব্বতীয়েরা একবক্র শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে গমন করে। এই পথে দার্জিলিঙের দূরত্ব প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া যায়; কিন্তু অতি দুরারোহ বলিয়া এ পথে পার্ব্বতীয়েরা ব্যতীত আর কেহই উঠিতে পারে না।

পর্ব্বতের গাত্র দিয়া ঝরণা নামিয়া অসংখ্য নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই ঝরণাগুলি দূর হইতে রজতরেখার ন্যায় প্রতীত হয়। পর্ব্বতশিখরে সর্ব্বদাই মেঘ উৎপন্ন হইতেছে। সেই মেঘ হইতে অনবরত বৃষ্টি পতিত

হইয়া ও বরফ গলিয়া এই সকল নির্ঝরকে অনন্তকালস্থায়ী করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল নির্ঝর ঝরঝর শব্দে অবিরাম জলোদ্গার করিতেছে, তথাপি তাহাদিগের উৎস কখনই জলশূন্য হইতেছে না। বর্ষাকালে এই নির্ঝরগুলি জলপ্রপাতের আকার ধারণ করে। বৃষ্টিস্ফীতকলেবর জলরাশি প্রচণ্ডবেগে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে নামিয়া গিরিগাত্রে প্রস্তরপরম্পরার উপর বার বার প্রতিহত হইয়া গভীর গুহাপ্রদেশে আসিয়া পড়িতেছে। অসংখ্য নির্ঝরিণী সেই গুহাপ্রদেশে নামিয়া মহাকল্লোলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া মিশিয়া নদীরূপে কল কল শব্দে গুহাপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া দুরন্ত গতিতে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। সে কল্লোল যে শুনে নাই তাহার শ্রুতি বৃথা। সে শোভা যে দেখে নাই, তাহার নয়ন বৃথা! শ্রুতি সেই বিশ্বপ্রলয়কারী শব্দে স্তম্ভিত হয়! যে কবি জাহ্নবীকে হরজটাভ্রষ্টা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন,—এ দৃশ্য যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা সে কবির কবিত্বশক্তির গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ দূর হইতে কল্পনাচক্ষে দেখিলে গিরিশৃঙ্গকে ধ্যানমগ্ন মহাদেব বলিয়া বোধ হয়; গগনস্পর্শী তরুরাজিকে মহাদেবের জটাজূট বলিয়া প্রতীত হয়; এবং তরুরাজিমধ্যবাহিনী নির্ঝরিণীকে হরজটাভ্রষ্টা জাহ্নবী বলিয়া ভ্রম জন্মে।

শিলিগুড়ি হইতে দেখিলে হিমালয়প্রদেশ অতি নিকটে বোধ হয়। যেন নীলিমাময় প্রস্তরস্তূপমালা হস্তপ্রসরে রহিয়াছে অনুমান হয়; কিন্তু এ ভ্রম মরীচিকাতুল্য। পর্ব্বতের যে পাদদেশ দশ বার মাইল দূরে অবস্থিত, তাহা যেন এক মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া ভ্রম জন্মে। যে প্রস্তরস্তূপমালা দূর হইতে বিবসনা বা নীলবসনে আবৃতা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা ক্রমে বিশালতরুমণ্ডিত বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। যত অগ্রসর হওয়া যায়, ক্রমে সেই প্রস্তরস্তূপমালা অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালার আকার ধারণ করে; ক্রমে সেই পর্ব্বতমালার তুঙ্গতা অপরিমেয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এত অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে গিরিক্ষুণ্ণ পথ উপরে উঠিয়াছে যে নিম্নে না তাকাইলে উচ্চে উঠিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। পর্ব্বতের নিতম্ব দেশ পর্য্যন্ত গিরিপথ সরলভাবে আসিয়া আবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে। সমতল ক্ষেত্র হইতে যে ইউরোপীয় ধবল কুটীরাবলী পর্ব্বতগাত্রে চূর্ণপ্রক্ষেপের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্ষুদ্র সৌধরাজির আকার ধারণ করিল। যে ধবল কুটীরাবলী ক্রোশমাত্র দূরে অবস্থিত আছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল, গিরিশকটকে তাহার নিকটে যাইতে অসংখ্য আবর্ত্তন করিতে হইল।

গিরিশৃঙ্গ আবর্ত্তনকালে দুইটী অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়ন-গোচর হয়। গিরিশৃঙ্গের যে

দিক্ বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রের অভিমুখে অবস্থাপিত, গিরিশকট শৃঙ্গ আবর্ত্তন-কালে যখন সেই দিক্ দিয়া উপরে উঠিতে থাকে, তখন সম্মুখে পাদতলস্থ অনন্ততরুরাজিসমাচ্ছন্ন গিরিনদীসঙ্কুল ভূতলের অতি রমণীয় শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নদিকে তাকাইলে বোধ হয় যেন ভূতল নামিতেছে, যেন পাদপসমূহ ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া অবশেষে পত্ররাশির অভ্যন্তরে বিলীন হইতেছে, যেন গিরিনদীসকল ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে বিলীন বা রজতরেখারূপে পরিণত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন পৃথিবী গললগ্নকৃতবাসা হইয়া হিমালয়চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছেন। অবতরণকালে আবার ঠিক ইহার বিপরীত দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিশকট শৃঙ্গ প্রদক্ষিণ করিয়া যখন নামিতে থাকে, তখন বোধহয় যেন লুণ্ঠিতশরীর ধরিত্রীকে তুলিয়া কেহ আমার পার্শ্বে আনিতেছে, যেন বেণীভূত বা অন্তর্লীন স্রোতস্বিনীসকল সহসা স্ফীত ভাব ধারণ করিয়াছে এবং যেন পত্রাভ্যন্তরবিলীন তরুরাজি ক্রমে স্কন্ধ তুলিতেছে *।

গিরিশকট শৃঙ্গপ্রদেশ আবর্ত্তন করিয়া যখন গুহাপ্রদেশের অভিমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত সেই গভীর গুহাপ্রদেশের দিকে তাকাইলে বোধ হয় যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া মুখ ব্যাদান করিতেছে, যেন পৃথিবী জগতের সমস্ত জীব জন্তু ও উদ্ভিদ্নিচয়কে কুক্ষিগত করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। অনন্ত নির্ঝরমালা গিরিগাত্র বহিয়া প্রচণ্ড বেগে ভীষণশব্দে সেই গুহাপ্রদেশে পড়িতেছে, পড়িয়া মিলিত হইয়া নদীরূপে প্রচণ্ডতর বেগে ও কর্ণবিদারী রবে গুহাভ্যন্তর দিয়া বাহিরে গিয়া পড়িতেছে। গিরিমালার গাত্রে অনন্তকালের সাক্ষীভূত প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল প্রহরিরূপে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিখিলজীব-আবাস-ভূত নিবিড় ক্ষুদ্র বনী যেন গিরিমালার দেহকে বস্ত্ররূপে নীহারপতন হইতে রক্ষা করিতেছে। নানাবিধ পক্ষিগণ বিবিধ স্বরে গান গাইয়া পথিকের চিত্ত হরণ করিতেছে। শ্রবণবিদারী ঝিল্লীরবে চতুর্দ্দিক্ স্তম্ভিত হইতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয় তথায় গিয়া স্বতঃই চিন্তামগ্ন হয়। আমাদের তথায় গিয়া বস্তুতঃই মনে হইল যে 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'। সেই গুহাপ্রদেশে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইলে, বোধ হয় যেন সকল পদার্থেরই সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে। এই জন্যই ঋষিগণ

* শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণস্যান্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

যোগসাধনার নিমিত্ত এই সকল স্থানে অবস্থিতি করিতেন।

ইংরাজের অসাধ্য কার্য্যই নাই। ইংরাজ চা-করেরা সেই গভীর জনশূন্য গুহা-প্রদেশকে স্থানে স্থানে সুচারু চা-উদ্যানে পরিণত করিয়াছেন। সেই সকল উদ্যানস্থ শ্বেত কুটীরগুলি দূর হইতে ঠিক গুহায় ভাসমান বজরার মত বোধ হয়। সেই শ্বেত কুটীরের চতুর্দ্দিকস্থ শ্রেণীবিভক্ত চা-গুচ্ছ-পরিশোভিত চা-উদ্যানগুলি দূর হইতে দেখিতে অতি রমণীয়। সেই মানব-সমাগম-শূন্য রসাতলে দুই একটী শ্বেতপুরুষ কেমন করিয়া বাস করেন, কিরূপে তথায় তাঁহাদিগের খাদ্যযোজনা হয়, কিরূপেই বা তথায় তাঁহাদিগের দেহ ও মন সুস্থ থাকে, ভাবিয়া আমরা আকুল হই। জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, নিঃসঙ্গ যোগতাপসের ন্যায় এই শ্বেত উপাসকেরা সুদূর রসাতলে আসিয়া কমলার উপাসনায় নিমগ্ন আছেন। কমলা এরূপ উপাসকের অঙ্কশায়িনী কি বলিয়া না হইবেন ?

সিলিগড়ি হইতে **চুনভাঁটী** পঞ্চদশ মাইল। এই পঞ্চদশ মাইলের মধ্যে কোন ভাল আড্ডা নাই, এবং কোনপ্রকার খাদ্য পাইবার আশা নাই। অধিক কি পিপাসা পাইলে একবিন্দু জল মিলা দায়। এই প্রদেশকে পর্ব্বতের পাদদেশ বলা যাইতে পারে। ইহা প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমূহে ও ক্ষুদ্র বনীতে পরিপূর্ণ। এই প্রদেশে বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। চুনভাঁটীতে একটী হোটেল আছে, ও কয়েকখান দোকান আছে। দোকানে মোটা চিঁড়ে, চাউল, ডাউল প্রভৃতি পাওয়া যায়। হোটেলে সাহেবী রকমের খাদ্য প্রায় সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। নিতান্ত হিন্দুরকমের লোকের বিশেষ কষ্ট।

চুনভাঁটী হইতে **খরশান** আর পঞ্চদশ মাইল। এই পঞ্চ দশ মাইলের মধ্যে দুই একটী আড্ডা আছে। তথায় কুলীদের খাদ্যোপযোগী চাউল, ডাউল প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোকের আহারোপযোগী কিছুই পাওয়া যায় না। এই প্রদেশে কলা, ভুট্টা, ও চায় চাস দেখিতে পাওয়া যায়। খরশান একটী ক্ষুদ্র সহর, চা-কর-প্রধান মিউনিসিপালিটির অধীন। এখানকার জলবায়ু অতি চমৎকার। এখানে দার্জ্জিলিঙের মত প্রচণ্ড শীত নাই। মর্ত্তদেশবাসিদিগের (পার্ব্বতীয়েরা আমাদিগকে মদেশবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে; মদেশ মর্ত্তদেশের অপভ্রংশ) পক্ষে এ স্থান অতি প্রীতিকর। এখনও দার্জ্জিলিঙের জল গরম না করিয়া গায় দেয় কাহার সাধ্য ? কিন্তু খরশানের জল অতি স্নিগ্ধকর। গলিতরজতনিভ সেই জল অসংখ্য স্থানে অসংখ্য নির্ঝর হইতে অনবরত ঝরঝর শব্দে পতিত হইতেছে। পথিক ও অধিবাসীরা এ সময়ে সে জলে স্নান

ও সেই জল পান করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। এখানকার নির্ঝরসমূহের মধ্যে একটীর নাম "পাগ্‌লা ঝোরা" বা উন্মত্ত নির্ঝর। এই নির্ঝর খরশান শৃঙ্গ হইতে নানাদিকে পতিত হইতেছে। বৎসরে বৎসরে ইহার প্রচণ্ড স্রোতোবেগে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড সহ অনেকদূর পর্য্যন্ত গৈরিকপথ গুহানিহিত হয়। প্রতি বৎসর এখানকার গৈরিকপথের নব গঠনে বা জীর্ণসংস্কারে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা ব্যয় হয়। এই কার্য্যের জন্য সেখানে একজন সুপারভাইজর নিযুক্ত আছেন। বহুদিন হইতে একজন বাঙ্গালী এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইহার নাম ঘনশ্যাম বন্দোপাধ্যায়। দুই তিন বৎসর গত হইল, পাগলা ঝোরার স্রোতোবেগে গৈরিকপথ অনেকদূর পর্য্যন্ত এরূপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল যে কখন যে সেখানে কোন পথ ছিল তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। ঠিক সেই সময়ে ছোট লাট সাহেবকে কলিকাতায় আসিতে হইবে। বড় বড় সাহেব ইঞ্জিয়ারগণ দারজিলিঙ হইতে আসিয়া, দুই এক দিনের মধ্যে কিরূপে ছোট লাট সাহেবকে পথ দিবেন তদ্বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা করিতে লাগিলেন। বারুদের দ্বারা পাথর উড়াইয়া এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এতখানি পথ প্রস্তুত করা অসাধ্য-সাধন মনে করিয়া তাঁহারা সকলেই একে একে দার্‌জিলিঙে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ঘনশ্যাম বাবুর প্রতিভা এই অসাধ্য কার্য্যের সংসাধনেও কৃতকার্য্য হইল। তিনি দুই দিনের মধ্যেই ছোট লাট সাহেবের জন্য একটী গৈরিক পথ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ছোট লাট সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী ক্ষুদ্র অর্দ্ধ জায়গীর প্রদান করিয়াছেন। ঘনশ্যাম বাবু যেরূপ প্রতিভাশালী, সেইরূপ আতিথেয়। অনেক দার্জ্জিলিঙ-যাত্রীকে সময়ে সময়ে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। আমাদিগকেও যাইবার সময় তাঁহার আশ্রমে রজনী যাপন করিতে হইয়াছিল। সেই ভীষণ তমসাচ্ছন্ন রজনীতে অবিরাম জলধারা পড়িতেছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ঝরের শিলারাশি ভীষণ শব্দে গুহাগর্ভে নিপতিত হইতেছিল। ঘনশ্যাম বাবুর কুটীরের পার্শ্বে একটী নির্ঝর ছিল; সেই নির্ঝর সেই রজনীতে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই নির্ঝরের নিম্নস্থ গৈরিকপথে একটি কাষ্ঠ-সেতু ছিল। সেই সেতুতে প্রতিহত হইলে সেই নির্ঝরের জলরাশি শিলারাশি সহ তাঁহার কুটীরের উপর আসিয়া পড়িতে পারে; এবং তাহা হইলে তাঁহার কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীর অভ্যন্তরস্থ প্রাণিবর্গের সহিত অতুল রসাতলে গিয়া পড়িবে; এই ভয়ে ঘনশ্যাম বাবু সেই গভীর রাত্রিতে কাষ্ঠসেতু কাটিয়া দিলেন। তাঁহার কুটীর ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগেরও প্রাণরক্ষা হইল। ভয়ে সমস্ত রাত্রি আমাদিগের নিদ্রা হইল না। প্রত্যূষে টঙ্গার ভেরীরবে

শয্যা হইতে উঠিয়া আমরা টঙ্গারোহণে দার্জ্জিলিঙাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

খরশান হইতে সোণাদহ বা হোপ-টাউন প্রায় দশ মাইল। সোণাদহ শীতপ্রধান স্থান। এখানকার শীত দার্জ্জিলিঙের শীত অপেক্ষা কম নহে; কাহারও কাহারও মতে বরং কিঞ্চিদধিক। বিগত শীতকালে আমি এখানে একরাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। সে রাত্রিতে আমার বোধ হইয়াছিল যেন আমার শরীর জমিয়া যাইতেছে, যেন আমি তুষার-শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, যেন পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, বস্তুতঃ আমার দার্জ্জিলিঙে এরূপ শীত বোধ হয় নাই। সর্ষপতৈল জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হইতে আমি কেবল এইখানেই দেখিয়াছিলাম। এখানে কয়েক খানি দোকান, একটী ডাকঘর, এবং বার্ড ও ক্যারিয়িং কোম্পানীর আড্ডা আছে। এখানকার পোষ্ট মাষ্টার এবং বার্ড ও ক্যারিয়িং কোম্পানীর এজেণ্ট-দ্বয় বাঙ্গালী ও অতি আতিথেয়। সেই মরুতুল্য নির্জ্জন শৃঙ্গ-প্রদেশে—যথায় অর্থ থাকিলেও ইচ্ছামত কিছুই মিলে না—আতিথ্য যে কি অমূল্য ধন, যাঁহারা কখন সেরূপ স্থানে রাত্রি যাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন।

সোণাদহ হইতে ছয় মাইল যাইয়া জোর বাঙ্গালা নামক একটী আড্ডায় উপস্থিত হইতে হয়। এখানেও অনেকগুলি দোকান, ও কতকগুলি সামান্য কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়। জোর-বাঙ্গালা হইতে তিনটী পথ দার্জ্জিলিঙা-ভিমুখে গমন করিয়াছে। একটী পুরাতন দার্জ্জিলিঙ্ পথ, ইহার নাম অকল্যাণ্ড রোড। দ্বিতীয়টী সরলতম পথ। ইহা জলাপাহাড়ের উপর দিয়া দার্জ্জিলিঙে গিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়টী আধুনিক গিরিক্ষুণ্ণ পথ। এই পথে এখন টঙ্গা যাতায়াত করে। দ্বিতীয় পথ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতে বিশেষ আমোদ। তৃতীয় পথ দিয়া এক্ষণে লোকে ততদূর যাতায়াত করে না। জোরবাঙ্গালা হইতে আর একটী পথ সিঞ্চলাভিমুখে গমন করিয়াছে। আধুনিক গিরিক্ষুণ্ণ পথ দিয়া যাইতে হইলে, জোরবাঙ্গালা হইতে দার্জ্জিলিঙ প্রায় পাঁচ মাইল; জলা-পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে হইলে প্রায় তিন মাইল।

দারজিলিঙ শৃঙ্গমালার মধ্যে সিঞ্চল-শৃঙ্গ সর্ব্বোচ্চ। ইহা প্রায় নয় হাজার ফুট উচ্চে। পূর্ব্বে ইহারই উপর ইংরাজ সেনানিবেশ সন্নিবেশিত ছিল। কিন্তু এখানে এতদূর শীত যে শীত-প্রধান-দেশ-বাসী ইংরাজকেও এস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছে। এখানে সততই বরফ পড়ে, এবং শীত-কালে এই শৃঙ্গে আরোহণ করা অতি ক্লেশকর। এখানে পূর্ব্ব সেনানিবেশের ভগ্নাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে। অনেকে ইচ্ছা করিয়া ইংরাজের কীর্ত্তি স্তম্ভ-স্বরূপ

সেই সকল ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে যায়। জোরবাঙ্গালার উপরেই জলাপাহাড়। জলাপাহাড় উচ্চে প্রায় আটহাজার ফুট। বর্ত্তমান ইংরাজ সেনানিবেশ ইহারই উপর সন্নিবেশিত। ইহা দূর হইতে ঠিক কৈলাস পর্ব্বতেব ন্যায় বোধ হয়। এই শৃঙ্গের উপরিভাগ প্রস্তরোৎক্ষিপণ (Blasting) বিদ্যার অপূর্ব্ব মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এই বিদ্যাবলে ইহা প্রায় সমস্তই সমতল-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেই সমতল ভূমির উপর অসংখ্য সৈনিকাবাস ধবল মস্তক উন্নত করিয়া পাহাড়ের অপূর্ব্ব শোভা বিধান করিতেছে। সেই শ্বেত অট্টালিকা সমূহের অভ্যন্তরে শ্বেত পুরুষ, শ্বেত ললনা, শ্বেত শিশুগণ যেন ধবল মেঘমালার কোলে বলাকাশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। অঙ্গন শ্বেত, অট্টালিকা শ্বেত, ভূমিতল শ্বেত, পথ শ্বেত, পথিক শ্বেত, অট্টালিকা-বাসী শ্বেত—সমস্তই শ্বেত দেখিয়া হৃদয়ের মলিনতা থাকিতে পারে না। সেই স্বর্গীয় স্থানে স্বর্গীয় ভাব আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই কৈলাসোপম গিরিশৃঙ্গে যখন রণবাদ্য বাজিতে থাকে, তখন অতীত দেবগণের ন্যায়, নির্বীর্য্য বাঙ্গালীরও অন্তরে অসুরবিজিগীষা বলবতী হইয়া উঠে।

জলাপাহাড় হইতে দার্জিলিঙ নগর পাঁচশত ফুট নিম্নে। গত অক্‌টোবর মাসে আমি যখন দার্জিলিঙ গিয়াছিলাম, তখন অশ্বারোহণে এই জলাপাহাড়ের উপর দিয়া দার্জিলিঙে অবতরণ করিয়াছিলাম। সেই সময় জলাপাহাড় হইতে দার্জিলিঙ ও ধবলগিরির শোভা সন্দর্শন করিয়া আমি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। উত্তরে ধবলগিরি রজত-নির্ম্মিত অত্যুচ্চ প্রাকারের ন্যায় যেন দার্জিলিঙনগরকে উদীচ্য আক্রমণ-কারী হইতে রক্ষা করিতেছে। ধবল গিরির সেই রাজত শোভার তুলনা পৃথিবীতে আছে কি না জানি না। কালিদাস কৈলাসপর্ব্বতকে দেবাঙ্গনা-গণের দর্পণস্বরূপ ও ইহার শৃঙ্গনিচয়কে প্রতিদিন রাশীকৃত মহাদেবের অট্টহাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন †। আমরা বলি এই রূপক ধবল গিরিস্থলেও অতি উৎকৃষ্টরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে।

অক্টোবর নবেম্বর মাসে জলাপাহাড়ের উপর হইতে দার্জিলিঙ দেখিতে অতি রমণীয়। ইহার শ্বেত সৌধরাজি সেই উচ্চ শৃঙ্গ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত কুটীরবৎ প্রতীয়মান হয়। বর্ষাকালে সেরূপ অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাওয়া যায় না। এসময়ে অনন্ত মেঘে সে নিম্ন শৃঙ্গ গুলি সতত আচ্ছন্ন থাকায়, কিছুই ভাল দৃষ্টিগোচর হয় না। যে দিকে তাকাও কেবল মেঘ। কখন কখন এক আধবার সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

† গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত-প্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতা-দর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥

সেই সময় যেন সমস্ত প্রকৃতি একবারে হাসিয়া উঠে। ঘোরতর-মেঘাচ্ছন্ন অমানিশিতে সৌদামিনী-বিলসনে যে শোভা, সেই দৃশ্যে সেই হৃদয়হারিনী শোভা!

জলাপাহাড় হইতে দার্জ্জিলিঙ নামিবার সময় বোধ হয় যেন কৈলাস হইতে নামিয়া হিমালয়-প্রদেশে আসিয়া পড়িতেছি। এবার জলাপাহাড়ের উপর দিয়া যাই নাই। এবার টঙ্গাযোগে গমন করায় আমাদিগকে জলাপাহাড় প্রদিক্ষিণ করিতে করিতে ক্রমশঃ নামিয়া দার্জ্জিলিঙ শৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছিল, সুতরাং অবতরণের আমোদ অনুভব করিতে পারা যায় নাই। আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় দিবসে আমাদিগের টঙ্গা মেঘ ভেদ করিয়া দুন্দুভিধ্বনি করিতে করিতে বেলা দশ ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিঙে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা চূর্ণ বিচূর্ণ শরীরে আর্দ্র বসনে মৃতবৎ টঙ্গা হইতে নামিয়া আপন আপন বাস্কবাবাসে গমন করিলাম।

যোগ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চদশাধ্যায়ে মহাযোগী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগীদিগের অষ্টাদশ যোগ সিদ্ধির বিষয়ে উদ্ধবকে যাহা বলিয়াছেন তাহাই নিম্নে লেখা যাইতেছে। অষ্টাদশ যোগ সিদ্ধির প্রথম আটটি শ্রীকৃষ্ণে ও মহাদেবে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করে।

এই অষ্টসিদ্ধি নারায়ণের ও শঙ্করের প্রকৃতি-সিদ্ধ ঐশ্বর্য্য। অপর দশটির কারণ ও অষ্টৈশ্বর্য্যের নাম ও গুণ যথা—অণিমা১ মহিমা২ লঘিমা৩ এই তিনটি সিদ্ধি। চতুর্থ প্রাপ্তি নামা সিদ্ধি। উহার ফল তাবৎ ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, প্রাকাম্য নামে যে পঞ্চমী সিদ্ধি তদ্দারা দূরদর্শন-ক্ষমতা জন্মে। ঈশিতা নামে যে ষষ্ঠী যোগসিদ্ধি জন্মে, তাহা হইতে মায়া ও মায়া সকলের অংশ বিস্তার করা যায়। সপ্তমী সিদ্ধির নাম বশিতা। ইহার দ্বারা বিবিধ বিষয় ভোগে সঙ্গহীনতা জন্মে। অষ্টমী সিদ্ধির ফল এই যে যাহা যাহা কামনা করা যায় তাহার অন্ত পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। অণিমার গুণ এই যে অণু হইতেও অণু হইতে পারা যায়। লঘিমার গুণ এই যে বায়ু অপেক্ষাও লঘু অর্থাৎ পাতলা হইতে পারা যায়। মহিমা দ্বারা যতদূর মহত্ব হইতে পারে, ততদূর মহান্ হইতে পারা যায়।

ভগবানের এই স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যের বিষয় বলা গেল।

অতঃপর গুণজা দশ সিদ্ধির বিষয় লেখা যাইতেছে। দেহে ক্ষুৎপিপাসাদি-রাহিত্য, কামপীড়ারাহিত্য, অসাধারণ শ্রবণ ও দর্শন জ্ঞান, মনোবেগে দেহের সর্ব্বত্র গতি, অভিলষিতরূপ প্রাপ্তি, পর-শরীরে প্রবেশকরণ, স্বেচ্ছামৃত্যু, অপ্সরোগণের সহিত দেবতাদিগের যে ক্রীড়া তাহা প্রাপ্তি, মনোগত বস্তু লাভ, অপ্রতিহতগতি প্রাপ্তি, এই গুণজা-সিদ্ধি।

সিদ্ধ যোগিগণ এই সকল যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবানের তুল্য ক্ষমতাশালী হইয়া মানব জন্ম সফল করেন। এতদ্ভিন্ন অবান্তরিক আরও সাধারণ যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। যথা, ত্রিকালজ্ঞতা—শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, পরচিত্ত পরিজ্ঞাত হওয়া, অগ্নি জল ও সূর্য্য ও বিষ প্রভৃতিকে স্তম্ভিত করিয়া রাখা, আর উহারদিগের ক্ষমতাকে পরাজিত করা এ সকল যোগসিদ্ধির কার্য্য।

অতঃপর ধারণার বিষয় লেখা যাইতেছে। অর্থাৎ—যে ধারণার দ্বারা যে প্রকারে যেরূপ যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে তাহা। যে ব্যক্তি অতি সূক্ষ্ম ভূতাতীত পরমাত্মাতে সূক্ষ্মভূতাকার নিজ মনকে ধারণা করেন, অর্থাৎ সংস্থাপন করেন, তিনি অতি সূক্ষ্মের উপাসনা করায় অণিমা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। ১।

যিনি মহত্তত্ত্বাত্মক ভগবানে মহত্তত্ত্বাত্মক স্বীয় মনকে ধারণা করিতে পারেন, তিনি মহিমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন অর্থাৎ আকাশাদি ভূতের মহত্ত্ব লাভ করেন। ২।

যিনি যাবদীয় ভূতের পরমাণু পরমাত্মাতে নিজ চিত্তকে ধারণা করিতে পারেন তিনি কালের পরমাণুস্বরূপ লঘিমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ৩।

যিনি বৈকারিক অহং-তত্ত্বাত্মক মনকে একাগ্রতারূপে ভগবানে সংস্থাপিত করিতে পারেন তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ প্রাপ্তিসিদ্ধিলাভ করেন। ৪।

যিনি সকলের সূত্রভূত মহান্ পরমাত্মাতে স্বকীয় ক্ষুদ্র মনকে ধারণা করেন তিনি অব্যক্তজন্মা ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। ৫।

যে ব্যক্তি ত্রিগুণা মায়ার অধীশ্বর সৃষ্টি-কর্ত্তা বিষ্ণুতে মন ধারণা করেন তিনি জীব সকলের উপাধিরূপা প্রেরণাস্বরূপ ঈশিতা সিদ্ধিলাভ করেন। ৬।

যিনি, ভগবান্‌শব্দ-প্রতিপাদ্য চতুর্থ নামক নারায়ণে অর্থাৎ বিরাট্, হিরণ্য-গর্ভ, ও কারণ শরীরের অতিরিক্ত পুরুষে মন ধারণা করেন তিনি বশিতা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ৭।

যিনি নির্গুণ পরমাত্মাতে নির্ম্মল বিশদ মনকে ধারণা করেন তিনি পরমানন্দরূপা অষ্টমী সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ইহা হইলে সমুদায় অভিলাষ সমাপ্ত হয়। ৮।

আকাশস্থ অভিব্যক্ত বাক্য শ্রবণোপায়। আকাশাত্মাতে মনদ্বারা শব্দ ভাবনা করিয়া জীব আকাশস্থ অভিব্যক্ত প্রাণিগণের বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে পারে।

চক্ষুকে সূর্য্যে, সূর্য্যকে চক্ষে যোজনা করিয়া তাহাতে মন দ্বারা মরমাত্মাকে গাঢ় চিন্তা করিলে দূর হইতে বিশ্বসংসারকে জীব দেখিতে পান।

মন আর দেহকে এই উভয়ের অনুবর্ত্তী বায়ু দ্বারা সুন্দররূপে পরমাত্মাতে যোজনা করত যে ধারণা অনুষ্ঠান করা হয় তাহার প্রভাবে মন যে স্থানে গমন করে, দেহও সেই স্থানে যায়।

যোগী নিজ মনকে উপাদান কারণ করিয়া যখন যেরূপ হইতে অভিলাষ করেন, তখনি মনের সেই সকল বাঞ্ছিত রূপ ধারণ করিতে পারেন। ইহার কারণ পরমাত্মাতে মনের ধারণা শক্তি।

সিদ্ধযোগী—পর-দেহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাতে নিজ আত্মাকে চিন্তা করিবেন। তাহা হইলে নিজ আত্মা স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণবায়ু হইয়া ভ্রমরের ন্যায় পরদেহে প্রবেশ করিবেন।* যে দেহে প্রবেশ করিতে হইবে অগ্রে সেই দেহের জীবাত্মাকে অন্য দেহে চালনা করিতে হইবে।

যোগীদিগের যেরূপে ইচ্ছা-মৃত্যু হইয়া থাকে তাহা লেখা যাইতেছে।

যোগী—যতক্ষণ যোগসিদ্ধ না হইবেন ততক্ষণ ইচ্ছামৃত্যু হইতে বঞ্চিত হইবেন। যোগ-সিদ্ধ হইলে যোগীর ইচ্ছামৃত্যু হইবে।

ইচ্ছামৃত্যুর ক্রম। যোগী পার্ষ্ণি দ্বারা গুহ্য দেশ চাপিয়া প্রাণোপাধিক আত্মাকে হৃদয়, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, ও মস্তকে কুম্ভক দ্বারা তুলিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র-দ্বার দিয়া অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া পরমাত্মাতে লইয়া অর্থাৎ সহস্রারে লইয়া নিজ ভৌতিক স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকারে দেহত্যাগ করিলে অপমৃত্যু-গ্রস্ত হইতে হয়। ধারণাক্ষম পরমাত্মাপরায়ণ যোগী যখন যাহা চিন্তা করিবেন সত্য-সংকল্প পরমাত্মা তখনি তাহা প্রদান করিবেন। ইহা হইতে প্রভুতা আর কি আছে?

যে যোগীর ধারণা-শক্তি বিশেষরূপে জন্মিয়াছে আর ভগবদ্ভক্তি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে এরূপ যোগীর জন্ম মৃত্যু সহিত ত্রৈকালিক জ্ঞানও জন্মিয়াছে। ইহার দেহ ও মন অশ্রান্ত হেতু অনলাদি দ্বারা ব্যাহত হয় না।

গৃহস্থাশ্রম-পরিত্যাগী যোগীরা স্ত্রীলোকের দর্শন স্পর্শন ও আলাপ ও তাহারদিগের সহিত পরিহাসাদি পরিত্যাগ করিবেন। এতদ্ভিন্ন মিথুনীভূত প্রাণিমাত্রই অগ্রে পরিত্যাজ্য। শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, ভগবদর্চ্চনা, তীর্থসেবা, বৈধ জপ করত অস্পৃশ্য, অভোক্ষ্য, অনালাপ্য পরিত্যাগ, সর্ব্বপ্রাণিতে ভগবদ্ভাবনা, এবং মন, বাক্য, দেহ সংযম করা যোগীমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

প্রাণায়াম অভ্যাসের শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নিয়ম। যিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন, তিনি প্রথমে অতি পবিত্র হইয়া নীরোগ শরীরে অতি উচ্চও নহে ও অতি নিম্নও নহে এমন আসনে সবল শরীরে যথাসুখে উপবেশন করত ক্রোড়ে হস্ত-দ্বয় রাখিয়া নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিস্থাপন পূৰ্ব্বক পূরক কুম্ভক ও রেচক দ্বারা প্রাণবায়ুর পথ সুষুম্নানাড়ী পরিষ্কার করিবেন; এবং ইন্দ্রিয়গণকে তাহারদিগের নিজ নিজ বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বিপর্য্যয়-ক্রমে ও অল্পে অল্পে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন। হৃদয়ে স্থিত প্রাণবায়ুদ্বারা অতি সূক্ষ্ম ওঁকারকে উৰ্দ্ধে লইয়া অর্থাৎ সহস্রারে লইয়া ঐ ওঁকারের মস্তকে বিন্দু যোজনা করিবেন। এইরূপ ওঁকার-সংযুক্ত প্রাণায়াম ত্রিসন্ধ্যা দশবার করিয়া অভ্যাস করিলে এক মাসের মধ্যেই প্রাণবায়ু জয় করিতে পারিবেন। ইহা তাবৎ যোগের মূল।

যোগী যখন কুম্ভক করিয়া হৃদয়-স্থিত ওঁকারকে চিন্তা করিবেন, তখন অবিচ্ছিন্ন ঘণ্টারব শুনিতে পাইবেন।

আর মৃণালসূত্রতুল্য অতি সূক্ষ্মরূপ ওঁকারকে দর্শন করিবেন। সেই ওঁকারের জ্যোতিতে হৃদয় যেন আলোকিত হইয়াছে এরূপ অনুভব হইতে থাকিবে। এই প্রকারে যোগী যদি একমাস কাল প্রাণায়াম যোগাভ্যাস করেন তাহা হইলে প্রাণবায়ুকে জয় করিতে পারিবেন। প্রাণবায়ুকে জয় করিতে পারিলে যোগী স্বীয় হৃৎপথে নারায়ণরূপ সন্দর্শন করিতে পারিবেন। যথা হৃৎপদ্মের নাল ঊর্দ্ধদিকে, পথের মুখ অধোদিকে যেমন মুকুলিত কদলী পুষ্প তদ্রূপ হৃৎপথ।

সেই অন্তঃস্থ হৃৎপথে মিলিত অপর ঊর্দ্ধমুখ প্রস্ফুটিত অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় ক্রমে ক্রমে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির চিন্তা করিতে হইবে। সেই অগ্নির মধ্যস্থলে নারায়ণকে যেরূপে ভাবনা করিতে হইবে তাহা নিবিড় মেঘের ন্যায় শ্যাম বর্ণ শ্রীবৎস-চিহ্নিত এবং লক্ষ্মীর নিকেতন। চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী বনমালা—বিভূষিত সুন্দর সুপ্রকাশ্য সহাস্য আস্য ও অতি রম্য সুন্দর গ্রীবা সমন্বিত, নূপুর সমূহ দ্বারা পদদ্বয় বিরঞ্জিত; কৌস্তুভ মণি দ্বারা বক্ষঃস্থল সুরম্য; অতি দীপ্তিশালী কিরীট, কটক, কটিসূত্র, ও অঙ্গদে অলঙ্কৃত। সমুদায় অঙ্গ সুন্দর ও মনোহর প্রসন্নতা হেতু মুখ ও নয়ন অতি শোভাকর। ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে মনঃ সংস্থাপন পূর্ব্বক ধ্যান করিতে হয়। যদিচ পরমাত্মা অরূপ, তথাপি তিনি ভক্তের ভক্তিতে আবদ্ধ হইয়া স্বরূপের বিরুদ্ধে সাকার হইয়া ভক্তের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহার কেবল বিভূতি চিন্তা করেন তাঁহারা তাঁহাকে বিজ্ঞান দ্বারা অনুভব করিয়া চরিতার্থ হন। পরমাত্মা সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের পরবর্ত্তী। আকাশের ন্যায় সর্ব্বাধার, নির্ব্বিকার, অন্ত ও উপমা রহিত। যোগীরা চিত্ত শুদ্ধি করিয়া

প্রাণায়ামে কৃতকার্য্য হইয়া অনুমানগর্ত্ত বুদ্ধি দ্বারা আত্মনিষ্ঠ আত্মাকে চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের মত।

অতঃপর যোগ-সিদ্ধির ও আত্মজ্ঞানের প্রকৃত কারণ সাধুসঙ্গের বিষয় বলিব। বিনা সাধুসঙ্গে যোগসিদ্ধি ও আত্মবোধ হইবার নহে। এনিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সাধুসঙ্গোপাখ্যান লেখা যাইতেছে। সাধু তাঁহাকে বলা যায় যিনি 'আনন্দাম্বু ভবাত্মক পরমাত্মাতে দৃঢ় ভক্তি লাভ করত ধৌত-পাপ হইয়া জগতের মিত্র হইয়াছেন। এতাদৃশ সাধু-সংসর্গের ফল সাধু হওয়া ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তির অগ্নি, যেমন জল-নিমগ্ন ব্যক্তির নৌকা, তেমনি ঘোরসংসার-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির সাধু-সঙ্গ। দেবতা, পুণ্যক্ষে , ও তীর্থ সকল দীর্ঘকালে অল্পে অল্পে লোক সকলকে পবিত্র করে, সাধুরা অল্প-কালেই একেবারে উহাদিগকে পবিত্র করেন।

এই সংসার-মধ্যে ক্ষণার্দ্ধ মাত্রেরও জন্য সাধুসঙ্গ মানবদিগের সম্বন্ধে আনন্দপ্রদ। সাধুদিগের চেষ্টা ও দেশ বিদেশ পর্য্যটন কেবল লোক সকলকে পবিত্র করণ জন্য বৈ অন্য কিছুই নহে।

যে যোগী পরমাত্ম-জিজ্ঞাসু হইবেন, তিনি যেন শব্দব্রহ্মের পারগত এবং পরমাত্মায় নিমগ্ন যে সাধু তাঁহার শরণ লন। কিন্তু কিছুতেই অনুপশমাশ্রয়ী অসাধুর শরণ লইবেন না।

এক্ষণে বিজ্ঞান-প্রদাতা চতুর্ব্বিংশতি গুরুর বিষয় বলা যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ সপ্তাধ্যায়ে যাদবকুলতিলক যদু অবধূতের নিকট সেই সকল গুরুর ও জ্ঞানের কথা শুনিয়া বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই বিষয় সাধারণের বোধের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বঙ্গভাষায় যথা জ্ঞান লেখা যাইতেছে।

অবধূতোক্তি। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, রবি, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, গজ, মধুহা, হরিণ, মীন, পিঙ্গলা, কুরু, বালক, কুমারী, শরকার, সর্প, ঊর্ণনাভি, সুপেশ-কার।

এই চতুর্ব্বিংশতি গুরুর নিকট হইতে যে যে বিষয় উপদেশপাওয়া যায়,তাহা।

দৈববশের অনুগামী ভূতগণকর্ত্তৃক পীড্যমান হইলেও উহা জানিয়া সুধীর ব্যক্তি আপন আপন পথ হইতে কদাচ বিচলিত হইবেন না।

পৃথিবী—অগ্নি জল বায়্বাদির উৎপাত সর্ব্বদা সহ্য করিয়াও আপন পথ পরিত্যাগ করেন না। পৃথিবীর নিকটে এই ধৈর্য্যগুণ শিক্ষা করিবে। যোগীগণ যেমন পৃথিবী হইতে ধৈর্য্যগুণ লইবেন তদ্রূপ পর্ব্বত আর পাদপ হইতেও যে যে বিষয় শিক্ষা করিবেন তাহা বলা যাইতেছে। পর্ব্বত হইতে সর্ব্বদা পরোপ-কারার্থ চেষ্টা ও জন্ম হওয়া শিক্ষা করিবেন। বৃক্ষের শিষ্য হইয়া

আপনাকে পরাধীন করা এবং চৈতন্যের অবিরোধী প্রাণবৃত্তি দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়া শিক্ষা করিবেন।

বায়ু হইতে যাহা যাহা শিক্ষা করিবেন তাহা বলা যাইতেছে—

যোগী সর্ব্বতঃ নানাধর্ম্মশীল বিষয় সকল সেবা করিয়াও তাহাদিগের গুণ এবং দোষ হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখিয়া বায়ুর ন্যায় লিপ্ত হইবেন না। আত্মদর্শী যোগী পার্থিব দেহ অবলম্বন করিয়া এবং দৈহিকগুণক্রিয়ার আধার হইয়াও গন্ধসমূহের সহিত বায়ুর ন্যায় ঐ গুণ ক্রিয়ায় লিপ্ত হইবেন না।

আকাশ-গুরুর নিকট হইতে এই শিক্ষা করিতে হইবে। আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপক হইয়াও আধারভেদে ঘটাকাশ মঠাকাশ বলিয়া লোকে বিদিত, কিন্তু ঘটমঠাদি ধ্বংস হইলে যে মহাকাশ সেই মহাকাশ হইয়া যায়, তদ্রূপ দেহ ভেদে চৈতন্যদেবকে মানুষ; গোরু, হাতী ঘোড়া বলিয়া বোধ হয়। মানুষ গোরু হাতী ঘোড়ার শরীর ধ্বংস হইলে যে চৈতন্য সেই চৈতন্যই থাকে, তাহার ব্যত্যয় হয় না, তেমনি যোগী নিজ চৈতন্যকে দেহের অন্তর্গত জানিয়াও তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপতা বোধ করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদি দেহ সকলের সহিত সম্বন্ধ জন্য যে ব্যাপ্তি, তদ্দ্বারা বিস্তৃত চৈতন্যের আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্নতা ও অসঙ্গতা ভাবনা করিবেন। আকাশ যেমন বায়ুচালিত মেঘাদি দ্রব্যের সহিত সংস্পৃষ্ট হয় না, তেমনি জীব পার্থিব জলীয় তৈজস কালসৃষ্ট গুণগণের সহিত স্পৃষ্ট হন না।

জলের নিকটে নির্ম্মলতা, স্নিগ্ধতা, মধুরতা, তীর্থভূতত্তা, বন্ধুতা, শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। অগ্নির নিকট হইতে যাহা যাহা শিক্ষা করিতে হইবে তদ্বিবরণ। তেজস্বিতা, দুর্দ্ধর্ষতা, পরিগ্রহশূন্যতা, সর্ব্বভোজিতা, মলগ্রহণশূন্যতা, প্রচ্ছন্নতা, অপ্রচ্ছন্নতা, সর্ব্ব-উপাস্যতা, অশুভনাশকতা ইত্যাদি। অগ্নি যেমন কাষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করেন, আত্মা তেমনি নিজ মায়া দ্বারা সৃষ্ট সদসৎস্বরূপ বিশ্বে প্রবেশ করতঃ স্বকীয় মহিমা প্রচার করেন। চন্দ্রের নিকটে এই শিক্ষা লাভ করিবে। যেমন অব্যক্তগতি কাল কর্ত্তৃক চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না; সেইরূপ জন্ম অবধি শ্মশান পর্য্যন্ত অবস্থা সকল দেহেরই হয় আত্মার নহে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

সূর্য্যের নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করিতে হইবে তাহা বলা যাইতেছে।

সূর্য্য যেমন করনিকর দ্বারা পার্থিব রস ও জল গ্রহণ করিয়া সময়ানুসারে আবার তাহা পৃথিবীতে পরিত্যাগ করেন, এইরূপ যোগীও ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা রূপরসাদিকে অল্পে অল্পে গ্রহণ এবং উপযুক্ত সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

যখন পরমাত্মা স্বরূপে অবস্থিত হন তখন তাঁহাকে স্বরূপের অন্য কোন

বস্তু বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তিনি যখন উপাধিতে অর্থাৎ জগতাকারে প্রতিবিম্বিত হন তখন সাধারণ লোকে তাঁহাকে জগৎ বলিয়া স্বতন্ত্র বোধ করে। যেমন এক সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জল-তরঙ্গে পতিত হইলে সহস্র সহস্র সূর্য্য দেখা যায়, তেমনি জগৎরূপ জল-তরঙ্গে এক পরমাত্মার প্রতিবিম্ব পতনে আত্মার অসংখ্যত্ব বোধ হয়। সূর্য্য হইতে এই জ্ঞান লাভ হইয়াছে।

জঘন্য মায়ায় আবদ্ধ হইয়া যেরূপে ইহকাল পরকাল বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা কপোত হইতে বিশেষরূপে জানা গিয়াছে। ইহার স্থূল বৃত্তান্ত এই—

কোন অরণ্যে এক কপোত আর এক কপোতী দাম্পত্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া কিছু দিন বাস করায় কপোতী গর্ভ ধারণ করে। পরে সেই গর্ভ হইতে কতিপয় অণ্ড প্রসব হয়; অণ্ড হওয়ায় ভগবন্মায়া প্রভাবে তাহাদিগের যথেষ্ট আনন্দলাভ হইল; অণ্ড যথা কালে প্রস্ফুটিত হইলে কতিপয় শিশু শাবক জন্মিল, ইহাতে ঐ দম্পতীদ্বয়ের আরও আনন্দ জন্মিল। একদা কপোত-কপোতী শাবকদিগের আহারান্বেষণার্থ দূরে গমন করিল। ইত্যবসরে কোন ব্যাধ শিকারার্থ ঐ স্থানে আসিয়া দেখিল দিব্য কপোত-শাবক বিচরণ করিতেছে। তাহাতে ব্যাধের লোভ-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে ব্যাধ বাগুরা বিস্তার করিয়া তণ্ডুল কণাবিক্ষেপ করত বৃক্ষান্তরালে বসিয়া থাকিল। কপোত-শাবকেরা প্রক্ষিপ্ত তণ্ডুলকণার লোভে সেই বাগুরাতে নিপতিত হইয়া বদ্ধ হইলে কপোতী আসিয়া দেখিল সন্তানগুলি ব্যাধের হস্তগত হইয়াছে। বিষ্ণু-মায়ায় বিমোহিতা কপোতী পুত্রশোকে অধীরা হইয়া সেই জালে আপনিও পতিতা হইল। এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই গৃহধর্ম্মী কপোত ঐ স্থানে আসিয়া ভার্য্যা পুত্রদিগের তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া শোকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইল ও প্রাণ পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া ভার্য্যা পুত্রদিগের অনুগামী হইয়া ব্যাধহস্তে নিপতিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া সংসার-মায়া যে অতি অনিষ্টকর তাহা বিলক্ষণ রূপে বোধ হইয়াছিল। ইহাতে নির্ব্বোধ কপোতকপোতীর নিকটে দুস্ত্যাজ্য সংসার-মায়ার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দেখা গেল।

অতঃপর অজাগরের নিকটে অজগরবৃত্তি অভ্যাস করা নারায়ণপরায়ণ যোগীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে সাধু ইন্দ্রিয় সত্বে নির্বিন্দ্রিয়ের ন্যায় অবস্থিতি করত নিরবচ্ছিন্ন দৈবনির্ভর করত জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তিনিই অজগর-বৃত্তি-অনুসারী সাধু। এ বৃত্তি মায়ায় বিমোহিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। কিন্তু নির্ম্মায়িক সাধুসংহতির একান্ত আদরণীয়। সাগর-বৃত্তি অবলম্বন করিলে ইন্দ্রিয়-চাপল্য একেবারে বিদূরিত হওয়াতে প্রশান্ত-সাগর-সদৃশ-স্থির হওয়া

যায়। ইহা সাগর-বৃত্তির ফল। অতঃপর ভ্রমরের নিকটে যাহা শিক্ষা করিতে হইবে তাহা বলা যাইতেছে।

ভ্রমর বিনা পীড়নে পুষ্প হইতে যেমন অল্প অল্প করিয়া মধু আহরণ করে, তদ্রূপ যাহাতে শরীর নষ্ট না হয় এবং গৃহ পীড়া না জন্মে অল্প অল্প করে যাচ্ঞালব্ধ সামগ্রীতে সাধুরা প্রাণ ধারণ করত পরিতৃপ্তি বোধ করিবেন।

ষট্পদ যেমন যাবতীয় পুষ্প হইতে পুষ্পসার মধু গ্রহণ করে, সাধু সকল তেমনি তাবৎ শাস্ত্র হইতে সারভূত ভগবচ্চরিত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করিবেন।

পতঙ্গ-বৃত্তি দর্শন করিয়া যে জ্ঞান পাওয়া গিয়াছে আমরা তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রাকৃতিক প্রতিসঞ্চারের অন্তর্গত পতঙ্গজাতি নিতান্তই রূপের বশীভূত হইয়া যামিনী-জাত জাজ্বল্যমানা দীপশিখা আলিঙ্গনে আত্মবিসর্জনে নয়ন যেমন চরিতার্থ করে, তদ্রূপ কামান্ধ স্ত্রীপুরুষ নিকৃষ্ট কামে অন্ধ হইয়া কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করণ নিমিত্ত মিলিত হইয়া মানব-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পতঙ্গের ন্যায় অমূল্য জীবন-ধন পরিত্যাগ করে।

যে মানব স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধুসঙ্গে সহবাস না করিয়া অথবা ভগবানে প্রেম না করিয়া সামান্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের জন্য স্ত্রীজাতির গরল-পূরিত হৃদয়ে আত্ম-হৃদয় সমর্পণ করে এমন যোনিকীট অতি অপদার্থ।

মহারাজ আমি গজের নিকটে যাহা দীক্ষিত হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুণ।

কোন হস্তিপক আরণ্য হস্তী ধরিবার কারণ আপন পালিতা একটী গ্রাম্য করিণী লইয়া যথায় আরণ্য করী বাস করে তথায় রহিতে লাগিল। পালিতা করিণী আরণ্য করীকে দেখিবামাত্র তাহার সহিত নাগরিক বারবিলাসিনীর ন্যায় ভুলাইয়া মোহিত করিলে ঐ হস্তিপক তাহাকে দৃঢ়তর লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আপন স্থানে লইয়া আইসে। এইরূপ পুরুষ যত দিন স্ত্রীলোকের সংসর্গে সংসাররূপ দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ভগবানকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া থাকে, ততদিন পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করে। স্ত্রীসংসর্গজনিত আপদ হাতীর নিকটে যেমন শিক্ষা পাইয়াছি এমন কুত্রাপি পাই নাই।

মহারাজ মধুহা দ্বারা যে জ্ঞান পাওয়া গিয়াছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

মধুহা মধু অন্বেষণার্থ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধুমক্ষিকার অনুসন্ধান করিয়া অরণ্য ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে মধুমক্ষিকা সকল দলবদ্ধ কিম্বা ২। ১ টি দেখিতে পায়, সেই স্থানে মধুক্রম আছে এই অনুমান করিয়া ঊর্দ্ধমুখে মধুমক্ষিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া যেখানে মৌচাক সেই স্থানে পৌঁছে, পৌঁছিয়া ইষ্ট সাধন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। মহারাজ মধুহার এমনি প্রতিজ্ঞা আর চিত্তস্থৈর্য্য যে

মধুমক্ষিকার অনুসরণ করিতে ও মধুক্রম পাইতে অন্য উপদেষ্টার আবশ্যক হয় না তাহা দেখা গিয়াছে। এইরূপে আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে হয়।

হরিণ।

হরিণ আরণ্য পশু। ইহাদিগের স্বভাবত শ্রবণেন্দ্রিয় নিতান্ত বলবান্; তজ্জন্য ব্যাধেরা অরণ্য মধ্যে বংশীবাদন করিয়া উহাদিগকে মোহিত করিয়া জালে আবদ্ধ করে। মহারাজ যাঁহারা যোগী তাঁহারা যেন গ্রাম্য সঙ্গীতাদি শ্রবণ না করেন। তাহা করিলে হরিণীর ন্যায় সংসার-জালে জড়িত হইতে পারেন।

মীন।

মহারাজ আমি মীনের নিকট হইতে রসনা জয় করার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া রসনাকে বশীভূত করিয়াছি। মৎস্য রসনার দোষে লোভী হইয়া বড়িশে গ্রথিত হইয়া প্রাণ হারায়। অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলকে পুরুষ শীঘ্র জয় করিতে পারেন, কিন্তু জিহ্বাকে জয় করা অতিশয় কৃচ্ছ্র-সাধ্য। এ নিমিত্ত যোগী সকল অতি যত্নের সহিত রসনাকে জয় করিবেন। রসনা তাবৎ অনর্থের মূল।

পিঙ্গলা।

পিঙ্গলা হইতে যে প্রকারে নির্ব্বেদ পাইয়াছি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি মহারাজ প্রণিধান করুন।

পুরা কালে বিদেহ নগরে যে সকল বেশ্যা বাস করিত তাহাদিগের মধ্যে পিঙ্গলা নামে একটি বেশ্যা ছিল। একদা পিঙ্গলা উপপতির সঙ্কেতানুসারে অভিসারিকাবেশে রজনীযোগে আপন বহির্ব্বাটীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ সে রাত্রির মধ্যে সে কোনক্রমে আসিতে না পারায় পিঙ্গলা সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিল। প্রথম প্রহরে উপপতির অদর্শনে পিঙ্গলার মনে হইল অর্দ্ধরাত্রিতে প্রিয়-সহবাস হইবে। অর্দ্ধ রাত্রিতেও যখন তাহা ঘটিল না তখন ভাবিল শেষ প্রহরে আসিবে; না আসায় কামিনী এই ভাবিল আহা যাহার অস্থি দ্বারা বংশ বংশ্য ও স্থূলা নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহা ত্বক্ রোম ও নখ দ্বারা আবৃত, যাহার নব দ্বার ক্ষরিত হইতেছে, যে দেহ বিষ্ঠা মূত্রে পরিপূর্ণ, আমিবৈ কোন্ সুভাগা কামিনী উহাতে আসক্ত হয়? অতএব অচ্যুত ভিন্ন অন্যের নিকটে পূর্ণ কাম হওয়া অসম্ভব। অচ্যুত শরীরীদিগের সুহৃৎ, প্রিয়তম, নাথ, ও আত্মা; আমি আত্মা দ্বারা ইহাঁকেই ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় ইহাঁর সহিত বিহার করিব। এই প্রকার গাঢ় চিন্তা করিয়া পিঙ্গলার নির্ব্বেদ জন্মিলে ঘৃণিত বেশ্যা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, সাধুসঙ্গ অবলম্বন করিতে করিতে সাধুধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্বাচরিত সুখ দুঃখ সকলি বিস্মৃত হইয়া, নারায়ণ-পরায়ণ হওত দেহাবসান

করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল। মহারাজ পিঙ্গলা আমার নির্ব্বেদ-প্রদাতা গুরু।

কুকুর আর বালক হইতে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বর্ণন করা যাইতেছে। কুকুর অর্থ ক্রূর জীব অর্থাৎ যাহারা মাংসাসী। আমিষসম্পন্ন ক্রূরকে আমিষহীন ক্রূরেরা বিনাশ করিয়া ঐ আমিষ গ্রহণ করে। অতএব মানব-সমাজে সংসাবিদিগের যাহা যাহা প্রিয়তম তাহার তাহার পরিগ্রহই দুঃখের হেতু। দেখ সংসারী ব্যক্তি-দিগের ধন-পুত্রাদি অতি প্রিয় হেতু সংসারিরা আমিষসম্পন্ন ক্রূর জীব-দিগের ন্যায় উহা রক্ষণাবেক্ষণ করে, পরে আমিষহীন ক্রূর জীবের ন্যায় কাল তাহাকে নষ্ট করে; অতএব যাহার কিছুই নাই সেই সুখী, তাহাকে কেহই নষ্ট করিতে পারে না।

আমি এইরূপ বিবেচনা করিয়া আর ক্রূর জীবদিগেব আচার ব্যবহার দেখিয়া সংসারমায়া পরিত্যাগ করত বালকদিগের নিকটে আনন্দলাভ করিযা সর্ব্বদাই আনন্দে কালযাপন করিতেছি। সাংসাবিক দিগের মধ্যে কেবল এক বালকেরাই সদা সুখী। বালকেরা যেমন সংসারে থাকিয়া কেবল যৎকিঞ্চিৎ আহারের প্রত্যাশী, অন্য কোন ভোগ্য বস্তুর প্রত্যাশী নহে, আমিও তদ্রূপ কেবল সামান্য ক্ষুৎপিপাসার শরণাপন্ন।

মহারাজ! কুমারী হইতে যে জ্ঞান পাওয়া গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। এক গৃহস্থের একটী কুমারী মাত্র বাটীতে আছে, এমন সময় কতকগুলি সাধু ঐ কুমারী যে বাটীতে আছে সেই বাটীতে অতিথি হইলেন। ঐ সঙ্গে মহারাজ আমিও ছিলাম। পরে কুমারী, আগত অতিথিদিগের সৎকারার্থ কতকটী শালিধান্য উদূখলে তণ্ডুল নির্গত করিতে লাগিল, তাহার হস্তে যে শঙ্খ পরা ছিল, সেই শঙ্খগুলি তণ্ডুল নির্গত করিবার সময় পরস্পর সংঘৃষ্ট হওয়ায় শব্দ করিতে লাগিল। কুমারী তাহাতে লজ্জাবোধ করিয়া ক্রমশঃ তাবৎ শঙ্খগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কেবল দুই হস্তে দুই গাছি মাত্র শঙ্খ খণ্ড রাখিলে আর শব্দ হইল না। অতএব মনুষ্য, একত্র দুই জন থাকিলেও কলহ হইতে পারে ঐ বালিকার নিকটে ইহা উপদেশ পাইয়া আমি একাকী পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি, তাহাতে আমার যে স্নেহবৃত্তি ছিল তাহা সেই পরমাত্মাতে বর্ত্তিয়া থাকায় আমার আনন্দের একশেষ হইয়াছে। পার্থিব ভয় বা অভয়, সুখ বা দুঃখ আমার নাই। ইহাতে আমার অণুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না। ববং সর্ব্বদা পরম সুখ বোধ হইতেছে। কুমারী হইতে আমার এই লাভ হইয়াছে।

মহারাজ অতঃপর শর-নির্ম্মাণ-কর্ত্তা হইতে মনের স্থৈর্য্য লাভ করিয়া লক্ষ্য পরমাত্মাকে লাভ করিয়াছি। মহারাজ যে প্রকারে শর নির্ম্মাতা শর নির্ম্মাণ করিতে ছিল তাহা বর্ণন করিতেছি। এক কর্ম্মকার

কোন ব্যাধের আদেশানুসারে অনন্যমনা হইয়া শরনির্ম্মাণ করিতে থাকিলে ঐ সময় তত্রস্থ রাজা ঐ কর্ম্মকারের সম্মুখ দিয়া যে গিয়াছিলেন তাহা শরনির্ম্মাতা কিছুই জানিতে পারে নাই। তৎকালে শর-নির্ম্মাতার মন আর চক্ষু কেবল শরে লিপ্ত থাকায় রাজাকে দেখিয়াও দেখিতে পায় নাই।

মহারাজ অতঃপর সর্পের নিকট হইতে যে জ্ঞান লাভ করিয়া নিরুদ্বেগে বিচরণ করিতেছি শ্রবণ করুন। সর্প সদাই যেমন পরকৃত ছিদ্রের মধ্যে বাস করিয়া সুখ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, আত্মাও তেমনি মায়াকৃত নবদ্বার বিশিষ্ট দেহে বাস করত, আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করত ও তত্ত্বাতীত হওতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও সুখী হইতেছেন।

নিজ গৃহে বাস করিয়া অর্থাৎ মায়ামর গৃহে বাস করিয়া যে ব্যক্তি মায়া পরিহার করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সুখী ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

ঊর্ণনাভি হইতে এইমাত্র উপদেশ পাওয়া হইয়াছে যে ঊর্ণনাভি স্বকীয় কর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মারা পড়ে। এই দেখিয়া আমি প্রারব্ধ কর্ম্মসূত্র ছেদের জন্য ভগবদ্ভক্তিরূপ তীক্ষ্ণ কর্ত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া জন্ম জন্মান্তরীণ কর্ম্মজ অদৃষ্ট ছেদন করিতেছি। এক্ষণ আর কোন বন্ধন নাই। মহারাজ মায়াই আত্মার প্রকৃত বন্ধন। সেই অচ্ছেদ্য মায়িক বন্ধন ভক্তি ও জ্ঞান আর সন্ন্যাস দ্বারা ছেদন করিতে পারিলেই মুক্ত পুরুষ হইতে পারা যায়।

পেশস্কার হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তৈলপায়ী কীট পেশস্কার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পেশস্কারকে গাঢ় চিন্তা করিয়া পেশস্কাররূপ যে লাভ করিয়াছিল তাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে ভয়, স্নেহ, আর দ্বেষ হেতু যে যাহাকে প্রগাঢ় চিন্তা করিয়া তাহাতে সমগ্র মন সমর্পণ করিতে পারে সে তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই মূল সূত্র অবলম্বন করত আমি স্নেহ হেতু সমগ্র মন ভগবানে সমর্পণ করিতেছি। মহারাজ আমি যে যে গুরুর নিকটে যাহা যাহা শিক্ষা করিয়াছি তৎসমুদয় বলিলাম ইতি।

মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ ও রাজযোগে যিনি অসমর্থ হইবেন, তিনি হয় অবধূতোক্ত ক্রিয়াযোগ, না হয় কপিল দেবোক্ত জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া শ্রেয়োলাভ করিবেন। শেষোক্ত যোগদ্বয়ে না আসনের, না প্রাণায়ামের, না সাধন চতুষ্টয়ের, না বৈধাবৈধ বিচারের আবশ্যকতা। অবধূতোক্ত যোগ নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতিসিদ্ধ হেতু আশুফলদায়ক। এ যোগ সাধনায় কোন বিঘ্ন বা আড়ম্বর নাই। অন্যান্য যোগ সাধনাতে অনেক বিঘ্ন ঘটে। এতদ্ভিন্ন সে সকল বাহ্যাড়ম্বর সাপেক্ষ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ যোগ অন্যান্য যোগ হইতে নিতান্ত সহজ নহে, বরঞ্চ কঠিন বোধ হয়।

অবধূতোক্ত যোগে সকলেই অধিকারী। ইহাতে জাতি বা বর্ণ বিচার নাই। স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরি অধিকার আছে। কেবল উন্মত্ত, জড় ও পঙ্গু প্রভৃতির অধিকার নাই।

অবধূত মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে আমি যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিত্য-মুক্ত হইয়া ভূমানন্দে পৃথিবী বিচরণ করিতেছি, সে সকল ভ্রম প্রমাদাদি দোষ শূন্য অথচ সর্ব্বত্র সুলভ। মহারাজ আমার বক্তৃতা শেষ হইল, আজ্ঞা হউক অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করি। এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া, তিনি অন্তর্হিত হইলেন। ইতি অবধূত প্রস্তাবনা নামক সাধারণ যোগ। ক্রমশঃ

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

আমার জীবনের ইতিহাস।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

দেবেন্দ্র।

প্রথমে কৈশোর, কৈশোরের পর বিবাহ, বিবাহের পর স্বামি-গৃহ, স্বামিগৃহে পতির স্নেহ ও মমতা এবং এই দগ্ধ হৃদয়ের নৃশংসাচরণ—এসকল কথা তোমাকে বলিয়াছি। এক্ষণে এক হতভাগা যুবকের ইতিবৃত্ত বর্ণন আবশ্যক। তুমি তাহার বিষয় কিছু কিছু শুনিয়াছ তাহাতে বোধ হয় তোমার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাহার মত পামর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। সে পামর হউক আর নৃশংস হউক, আমি সে সকল কিছু বলিতে চাহিনা। তবে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে লোকে তাহাকে আমার সর্ব্বনাশের কারণ বলিয়া যে নিন্দা করে, সে সমস্তই অন্যায়। আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি সে আমার কোন অপকার করে নাই, প্রত্যুত আমিই তাহার কলঙ্ক ও সর্ব্বনাশের মূল কারণ। ঈশ্বর তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, সে শুদ্ধ আপনারই পায় আপনি কুঠার মারিয়াছে; পাপীয়সীর মত আপনি মজিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনকে মজায় নাই।

এই হতভাগ্য যুবকের নাম দেবেন্দ্র। দেবেন্দ্র কে তাহা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে সে আমার স্বামীর আত্মীয় প্রতিবেশী। আমি যখন প্রথমে স্বামি-গৃহে নীত হইলাম তখন তাহার বয়স

আন্দাজ কুড়ি, সুতরাং আমার অধঃপতনে যখন তাহার অধঃপতন হইল তখন তাহার বয়স চব্বিশ পঁচিশের অধিক হইবে না। তাহার পিতা মাতা কিঞ্চিৎ সঙ্গতি রাখিয়া শীঘ্র পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্র অবাধে সেই পৈতৃক অর্থ অধিকার করিয়া যথেচ্ছ জীবন যাপন করিতে লাগিল। অল্প বয়সে অর্থের অধিকারী হইলে চরিত্র প্রায়ই দূষিত হয় বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রের পক্ষে তাহা ঘটে নাই। সরল-প্রকৃতি ও শুদ্ধচেতা দেবেন্দ্রের প্রশংসা না করিত এমন লোক কেহ ছিল না। বস্তুতঃ প্রতিবাসিবর্গ সকলেই তাহাকে স্নেহ করিত ও পরম আত্মীয় জ্ঞান করিত। দেবেন্দ্র সকলেরই বাটীতে যাতায়াত করিত এবং বালকের সহিত বালকের মত, যুবকের সহিত যুবকের মত, এবং বৃদ্ধের সহিত বৃদ্ধের মত কথোপকথনে সকলকেই আপ্যায়িত করিত। পরের দুঃখে দুঃখী এবং পরের সুখে সুখী হওয়া দেবেন্দ্রের স্বভাবের মূল ভিত্তি স্বরূপ ছিল। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি অপরের ক্লেশ দেখিলে তাহার বিস্ফারিত নয়নদ্বয় নীহারসিক্ত পদ্মপত্রের ন্যায় হইত, বিস্তীর্ণ বক্ষদেশ সঘনে স্ফীত হইত। আমি বুঝিয়াছি তুমি আমার মুখে দেবেন্দ্রের এই প্রশংসাবাদ শুনিয়া ঈষৎ হাসিতেছ, কিন্তু তুমি যাহা ভাবিয়া হাসিতেছ সে ভাব এক্ষণে আর নাই। যে হতভাগ্য ব্যক্তি দিবা নিশি জলন্ত বহ্নিতে শায়িত, বল দেখি তাহার হৃদয়ে অন্য চিন্তা আসা কি সম্ভব? একমাত্র চিন্তা আছে, এবং সেই চিন্তা মৃত্যু। বল সেই সুখের দিন আমার কবে হইবে যে দিন চিতার কোমল উত্তাপে অন্তর্দাহ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইব। না—না, লজ্জিত হইও না, আমি তোমার উপরে দুঃখিত হই নাই। তোমার উপরে রাগ করিব? হরি হরি পৃথিবীতে তবে বন্ধু বলিব কাহারে? হতভাগিনীর আপনার বলিবার আর কেহ নাই তুমি কি তা জান না?

দেবেন্দ্রের প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ে এক মস্ত অভাব ছিল। দেবেন্দ্র স্বয়ং তাহা জানিত না এবং অপর কেহও তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে নাই। সেই অভাব কি তাহা বলিতেছি। দেবেন্দ্রের পিতা অল্প বয়সেই তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই দেবেন্দ্রের স্ত্রীবিয়োগ হয়। দেবেন্দ্র আর বিবাহ করিল না। তাহার আত্মীয় স্বজন পুনর্ব্বার বিবাহের জন্য বিস্তর অনুরোধ করিতে লাগিলেন, দেবেন্দ্র কিছুতেই স্বীকার পাইল না। কিন্তু অল্প বয়সে গৃহ-শূন্য হওয়ায় তাহার চরিত্রে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। তাহা তেমনই বিশুদ্ধ ও কোমল রহিল। দেবেন্দ্রের চরিত্র পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধ ও কোমল রহিল বটে, কিন্তু সে বুঝিতে পারিত না যে তাহার হৃদয় শূন্য, অধিকার

করিয়া থাকিবার কেহ নাই; লাগাম না থাকিলে ঘোড়া সুপথেও যাইতে পারে কুপথেও যাইতে পারে। আমি তাহার হৃদয়ের এই অভাবের কথা বলিতেছিলাম। দেবেন্দ্র যদি ইহা জানিতে পারিত তাহা হইলে এমন পরিণাম তাহার কখনই ঘটিত না। সেই পূর্ণচন্দ্র কখনই রাহুগ্রস্ত হইত না! যাহার হৃদয় প্রেমে উথলিয়া উঠে, অথচ সেই প্রেমের পাত্রী কেহ নাই তাহাকে ভাল বলিয়াও জানিও না মন্দ বলিয়াও জানিও না। তাহার পথ ভগ্ন সেতুর উপর দিয়া—কখন্ আছে কখন্ নাই কে বলিতে পারে? অধঃপতন রূপ তীক্ষ্ণ তরবারি দিবানিশি তাহার মস্তকের উপরিদেশে সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা ঝুলিতেছে, কখন্ তাহাকে বিনষ্ট করে তাহার স্থিরতা কি? কিন্তু সেই ভগ্ন সেতু যে নিশ্চয় ভাঙ্গিবে, সেই সূক্ষ্মসূত্র-বিলম্বিত তরবারি নিশ্চয় যে ছিঁড়িয়া পড়িবে তাহারই বা স্থিরতা কি? দেবেন্দ্রের জীবন সুখে ও শান্তিতে কোন মতেই অতিবাহিত হইতে পারিত না একথা কে বলিতে পারে? যদি এই কাল-সর্পিণীর সংসর্গে সে না আসিত তাহা হইলে কি তাহার জীবন বিষময় হইত? আমার মনে যখন এই প্রশ্ন উদয় হয় আমি ইহার উত্তর দিতে সাহস পাই না। ঘাতক যেমন রাজদণ্ড হইতে পলাইবার চেষ্টা পায় আমি তেমনি আপনার হস্ত হইতে আপনি পলাইবার জন্য ব্যস্ত হই। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যতই তর্ক করি না, যতই যুক্তি করিনা কেন কে যেন দিবানিশি আমার কর্ণের কাছে আসিয়া বলিতেছে 'পিশাচি দেবেন্দ্রের কথা ভুলিয়াছ? সর্ব্বনাশি দেবেন্দ্রকে নষ্ট করিয়া তুমি এখনও জীবিত আছ?' দিন নাই রাত্রি নাই সর্ব্বদাই কাণের কাছে কেবল এই কথা শুনিতেছি। বলিতে পার এ রোগ কি?—ইহার প্রতীকারই বা কি? এত রোগের ঔষধ আছে, ইহার কি কোন ঔষধ নাই? শুনিয়াছি যাহারা আত্ম-হত্যা করে, পরলোকে যমরাজ শতপুরু অন্ধকার সমাচ্ছন্ন দেশে সেই সকল পাপীদিগকে অনন্তকাল আবদ্ধ করিয়া রাখেন। মিনতি করিতেছি, সত্য করিয়া বল, একথা কি যথার্থ? আত্মহত্যা কি মহাপাপ? আমি মরিব তাহাতে পৃথিবীর ক্ষতি কি? কোন ক্ষতি নাই, বরং মঙ্গল। পৃথিবীর ভার কমিবে, সংসারের কণ্টক দূর হইবে, মনুষ্য-নামের কলঙ্ক যাইবে। যে মরিলে জগতের কোন অপকার নাই অথচ তাহার নিজের পরম মঙ্গল, সে ইচ্ছা হয় মরুক না কেন? আবার ইহাও বলি সে যদি মরিবে ত তবে তাহার সমুচিত শাস্তি হইল কৈ?—তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কৈ? সে জ্বলন্ত অগ্নিতে জ্বলিবে অথচ দগ্ধ হইবে না, অনুতাপ তাহার অন্তরাত্মাকে খণ্ড খণ্ড করিবে অথচ সে মরিবে না; এই বিধাতার ইচ্ছা। ব্রহ্মাণ্ডদেব হতভাগিনী বহু পাপ

করিয়াছে, বহুবার তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে। যজ্ঞাগ্নির অধিক তোমার ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত করিতে আর তাহার সাহস নাই। দেব! করুণ হও, পাপীয়সীর হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ কর। হতভাগিনী দুহিতা দিবানিশি কি অগ্নিতে জ্বলিতেছে, দেব! তুমি কি তাহা দেখিবে না?

পদস্খলন।

তুমি স্ত্রীলোক নও অতএব বলিলে হয়ত বুঝিতে পারিবে না যে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে যুবতী কখনই প্রকৃতিস্থা থাকিতে পারে না। তাহার চক্ষুদ্বয় সর্ব্বদা ভূমির প্রতি চাহিয়া আছে, কিন্তু তাহার মন কোথায় উড়িতেছে কে বলিতে পারে? তাহার চক্ষুতে তখন প্রয়োজন কি? সে চক্ষু দিয়া ত কিছুই দেখেনা—থাকিলেও হয়, না থাকিলেও হয়। জলপূর্ণ নৌকা, এই আছে এই নাই, একটু মাত্র পবনের আবশ্যক। তাহার চারিদিকে অধঃপতন-বহ্নি জ্বলিতেছে,ষোড়শী পতঙ্গের মত তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য কতই ব্যাকুল। সেই অগ্নি কেমন সুন্দর! কেমন উজ্জ্বল! তাহার প্রভা কেমন তরল! তাহার জ্যোতিঃ কেমন স্নিগ্ধ! ষোড়শী মনে মনে দিবানিশি এই কথা ভাবিতেছে, যদি ইহাতে পুড়িয়া মরিতে না পারিলাম তবে মনুষ্য-জন্মে ফল কি? হতভাগিনি! ঐ বহ্নিতে ঝাঁপ না দিয়া প্রথমে উহাকে একবার স্পর্শ করিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে উহার জ্বলন কি ভয়ানক! এই ঘোর মত্ততার সময় যাহার মন বাঁধা পড়িয়াছে তাহারই মঙ্গল। কিন্তু যাহার হৃদয়ের ভিতরে শূন্য, যাহার মন উড়িয়া বেড়াইতেছে, বসিবার স্থান পায় না, তাহার দুর্গতির আর সীমা নাই। ঈশ্বর যদি তাহাকে রাখিলেন ত ভালই,নহিলে তাহার রক্ষা নাই।

ক্রমশঃ আমি ষোড়শ বর্ষে পড়িলাম ও আমার সর্ব্বনাশের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। আমি তোমাকে বলিয়াছি বিবাহের পর আমার হৃদয় শান্তি কি তাহা একদিনের জন্যেও জানে নাই, এক্ষণে সেই যন্ত্রণা মৃত্যু-যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি একদিকে যাইতে চাহি, দুষ্ট সরস্বতী আমাকে অন্যদিকে লইয়া যায়। আমি মনে করি দুর্বুদ্ধির দমন করিব, স্বামিকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিব। অমনি কে যেন আমার কাণে কাণে কি বলিল, বলিয়া আমার সুবুদ্ধিকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিল। আবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, আবার সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলাম। পুনশ্চ প্রতিজ্ঞা করিলাম পুনরায় পরাভূত হইলাম। একদিন মনে বড় ভয় হইল। ঈষৎ বুঝিতে পারিলাম পরিণামে অভাগিনীর অদৃষ্টে অনেক লাঞ্ছনা আছে। তখন আপনাকে অসহায় ভাবিয়া ঈশ্বরের দিকে চাহিলাম, বলিলাম 'দেব

রক্ষা কর, তুমি যে দুর্ব্বলের বল, সহায়-হীনের সহায়।' পঙ্কিল-নিশ্বাস-মিশ্রিত সেই প্রার্থনা ব্রহ্মাণ্ডদেবের পবিত্র চরণে পৌঁছিল না। আবার অন্ধকারে পড়িলাম, আবার দুষ্টবুদ্ধি দিনে দিনে প্রবল হইতে লাগিল। একদিন মনস্থ করিলাম আত্মহত্যা করিব। পরে ভাবিলাম কেমন করিয়া মরিব? তৎক্ষণাৎ কে যেন বলিল 'মরিবার ভাবনা কি? অগ্নি আছে, জল আছে, রজ্জু আছে, বিষ আছে, মরিবার ভাবনা কি?' কিন্তু মরিতে পারিলাম না। ধর্ম্মভয়ে কি প্রাণভয়ে সেকাজ হইতে বিরত হই নাই। তবে কেন মরিলাম না বলিতে পারি না। তখন মরিলে আমার মঙ্গল হইত কি অমঙ্গল হইল তাহা অন্তর্যামী যিনি তিনিই বলিতে পারেন! কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে হতভাগ্য দেবেন্দ্রের ইহকাল পরকাল রক্ষা হইত। তাহার সর্ব্বনাশের বীজ অঙ্কুরে নিহত হইত। এই জীবনে আমি বহু দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, এবং যাহা যাহা করিয়াছি তাহার ফল ভুগিতেছি ও এখনও ভুগিব। কিন্তু যখন মনে হয় আমি আর একজনকে মজাইয়াছি—সুশীল সরল প্রকৃতি দেবেন্দ্রকে নষ্ট করিয়াছি, তখন হৃদয়ে যে কি ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হয় তাহা ঈশ্বরই জানেন। সে কথা মনে হইলে বোধহয় আমি যেন কোন গভীর অন্ধতম কূপে নিমগ্ন হইতেছি। আমার ঊর্দ্ধ অধঃ চারিদিকে স্তরে স্তরে অন্ধকার রাশীকৃত; সেই অন্ধকার মধ্যে সকলই অদৃশ্য অথচ অনুক্ষণ এই বোধ হইতেছে কি যেন আমাকে জন্মের মত গ্রাস করিল, আর তিলেক বিলম্ব নাই। বলিতে পার এই ব্যাধির হস্ত হইতে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইব?

ক্রমে দিন যাইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। যখন মন বড়ই বিষণ্ণ হইত তখন আমার কেবল এই ইচ্ছা হইত ক্ষণেক দেবেন্দ্রের সহিত কথোপকথন করি। বস্তুতঃ তাহার মধুর স্নেহপূর্ণ কথাগুলি আমার অমৃত বলিয়া বোধ হইত। দেবেন্দ্রের মন সরল, নিষ্কলঙ্ক; এবং ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি আমারও মনে তখন পর্য্যন্ত কোন দুষ্ট অভিসন্ধির উদয় হয় নাই। কিন্তু তাহাই উভয়ের কাল হইল, অথচ উভয়ের কেহই তাহা বুঝিলাম না। দেবেন্দ্র কি করিত বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যদি তখন জানিতে পারিতাম ভবিষ্যৎ-গর্ভে কি নিহিত রহিয়াছে, তাহা হইলে আমি সাবধান হইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। কারণ এখন হইতে দেবেন্দ্রকে না দেখিয়া আমি এক দিন থাকিতে পারিতাম না। এই সময়ে আমি এক দিন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম দেবেন্দ্র আমার কে? তাহার জন্য এত ব্যাকুল হই কেন? মন এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিল

না। তবে কি আমার হৃদয়ে কোনরূপ কু-অভিপ্রায় আছে? কৈ তাহাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। পরিশেষে আপনাকে আপনি বুঝাইলাম, দেবেন্দ্রকে ভাল বাসি তাহাতে ক্ষতি কি? কেহ কি কাহাকে ভাল বাসে না? এই সময়ে কোন বয়োজ্যেষ্ঠা যদি আমার মনের ভাব জানিত তাহা হইলে সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিত এ ভালবাসা বড় সহজ নহে। স্ত্রীলোকের ও পুরুষের মনের সঙ্গতি হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে বড় অধিক ক্ষণ লাগে না। কিন্তু তখন আমি তাহার অণুমাত্রও বুঝিলাম না। ভাবিলাম ভালবাসায় দোষ কি? আমি যে কুমুদিনীকে প্রাণের মত ভাল বাসি, তবে তাহাও দোষের। কিছু দিনের মধ্যেই বুঝিলাম যে কুমুদিনীকে ভাল বাসায় আর এ ভালবাসায় প্রভেদ বিস্তর। কুমুদিনী স্ত্রীলোক আমিও স্ত্রীলোক, কিন্তু দেবেন্দ্র তাহা নহে। কিন্তু এই কথা বুঝিবার পূর্ব্বেই মহাপঙ্কে পড়িয়াছিলাম। সেই মহাপঙ্কে পড়িয়া যে উঠিতে পারে সেই ধন্য, কিন্তু যে কখন তাহাতে পড়ে নাই সেই জগতে সুখী। যখন জানিতে পারিলাম আমার সর্ব্বনাশের উপক্রম হইয়া আসিতেছে, তখন প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা করিলাম আপনি বাঁচিব, আর দেবেন্দ্রকে বাঁচাইব—সে যাহাতে পঙ্কে পতিত না হয় তাহার চেষ্টা করিব। ভবিষ্যতে উভয় প্রতিজ্ঞা কতদূর সফল হইল তাহা বিলক্ষণ জান। প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি পালন করিতে পারিত তাহা হইলে মনুষ্যের এত দুর্দ্দশা, এত অবনতি হইবে কেন? আজি এক দুষ্কর্ম্ম করিলাম, করিয়া মনে বড়ই লজ্জা হইল। আপনাকে আপনি ঘৃণা করিলাম, সহস্র ধিক্ দিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম জীবন থাকিতে এমন জঘন্য কর্ম্ম আর কখনই করিব না। সেই প্রতিজ্ঞার সময় আমিই বা কে, আর যোগিকুল-শ্রেষ্ঠ যোগীই বা কে?—তখন মন এমনই শুদ্ধ, এমনই পবিত্র! দুই দিন না যাইতে যাইতে সেই কুপ্রবৃত্তি আবার হৃদয়ে দেখা দিল। অমনই মন আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলিল, ভুলিয়া পশুর মত ব্যবহার করিতে লাগিল। হা বিধাতঃ! যদি মনুষ্যকে চারি দিকে প্রলোভনে ঘিরিয়া রাখিলে, তবে তাহার হৃদয় এত দুর্ব্বল করিলে কেন? দেব! তুমি যদি মনুষ্যের অন্তর সবল করিয়া সৃজন করিতে, তাহা হইলে আজি তোমার সংসার স্বর্গের মত হইত—তাহাতে পাপ থাকিত না, কলঙ্ক থাকিত না, রাশি রাশি দুঃখ থাকিত না।

আমি যখন জানিলাম আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তখন এই স্থির করিলাম যে দেবেন্দ্রের সহিত আর দেখা করিব না, দেখা হইলেও কথা কহিব না। যদি এই সংকল্পে কৃতকার্য্য হইতাম তাহা হইলে হয় ত আজি এ দুর্দ্দশা হইত না। প্রথমে দুই চারি দিন মনকে কঠোর

শাসনে রাখিলাম, কিন্তু শীঘ্রই তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। পূর্ব্বে এই পাপিষ্ঠ হৃদয়ে যে কিছু লজ্জা, যে কিছু ধর্ম্মভয় ছিল, এক্ষণে সে সকলের লেশমাত্র রহিল না। মনের ভিতরে কেমন একপ্রকার শয্যাকণ্টকি আরম্ভ হইল। কখন ইচ্ছা হইত আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করি, কখন ইচ্ছা হইত লোকালয় ছাড়িয়া পশু পক্ষীর সহিত অরণ্যে বসতি করি ও আপনার আগুনে আপনি পুড়িয়া মরি। এই অবস্থায় কয়েক দিন অতীত হইলে একদা হঠাৎ দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেই মুহূর্ত্তের কথা অভাগী এজন্মে ভুলিবে না। যে দিন আপনার সর্ব্বনাশ করিলাম, শুধু আপনার নহে, আর এক জনের সর্ব্বনাশ করিলাম, সে দিনের কথা জীবন থাকিতে হৃদয় হইতে যাইবার নহে। দেবেন্দ্রকে দেখিয়া আমার হৃদয় যেন গলিয়া গেল, দুঃখ-সাগর একবারে উথলিয়া উঠিল। আমি আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না। চক্ষু হইতে বেগে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। কথা কহিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কথা কহিতে পারিলাম না—কে যেন মুখ চাপিয়া রাখিল। দেবেন্দ্র! সেই মুহূর্ত্তে কালসার্পিণী তোমার সর্ব্বনাশ করিল তাহা কি তুমি বুঝিলে না? তোমার হৃদয় প্রেমময়, পর-দুঃখকাতর; পরের চক্ষু-জল তোমার পক্ষে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র, সে অস্ত্র নিবারণ করিবার কাঠিন্য তোমার হৃদয়েত নাই। আমার চক্ষু হইতে বেগে যে বিষধারা পড়িতে লাগিল তাহাতে তোমার অন্তর একেবারে জর্জ্জরিত হইল। তুমি পরের দুঃখে ধৈর্য্য হারাইলে; পরদুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, এবং সেই দ্রবীভূত হৃদয় তোমার বিস্ফারিত নয়ন দিয়া জলধারায়—অমৃত ধারায়, বহির্গত হইল। সেই মুহূর্ত্তে তুমি প্রাণ হারাইলে, হৃদয় শূন্য হইলে। দেবেন্দ্র প্রাণ হারাইল—তাহার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। পরে যাহা যাহা ঘটিল তাহা এক্ষণে বলিবার প্রয়োজন নাই। অমৃতে গরল জন্মিল; নয়ন-জলে অগ্নিকাণ্ড হইল, এবং সেই অগ্নিকাণ্ডে উভয়েই পুড়িয়া মরিলাম। হা বিধাতা! তুমি অনন্ত জ্ঞানময়, তথাপি দেব তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছে। দেব! পরদুঃখ-কাতরতার অপেক্ষা সংসারে পবিত্র আর কি আছে? তবে তাহাতে এমন গরল জন্মিল কেমন করিয়া? সংসারে কি তবে কিছুই নিষ্কলঙ্ক নাই, কিছুই পবিত্র নাই? বলিতে পারি না এ বিড়ম্বনা কেন—এ মনুষ্য জন্ম কেন? তোমার অচিন্তনীয় সৃষ্টির তত্ত্ব দেব কেবল তুমিই জান। (ক্রমশঃ)

শ্যাম——

বৈদেশিক সংমিশ্রণ ও ইহার উপকারিতা।

হিন্দুসমাজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া একটী নূতন আবর্ত্তনে আলোড়িত হইতেছে। বৈদেশিক সংমিশ্রণে হিন্দুসমাজের বন্ধন শিথিলিত হওয়ায়, ইহাতে বিবিধ সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। মনুর সময় হইতে ইংরাজদিগের আগমন পর্য্যন্ত যুগসহস্র ব্যাপিয়া যে হিন্দুসমাজ অচলমালার ন্যায় অটল ভাবে স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান ছিল, মুসলমান রাজগণের ভীষণ অত্যাচারেও যে হিন্দুসমাজ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই—বরং অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছিল, আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহিনী-শক্তি-প্রভাবে, সেই হিন্দুসমাজে সর্ব্বাঙ্গীন বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কোন দেশ ম্যালেরিয়াদি দোষে দুষ্ট হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন প্রচণ্ড ঝটিকা বা জলপ্লাবনাদি উপস্থিত হইয়া সে দেশকে আলোড়িত করে, এবং সেই আলোড়নে যেমন সেই দেশের ম্যালেরিয়াদি দোষ কাটিয়া যায়, সেইরূপ হিন্দুসমাজ বহুদিন জড়পিণ্ডের মত থাকিয়া ক্রমেই জীবনী শক্তি হারাইতেছিল, এমন সময় দৈবানুগ্রহে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ইহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যেমন ঝটিকা বা জলপ্লাবনাদির আনুসঙ্গিক নৈমিত্তিক অনিষ্টাপাত অপরিহার্য্য, সেইরূপ এই সংঘর্ষের আনুসঙ্গিক অব্যবহিত নৈমিত্তিক অমঙ্গল নিচয়ও দুর্ম্মোচ্য। কিন্তু ঝটিকা বা জলপ্লাবনাদির ব্যবহিত ফল যেরূপ শুভদ, এইরূপ সংঘর্ষেরও পরিণাম সেইরূপ শুভপ্রদ।

হিন্দুসমাজ এক্ষণে যে কয়টী সমাজবিপ্লবে আলোড়িত হইতেছে, বিলাতগমন তাহার অন্যতম। বহুকাল ধরিয়া ভারতবহিশ্চর জাতিনিচয়ের সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের কোন সংমিশ্রণ না হওয়ায় তাঁহারা এতদিন জানিতে পারেন নাই যে তাঁহারা সভ্যসমাজে একসময়ে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এখন সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন; এবং যে সকল জাতি পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় সভ্যজাতি বলিয়াই গণিত হইত না, এখন তাহারা সভ্যতাশৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে বড় ছিলাম বলিয়া অভিমান করিয়া এখন যাহারা বড় হইয়াছে তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিলে, আমাদিগের ভাবী উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত হইবে। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহাদিগকে যবন বলিয়া ঘৃণা করিতেন, একসময়ে যাহাদিগকে অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া মনে করিতেন, তাহারা বস্তুতঃ তখন ঘৃণার্হ ও অস্পৃশ্যই ছিল। কিন্তু এখন সে তুলামান আবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে

পরিচ্ছদ, আহার, বাসের পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য্য, বীর্য্য—সকল বিষয়েই সেইযবন আমাদিগের শ্রেষ্ঠ। এক সময়ে আমরা যেমন তাহাদিগকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করিতাম, এখন তাহারাও তেমনই আমাদিগকে অসভ্য নিগার বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। আমরা যদি বস্তুতঃ বুঝিয়া থাকি যে আমরা এখন বস্তুতঃই তাহাদিগ অপেক্ষা সকলবিষয়েই হীন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা হইলে অভিমানভরে তাহাদিগ হইতে দূরে থাকিলে আমাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। গুণের অনুকরণে কোন দোষ নাই। আমাদিগের যখন ভাল সময় ছিল, তখন তাহারা আমাদিগের অনুকরণ করিয়াছে, আমাদিগের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা পাইয়াছে; এখন তাহাদিগের উন্নতির ও আমাদিগের অবনতির সময়। এখন আমরা তাহাদিগের নিকট যাহা ভাল পাইব তাহা শিখিব, তাহাদিগের সমস্ত গুণের অনুকরণ করিব—তাহাতে দোষ কি? যে একসময় অধমর্ণ ছিল, তাহার কি চিরকালই অধমর্ণ থাকিতে হইবে; এবং যে একসময় উত্তমর্ণ ছিল, সে কি চিরকালই উত্তমর্ণ থাকিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। প্রকৃতি কাহারও অদৃষ্টে চিরকাল দুঃখ বা কাহারও অদৃষ্টে চিরকাল সুখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন নাই। প্রকৃতির নিয়মানুসারে জগতে সুখ দুঃখ নিয়ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।*

* চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।

সুতরাং সভ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগের সভ্যতা ও জ্ঞান শিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। বৃথা অভিমান-ভরে ইহা হইতে বিরত থাকিলে, আমাদিগের সৌভাগ্যতপন সমুদিত হইতে অনেক বিলম্ব হইবে। যাঁহারা আপনারা অভিমান-ভরে রহিবেন, বা অভিমানত্যাগী ব্যক্তির উন্নতিশীল গতির অন্তরায় হইবেন, তাঁহারা অন্তরে দেশহিতৈষী হইলেও কার্য্যতঃ দেশের পরম শত্রু।

আধুনিক সভ্য ইউরোপের নিকট সভ্যতা ও জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে, সভ্যতা ও জ্ঞানের রঙ্গভূমি ইউরোপক্ষেত্রে গমন করা একান্ত প্রয়োজন। অভিনয়ের বর্ণনা শুনিয়া যেমন অভিনয় দর্শনের তৃপ্তি লাভ করা অসম্ভব, শুদ্ধ পুস্তক পড়িয়া সেই জীবন্ত সভ্যতা ও জ্ঞানের অনুভূতি করা সেইরূপ অসম্ভব। যেমন শবচ্ছেদ না করিয়া শারীর বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র, সেইরূপ সভ্য সমাজের আভ্যন্তরীণ চিত্র স্বচক্ষে না দেখিয়া সভ্যতার অনুকরণ-চেষ্টা উপহাসাস্পদ মাত্র। আমরা এই জন্যই ইউরোপযাত্রার বিশেষ পক্ষপাতী। বিশেষতঃ বিলাত গমনে আমাদিগের দ্বিবিধ উপকার আছে। এক দিকে সভ্যতা ও জ্ঞান লাভ, অন্য দিকে ধন মান ও পদ লাভ। এ দ্বিবিধ উপকারই আমরা এখানে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে ও সহজে লাভ করিতে পারি না।

এই সকল উপকার আছে বলিয়াই অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবল জন-স্রোত বহিয়াছে। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় ক্রমে ক্রমে নানা উদ্দেশে বিলাত গমন করিয়া তথা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; এবং কতকগুলি এখনও তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, জঙ্গবাহাদুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয় জন ভিন্ন আর প্রায় সকলেরই বিলাত গমনের উদ্দেশ্য বিদ্যোপার্জ্জন বা বাণিজ্য। আমাদিগের বিশ্বাস, যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিলোপ না হয়, তাহা হইলে এই স্রোত দিন দিন অধিকতর প্রবল হইবে। এ স্রোতের গতি বা বেগ নিবারণ করা হিন্দুসমাজের এক্ষণে অসাধ্য।

কেন অসাধ্য তাহা আমরা বলিতেছি। উচ্চ পদে আরোহণ করার ইচ্ছা ও তদনুষ্ঠান চেষ্টা মানব জাতির হৃদয়ের একটী বলবতী স্বাভাবিকী বৃত্তি। সামান্য গার্হস্থ ভৃত্য হইতে সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেই এই প্রবল বৃত্তির দাস। বস্তুতঃ পরিশ্রমের বা মস্তিষ্কপরিচালনের বিনিময়ে যখন বেতন লইতেই হইল, তখন যাহাতে অধিক বেতন পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সেইরূপ বাণিজ্য-স্থলেও বলিতে পারা যায় যে যখন বাণিজ্য করিয়াই অর্থোপার্জ্জন করিতে হইল, তখন যাহাতে সেই বাণিজ্যের সর্ব্বতোভাবে শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহাই কর্ত্তব্য। যদি তাহাই কর্ত্তব্য স্থির হইল, তাহা হইলে কি উপায়ে অধিক বেতন লাভ করা যাইতে পারে, এবং কি উপায়েই বা বাণিজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যাইতে পারে, সেই উপায়ের উদ্ভাবন ও অনুবর্ত্তন কখন অকর্ত্তব্য বা নীতিবিগর্হিত হইতে পারে না। বিলাতগমন সর্ব্বোচ্চ বেতন প্রাপ্তির ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের প্রধান উপায়, সুতরাং বিলাতগমন কখন অকর্ত্তব্য বা নীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিলাতগমন যেমন উচ্চ পদ ও উচ্চ বেতন প্রাপ্তির প্রধান উপায়, ইহা সভ্যতা শিক্ষা ও জ্ঞান উপার্জ্জনের সেইরূপ প্রধান সোপান। আমরা এখানে যে সকল অধ্যাপকের নিকট ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী গণিত, ইংরাজী বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়ন করি, বিলাতে গমন করিলে সেই অধ্যাপকদিগের অধ্যাপকের নিকট সেই সেই বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে আমরা এখানে যাঁহাদিগের রচিত পুস্তক পাঠ করি, তাঁহারাই ব্রিটনে সেই সেই বিষয়ের অধ্যাপক। সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তা অধ্যাপকের নিকট গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় পড়িয়া যে সুখ ও যে উপকার, অপরের নিকট তাহা পড়িয়া কখনই সে সুখ ও সে

উপকার হইতে পারে না। গ্রন্থকর্ত্তা অধ্যাপক আপনার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যেরূপ বিশদরূপে বুঝাইতে পারিবেন, অপরে কখন সেরূপ পারিবেন না। এই জন্য যেখানে যে বিষয়ের উৎপত্তি, সেইখানেই নানাদেশের ছাত্রগণের সমাগম। নবদ্বীপে আধুনিক স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি ও আলোচনা বলিয়াই নানা দেশ হইতে তত্তদ্বিষয়ের অধ্যয়নাভিলাষী ছাত্রগণ আসিয়া তথায় সেই সেই শাস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধবিদ্যায় দেবতারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়াই অর্জ্জুনাদি অমরাবতীতে অস্ত্রশিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। এই রীতি চিরপ্রচলিত স্বভাবসিদ্ধ ও শুভপ্রদ। ইহার ব্যতিক্রমে বরং অমঙ্গলেরই সম্ভাবনা। যেমন এক ব্যক্তি সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ হইতে পারেন না, সেইরূপ এক জাতিও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। বিশেষ বিশেষ জাতির বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশিষ্ট পারদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়। পরের যাহা ভাল তাহা শিখিয়া গৃহে আনিবে, আর তোমার যাহা ভাল তাহাতে অপরকে শিক্ষা দিবে—এইরূপ উদার নীতি ব্যতিরেকে জগতের উন্নতির সামঞ্জস্য রাখিতে পারা যায় না। এই উদার নীতির অভাবেই জগতে জ্ঞান ও সভ্যতার এত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই উদার নীতির অভাবই ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের পতনের অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা যে অতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন, এবং অনেক বিষয়েই তাঁহারা যে মৌলিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অতিশয় জ্ঞানগর্ব্বিত ছিলেন। তাঁহারা নিজে যাহা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা আর কিছু ভাল হইতে পারে এরূপ সংস্কার তাঁহাদিগের ছিল না। তাঁহারা আপনাদিগের দ্রব্যজাত লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু মানুষ সর্ব্বজ্ঞ নহে। সুতরাং বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক আলোক বিরহে তাঁহাদিগের উন্নতি ক্রমে স্থিতিশীল হইয়া উঠিল। ইহা একটী নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্গে উঠিয়া আর উঠিতে পারিল না। তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইলেন যে উন্নতি-শৈলের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শৃঙ্গ আর নাই। তাঁহাদিগের অগ্রগামিনী গতি নিবৃত্ত হইল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের পতনও আরম্ভ হইল। কারণ প্রকৃতির নিয়মে কোন পদার্থই চির দিন একভাবে বা এক স্থানে থাকিতে পারে না। হয় ইহা উঠিবে, নয় নামিবে, হয় অগ্রসর হইবে, নয় পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। জীবনের প্রথম নিয়ম গতি। যেমন সর্ব্বপ্রকার দৈহিক গতিরোধ হইলেই দেহীর মৃত্যু,

সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার সামাজিক গতি রোধ হইলেই সমাজের মৃত্যু। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উন্নতি-শৈলের যে শৃঙ্গে উঠিয়াছিলেন, আমরা ধীরে ধীরে সেই শৃঙ্গের প্রায় পাদদেশে আসিয়া পড়িতেছি। সেই অধোগতির ধীর বেগে এখনও আমাদিগের জাতীয় দেহে সঞ্জীবনী শক্তি আছে। এখনও উঠিতে চেষ্টা করিলে আমরা উঠিতে পারিব। কিন্তু যখন সেই শৃঙ্গের চরণতলে পড়িয়া আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার গতি রোধ হইয়া সঞ্জীবনী শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইবে, তখন আর কোন আশা থাকিবে না, তখন আমাদিগের জাতীয় মৃত্যু অপরিহার্য্য। সেই অবশ্যম্ভাবী জাতীয় মৃত্যুর দিন দূর-প্রসারিত করিতে হইলে আমাদিগকে উঠিতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে আমরা উঠিতে পারি? বহুদিনব্যাপি অবনমনে আমাদিগের জাতীয় অঙ্গ স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়াছে। এ অবস্থায় অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া উঠিতে গেলে অভ্যুত্থানস্পৃহা হয়ত ফলবতী না হইতে পারে। অথবা যদি ফলবতী হয়, তবে অনেক বিলম্বে হইতে পারে। এ দুর্ব্বল শরীরে প্রবলতর বৈদেশিক জাতির হস্তাবলম্ব একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন বলিয়াই ঐশী শক্তি প্রভাবে অথবা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ইংরাজ ভারতে। ভারতীয় ইংরাজ আমাদিগকে কথঞ্চিৎ করাবলম্ব প্রদান করিয়াছেন বটে, আমাদিগকে জাতীয় পতনাবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগকে এখনও পূর্ণ জাতীয় জীবনের সুখে সুখী করিতে পারেন নাই। সে দেবদুর্ল্লভ সুখ কিরূপ, আমরা ভারতীয় ইংরাজের সংসর্গে আসিয়া জানিতে পারি না। জাতীয় জীবনের চিরদোলা শ্বেতদ্বীপে গমন না করিলে সে সুখের পূর্ণ প্রতিবিম্ব আমরা দেখিতে পাই না। জাতীয় জীবনের জ্বলন্ত ভাব আমরা ভারতে কখনই উপলব্ধি করিতে পারি না। জাতীয় কার্য্যে জীবন্ত ভাব এ পতিত ভারতে থাকিয়া আমাদিগের দেখিবার সম্ভাবনা নাই। আজ গ্লাড্‌ষ্টোন বক্তৃতা করিবেন, পঞ্চাশৎ সহস্র লোক হাইডপার্কে সমবেত; আজ ব্রাড্‌ল পার্লেমেণ্ট হইতে তাড়িত, বিংশ সহস্র লোক পার্লেমেণ্টের দ্বারে দণ্ডায়মান—জাতীয় জীবনের এ মূর্ত্তি যে কখন দেখে নাই, তাহার অন্তরে জাতীয় জীবনের জীবন্ত ভাব কিরূপে আবির্ভূত হইবে?

সুতরাং আমাদিগকে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে হইলে কোন উন্নতিশীল জাতির জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ চিত্র স্বচক্ষে দেখিতে হইবে। কোন্ কোন্ নৈতিক ও সামাজিক উপাদান সেই উন্নতির ভিত্তিভূমি তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়া ভারতীয় সমাজে তাহার বীজ বপন করিতে হইবে। সেই বীজ যখন বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে,

তখনই আমাদিগের জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ হইবে। ইহা না করিয়া যাঁহারা গৃহে বসিয়া সমাজশাসনবহির্ভূত দুই একটী ভারতীয় ইংরাজ-গৃহের চিত্র দেখিয়া সমস্ত ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তিভূমি দূষিত মনে করিয়া আপনার অন্তরে ভ্রান্ত জাতীয় গৌরব পরিপোষিত করেন, তাঁহাদিগের মত পাগল আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে—যে জাতির সমাজ ও নীতি দূষিত, সে জাতি কখনই সভ্যতা ও উন্নতি-শৈলের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিতে পারে না। সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষের সহিত সভ্যতা ও উন্নতির অব্যভিচারী কার্য্যকারণসম্বন্ধ। ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সুতরাং সভ্যতা ও উন্নতির রঙ্গভূমি ইউরোপ বা ব্রিটন যে নৈতিক ও সামাজিক উৎকর্ষে আধুনিক ভারতের নিম্নে অবস্থিত, এ কথা অশ্রদ্ধেয় ও অপ্রামাণ্য। কখন যে ভারতে নৈতিক ও সামাজিক উৎকর্ষ ছিল না এ কথা আমরা বলি না। প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা অচলা; কিন্তু বর্ত্তমান পতিত ভারতে সে উৎকর্ষানলের কেবল ভস্মরাশি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতে বসিয়া শুদ্ধ আমাদিগের অতীত গৌরবের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করা অপেক্ষা, পাশ্চাত্য জাতি নিচয়ের গৌরবতপনের প্রখর রশ্মিমালায় উদ্ভাসিত হওয়া সর্ব্বথা শ্রেয়। সেই রশ্মিমালার সঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে আমাদিগের জাতীয় জীবন নব জীবন ধারণ করিবে। স্বাধীন চীন, স্বাধীন জাপান—প্রাচ্য ফ্রান্স, প্রাচ্য ব্রিটন—অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলনার্থ নহে, উচ্চতর সভ্যতা ও জ্ঞানের সংস্রবে আসিয়া অধিকতর সভ্যতা ও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, বর্ষে বর্ষে কত শত যুবককে ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রেরণ করিতেছেন। যখন ভারত—প্রাচ্য ইতালী—স্বাধীন ছিল, তখন ভারতের বাণিজ্যপোত সুদূর প্রাচ্যে, সুদূর প্রতীচ্যে ভারতের রত্নরাশি ছড়াইয়া তৎপরিবর্ত্তে নানাদেশের পণ্যজাত লইয়া গৃহভাণ্ডার পরিপূরিত করিত। তখন ভারতের স্বার্থবাহী বণিকনিচয় পদব্রজে ব্যাক্‌ট্রিয়, তাতার, কাস্‌পিয়ান, কৃষ্ণহ্রদ অতিক্রম করিয়া গ্রীস, ইতালী, ভিনিস, লম্বার্ডী—সর্ব্বত্র ভারতের পণ্যজাত লইয়া যাইত। সে লক্ষ্মীশ্রীর সময় ভারতে সমুদ্রযাত্রা বা বৈদেশিক সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু আজ পতিত ভারতের সকলই সার্গল!

যদি বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতাতে ভারত ইউরোপের সমকক্ষ হইত, তাহা হইলেও ইউরোপের সহিত সংমিশ্রণে ভারতের সবিশেষ উপকার হইত। নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া নানা জাতির রীতি নীতি ও সামাজিক আচার ব্যবহার দেখিলে মানসিক জড়তা অপনীত, এবং জাতীয়

কুসংস্কার বিদূরিত হয়। এই জন্য ব্রিটন ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির মধ্যে এরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ছাত্রদিগকে দেশপর্য্যটন করিতে হইবে। দেশপর্য্যটন বিনা শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিবে। ব্রিটনের ছাত্রেরা ফেলোসিপ লইয়া ছয় মাস বা এক বৎসর কাল ইউরোপ মহাদেশ পর্য্যটন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ চিত্র স্বচক্ষে দেখিয়া বেড়ান, এবং যতদূর সাধ্য তাহাদিগের ভাষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিখিয়া লন। যাঁহারা ফেলোসিপ পান না, অথচ যাঁহাদিগের পিতা মাতার অবস্থা ভাল, তাঁহারাও পিতৃ-মাতৃ-ব্যয়ে শিক্ষা-সমাপ্তির জন্য ইউরোপ যাত্রা করেন। এইরূপ ইউরোপের ছাত্রেরাও শিক্ষা-সমাপ্তির জন্য ব্রিটন ও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন ও অবস্থিতি করিয়া থাকেন। কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গে কি হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রেমচাঁদ রাইচাঁদ প্রতিষ্ঠাপিত ফেলোসিপ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলবতী অর্থার্জ্জনস্পৃহার দাস হইয়া অন্যের কষ্টার্জ্জিত ধনে আপনাদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি না করিয়া আপনাদিগের ব্যবহার-ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিয়া লন। যে দিন ফেলোসিপ পান, সেইদিন হইতেই তাঁহাদিগের সমস্ত উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হয়। যাঁহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাঁহারা প্রায়ই বিদ্যামন্দিরের উচ্চতম সোপানে উঠিতে পারেন না; যাঁহারা সক্ষম হন, তাঁহারা প্রায়ই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিলাসিতার মোহন ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের জ্ঞান-পিপাসা উপাধি-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। সুতরাং যাঁহারা আশা করেন যে ধনীর তনয় বিলাত গমন করিয়া বিজেত্রী জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমরে জয়ী হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহাদিগের করকবল হইতে পদ মর্য্যাদা কাড়িয়া লইবে, এবং আমাদিগের ললাট-ঘর্ম্মার্জ্জিত ধনের অন্ততঃ কিয়দংশ স্বদেশে পরিরক্ষিত করিবে, তাঁহাদিগকে আমরা নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করি। উচ্চ-শ্রেণী দ্বারা কখনই কোন দেশের কোন বিপ্লব সাধিত হয় নাই। আজ উচ্চশ্রেণী নামিয়া ভারতের এই প্রকাণ্ড বিপ্লব সংসিদ্ধ করিবেন ইহা কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না। যদি এ বিপ্লব কাহারও দ্বারা সংসাধিত হয় ত মধ্য বা নিম্নশ্রেণী দ্বারাই হইবে।

অনেকে এইরূপ তর্ক তুলিয়া থাকেন যে যখন এ দেশে থাকিয়াও জ্ঞান ও অর্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, তখন এত ব্যয় করিয়া ও এত ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিলাতে যাইবার প্রয়োজন কি? তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই যে আমাদিগের বিলাত যাওয়া শুদ্ধ জ্ঞানপিপাসা বা অর্জ্জনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য

নহে; আমাদিগের বিজেতা ইংরাজের সমান পদ ও সমান ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবারও জন্য। বিজেত্রী জাতির অনৌদার্য্যদোষে আমরা এদেশে থাকিয়া কখন ইংরাজের সমান পদ ও সমান ক্ষমতা পাইতে পারি না। এক জন বারিষ্টার অপেক্ষা এক জন হাইকোর্টের উকিল অধিক অর্থ পাইতে পারেন, কিন্তু বারিষ্টারের ক্ষমতা ও স্বত্ব হাই-কোর্টের উকিলের ক্ষমতা ও স্বত্ব অপেক্ষা অনেক অধিক। সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালী বারিষ্টারের দল বৃদ্ধি দেখিয়া ভীত ও দুঃখিত হন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের একমাত্র বক্তব্য এই যে বাঙ্গালী বারিষ্টারের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত যদি সাহেব বারিষ্টারের সংখ্যা হ্রাস হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সমূহ মঙ্গল। ভারতের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের পশ্চিম-বাহী স্রোত অন্ততঃ কিঞ্চিৎ রুদ্ধ হইলেও আমাদিগের যথেষ্ট লাভ। যদি বলেন ইহাতে সাহেব বারিষ্টারের সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, তাহা হইলে হয় সাহেব বারিষ্টারগণের আয় কমিয়া গিয়াছে, অথবা বাঙ্গালী বারিষ্টার-গণ অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছেন—আমাদিগকে অগত্যা এই দুই বিকল্পের অন্যতর স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে কোন বাঙ্গালী বারিষ্টারকেই আজপর্য্যন্ত অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই। তাঁহাদিগের যেরূপ আশা সকলে তদনুরূপ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু সকলেরই আয় সাধারণ উকিলের অপেক্ষা অনেক অধিক। আর আমরা যদি স্বজাতিপোষক হইতাম, যদি মকদ্দামা উপস্থিত হইলেই ইংরাজ বারিষ্টারের শরণাগত না হইতাম, তাহা হইলে কি অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় কয়জনমাত্র বাঙ্গালী বারিষ্টারের অবস্থা সাধারণ সাহেব বারিষ্টারের অপেক্ষা হীন হইত? তাহা হইলে কি ভারতের অর্থ নদী-স্রোতের ন্যায় অবিরাম শ্বেতসাগরে গিয়া মিশিত? যাহাই হউক আমাদিগকে পূর্ব্ব কল্প স্বীকার করিতেই হইতেছে, যে বাঙ্গালী বারিষ্টারগণের আবির্ভাবে সাহেব বারিষ্টারগণের আয় কমিয়া ভারতের অর্থ অন্ততঃ কিছু পরিমাণে ভারতে রহিয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে বারিষ্টার হইবার জন্য দশ বার হাজার টাকা নষ্ট না করিয়া তাহাতে একটা ব্যবসায় করিলে অধিক লাভ হইতে পারে। অনেকে উচ্চশিক্ষা বিরুদ্ধেও এইরূপ আপত্তি তুলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে একটী পুত্রকে এম্ এ, বি এল্ পর্য্যন্ত পড়াইতে যে ব্যয় হয়, আজ কাল সে ব্যয়ের প্রতিফলন হয় না। এই দুই স্থলেই আমাদিগের বক্তব্য এই যে যতদিন আমরা এই উভয় দলের

আয়ের নিয়মিত গড় তালিকা গ্রহণ না করিতেছি, তত দিন এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলিবার আমাদিগের অধিকার নাই। যদি বাস্তবিকই ইহা হইত তাহা হইলে, এই দীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও বিলাতযাত্রার স্রোত দিন দিন বৃদ্ধি না পাইয়া নিশ্চয়ই হ্রাস প্রাপ্ত হইত। আমরা যতদূর জানি তাহাতে আমাদিগের সংস্কার যে এক জন বারিষ্টার বা এক জন গ্রাজুয়েট্ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার সময় প্রথম দুই এক বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন কিন্তু তাহার পর তাঁহাদিগের আয় তাঁহাদিগের উপর ব্যয়িত মূল ধনের বাণিজ্যে নিয়োগোৎপন্ন লাভ অপেক্ষা অনেক পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। বাঙ্গালী বারিষ্টারগণ সাধারণতঃ অতিশয় অপরিমিতব্যয়ী। এই জন্য অনেক সময় তাঁহারা পর্য্যাপ্ত আয় সত্বেও কষ্ট পাইয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহাদিগের এতদূর দারিদ্র্যকলঙ্ক। তাঁহাদিগের সাধারণ গড় আয় বোধ হয় পাঁচশত টাকার ন্যূন হইবে না। দুই এক জনের আয় মাসিক দশ সহস্র মুদ্রা শুনিতে পাওয়া যায়। এইত গেল অর্থসম্বন্ধে। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালী বারিষ্টারগণের যে মর্য্যাদা, যে স্বত্ব—বাঙ্গালী জজ্ ভিন্ন আর কোন বাঙ্গালীর সেরূপ স্বত্ব নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দশ হাজার টাকার মূল ধন লইয়া ব্যবসায় করা অপেক্ষা সেই টাকায় বারিষ্টার হইয়া আসিতে পারিলে অধিক অর্থ, অধিক মান, অধিক ও মর্য্যাদা অধিক ক্ষমতা পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা সিবিল সর্ব্বিস্ বা মেডিকেল্ সার্ব্বিসের জন্য বিলাতে গমন করেন, তাঁহাদিগের ব্যয় বারিষ্টার হইবার জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধেক। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যে যোগ দিবার দিন হইতেই তাঁহাদিগের আয় তাঁহাদিগের প্রতি ব্যয়িত মূল ধনের সম্ভাব্য বাণিজ্য-লভ্য আয় অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক হইয়া পড়ে। ক্রমশই তাঁহাদিগের আয় বাড়িতে থাকে। এ দিকে তাঁহাদিগের মান, ক্ষমতা, স্বত্ব—এ দেশে পরীক্ষোত্তীর্ণ সুশিক্ষিতগণের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া থাকে। যে সকল উচ্চপদ একমাত্র বিজেত্রী জাতির উপভোগ্য, তাহাতে তাঁহারা অধিষ্ঠিত হওয়ায়, বিজেতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের বৈষম্য প্রায় তিরোহিত হয়। এইরূপে সমাজের কিয়দংশও বিজেত্রী জাতির সমকক্ষ হওয়ায়, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্গসমাজ অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও দিন দিন অগ্রসর হইতেছে, এবং বিন্দুপরিমাণেও দিন দিন উন্নতিশৈলে উঠিতেছে। এ শুভপ্রদ সামাজিক-স্বাস্থ্যদ অগ্রগমনকে কেহ কেহ কি বলিয়া রোগপর্য্যায়ভুক্ত করেন আমরা ভাবিয়া স্থিরকরিতে পারি না।

সুশিক্ষিত দলের কেহ কেহ ছেলেপিলের বিলাত যাওয়া সমাজ-শাসন দ্বারা নিরুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা বিংশতি বা তদূর্দ্ধবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তির বিলাত গমন অনুমোদন করেন, কিন্তু তন্ন্যূনবর্ষ-বয়স্ক বালকের বিলাত যাওয়া রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং কঠোর সামাজিক দণ্ডবিধি দ্বারা তাহা নিযন্ত্রিত করিতে চাহেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা স্বাধীনভাবে বিলাত গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিংশতিবর্ষ বয়সের ন্যূনবয়স্ক ত·কাহাকেও দেখিতে পাই না। সুতরাং যখন অপরাধী নাই, তখন কঠোর দণ্ডবিধির অবতারণা করিতে সমাজকে অনুরোধ কেন? যাহাতে সমাজের প্রকৃত উন্নতি, সেই সৎসাহস ও সাধু উদ্যমকে সামাজিক রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ কেন? বিজেত্রী জাতির নিকট আপনাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব কাড়িয়া লইবার যাহা একমাত্র উপায়, সে পথে নূতন কণ্টকরোপণ করিবার চেষ্টা কেন?

যাঁহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে বিলাত যাওয়ায় যে পরিমাণ ব্যয়, কিছুতেই সে পরিমাণ লাভ নাই—তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে অলাভকর বাণিজ্যে স্বতঃই মানুষের অপ্রবৃত্তি জন্মে; সুতরাং যদি বস্তুতঃই ইহা অলাভকর হয়, তাহা হইলে লোকে ইহা হইতে আপনিই নিরস্ত হইবে। দশ জনের ক্ষতি দেখিয়া, আর দশ জন· আপনিই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। লাভ ও ক্ষতি গণনা মনুষ্যের অতি প্রবল স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাহাতে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমাজ-শাসনের অধীন নহে। সমাজ অন্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, ক্ষতিগ্রস্তের প্রতি যখন খড়্গহস্ত হন না, তখন বিলাতে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্তের প্রতি কেন দণ্ডবিধান করিতে যাইবেন? ইহা সামাজিক অপরাধ নহে, সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিষয়। এ সকল বিষয়ে সমাজ হস্তক্ষেপ করিলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ হইবে; সুতরাং ব্যক্তিগত উন্নতির পথও একেবারে রুদ্ধ হইবে। আর সমাজ ইচ্ছা করিলেই বা কিরূপে এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন?

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ?"

নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতি এবং অভিলষিত বিষয়ে কৃতসংকল্প ব্যক্তির মনকে ফিরায় কাহার সাধ্য? যখন জননীর অশ্রুজল ও পত্নীর ক্রন্দন বিলাতগমনে স্থিরসঙ্কল্প ব্যক্তির মনকে ফিরাইতে পারে না, তখন সামাজিক শাসনের ভয়ে তাঁহারা নিরস্ত হইবেন এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ফিরিয়া আসিলে সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে না পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের যাওয়া নিবারণ করায় সমাজের কি হাত? হিন্দু সমাজ যেরূপ অদূরদর্শী ও অনুদার, তাহাতে সাধ্য থাকিলে·যে

এ পথ রুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন, এরূপ নহে। যেখানে সমাজের ক্ষমতা দেখাইবার সুবিধা আছে, সেখানে হিন্দু-সমাজ ক্ষমতা দেখাইতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন না। বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত যুবকমণ্ডলীর প্রতি হিন্দুসমাজ যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে পুত্রকে পিতা একদিন পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে লইয়া ও পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেন না, সেই পুত্র বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আজ পিতার চরণতলে লুণ্ঠিতশির, কিন্তু পিতৃদেব আজ সমাজের ভয়ে বা হৃদয়ের কাঠিন্যবশতঃ তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ভূমিবিলুণ্ঠিত পুত্রকে তুলিয়া আলিঙ্গন না করিয়া—অধিক কি মুখের কথায় তাহাকে আশ্বস্ত না করিয়া—অন্তর্হিত হইলেন। যদি পিতা মানবসুলভ অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে গৃহে স্থান দিলেন, সমাজ সেই অস্পৃশ্য চণ্ডালসম পুত্রের আশ্রয়দাতা পিতাকেও পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহা-দিগের সহিত সমাজের সর্ব্বপ্রকার সংমিশ্রণ, সর্ব্বপ্রকার আদান প্রদান একবারে রহিত হইল। সামাজিক নির্যাতনের ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় দৃশ্য আর কি হইতে পারে?

এই সমাজ-প্রত্যাখ্যাত বিলাত প্রত্যাগত যুবক-মণ্ডলী ক্রমে দলবদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু ইহাঁদিগের ভবিষ্যৎ এক্ষণে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। হিন্দুসমাজ হইতে তাড়িত, ও ইউরোপীয় সমাজে অগৃহীত—এই নবীন দলের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ইহাঁদিগের পদমর্য্যাদা ধন—সাধারণ যুবকমণ্ডলীর অপেক্ষা অনেক অধিক বটে, কিন্তু সামাজিক সংমিশ্রণ অভাবে ইহাঁদিগের হৃদয় শুষ্ক ও জীবন মরুতুল্য। এ শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী কে? আমরা বলি প্রধানতঃ হিন্দুসমাজ। হিন্দুসমাজ যদি প্রত্যাবৃত্ত যুবকমণ্ডলীকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিতেন, তাহা হইলে এই নবীন দল কখনই সমাজকে পদ-দলিত করিতে পারিতেন না। মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া মাতৃ বক্ষে পদাঘাত করিতে পারে কয় জন? কিন্তু যখন তাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়া দেখেন যে হিন্দুসমাজ আর তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের মত স্নেহ-নয়নে দেখিতেছেন না, তখন তাঁহা-দিগের আত্মাভিমান স্বতঃই উদ্দীপিত হয়। তখন তাঁহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ আচার ব্যবহার আরম্ভ করেন। হতাশা-প্রপীড়িত হৃদয় ক্রমেই স্বজাতির প্রতি মমতাশূন্য হইয়া উঠে। ঘৃণার পরিবর্ত্তে ভক্তি বা মমতা দেখা-ইতে সমর্থ, এরূপ মহাত্মা জগতে কয় জন আবির্ভূত হইয়াছেন? 'ঘৃণার পরিপর্ত্তে ঘৃণা'—এইই সাধারণ নিয়ম। সাধারণ লোকে ইহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

এই পরস্পর-বিদ্বেষভাবে শুদ্ধ যে এই নবীন দলই ক্ষতি-গ্রস্ত হইতেছেন এরূপ

নহে। হিন্দুসমাজ ক্রমে মস্তকবিহীন হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহারা ধন মান ও পদে সর্ব্বোচ্চ, তাঁহারা সমাজের বাহিরে গিয়া পড়ায় হিন্দুসমাজ ক্রমে ক্ষীণ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহারা সকল বিভাগেই বিজেত্রী জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ, তাঁহারা হিন্দুসমাজের বহির্ভূত হওয়ায়, হিন্দুসমাজের মর্য্যাদাও কমিয়া যাই- তেছে। অন্তর্ব্বিচ্ছেদে বহিঃশত্রুর আশা স্ফীত হইতেছে। ভারতের ভবিষ্য গৌরবের দিন সুদূর-পরাহত হইতেছে। এমন অবস্থায় কোথায় আমরা ধর্ম্মান্ধ বা ব্যবহারান্ধ প্রাচীন দলকে বুঝাইয়া আমাদিগের জাতীয় জীবনের অভ্যন্তরে নব বল সঞ্চার করিব, না কোথায় আমরা তাঁহাদিগের কুসংস্কারানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি। ধিক্ আমাদিগের শিক্ষায়! ধিক্ আমাদিগের স্বদেশ-হিতৈষণায়!!

সমর-শেখর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"O, I have bought the mansion of a love,
But not possessed it; and though I am sold,
Not yet enjoyed."——ROMEO AND JULIET.

গিরিবালা সত্বর গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। রমেশ ক্ষণকাল গিরিবালার পুনরাগমনাশায় গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিল। উপস্থিত ঘটনাবলি মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার অন্তঃ- করণকে কখন ঘোর হতাশ তিমিরজালে আবৃত করিতে লাগিল, কখন বা জ্যোতির্ম্ময়ী আশাকৌমুদী বিকাশিত হইয়া সে সমস্ত অন্ধকাররাশি অপসারিত করিয়া দিল। একবার ভাবিল "যে গিরিবালা আমাকে এত ভালবাসিত; পূর্ব্বে সহস্র সহস্র কটুকথা বলিলেও যে অনায়াসে সহ্য করিত, কখন তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করিত না, অদ্য কেন সে সামান্য বিষয়ের জন্য কাঁদিল ও আমাকে এত ভর্ৎসনা করিল? অদ্য কেন সে আমাকে দেখিয়া বিষণ্ণ হইল? পূর্ব্বে সে আমাকে যেরূপ ভালবাসিত, যেরূপ স্নেহ করিত, আমিও তাহাকে সেইরূপ ভাল বাসিতাম, সেইরূপ স্নেহ করিতাম। বরঞ্চ আমি আরও অধিক ভালবাসিতাম; আমি একদণ্ড তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। তজ্জন্য সদা- সর্ব্বদা উহাদের বাটীতে থাকিতাম। কিন্তু এতাবৎ কালপর্য্যন্ত একদিনও উহার এরূপ বিমর্ষভাব দেখি নাই।

আমি যখনই উহাদের বাটীতে আসিতাম তখনই সমাদর করিয়া বসিতে বলিত,—বাটীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিত। তবে আজ আসিলে কেন কথা কহিল না, একবারও সম্ভাষণ করিল না?—কেন আজ আমাকে দেখিয়া বিমর্ষভাবে মুখ নত করিল?—উঃ বুঝিয়াছি, আমারই অদৃষ্ট। নতুবা এতদিনের স্নেহপালিতা মাধবীলতা কেন অন্য তমালের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? কি, অন্য তমাল? রমেশ জীবিত থাকিতে একটা অজ্ঞাতকুলশীল পথিক আসিয়া গিরিবালার প্রণয়পাত্র হইবে? কখনই নয়।" আবার ভাবিলেন "না গিরিবালা দারুণ অভিমানিনী,—পিতার আদরিণী কন্যা, অল্পকারণেই ক্ষুব্ধা হয়, তজ্জন্য বোধ হয় পত্রদর্শনে মনে মনে দুঃখিতা হইয়া থাকিবে। আর এতদ্বিষয়ে আমারই সম্পূর্ণ দোষ। আমি যদ্যপি পত্রখানি ওরূপ পরুষ ভাবে না লিখিতাম, তাহা হইলে এতবড় কাণ্ড হইত না। যাহা হউক ও অভিমান ক্ষণস্থায়ী, ও বিমর্ষভাব অল্পকালের জন্য। হাস্যময়ী গিরিবালা এখনই হাঁসিতে হাঁসিতে আমার নিকট আসিবে। আর আমার আশা বোধ হয় বিফলা হইবে না। কেননা প্রশ্নের উত্তরদানে সম্মতা হইয়াছে। হয়ত এখনই প্রত্যাগমন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিবে "আমার বিবাহ রমেশের সহিত হইবে।" অমূলকাশ্বাসজনিত আনন্দস্রোতে রমেশের হৃদয়-সাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, তাঁহাতে আবার হাস্যবায়ু প্রবাত হইয়া তাহাকে দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিল। মূর্খ! বাতুল! ইহা তোমার বৃথা আশা। তুমি মনে মনে সহস্রবার গিরিবালার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হও, কল্পনার ক্রোড়ে বসিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ সহস্রবার গিরিবালাকে তোমার প্রতি প্রণয়াসক্তা বলিয়া বিমল-হৃদয়ার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কার্পণ কর, তথাপি নিশ্চয় জানিও গিরিবালা কখনই তোমার হইবেন না।

রমেশ হতাশ হইল। বহুক্ষণ গিরিবালার আগমন প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট রহিল। গিরিবালা আসিলেন না, অবশেষে রমেশ উঠিল এবং শূন্যমনে গৃহের বহির্গত হইল।

আজ গিরিবালার হৃদয়ে সুখের লেশমাত্রও নাই। অন্তঃকরণ অস্থির, সদাই যেন অমিবার্য্য; দারুণ হুতাশনে দগ্ধ হইতেছে। যে ক্ষণ হইতে তিনি পামর রমেশের সেই বিষপূর্ণ পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ক্ষণ হইতেই তাঁহার হৃদয়ের চিরসুখ একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। যে প্রফুল্ল বদনে সদা সর্ব্বক্ষণ সুধাময়ী হাস্যলতা ক্রীড়া করিত, তাহা এখন গভীর কালিমায় পরিপূরিত হইয়াছে। পৃথিবীর কোথাও সুখ নাই, বাটীর কোথাও সুখ নাই, তাঁহার হৃদয়েরও কোনস্থানে সুখ নাই। যাহা দেখেন সকলই যেন শূন্যময়—কিছুই ভালো লাগে না।

দিবা সতী গিরিবালাকে অসুখী

দেখিয়া দুঃখে ও হৃদয়ের সন্তাপে ক্রমে ক্রমে মলিনা হইতে লাগিলেন। যে উৎফুল্ল কমলাননা তাঁহারই ন্যায় চিরকাল হাস্যময়ী সে কেন আজ সহসা ম্লানা হইল, দেখিয়া সহস্রাংশুময়ী উজ্জ্বলবদনা দিবারও মুখ ম্লান হইল; দারুণ হৃদয়ানল সহ্য করিতে না পারিয়া কান্তসহবাসে পশ্চিমসাগরে ঝাঁপ দিতে চলিলেন।

গিরিবালা একাকিনী তাঁহার পিতৃগৃহের ছাদের উপর দণ্ডায়মানা হইয়া পৃথিবীর প্রদোষ-বেশভূষা সন্দর্শন করিতেছিলেন। যে দিকে যে বস্তু নিরীক্ষণ করেন, সেই দিকেই সেই বস্তু যেন তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। পাদপনিচয় সন্ধ্যাসমীরণ কর্ত্তৃক আন্দোলিত হইয়া শোঁ শোঁ শব্দে যেন ক্রন্দন করিতেছে এবং মাথা নাড়িয়া বলিয়া দিতেছে "গিরিবালা, কেন দেখ? সুখ পাইবে না।"

গিরিবালা সন্তপ্ত হৃদয়ে চারিদিক্ অন্বেষণ করিলেন—যাহাতে তাঁহার মন একটু সুখানুভব করিতে পারে; কিন্তু তাঁহার সে আশা তাঁহার হৃদয়ের তিমিররাশির মধ্যেই বিলীন হইল। তিনি হতাশ হইলেন। এইরূপ দেখিতে দেখিতে দূর হইতে সেই সুবিস্তৃত প্রান্তর তাঁহার নয়নগোচর হইল। অমনি তৎসঙ্গেই সেইদিন সন্ধ্যাকালের সেই সমুদয় ঘটনাবলী আসিয়া তাঁহার হৃদয়াগার অধিকার করিল! সেই ভীষণ প্রান্তর, সেই সন্ধ্যাকাল, তিনি সেই শিবিকারোহণে গমন করিতেছেন, অকস্মাৎ সেই হৃদয়বিদারক অনুজ্ঞা ও তৎপরেই দস্যুদিগের আক্রমণ—এই সমস্ত ঘটনা ক্রমান্বয়ে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল; তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ভয়ে সর্ব্বশরীর স্তম্ভবৎ স্থিত রহিল, যেন সেই দস্যুরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি তদ্দিক্ হইতে দৃষ্টি নিবর্ত্তিত করিলেন, নামিয়া যাইবার বাসনায় দুই একপদ ফিরিয়া চলিলেন; অকস্মাৎ এক মনোহর দৃশ্য তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হইল; তিনি পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিয়া দাড়াইলেন, একদৃষ্টে সেই প্রান্তর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেইদিন মূর্চ্ছাপনোদনে যে নবীন যুবককে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অবিকল মনে পড়িল; যতই সেই স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই সেই যুবকের বিষয় সূক্ষ্মরূপে তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইতে লাগিল; অবশেষে সেই বিষয় বারম্বার পর্য্যালোচনা করাতে তাঁহার সহসা মনে হইল যেন সেই যুবক আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছেন,—গিরিবালা চমকিতা হইলেন, হঠাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,—কিন্তু বৃথা! কিছুই দেখিতে পাইলেন না। "একি আমার এপ্রকার হয় কেন? যে পুরুষকে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, সেদিন তাঁহাকে দেখিয়া হঠাৎ

যেন চিরপরিচিতের ন্যায় বোধ হইল! যেন সে মুখখানি আগে কতবার দেখিয়াছি, তাই নির্নিমেষ নয়নে বারম্বার দেখিলাম। তিনি যে অপরিচিত তাহা তখন আমার একবারও মনে হইলনা। আর সেই দিন হইতে যেখানে যাই,—যা করি, সর্ব্বক্ষণই সেই সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে। সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয় যেন যাইয়া যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি। তিনি যেন আমার কতই আপনার—কতই উপকারী। যা করি সকলই যেন তাঁহারই জন্য; তিনিই যেন আমার পৃথিবীতে এক মাত্র সুখের সামগ্রী। নতুবা আজ রমেশের পত্র পাইয়া কাঁদিব কেন?—অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হইলে যেন সেই সুখের সামগ্রীকে চিরকালের জন্য হারাইব, তাই কাঁদিলাম। যে রমেশকে শৈশবকাল হইতে সোদর ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া আসিতেছি, আজ কেন তাহাকে আমার দুর্জ্জয় শত্রু বলিয়া বোধ হইল?—যাহাকে দেখিলে আমার মনে আনন্দ হইত, আজ কেন সে আমার চক্ষের শূল হইল?—বোধ হয় তাঁহারই নিমিত্ত। রমেশ লিখিয়াছে "আমার সঙ্গে বিবাহ না হইলে চিরজীবনের জন্য তোমার ঐহিক সুখের পথে কণ্টক পড়িবে" এ কথায় আমার চক্ষে জল আসিল কেন? সেত আমাকে পূর্ব্বে অনেক কটু বলিত, কিন্তু তাহাতেত একদিনও কাঁদিনাই আজ তবে কাঁদিলাম কেন?" * *

"এখনি হয়েছে কি—এই ত চখের দেখা" নিকট হইতে কে উত্তর করিল।

গিরিবালা চমকিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রিয়সখী সুরাঙ্গিনী, অমনি পূর্ব্বভাব গোপন করিয়া প্রিয় সহচরীর হস্ত ধরিয়া হাঁসিলেন "আয়লো! সুরাঙ্গিনি, তুই কখন আসিলি?"

সুরাঙ্গিনী। "কেন আমি আসাতে তোমার কোন ব্যাঘাত ঘটিল নাকি?"

গিরি। "ব্যাঘাত আর কি?—বরঞ্চ আরও ভালো হইয়াছে। একলা ছিলাম,—তুমি আসিলে,—দুই জন হইলাম; ইহাত আরও ভালই হইল।"

সুরা। "আচ্ছা ও সব কথা এখন থাকুক।" গিরিবালার চিবুক ধারণ করিয়া সহাস্যে বলিল "বলি, এতক্ষণ কি হইতেছিল?"

"কি হইতেছিল?—কিছুই নয়।" গিরিবালা ঈষল্লজ্জিতা হইলেন।

সুরা। "এই যে এতক্ষণ কাঁদিতেছিলে"—

গিরি। "কাঁদিব কেন? কাঁদিবার কারণত কিছুই দেখিতে পাই না।"

সুরা। "বটে! আমার কাছে গোপন? আচ্ছা না বল আমি চলিলাম।" সুরাঙ্গিনী উঠিতে উদ্যতা হইল।

গিরিবালা তাহাকে বাধা দিলেন "সুরাঙ্গিনী,—যেওনা—যেওনা—বসো। সখি! ও কথা আর জিজ্ঞাসা করোনা। ও বিষয় হইতে যতক্ষণ ভিন্ন থাকি, ততক্ষণ হৃদয় একটু সুখে থাকে।"

সুরা। "কেন লো! পুষ্প ফুটিতে না ফুটিতেই যে নাকে কাপড়? অগ্রে পুষ্প প্রস্ফুটিত হউক,—সুগন্ধ কি দুর্গন্ধ চারিদিকে বিকীর্ণ হউক,—তবে ভাবিয়া নাকে কাপড় দিও।"

গিরি। "সখি! পুষ্প দুর্গন্ধ নহে—সুগন্ধ সত্য, এবং ইহার আঘ্রাণেও কাহারও অরুচি নাই, কিন্তু তাহা যদ্যপি না ফুটিতে পায় তাহা হইলে কি প্রকারে তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিবে?"

সুরা। "কেন ফুটিতে পাইবে না কেন?"

গিরি। "যদি প্রথমেই কীট প্রবেশ করিয়া সে কুসুম-কলিকা ছিন্ন করে?"

সুরা। "তুমি কি প্রকারে জানিলে যে, তোমার এ পুষ্পে কীট প্রবেশ করিয়াছে?"

গিরি। "সখি! না জানিলেই বা আশাত্যাগ করিব কেন? যখন নিশ্চয় জানিয়াছি যে পুষ্প ফুটিবে না, ফুটিলেও কখন সৌরভ বাহির হইবে না, তখন সে সুখের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সখি! আমি নিশ্চয় জানিয়াছি যে, সে সুখে চিরকালের নিমিত্ত বঞ্চিত থাকিব, জানিয়াছি এ অভাগিনীর অদৃষ্টে কোন কালে সুখ হইবে না, চির জীবন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তবে সে দুঃখময় পরিণাম ভাবিয়া এখন হইতে হৃদয়কে কেন জ্বালাতন করিব?—তবে কেন সে দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়ামরীচিকায় আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হইব?"

সুরা। "সখি! তোমার এ সমস্ত বাক্যের মর্ম্ম কিছুইত বুঝিতে পারিতেছি না; আর এ বিষয় তুমিত আমাকে এক দিনও বল নাই। আমার উপর বোধ হয় অবিশ্বাস হইয়াছে।"

গিরি। "না সখি! তোমার উপর যদ্যপি অবিশ্বাস জন্মিবে, তবে এ পৃথিবীতে আমার আর বিশ্বাসের পাত্র কে আছে? তবে যে জন্য তোমাকে এতদিন তাহা বলি নাই তাহার একই কারণ;—কেন আর সে দুঃখময় কথা তোমার নিকট বলিয়া তোমার সুখী হৃদয়কে ব্যথিত করিব?"

সুরা। "না, গিরিবালা! তুমি কখনও মনে করিও না যে সুরাঙ্গিনী তোমাকে দুঃখিত দেখিয়া সুখে থাকিবে। সে যতক্ষণ তোমার দুঃখের কারণ শ্রবণ না করিবে ততক্ষণ তাহার হৃদয়ে দ্বিগুণতর দুঃখানল প্রজ্বলিত হইবে। সখি! বল, বিলম্ব করিও না কেন সে গরলে হৃদয় পরিপূর্ণ রাখিয়া অন্তরাত্মাকে কষ্ট দিবে? তদপেক্ষা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া আমাকেও দুঃখের অর্দ্ধভাগিনী কর। আমি জানি যে, বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলে হৃদয়যাতনার অনেক লাঘব হয়।" সুরাঙ্গিনী প্রশ্নের উত্তরাশায় গিরিবালার সন্ধ্যাকমলতুল্য নিষ্প্রভ বদনোপরি সতৃষ্ণ নয়নদ্বয় সংযত করিয়া রহিল। গিরিবালা ক্ষণকাল স্বীয়া সহচরীর স্কন্ধদেশে মস্তক রক্ষা করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিলেন,

পরে এক অতি গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "সখি! ও দিবস আমি মাতুলালয়ে গমন করিয়াছিলাম, তাহা তুমি ভালরূপে জান; পরে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে বেলা প্রায় অতীত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, তখন আমরা শাগঘাটের মাঠে। একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে অবার সেই দুরন্ত মাঠ, বেহারারা 'প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা যে ভয়ে ছুটিতে ছিল, তাহাই তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ক্ষণেক পরে "কে তোরা? পালকি থামা।" এই কঠোর বাক্য একটা নিকটস্থ বন হইতে বহির্গত হইল, অমনি তাহার সঙ্গে যমদূতের ন্যায় জনকতক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোক ছুটিয়া আসিয়া পালকির উপর লাঠি মারিতে লাগিল, আমি ভয়েতে পালকিমধ্যেই মূর্চ্ছিতা হইলাম। মূর্চ্ছিতাবস্থায় আবার যে কত কত ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলাম তাহা এখন স্মরণ হয় না; কেবল একবার—আমার স্মরণ হইতেছে—দেখিলাম যেন দস্যুরা সকলের প্রাণসংহার করিয়া আমাকে লইয়া পলায়ন করিতেছে, অমনি পিতার নাম করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তাহার পর যে কি হইল কিছুই মনে হইতেছে না। পরে অকস্মাৎ চেতনা হওয়াতে দেখিলাম দস্যুরা সকলেই পলায়ন করিয়াছে; কেবল মাত্র একজন আহত হইয়া ভূপতিত রহিয়াছে; সখি! তাহার পর যাহা দেখিলাম তাহাই আমার হৃদয়ের শান্তিনাশের একমাত্র কারণ হইল; তাঁহার সঙ্গে যদ্যপি না সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে হত-ভাগিনীর আর এরূপ দশা কখন হইত না।" গিরিবালা আর বলিতে পারিলেন না। অনর্গল বারিধারা বহির্গত হইয়া তাঁহার বিশাল নয়নদ্বয় আবৃত করিল। তিনি প্রিয়সখীর স্কন্ধদেশে অশ্রুসিক্ত বদন রক্ষা করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

সুরাঙ্গিনী সহচরীর এই আকস্মিক মনোবিকার দর্শন করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্না হইলেন। এ বিষয় লইয়া আর অধিক আন্দোলন করিলে পাছে প্রিয়সখীর শোকাবেগ দ্বিগুণতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় তাঁহার মনকে বিষয়া-ন্তরে ব্যাপৃত করিবার মানসে তাঁহাকে ছাদ হইতে নামাইয়া লইয়া চলিলেন।

হে চন্দ্র!

সুদূর গগনে থাকি, ধরণীতে নেত্ররাখি
ক্লান্তিতে কি পাংশুবর্ণ বদন তোমার?
ভ্রমিতেছ দিন দিন, সদা সহচর-হীন,
বিভিন্ন-প্রকৃতি যত তারকা মাঝারে;
ক্ষীণতনু নিতি নিতি, লোচনে নাহিক ভাতি;
হৃদয়ের অবিচল-প্রেম-যোগ্য ধন
না পাই খুঁজিয়া, নভে ভ্রম অনুক্ষণ?

শ্রীপ্রঃ—

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রচনা—কাকিনীয়াধিপতি শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়ের জন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীগৌর সুন্দর চৌধুরী কর্ত্তৃক বিরচিত। জন্মতিথি-উৎসব হিন্দুদিগের একটী সুন্দর সামাজিক প্রথা। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মদিন উপলক্ষে প্রত্যেক হিন্দু-পরিবারের মধ্যে কিছু না কিছু উৎসব হইয়া থাকে। যাহার জন্মতিথি, সে সেদিন সকলেরই লক্ষীভূত, সকলেরই আদরের বস্তু। সে অতি দীন দুঃখী হইলেও সেদিন তাহাকে নব বস্ত্র পরিধান ও আয়ুর্বৃদ্ধিকর পরমান্নাদি উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণ করিতে হইবে। অতি অপরিচ্ছন্নকেও সেদিন সুমার্জ্জিত হইয়া স্রক্‌চন্দনাদি দ্বারা দেহ ভূষিত করিতে হইবে। যাহার সমস্ত বৎসর নিরানন্দে গিয়াছে, তাহাকেও সেদিন প্রফুল্ল ও সানন্দচিত্ত হইতে হইবে। কারণ সাধারণের এরূপ সংস্কার যে সেদিন নিরানন্দ থাকিলে আবার এক বৎসর নিরানন্দ থাকিতে হইবে। এই শুভপ্রদজন্মোৎসব প্রথা আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে আজ কাল উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা বৈদেশিক সংমিশ্রণের আনুষঙ্গিক যে সকল নৈমিত্তিক অশুভের উল্লেখ করিয়াছি, এই সকল সুন্দর প্রথার বিলোপ তাহার অন্যতম। আমরা এমনই নির্ব্বোধ যে পরের যাহা ভাল তাহা অনুকরণ করিয়া উঠিতে পারি না; কিন্তু আপনাদিগের যাহা ভাল তাহা পরিত্যাগ করিতে অগ্রপদ। আমরা স্বীকার করি যে আমাদিগের সমাজে অনেক কদাচার প্রচলিত আছে। আমাদিগের সমাজের সহিত তুলনায় ইউরোপীয়

সমাজ অধিকতর সদাচারপূর্ণ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা প্রামাণ্য হইতে পারে না যে হিন্দুসমাজের সকলই দূষিত, আর ইউরোপীয় সমাজের সকলই পবিত্র। আমাদিগের জন্মোৎসব প্রথা হিন্দু-সমাজের একটী সুন্দর প্রথা; সুতরাং ইহার পরিরক্ষণ প্রার্থনীয়।

রচনা-লেখক বৃথা আমোদ প্রমোদে প্রতিবৎসর অনেক টাকা ব্যয় করার বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। এই জাতীয় অধঃপতনের সময়, বৃথা আমোদ প্রমোদে সময় নষ্ট করিবার আমাদিগের অধিকার নাই। তাহার উপর ইহার জন্য বৎসারে বৎসরে অর্থরাশি বিসর্জ্জন করা বিশেষ লজ্জাকর। বিশেষতঃ রচনাকার কাকিনীয়াধিপতি কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীকে যে সকল অলৌকিক গুণগ্রামে মণ্ডিত করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহার যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সত্য হয় তাহা হইলে তাদৃশ মহাত্মার পক্ষে এরূপ অপব্যয় অক্ষমণীয়।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যে আদর্শ পুরুষের উল্লেখ আছে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য মন স্বতঃই উৎসুক হয়; কারণ আমরা জমিদারশ্রেণীর ভিতর এরূপ অলৌকিক-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি একজনও দেখি নাই। কাকিনীয়াধিপতির অলৌকিক গুণগ্রাম যদি স্তুতি-পাঠকের স্বার্থপূরিত মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা মাত্র না হয়, তাহা হইলে তিনি জমিদার-মাত্রেরই অনুকরণীয় সন্দেহ নাই।

নলিনী—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। শ্রীনবেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ আনা মাত্র। বঙ্গীয় সাহিত্যকাননে বিবিধ ফুল ফুটিতে দেখিলে সাহিত্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়। কানন-সরোবরে দুই চারিটী কমল ফুল ফুটিয়া থাকিলেই যে কাননের শোভা হয় এরূপ নহে। কাননের শোভাপূরণে স্থলপদ্ম, মল্লিকা, চম্পক, যুঁই—প্রভৃতি সকল ফুলেরই প্রয়োজন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে বঙ্গীয় সাহিত্য-কাননে কোন ফুলেরই বৃদ্ধির আশা নাই। উদ্যানপালের যত্নবিরহে সকল ফুলই অর্দ্ধ-বিকশিত অবস্থায় নিমীলিত হইয়া যায়। এই স্থল-পদ্মের অদৃষ্টে যে সেরূপ দুরবস্থা ঘটিবে না কে বলিতে পারে?

যাহা হউক নলিনীর দীর্ঘ জীবন যে প্রার্থনীয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ আমরা ইহার দুই চারিটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। "আধপাগলার পত্রের" প্রবন্ধাংশটু কি চিন্তা-পূর্ণ, তাহাতে পাগলামির লেশমাত্র নাই। এরূপ পাগলের দলবৃদ্ধিতে ভারতের মঙ্গল বই অমঙ্গল নাই। "দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রসর" প্রবন্ধে চিন্তা-শীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার ভাষা কিঞ্চিৎ জটিল। কবিতাগুলি তত মনোহারিণী হয় নাই। "রজনী প্রভাত" নবন্যাসের

ভাষা মন্দ নহে, তবে ইহার চরিত্রগুলি কিরূপ দাঁড়ায় এখন বলা যায় না। "বিজ্ঞান ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম" এ প্রবন্ধটীও মন্দ হয় নাই। এক্ষণে আমরা আশীর্ব্বাদ করি নলিনী যেন দীর্ঘজীবিনী হইয়া বঙ্গীয় কাননের শোভা বর্দ্ধন করে।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সপ্তদশ সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ।

আমরা প্রতিবৎসরই উত্তর পাড়া হিতকরী সভার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই একই কারণে এবৎসরও তাহাই করির। হিতকরী সভা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতভাবে সমাজের যে উপকার সাধন করিতেছে, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রশংসা হইতে পারে না। ইহার সহিত কোন সভারই তুলনা হইতে পারে না। কারণ অন্যান্য সভা বক্তৃতামূলক বা আবেদন-প্রবণ। তাঁহারা বক্তৃতা করিয়া বা গবর্ণমেণ্টের নিকট কাঁদিয়া কিঞ্চিৎ চাহিয়া নিরস্ত হন; কিন্তু হিতকরী সভা কার্য্য-মূলক, ইহা যথাশক্তি সমাজের কিঞ্চিৎ কার্য্য না করিয়া ক্ষান্ত হন না। হিতকরী সভার একটী প্রধান ব্রত স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন করা। হিতকরী সভা আজ সপ্তদশ বৎসর অবিচলিত ভাবে অবিরাম সেই ব্রতপালনে রত রহিয়াছেন। পরিণতবয়স্কা অন্তঃপুরিকা ও অপরিণত-বয়স্কা বালিকা এই উভয় শ্রেণীর ছাত্রী-দিগের শিক্ষা দান ও পরীক্ষা গ্রহণাদি বিষয়ে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। এই শ্মশানতুল্য বঙ্গভূমিতে জীবনচিহ্ন দেখিলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। এদেশের প্রায় সকল স্থলেই সুশিক্ষিত দল স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উদাসীন। যদি দয়া করিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন স্থানে স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন তবেই মঙ্গল। নতুবা তত্তৎস্থানের নারীবৃন্দ চির-অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন রহিলেন। তাঁহাদিগের উদ্ধারের আর কোন আশা নাই। যদি আমরা বক্তৃতায় বা ইংরাজ-দ্বারে ক্রন্দনে আমাদিগের সময়, শক্তি, ও অর্থ বৃথা নষ্ট না করিয়া, নিম্নশ্রেণী ও স্ত্রীজাতির শিক্ষা বিধানে সে সকল ব্যয়িত করিতাম, তাহা হইলে ভারতের অবস্থা অচিরকাল মধ্যেই অন্যরূপ ধারণ করিত সন্দেহ নাই। হিতকরী সভার ন্যায় কার্য্যকরী সভা সকল যদি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে সংস্থাপিত হয়, যদি সেই সকল সভার প্রসর বাড়িয়া নিম্নশ্রেণীকেও তদন্তর্ভুক্ত করে, তাহা হইলেই বুঝিব ভারতের আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা আছে।

আমরা সভাকে আবার অনুরোধ করি-তেছি সভা যেন আপনার কার্য্যবিবরণ স্বদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত করেন। আমাদিগের অনুরোধ কথনই গ্রাহ্য হইবে না তাহাও আমরা জানি। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা প্রতিবার ইহা বলিব। কারণ সাহেবের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করা যদি সভার উদ্দেশ্য না হয় তাহা হইলে বৈদেশিক ভাষায় কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত করায় সভার যে কি লাভ তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। যতদিন মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার উপর আমাদিগের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না জন্মিবে ততদিন আমাদিগের জাতীয় উন্নতির কোন আশা নাই।

সন্ন্যাসী।

"Rise up! and loiter not!
Follow after a holy life."

"হবে না কথাতে, কেবল লেখাতে
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,
ভারত সন্তান তবে বলি তারে,
নতুবা লিখিতে অথবা বলিতে
আমিও তো পারি তাতে কি বল না।"

বিরাগ এবং অনুরাগ অপূর্ব্বভাবে মিশ্রিত হইয়া প্রকৃত সন্ন্যাসরূপে পরিণত হয়। এই দুইটীর সমন্বয় পবিত্র। অন্তর্জ্জগৎ এবং বহির্জ্জগতের দুই মূর্ত্তি শিব এবং অশিব। আত্মা শিক্ষিত না হইলে সহজে সংসারের মঙ্গলময় মূর্ত্তির পরিচয় পায় না। এই শিক্ষাই যোগ। পূর্ণ উদার ভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রকৃত যোগী হৃদয়কে বহুকাল ধরিয়া শিক্ষা দেন। সংসারের কু হইতে সু বিচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত, সুখ হইতে দুঃখকে বিশ্লেষণ করিয়া হৃদয়কে একটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব উচ্চ কাল্পনিক জগতের সহিত একতন্ত্রীভূত করিবার জন্য যোগী জীবন উৎসর্গ করেন। যখন এইরূপে হৃদয়ের এবং প্রকৃতির শিব মূর্ত্তির পরিচয় পান, তখন তাঁহার যোগ সিদ্ধ হয়। যোগীর কার্য্যের অবসান হইলে সন্ন্যাসীর কার্য্যের আরম্ভ হয়। দুঃখকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া কিরূপে সুখে পরিণত করিতে পারা যায়, যোগ হইতে এই শিক্ষা লাভ হয়। সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব্বে যোগীর জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। এই জ্ঞান হইতে যোগী সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। যোগীর জীবন ধ্যানময়, সন্ন্যাসীর জীবন কার্য্যময়। যোগীর কার্য্য ব্রত গ্রহণ, সন্ন্যাসীর কার্য্য ব্রত সাধন। সন্ন্যাসী যোগীর বীর সন্তান। ব্রতপালন বীরের ধর্ম্ম। জগতে মঙ্গলময় যাহা তাহার প্রতি অনুরাগ—এবং অমঙ্গলময় যাহা তাহার প্রতি বিরাগ—সন্ন্যাসি-জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র ভিন্ন জনে ভিন্ন প্রকার।

অনেকে বলেন সন্ন্যাসীর জীবন

সম্পূর্ণ অভাবাত্মক (negative)। তাঁহাদিগের মতে, সর্ব্ব বস্তুতেই যে বিতৃষ্ণা তাহার নামই সন্ন্যাস *। যদি ইহার অর্থ এই হয় সন্ন্যাসীর কোন বিষয়েই আস্থা থাকিবেক না, তাহার জীবনের কোন উদ্দেশ্য থাকিবে না, তৃণ-খণ্ডের ন্যায় সময়স্রোতে ভাসিবে, তাহা হইলে এ অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। সন্ন্যাসীব বিতৃষ্ণা একমাত্র বস্তু ভিন্ন অন্য সকল বস্তুতে। এবং এই এক মাত্র বস্তু তাহার নিজের সুখ নহে; অন্যের সুখ, পরের উপকার, জগতের মঙ্গল। জগৎ দুঃখ-পরিপূর্ণ দেখিয়া আমাদিগেব সন্ন্যাসীর নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয়, এবং তিনি কিসে দুঃখের অপনয়ন হইবে তাহারই সাধনে জীবন উৎসর্গ করেন।

স্থায়ী ও প্রকৃত বিরাগের উৎপত্তি স্থান অনুরাগ। পুণ্যে প্রকৃতানুরাগ না থাকিলে, পাপে যথার্থ বিরাগ হইতে পারে না। একটীতে সংযোগ না হইলে, অন্য সকলে বিয়োগ সম্ভবে না। যিনি বিরাগী তিনি অনুরাগী। সন্ন্যাসীর ব্রতই ধর্ম্ম, ব্রতই দেবতা। সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন এবং সেই দেবসেবাই জীবনের লক্ষণ। সন্ন্যাসীর জীবন পবিত্র ও উচ্চ। মোহময় সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া, আরাধ্য দেবের চরণে জীবনোৎসর্গ করিয়া দিয়া, নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুখ দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, কেবল মাত্র আপনার উচ্চ ব্রত লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত সন্ন্যাসী জীবনের পথে অগ্রসর হন। সংসারে নিজের নিমিত্ত তাঁহার কোন কাম্য বস্তু নাই। আমরা এই অর্থে "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।" এইটী গ্রহণ করি। সংসার-কোলাহল পরিত্যাগ, ও ভোগবাসনা পরিহার করিয়া, প্রতিনিয়ত ব্রত সাধনায় অনুরক্ত থাকাই সন্ন্যাস, এবং তাহাই যিনি করেন তিনিই সন্ন্যাসী। গৃহীও সন্ন্যাসী হইতে পারেন। গৃহে থাকিয়া যিনি সন্ন্যাসী তাঁহার জীবন আদর্শ-স্থল। যিনি সন্ন্যাসী, তিনি জগতের শিক্ষক। মহৎ ব্রত সাধনার্থে শশ্বৎ আপনার জীবন ভুলিয়া, আত্মার সুখাশার বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করা, মহতী শিক্ষা। প্রিয় জন্মভূমি, আবাস গৃহ, স্নেহময় পরিবার পরিত্যাগ করিয়া, দূরে নির্জ্জনে পর্ব্বত-গুহায় কেবল মাত্র ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যায় না *। এইরূপ যোগ আত্মময় যোগ এবং আত্মময় বলিয়া উচ্চ আদর্শ-স্থল নহে, বরঞ্চ যে শক্তির দ্বারা জগতের হিত সাধিত হইতে পারে সেই শক্তির অপব্যয় এবং উচ্চনীতির বিরোধী। বিজনে ঈশ্বরের ধ্যানে মহত্ত্ব আছে

* যদা মনসি সম্পন্নং বৈতৃষ্ণং সর্ব্ববস্তু।
তদা সন্ন্যাসমিচ্ছেত্ত পতিতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়ে॥
ইতি কৌর্ম্মে উপরিভাগে ২৭ অধ্যায়ঃ।
কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণঃ॥
ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ঃ।

* গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা বাসং দেবালয়েঽপি বা।

স্বীকার করি, কিন্তু স্বীকার করিলেও এইটী বলিতে হইবে যে এই প্রকার ধ্যান সর্ব্বোচ্চ আদর্শ নহে। আপনার কার্য্য অনেকেই করিয়া থাকেন, অন্যের কার্য্যে যিনি জীবনোৎসর্গ করেন, তিনিই মহান্, তিনিই উচ্চ। যিনি উপরে ঈশ্বর এবং অন্তরে কর্ত্তব্যজ্ঞান রাখিয়া * ব্রত গ্রহণ এবং পালন করেন তাঁহারই চরিত্র অনুকরণীয়।

সন্ন্যাসী নানাপ্রকার। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিবিধ সন্ন্যাসী উল্লিখিত হইয়াছে— জ্ঞানসন্ন্যাসী, বেদসন্ন্যাসী, কর্ম্ম-সন্ন্যাসী।† আমরা সন্ন্যাসীকে চারি শ্রেণীতে এবং ভিন্ন অর্থে বিভক্ত করিলাম। প্রথম, ধর্ম্ম-সন্ন্যাসী, দ্বিতীয় রাজনীতি-সন্ন্যাসী, তৃতীয় জ্ঞান-সন্ন্যাসী, চতুর্থ কর্ম্ম-সন্ন্যাসী। ইঁহারা সকলেই এক তীর্থের যাত্রী—কেবল ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিক। সকলেরই উদ্দেশ্য এক জগতের মঙ্গল। কেবল উপায় বিবিধ। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ বা পাপের উৎপীড়ন হইতে মানবজাতিকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ব্রত গ্রহণ করেন; কেহ বা শাসনের অত্যাচার হইতে প্রপীড়িত প্রজাপুঞ্জকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত দৃঢ়-সংকল্প হয়েন; কেহ বা অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যকে চক্ষু দিবার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করেন; কেহ বা কোন বিশেষ বিভাগে আবদ্ধ না থাকিয়া যখন যে প্রকারে সুবিধা পান, তখন সেই প্রকারে প্রাণি-মাত্রেরই দুঃখের অপহার এবং সুখের পরিবর্দ্ধন করিতে সতত সচেষ্ট থাকেন। উপরোক্ত চারি শ্রেণীর মধ্যে আমরা এই প্রবন্ধে ধর্ম্ম-সন্ন্যাসী ও রাজনীতি-সন্ন্যাসী এই দুই শ্রেণীর বিষয়ে দুই একটী উদাহরণ দিয়া লিখিব।

১। ধর্ম্ম-সন্ন্যাসী। মহেশ্বর সন্ন্যাসী ও যোগী ছিলেন। মহাদেব গৃহী, তাঁহার প্রিয়পত্নী স্নেহময়ী ভক্তবৎসলা ভগবতী। তাঁহার সহচর ভূতপ্রেত প্রভৃতি। শ্মশান তাঁহার বিচরণ ভূমি, মৃত শরীর যোগাসন, নৃমুণ্ডমালা অলঙ্কার, ভস্ম অঙ্গভূষণ, ভিক্ষা মাত্র উপজীবিকা। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য, জ্ঞানময়, যোগী। তাঁহার অভিমান কি ঘৃণা ছিল না। পতিতের আশ্রয় ছিলেন, ভক্ত বিপদে পড়িয়া স্মরণ করিলেই তাঁহার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইতেন। বৈরাগ্যের চরমসীমায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্মশানে থাকিয়াও তিনি গৃহী ও প্রণয়ী। তিনি আপনার অস্তিত্বে বিস্মৃত হইয়া আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। ধ্যান করিতে করিতে দুঃখের হাহাকার শুনিতে পাইতেন। সন্ন্যাসী মহাদেব জগৎ-মঙ্গল-ব্রতে আত্মবিস্মৃত।

* "Heart within and god o'ver head"
Longfellow.

† জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসন্ন্যাসিনোপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত্বন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
যঃ সর্ব্বসঙ্গনির্মুক্তো নির্দ্বন্দ্বশ্চাপি নির্ভয়ঃ।
প্রোচ্যতে জ্ঞানসন্ন্যাসী স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতঃ ॥
বেদমভ্যসেন্নিত্যং নিরাশী নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে বেদসন্ন্যাসী মুমুক্ষুর্ব্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
যস্ত্বগ্নীনাত্মসাৎ কৃত্বা ব্রহ্মার্পণপরো দ্বিজঃ।
জ্ঞেয়ঃ স কর্ম্মসন্ন্যাসী মহাযজ্ঞপরায়ণঃ ॥

মহেশ্বর প্রণয়ী। ভক্ত-প্রিয়া পার্ব্বতী প্রণয়ের সামগ্রী। শ্মশানে মহাদেব ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন সত্য, কিন্তু পত্নীর প্রতি উদাসীন নহেন। প্রণয়ী যোগী। যোগের প্রথমাবস্থা প্রণয়। প্রণয় মনুষ্য-জীবনের একটী উচ্চ ধর্ম্ম। যে দর্শনে সহানুভূতি পাপ পুণ্যের পরীক্ষাস্থল বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার সত্যতার বিষয় মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু সহানুভূতিতে যে বহুল পরিমাণে আমাদিগের চরিত্র সংঘটিত হয়, তাহা দার্শনিকেরাও স্বীকার করেন। সমগ্র জগতের উপর যে প্রণয় বিস্তৃতি লাভ করে—তাহার উচ্চতা, তাহার পবিত্রতা, চিরকাল লোকে পূজা করিবে, হৃদয়ের সহিত আকাঙ্ক্ষা করিবে। যে প্রণয়ে দুই আত্মা এক হইয়া যায়, সংসারে মনুষ্যজীবন দ্বৈত ভাব পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈত ভাব লাভ করে, সে প্রণয় যে স্বর্গের সোপান, আত্মার মুক্তি, তাহা কেনা স্বীকার করিবে? এই প্রণয় হইতেই বিশ্বব্যাপী প্রণয়ের উদ্ভব এবং বিশ্বব্যাপী প্রণয়ই সর্ব্বোচ্চ যোগের প্রধান লক্ষ্য।

মহাদেব ও সতী উভয়েই উভয়ের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, কিন্তু দুই জনের প্রণয় উভয়েতে সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রাণী জগতের উপর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সতী পতিগত প্রাণা। পতিনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। শিবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। সন্ন্যাসী মহেশ্বর সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই প্রণয়ের শেষাভিনয়েও সন্ন্যাস। জ্ঞানময় সদাশিব, পার্ব্বতীর বিয়োগে, মৃত শরীর স্কন্ধে লইয়া, যে শোকে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, সে শোকের নাম যোগ ও সাধনা। স্কন্ধে মৃতদেহ, হৃদয়ে তাপসের প্রণয়, ইহার মাহাত্ম্য, ইহার মহিমাময় কবিত্ব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পত্নীকে ভাল বাসিতেন—আকাঙ্ক্ষাবিহীন, দানেই সুখী, প্রতিদান চাহিতেন না। উচ্চ প্রকৃতির সন্ন্যাস কি তাহা মহাদেবকে চিন্তা করিলে বুঝা যায়। কবির কি মহতী কল্পনা!

কাব্য হইতে ইতিহাসে আইস। গালিলী-হ্রদবিচারী ধীবর-সহচর, সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ, মহাত্মা, ঈশার জীবন অনুধাবন করিয়া দেখ। ঈশাকে যখনই যে অবস্থায় দেখিবে ঈশা সন্ন্যাসী। তাঁহার নিজের কোন কামনা বা সুখভোগের ইচ্ছা নাই। জগতে "কদম্বে বা সদম্বে লোষ্ট্র বা কাঞ্চনে" সমবুদ্ধি। ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য ক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা তাঁহার নিকট এক। তিনি জগতে যে প্রণয়-রাজ্য সংস্থাপিত করিতে আসিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কি গ্যালিলি প্রদেশে কি টাইবীরিয়া হ্রদ-প্রান্তে কি জেরুজিলাম নগরে কি অলিভিস (Olives) শৈলোপরে, কি জিবোদির গৃহে কি গেথ্‌সিমেন (Gethsemane) উদ্যানে,

যেখানেই দেখ, দেখিবে ঈশা সন্ন্যাসী। যতদিন তিনি গ্যালিলি প্রদেশে ছিলেন, ততদিন প্রতিকূল ঘটনার বিশাল তরঙ্গ তাঁহাকে প্রতিঘাত করে নাই; কিন্তু যখন তিনি গ্যালিলি পরিত্যাগ করিয়া জেরুইজিলম রাজধানীতে আসিলেন, তখনই তাঁহার জীবনের যন্ত্রণা ও বিপদ আরম্ভ হইল। ঈশা ইচ্ছা করিলে নিরাপদ থাকিতে পারিতেন, কিন্তু ঈশা তাহা করিলেন না। তিনি কপটতা এবং অধর্ম্মের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ অস্ত্র অনবরত প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঈশার জীবনের শেষ সপ্তাহে বিপদের ও মৃত্যুর পূর্ব্ব ছায়া তাঁহার হৃদয়ে পতিত হইয়াছিল, নানা প্রকার সন্দেহ ও বিভীষিকা আসিয়া তাঁহার মনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল "চিরজীবনের মত বিশ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্ব প্রকার সুখ সম্ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া, যে কার্য্যের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিলাম তাহা বুঝি সমাধা করিতে পারিলাম না, কেবল যন্ত্রণা এবং মৃত্যুই বুঝি সার হইল।" হয়ত তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য বাল্যকালের সুখস্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। জানিনা হয়ত গ্যালিলির নির্ম্মল নির্ঝরণীর শীতল বারি, জন্মভূমির পিককুল-কূজিত শ্যামল তরু-রাজি, লজ্জাশীলা নবযৌবনা সহচরীর স্ফুটনোন্মুখে প্রণয়ের মধুর কান্তি তাঁহার হৃদয়ে সেই নৈরাশ্য এবং অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর গাঢ়তর তিমিরের মধ্যে, নিশীথদৃষ্ট দূরবর্ত্তী দীপালোকের ন্যায় প্রতিভাসিত হইয়াছিল। তাঁহার মনে এই সময়ে কিরূপ চিন্তা উদিত হইয়াছিল—তাহা নিশ্চয় জানি না, কারণ তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণকেও তাহা কখন বলেন নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, ক্ষণকালের পরেই ঈশার স্বর্গীয় প্রভা তাঁহার পার্থিব প্রকৃতির উপর আধিপত্য সংস্থাপিত করিল। ঈশা ইচ্ছা করিলে এখনও নিজের জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। সংশয়, বিষাদ, নৈরাশ্য ক্ষণ কালের নিমিত্ত হয়ত ঈশার দিপ্তিময় হৃদয়কেও মেঘাবৃত করিয়াছিল; কিন্তু তিনি অনতিবিলম্বে মেঘবিনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উৎসারিত হইলেন। ঈশার শত্রুগণ তাঁহার জীবন-নাশের নিমিত্ত চক্রান্ত করিতে লাগিল। ঈশা ইচ্ছা করিলে এখনও জীবন রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তিনি তামিস্রা রজনীতে অলিবিস-গিরি-পদ-প্রান্তস্থ উদ্যানে বিভুধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন, তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় আলোক লইয়া সেখানে একদল সৈন্য উপস্থিত হইল, ঈশাকে বন্দী করিল। ঈশার শিষ্যগণ তাহা দেখিয়া পলায়ন করিল। ঈশা নির্ভয়, কেন না তিনি সন্ন্যাসী। ঈশাকে প্রধান

যাজকপ্রতিম ক্রূর-বুদ্ধি হানানের (Hanan) নিকট লইয়া গেল। হানান তাঁহাকে তাঁহার মত এবং তাঁহার শিষ্যদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। ঈশা নির্ভীক চিত্তে বলিলেন "আমার মত— আমার উপদেশ-বাক্য, বারম্বার প্রকাশ্যে উচ্চারিত হইয়াছে; যাহারা আমার বাক্য শ্রবণ করিয়াছে ইচ্ছা হইলে আপনি তাহাদিগকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলিতে চাহি না"। ঈশার এই নির্ভীক বাক্য শ্রবণ করিয়া একজন পুরোহিত তাঁহাকে প্রহার করিল; ঈশা সন্ন্যাসী, তাহাতে তিনি ক্ষুব্ধ বা কুণ্ঠিত হইলেন না। তৎপরে যখন ঈশাকে প্রধান পুরোহিতের বাটীতে লইয়া যাইল, এবং সেখানে তাহার ভৃত্যগণ তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে অপমান করিতে লাগিল, তখন ঈশা সন্ন্যাসী। রোমীয় শাসনকর্ত্তা পাইলেট বিচারালয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি আপনাকে যথার্থই ইহুদিরাজ মনে করিয়া থাক।" ঈশা উত্তর করিলেন "হাঁ আমি রাজা বটি কিন্তু এ রাজত্ব পার্থিব নহে,"—তখন ঈশা সন্ন্যাসী। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যখন ঈশার কোমলাঙ্গে কশাঘাত করিল, যখন ব্যঙ্গ করিয়া ঈশার মস্তকে কণ্টক-মুকুট স্থাপন করিয়া হস্তে রাজদণ্ড স্বরূপ কাষ্ঠ খণ্ড দিয়া, তাহাকে সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিল, এবং পাষণ্ড সৈন্যগণ একে একে তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল, কেহ বা তাঁহার উপর থুৎকার দিল—যখন ঈশার চতুর্দ্দিকে "ঈশাকে ক্রুসে বধ কর, ঈশাকে ক্রূসে বধ কর" এই ভয়ানক ধ্বনি উত্থিত হইয়া তাহার কর্ণ ভেদ করিতে লাগিল;—তখন ঈশা ধীর, প্রশান্ত, বীর-সন্ন্যাসী। তাঁহাকে দস্যু চোর ইত্যাদি নিতান্ত ঘৃণিত লোকের ন্যায় ক্রূশে বধ করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইল। প্রায় মধ্যাহ্ন, ঈশার দুর্ব্বল শরীর ক্রূস কাষ্ঠ-খণ্ড-বহনে ক্লিষ্ট ও অবনত—তিনি ক্লান্ত শরীরে ধীরে ধীরে বধ্যভূমি গল-গথাতে উপস্থিত হইলেন। ক্রূসে আরোপিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে মদিরা দেওয়া হইল। তিনি তাহা পান করিলেন না, সুরা পান করিয়া যন্ত্রণা উপশম করিবার তাঁহার আবশ্যক নাই। তাঁহাকে ক্রূসে আরোপিত করা হইল, জশঙ্কু দ্বারা তাঁহার হস্ত বিদ্ধ করিতে লাগিল—জগতের যিনি মুক্তি-দাতা, প্রেমরাজ্যের যিনি সংস্থাপয়িতা, দয়ার যিনি মূর্ত্তিমান প্রকাশ, তাঁহার সেই সুকুমার দেহ নিষ্ঠুরেরা গজাল দিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন-উত্তাপ-দহ্যমান দেহে শোণিত বিগলিত হইতেছে, বিজাতীয় তৃষ্ণায় প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। ভিতরে এই যন্ত্রণা—বাহিরে মানবজাতির কৃতঘ্নতা ও পশ্বাচারের দৃশ্য। পথিকগণ তাঁহার যন্ত্রণা লইয়া তাঁহার সম্মুখে রহস্য করিতেছে, তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনায় নিঃসারিত শব্দ

লইয়া কৌতুক করিতেছে। তখন আকাশ তিমিরাবৃত, পৃথিবী শুষ্ক, অন্ধকারময়। শারীরিক যন্ত্রণা অপেক্ষা মনুষ্যের কৃতঘ্নতা ও পাশব ব্যবহার ঈশার অন্তঃকরণে সহস্রগুণ কষ্টদায়ক বোধ হইতে লাগিল, মনুষ্যের ন্যায় কৃতঘ্ন ও নিষ্ঠুর জীবের নিমিত্ত তাঁহার নিজের প্রাণদান করা ভুল হইয়াছে, হয়ত তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার মনে হইয়াছিল। তখন তিনি কাতরস্বরে বলিলেন "হে ঈশ্বর! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে?" কিন্তু তৎপরেই ঈশার সন্ন্যাস ভাব তাঁহার হৃদয়কে দৃঢ় করিল, তাঁহার আত্মার জ্যোতি ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্যের কৃতঘ্নতা ও নৃশংসাচরণের সম্মুখস্থ ঘৃণিত দৃশ্য ভুলিয়া গিয়া, তিনি তাঁহার মৃত্যুর শুভময় ফল প্রতীতি করিতে লাগিলেন, এবং ক্রুসে বিলম্বিত হইবার এক প্রহর পরে, জগতে অপূর্ব্ব সন্ন্যাস জীবনের জ্বলন্ত ও অমর দৃষ্টান্ত রাখিয়া, ঈশ্বর-সন্নিধানে চলিয়া যাইলেন।

হে সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ! হে ঋষিপ্রবর? হে মৃত্যুঞ্জয়! তোমার জীবন ও মৃত্যুর মহিমা ভাষায় কে বর্ণনা করিবে? তোমার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে, তোমার দেবত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। তোমার গৌরবের পবিত্র বৈজয়ন্তী সর্ব্বত্র উড্ডীন হইয়াছে। তুমি মরিয়া অমর হইয়াছ। কালের অনন্ত স্রোত অবিরাম প্রবাহিত হইবে, কিন্তু তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি, তোমার জগন্মঙ্গলময় যোগ, তোমার সর্ব্বসিদ্ধিভূত মৃত্যু মানব-হৃদয়ে চিরকাল রাজত্ব করিবে।*

ঈশা জন্মিবার প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এক সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন আর্য্যজাতি পঞ্জাব-প্রবাহী পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া, জাহ্নবীর রম্য উপত্যকায় নিবাস স্থাপন করিয়াছেন। জেতা আর্য্যগণ জাত্যভিমান-দৃপ্ত বিজিত আদিম নিবাসিগণ জেতৃপদদলিত; জাতিভেদ সমাজে দৃঢ়-বদ্ধ; বেদে লোকের আর তত আস্থা নাই; নানা প্রকার উপধর্ম্ম ও কলুষিত কল্পনা আর্য্যদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছে; ধর্ম্মযাজকগণের শাসন ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে; বাহ্যিক ও অনর্থক ক্রিয়া কলাপে পরোপকারাভ্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মের সারভূত অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; সাহিত্যরাজ্যে, কবিকুলের আসনে টীকাকার ও বৈয়াকরণগণ আসীন হইয়াছেন; আত্মার দেহ-পরম্পরাতে ক্রমিক অবস্থানে জন-সাধারণের বিশ্বাস আবদ্ধ, এবং আত্মার মুক্তি-লাভের আশায় বহুলোক আত্ম-নিগ্রহ তৎপর হইয়াছে:—এমন সময় শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করিলেন। শাক্য-সিংহ শৈশব হইতে ভোগবাসনায় উদাসীন। বালক-সন্ন্যাসী ক্রীড়াস্থল

* See Life of Jesus by M. Ernest Renan. Chaps. XXI–XXV.

পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত বিপিনে বসিয়া কি চিন্তা করিত। রাজপুত্র, অসীম বিভবশালী, বিলাসের ক্রোড়ে পালিত, জগতে কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু কাল্পনিক রাসেলাসের যেমন, তাঁহার পক্ষেও তেমন, যাহার কিছুরই অভাব নাই তাহার অসুখ। রাসেলাস উপত্যকায় গিরি-প্রাচীরে বদ্ধ, শাক্য তাহাও নহে, তথাচ অসুখ, কিসের যেন অভাব। রাজপ্রাসাদে মনুষ্যের দুঃখের ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। রাজ্য-সুখ ও প্রণয়ের আবেশ ভঙ্গ হইল। কুসুম-সরসী-শোভিত প্রমোদ বন, বিদ্যাধরী-রূপিণী কমনীয় যুবতীমণ্ডলী, স্বামিগত-প্রাণা ললিতা ভার্য্যা প্রভুভক্ত ভৃত্যবর্গ, স্নেহময় জনকের অতুল বিভব, নিজের নব যৌবন—তথাচ শাক্য সিংহের সংসারে বৈরাগ্য। নিস্তব্ধ নিশীথে তিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন এবং নিদ্রিত প্রেয়সী, প্রাণাধিক নবজাত শিশু পরিহার করিয়া, একমাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে, বিজন বিপিনে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজকুমারের পরিচ্ছদ ও আভরণ পরিত্যাগ করিয়া, ভৃত্যকে বিদায় দিয়া এবং রাজ্যসুখ সম্পদের নিকট চিরবিদায় লইয়া, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সেই নৈশ অন্ধকারে, সেই জনসমাগমশূন্য অরণ্যে, শাক্যসিংহ এখন আর রাজকুমার নহেন—এখন তিনি নিরাশ্রয় নির্ধন সন্ন্যাসী; অদ্য ইহার কল্য উহার দ্বারে অন্নমুষ্টি ভিক্ষার নিমিত্ত দণ্ডায়মান। তিনি ছয় বৎসর উরুবেলারণ্যে কঠোর সাধনা করিলেন, আত্মদেহ নিগ্রহে, অনশনে কঙ্কালা-বশিষ্ট হইয়া যাইলেন।* একদিন তিনি চিন্তা-নিমগ্ন হইয়া ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতেছিলেন, সহসা টলিয়া ভূমিতে পড়িয়া যাইলেন।† শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ মনে করিল তিনি মরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধ আস্তে আস্তে উঠিলেন। দীর্ঘকাল শরীরকে এই প্রকার নিপীড়িত করিয়া কিছুই পরমার্থ জ্ঞান লাভ হইল না দেখিয়া তিনি হতাশ হইয়া আত্ম নিগ্রহ পরিত্যাগ করিলেন। একে তাঁহার মনের অবস্থা এখন শোচনীয় তাহার উপর তাহার শিষ্য মণ্ডলী তাহার আত্ম নিগ্রহ ত্যাগের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে অসার ব্যক্তি মনে করিয়া অশ্রদ্ধার সহিত তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিল। বুদ্ধের মনে এই সময় মহা বিতণ্ডা ও বিগ্রহ উপস্থিত হইল। কু এবং সুর মধ্যে মহা দ্বন্দ্ব। তাহা বৌদ্ধদিগের পুস্তকে

* He withdrew accordingly into the jungles of Urvela, near the present temple of Budha Gaya, and there for six years attended by faithful disciples, he gave himself up to the severest penance, until he was wasted away to a shadow by fasting and self mortification.

(Budhism by Rhys Davids, late of the Ceylon Civil Service p. 35.)

† At last one day, when walking slowly up and down, lost in thought, he suddenly staggered and fell to the ground. (Ibid.)

কবিত্ব-সম্পদে বর্ণিত হইয়াছে *। শাক্য-সিংহ এইরূপ দ্বিধাক্লিষ্ট চিত্তে নৈরঞ্জর নদী-তীরাভিমুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পথি মধ্যে বড় ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। সুজাতা-নাম্নী এক কৃষক-কন্যা তাহাকে কিছু আহারীয় সামগ্রী দিল, বৃক্ষমূলে বসিয়া তাহা ভোজন করিয়া সেই দীর্ঘ দিবসে তাঁহার এখন কি করা কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে মনে নানা-প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। "কই, সংসারের মায়া এক-কালীন পরিত্যাগ করিয়া, এতদিন, এত বৎসর, পথে পথে অরণ্যে অরণ্যে, ভ্রমণ করিলাম, পণ্ডিতদিগের উপদেশ লইলাম, কত-প্রকার সাধনা করিলাম, কত ক্লেশ স্বীকার করিলাম, কই, তাহাতে মোক্ষজ্ঞান লাভ হইল কৈ? তবে কেন সংসার ত্যাগ করিলাম, এখনও ত ফিরিয়া যাইতে পারি, সেই সুখ আবার সম্ভোগ করিতে পারি। গৃহে ফিরিয়া যাইলে বৃদ্ধ জনকের আনন্দের সীমা থাকিবে না, পতিপ্রাণা পরিত্যক্তা প্রেয়সী আহ্লাদে বিহ্বলা হইবেন। সেই শিশু সন্তান—যাহাকে গৃহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার হৃদয়ে ধারণ করিবার নিমিত্ত মন আকুল হইয়াছিল, কিন্তু পাছে পত্নীর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এবং তাহার মায়াতে জড়ীভূত হইয়া যাই, এই ভয়েতে যাহাকে বিদায় কালে একবার চুম্বন করিতে পারি নাই, সেই সন্তান এখন আরও কত সুন্দর হইয়াছে, তাহাকে দেখিয়া কতই আনন্দ হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেত এই জনক, পত্নী, পুত্র এই সকলই ছিল, তাহাতে ত সুখ পাই নাই। আর কি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না? তাহা কি স্থির, আত্মার রোগ শোক জরা ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখ হইতে কি মুক্তি পাইবার কোন আশা নাই, কোন উপায় নাই? আমি কি সিদ্ধি লাভ না করিয়া ব্রতের অবসান করিব? শাক্য সিংহ সেই দিন সূর্য্যো-দয় হইতে সূর্য্য অস্তগমন পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষতলে বসিয়া এইরূপ নানা প্রকার তর্কের দোলায় উঠিতে ও নামিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দিবাবসান হইয়াছে, প্রকৃতি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, শাক্যসিংহের হৃদয় হইতে সকল সংশয়ের অপনয়ন হইল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইলেন। গূঢ় সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে। মনুষ্যের দুঃখের কারণ এবং দুঃখ-বিনাশোপায় আবিষ্কৃত

* "When the conflict began between the Saviour of the word and the Prince of Evil a thousand appalling meteors fell; clouds and darkness prevailed, even this earth, oceans and mountains it contains, though it is unconscious, quaked like a conscious being, like a fond bride when forcibly torn from her bridegroom—like the festoons of a vine shaking under the blasts of a whirl-wind &c."

(Madhuratha Vitasini apud Turnour and Davids.)

So in "Paradise Regained" on a similar occasion:—

"And either tropic now
'Gan thunder, and both ends of heaven
the clouds."
&c. &c. (Par. Reg., bk iv.)

হইয়াছে, হৃদয়ের উৎকর্ষ—সর্ব্বভূতে প্রণয়, ইহাতেই সুখ। এখন, তিনি যে সত্যের আবিষ্কার করিলেন, তাহা কি তিনি প্রচার করিবেন না? অবশ্য করিবেন। এখন তাঁহার একমাত্র কার্য্য তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার; অন্য সকল বিষয়ে পূর্ণ বৈরাগ্য। সবিস্তরে তাঁহার জীবন-চরিত অনুধাবন করা আবশ্যক নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পিতার রাজ্যে একবার আসিয়াছিলেন, পত্নীর ও পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু এখন বুদ্ধদেব পূর্ণ সন্ন্যাসী। তাঁহার পত্নী বুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা জানিতেন, তথাচ তিনি যখন দেখিলেন—তাঁহার স্বামী, রাজতনয় শাক্যসিংহ, মুণ্ডিত-মস্তক ও মুণ্ডিত বদনে রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, তখন তিনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন; বুদ্ধের পদদ্বয় ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী যশোধরা জানিতেন এখন তাঁহার স্বামীর এবং তাঁহার মধ্যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান। ক্ষণকাল পরে তিনি উচ্ছলিত হৃদয়কে দমিত করিলেন, এবং এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অন্য দিকে রাজা স্বয়ং স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া। কিন্তু যদিও এই সময় বুদ্ধের মনের কি ভাব হইয়াছিল তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, তথাচ বুদ্ধ যে আর মায়ামুগ্ধ হয়েন নাই তাহা ইতিহাসে আমরা জানিতে পারি।* পরে যশোধরা বুদ্ধ-স্থাপিত সন্ন্যাসিনী শ্রেণীতে ভুক্ত হইলেন। বুদ্ধের মৃত্যুতেও সন্ন্যাসীর প্রশান্ত ভাব।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালি-স্তব।

হে বাঙ্গালিন্! কলিকালে তুমি মহাদেবতা, তোমাকে নমস্কার।

তুমি ব্রহ্মা, নিরন্তর প্রজা বৃদ্ধি করাই তোমার একমাত্র কার্য্য, তোমাকে নমস্কার।

তুমি বিষ্ণু, আজীবন তুমি কুপোষ্য প্রতিপালন কর, তোমাকে নমস্কার।

তুমি মহেশ্বর, অনুক্ষণ তুমি কাল সংহার কর, তোমাকে নমস্কার।

হে চতুর্ম্মুখ! চারিমুখে তুমি চারি প্রকার কথা কহিয়া থাক; তোমার বৃদ্ধ হংসটি কালে লয় পাইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার পুচ্ছটি অবলম্বন করিয়া তুমি দুস্তর ভবসাগর পার হইয়া থাক। সহধর্ম্মিণী তোমার গায়ত্রী, তাঁহার বাক্যই

"The different accounts often tell us the thoughts of the Budda on any particular occasion; here they are silent."

* She became an earnest hearer of the new doctrines.

Buddhism by Davids. p. 66.

তোমার নিকট বেদবাক্য, তুমি নানা ছন্দোবন্ধে তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া থাক। স্বরস্বতী তোমার দুহিতা, কন্যাদায়ে তুমি সদাই বিব্রত, তাহাকে অন্যের ঘাড়ে ফেলিতে পারিলেই তুমি দায় হইতে নিষ্কৃতি পাও, তোমাকে নমস্কার।

হে লোকপালক! তুমিই এই জগৎ-সংসারের আহার যোগাইতেছ; তোমারই প্রসাদাৎ উকীল মোক্তারগণ খাইতে পাইতেছে, আবগারী বিভাগ চলিতেছে, ডাক্তারগণ পয়সা করিতেছে। হে লোকরঞ্জক! তুমি নানারূপে জীবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাক; থিয়েটরে ভূত সাজিয়া, কাছারীতে বেটো ঘোড়া সাজিয়া, আফিসে গর্দ্দভ সাজিয়া, আর বাটীতে তামাক সাজিয়া লোকের তুষ্টি সাধন কর। হে অনন্ত মায়াময়! ভ্রান্ত মানবগণ তোমার মহামায়ার কি বুঝিবে? তুমি মায়াবলে হ্যাট্ কোট পরিয়া সাহেব সাজিয়া থাক, ব্রাহ্ম সমাজে চক্ষু মুদিয়া থাক, শৌণ্ডিকালয়ে গ্রাস ধরিয়া থাক; সভাস্থলে গলাবাদ্যে ইংরাজ দূর কর, রাত্রে গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া গৃহের বাহির হও; কাগজ কলমে একত্র করিয়া বিধবার বিবাহ দেও, জাতিভেদ উঠাইয়া দেও, বাল্য বিবাহ রহিত কর, আবার গ্রামে গিয়া দলাদলী কর। হে ক্ষীরোদ-বাসিন্! তোমার শ্রী সতত চঞ্চলা, তোমার গৃহে সদাই অন্নাভাব। হে বিভো! তোমার দশ অবতার; প্রথম অবতারে রেলের বাবুরূপে অব-স্থান করিতেছ, তোমার দ্বিতীয় অবতার কাছারীর আমলা, তৃতীয় অবতার লাই-সেন্সের এসেসর, চতুর্থ ও পঞ্চম পোষ্ট-মাষ্টর ও পুলিশ ইন্সপেক্টর। পরশু রামাবতারে তুমি পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃমুণ্ড ছেদন করিয়াছিলে, সম্প্রতি তুমি কলি-অবতারে স্ত্রীর আজ্ঞায় মার ভাত বন্ধ করিয়াছ। তুমি বুদ্ধাবতার, তোমার নিশ্বাসে ঈশ্বর উড়িয়া যান, শ্বেতকৃষ্ণের প্রভেদ থাকে না; অহিংসা তোমার পরম ধর্ম্ম, বুট প্রহারেও তোমার হিংসা বৃত্তি উত্তেজিত হয় না; বেশ্যাগৃহ তোমার মঠ, সেখানে থাকিয়া যখন তুমি সন্ন্যাস অবলম্বন কর, তখন সংসার-মায়া তোমাকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না, স্ত্রী পুত্রের নয়ন-জল তোমাকে ফিরাইতে পারে না; তুমি সেখানে থাকিতে থাকিতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হও। তুমি শ্রীকৃষ্ণাবতার, বিদ্যালয়ে শিশুর পালচরাইয়া থাক; অপরে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া যে নবনীতটুকু বাহির করেন, তুমি বেমালুম সেটুকু চুরী করিয়া থাক; তোমার লীলা খেলায় জনগণ স্বাধীন প্রেম শিক্ষা করে। হে কৃষ্ণ! তোমার ভিতর বাহির সমান; তোমার চক্রে যে একবার পড়িয়াছে তাহার আর নিস্তার নাই। হে নারায়ণ! তোমার দশম ও শেষ অবতার ঘরজামাই ও পোষ্যপুত্র; তোমার মহিমা অপার।

হে মহাদেব! যে তোমার সংহার মূর্ত্তি না দেখিয়াছে, ভৃত্যবর্গের মধ্যে

তোমার তর্জ্জন ও বিষাণ-নির্ঘোষ না শুনিয়াছে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর সে নর কিরূপে তোমার মহিমা বুঝিবে? হে ভূতনাথ! তুমি ভূতগণের শ্রেষ্ঠ, প্রেতগণ তোমার অনুচর, সদনুষ্ঠান ও সৎকার্য্যে সততই তুমি বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাক। তুমি তমোময়, তমঃ-প্রভাবে তুমি ত্রিসংসারে কাহাকেও দৃক্‌পাত কর না। হে নীলকণ্ঠ! তোমার কণ্ঠে যে হলাহল রহিয়াছে, তাহা উদ্গীরণ করিয়া তুমি চরাচর দগ্ধ করিয়া ফেল। হে পঞ্চানন! তোমার পঞ্চমুখে তুমি সদাই পরনিন্দাগান করিয়া আপন ভাবে আপনি বিভোল হইয়া থাক। হে মহেশ্বর! তুমি সদাশিব, গৃহিণীর পদতলে তুমি সততই অবস্থিতি কর। তুমি ভোলানাথ, পুস্তক চাহিয়া ফিরাইয়া দিতে তোমার মনে থাকে না, আর্য্যদর্শনের পয়সা দিতে তুমি ভুলিয়া যাও; পরকৃত উপকার তোমার স্মৃতি হইতে শীঘ্রই বিলোপ পায়। হে আশুতোষ! তুমি স্বতঃই সন্তুষ্ট, ৩০ টাকার চাকুরী হইলেই তুমি আপ্যায়িত হও। পরিহিত সূক্ষ্ম বস্ত্রে তুমি দিগম্বর, গৃহিণীও দিগম্বরী। ত্রিশূল তোমার বেত্র-যষ্টিতে পরিণত হইয়াছে, কুঞ্চিত কেশাবলীতে তোমার জটা পরিলক্ষিত হয়, সীমন্ত-রেখাতে তন্নিবদ্ধা ভাগীরথীর প্রবাহ প্রতীতি হয়, গলবিলম্বী উড়ুনীতে সর্পজ্ঞান হয়; হাড়মালা তোমার চেইনে পরিণত হইয়াছে, ঝুলী তোমার রুমালত্ব পাইয়াছে, বিষাণ তোমার চুরটত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তৃতীয় নয়ন তোমার নাসিকার উপর আসিয়া চসমারূপ ধরিয়াছে। হে বৃষভ-বাহন! তুমি বাহন-পৃষ্ঠে একবার আবির্ভূত হও! হে সিদ্ধিদাতঃ! তুমি রায় বাহাদুর হও, রাজা বাহাদুর হও, আমায় সিদ্ধি দান কর; তুমি ভোজ দাও, বল্ দাও, রেসফণ্ডে টাকা দাও, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি।

তুমি ইন্দ্র, পরচ্ছিদ্রান্বেষণে তুমি সহস্র-চক্ষু। তুমি অসুরারি, যেহেতু পাওনাদার-ভয়ে ইন্দ্রত্ব ছাড়িয়া তোমাকে মাঝে মাঝে ডুব মারিতে হয়। তুমি শতক্রতু, যেহেতু তুমি শত উমেদারী করিয়া তোমার চাকুরী পাইয়াছ। তুমি সোমপায়ী, তুমি যজ্ঞভাক্, যে যাহা করে, তাহাতেই তুমি ভাগ বসাও। তুমি ত্রিদিব-নিবাসী, তোমার বড় কেহই নাই এই ভাবিয়া মাটীতে তোমার পা পড়ে না। সমালোচনা তোমার বজ্র; হে মেঘবাহন! যখন মেঘান্তরালে থাকিয়া এই বজ্র ছাড়, তখন শত শত নিরীহ গ্রন্থকার দগ্ধ হইয়া যায়।

তুমি অগ্নি, তুমি যে স্থানে যাও জ্বালাইয়া পোড়াইয়া খাক করিয়া দাও। তুমি সর্ব্বভুক্, ত্রিসংসারে তোমার কিছুই অখাদ্য নাই। হে তেজাধার তোমার উত্তাপ ন্যাসন্যাল থিয়েটরের নটবৃন্দ, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী, ও হকার-বাহিত পুস্তক-রাশির

মধ্য হইতে স্ফুরিত হইয়া ভারত তাতাইয়া তুলিয়াছে, অচিরাৎ প্রজ্জ্বলিত হইবে, অতএব তোমাকে সঘৃত মাংস আহুতি দিতেছি, হে হুতাশন! আমাকে সে অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা কর।

তুমি বায়ু, লঘুত্ব তোমার গুণ, পরিবর্ত্তন তোমার ধর্ম্ম, শৈত্যই তোমার স্বভাব। তুমি জগতের প্রাণভূত, তোমার চাকরী না হইলে জগৎ এক দণ্ডও চলে না। সংবাদ-পত্র তোমার বাহন, তাহাতে আরোহণ করিয়া তুমি প্রবল ঝড় তুলিয়া থাক।

তুমি বরুণ; বারুণী তোমার বিলাসিনী। তোমার অমোঘ পাশে বঙ্গ স্ত্রী পুরুষ যে দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ আছে, স্বয়ং শক্তি আসিলেও তাহা ছেদন করিতে অসমর্থ। হে জলেশ! তোমার ইচ্ছা হইলে পিটিশন বৃষ্টি করিয়া জগৎ সংসার ভাসাইয়া দিতে পার, তাহাতে বিক্টোরিয়ার সিংহাসন পর্য্যন্ত প্লাবিত হইয়া যায়।

তুমি সূর্য্য, তোমার উদয়াস্ত রুটিন বাঁধা; দশটায় আইস পাঁচটায় যাও। তোমার ভয়ে পেচকগণ কোটরে লুকায়! হে লোক-লোচন! তুমি বঙ্গের অন্ধকার হরণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ।

তুমি যম, তোমার প্রসাদাৎ অজ ও মোরগকুল নির্ম্মূল হইয়াছে; স্বয়ং ভগবতীই তোমার ভয়ে শশব্যস্ত! তোমাকে নমস্কার।

তুমি কার্ত্তিকেয়, তোমার শৌর্য্যবীর্য্য ত্রিলোক-প্রথিত, তোমাকে নমস্কার।

হে সর্ব্ব-দেবাত্মন্! ভক্তি-ভাবে তোমার স্তব করিলাম। অযথোক্তি যদি কিছু থাকে, সে গুলি অজ্ঞানকৃত বলিয়া জানিও, আমি তোমাকে পুনরায় অভিবাদন করি।

॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইউরোপ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

আমরা পূর্ব্বখণ্ডে দেখাইয়াছি যে নব্য ইতালী সমাজের প্রথম যুগের পরিণাম—পরাজয়, ছত্রভঙ্গতা ও নিদারুণ নির্যাতন। এই খণ্ডে দেখাইব যে এই পরাজয়ের পর নব্য ইতালী সমাজের প্রসর বাড়িয়া ইহা "নব্য ইউরোপ" আখ্যা ধারণ করে। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, ভবিষ্য গগনে একটী আশাতারা দেখা যাইতেছে না, এ তামসী নিশির কবে অবসান হইবে, কেহই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না—এমন অবস্থায় একাকী বিরলে বসিয়া ম্যাট্‌সিনি ভাবিতে লাগিলেন—"আমি

কি এখন এই রঙ্গভূমি হইতে অবসৃত হইয়া, রাজনৈতিক জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিস্তব্ধভাবে আত্মোন্নতির পথের অনুসরণে রত থাকিব; এবং যে সকল অধ্যয়ন আমার প্রকৃতির অনুকূল তাহাতে নিমগ্ন হইয়া যতদিন না আমা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী ও অধিকতর সাহসিক বীরপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া ইতালীর আভ্যন্তরীণ পরিপুষ্টি সাধন করিতেছেন, ইতালীর অদৃষ্টসাগরে নূতন আবর্ত্ত উত্থাপিত করিতেছেন, ততদিন ধীরভাবে কালের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব?"

অনেকেই তাঁহাকে তাহাই করিতে উপদেশ দিলেন। কারণ অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস যে ইতালী বহুদিনের দাসত্বে মূলতঃ দূষিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা ম্যাট্‌সিনির উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে কখনই প্রস্তুত হইবে না: এবং কখনই নিজ চেষ্টায় স্বজাতির উদ্ধার-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইবে না। আর কতকগুলির এরূপ উপদেশ দানের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার। তাঁহারা এই স্বাধীনতা-সমরের প্রারম্ভেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে শীর্ষোপরি ভীষণ ঝটিকা আকাশমণ্ডলকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়া ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইলেন; ইহাঁদিগের ইচ্ছা যে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইলেই আপন আপন ব্যক্তিগত জীবনের পরিতৃপ্তি-সাধনে নিমগ্ন হন।

বস্তুতঃ অলক্ষণ সেভয়-অভিযানের পর যে সকল ঘটনা-রাশি পুঞ্জীকৃত হইল, তাহাতে তাঁহাদিগের যুক্তি নিতান্ত অসার বলিয়া প্রতীত হয় নাই। যাঁহারা কেবল মাত্র জয়ের উপাসক, তাঁহারা এই পরাজয়ে ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর রবে দোষোদ্ঘোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। জাতীয় উদ্দীপনা—প্রতিহত হইয়া প্রতিক্রিয়ায় এক্ষণে অধিকতর নিষ্প্রভ ভাব ধারণ করিল।

ইতালী হইতে যাহা কিছু শুনা যাইতে লাগিল, সমস্তই নৈরাশ্য জনক। পলায়ন, দলত্যাগ, কারাবোধ, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা এ সকল ভিন্ন ইতালী হইতে আর কোন সংবাদ আসিতে লাগিল না। এদিকে ম্যাট্‌সিনির যে লক্ষ্য সুইজর্লণ্ডের সর্ব্বত্র প্রথমে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল, এই পরাজয়ে সেই লক্ষ্যের প্রতি সুইজদিগের ক্রোধের ভাব উদ্দীপিত হইল। ইহার প্রধান কারণ—ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতিকে আশ্রয় দান করায় সুইজরলণ্ডের প্রতি ইউরোপের ভয়ানক নির্যাতন। জেনোয়া—অসংখ্য রাজনৈতিক লিপি দ্বারা উৎপীড়িত হইতে লাগিল; সকল দিক্ হইতেই এই দুর্লঙ্ঘ্য আদেশ আসিতে লাগিল যে—যদি পত্রপাঠ মাত্র ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতিকে সুইজর্লণ্ড হইতে বিদূরিত করা না হয়, তাহা হইলে অচিরকাল-মধ্যেই তথায় ইউরোপীয় সেনা আবির্ভূত হইবে।

কতিপয় অজ্ঞাতনামা বিদেশীয় আসিয়া সুইজর্লণ্ডের শান্তিকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তুলিল, ইউরোপের সহিত একদিন সুইজর্লণ্ডের যে ঐকতানিক সদ্ভাব চলিয়া আসিতেছিল তাহা নষ্ট করিল, এই সকল ভাবিয়া অনেকেই পরাজিত বৈদেশিকদিগের প্রতি শাপ দান করিতে লাগিলেন। সুইস্ সাধারণতন্ত্র ইউরোপীয় রাজ্যসকলের সহিত শান্তি রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং গৃহে অনুসন্ধান ও বিচার আরম্ভ হইল। বৈপ্লবিকদিগের যুদ্ধসামগ্রী সকল ক্রোক করা হইল। এদিকে ধনাগার প্রায় বিশোষিত হইয়া উঠিল। নির্ব্বাসিতদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িল। অধিক কি অধিকাংশেরই দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহের কোন উপায় ছিল না। হতাশার অন্ধকারে অন্ধিত-দৃষ্টি ও এই সকল কষ্ট যন্ত্রণায় হতবুদ্ধি হইয়া নির্ব্বাসিতগণ পরস্পর-মমতাশূন্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। নৈরাশ্যের অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইল। এমন সময় তমসাচ্ছন্ন গগনে একটী আশাতারার ক্ষীণ বিভা পরিদৃষ্ট হইল। নির্ব্বাসিতগণ নিশ্চিত সংবাদ পাইলেন যে অচিরকাল-মধ্যে ফ্রান্সে একটী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান উপস্থিত হইবে এবং সম্ভবতঃ ইহা বিজয় লাভ করিবে। কিন্তু এই একমাত্র শুভ লক্ষণে ম্যাটসিনির মনে কোনও আশার সঞ্চার হইল না। কারণ তিনি জানিতেন ফ্রান্সের—ইউরোপীয় জাতীয় স্বাধীনতা-সমরের অধিনেতা হইবার কোন আশা নাই। সুতরাং ভবিষ্যতে কি হইবে এই ভাবনায় তিনি নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ বন্ধুজনের উপদেশ বা ভবিষ্য বিপদের আশঙ্কা অপেক্ষা দুঃখিনী জননীর নিদারুণ শোক ও ভাবনা তাঁহার চিত্তের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যদি নিবৃত্ত হওয়া ম্যাট্‌সিনির পক্ষে সম্ভব হইত, তিনি এই স্থলেই নিবৃত্ত হইতেন।

কিন্তু যে তেজ ম্যাটসিনির অন্তরে ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্নভাবে জ্বলিতেছিল, তাহা বাহ্য ঘটনারূপ আবর্জ্জনা দ্বারা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তাঁহার প্রকৃতি প্রবলতররূপে স্বতন্ত্রী ও স্বানুবর্ত্তী ছিল। এই ভীষণ সংঘর্ষকালেও তিনি নিজ প্রকৃতিকে এরূপ একটী কার্য্যকর বল-কেন্দ্র বলিয়া মনে করিতেন, যাহা বাহ্য ঘটনাপুঞ্জ দ্বারা রূপান্তরিত না হইয়া, বরং সেই ঘটনাপুঞ্জকে অভ্যন্তরে আনিয়া ইচ্ছানুসারে রূপান্তরিত-করিতে পারিত। তাঁহার অন্তর্জীবন আভ্যন্তরীণ তেজ-কেন্দ্র হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে বিকীরিত হইত, বাহির হইতে সঙ্কলিত হইয়া অভ্যন্তরে কেন্দ্রীভূত হইত না।

তাঁহাদিগের উদ্যম শুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার পরিণাম নহে; পার্শ্বপরিবর্ত্তন দ্বারা

যন্ত্রণার লাঘব করিবার জন্য পীড়িত ব্যক্তির অঙ্গসঞ্চালনের ন্যায় নহে। বৈদেশিক শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়া—জাতীয় স্বাতন্ত্র্য মাত্র লাভ করা তাঁহাদিগের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু তাঁহারা ইহাকে উচ্চতর লক্ষ্য সংসিদ্ধ করিবার সাধন স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন মাত্র। তাঁহারা তাঁহাদিগের জাতীয় পতাকায় লোকতান্ত্রিক একতা এই দুইটী শব্দ সুবর্ণে খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য একটী জাতি প্রতিষ্ঠাপিত করা, একটী সমগ্র দেশকে একটী সজ্জাত মানবে পরিণত করা। এই প্রকাণ্ড লক্ষ্য যাঁহাদিগের নয়ন-সমক্ষে জ্বলিতেছে, সামান্য পরাজয় তাঁহাদিগের নিকট কি ছার? বিশেষতঃ বিপদে প্রশান্ত সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদিগের বৈপ্লবিক শিক্ষাপ্রণালীর একটী প্রধান অঙ্গ।

দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা যেরূপ ফলোপধায়িনী হয় এরূপ আর কিছুতেই নহে। ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন যে এই বিপদের সময়, এই নৈরাশ্যের সময়, তাঁহারা যদি অবিচালিত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে না পারেন, অধিনায়কেরা যদি নিজেরাই রণে ভঙ্গ দেন, তাহা হইলে কে আর তাঁহাদিগের বক্তৃতায় বা রচনায় উদ্দীপিত হইবে? কে আর তাঁহাদিগের বাক্যে জীবন উৎসর্গ করিবে? কে আর বিশ্বাস করিবে, যে ইতালীর একতা কখন সম্ভবপর হইতে পারে? যে পাপে ইতালী এত দিন অসাড় জড়পিণ্ডের ন্যায় বৈদেশিক চরণতলে পড়িয়া আছে, তাহা ইতালীর স্বাধীন হইবার ইচ্ছাবিরহ নহে; ইতালীর নৈরাশ্য-প্রবণতা, এবং নিজ অন্তর্বলে বিশ্বাস ও স্থিরলক্ষ্যতার অভাবই সেই পাপের একমাত্র কারণ-সামগ্রী। জ্বলন্ত আশা, নিজ অন্তর্বলে অবিচলিত বিশ্বাস, এবং লক্ষ্যের স্থিরতা—এই কয়টী জাতীয় গুণের অভাবে অন্য সকল গুণই নিষ্ফল। চিন্তা ও কার্য্যের সামঞ্জস্যের অভাবেই এই সকল বিষময় ফলের উৎপত্তি।

প্রয়োজনের গুরুত্বানুরূপ বক্তৃতা করিয়া বা পত্রিকাদি লিখিয়া নৈতিক শিক্ষা বিধান দ্বারা লোকের মন হইতে এই মৌলিক পাপ বিদূরিত করা সম্ভবপর হইত বটে, কিন্তু পুলিশের ভীষণ নির্যাতনে তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং জীবন্ত দৃষ্টান্তের একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। এক দল এমন লোকের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল,—যাঁহাদিগের সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে; যাঁহারা ভগ্নোৎসাহতার অধিগম্য নহেন; যাঁহারা নির্যাতনের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম; যাঁহারা কোন মহৎ সত্যের অনুরোধে সহাস্য বদনে পরাজয়কে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত; যাঁহারা অদ্য বিপদের নিকট নতশির হইলেও কল্য আবার মস্তক তুলিতে

কৃতসঙ্কল্প; যাঁহারা সততই সমরার্থ সসজ্জিত; যাঁহারা কার্য্যের আপাত-বিমুখতা ও ভাগ্যলক্ষ্মীর বর্ত্তমান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, ভাবিষ্যৎ বিজয় বিষয়ে সতত বিশ্বাস-পূর্ণ। দল বাঁধা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। জগতে স্বদেশ-হিতৈষণা ধর্ম্মের প্রচার করাই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। নির্যাতন দ্বারা দলের মূলোৎপাটন সম্ভব, কিন্তু ইহা দ্বারা ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ অসম্ভব।

এই সকল চিন্তা ম্যাট্সিনির মনোমধ্যে সমুদিত হওয়ায় তিনি অতঃপর মন হইতে সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত করিয়া, গৃহীত ব্রতের উদ্যাপনা পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত না হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

তবে তিনি ইহা স্থির জানিতেন যে তাঁহাদিগের ইতালীতে কার্য্যারম্ভ করা অনিবার্য্যরূপে বিলম্বিত হইবে। কারণ তাঁহার দলের লোকদিগের এই ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে এবং তাঁহাদিগের প্রভুগণের বিজয় স্থির জানিয়া আবার বিশ্রাম-সাগরে নিমগ্ন হইতে অনেক সময় লাগিবে। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে ইত্যবসরে বাহিরের চেষ্টা দ্বারা গৃহের ক্ষতির কথঞ্চিৎ পূরণ হইতে পারিবে; এবং ইউরোপের মধ্যে তাঁহাদিগের স্বাপক্ষ্যে মতের আন্দোলনে ও বৈদেশিক মিত্রতার আনুকূল্যে তাঁহাদিগের ভবিষ্য অভ্যুত্থানের কৃতকার্য্যতা অনেক পরিমাণে নিশ্চিত করিতে পারিবেন।

১৮৩৪ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত দুই বলবতী চিন্তা ম্যাট্সিনির চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। দলিতপ্রায় ইউরোপীয় জাতিনিচয়কে মোহমন্ত্রে জাতীয়তার সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করা, এবং সেই সঞ্জীবন ও উদ্দীপনাকার্য্যের অধিনায়কত্ব ইতালীর হস্তে সমর্পণ করা—এই চিন্তাতেই এই কয় বৎতেই সর তাঁহার মন সতত আকুল থাকিত। এ দুইই তিনি সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতেন।

তাঁহাদিগের প্রকাশিত পত্রিকাদি সমস্ত ইউরোপবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। অসমসাহসিকতার সহিত সেভয় আক্রমণে ইউরোপীয় নির্ব্বাসিত দল আসিয়া ক্রমে নব্য ইতালী সমাজের সহিত সমবেত হইল। এই বৈদেশিক নির্ব্বাসিত দলের অধিকাংশই জার্ম্মান্ ও পোল; কিন্তু ফ্রান্স, স্পেন, ও অন্যান্য দেশ হইতেও কতকগুলি আসিয়া জুটিয়াছিল। এই সকল আগন্তুক বৈদেশিক নির্ব্বাসিতগণের মধ্যে হ্যারো হেয়ারিঙের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ব্যক্তি একজন উৎকৃষ্ট লেখক, এবং স্বাধীনতাতীর্থের একজন অকপট যাত্রী। পোলাণ্ড, জার্ম্মানী, ও গ্রীস,—যে দেশে যখনই স্বাধীনতার নামে বিপ্লবপতাকা উড্ডীন হইয়াছে, এই মহাত্মা সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া প্রপীড়িত অধিবাসিবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীনতা-

সমরানলে ঝাঁপ দান করিয়াছিলেন। উত্তর সাগরের তীরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কেবল তিনিই স্কন্দনভরাজ্যের*—সুইডেন ও নরওয়ের—সমীকরণরূপ পবিত্র ভাব ও তৎসাধনের উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষিত করিয়াছিলেন। সে সময় তথাকার কেহই এই পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত, বা এই উচ্চ আশায় উদ্দীপিত হন নাই। কিন্তু দিন আসিবে—যখন এই পবিত্র ভাবে ও এই উচ্চ আশায় সমস্ত স্কন্দনভ আলোড়িত হইবে।

শাসনসমিতির নির্যাতনে এই সকল নির্ব্বাসিত দল ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ার পূর্ব্বেই ম্যাট্‌সিনি সকলেরই অন্তরে জাতি-সমবায়ের বীজ বপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমস্ত জাতিকে এক শাসনসমিতির অধীন করাই জাতি-সমবায় শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য। ইউরোপের সকল দেশেই এই বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। সকল দেশই এই মতের সত্যতা ও সারবত্তা স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু কোন দেশেই অদ্যাবধি এই মতকে কার্য্যে পরিণত করার উদ্যম হয় নাই।

এদিকে ফ্রান্সে বোনারতি, তেষ্টি প্রভৃতি অধিনায়কশিরস্ক কার্ব্বোনারি সম্প্রদায় সকল দেশেই তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং সকল দেশের, সকল অবস্থার, লোককেই আপনাদিগের শ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিলেন। কার্ব্বোনারি শব্দের সূক্ষ্ম দার্শনিক অর্থে ইহা—বিশ্বনাগরিক সমাজ। মানবজাতি ও মানব-ব্যক্তি ভিন্ন ইহা আর কিছুই স্বীকার করিত না; ইহা অন্তর্ভুক্ত সভ্যদিগকে বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন আর কোন ভাবে দেখিত না। তাঁহাদিগের বেদিতে মাতৃভূমির নাম খোদিত, বা তাঁহাদিগের পতাকা মাতৃভূমির নামে উড্ডয়িত হইত না। একবার দীক্ষিত হইলে—পোল, জার্ম্মান্, রসিয়ান্—সকলেই জাতীয়-নাম বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল কার্ব্বোনারি নামে আখ্যাত হইতেন। ফরাশি বিপ্লবের মত সকল তাঁহারা দেবতাভাবে পূজা করিতেন; সে গণ্ডী লঙ্ঘন করিতে তাঁহাদিগের সাহস হইত না। সমস্ত মানব জাতির জন্য ও মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য—স্বাধীনতা ও সাম্যরূপ স্বত্বের উদ্ধার সাধন করাই তাঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেক অবান্তর সঙ্ঘাতভাবকে—সুতরাং প্রত্যেক জাতীয় ভাবকে—তাঁহারা অনাবশ্যক, অথবা—অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের আলোকে বিচার

---

* এরূপ প্রবাদ আছে, যে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় দৈত্যদিগকে তাড়াইয়া স্কাণ্ডিনেভিয়া পর্য্যন্ত লইয়া যান; স্কন্দ হইতে এ দেশের নাম স্কন্দনভ হয়; স্কাণ্ডিনেভিয়া স্কন্দনভের অপভ্রংশ মাত্র।

করিলে—বিপদ্‌সঙ্কুল বলিয়া মনে করিতেন।

ম্যাট্‌সিনির মতে কার্ব্বোনারিদিগের এই মত ভ্রমপূর্ণ। তিনি বলেন কর্ত্তব্য-সাধন ব্যতীত কোন ব্যক্তিই কোন স্বত্বের অধিকারী হইতে পারেন না; এবং জাতীয় বিধি না হইলে, ব্যক্তিগত বিধি হইতে পারে না; কারণ ব্যক্তি-গত বিধি জাতীয় বিধির প্রতিফলন মাত্র। যে স্বাভাবিকী আসঙ্গলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া মানবব্যক্তিগণ সমাজ-বন্ধনে প্রবৃত্ত হয়, এবং যে সমাজবন্ধন হইতেই জাতিসৃষ্টি, সে আসঙ্গলিপ্সা ও সমাজবন্ধন-প্রবৃত্তিকে কার্ব্বোনারোগণ অস্বীকার করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত ছিল যে সমবেত জীবন ব্যতীত মানব ব্যক্তি বিশ্লিষ্ট ভাবে মানব জাতির জন্য কোন উপকারই সাধন করিতে পারে না।

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব, বিশ্বপ্রেমিকতা, এবং—যে সকল কাল্পনিক অন্তরায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে স্বার্থসংঘর্ষ উপ-স্থাপিত করে—সে সকলের বিনাশ-সাধন, যদি বিশ্বনাগরিকতা হয়, তাহা হইলে ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দ সকলেই বিশ্বনাগরিক ছিলেন। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি বলেন শুদ্ধ এই সকল সত্যের প্রচারে লাভ কি? যে সকল সত্য কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না, তাহার উদ্ঘোষণে ফল কি? কার্য্য তাঁহাদিগের লক্ষ্য। সুতরাং যে সকল সত্য কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, তাঁহারা কেবল সেই সকল সত্যরই আন্দোলনে প্রস্তুত। সমস্ত পৃথিবীকে যদি এক শাসনসমিতির অধীনে আনা শ্রেয় হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে কি উপায়ে সে সঙ্কল্প সাধন করিয়া উঠিতে পারা যায়। যে সকল শাসন-সমিতি বা রাজপরিবার বহুকালের অধিরাজ্যে স্বত্ববান্‌ হইয়া সেই স্বত্বের পরিরক্ষণার্থ পরস্পরের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অগ্রে সেই সূত্রের চ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ দল ভাঙ্গিতে হইলে, আর একটী শৃঙ্খলা-বদ্ধ দলের প্রয়োজন। কারণ বিশ্লিষ্ট মানব কখন মহতী মানব-সমষ্টির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। এই জন্যই ম্যাট্‌সিনি স্বদেশকে সাধন-বেদি ও স্বজাতিকে সাধন-সামগ্রী করিয়া, সজ্ঘাত মানবরূপ প্রকাণ্ড লক্ষ্যের অভিমুখে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাঁহারা আপনাদিগকে বিশ্ব-নাগরিক বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহা-দিগেরও লক্ষ্য সজ্ঘাত মানব বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সাধনসামগ্রী বিশ্লিষ্ট মানব-ব্যক্তি। প্রত্যেক বিশ্বনাগরিক স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করায়—প্রত্যেক বিশ্লিষ্ট মানব-ব্যক্তি অসংখ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি-কেন্দ্র রূপে পরিণত হওয়ায়—শক্তিসংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মানবজাতি—সকলের সাধ্য হইলেও, সাধন-সামগ্রী ও সাধন-প্রণালী বিভিন্ন হইয়া পড়ে। সাধন-

সামগ্রী ও সাধন-প্রণালীর বৈষম্য হইতে কার্য্যবৈষম্য ঘটিয়া উঠে। সকল ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্য করায় লক্ষ্য সংসিদ্ধ হয় না। যে সকল রাজোপাধিধারী নরপিশাচ মানবজাতি ও মানবব্যক্তির পরম শত্রু, তাহারা এই বিচ্ছিন্ন ভাবের সুবিধা লইয়া মানব জাতিকে কঠিনতর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। সুতরাং বিশ্লিষ্ট বিশ্বনাগরিকের পরিণাম হয় যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের কঠোর নির্যাতন সহ্য করা, অথবা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে শান্তি ক্রয় করা।

এইরূপে বিশ্বনাগরিক যখন বিশ্লিষ্ট ভাবে জগতের উদ্ধার-সাধনে অসমর্থ হন, তখন স্থির করেন যে সে কার্য্য তাঁহার সাধনার বিষয় নহে। তিনি কর্ত্তব্য সাধন না করিয়াও কর্ত্তব্য-সাধন-জনিত স্বত্বের অধিকারী হইতে চাহেন। কিন্তু যখন তাঁহার সেই স্বত্ব অস্বীকৃত হয়, তখন তিনি সেই স্বত্ব রক্ষার জন্য প্রাণপণ না করিয়া নিজের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হন, অথবা স্থানান্তরে পলায়ন করেন। কালে বা প্রাকৃতিক ঘটনাস্রোতে অভিলষিত শুভ আপনিই আসিবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আপনার হিতকরী বৃত্তিকে কেবল দানশীলতায় পরিণত করেন। কিন্তু এরূপ জাতীয় অধঃপতনের সময় কার্য্যকরী মানবহিতৈষণা বৃত্তিকে শুদ্ধ দানশীলতায় পরিণত করা, আর জড়ভাব অবলম্বন করা দুইই সমান। এরূপ সময় যিনি শুদ্ধ দানে আপনার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে চরিতার্থ করিতে চাহেন, তিনি স্বজাতি ও মানব জাতির নিকট বিশেষ দণ্ডার্হ।

এমন অনেক বিশ্বনাগরিক আছেন—যাঁহারা বৈদেশিকের জাতীয় ভাবকে ঘৃণা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বজাতি ও স্বদেশকে জগতের উদ্ধার-সাধন-কার্য্যের কেন্দ্রীভূত করিতে চাহেন। তাঁহারা অন্যান্য দেশের জাতীয় ভাবকে আপনাদিগের জাতীয় ভাবের অন্তর্লীন করিতে চাহেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নেপোলিয়নের ন্যায় শস্ত্রবলে অন্যান্য জাতিকে নিজ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন না; কারণ তাঁহারা জানেন যে আজ কাল তাহা বড় সহজ হইবে না। তাঁহারা দীক্ষাগুরু-রূপে অন্যান্য জাতির অন্তরে—জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি বিষয়ে আপনাদিগের মূল বিশ্বাস সংক্রামিত করিতে উদ্যত হন। ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সই সকল বিষয়ে মানবজাতির দীক্ষাগুরু হইতে সবিশেষ আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এরূপ দীক্ষা গ্রহণ—দুর্ব্বল জাতিনিচয়ের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক ও তাহাদিগের উন্নতির বিশেষ প্রতিরোধক।

যাঁহারা অতীত ইতিহাস হইতে জাতীয়ভাবের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জাতীয় ভাবের প্রতি বিদ্বেষ-বিশিষ্ট হইতে পারেন; কারণ অদ্যাবধি

প্রকৃত প্রস্তাবে একটী জাতিও সংগঠিত হয় নাই। জনসাধারণ যে জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সে জাতি ভবিষ্য ইতিহাসের গৌরবের সামগ্রী হইবে। অতীত ইতিহাসে আমরা যে সকল জাতি ও জাতীয় ভাবের কথা শুনিতে পাই, তাহার অধিষ্ঠাতা দেব রাজা। কতিপয় রাজপরিবারে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদিগের গূঢ় মন্ত্রভবনে উদ্ভাবিত সন্ধিবলে মানব জাতি যে সকল ক্ষুদ্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের শুভ-গণনা হয় নাই; সে সকল সন্ধিপত্র সংরচিত হইবার সময় জনসাধারণের মতামত পরিগৃহীত হয় নাই; মানব জাতির সঙ্ঘাত জীবনের উজ্জ্বল ভাবে সে সন্ধিপত্র উদ্ভাসিত হয় নাই। সুতরাং সে সন্ধিপত্রে, সে জাতিবিভাগে, উচ্চ পবিত্র ভাবের আশা কোথায়? রাজবৃন্দের নিজ পরিবার, নিজ বংশ, ও নিজ জাতিই—তাঁহাদিগের স্বদেশ ও স্বজাতি। জনসাধারণের মঙ্গল বলিদান দিয়া আপনাদিগের দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করাই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। জনসাধারণের অন্তর্দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করিয়া, আপনাদিগের ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিরক্ষণ ও উন্নতিসাধন করা—তাঁহাদিগের সমস্ত রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাঁহাদিগের সন্ধি কেবল দুর্লঙ্ঘ্য সাময়িক আবশ্যকতার নিকট মস্তক অবনমন মাত্র; তাঁহাদিগের শান্তি কেবল নিরন্তর বিবাদ হইতে ক্ষণিক বিশ্রামমাত্র। তাঁহাদিগের শক্তি-সামঞ্জস্য—কেবল পরস্পর অবিশ্বাস-সম্ভাব্য পরস্পর-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য।

তাঁহারা যে পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেক রাজনৈতিক কার্য্যে তাহা পরিব্যক্ত। এই পরস্পর অবিশ্বাস দ্বারা তাঁহাদিগের সন্ধির নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। যে ওয়েষ্টফেলিয়া সন্ধি আধুনিক ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের অন্তর্জাতীয় বিধির (International Law) ভিত্তি-ভূমি, সেই ওয়েষ্টফেলিয়া সন্ধির প্রতি পত্রে, প্রতি অক্ষরে—এই অবিশ্বাসের ভাব দেদীপ্যমান। এরূপ পরস্পর-বিশ্বাসশূন্য রাজাধিষ্ঠিত ইউরোপ কি কখন সেই প্রকাণ্ড মানব-সমবায়ের ভাব—সেই মহান্ জাতিনিচয়ের সমীকরণরূপ ভাব—হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ?

না, কখনই নহে। রাজাধিষ্ঠিত ইউরোপের কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই; আংশিক ও গৌণ স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোন স্বার্থ সাধনের ইচ্ছা নাই; সাধারণের সমবেত কার্য্যের প্রতিভূ ও ভিত্তিভূমি স্বরূপ কোন সাধারণ মত বা সাধারণ বিশ্বাস নাই। রাজাধিষ্ঠিত ইউরোপের কেবল একটী সাধারণ বিশ্বাস আছে, সে এই যে—যখন কোন রাজপরিবার বহুকাল ধরিয়া কোনদেশে রাজত্ব করিয়া

আসিতেছে, তখন সেই দেশের অদৃষ্ট-নেমির আবর্ত্তন সেই পরিবারের হস্তেই ন্যস্ত থাকা উচিত; ইহারই—সেই জাতির একমাত্র মীমাংসক ও একমাত্র বিচারক হইবার একমাত্র অধিকার। এই জঘন্য নীতির পরিণাম—আধুনিক অতি সংকীর্ণ জাতীয় ভাব।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথমে এই সঙ্কীর্ণ ও রাজকীয় জাতীয় ভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হয়। কারণ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সাম্যবাদী। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মূল সত্য মানবজাতির অবৈষম্য-রূপ প্রকাণ্ড ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত। সুতরাং মানবে মানবে শত্রুতা-ভাব—প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ভাব—খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশেষ নিষিদ্ধ। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মতে মানব মানবের সহিত মিলিত হইয়া অনন্ত উন্নতির দিকে অবিরাম ধাবিত হইবে। সুতরাং খ্রীষ্ট ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথমে মানব-সমবায়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, বিশ্বনাগরিকতার ন্যায়, মানব ব্যক্তিকে কার্য্যকেন্দ্র করিতে চাহে না। ইহা সাম্যবাদী বটে, সকলেরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার আছে স্বীকার করে বটে, স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষপাতী বটে, কিন্তু মানবজাতির মঙ্গলের জন্য ইহা জাতিকে মধ্য বিন্দু করিয়া এই সকল প্রকাণ্ড সত্যের প্রচার করিতে চাহে; জন-সাধারণের সমবায়রূপ একটী জাতির মধ্য দিয়া জাত্যন্তরে গমন করিতে চাহে। এই সকল সত্য ব্যক্তি হইতে ব্যক্তিতে প্রচারিত হইতে গেলে, প্রচার-কার্য্যের নানা অসুবিধা হইতে পারে, অনর্থক অনেক সময় যাইতে পারে, এই জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্ম জাতির মধ্য দিয়া জাত্যন্তরে সাম্য প্রচার করিতে আরম্ভ করে।

সেই সময় হইতে জন-সাধারণ এক অপূর্ব্ব রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। জনসাধারণের আবির্ভাবে ইউরোপে এক নব জীবনী শক্তি সংক্রামিত হইল। অরুণোদয়ে নৈশ তিমিরের ন্যায় এই নব আলোকে রাজাধিষ্ঠিত জাতীয় ভাব ক্রমে অন্তর্হিত হইল।

এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতি সকল মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে এবং শান্তি ও প্রেমপূর্ণ মনে সেই প্রকাণ্ড মানব-রাজ্যের অভিমুখে নিঃশব্দে গমন করিতেছে। স্বাধীন ও সমস্বত্ব জাতি-নিচয় সুসম্বদ্ধ হইয়া, পরস্পরের উন্নতি-পথে পরস্পর অন্তরায়-স্বরূপ না হইয়া, পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর লাভবান্ হইয়া, করে করে শৃঙ্খল বাঁধিয়া—সেই ক্রমোন্নতিশীল ঐশ রাজ্যের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। স্বাধীন জাতিনিচয়ের এই অগ্র গমনে, এই দৈবনির্দ্দিষ্ট তীর্থ যাত্রায়—কোন প্রকার দিগ্বিজয় বা দিগ্বিজয়-বিভীষিকা থাকিবে না; কারণ এই অগ্রগতির সময় সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তি-গত বা জাতীয় রাজত্ব বিলুপ্ত হইবে। এই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃ-সমবায়ে স্বার্থ ও লক্ষ্যের সংঘর্ষ নাই, সকলেরই এক লক্ষ্য ও এক স্বার্থ। পূর্ব্বে প্রত্যেক

জাতি অপরাপর জাতিনিচয়ের স্বত্বাপহারী হইতে চেষ্টা করিত; প্রত্যেক জাতির মনে আশঙ্কা ছিল যে সুযোগ পাইলেই অন্যান্য প্রবলতর জাতি তাহাকে পদদলিত করিবে; কিন্তু এক্ষণে আর সে আশঙ্কার কারণ নাই। এক্ষণে কর্ত্তব্যের রাজ্য সংপ্রসারিত হইয়াছে, কর্ত্তব্যের বিধি প্রচারিত হইয়াছে। এক্ষণে সকল জাতিই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য স্বীকার করিয়াছেন, এবং মুক্তকণ্ঠে জগতে তাহা ঘোষণা করিতেছেন। এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পরের অন্তর্দৌর্ব্বল্য সাধন—অন্তর্জাতীয় বিধির নিয়ামক ধর্ম্ম নহে। এক্ষণে সকলের সমবেত চেষ্টায় সাধারণের দুরবস্থাপনোদন, এবং অপরের মঙ্গলের জন্য নিজের উন্নতিসাধন এই দুই উদার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বপ্রকার অন্তর্জাতীয় বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। এখন হইতে সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভিমুখে তাহাদিগের সমস্ত চেষ্টা সংনোদিত হইবে।

মনুষ্যের হৃদয়-ফলকে চির-অঙ্কিত জন্মভূমির ভাব একবারে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করা; সহসা মনুষ্যের হৃদয় হইতে সমস্ত জাতীয় ভাব অপসারিত করিতে উদ্যত হওয়া, মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর ঈশ্বর যে সকল ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য সংন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ওতপ্রোত করা; মানবজাতির শুভ উদ্দেশে মানবজাতি যে সকল স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে, সেই জাতি সকলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া অবশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত করা; মানব জাতি যে সিঁড়িতে চড়িয়া নিজ জীবনের উচ্চ লক্ষ্যে উঠিবে, সেই সিঁড়িকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলা;—এ সকল উদ্যম বস্তুতঃ অসাধ্যসাধন চেষ্টা মাত্র। যে পরিশ্রম এই অসাধ্য-সাধনে ব্যয়িত হইবে, তাহার প্রতিফলনের কোন আশা নাই। এ সকল চেষ্টা এ যুগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে অসমর্থ। স্বদেশ ও স্বাজাতির ভাবের সহিত মানবজাতীয় ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করাই বর্ত্তমান যুগের প্রধান ব্রত। এই সকল অসাধ্য সাধন চেষ্টা, বর্ত্তমান যুগের সে ব্রত ভঙ্গ করিতে অক্ষম। ইহা সেই ব্রত উদ্যাপনার কাল বিলম্বিত করিতে পারে মাত্র।

মানবজাতির সন্ধিপত্র বিশ্লিষ্ট মানব ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত হইতে পারে না। স্বাধীন ও সমস্বত্ব জাতিনিচয়ই—যাহাদিগের জাতীয় নাম, জাতীয় পতাকা, এবং জাতীয় অস্তিত্বের স্পষ্ট জ্ঞান বিদ্যমান আছে—ইহাতে স্বাক্ষর করিবার অধিকারী।

কিন্তু যতক্ষণ প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট না হইবে, ততক্ষণ কোন জাতিই সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবে না, ততক্ষণ কোন জাতিই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে না। সুতরাং তোমাদিগকে প্রত্যেক জাতির প্রতি স্বতন্ত্র

কার্য্য নির্দ্দেশ করিতে হইবে; প্রত্যেক জাতির অন্তরে স্বতন্ত্র ব্রতের ভাব অঙ্কিত করিতে হইবে; প্রত্যেক জাতির ললাট-দেশে তাহাদিগের স্বতন্ত্র জাতীয়জীবনের ও স্বতন্ত্র দীক্ষার চিহ্ন খোদিত করিতে হইবে।

আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ব্রতের উদ্যাপনা না হইলে কোন জাতিই কাল-সাগরে বিলয়-প্রাপ্ত হইবে না। সেই দৈবনির্দ্দিষ্ট ব্রতের উদ্যাপনা সমাপ্ত না হইলে, কোন জাতিকে তুমি বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার পৈশাচিক চেষ্টায় সেই উদ্যাপনার দিন বিলম্বিত হইতে পারে মাত্র।

এই **জাতীয়তা** ভাব—প্রাদেশিক গর্ব্ব বা প্রাদেশিক দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নহে; ইহা মানব-জাতির কার্য্য সৌকর্য্যার্থ **শ্রমবিভাগ** মাত্র। বর্ত্তমান জাতীয়তার ভাব হইতেই বর্ত্তমান যুগের নামকরণ হইবে। ম্যাট্‌সিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই যে ইউরোপীয় জাতীয়তা-সমরে ইতালীই নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। এই উচ্চ আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইতালীকে নিজ দাসত্বকলঙ্ক ক্ষালণ করিতে হইবে, এবং ইতালীক্ষেত্র হইতে দুর্বিনীত ভীরুস্বভাব অষ্ট্রিয় দানব-দলকে বিদূরিত করিতে হইবে।

যে সকল জাতি রাজপরিবারের রাজত্বের স্থানে জন সাধারণের প্রভুতা সংস্থাপন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে অনুকূল করাবলম্ব প্রদান করিতে হইবে। ইউরোপের মধ্যে কেবল ফরাশিজাতিই রাজপরিবারের রাজত্ববিলোপ করিয়া তৎস্থানে জন-সাধারণের রাজত্ব সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যেই জাতীয় একতা সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল আন্দোলনে ইহা আলোড়িত হইতেছে, সে সকল সম্পূর্ণরূপে **সামাজিক**।

ইউরোপে এক্ষণে তিনটী স্বতন্ত্র মানব পরিবার বাস করিতেছে। হেলেনিক লাটিন্, জার্ম্মান্, এবং শ্লাভোনীয়। ইতালী, জার্ম্মাণী ও পোলণ্ড এই কয় পরিবারের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। গ্রীস যদিও ঐতিহাসিক স্মৃতিতে মানবসমাজে অতি উচ্চ পবিত্র স্থান অধিকার করিতেছে, যদিও ইহা ভবিষ্যতে এক দিন প্রাচ্য ইউরোপে অতি সুমহৎ ব্রত উদ্যাপনা করিবে; তথাপি ইহা এক্ষণে জাতীয় গণনায় এত ক্ষুদ্র, যে ইহার ইউরোপীয় অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। রুসিয়া এক্ষণে মৃত্যু শয্যায় শয়ান; যদিও দৈবশক্তিবলে ইহার চৈতন্য সমুদিত হয়, তথাপি এই কোণবর্ত্তী রাজ্যের শক্তিকেন্দ্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইতালী জার্ম্মাণী ও পোলাণ্ড—মানব পরিবারের এই তিন প্রকাণ্ড প্রতিনিধি—ভবিষ্য ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তিভূমি হইবে। ভবিষ্য ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তিভূমি হইতে হইলে এই

তিন দেশকে সমবেত করিতে হইবে। সেই কপর্দ্দকশূন্য নির্ব্বাসিত কাপালিক দল এই গুরুতর ভার আপনাদিগের মস্তকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে এই তিন দেশকে সমবেত করিতে পারিলে,—গ্রীস, সুইজরলণ্ড, রাউমেনিয়া, স্পেন প্রভৃতি সকল দেশই আপন আপন পরিবারের প্রতিনিধি জাতির সহিত আসিয়া মিলিত হইবে।

এই সকল সুমহৎ ও কষ্টসাধ্য লক্ষ্য সাধন জন্য তাঁহারা **নব্য ইউরোপ** নামে এক সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

(ক্রমশঃ।)

গীতি কবিতা।

নক্ষত্র। (১)

নক্ষত্র কে বল, সৃজিল তোমারে
কে বল সৃজিয়া, দিল রে রাখিয়া,
সুদূর অম্বরে?

নিশীথে নীরবে পড়ে যে নীহার,
পবিত্র সলিলে ভাসায় সংসার,
তুমি কি তারকে কাঁদ অনিবার
ভাসি নেত্রধারে।

মুদিলে কুসুম সুরভি কাননে,
ফোট ফুল-সম আকাশ-উদ্যানে;
অপরূপ রূপে ভাসাও গগনে,
ভাসাও সংসারে।

চাই না বিজ্ঞান, চাই না জ্যোতিষী,
জানিতে কি দ্রব্য ওই রূপরাশি,
কেবল তারকে বড় ভাল বাসি,
ও জ্যোতি আঁধারে।

শ্রীদ্বিঃ

আমার জীবনের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রোগ গোপন।

"তুমি কাঁদিলে কেন? তোমার হৃদয় নির্ম্মল—তাহাতে দুঃখ নাই, অনুতাপ নাই; তবে তুমি কাঁদিলে কেন? হতভাগিনীর হৃদয়ের যাতনা তুমি কি জানিয়াছ? একবার বল, বলিয়া অন্তর জুড়াও, তুমি কি তাহারই দুঃখে কাঁদিলে?"

দেবেন্দ্রকে দেখিয়া আমার হৃদয় যখন গলিয়া গেল, এবং এই পাপ-চক্ষুতে

(১) রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

জলধারা দেখিয়া তাহারও নয়নদ্বয় যখন জলে ভাসিতে লাগিল, আমি পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথা গুলি তাহাকে বলিলাম—এই মধুমাখা ছুরি তাহার কোমল হৃদয়ে বসাইয়া দিলাম। দেবেন্দ্র আবার অধীর হইল। তাহার অধর ঈষৎ ফুলিতে লাগিল, তাহার চক্ষু পুনরায় জলে ভাসিতে লাগিল। 'আবার কাঁদিলে কেন? তোমার কিসের দুঃখ, তুমি কাঁদিলে কেন?' দেবেন্দ্র স্খলিত স্বরে উত্তর করিল 'কেন কাঁদিতেছি জানি না। আমার বোধ হইতেছে সকলই যেন শূন্য। আমি যে দিকে চাহিতেছি সকলই অন্ধকারময়, সকলই অদৃশ্য, কেবল এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিতেছি। ক্ষমা কর, বিদায় দাও, আমার হৃদয়ের ভিতরে বড়ই কেমন করিতেছে—আমাকে বিদায় দাও', এই বলিয়া দেবেন্দ্র উন্মত্তের মত আমাকে পরিত্যাগ করিল।

দেবেন্দ্র চলিয়া গেল। আমি যতক্ষণ পারিলাম তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, ও তাহাকে দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিলাম পরে সে যখন দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, আমার বোধ হইল বিশ্বসংসার যেন অকস্মাৎ গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। আমি হৃদয়ের ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম, দেখিলাম সেখানে দেবেন্দ্র ব্যতীত আর কিছু নাই। মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম দেবেন্দ্র আমার কে? মন বলিল দেবেন্দ্র আমার কে তাহা জানি না কিন্তু এই বিস্তীর্ণ সংসারমরুতে যদি কেহ আপনার থাকে ত সে দেবেন্দ্র। পরে ভাবিলাম সে যদি আমাকে না চায়? মন উত্তর করিল 'তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি? রাত্রির অন্ধকারে নির্জ্জনে বসিয়া তাহার জন্য একবার করিয়া কাঁদিব। তাহাতে যে সুখ পাইব সে সুখের বিরোধী হইবে কে? সে সুখের বিরোধী হইবার ক্ষমতা কাহার? সংসারের কঠোর শাসনে মনুষ্যের অর্থ সামর্থ্য শরীর এ সকলের উপর আধিপত্য করিতে পারে বটে, কিন্তু নয়ন-জলের উপর আধিপত্য করিবে এমন ক্ষমতা কাহার? মনুষ্যের চক্ষু অঙ্গুলি-পরিমেয়, কিন্তু তাহার অন্তরালে যে বিশাল তরঙ্গিণী আছে সেই তরঙ্গিণী উথলিয়া উঠিলে তাহাকে নিবারণ করে এমন ক্ষমতা কাহার?' এইরূপ চিন্তা-স্রোতে মন অকাতরে ভাসিয়া চলিয়াছে, এক চিন্তার পর অপর চিন্তা তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক শিলা-খণ্ডে লাগিয়া সেই স্রোতের গতি-রোধ হইল। ভাবিলাম 'যাহার হস্ত পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ তাহার ভালবাসা স্বাধীন কেমন করিয়া? তবে কেন এমন পাপচিন্তাকে মনে স্থান দিতেছি? স্বপ্নেও যদি পরপুরুষের চিত্র রমণীর হৃদয়ে অঙ্কিত হয় তথাপি সে কলঙ্কিনী, তাহার সতীত্ব গিয়াছে। যে বিবাহ-রাত্রিতে গুরুজনের সম্মুখে ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া মন বিক্রয় করিয়াছে, সে আবার

কোন্ সাহসে, কোন্ লজ্জায়, সেই মনকে আপনার বলিতে চাহে?' আমি এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ এক কুতর্ক হৃদয়ে দেখা দিল। আজি সেই কুতর্কের কথা মনে হইলে সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হয়। ভাবিলাম একবার যে আপনার মন বিক্রয় করিয়াছে তাহাতে তাহার আর অধিকার নাই সত্য, কিন্তু আমি মন বিক্রয় করিলাম কবে? হিন্দু মহিলা কোন্ কালে আপনার মন বিক্রয় করিয়া থাকে? বালিকার হৃদয়ে জ্ঞানস্ফূর্ত্তি না হইতে, অভিলাষ সঞ্চার না হইতে হইতে, আর এক জন আসিয়া তাহার মন বিক্রয় করিল। তিনি পিতা হউন, মাতা হউন, অথবা অন্য কেহ পরমাত্মীয় হউন, তথাপি তিনি পর। মন বিক্রয় করিবার ক্ষমতা তাঁহারত নাই। বালিকা কি চাহে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না; কিন্তু তিনি অকুতোভয়ে তাহার মনটী—সেই অদেয় পদার্থ, যাহা দিবার নহে, অনিচ্ছায় যাহা কেহ কখন দিতে পারে না, যাহা কেহ কখন কাড়িয়া লইতে পারে না—তাহার সেই ক্ষুদ্র অপ্রস্ফুটিত মনটী তিনি অনায়াসে আর এক জনকে বিলাইয়া দিলেন। কালক্রমে বালিকার জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইল, অভিলাষ সঞ্চার হইল, সে জানিল তাহার মন তাহার নহে,—বহুদিন অবধি আর এক জনের হইয়াছে! বালিকা তাহাই স্বীকার করিল, স্বীকার করিয়া হৃদয়ের অগ্নি হৃদয়ে নিবাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। সেই চেষ্টায় যদি সে কৃতকার্য্য হইল তবেই রক্ষা, নচেৎ তাহার দুর্গতির আর সীমা রহিল না। কিন্তু এই চেষ্টায় সে যে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে এ কথা কে বলিতে পারে? উত্তাল তরঙ্গে পড়িলে নৌকা ডুবিবেনা একথা কে বলিতে পারে? বালিকা অকৃতকার্য্য হইল, তাহার ধর্ম্মতরী পাপসাগরে ডুবিল, তাহার কলঙ্ক রাখিবার স্থান পৃথিবীতে রহিল না। কিন্তু সে দোষ কাহার? যিনি রমণী-হৃদয়াভিজ্ঞ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব সে দোষ কাহার? তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন—হিন্দুমহিলার ব্যভিচার প্রকৃত ব্যভিচার নহে, তাহার অসতীত্ব প্রকৃত অসতীত্ব নহে! সেই ব্যভিচারে, সেই অসতীত্বে যিনি দুঃখ প্রকাশ না করিয়া ঘৃণা করিবেন, তিনি মনুষ্য-হৃদয় জানেন না; তাঁহার ধর্ম্মনীতি মনুষ্য-চরিত্ররূপ ভিত্তির উপরে গঠিত নহে—তাহা জগতে থাকিলেও 'হয়, না থাকিলেও হয়।'

এইরূপ চিন্তায়—যাহার পঙ্কিল স্রোতের স্পর্শমাত্রে সতীর সতীত্ব-রত্ন ম্লানপ্রভ হয়, যাহা একবার হৃদয়ে ধারণ করিলে রমণী ইহকাল পরকাল হারায়—এইরূপ চিন্তাস্রোতে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া শরীর ছাড়িয়া দিয়াছি, এমন সময়ে স্বামী হঠাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল।

প্রথমে এমন সাহস হইল না যে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি। তিনিও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। উভয়েই কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ ভাবে রহিলাম; কিন্তু সেই নিস্তব্ধ ভাব আমার বক্ষে পাষাণের মত চাপিয়া ধরিল। আমার শ্বাস রোধ হইতে লাগিল, হৃদয় বেগে বক্ষদেশ আঘাত করিতে লাগিল, এবং বোধ হইল উষ্ণ শোণিত তাড়িত-বেগে আমার সর্ব্ব শরীরে সঞ্চরণ করিতেছে। ক্রমে এই অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন আমি প্রাণপণে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে যন্ত্রণা আরও বাড়িল। স্বামীর নয়নদ্বয় নিমেষ-শূন্য, তাহাদের দৃষ্টিরেখা ভূতলে পতিত হইয়াছে। মুখ কেমন একপ্রকার মালিন্য-পরিব্যাপ্ত, দেখিলেই বোধ হয় অন্তর গভীর অর্থে পরিপূর্ণ। সেই অর্থ যে কি তাহা তাঁহার নয়নদ্বয় আমাকে যেন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিল। আমি সে মুখের দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনন্তর হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার জন্য সাহসে ভর করিয়া—অস্ফুট স্বরে কথঞ্চিৎ বলিলাম—'দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?' তিনি ভাল মন্দ কোন উত্তর না দিয়া আমার সম্মুখস্থিত আসন গ্রহণ করিলেন। তখনও স্বামী সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিলেন না। পরে এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রাণাধিকে কেমন আছ?' এই প্রশ্ন আমার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র আমি চমকিয়া উঠিলাম, কি বলিব স্থির করিতে পারিলাম না। এই সময়ে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমার সহায় হইল। স্বামী আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আমিও সেই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিলাম—'ও কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন? আমি কেমন আছি তুমি কি তা জান না?' স্বামী উত্তর করিলেন 'সকলই জানিতেছি অথচ কিছুই জানিতেছি না। আমি এক দিনের জন্য তোমার মুখ প্রফুল্ল দেখিলাম না, এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি জানিতে পারিলাম না। তোমার বদনদ্যুতি দিনে দিনে প্রভাত-চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণপ্রভা হইয়া যাইতেছে; তোমার নয়নদ্বয় তাহাদের স্বাভাবিক জ্যোতি হারাইতেছে। তুমি যখন একাকিনী থাক আমি তখন, আপনাকে লুকায়িত রাখিয়া কতদিন তোমাকে লক্ষ্য করিয়াছি। তৎকালে তোমার দীর্ঘ নিশ্বাসে আমার হৃদয় দলিত হইয়াছে। কি কারণে তুমি দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছ? তোমার মনে কি কোন অসুখ আছে?' এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব স্থির করিতে পারিলাম না। ভীরুতা ও দুষ্কর্ম্মের পরম সহায় শঠতা। আমি সেই শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিলাম—'আমার শরীরে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে কি না তাহা আমি

বলিতে পারি না, কিন্তু আমার মনে ত কোন অসুখ নাই।' স্বামী সেই শঠতায় ভুলিলেন না; তিনি বলিলেন--'আমার কাছে কথা লুকাইতেছ কেন? অকারণে দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হয় না, অকারণে চক্ষু হইতে জলধারা নির্গত হয় না। তোমার মনে যদি কোন চিন্তা না থাকিবে, তবে তোমার মুখ দিনে দিনে এমন মলিন হইয়া যাইবে কেন? সত্য করিয়া বল, লুকাইও না,—তোমার মনে অসুখ কি।' যদি সেই ব্যাধি জানাইবার হইত, বিশেষতঃ যিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যদি তাঁহাকে জানাইবার হইত, তাহা হইলে আজি এ দুর্দ্দশা হইবে কেন? স্বামীর প্রশ্নের কি উত্তর দিব স্থির করিতে না পারিয়া আমি পাঁচ কথা আনিয়া ফেলিলাম, ভাবিলাম সেই উপায়ে তাঁহার মন অন্য দিকে লইয়া যাইব, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। স্বামী বলিলেন—হায় সেই করুণ অমৃতময় স্বর এখনও কর্ণে লাগিয়া রহিয়াছে—স্বামী বলিলেন 'শ্যামাঙ্গিনি! কেন কথা গোপন করিয়া রাখিতেছ? সত্য করিয়া বল তোমার অসুখ কি। তোমার মুখ ম্লান দেখিলে আমি চারিদিক্ অন্ধকারময় দেখি তুমি তা জান। তোমার জন্য যদি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয় আমি তাহাতেও প্রস্তুত। তবে কথা লুকাইতেছ কেন? তোমার দীর্ঘ নিশ্বাস দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়, তোমার চক্ষুতে একবিন্দু জল-সঞ্চার দেখিলে আমি স্থির থাকিতে পারি না।' এই বলিয়া তিনি সাদরে আমার গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, ও সস্নেহ নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ আমার নয়ন হইতে একবিন্দু জল বর্ষণ হইল। সেই বারি-বিন্দু কেন পড়িল বলিতে পারি না। এ কঠিন—এ পাষাণ হৃদয় ত দ্রব হইবার নহে, তবে সে জলবিন্দু তৎকালে কেন পড়িল বলিতে পারি না। যাহা হউক হৃদয় পর ক্ষণেই বজ্রের সমান হইল। স্বামীর প্রিয় বাক্য তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি পুনরায় কাতর স্বরে বলিলেন—'শ্যামাঙ্গিনি! তোমার জন্য আমার মনে যে কি অসুখ তাহা বলিবার নয়। আমি আহারে সুখ পাই না, নিদ্রায় সুখ পাইনা। তোমার কি হইয়াছে বল, কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ। আমি কষ্ট পাইলে কি তুমি সুখী হও?' আমি নিস্তব্ধ রহিলাম; পরে বলিলেন 'শ্যামাঙ্গিনি! আমি এখন চলিলাম। আমার কথায় কোন সদুত্তর দিলে না; কিন্তু পুনরায় যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব তখন যেন আর কথা লুকাইওনা। শ্যামাঙ্গিনি! অধিক বলিব কি, এই কথাটী মনে রাখিও তুমি আমার জীবনের জীবন। তোমার সুখে আমার সুখ, তোমার দুঃখে আমার দুঃখ' এই বলিয়া তিনি কাতর ভাবে আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন এবং আমি

পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। যাইবার সময় স্বামী—যাইবার সময় আমায়—কি বলিতে ছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। আমি সেই খানেই বসিয়া রহিলাম; পাপচিন্তা-স্রোত আমার হৃদয়কে প্লাবিত করিল, তাহাতে এমন একটু স্থান রহিল না যে ধর্ম্ম-বুদ্ধি আসিয়া আশ্রয় লয়। সেই পাপ-স্রোতে অবিশ্রান্ত বাহিত হইয়া অবশেষে এই দুর্গতি-সাগরে পড়িয়াছি। হে ঈশ্বর এই দুস্তর সাগরের কি অবধি নাই? যে হতভাগ্য প্রাণী ইহাতে একবার পড়িয়াছে তাহার কি আর নিস্তার নাই? যে দিকে চাহিতেছি সকলই অন্ধকার-ময়, কোন্ দিকে তরী বাহিব কিছুই স্থির করিতে পারি না। দেব! শুনিয়াছি অকূল সাগরে তুমিই একমাত্র কাণ্ডারী। তবে আর অধিক বলিব কি, তুমি অন্তর্যামী, সকলই জানিতেছ। দেব! যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহার ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। হায়! সেই স্নেহ, সেই ভালবাসা, কেমন করিয়া সে সকলের মায়া ছাড়াইলাম! পাপীয়সীর হৃদয়ে কি এক তিলও মাংস, এক ফোটাও রক্ত ছিল না? ভালবাসার কি সুন্দর প্রতিফল দিয়াছি! যে আমার জন্য ব্যাকুল তাহারই বক্ষে ছুরি মারিলাম। এ পাপ রাখিবার স্থান নাই। অনন্ত নরকেও এ পাপের সমুচিত শাস্তি নাই! হৃদয়ের আগুণ হৃদয়ে আর যে নিবাইতে পারি না। কতকাল আর এ যাতনা সহিব, এ পাপ-জীবন কতকাল আর থাকিবে? কতশত সুর বীর যাইতেছে, কত শত ইন্দ্র চন্দ্র যাইতেছে, কিন্তু হতভাগিনীর প্রাণ যাইবার নহে। তাহা বজ্রে নির্ম্মিত, তাহার ক্ষয় নাই।

দাসী।

যে দিন হৃদয়াবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দেবেন্দ্রের হস্তে ধরা পড়িলাম, সেই দিন লইয়া তিন দিন অতিবাহিত হইল, দেবেন্দ্র তন্মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। চতুর্থ দিবসে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একাকিনী বসিয়া আছি। পৃথিবী অপূর্ব্ব শান্তিময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অস্তমিত সূর্য্যের তরল কিরণ চারি দিকে প্রতিফলিত হওয়ায় প্রকৃতির বদন যেন ঈষৎ তাম্বুলরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। দক্ষিণ দিক্ হইতে মৃদু মৃদু পবন বহিতেছিল; সেই মৃদুবাহী পবন, লতা ও বৃক্ষপত্রকে ধীরে সঞ্চালিত করিয়া প্রতি প্রবাহে জীবের দেহ অমৃত-রসে স্নাত করিতেছিল। ইতি পূর্ব্বে স্বভাবের এরূপ প্রফুল্ল শোভা দেখিলে মনে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত। হৃদয়ের সেই অবস্থাকে সুখ বলিব কি দুঃখ বলিব জানি না। যেমন তড়াগ-বক্ষে এক একটী করিয়া বুদ্বুদ উঠে এবং পরক্ষণেই তাহা বিলীন হয়, সেইরূপ স্মৃতি-সলিলে এক একটী করিয়া কত পূর্ব্বকথাই ভাসিয়া উঠিত আবার তখনই অদৃশ্য

হইত। পুরাতন সুখ, পুরাতন দুঃখ, পুরাদৃষ্ট নৈসর্গিক শোভা, পূর্ব্ব পরিচিত বস্তু ইত্যাদি কতকথা হৃদয়ে স্বতই আসিত এবং মন সেই সকল পুনর্লব্ধ নষ্ট ধন পাইয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া থাকিত। এই অদ্ভুত মানসিক আবস্থায় হৃদয় সুখে উত্তেজিত হয় না, দুঃখেও প্রপীড়িত হয় না। ইহার প্রকৃত নাম সুখ নহে দুঃখ ও নহে। ব্যথিত শরীরে সংবাহনে যে সুখ—যে ঈষৎ ক্লেশ মিশ্রিত সুখ, তাহাই এই স্মৃতি-সুখের প্রকৃত উদাহরণ-স্থল। যে হতভাগ্য জীব এই সুখে বঞ্চিত, তাহার জীবন জীবনই নহে; সচেতন মৃত্যু তাহার ব্যাধির উপযুক্ত নাম।

যে দিনের কথা বলিতেছিলাম, সে দিন হৃদয় এ সুখের আস্বাদন পাইল না। সেই অস্তমিত রবির কিরণমালা, সেই সুশীতল সমীরণ, সেই মৃদু সঞ্চালিত বৃক্ষপত্রস্মৃতির দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে অক্ষম হইল। যাহার অন্তর বর্ত্তমান চিন্তায় ঘূর্ণিত, অতীতের সাধ্য কি তাহাকে স্পর্শ করে। তখন পাপীয়সীর মন পাপচিন্তায় নিমগ্ন। "দেবেন্দ্র"—মরি তাহার চক্ষু দুইটী কি উজ্জ্বল, যেন ভালবাসা উছলিয়া উঠিতেছে, মুখ খানি কেমন সুন্দর, বিধাতা সে মুখ কাহার জন্য গঠিল! তাহাতে কি সুন্দর হাসা, যেন জগতের সমুদয় ভালবাসা সেই হাস্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আর কথা-গুলি—কি মধুর, কি মনোহর, জগতে তেমন আর হয় নাই, কখন হইবেওনা। হে বিধাতঃ! যদি দেবেন্দ্রকে দেখাইলে ত আমার করিয়া দেখাইলে না কেন, আর আমারই যদি না হইল ত দেখাইবার প্রয়োজন ছিল কি?' এই চিন্তা শেষ না হইতে হইতে আর এক চিন্তার উদয় হইল। 'সে দিন দেবেন্দ্রকে দেখিয়া হৃদয় উন্মত্ত হইল। মনের ভাব কিছুমাত্র সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কায টা কি ভাল করিয়াছিলাম? পর পুরুষের সম্মুখে—' পর কথা সহ্য হইল না। মন অমনি সক্রোধে উত্তর করিল—'ভাল দেবেন্দ্র যেন পর। কিন্তু আপনার কে?' যাহা হউক কায টা যে ভাল হয় নাই তাহার আর সন্দেহ রহিল না। 'দেবেন্দ্র না জানি কি মনে করিয়াছে। অসতী বলিয়া যদি সে মনে মনে ঘৃণা করে?' এই চিন্তায় মনে কেমন এক প্রকার যুগপৎ লজ্জা ঘৃণা ও ভয়ের সঞ্চার হইল। বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। 'যাহার জন্য হৃদয় ব্যাকুল, যাহার জন্য দিবানিশি কাঁদিয়াও চক্ষুর জল ফুরায় না, সে যদি ঘৃণা করিল তবে আর বাঁচিয়া সুখ কি—এমন জীবনে প্রয়োজনই বা কি?' এই সময়ে—সেই পবিত্র নাম, যাহা একবার স্মরণ করিলে হৃদয়ে শোক তাপ আর তিলার্দ্ধ স্থান পায় না, যে নাম ভক্তির সহিত একবার ডাকিলে অনন্ত নারকীর সদ্য উদ্ধার হয়—সেই পবিত্রাদপি

পবিত্র নাম পাপ মুখে আনিয়া কলঙ্কিত করিলাম। জানি না কি সাহসে তাঁহাকে তখন ডাকিলাম, জানি না কেমন করিয়া সে নাম পাপ মুখের বাহিরে আসিল। 'হে ঈশ্বর! আমি ধন চাহি না, মান চাহি না, ঐশ্বর্য্য চাহি না—চাহি শুধু দেবেন্দ্র। যতকাল বাঁচিয়া থাকিব, দেবেন্দ্রকে যেন দিনান্তেও একবার দেখিতে পাই।' এই কথা বলিতে বলিতে পাপ-চক্ষুতে জল সঞ্চার হইল, এবং পাপাভিলাষে সেই জল সিঞ্চন করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে দেবেন্দ্রের বাটীর একজন দাসী আমাদের গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া বড়ই আহ্লাদ হইল, গত কয়েক দিনের মধ্যে দেবেন্দ্র একবারও আমাদের বাটীতে কেন আসিল না তাহা জানিবার উপায় হইল। দাসী অতি বৃদ্ধা, সরল প্রকৃতি ও প্রভুপরায়ণা। সে দেবেন্দ্রের শৈশবকাল অবধি তাহাদের বাটীতে ছিল। এই দীর্ঘকাল মধ্যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিল। দেবেন্দ্রের বিবাহ, দেবেন্দ্রের পিতামাতার পরলোক, দেবেন্দ্রের সহিত যে হতভাগিনীর বিবাহ হইয়াছিল তাহার অকাল মৃত্যু, ইত্যাদি কত পরিবর্ত্তন ঘটিল, কিন্তু তাহার প্রভু-ভক্তি ও সরলতা চিরকাল একইভাবে রহিল। ক্রমে সেই সোণার সংসারে যখন এক একটী করিয়া সমস্ত প্রদীপ গুলি নিবিয়া গিয়া দেবেন্দ্র একা রহিল, দাসীর প্রাণ তখন দেবেন্দ্রগত হইল। দেবেন্দ্রও তাহাকে যথোচিত স্নেহ করিতে কস্মিন্‌কালে ত্রুটি করিত না। দাসী আমার কাছে আসিলে তাহার সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল তাহা বলিতেছি।

আমি বলিয়াছি গত কয়েক দিবসের মধ্যে দেবেন্দ্র আমাদের বাটীতে আসে নাই সুতরাং প্রথমেই সেই কথা হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'হ্যাঁগা। তোমাদের বাবু এক দিন আমাদের বাটীতে আসেন না কেন?' দাসী দুঃখিত স্বরে উত্তর করিল 'আহা আস্‌বেন কি মা, তাঁর যে বড় অসুখ।' দেবেন্দ্র অসুস্থ, সুধু অসুস্থ নহে, অসুখ অধিক হইয়াছে, এই সমাচার পাইয়া আমার মন কিরূপ হইল তাহা বলিবার প্রয়োজন করে না। আমি কিঞ্চিৎ উতলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— 'অসুখ? কৈ আমরা তা ত কিছু শুনি নাই। ক' দিন অসুখ হইয়াছে?' দাসী বলিল ইতিপূর্ব্বে যেদিন দেবেন্দ্র আমাদের বাটীতে আসিয়াছিল, সেই দিন হইতেই অসুখ আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—'বড় অসুখ বলিলে, অসুখটা কি?' দাসী বলিল—'অসুখ কি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি না; কিন্তু অসুখ বড় অধিক। আহা ক' দিনে মুখ খানি যেন শুকিয়ে গেছে।' দাসীর সমাচারে মনে বড়ই কষ্ট হইল, ইচ্ছা হইল একবার ছুটিয়া গিয়া দেখিয়া আসি। কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত সাহস হইয়া

উঠিল না। পরে বলিলাম—'তাঁর অসুখ কি, তোমরা কি কেহ তা জিজ্ঞাসা কর না?' 'জিজ্ঞাসা বার বার করিতেছি কিন্তু স্পষ্ট কিছুই বলেন না, আমার বোধ হয় তাঁর অসুখ মনের।'—অসুখ মনের; মনে এত কিসের অসুখ? *অথবা মানুষের মন কত রকমে পীড়িত* হইতে পারে তাহার ঠিকানা কি? ঠিকানা নাই সত্য, তথাপি সকল বিষয়েই একটা সম্ভব অসম্ভব আছে। না, ও কাযের কথা না।—'তবু তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন কি?' "বলেন 'আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে কিছুই ভাল লাগে না। শুইয়া থাকিলে বসিতে ইচ্ছা করে, বসিলে শুইতে ইচ্ছা করে; কোন কাযেই সুখ পাই না'।" 'তা অসুখ যখন এত অধিক, চিকিৎসা পত্রের কি হইতেছে?' দাসী উত্তর করিল—"চিকিৎসা পত্রের কথা তাঁহাকে বলিলাম, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন 'দেখি, আর দুই এক দিন যাক্, পরে শরীরের ভাব বুঝিয়া যাহা হউক করা যাবে।' 'তা তোমাকে তিনি এত যত্ন এত স্নেহ করেন, মনে কোন অসুখ হ'লে অবশ্য তোমাকে বল্‌তেন?' দাসী বলিল—'আহা অভাগীর উপরে তাঁর দয়া এমনই বটে, কিন্তু তবু যারপর নাই মা, যারপর নাই স্ত্রী, যখন মানুষের মনের কথা সকল সময়ে জান্‌তে পারে না তখন আমার এমন কি অদৃষ্টের জোর! মা! বল্‌তে বুক ফেটে যায়, যাদের সংসার—তারা একে একে কোথায় চলিয়া গেল। অভাগিনীর অক্ষয় জীবন, তাহার আর এক তিল ক্ষয় নাই!' এই বলিয়া দাসী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার কথা শুনিয়া আমার পাপ-তৃষ্ণা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—'তবে সত্যই কি তিনি মনের অসুখে কষ্ট পেতেছেন?' দাসী উত্তর করিল—'তোমরা কাল্‌কের ছেলে মা, পৃথিবীর কিবা দেখ্‌লে। সব অসুখ লুকান যায়, মনের অসুখ লুকান যায় না। এই ক' দিনে তাঁর শরীর অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। তিনি যখন একা থাকেন তখন তাঁহাকে দেখ্‌লে স্পষ্টই বুঝা যায় তাঁর অসুখ যে সে অসুখ নয়। কখন বা বিছানায় বসিয়া এক-দৃষ্টিতে মাটির দিকে চেয়ে থাকেন, আবার তখনই বিছানা হ'তে উঠিয়া ঘরের ভিতরে পাইচারি করেন। হ'ল পাইচারি কর্‌তে কর্‌তে একবার হঠাৎ থাম্‌লেন, থেমে আকাশের পানে খানিক চেয়ে রইলেন ও শেষে আবার বিছানায় এসে বস্‌লেন, কি শুয়ে পড়্‌লেন। এ মনের অসুখ না ত আর কি মা? এখন শীঘ্র ভাল হলে বাঁচি।' এই বলিয়া দাসী বিদায় লইল।

সে চলিয়া গেলে আমার হৃদয় হঠাৎ যেন বন্ধনোন্মুক্ত হইল। দেবেন্দ্রের অসুখ কি তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। মন এমনই উল্লাসে পরিপূর্ণ হইল যে

অবশেষে হৃৎকম্প হইতে লাগিল। ক্রমে সে ভাব অন্তর্হিত হইলে কেমন এক প্রকার বিমর্ষের উদয় হইল। মনে মনে দেবেন্দ্রের অসুখের যে কারণ নির্দ্দেশ করিলাম তাহাই প্রকৃত কারণ কি না, —যে কারণেই হউক তাহার মনে কতই কষ্ট হইতেছে—ইত্যাদি নানাবিধ চিন্তায় মনে কখন ভয়, কখন সন্দেহ, কখন বা দুঃখের উদয় হইল। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ রাত্রি অনেক হইয়া উঠিল এবং সে দিনের ঘটনাবলী পরিসমাপ্ত হইল।

শ্যাম—

(ক্রমশঃ।)

কাব্য-সুন্দরী। (১)

কোমল-প্রকৃতি বাঙ্গালী কোমলতর নারী-চরিত্র চিত্রনে যে প্রকার পটুতা প্রদর্শন করিয়াছে, অন্য কোন দেশের কোন কবি সেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ আছে পৃথিবীর অদ্বিতীয় কবি সেক্সপিয়ার কেবল পুরুষ-চরিত্রেই তাঁহার অসামান্য সৃষ্টি-কৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাকবি মিলটন্ যে প্রকার দক্ষতার সহিত শয়তানের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, ইভের চরিত্রে সে ক্ষমতার শতাংশের একাংশও প্রকাশিত হয় নাই।

সর্ব্বপ্রধান উপন্যাস-লেখক সর্ ওয়াল্‌টর স্কট্ প্রণীত গল্পাবলিতেও রমণী-চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এবং যে সময়ে আর্য্যদিগের শৌর্য্য বীর্য্য ও প্রভূত মহত্ত্ব ছিল, সে সময়ের ভারতীয় কাব্যেও নারী-প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃষ্ণের সহিত তুলনায় কুন্তী কি? শকুনি, দ্রৌণি, ও দুর্য্যোধনের সহিত তুলনায় ভানুমতী কি? এবং কর্ণার্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত তুলনায় দ্রৌপদী কি? সীতা, শকুন্তলা, দময়ন্তী প্রভৃতি আর্য্য কবিবৃন্দের মানস কন্যাগণ বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-সুন্দরীদিগের নিকট মধুরতা ও হৃদয়-সৌন্দর্য্যে পরাভূত হইয়াছেন। পূর্ণবাবু সেই সকল সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য বিশদ ও সম্পূর্ণ করিয়া সাধারণ-সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লেখেন—"সমৃদ্ধ জনগণের স্বর্ণকোষে যেরূপ রত্নবাজি সজ্জিত থাকে, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে তদ্রূপ কতিপয় রমণীরত্ন সজ্জিত আছে। আমি সেই রত্নচয় হইতে এক একটী রত্ন বাছিয়া লইয়া লোকলোচনের সমক্ষে তাহাদের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছি।" পূর্ণ বাবু এই সকল রত্ন পরীক্ষায় যথার্থই জহরীর ন্যায় ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কুন্দনন্দিনী ও রজনীর সমালোচনা এত

(১) শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। জি, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক বসুপ্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুন্দর যে সেই প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিবার সময় আমরা অনেকস্থলে চমৎকৃত হইয়াছি এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা, ভাবুকতা ও মানবস্বভাবপরিজ্ঞানের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়াছি। বাস্তবিক তাঁহার সমালোচনা-প্রণালী নূতন ও চমৎকার। সে প্রকার সমালোচনা আমরা অন্য কোথাও দেখি নাই। তাঁহার সমালোচনার গুণে অস্পষ্ট চিত্রও ভাস্বর হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা রজনীর চরিত্র নির্দ্দেশ করিতে পারি। প্রথম যখন আমরা রজনী উপন্যাস পাঠ করি তখন রজনীকে আমাদের তত মনোহারিণী বলিয়া বোধ হয় নাই, যত পূর্ণ বাবুর সমামোচনা পাঠ করিয়া বোধ হইল। আমরা অনুরোধ করিতেছি, যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস পাঠে আমোদ বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন এক এক বার পূর্ণ বাবুর কাব্য-সুন্দরীও পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কবির প্রকৃত ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন, এবং তাঁহার কাব্য পাঠে অধিকতর আমোদ প্রাপ্ত হইবেন।

বিশদরূপে কাব্যগত সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের প্রকৃতি বুঝাইয়া দেওয়াই সমালোচকের কার্য্য, কিন্তু সে প্রকার সমালোচনা কয় জন করিতে পারেন? গ্রন্থের গুণ উপেক্ষা করিয়া ও দোষোল্লেখ করিয়া গালি দেওয়াকে সমালোচনা বলে না, এবং কদর্য্য রসিকতা প্রকাশ করাও সমালোচকতা নহে। আমরাও দুই একবার এই প্রকার রসিকতা করিয়াছি এবং নিরীহ গ্রন্থকারকে কেবল বেত্রাঘাত করিতে বাকি রাখিয়াছি, কিন্তু সে দোষ আমাদের সম্পূর্ণ নহে; নিন্দা করা ও গালি দেওয়া বাঙ্গালীর সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঠক প্রকৃত সমালোচকের কার্য্য দেখুন। পূর্ণবাবু ভাবময়ী কুন্দনন্দিনীর কোমল হৃদয়ের কেমন চমৎকার ব্যাখ্যা এবং কেমন সুন্দররূপে তাহার সুমধুর প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন একবার আলোচনা করুন্।

কাব্য-সুন্দরী হইতে উদ্ধৃত।

কুন্দনন্দিনীর প্রকৃতি।

"সাহসিকতা কিরূপ কুন্দনন্দিনীর ন্যায় রমণী তাহা জানে না, ভাবিতেও পারে না। সে সাহসিকতার উপন্যাস বলিলে শিহরিয়া উঠে। কেহ উচ্চ-রবে কথা কহিলেও ভীত হয়। কিছু করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে ভয় পায়। উচ্চরবে কথা কহিতে জানে না। অন্যে উচ্চরবে কথা কহিলে থমকিয়া কাঁদিয়া ফেলে। তাঁহার অবগুণ্ঠন-মুক্ত মুখচন্দ্রমা অল্পলোকেই দেখিতে পায়। একাকিনী থাকিতে ভাল বাসে, অন্যান্য রমণীর সহিত মিশিতে সাহস হয় না। মিশিলে তাহাদের সহিত দুই একটী কথা মাত্র কয়। অগ্রসারিণী হইয়া কোন কার্য্য করিতে যায় না, হয় ত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া

অবগুণ্ঠন টানিয়া পরের সাহস ও কার্য্য দেখিতে থাকে। পরের প্রতি চাহিতেও ভয় পায়। চক্ষে চক্ষে মিলিলে অমনি নয়নপল্লব ফেলিয়া মুখ অবনত করে। মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারে না। ইচ্ছা হইলে তাহা মনে মনেই বিলীন হয়।”

কুন্দনন্দিনীর হৃদয়।

“কুন্দনন্দিনীর হৃদয়-কমল যে কতদূর সৌকুমার্য্যে সুন্দর তাহা ভাবিতে গেলে, এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসে মন আর্দ্র হইয়া যায়। লজ্জাবতীর কোমল দল যেমন ঈষৎ অঙ্গুলিস্পর্শ সহিতে পারে না, অমনি আকুঞ্চিত হইয়া যায়, কুন্দের হৃদয় তেমনি অত্যল্প আঘাতে দারুণ ব্যথিত হইয়া পড়ে। সদ্য-প্রস্ফুটিত নবীন কুসুমে যেমন অঙ্গুলি-স্পর্শ করিতেও ভয় হয়, পাছে তাহার নবীনত্ব, সুষমা ও সৌন্দর্য্যের ঈষৎ ব্যতিক্রম ঘটে, পাছে বর্ণের সে উজ্জ্বলতা ও সৌকুমার্য্যের হানি হয়, কুন্দের হৃদয় স্পর্শ করিতেও তেমনি সঙ্কুচিত হইতে হয়। এই হৃদয় যে ঈষৎ স্পর্শ করিতে-ও ভয়, কমলমণি তাহা এক দিন দেখা-ইয়া ছিলেন। কুন্দ সেই আঘাতে জলমগ্ন হইতে গিয়াছিলেন! সূর্য্যমুখী তাহা এক দিন নিদারুণ স্পর্শ করাতে কুন্দ থরথর-কম্পিত-কলেবরা হইয়া রাত্রিযোগেই বিরাগিণী হইয়া গেলেন। কিন্তু নগেন্দ্র যখন সে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিলেন, তখন সর্ব্বাপেক্ষা তাহার সৌকুমার্য্য প্রকাশিত হইল। তিনি যেরূপ যৌবনের প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত নগেন্দ্রকে ভালবাসিতেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নগেন্দ্র যখন কুন্দকে ত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর জন্য দেশে দেশে ফিরিতে লাগিলেন, তখন কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে নগেন্দ্র-প্রেম স্তম্ভিত হইল। নগেন্দ্র যাওয়াতে কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখীর জন্য দ্বিগুণ কাতরা হইলেন। এ কাতরতায় একদা অভিমান, ঘৃণা, মমতা, সহানুভূতি প্রভৃতি অনেক ভাব মিশ্রিত ছিল। * * অবশেষে নগেন্দ্র নিজ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কুন্দ দেখিলেন এখন আর সে নগেন্দ্র নাই, যাহাকে দেখিবার জন্য তিনি এতকাল প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন, সেই নগেন্দ্র আসিয়া একবার তাঁহাকে চখের দেখাও দেখিলেন না। কুন্দের মর্ম্মচ্ছেদ হইল কুন্দ যৌবনের দমিত অধীরতায়, নিজ প্রকৃতির অপরিস্ফুটতায় এবং প্রেমের গভীরতায় এক দিনে দারুণ মর্ম্মবেদনায় প্রাণত্যাগিনী হইলেন।”

শকুন্তলাই বলুন, লয়লাই বলুন, আর যে কোন কাব্যের যে কোন চিত্রই বলুন, সৌকুমার্য্যে, ভাব-প্রাচুর্য্যে এবং হৃদয়-সৌন্দর্য্যে কুন্দনন্দিনীর নিকট সকলকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালী কবি নারীচরিত্র চিত্রনে যে প্রকার দক্ষ, অন্য কোন দেশের কোন কবি সে প্রকার নহেন। সুখের হইত,

গৌড়ীয় সাহিত্যের গৌরব বাড়িত, বাঙ্গালী নামের কলঙ্ক অপনীত হইত, কবি যদি এক আদর্শ পুরুষ-চরিত্রের পার্শ্বে কুন্দনন্দিনীকে প্রস্থাপিত করিতে পারিতেন। দাশরথির পার্শ্বে সীতা যেমন, দশাননের পার্শ্বে মন্দোদরী যেমন, ইন্দ্রের পার্শ্বে শচী যেমন, এবং ধূর্জ্জটীর পার্শ্বে গৌরী যেমন, কাব্যে পুরুষ-চরিত্রের পার্শ্বে রমণীচরিত্রের সেইরূপ স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত। নারী-প্রাধান্যে সমাজের ন্যায় কাব্যও কলঙ্কিত হয়।

কুন্দনন্দিনী, রজনী ও বিমলার সমালোচনা, আমাদের বিবেচনায়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা দীর্ঘ প্রস্তাব হইয়া পড়িয়াছে। আর্য্য-দর্শনে শৈবলিনী-সমালোচনা যেরূপ পাঠ করিয়াছিলাম এ পুস্তকে সেরূপ নাই দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। পরি-বর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজন বুঝিতে পারিলাম না।

এ গ্রন্থের রচনা প্রগাঢ় ও প্রাঞ্জল, কিন্তু কপালকুণ্ডলার সমালোচনার ভাষা তত ভাল বোধ হইল না।

উপসংহার-স্থলে বক্তব্য এই যে কাব্যসুন্দরী আমরা হর্ষ-বিষাদের সহিত পাঠ করিলাম। এ প্রকার উচ্চতর রচনা, যে কোন ভাষারই গৌরব-স্থল, ইহাই আমাদের আহ্লাদের বিষয়; আর পূর্ণবাবুর ন্যায় অসামান্য ভাবুকতা কেবল নারী-চরিত্রালোচনায় পর্য্যবসিত হইবে ইহাই দুঃখের বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে কবিরও দোষ নাই, সমা-লোচকেরও দোষ নাই; দোষ আমাদের দেশের ও আমাদের অদৃষ্টের।

শ্রীল—

*

* *

সমালোচক নারী চরিত্র চিত্রনে তাঁহা-দিগের প্রতিভা নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিম বাবু ও পূর্ণবাবু সম্বন্ধে যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদিগের মতে সে দুঃখ প্রকাশ অমূলক ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। 'নারীপ্রাধান্যে সমাজের ন্যায় কাব্যও কলঙ্কিত হয়' এ কথা আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে পারিলাম না। নারীপ্রাধান্যে যদি কাব্য কলঙ্কিত হইত, তাহা হইলে কালি-দাসের 'শকুন্তলা' জগতে অদ্বিতীয় দৃশ্য কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত না। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের নায়িকা শকুন্তলা হৃদয়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে জগতের আরাধ্য হইয়া রহিয়াছেন, এবং বর্ণোচ্ছ্বাসে ইহার অন্যান্য চরিত্রকে নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছেন। কালিদাসের অন্যতর মহাকাব্য 'কুমার-সম্ভবে' গৌরী ভাবী পতির প্রতি অলৌকিক ভক্তি ও অনুরাগে জগতের আদর্শ সতী হইয়া রহিয়াছেন। পার্ব্বতীর হৃদয়-সৌন্দর্য্যে শম্ভুরূপ এত বড় উচ্চ চরিত্রও ম্লান হইয়া গিয়াছে। মহাভারতের দ্রৌপদী মানসিক

প্রতিভায় ও হৃদয়-সৌন্দর্য্যে কর্ণার্জ্জুনাদি অপেক্ষা হীন কি না বিশেষ-প্রমাণ-সাপেক্ষ। রামায়ণের সীতা ভারত-মহিলার যেরূপ আদর্শ হইয়া আছেন, ভারতললনার চরিত্রগঠনে যেরূপ উপাদানীভূত হইয়া রহিয়াছেন; শ্রদ্ধাস্পদ রামচন্দ্র ভারতীয় পুরুষের সেরূপ আদর্শ, ভারতীয় পুরুষের চরিত্র-গঠনে সেরূপ উপাদান হইতে পারেন নাই। সেক্‌সপীয়রের একটী প্রধান দৃশ্য কাব্য 'ম্যাক্‌বেথ'; সেই ম্যাকবেথের অধিনেত্রী লেডী ম্যাক্‌বেথ। ম্যাক্‌বেথ তাঁহার হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। তাহাতে ম্যাক্‌বেথের মূল্য কিছুই কমে নাই। আর যে সমালোচক বলিয়াছেন স্ত্রী-প্রাধান্যে সমাজ দূষিত হয়, ইউরোপীয় সমাজের প্রতি নেত্রপাত করিলেই তাঁহার এই ভ্রম বিদূরিত হইবে। তিনি শৈবলিনী-সমালোচনার পরিবর্ত্তন দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহাতে বিশেষ সুখী হইয়াছি। পূর্ণবাবু শৈবলিনীচরিতের প্রথম সমালোচনা কালে যে সকল ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, সমালোচনার সমালোচনা, তাহার সমালোচনা ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার সে ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার হস্ত হইতে শৈবলিনী-চরিতের যেরূপ সমালোচনা আশা করিয়াছিলাম এক্ষণে সেই সমালোচনা বাহির হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর স্ত্রী-চরিত্রগুলি ভবিষ্য সমাজের আদর্শ-স্বরূপ। সুতরাং সে উচ্চ ও আদর্শ-চরিত গুলিকে অধুনা-প্রচলিত শৃঙ্খলিত ও দূষিত সমাজনীতি দ্বারা বিচার করিলে, তাহাদিগের প্রতি অন্যায় করা হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে বঙ্কিমবাবু এই সকল উচ্চ আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া বঙ্গীয় ললনাকে ভারতচন্দ্রের নীচ আদর্শ হইতে অনেক উচ্চে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গললনা যে, প্রেমের সেই পঙ্কিল চিত্রের পরিবর্ত্তে, প্রেমের এরূপ অলৌকিক ও দেবোপম চিত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহা তাঁহাদিগেরও সৌভাগ্য, সমাজেরও সৌভাগ্য। বর্ত্তমান বঙ্গবামার হৃদয় যে অনেক পরিমাণে এই উচ্চ আদর্শে গঠিত হইতেছে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ অল্প। যে উচ্চ ও আদর্শ নারীচরিত্রনিচয় দ্বারা আধুনিক বঙ্গসমাজ উঠিতেছে, তাহাদের প্রতি পূর্ণবাবু দ্বারা অন্যায় অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহার চরিত্রে একটী গভীর কলঙ্ক-রেখা পড়িত। কারণ পূর্ণবাবুর 'বঙ্গবামার ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা' প্রবন্ধে তিনি নারীজাতির সম্মুখে যে সমাজনীতির আদর্শ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম শৈবলিনী-চরিত সমালোচনায়, সেই আদর্শ সমাজনীতি পদদলিত হইয়াছিল। আমরা দেখাইয়া দিলে পূর্ণবাবু সেই অসঙ্গতি বুঝিয়াছিলেন, এবং তাঁহার চরিত্র গৌরব এই যে—তিনি ভ্রম বুঝিতে পারিয়াই, তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়াছেন।—স।

সমর-শেখর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"And now my tongue the secret tells."—
Marmion.

সন্ধ্যাকাল অতীত, নক্ষত্র-কুন্তলা নিশা সতী প্রাণপতিকে ললাটদেশে ধারণ করিয়া পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইল; তাহা দেখিয়া সপত্নী কুমুদিনী হাঁসিয়া উঠিল।

এই সময়ে দুইজন পুরুষ একখানি পান্থশালা মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া কি বিষয়ের কথোপকথন করিতেছেন। উভয়ের বয়স ও রূপের সমধিক বিভিন্নতা। একের বয়ঃক্রম প্রায় ষাইট বা একষষ্টি হইবে। মস্তকের কেশাবলী, সংশ্লিষ্ট-প্রায় ভ্রূদ্বয়, গুম্ফ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু—সমুদয়ই ধূষরবর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতি ধীর ও শান্ত, দর্শন সরলতা-ধার। প্রত্যেক দৃষ্টিতেই—যদ্দ্বারা তিনি সম্মুখস্থ যুবককে দর্শন করিতেছেন—তাঁহার হৃদয়ের অনবচ্ছিন্ন সারল্যরাশি পরিদৃশ্যমান হইতেছে। অপর ব্যক্তির বয়ঃক্রম প্রায় চতুর্ব্বিংশ হইবে। কুঞ্চিত শিরোরুহ, রামধনু ভ্রূযুগ, সঙ্কীর্ণ গুম্ফ ও শ্মশ্রু—সকলি চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ; বৃদ্ধের ন্যায় তাঁহার সমস্ত বহিরাকার সরলতা-ব্যঞ্জক; কেবল নয়নদ্বয়ে ঈষৎ লজ্জাভাব প্রতীয়মান হইতেছে। উভয়েই একখানি বিস্তৃত আসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে বর্ত্তিকা-ধারে বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে।

বৃদ্ধ যুবককে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, সতীশ! সে দিবস রাত্রে তোমার সহিত বিশেষ কথাবার্ত্তা কিছুই হয় নাই, সেই জন্য অদ্য কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা আছে, যদ্যপি কোন প্রকার আপত্তি না থাকে তবে বলিতে পারি।"

"প্রভো! দাসকে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহাতে আর আপত্তি কি?" সতীশ বিনম্র বচনে উত্তর করিলেন।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিতে সন্দেহ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সম্পূর্ণরূপ সাহস হইল না।

সতীশ তাঁহার সেই ভাব দর্শন করিয়া বিনীত বাক্যে তাঁহাকে সাহস প্রদান করিলেন "প্রভো! দাসকে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহাতে আব সন্দেহ কি? যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন অকপট হৃদয়ে দাস তাহার প্রত্যুত্তর দিবে। প্রভুর নিকটে কিছুই গুপ্ত থাকিবে না।"

শশি।—"বৎস! তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার পিত্রালয় কোথায়?"

"মহাশয়! আমার পিতার নাম কি তাহা আমি অদ্যাবধি কাহারও নিকট

শ্রবণ করি নাই ও তন্নিমিত্ত প্রভুর কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিলাম না। আর পিত্রালয়ের নাম বিষ্ণুপুর এই মাত্র জানি; কোথায় ও কোন্ প্রদেশের অন্তর্গত তদ্বিষয়ে কিছুই অবগত নহি। শৈশবকাল হইতে পরগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছি। পিত্রালয় কিপ্রকার স্থান ও পিতৃদেবের কিপ্রকার আকৃতি তাহা কদাপি নয়নগোচর করি নাই। আর বোধ হয় বিধাতা এ হতভাগ্যকে চিরকালের জন্য সে সুখে বঞ্চিত রাখিবেন।" সতীশ অকপটহৃদয়ে উত্তর করিলেন।

শশি।—"এখন তোমার মাতাঠাকুরাণী কোথায় অবস্থান করিতেছেন?"

সতীশ। "স্বর্গধামে!"

শশিশেখর 'স্বর্গধাম' এই কথা শ্রবণ মাত্র চমকিত হইলেন। সবিস্ময়ে সতীশের মুখের দিকে দৃষ্টি সংযত করিলেন, দেখিলেন যুবকের বিস্ফারিত নয়ন-প্রান্তে দুই বিন্দু বারি বর্ত্তিকালোকে জ্বলিতেছে। তিনি বুঝিলেন এ বিষয় লইয়া আর অধিক আন্দোলন করিলে যুবকের অন্তঃকরণ-নিহিত চিরনির্ব্বাপিত শোকাগ্নি পুনর্ব্বার প্রজ্জলিত হইবে। এই ভাবিয়া সেই বিষয় অন্তরিত করিলেন এবং অন্য বিষয় লইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। "বৎস! অদ্যকার রাত্রিটী বড় পরিষ্কার বোধ হইতেছে। বিশুদ্ধ সুধাংশুকিরণে প্রকৃতি হাস্য করিতেছেন। আমার বোধ হয় রাত্রে এই মাঠ দিয়া গমনাগমন করিবার অনেক সুবিধা। আর এ সময়ে দস্যুগণের আক্রমণাশঙ্কা কিছুই নাই। তবে শালঘাটের মাঠে দুরাত্মারা প্রায় সমস্ত দিবারাত্রিই অবস্থান করে। উঃ! শালঘাট কি ভয়ানক স্থান! সে দিবস সন্ধ্যাকালের দুর্ঘটনা কি বিভীষিকাময়ী! মনে হইলে হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়!" বৃদ্ধ ক্ষণবিলম্বে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন "তাহার দুই দিবস পূর্ব্বকার রাত্রে যেরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে চমকিত হইতে হয়।" যুবক আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! সে বিষয় কি—বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়।"

শশি। "সেই দিবস রাত্রিতে—তখন রাত্রি প্রায় তিন প্রহর অতীত হইয়া থাকিবে—আমরা সকলে নিদ্রা যাইতেছিলাম, এমন সময় এক গম্ভীর শব্দে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগরিত হইয়া শুনিলাম যেন কেহ সজোরে আমাদিগের বহির্দ্বারে ঘন ঘন আঘাত করিতেছে। ভৃত্যেরা আমার অনুমতি লইয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিতে যাইল; আমিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। দ্বারদেশ উদ্ঘাটিত হইলে সকলে সবিস্ময়ে দেখিলাম এক অর্দ্ধোলাঙ্গ কৌপীন-মাত্র-পরিহিত মনুষ্য ত্রস্তভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! আমাকে দেখিবামাত্র সে

ব্যক্তি আমার পদতলে পতিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল; কহিল "মহাশয়! আমাকে রক্ষা করুন! রক্ষা করুন!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি হইয়াছে?" তাহাতে সে উত্তর করিল "আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দস্যুরা আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে; আমার দুই জন ভৃত্যকে বধ করিয়াছে; আমি অতিকষ্টে ও সাবধানে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছি। মহাশয়! অদ্যরাত্রে আমাকে একখানি পরিধেয় বস্ত্র ও একটু আশ্রয় স্থান প্রদান করুন।"

সতীশ শুনিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবিলেন "মহাশয়! তাহার পর?"

শশি। "তাহার পর, তাহাকে এক খানি বস্ত্র ও অঙ্গাবরণি প্রদান করিলাম, এবং সাদরে বাটীর ভিতর আনয়ন কবিয়া তাহার আদ্যন্ত সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলাম। উঃ কি ভয়ঙ্কর!" বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিলেন এবং যুবকেব আগ্রহ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন "তৎপরে, বৎস! শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি কহিল 'মহাশয়! আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে দুইজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া শালঘাটের মাঠ দিয়া বেলগ্রাম যাইতেছিলাম; শালঘাটের নদীর নিকটে যখন গমন করিলাম, এক শালগাছের অন্তরাল হইতে কে বলিয়া উঠিল 'কোথা যাইতেছিস, দাঁড়া! শুনিবামাত্র আশঙ্কায় প্রাণ উড়িয়া যাইল। ক্ষণেক পরেই তিন জন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগের তিন জনের হস্ত ধারণ করিল এবং কহিল—'যা কিছু আছে সমস্ত বাহির কর' আমি ভয়েতে অগ্রে যাহা কিছু ছিল সমস্তই দিলাম, কিন্তু মূর্খ ভৃত্যেরা তাহা না করিয়া নৃশংসদের বজ্রমুষ্টি হইতে সবেগে হস্ত উন্মোচন করিয়া যেমন পলায়ন করিবে, অমনি রাক্ষসেরা বন্দুক ছুড়িয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিল; তৎপরে আমাকে কহিল 'তোর কাপড় সমস্ত প্রদান কর' আমি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলাম, কিন্তু কি ইচ্ছা হইল তিন জনে পরামর্শ করিয়া আমাকে বিনাশ কবিল না—ছাড়িয়া দিল।"

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিরস্ত হইলেন। যুবক অতিশয় বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনে মনে কি ভাবের উদয় হইল; ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! দস্যুরা কয়বার বন্দুক ছুড়িয়াছিল, তাহা কি আপনি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন?"

শশি। "না। সে বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। কেন, তোমার কি কিছু আবশ্যক ছিল?"

সতীশ। "আজ্ঞা না।"

এই সময়ে শশিশেখর আপণির বাহিরে আসিয়া দেখিলেন রাত্রি অধিক হইয়াছে। তিনি যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস সতীশ! রাত্রি অধিক হইয়াছে আমি এক্ষণে গমন করি।" বৃদ্ধ উঠিবার

সময় প্রণত যুবককে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পাঠক! এই বৃদ্ধই সেই ধর্ম্মাত্মা শশিশেখর, গিরিবালার স্নেহময় জনক। আর এই যুবক সেই মহাত্মা, যিনি গিরিবালাকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শশিশেখরের সহিত সতীশের কোনরূপ পরিচয় ছিল না, অবশেষে সেই দিবস হইতে ইহাঁদিগের পরস্পর মিত্রভাবের প্রথম সূত্রপাত হয়। শশিশেখর তাঁহার বীরত্ব ও সদাশয়তা নিরীক্ষণ করিয়া তৎপ্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হয়েন, এবং সেই দিবস রাত্রিকালে তাঁহাকে আপন ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন।

শশিশেখর সরাই হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সতীশ ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে উপবেশন করিয়া মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সতীশ সেই ঘোর রজনীতে সেই ভীষণ প্রান্তরস্থ বৃক্ষলতায় যখন অশ্বারোহণে অবস্থিত ছিলেন, তিনি সেই বজ্রনাদতুল্য বন্দুকধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কে সেই শব্দ করিয়াছিল ও তাহার কারণ কি এতদিন তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই; অদ্য শশিশেখরের নিকট শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন এই সেই বন্দুকধ্বনি।

সতীশ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে পান্থাবাসের পার্শ্বস্থ রথ্যোপরি ঘন ঘন অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। সতীশ তাহা জানিবার জন্য যেমন গাত্রোত্থান করিবেন, অমনি তাঁহার গৃহমধ্যে এক সসজ্জ পুরুষ প্রবেশ করিল। সতীশ আহ্লাদে দেখিলেন সমরশেখর। অমনি সাগ্রহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন।

সমর ব্যগ্রভাবে কহিলেন "না কুমার! আমি আর বসিব না। তোমার অশ্ব সজ্জিত আছে?"

"কেন, কি হইয়াছে?" সতীশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সমর। "সে কথা পরে বলিব, এখন তোমার অশ্ব প্রস্তুত আছে?"

সতীশ। "আছে।"

সমর। "তবে আমার সঙ্গে আইস।"

সতীশ বিনা বাক্যব্যয়ে ত্বরিত গৃহ হইতে সমরের সহিত বহির্গত হইলেন।

স্কচ্‌-ইতিবৃত্ত-সম্বলিত

বীরবর ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত।

অবতরণিকা।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী উইলিয়ম কর্তৃক ইংলণ্ড বিজিত হইলে, ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড উভয় দেশে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রবলতম সাকসন্‌ সামন্তগণ

উইলিয়মের দুর্ব্বিষহ প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ফোর্থ পার হইয়া স্কটলণ্ডের উপত্যকা ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অধিক কি উইলিয়মের আনুযাত্রিক নর্ম্মান্ সামন্তগণও উইলিয়মের যথেচ্ছচারিতায় বিরক্ত হইয়া সাক্সন সামন্তগণের অনুকরণে স্কট্‌লণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করেন। এই নর্ম্মান্ সংমিশ্রণে স্কট্‌লণ্ডে একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। ইংলণ্ডের অনুরূপ স্কচ্ বিচারলয় সমূহেও ফরাশিভাষা অনুপ্রবেশিত হয়। ইহাতে যদিও জাতীয় ভাষার কোন বিশেষ মৌলিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই, তথাপি জাতীয় জীবনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। কারণ জাতীয় ভাষার অনাদর হইলেই, জাতীয় জীবন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। যৎকালে স্কট্‌লণ্ডের অদৃষ্টচক্রের এই সকল আবর্ত্তন ঘটিতেছিল, তখন স্কচ্-সিংহাসনে ম্যাল্‌কম্ কেন্‌মোর, প্রথম আলেক্‌জাণ্ডার, ও প্রথম ডেভিড্—ক্রমান্বয়ে এই তিন জন নরপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কিন্তু যদিও বৈদেশিক ভাষার অনুপ্রবেশে জাতীয় ভাষার প্রতি অনাদর ও তজ্জন্য জাতীয় জীবনের সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, তথাপি বিরক্ত প্রবলতর নর্ম্মান্ সামন্তগণকে আশ্রয় দিয়া স্কচ্ নরপতিগণ তৎকালে বিশেষ রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বিবেচিত হন। কারণ তাহাতে আপাততঃ দুইটী উপকার হইয়াছিল। প্রথমতঃ প্রবলতর প্রত্যাসন্ন রাজার বলক্ষয়; দ্বিতীয়তঃ স্বরাজ্যের বলোপচয়। বিশেষতঃ নর্ম্মান্ সামন্তগণ বীরভূমি ইউরোপের রণক্ষেত্রে যে সকল রণকৌশল ও বীরধর্ম্ম শিখিয়া আসিয়াছিলেন, স্কট্‌লণ্ডে সেই রণকৌশল ও বীরধর্ম্ম রোপিত করিয়া স্কট্‌লণ্ডের ভাবী কীর্ত্তির ভিত্তি প্রোথিত করেন।

১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিডের মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কিঞ্চিদূন এক শতাব্দী কাল স্কট্‌লণ্ডে অপ্রতিহত শান্তি বিরাজিত থাকে। এই সময়ে স্কট্‌লণ্ডের অদৃষ্টগগনে প্রচণ্ডতর সৌভাগ্যরবি সমুদিত হয়। অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য, ও কৃষির সবিশেষ উন্নতি হওয়ায়, স্কট্‌লণ্ড সাতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠে। ধনবৃদ্ধির সহিত স্কট্‌লণ্ডের এতদূর বলবৃদ্ধি হইয়াছিল, যে ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডার একলক্ষ পদাতিক ও তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া স্কট্‌লণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযানোদ্যত তৃতীয় হেন্‌রীর অভিসরণে ইংলণ্ডের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হন। হেন্‌রী এই প্রবল সেনাতরঙ্গে ঝাঁপ দিতে সাহস না করিয়া সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক নিজ রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করেন।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের সময় স্কট্‌লণ্ডের সৌভাগ্যতপন ইহার অদৃষ্ট-

আকাশের উচ্চতম স্থান অধিকার করে। এই রাজা কৃষি বিষয়ে সবিশেষ যত্ন প্রদর্শন করেন। সুতরাং, তাঁহার রাজকোষ ধনধান্যে পরিপূরিত হয়, এবং তাঁহার প্রজাবর্গ সবিশেষ ধনশালী হইয়া উঠে। ইহাঁর মহতী সেনা ১২৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত লার্গস রণে গর্ব্বিত নর্ম্মান্‌দিগের বীরদর্প চূর্ণ করে। এই রণে ইনি এতাদৃশ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে তাঁহার শত্রুদিগকেও তাঁহার যশোগান করিতে হইয়াছিল। গুণগ্রাহী হেন্‌রী (তৃতীয়), আলেকজাণ্ডারের (তৃতীয়) বীরত্বে প্রীত হইয়া আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী মার্গেরেটের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড পরস্পরের প্রতি চির-বিদ্বেষভাব ভুলিল। ইংলণ্ডকে এই সময় স্কট্‌লণ্ডের এতদূর মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল, যে ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন আরল্‌ গ্লষ্টার ও অন্যান্য ব্যারন্‌গণ লণ্ডন টাওয়ার অবরুদ্ধ করেন, তখন হেনরী (তৃতীয়) ও যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ডকে (প্রথম) আত্মরক্ষার নিমিত্ত আলেক্‌জাণ্ডারের (তৃতীয়) শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ডার শ্বশুর ও শ্যালকের সাহায্যার্থ ত্রিশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। হেন্‌রী সেই সৈন্যের সাহায্যে বৈপ্লবিক ব্যারন্‌দিগকে দমিত করিয়া ইংলণ্ডে শান্তি সংস্থাপন করেন।

হেন্‌রী জামাতাকে ইংলণ্ডের সামন্ত-রূপে পরিণত করিবার অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি জামাতাকে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ ইংলণ্ডে কিঞ্চিৎ ভূমি সম্পত্তি প্রদান করেন। এই ভূমি সম্পত্তির জন্য আলেক্‌জাণ্ডরকে প্রকাশ্য দরবারে মধ্যে মধ্যে শ্বশুরের নিকট নতজানু ও নতশির হইতে হইত। একবার এই উৎসব উপলক্ষে হেন্‌রী স্পষ্টাক্ষরে জামাতাকে স্কট্‌লণ্ডের জন্যও নতশির ও নতজানু হইতে আদেশ করেন। স্কট্‌রাজ এই কথা শুনিবামাত্র কোপে কম্পান্বিত হইয়া উঠিলেন, এবং ঘৃণার সহিত হেন্‌রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করিলেন। আলেক্‌জাণ্ডারের সৌভাগ্য-ক্রমে তাঁহার রাজত্ব-কালে তদীয় সামন্তবর্গ পরস্পর-মিলিত ও তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই জন্য ইংলণ্ডের এই অন্যায় প্রস্তাব তিনি ঘৃণার সহিত পদদলিত করিতে বিন্দুমাত্রও ভীত হয়েন নাই।

কিন্তু বিধাতা স্কট্‌লণ্ডের অদৃষ্টে এ সুখ বহু দিন স্থায়ি করিলেন না। ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ডের সুখসূর্য্য অস্তমিত হইল। উক্তবৎসরে তৃতীয় আলেক্‌-জাণ্ডারের, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তদীয় পৌত্রী নরওয়ে-কুমারীর মৃত্যুতে—স্কট্‌লণ্ড-সিংহাসন উত্তরাধিকারি-বিরহে শূন্য হইয়া পড়িল। এই দুর্ঘটনাকালে ঘোরতর অন্তর্ব্বিচ্ছেদে স্কচ্‌-বক্ষ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল।

স্কট্-রাজ প্রথম ডেভিডের কনিষ্ঠ পুত্র হন্টিংডনের আরল ডেভিডের তিন কন্যার ক্রমান্বয়ে জন্ বেলিয়ল্, রবার্ট, ব্রুস্ ও জন্‌হেষ্টিংস নামক তিন উত্তরাধিকারী ছিল। ইহাঁরা তিনজনেই এক্ষণে শূন্য স্কচ্‌সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন।

এই অন্তর্বিপ্লবের সময়—এই প্রতি-দ্বন্দ্বিতা সমরকালে—ছয় জন প্রধান স্কচ্ স্কট্‌লণ্ডের রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইলেন। গ্লাসগোর প্রধান পুরোহিত রবার্ট, জন্ কিউমিন্, স্কট্‌লণ্ডের প্রধান কোষাধ্যক্ষ জন্, ফাইফের আবল্ ম্যাক্‌ডফ্, বুকানের আরল্ জন্ কিউমিন্, সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুসের প্রধান পুরোহিত উইলিয়ম ফেজর—এই ছয় জনের হস্তেই সেই অরাজক কালে স্কট্‌লণ্ডের অধিনেতৃত্ব-ভার অর্পিত হয়। ইহার পর দুই বৎসর কাল ধরিয়া অবিরাম অন্তঃসমরে স্কট্‌লণ্ড-বক্ষ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। সমস্ত স্কট্‌লণ্ড এক্ষণে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বেলিয়ল্, ও ব্রুস্—এই দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়।

স্কট্‌লণ্ডের দুর্ভাগ্যক্রমে কুক্ষণে প্রতি-দ্বন্দ্বীরা এই জটিল বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত হেন্‌রীর পুত্র ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম এড্‌ওয়ার্ডের শরণাপন্ন হন। ইংলণ্ডেশ্বর এই নিয়মে এই মীমাংসার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন—যে অতঃপর, স্কট্-রাজকে ইংলণ্ডেশ্বরের অধীন রাজা-রূপে পরিণত হইতে হইবে। তিনি অতীত ঐতিহাসিক ঘটনার উপর এই স্বত্ব ন্যস্ত করেন।

স্কট্-রাজ উইলিয়ম্-সিংহ ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করেন, তখন তিনি চারিশত অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত ইয়র্কসায়ারের ব্যারন্‌গণ কর্ত্তৃক ধৃত হন। তাঁহার ও তদীয় সৈনিকবর্গের মুক্তির জন্য স্কচ্ ব্যারন্‌গণ হেন্‌রীর সহিত এই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, যে উইলিয়ম্ কারামুক্ত হইলেই ইংলণ্ডেশ্বরের সামন্তরূপে স্কট্‌লণ্ডে রাজত্ব করিবেন। উইলিয়ম নিজ ব্যারন্‌গণ-প্রস্তাবিত এই সন্ধিতেই সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে হেন্‌রীর মৃত্যু হইলে সিংহ-হৃদয় রিচার্ড ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র জেরুজেলম্ যাত্রা-কালে উইলিয়ম্ সিংহকে রক্‌সবরা ও বার্‌উইক্ দুর্গদ্বয়—উইলিয়ম সন্ধিরক্ষার প্রতিভূস্বরূপ এই দুই স্কচ্ দুর্গ ইংলণ্ডেশ্বরের হস্তেই ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন—প্রত্যর্পণ করেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্ব-প্রকার সামন্ততান্ত্রিক অধীনতা হইতে মুক্ত করেন। ইহার বিনিময়ে উইলিয়ম্ সিংহকে একলক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল। রিচার্ড ও উইলিয়মের এই সন্ধিতেই এই বিষয়ের শেষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সেই পুরাতন নষ্ট স্বত্বের উপর এই নূতন দাবী সংস্থাপিত

করা এড্ওয়ার্ডের পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়-বিগর্হিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

কিন্তু এরূপ দাবী অসঙ্গত ও ন্যায়-বিগর্হিত জানিয়াও সিংহাসন-ভিখারী বেলিয়ল্ ও ব্রুস্—এড্ওয়ার্ডের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এইবার স্কট্লণ্ডের কপাল ভাঙ্গিল!

যখন বেলিয়ল্ ও ব্রুস্ স্কট্লণ্ড-সিংহাসনের জন্য স্কট্লণ্ডের স্বাধীনতা এড্ওয়ার্ড-চরণে উৎসর্গ করেন, তখন তাঁহারা স্কটিশ পার্লিয়ামেণ্টের মত লইয়া তাহা করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা এড্ওয়ার্ডের সহিত যে নিয়ম-পত্রে আবদ্ধ হন, স্কচ্‌জাতি তাহা দ্বারা আবদ্ধ হয়েন নাই। সুতরাং এড্ওয়ার্ড যখন বেলিয়লের স্বাপক্ষ্যে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়া স্কট্লণ্ডকে নিজ করদ রাজ্যরূপে পরিণত করিতে চাহেন, তখন স্কটিশ পার্লিয়ামেণ্ট কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন নাই।

এড্ওয়ার্ডের বিচার সর্ব্ববাদি-সম্মত না হইলেও, প্রচলিত দায়তত্ত্বের মর্ম্মানুসারে ন্যায়-সঙ্গত হইয়াছিল। কারণ বেলিয়ল্ আরল্ ডেভিডের জ্যেষ্ঠ কন্যার প্রপৌত্র, ও ব্রুস্ কনিষ্ঠার পৌত্র। প্রতিপক্ষদিগের মতে ব্রুস্ অধিকতর নিকটবর্ত্তী পুরুষ, সুতরাং তিনি উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান থাকিতে, দূরতর উত্তরাধিকারী বেলিয়ল্ স্কটিশ সিংহাসনের অধিকারী হইতে পারেন না। কিন্তু প্রচলিত জ্যেষ্ঠাধিকার মূলক দায়তত্ত্ব অনুসারে জ্যেষ্ঠা কন্যার উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান থাকিতে, কনিষ্ঠার কোন উত্তরাধিকারীই দায়াদরূপে পরিগণিত হইতে পাবেন না। সুতরাং এড্ওার্ডের বিচার যে প্রচলিত-বিধি-সঙ্গত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডারের সময় ব্রুসের উত্তরাধিকার স্বীকৃত হওয়ায়, আর ব্রুসের উত্তাধিকার স্কট্লণ্ডের অধিকাংশ লোকের রুচির অনুরূপ হওয়ায়, এড্ওয়ার্ড প্রথমে ব্রুসকেই স্কটিশ সংহাসন অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ব্রুস তাঁহার সমস্ত নিয়মে স্বীকৃত না হওয়ায়, সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং এড্ওয়ার্ড অগত্যা বেলিয়লের স্বাপক্ষ্যেই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইলেন। এই সিদ্ধান্তের বলে ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বেলিয়ল্ প্রথম এড্ওয়ার্ডের অধীনে স্কট্-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এদিকে ম্যাল্‌কম্ কেন্‌মোরের সময় হইতে স্কটিশ রাজবৃন্দ যে রাজনীতির অনুসরণ করিয়া আসিতে-ছিলেন, যাহাতে আপাততঃ স্কট্লণ্ডের শুভ ফল ফলিয়াছিল, ক্রমে তাহার পরিণাম বিষময় হইয়া উঠিল। তাঁহারা যে সকল নর্ম্মান্ ব্যারন্‌দিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে অতুল ভূমিসম্পত্তির অধীশ্বর ও রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত করিয়া-ছিলেন; তাঁহারা এই সময় হইতে স্কটিশ সিংহাসনের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সেই বৈদেশিক

ব্যারন্‌গণ এক্ষণে দেখিলেন যে স্কট্‌লণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের ভাবী সংঘর্ষ অনিবার্য্য, এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্কট্‌লণ্ডের সিংহাসন ইংলণ্ডেশ্বরের হস্তেই পড়ুক, আর স্কট্‌-রাজের হস্তেই থাকুক, তাঁহাদিগের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যতক্ষণ তাঁহাদিগের ভূমিসম্পত্তি অস্পৃষ্ট রহিবে, ততক্ষণ তাঁহাদিগের কোন বিষয়েই আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন যে প্রবলতর ইংলণ্ডেশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করিলে বরং তাঁহাদিগের অবস্থা অধিকতর নিরাপদ। বিশেষতঃ স্কট্‌-রাজ ইংলণ্ডেশ্বরের অধীন রাজামাত্র। সুতরাং প্রবলতরের অনুবর্ত্তনে অধিকতর দুর্ব্বলের নিকট হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, বরং ইহার ব্যতিক্রমে সম্পূর্ণ বিপদ্‌ ঘটিবার সম্ভাবনা। স্কট্‌দিগের সহিত তাঁহাদিগের কোনও জাতীয় সম্বন্ধ ছিল না, সুতরাং জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্যও তাঁহাদিগের কোন ভাবনাই ছিল না। বরং ইংলণ্ডেশ্বর ও ইংলণ্ডবাসী নর্ম্মান্‌গণের সহিত রক্ত সম্বন্ধ থাকায়, স্বতঃই সেই দিকে তাঁহাদিগের হৃদয়ের প্রবণতা ছিল। যখন মনে হয় যে স্কট্‌লণ্ডের বড় বড় জমিদারী সমস্তই বৈদেশিক নর্ম্মান্‌ ব্যারন্‌দিগের হস্তগত, রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদে তাঁহারা অভিষিক্ত, তখন আমাদিগের মনে স্বতঃ এই বিস্ময়ের উদয় হয় কেমন করিয়া স্কটিশ জাতীয় দল এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিকূল ঘটনাবলী অতিক্রম করিয়া, জাতীয়-জীবন-বিধ্বংসী এই সকল বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্বাধীনতা-সমরে অবতীর্ণ হইলেন।

স্কট্‌লণ্ডবাসী নর্ম্মান্‌গণ যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। অচিরকাল মধ্যেই এড্‌ওয়ার্ডের সহিত বেলিয়লের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই সংঘর্ষে উক্ত নর্ম্মান্‌ ব্যারন্‌গণ এড্‌ওয়ার্ডের, এবং জাতীয় দল বেলিয়লের স্বাপক্ষ্যে দণ্ডায়মান হইল। আমরা আজ যে প্রাতঃস্মরণীয়চরিত মহাত্মার জীবনী লিখিতে উদ্যত হইয়াছি, ইনিই এই জাতীয় দলের সংগঠক, নেতা, ও একমাত্র বল ছিলেন। যদি কখন কেহ নিঃস্বার্থ ভাবে, জাতীয় উদ্ধারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন; যদি কখন কেহ স্বজাতির মঙ্গলোদ্দেশে জাতীয়-অদৃষ্ট-দেবতার তৃপ্ত্যর্থ শরীরের রুধির বিন্দু বিন্দু করিয়া আহুতি দিয়া থাকেন; যদি কখন স্বজাতি ও স্বদেশ কাহারও জীবনব্যাপী চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে; যদি কেহ কখন নিদ্রাকালেও স্বজাতি ও স্বদেশের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন; যদি কেহ কখন স্বজাতির উদ্ধারের জন্য দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিগঙ্গনাগণের মুখে প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন;—তিনি তবে সার উইলিয়ম্‌ ওয়ালেস্‌।

আজ আমরা এই আরাধ্য দেবতার

নিকট, এবং যে স্কটলণ্ড সেই দেবতার জন্মভূমি তাহারও নিকট, মস্তক অবনত করিতেছি। কবিবর বরনস সত্যই বলিয়াছেন এমন স্কটিশ হৃদয় নাই, যাহার উষ্ণ রুধির-স্রোত ওয়ালেসের নামে প্রবল বেগে প্রবাহিত না হয় *। আমরা আরও বলি এমন স্বজাতি-প্রেমিক ব্যক্তি নাই, ওয়ালেসের কাহিনীতে যাঁহার হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত না হয়, ওয়ালেসের নামে যাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত না হয়।

বনলতা।†

অবগুণ্ঠনবতী নবোঢ়া কামিনী দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সম্মুখে যেমন মুখচন্দ্রমা একবার দেখাইয়া, আবার তখনই অবগুণ্ঠন-মেঘে আবৃত করিয়া ফেলেন, সেইরূপ কবি হৃদয়-কবাট খুলিয়া পাঠককে আপনার হৃদয়-ভাণ্ডারের সুখ দুঃখ দেখাইতে গিয়া আভাসমাত্র দিয়াই অমনি লজ্জায় তৎক্ষণাৎ উৎঘাটিত কপাট রুদ্ধ করিয়া ফেলেন। এই আভাসমাত্রে কামিনীর সৌন্দর্য্য ও কবির কাব্য লোকের মনে প্রবল ঔৎসুক্য উৎপাদন করে, এবং দর্শক-দিগের নিকট অতি রমণীয় বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন যুবতীর নিরাবরণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া সাধুজনের দৃষ্টি তাহা হইতে প্রতিহত হয়, সেইরূপ কবির উৎঘাটিত-কপাট হৃদয় দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টি তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হয়। সেই কবিই উৎকৃষ্ট কবি, যিনি একটী মনোহর সুরের অবতারণা দ্বারা এক সময়েই বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তরে এক বিষয়ে বিভিন্ন গীতির অবতারণা করিতে পারেন। সেই কবিই উৎকৃষ্ট কবি, যিনি যাহা বলিবার সমস্ত না বলিয়া, দুই একটী কথায় বা দুই একটী ভাবাবতারণা দ্বারা, পাঠকের হৃদয়ের অন্তর্নিগূহিত ভাবরাশি টানিয়া বাহির করেন। সকল উচ্চদরের কবিতাই ভাব-উদ্দীপক। এই গুণ আছে বলিয়াই সেক্সপিয়ার মিলটন্, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কবির উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের কাব্য পড়িয়া হৃদয়ে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস উপস্থিত হয়। একটী ভাবের তড়িৎ-সঞ্চারণে হৃদয়ে অনুরূপ অসংখ্য ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই তাড়িত উত্তাপে গলিত হইয়া হৃদয় যেন অসংখ্য ধারায় প্রবাহিত হয়। নিম্ন দরের কাব্য ভাবব্যঞ্জক বা ভাবপ্রকাশক মাত্র। যাহা বলিবার, কবি সমস্তই বলিয়াদেন। তাঁহার হৃদয় নিরাবরণ। সংস্কৃত ভট্টিকাব্য ও বাঙ্গালা অধিকাংশ কাব্যই এই শ্রেণীর। এই সকল কবি ছন্দোময়ী রচনামাত্রকেই কবিতা বলিয়া মনে করেন।

বনলতা-রচয়িত্রীর কবিতার স্থানে স্থানে পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর কবির কিঞ্চিৎ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল। সেই আভাস মাত্র দেখিয়া যদিও এখন আমরা তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কবির উচ্চ আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি, তথাপি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, যদি এই কবিত্ব-শক্তি সামাজিক নির্য্যাতনে মুকুলে বিদলিত না হয়, তাহা হইলে কালে ইহা বিকসিত হইয়া রমণীয় কুসুমে পরিণত হইবে।

---

* "At Wallace's name what Scottish blood
But boils up in a spring-tide flood ?"

† শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক ক্যানিং লাইব্রেরীতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

স্কট্‌লণ্ডের ইতিবৃত্ত-সম্বলিত

বীরবর ওয়ালেসের জীবন-বৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

স্কট্‌লণ্ড ও ইংলণ্ডের তদানীন্তন আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

ইউরোপীয় রাজ্যসকলের ন্যায় স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডেও তৎকালে সামন্ত-তান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত ছিল। সামন্ত-গণ প্রায় সকল বিষয়েই স্বাতন্ত্রী ছিলেন; কেবল যুদ্ধের সময় তাঁহা-দিগকে অর্থ ও সৈন্য দ্বারা রাজাকে সাহায্য করিতে হইত মাত্র। তাঁহা-দিগকে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বলিলেও চলিতে পারে। এই সামন্ত-তান্ত্রিক প্রথা পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে এক এক সময় এক জন প্রতাপশালী রাজা সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ রাজবৃন্দ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপঢৌকন দিয়া ও তাঁহার প্রভুতা স্বীকার করিয়াই অব্যাহতি পাইতেন। তাঁহাদিগের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন। বিজয়ী সম্রাট্ অভি-যানোদ্যত হইলে বা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগকে অর্থ ও সৈন্য দ্বারা প্রভুর সাহায্য করিতে হইত বটে; কিন্তু প্রভুকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিলেই তাঁহারা বাঁকিয়া বসিতেন, এবং প্রত্যেকেই আপনাকে স্ব স্ব প্রধান করিবার চেষ্টা করিতেন। সুতরাং যে যে সময়ে জাতীয় একতার বিশেষ প্রয়োজন, সেই সেই সময়েই জাতীয় আভ্যন্তরীণ বিপ্লব উপস্থিত হইত। ইহার পরিণাম জাতীয় পরাজয় ও জাতীয় পতন। এই কারণেই ভারত-গৌরব-রবি পৃথুরাজের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও পতন হয়। সেই একই কারণে স্কট্‌লণ্ডের পতন, সেই একই কারণে অভিযানোদ্যত হেন্‌রী ও তদীয় বীরপুত্র এড্‌ওয়ার্ডকে পদে পদে শৃঙ্খলিত ও পদে পদে পরাজিত হইতে হইয়া-ছিল। কৃষক ও শ্রমোপজীবী ও তাহাদিগের উপভোজ্য ভূমি সামন্তদিগের অধীনে থাকায় তাঁহারা যখন ইচ্ছা—তখনই রাজাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু ইংলণ্ডে এই সংঘর্ষে অমৃত ফল ফলিল। ইংলণ্ডে এই রাজ-সামন্ত-সংঘর্ষ হইতেই প্রজাতন্ত্র শাসন

প্রণালীর উৎপত্তি। কিন্তু ভারতে ও স্কট্‌লণ্ডে এই সংঘর্ষের পরিণাম জাতীয় পতন।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী উইলিয়ম্ ইংলণ্ড বিজয় করার পর প্রায় সার্দ্ধ দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া সাক্‌সন্ সামন্ত ও পুরোহিতগণ ভূমি লইয়া ক্রমাগত নর্ম্মান্ রাজবৃন্দের সহিত যুদ্ধে নিমগ্ন হন। ইঁহারা দুর্দ্দমনীয় রাজ্যলালসার বশবর্ত্তী হইয়া এই দুই শতাব্দী কাল কেবল ওয়েল্‌স্, আয়র্লণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি প্রত্যাসন্ন রাজ্য সকল ইংলণ্ডের অন্তর্ভূক্ত করিতে লোলুপ হন। সুতরাং তাঁহাদিগের অর্থ ও সৈন্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। বিরক্ত সামন্তগণ তৎপ্রদানে অস্বীকৃত হওয়ায়, নর্ম্মান্ রাজবৃন্দ তাঁহাদিগের ভূমি-সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হন। কিন্তু কৃষক ও শ্রমোপজীবী —তাৎকালিক জাতীয় সেনার অদ্বিতীয় উপাদান— সামন্তগণের অব্যবহিত অধীনে থাকায়, ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহাদিগকে অবসন্ন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা আপনাদিগের ভ্রম বুঝিলেন। তাঁহারা দেখিলেন গৃহে বিবাদ থাকিতে তাঁহাদিগের বাহিরে বিজয়ের কোন আশা নাই। এই সকল ভাবিয়া ইংলণ্ডেশ্বর জন্ ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় প্রজাবৃন্দকে মহতী স্বত্বপত্রী (Magna charta) প্রদান করেন। এই স্বত্বপত্রই ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূলভিত্তিস্বরূপ। এই স্বত্বপত্র পাইয়া সাক্‌সন্ সামন্তগণ এখন হইতে সন্তুষ্ট চিত্তে রাজার অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৃতীয় হেন্‌রী জনের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া পিতৃ-দত্ত স্বত্বসকল হইতে প্রজাগণকে বিচ্যুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহার পরিণাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—তিনি ও তৎপুত্র প্রথম এড্‌ওয়ার্ড লণ্ডন টাওয়ারে অবরুদ্ধ হন। সেই সময় হেন্‌রীর জামাতা স্কট্-রাজ তৃতীয় আলেক্‌জাণ্ডার শ্বশুর ও শ্যালকের মুক্তির জন্য ত্রিশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ না করিলে ইংলণ্ডের ইতিহাস কি আকার ধারণ করিত কে বলিতে পারে? হেন্‌রী দুর্ব্বল-প্রকৃতি ছিলেন, সুতরাং তিনি অতঃপর প্রজাদিগের সহিত আর কোন বিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। প্রজাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য বিরহে তাঁহার রাজ্য-লালসা অন্তরেই বিলীন হইয়া গেল। অবশেষে তৎপুত্র প্রবল-পরাক্রান্ত অয়োহৃদয় এড্‌ওয়ার্ড পিতৃ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই সর্ব্ব প্রথমে ওয়েল্‌সরাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, এবং অচিরকাল মধ্যে আয়র্লণ্ডও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। এক্ষণে তাঁহার বিজয়-পিপাসু নেত্র স্কট্‌লণ্ডের উপর পতিত হইল। তাঁহার ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ, এবং তাঁহার বিজয়িনী সেনা রণোল্লাসে উন্মাদিত; সুতরাং তিনি স্কট্‌লণ্ড বিজয় অতি সহজসাধ্য বলিয়া মনে করিলেন।

কিন্তু তাহা ঘটিল না। ফরাশিদেশে গিনি উপকূলে এড্‌ওয়ার্ডের একুইটেন্ নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের সামন্তরূপে তাঁহাকে ফরাশি-রাজের প্রভুতা স্বীকার করিতে হইত। এই সময় ফিলিপ্ ফরাশি সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সম্প্রতি ইংলিস ও নর্ম্মান্ বাণিজ্য-তরি সকলের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, ইংলিস বণিকেরা দিনেমারদিগের সাহায্য লইয়া নর্ম্মান্ বাণিজ্যপোত সকলের বিশেষ ক্ষতি করে। ফিলিপ্ ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া ইহার জন্য জবাবদিহি করিবার নিমিত্ত নিজ সামন্ত এড্‌ওয়ার্ডকে ফরাশি-রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, ফিলিপ্ একুইটেন্ নিজরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। দৃপ্ত এড্‌ওয়ার্ড ইহা সহিতে না পারিয়া ফরাশিরাজ্য আক্রমণ করিবার নিমিত্ত মহতী সেনা সংগ্রহ করেন। তিনি অভিযানোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় ওয়েল্‌স অভ্যুত্থিত হইল। এড্‌ওয়ার্ড সেই মহতী সেনা লইয়া ওয়েল্‌সের অভিমুখেই যাত্রা করিলেন; এবং বিদ্রোহী ওয়েল্‌সবাসিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিজিত করিয়া তাহাদিগের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করিলেন। স্কট্‌লণ্ড, ওয়েল্‌স, এবং গিনি—চতুর্দ্দিকে সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় এড্‌ওয়ার্ডের পূর্ণ কোষ শূন্য হইয়া উঠিল। এইবার তিনি প্রজাদিগের লব্ধ স্বত্ব অপহরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগের উপর গুরুতর কর ধার্য্য করিলেন। পুরোহিত, সামন্ত, ও বণিক্—সকলেই সমবেত হইয়া এড্‌ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়। অবশেষে ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন সসৈন্য ফরাশি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সমুদ্যত হন, তখন আরল্ হিয়ারফোর্ড ও নর্ফোক—এই দুইজন প্রধান সামন্ত ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মত হইয়া সৈন্য সহ আপন আপন গৃহে প্রত্যাগত হন। এইরূপে স্কট্‌লণ্ড যাত্রা কালেও নিজ প্রজাবৃন্দ দ্বারা বার বার তাঁহার গতি প্রতিহত হয়। এইরূপে তাঁহার প্রচণ্ড দর্প চূর্ণ করিয়া ইংলণ্ডীয় প্রজাসাধারণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অপহৃত স্বত্ব সকল পুনরুপলব্ধি করেন। এড্‌ওয়ার্ড এই ক্ষতি বহির্বিজয় দ্বারা পূরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লব্ধস্বত্ব প্রজাবৃন্দ এক্ষণে প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার অনুগমন করিতে স্বীকৃত হইল।

যৎকালে এড্‌ওয়ার্ড ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন, তখন তিনি সামন্ত-প্রভুরূপে স্কট্‌রাজ বেলিয়ল্‌কে সামন্তরূপে স্বসৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিতে আহ্বান করেন। স্কট্‌রাজ ও স্কট্ প্রজাবৃন্দ তখন আপনাদিগের অবস্থা বুঝিলেন। এড্‌ওয়ার্ডকে প্রভুরূপে স্বীকার করা তাঁহারা পূর্ব্বে

কেবল মৌখিক সম্মানবর্দ্ধন করামাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে দেখিলেন যে এড্‌-ওয়ার্ডের দুর্দ্দমনীয় জিগীষা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে জাতীয় রুধির ও জাতীয় অর্থ ব্যয়িত করিতে হইবে। তখন তাঁহাদিগের ভয় হইল। ভয়ে তাঁহারা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। স্কট্‌রাজ এতদিনে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, পারিয়া এড্‌ওয়ার্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পরিণাম ইংলণ্ডের সহিত তুমুল সংগ্রাম। এই জাতীয় স্বাধীনতাসমরে ওয়ালেস্‌-শিরস্ক জাতীয় দল বেলিয়লের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। এরূপ অদমিত তেজে জাতীয় দল ইংলণ্ডের আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল, যে অবশেষে এড্‌ওয়ার্ডকে অতি আদরের সম্পত্তি একুইটেনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ফিলিপের সহিত সন্ধি-বন্ধন পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্যের সহিত স্কট্‌লণ্ডের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে হইল। যদি ডন্‌বারের আরল কস্‌প্যাট্রিকের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক স্কট্‌লণ্ডবাসী নর্ম্মান্‌ সামন্তগণ অর্থ ও সৈন্য দ্বারা এড্‌-ওয়ার্ডকে সাহায্য না করিত, যদি ফল্‌কার্ক সমরে জাতীয় দলের অভ্যন্তরে অধিনায়কত্ব লইয়া পরস্পর ঘোরতর বিদ্বেষভাব না জন্মিত, যদি পাপিষ্ঠ মেন্‌টীথ বীরবর ওয়ালেস্‌কে এড্‌-ওয়ার্ডচরণে বিক্রীত না করিত, তাহা হইলে আজ ভারতে শ্বেত মূর্ত্তি দেখিতে হইত না; তাহা হইলে স্কট্‌লণ্ডেরও জাতীয় জীবন বিলুপ্ত হইত না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা! তোমার মহিমা অপার। তুমি জয়চন্দ্র-মূর্ত্তিতে ভারতের সিংহাসন যবনহস্তে সমর্পণ করিলে। বিভীষণ-মূর্ত্তিতে লঙ্কা দাশরথি-চরণে বিক্রীত করিলে। মেন্‌টীথ-মূর্ত্তিতে ওয়ালেসের দেহ এড্‌ওয়ার্ডের চরণে বিক্রীত করিলে। কিউমিন্‌ ও কসপ্যাট্রিক-মূর্ত্তিতে স্বদেশের স্বাধীনতা বৈদেশিকের চরণে উৎসর্গ করিলে। পিশাচি! তোর আসাধ্য কিছুই নহে। তোর আবির্ভাবে মানুষ ভীষণ রাক্ষস-রূপে পরিণত হয়। তখন সে আপনার রক্ত আপনি পান, ও আপনার মাংস আপনি ভক্ষণ করে। পিশাচি! এ জগতে সকলই বিনশ্বর, কিন্তু তোর কি ধ্বংস নাই?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওয়ালেসের জীবন-প্রভাত ও যৌবনকালের অমানুষ কার্য্যকলাপ।

ওয়ালেস্‌ স্কট্‌লণ্ডের কোন প্রাচীন সামন্তবংশ হইতে উৎপন্ন। রিচার্ড ওয়ালেন্‌স বা ওয়ালেস্‌, ওয়ালেস্‌ বংশের ঐতিহাসিক আদি পুরুষ। আর্ভিং নদীর তীরে কিলমার্‌নক নগরের অদূরে রিকার্টন্‌ নামক গ্রামে তাঁহার দুর্গ অবস্থিত ছিল। উক্ত গ্রাম রিচার্ড টাউন্‌ বা রিচার্ড নগর নামে প্রখ্যাত

হয়। রিকার্টন্ রিচার্ড টাউনের অপভ্রংশ মাত্র। ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এডাম ওয়ালেস্ নামক উক্ত বংশের এক ব্যক্তি এডাম্ ও ম্যালকম্ নামে দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। এডাম্ পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া রিকার্টন্ দুর্গে অবস্থিতি করেন। দ্বিতীয় পুত্র ম্যালকম্ এলার্স্লি-দুর্গের অধীশ্বর হয়েন। ম্যালকম্ আয়ার নগরের সেরিফ্ সার্ রোনাল্ড ক্রফোর্ডের দুহিতা জেন্ ক্রফোর্ডকে বিবাহ করেন। এই বিবাহেরই প্রসূ—এলার্স্লির নাইট্ চির-প্রখ্যাত-নামা সার উইলিয়ম ওয়ালেস্।

জেনের গর্ভে ম্যাল্কমের তিন পুত্র জন্মে—সার্ ম্যাল্কম্ ওয়ালেস্, সার্ উইলিয়ম্ ওয়ালেস্, এবং জন্ ওয়ালেস্। কনিষ্ঠ জন্ ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আমাদিগের গ্রন্থের নায়ক সার্ উইলিয়ম্ ওয়ালেস্ সম্ভবতঃ ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে স্কট্-রাজ তৃতীয় আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং যৎকালে তিনি বিশ্বাসঘাতক মেন্টীথ কর্ত্তৃক ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে এড্ওয়ার্ডের হস্তে সমর্পিত হন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চত্রিংশৎ। ইতিহাস-প্রসরে যখন তিনি সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার বয়স সপ্তবিংশমাত্র। এই নয় বৎসরে তিনি স্কট্লণ্ডে একটী যুগের অবতারণা করেন।

এরূপ প্রবাদ আছে যে ওয়ালেস্ বাল্যকালে তদীয় পিতৃব্য ডুনিপেসের সম্ভ্রান্ত যাজকের নিকট থাকিয়া গ্রীক্ লাটিন্ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যসাগর মন্থন করিয়া বাছিয়া বাছিয়া রত্ন তুলিয়া আপনার চিত্ত-ভাণ্ডার পরিপূরিত করেন।

১২৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন রাজ-প্রতিনিধিষট্ক স্কট্লণ্ডের শাসনভার পরিত্যাগ করিলে পর, এড্ওয়ার্ড স্কট্লণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন; হইয়াই সর্ব্বত্র এই আদেশ প্রচার করিলেন যে—প্রত্যেক স্কট্লণ্ডবাসীকে তাঁহার নিকট নতজানু ও নতশির হইয়া তাঁহার প্রভুতা স্বীকার করিতে হইবে। এই আদেশ শুনিয়া, ওয়ালেসের পিতা এলার্স্লির অধীশ্বর সার্ ম্যাল্কম্ ওয়ালেস্ এরূপ দস্যুর নিকট নতজানু হওয়া অপেক্ষা যে কোন দণ্ড গ্রহণ করা শ্রেয় মনে করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রসহ ডম্বার্টন্সায়রস্থিত লেনক্সদিগের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মধ্যম পুত্র ওয়ালেস্কে লইয়া কিল্স-পিণ্ডিবাসী এক স্বসম্পর্কীয় বৃদ্ধ ক্রফোর্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র জন্ পূর্ব্বেই তথায় প্রেরিত হইয়াছিল। ক্রফোর্ড ইহাঁদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত নিজের আলয়ে রাখিয়া দিলেন। যৎকালে ওয়ালেস্ জননীর সহিত কিল্স্পিণ্ডী নগরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়

তিনি ডণ্ডীস্থ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তৎকালে বিদ্যালয়সকল ধর্ম্মাবাসের সহিত সংলগ্ন থাকিত। উচ্চশ্রেণীর বালকেরা ও যাজক-পুত্রেরাই কেবল তথায় পড়িতে পাইত। এই সময় তাঁহার বয়স আনুমানিক ষোড়শ বৎসর মাত্র। তাঁহার ভবিষ্য দীক্ষাগুরু ও জীবন-চরিত-লেখক জন্ ব্লেয়ারের সহিত তাঁহার এই খানেই প্রথম পরিচয় হয়।

এই সময় এড্ওয়ার্ড স্কট্লণ্ডের উপর অতি নিষ্ঠুর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার অনিযন্ত্রিত সেনা, দুর্গরক্ষিত নগর সকল আক্রমণ করিয়া তত্তৎস্থানে অতি ভয়ানক অত্যাচার ও অতি ভীষণ নৃশংসাচার আরম্ভ করিল। সেই নবীন বয়সেই ওয়ালেসের হৃদয় এই সকল জাতীয় উৎপীড়নে নিদারুণ ব্যথিত হইল। তিনি করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্বদেশের ভবিষ্যৎ-ভাবনায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে যথেচ্ছাচারী সৈনিক বৃন্দের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার জন্য সমপাঠিগণকে লইয়া একটী ছাত্র-সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত করেন। পূর্ব্বোক্ত জন্ ব্লেয়ারের ন্যায় সার্ নীল্ ক্যাম্পবেলও তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। ওয়ালেস্ সেই নবীন বয়স হইতেই সর্ব্বদা তরবারি ও ছোরা দ্বারা সসজ্জিত হইয়া থাকিতেন। কারণ যথেচ্ছাচারী এড্ওয়ার্ডের সৈনিক-বৃন্দের সহিত এই কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে; ইহারই মধ্যে তাহাদিগের অনেকেই ওয়ালেসের শাণিত তরবারির আঘাতে ধূলিসাৎ হইয়াছে।

ওয়ালেস্ এক দিন স্থানান্তর হইতে ডণ্ডী প্রত্যাগমন কালে ডণ্ডীর গবর্ণর সেল্বাইএর পুত্র কর্তৃক আক্রান্ত হন। কম্বর্লণ্ড নিবাসী সেল্বাই এড্ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করায় তাঁহার কৃপায় ডণ্ডী ও ফর্ফারের দুর্গের অধীশ্বর হইয়াছেন। গবর্ণর সেল্বাই তাঁহার দুর্দমনীয় অর্থগৃধ্নুতানিবন্ধন, এবং তদীয় পুত্র, অন্যায় ঘৃণা ও অযোগ্য গর্ব্বের নিমিত্ত, প্রজাবৃন্দের সবিশেষ অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই দিন গবর্ণর-পুত্র চারি জন সঙ্গীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় ওয়ালেস্ মনোহর হরিৎবর্ণের পরিচ্ছদে বিভূষিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। গবর্ণরপুত্র তাহা সহিতে না পারিয়া ওয়ালেস্কে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে বলিয়া উঠিল 'রে গর্ব্বিত স্কট্! এ সকল বেশভূষা—এ সকল বীরোচিত অস্ত্র শস্ত্র দাসের যোগ্য নয়। শৃগাল হইয়া সিংহ চর্ম্মে আবৃত হওয়া কখন সাজে না।' এই বলিয়া সে যেমন বলপূর্ব্বক ওয়ালেসের ছুরিকা গ্রহণ করিতে যাইবে, অমনি ওয়ালেস্ তাহার গলদেশ ধরিয়া শাণিত তরবারি দ্বারা তদীয় দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তাহার

ছিন্ন দেহ ভূমিবিলুণ্ঠিত রহিল, এদিকে ওয়ালেস্‌ও পলায়ন করিলেন। তিনি বাল্যকালে যে পিতৃব্যের আলয়ে বাস করিতেন, একেবারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতৃব্য-পত্নী তাঁহাকে এইরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে রমণীর পরিচ্ছদ পরাইয়া তুলা পিঁজিতে দিলেন। তাঁহার অনুসরণকারীরা সেই গৃহ তন্ন তন্ন করিয়াও ওয়ালেসের কোন সন্ধান না পাইয়া ভগ্ন-হৃদয়ে ও শোকাকুল মনে ফিরিয়া গেল।

তদনন্তর তদীয় পিতৃব্য-পত্নী রজনীযোগে তাঁহাকে ডী নদী পার করিয়া দিলেন। ওয়ালেস্‌ নিরাপদে কিল্‌স্‌পিণ্ডী নগরে জননীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে তাঁহার জননী ও তদীয় বন্ধু-বান্ধবগণ সেই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া ভয়ে আকুল হইলেন। তথায় থাকিলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বিবেচনায়, তদীয় আত্মীয় স্বজন তাঁহাদিগকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পরামর্শ দিলেন। ওয়ালেস্‌-জননী পুত্রসহ উদাসিনীবেশে তীর্থপর্য্যটনব্যপদেশে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ডুনিপেসে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তাঁহারা সাদরে পরিগৃহীত হন, এবং যত দিন না তাঁহাদিগের অদৃষ্টদেব প্রসন্ন হন, তত দিন তথায় থাকিতে অনুরুদ্ধ হন। অভাগিনী জেন এই খানেই লাউডান্‌ পাহাড়ের শোচনীয় যুদ্ধবার্ত্তা শ্রবণ করেন। এই যুদ্ধে তদীয় পতি ও জ্যেষ্ঠ পুত্র ইংরাজগণ কর্ত্তৃক হত হন। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ওয়ালেস্‌ নিতান্ত শোকাতুর হইলেন। পরশুরাম যেমন পিতৃহন্তা ক্ষত্রিয়ের রুধিরে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদিগের নবীন বীর সেই রূপ পিতৃঘাতী ইংরাজের রক্তে পিতৃশোকানল নির্ব্বাপিত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। চতুর্দ্দিকে দেশ শত্রুগণ দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছে শুনিয়া তাঁহারা ডুনিপেসের আতিথ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আশ্রয়দাতার নিকট ওয়ালেস্‌ বলিলেন "আমার পিতা ও ভ্রাতা ইংরাজগণ কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন, আজ আমি ঈশ্বর-সমক্ষে শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমি জীবিত থাকি ত নিশ্চয় ইহার প্রতিশোধ লইব।"

ডুনিপেস্‌ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা আবাসভূমি এলাব্‌সলি দুর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় ওয়ালেসের সহিত তদীয় মাতুল সার রোনাল্ড ক্রফোর্ডের সাক্ষাৎ হইল। তিনি তৎকালে আয়ারের গবর্ণর পার্সীর তত্ত্বাবধায়কতায় তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কাতরা জেন তাঁহাদিগের জন্যও পার্সীর নিকট হইতে শান্তি ভিক্ষা করিতে ভ্রাতাকে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু ওয়ালেস্‌ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি এরূপ সময়ে শত্রুর নিকট শান্তি ক্রয় করিয়া প্রতিহিংসার দিন আলস্যে যাপন করা কাপুরুষের কার্য্য মনে করিলেন। তিনি জননীকে এলাব্‌সলি

দুর্গে রাখিয়া মাতুলের সহিত রিকর্টন্-স্থিত বৃদ্ধ পিতৃব্য সার্ রিচার্ডের দুর্গে গমন করিলেন। আর্ভিং নদীর তীরে একটী উচ্চ স্থানে এই রিকার্টন্ দুর্গ অবস্থিত ছিল। ওয়ালেসের পিতৃব্যের পৌত্র জন ওয়ালেসের, সমীপবর্ত্তী ক্রেগী দুর্গের উত্তরাধিকারিণীর সহিত বিবাহ হওয়ায়, সেই অবধি ওয়ালেস্ বংশ রিকার্টন-দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রেগী দুর্গে অবস্থান করেন। সেই সময় হইতে রিকার্টন্দুর্গ জীর্ণ-সংস্কারাভাবে ক্রমে বিলয়সাগরে মগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে আর ইহার চিহ্নমাত্রও নাই।

যাহা হউক রিকার্টন্ ওয়ালেসের একটী কীর্ত্তিস্থল। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি এখানে আইসেন, এবং এক মাস অতীত হইতে না হইতেই একটী অভাবনীয় ঘটনায় তাহাকে এখান হইতে পলায়ন করিতে হয়। এক দিন তিনি আর্ভিং নদীতে মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলেন। জাল বহন করিবার নিমিত্ত এক জন মাত্র বালক তাঁহার সঙ্গে ছিল। তিনি অনেক গুলি মৎস্য ধরিয়াছেন, এমন সময় গবর্ণর পার্সী আনুযাত্রিক-বর্গসহ অর্ভিং নদীর ধার দিয়া গ্লাস্গো মেলা দেখিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার শরীর-রক্ষক পঞ্চ অশ্বারোহী, কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া ওয়ালেস্ যথায় মৎস্য ধরিতে ছিলেন, তথায় আসিয়া মাছ ধরা দেখিতে লাগিল। জালে অনেক গুলি সুন্দর সুন্দর মাছ উঠিল দেখিয়া তাহারা গবর্ণরের জন্য সে গুলি সমস্ত চাহিল। ওয়ালেস্ তাহার কিয়দংশ দিবার জন্য বালককে আদেশ করিলেন। তাহারা সমস্ত চাহিল। বলিল "এবারে জালে যাহা উঠিয়াছে সমস্তই গবর্ণরের প্রাপ্য; পরে জলে যত বার ইচ্ছা জাল ফেলিয়া যত ইচ্ছা তুমি লইতে পার।" ইহাতে ওয়ালেস্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আজ এই মৎস্যে এক জন বৃদ্ধ নিমন্ত্রিত নাইটের অভ্যর্থনা করিতে হইবে, অতএব তোমরা যদি ভদ্রলোক হও ত যাহা দিয়াছি তাহাই লইয়া যাইবে।" গর্ব্বিত ইংরাজ ইহাতে নিরস্ত না হইয়া এক জন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া বালকের হস্ত হইতে সমস্ত মাছ কাড়িয়া লইল। ওয়ালেস্ বলিয়া উঠিলেন—"তোমার এ অতি অন্যায়।" দৃপ্ত ইংরাজ বলিয়া উঠিল—"কি আমার অতি অন্যায়? দুরাত্মন্! তবে দেখ।"—এই বলিয়া অসি হস্তে ওয়ালেসের দিকে ধাবিত হইল। ওয়ালেসের হস্তে একটী বর্ষা ভিন্ন আর কোন অস্ত্র ছিল না। ওয়ালেস্ সেই বর্ষা দ্বারাই আততায়ীকে ভূমিসাৎ করিলেন, নরাধম যেমন ভূপতিত হইবে অমনি তাহার হস্ত হইতে অসি প্রক্ষিপ্ত হইল। ওয়ালেস্ সেই অসি দ্বারা তাহার ভূপতিত দেহ দ্বিখণ্ডিত করিলেন। অবশিষ্ট চারি জন ইহা দেখিয়া ওয়ালেস্কে আক্রমণ করিল। ওয়ালেস্ সেই তরবারির আঘাতেই চারি জনের দুই জনকে ধরাশায়ী করিলেন। অবশিষ্ট

দুই জন ভয়ে পলায়ন করিয়া দূরগত পার্সীর নিকট আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। পাঁচ জন সসজ্জ অশ্বারোহী এক জন নিরস্ত্র পুরুষের নিকট এই রূপে পরাজিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলেন, এবং হত্যাকারীর অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। এ দিকে ওয়ালেস্ গৃহে আসিয়া বৃদ্ধ পিতৃব্যের নিকট সমস্ত জানাইলেন। তিনি ওয়ালেসের তথায় অবস্থিতি আর নিরাপদ মনে না করিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে পরামর্শ দিলেন। প্রস্থানকালে বৃদ্ধ রিচার্ড ভ্রাতুষ্পুত্রকে পর্য্যাপ্ত অর্থ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন যখন যাহা অভাব হইবে তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেই তিনি পাঠাইয়া দিবেন; আর সঙ্গে লোক দিতেও চাহিলেন, কিন্তু ওয়ালেস্ শেষোক্ত প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন।

ওয়ালেস্ যৌবনের অদমিততায়, এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর উদ্দীপনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, অশ্বারোহণে আয়ার নদীর তীরবর্ত্তী অচিন্‌ক্রুভ দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন সার্ ডঙ্কান্ ওয়ালেস্ এই দুর্গের অধিপতি ছিলেন। ইনিও ওয়ালেস্-বংশসম্ভূত। ওয়ালেস্ এই আত্মীয় কর্ত্তৃক অতি সমাদরের পরিগৃহীত হইলেন। কয়ীল নদীর তীরে ইহাঁর সনড্রুম্ নামে আর একটী দুর্গ ছিল। এই দুর্গ ও অচিন্‌ক্রুভের অনতিদূরবর্ত্তী ল্যাঙ্‌লেন বন, ওয়ালেস্‌কে কিছুদিনের জন্য শত্রুদিগের অনুসরণ হইতে রক্ষা করিল।

এক দিন ওয়ালেস্ আয়ারনগর দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলপরবশ হইয়া ল্যাঙ্‌লেন অরণ্যে নিজের অশ্ব রাখিয়া একটী বালক মাত্র সঙ্গে লইয়া পদব্রজে সেই নগরের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পার্সী ও তাঁহার নিষ্ঠুর সৈনিকবৃন্দ তৎকালে আয়ার দুর্গের রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের কঠোর শাসনে ইহার অধিবাসিবৃন্দ কম্পিত-কলেবর। তৎকালে স্কট্-দিগের অপেক্ষা আপনাদিগের শারীরিক বলের আধিক্য দেখাইবার জন্য ইংরাজেরা নানা প্রকার অবদান-পরম্পরা দেখাইতেন। সেইদিন একজন প্রকাণ্ড-কায় ইংরাজ গ্রামীণ বাজারে বসিয়া বলিতেছে "যে আমাকে একটী মুদ্রা প্রদান করিবে, আমি তাহাকে আমার হস্তস্থিত এই বল্‌দ্বারা আমার পৃষ্ঠদেশে তাহার যতদূর শক্তি আঘাত করিতে দিব; আর আমি যে-কোন স্কট্ অপেক্ষা দ্বিগুণ বোঝা বহন করিতে পারি। ওয়ালেস্ ইহাতে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন 'তুমি যদি পৃষ্ঠদেশে আমার একটী বজ্রমুষ্টির প্রহার সহিতে পার, আমি তোমায় তিনটী মুদ্রা প্রদান করিব।' ইংরাজ সৈনিক ইহাতে স্বীকৃত হইল।

পরক্ষণেই ওয়ালেসের বজ্রমুষ্টি তাহার পৃষ্ঠদেশে যেমন পতিত হইল, অমনিই তাহার পৃষ্ঠদণ্ড দ্বিধা ভগ্ন হইল। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, সকলেরই নেত্র যুগপৎ ওয়ালেসের উপর পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি অসংখ্য ইংরাজ অশ্বারোহী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন; কিন্তু অমিতবল ওয়ালেস্ পাঁচ ছয় জনকে ধরাশায়ী করিয়া ত্বরিত গতিতে ল্যাণ্ডলেন্ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় বৃক্ষমূলে তাঁহার অশ্ববর রজ্জুসংযত ছিল। তিনি সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তাড়িতবেগে অনুসরণকারিদিগের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া নিরাপদে অচিন্‌ক্রুভ্ দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু ওয়ালেসের দুর্দ্দমনীয় মন এক স্থানে অধিক দিন স্থির থাকিবার নহে। তিনি আবার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আয়ার নগর দেখিতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে আয়ারের সেরিফ্ তদীয় পিতৃব্যের ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে প্রভুর জন্য মৎস্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছিল। গবর্ণর পার্সীর ভাণ্ডারাধ্যক্ষ তাহার নিকট হইতে সেই মৎস্য সমস্তই বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। ভৃত্যের কাতর নেত্র সাহায্যার্থ ওয়ালেসের উপর পতিত হইল। ওয়ালেস্ ভাণ্ডারপতিকে বলিলেন "মহাশয়! কেন বাধা দেন, ইহাকে যাইতে দিউন্।" এই বাক্য ভাণ্ডারাধ্যক্ষের অসহ্য বোধ হইল; তিনি হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা তৎক্ষণাৎ ওয়ালেসের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিলেন। ওয়ালেস্ ক্রোধে অন্ধ হইয়া নিজ কোটিদেশ হইতে ছোরা উন্মোচন পূর্ব্বক ভাণ্ডারাধ্যক্ষকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে ইংরাজ সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। এই তুমুল সংঘর্ষে যদিও ওয়ালেস্ সাতজন ইংরাজ সৈন্যকে ধূলিশায়ী করিলেন, তথাপি এত লোক তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল যে এবার তিনি আর সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি অবসন্ন ও পর্য্যুদস্ত হইয়া ধৃত ও আয়ারের পুরাতন কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন। এখানে শুদ্ধ জলাহার দিয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিয়া রাখা হইয়াছিল; এইরূপে তিনি মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন। কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া কারাপ্রাচীরের উপর হইতে পার্শ্বস্থ শস্যক্ষেত্রে প্রক্ষেপ করেন। তিনি সেই অবস্থায় তথায় পড়িয়া থাকেন, এমন সময় তাঁহার শৈশবধাত্রী আয়ারনিবাসিনী নিউটন্‌নাম্নী মহিলা এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার আপাত মৃতদেহ দেখিতে আসেন। তিনি নিজ আবাসে সমাধিনিহিত করিবার ছলে, ওয়ালেসের সেই আপাত মৃতদেহ গৃহে লইয়া যাইবার জন্য কারাধ্যক্ষের অনুমতি গ্রহণ করেন। তথায় লইয়া গিয়া তিনি ও তদীয় দুহিতা দিন রাত্রি শুশ্রূষা

করিয়া ওয়ালেসের সেই মৃত দেহে প্রাণ দান করেন।

ওয়ালেস্ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া অশ্ব, কঞ্চুক, ও অর্থের নিমিত্ত রিকার্টনে বৃদ্ধ পিতৃব্যের নিকট যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এদিকে তিনি জীবনদাত্রী ধাত্রী ও তৎকন্যাকে এলার্‌সলি দুর্গে জননীর নিকট প্রেরণ করিলেন। ধাত্রীর গৃহে যে এক খানি পুরাতন তরবারি ছিল, সেই তরবারি মাত্রে সসজ্জ হইয়া তিনি রিকার্টন্ যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় তিনি পথিমধ্যে গ্লান্‌গো মেলা হইতে প্রত্যাবৃত্ত স্কোয়ার লর্ড্ কাসল্ ও তদনুচরদ্বয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। লর্ড্ কাসল্ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আয়ারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং তিনি অগত্যা আত্মরক্ষার জন্য লর্ড্ কাসল্ ও ভৃত্যদ্বয়ের অন্যতরকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। জীবিত ভৃত্য প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

ওয়ালেস্ রিকার্টনে পিতৃব্য বৃদ্ধ রিচার্ড ও তদীয় পুত্রত্রয় কর্ত্তৃক সাদরে পরিগৃহীত হইলেন। এদিকে তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া করস্‌বি হইতে তদীয় মাতুল সার রেনাল্ড, এবং এলার্‌সলি হইতে তদীয় জননী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর তাঁহার ভাবী বিপদ্‌বন্ধু রবার্ট বয়িড্ পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ওয়ালেসের অভাবনীয় মুক্তিতে, এবং সেই অভাবনীয় মুক্তির পর আজ ওয়ালেস্‌কে দেখিয়া, সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সেই সময় সকলেরই নয়ন হইতে প্রবল বেগে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

সন্ন্যাসী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চৈতন্যদেবও ধর্ম্ম-জগতের সন্ন্যাসী। গভীর নিশিতে প্রিয় জন্মভূমি, আবাসগৃহ, স্নেহময়ী মাতা, প্রাণপ্রিয়া পত্নী পরিত্যাগ করিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনার সুন্দর মূর্ত্তি বিকৃত করিয়া ভিখারী-রূপে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, দ্বারে-দ্বারে, নগরে নগরে, ঈশ্বরের নাম, মুক্তির উপায় গাইয়া গাইয়া ফিরিয়াছেন। কোন স্থানে আদরে গৃহীত হইয়াছেন, কোন স্থানে কর্কশ বচনে তাড়িত হইয়াছেন; তথাচ তাঁহার ব্রত কখন ভঙ্গ করেন নাই। অদ্য দেবতা বলিয়া লোকে তাঁহাকে পূজা করিতেছে।

২। রাজনীতিসন্ন্যাসী। রাজ-নৈতিক জগতের সন্ন্যাসী যাঁহারা,

তাঁহাদিগের কার্য্যেরও এক দিকে বিরাগ, অন্যদিকে অনুরাগ। রাণা প্রতাপ-সিংহ সন্ন্যাসী। স্বদেশের মানরক্ষা—কেবল ইহাতেই তাঁহার অনুরাগ, আর সকল বিষয়ে তাঁহার বিরাগ। প্রতাপ দীপ্তিময় বংশের রাজ-সিংহাসন আরোহণ করিলেন; কিন্তু রাজধানী শত্রুহস্তে, যুদ্ধের উপকরণ অতি সামান্য, অনুচর যোদ্ধৃবর্গ উপর্য্যুপরি পরাভবে হতাশ্বাস। তথাচ রাজপূতের মহচ্চিত্ত সঙ্কল্প করিল যে চিতোর উদ্ধার করিব, এবং বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিব। প্রতাপ তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা, তাঁহার কোষাগারের অবস্থা, আলোচনা করিলেন না। যে বিপদ-রাশির বিরুদ্ধে তাঁহার অনবরত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে, তাহার বিষয় মনে আন্দোলন করিলেন না, (প্রতাপ সিংহাসনারোহণ হইতেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী ক্ষতি লাভের গণনা করেন না)। সম্রাট্ আকবরের অগণ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, পূর্ণ কোষাগার, অধিক কি অন্যান্য রাজপুতগণ, প্রতাপের নিজের ভ্রাতা পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বশীভূত। কিন্তু বিপদের বৃহদায়তন প্রতাপকে ভীত না করিয়া বরঞ্চ তাঁহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর করিল। একক প্রতাপ পঞ্চবিংশতি বৎসর কাল সাম্রাজ্যের একত্রীভূত চেষ্টা বিফল করিয়াছিলেন। কখন বা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বিধ্বস্ত করিতেন; কখন বা শৈল হইতে শৈলান্তরে পলায়ন করিয়া, রাজমহিষী, সন্তানগণ এবং স্বয়ং শৈলজাত ফল মাত্র আহার করিয়া, জীবন ধারণ করিতেন। তথাচ মোগলের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই, তথাচ সম্রাটের নিকট সুখ-সজ্জিত দাসত্ব উপহার লইতে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার জলন্ত বীরত্বময় কার্য্য-পরম্পরা রাজস্থানের প্রত্যেক উপত্যকায় অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে, অদ্যাপি প্রকৃত রাজপূতের হৃদয়মন্দিরে তাহারা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ বিরাজ করিতেছে, অদ্যাপি তাঁহার সেনাপতিগণের বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তিনিচয় বর্ণনা করিতে করিতে পুরুষশোভন বীরাশ্রুতে দ্রবীভূত হইয়া যান *।

চিতোরের ধ্বংস হইয়াছে; চিতোর বিধবা, ভূষণচ্যুতা, প্রতাপ সন্ন্যাসী। প্রতাপের ভোজন বৃক্ষপত্রে, শয়ন মৃত্তিকার উপর তৃণ-শয্যায়। যতদিন চিতোরের উদ্ধার না হইবে ততদিন

* "The brilliant acts which he (Pratap) achieved during that period live in every valley; they are enshrined in the heart of every true Rajpoot, and many are recorded in the annals of the conquerors. To recount them all, or relate the hardships he sustained, would be to pen what they would pronounce a romance, who had not traversed the country where tradition is yet eloquent with his exploits, or conversed with the descendants of his chiefs, who cherish a recollection of the deeds of their forefathers, and melt as they recite them, into manly tears." (TOD'S RAJASTHAN. *Annals of Mewar, Chap. IV.*)

প্রতাপের দিন এইরূপ যাইবে, ততদিন সুখের সহিত প্রতাপের চির বিচ্ছেদ, প্রতাপের মরণান্তরেও প্রতাপের বংশধরগণ ঐ প্রকার দীন হীন ভাবে কাল যাপন করিবে, প্রতাপের এই আজ্ঞা।

ভীষণ হলুদিঘাটে প্রতাপের সহিত মোগল সৈন্যের মহাযুদ্ধ হইল। বীরধর্ম্ম রাজপুতগণ প্রতাপের অমানুষিক সাহসে উদ্দীপ্ত হইয়া, দলে দলে, দৃক্‌পাত-শূন্য সাহসের সহিত, রণে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ দেখ প্রতাপের রক্তবর্ণ বৈজয়ন্তী বৈদ্যুতিক বেগে রিপু-কুলের গাঢ়-সন্নিবিষ্ট ব্যূহ ভেদ করিয়া সম্রাট্-তনয় সেনাপতির দিকে ধাবমান হইতেছে, কেহই তাঁহার গতি রোধ করিতে পারিতেছে না, রাশি রাশি সেনার শিরশ্ছেদন করিতে করিতে অশ্বারোহী প্রতাপ সেলিমের হস্তীর সম্মুখে, ঐ দেখ প্রতাপ তাঁহার বিশাল হস্তে বর্ষা তুলিলেন, সম্রাট্‌তনয়কে বুঝি অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়—না, হাওদার লৌহ আবরণ সেলিমকে রক্ষা করিল, কিন্তু হস্তিপ মরিল, চালকহীন ক্রুদ্ধ মাতঙ্গ রণভূমি হইতে ডাক ছাড়িয়া ছুটিয়া যাইল। কিন্তু এ দিকে দেখ প্রতাপের প্রাণ বুঝি যায়। প্রতাপকে শত্রুরা সকলে ঘেরিল, ঐ দেখ তাহারা বর্ষা দিয়া প্রতাপকে বিঁধিল, এক বার, দুই বার, তিন বার; ঐ দেখ প্রতাপের গাত্রে গুলি লাগিল, আবার তরবারি দিয়া তিন স্থানে ক্ষত করিল, প্রতাপের শরীর সপ্ত স্থানে ক্ষত, তথাপি রণোন্মত্ত প্রতাপ ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন—এ কি দৈবশক্তি, না ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, না অমানুষিক দেহ? কিন্তু এবার আর রক্ষা নাই। এবার প্রতাপের মরণ। নিশ্চয় না, তাঁহার অন্যতম সেনাপতি মহাবীর কাল নিজের জীবন দিয়া রাজপুতাশা আহত রাজার প্রাণ রক্ষা করিলেন। প্রতাপের সৈন্যগণও অভূতপূর্ব্ব সাহসের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, কিন্তু নির্ভীক-সাহস অটল-বীরত্ব ঘনশ্রেণীবদ্ধ কামানের সম্মুখে শিক্ষিত সেনাসমুদ্রের বিরুদ্ধে কেমনে জয়লাভ করিবে? অদ্য দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপূত হলুদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অষ্ট সহস্রমাত্র জীবন লইয়া রণভূমি হইতে প্রস্থান করিতে পারিল।

প্রতাপ একাকী অশ্ব-শ্রেষ্ঠ চৈতুর পৃষ্ঠে পলায়ন করিলেন। শত্রুরা অনু-সরণ করিল। তেজস্বী অশ্ব লম্ফে একটী গিরিস্রোত উত্তীর্ণ হইল। ক্ষণ-কালের নিমিত্ত মোগল শত্রু বিলম্বিত হইল বটে। কিন্তু চৈতুরও আহত হইয়াছিল, অনুধাবকগণ ক্রমেই নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিল। পশ্চাতে কে "হো নীল ঘোড়াকা সোয়ার" বলিয়া চীৎকার করিল, প্রতাপ পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া দেখেন এক জন মাত্র অশ্বারোহী—তাঁহারই ভ্রাতা শক্ত। এবার ভ্রাতা

বন্ধু, ভ্রাতা তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন। ইহার পরে প্রতাপ বারম্বার পরাজিত হইতে লাগিলেন। প্রতাপের প্রায় সমুদয় রাজ্যই শত্রু করতলস্থ হইল।

এই প্রকার কত দীর্ঘ বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, প্রতাপের সংগ্রাম-সম্বল ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিল। তাঁহার পরিবারের নিমিত্ত প্রতাপকে প্রায় সতত উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। সদাসর্ব্বদা ভয়, পাছে তাহারা শত্রুহস্তে পড়ে, কতবার পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিল। একবার কতকগুলি উদয়ের ভীল তাঁহার পরিবারকে ঝুড়ির মধ্যে করিয়া লইয়া গিয়া টিনের খনিতে লুকাইয়া রাখিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল। রাজমহিষী ও রাজকুমারগণকে অনেক সময়ই অনাহারে থাকিতে হইত। এক দিন পাঁচ বার আহার প্রস্তুত করিয়া তাহা অভুক্ত রাখিয়া দুরন্ত শত্রুগণের উপদ্রবে তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। রাজার শিশু সন্তানকে, হিংস্রক জন্তু দিগের ভয়ে কখন কখন ঝুড়ী করিয়া গাছে ঝুলাইয়া রাখিতে হইত। যখন মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িত, তখন কখন কখন রাজ্ঞীকে শিশু সন্তান হৃদয়ে ধারণ করিয়া জলের স্রোতের মধ্যে পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে হইত। রাজমহিষী নিজের এবং সন্তানগণের এত কষ্টেও কখন বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। রাজমহিষীও সম্ন্যাসিনী। পবিত্র এই তাপস পরিবারের চিত্র। পবিত্র সেই সকল স্থান, যেখানে যেখানে তাঁহাদিগের পদধূলি পড়িয়াছিল, পুণ্যবান্ সেই বংশ যাহাতে তাঁহাদিগের উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহাদিগের জীবন-চরিত পাঠ করিলেও পাপের ক্ষয় হয়।

প্রতাপের মন একবার দমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু ইহা দমিল না। অবশেষে তিনি দেখিলেন অবিরাম-প্রবাহী মোগল সৈন্যের স্রোত রোধ করা অসম্ভব-পর। তখন তিনি তাঁহার তেজস্বিতানুরূপ সঙ্কল্প করিলেন। স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া, স্বাধীনতা রক্ষা করিব। এই মনে করিয়া তিনি তাঁহার পরিবার এবং বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ লইয়া মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদ-তীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আর্ব্বলী পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন, মরু-ভূমির সীমান্তে আসিয়া যাত্রিগণ উপস্থিত হইয়াছেন—এমন সময় প্রতাপের প্রধান অমাত্য, ভীম সাহা, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চিত অর্থরাশি রাণাকে দিলেন। প্রতাপ আবার দ্বিগুণীকৃত উৎসাহের সহিত অতর্কিতরূপে অশনিপাতের ন্যায় শত্রুর মস্তকে পড়িলেন। সাবাজের মোগল সৈন্য দীবারের যুদ্ধে সম্পূর্ণ নষ্ট হইল। প্রতাপ প্রায় সমুদায় মেওয়ার পুনরধিকার করিলেন। উদয়পুর আবার তাঁহার হস্তগত হইল। কিন্তু প্রতাপের তাহাতে সুখ নাই। তাঁহার পিতৃশোণিতসিক্ত চিতোর এখনও শত্রুহস্তে। তুমি কল্পনা-নেত্রে দেখ, উদয়পুরের নিকটবর্ত্তী

গিরিশৃঙ্গে সন্ন্যাসী যোদ্ধা প্রতাপ দণ্ডায়মান, দূরস্থিত অপহৃত চিতোরের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিতেছেন; অবিরাম পরিশ্রমে, চিন্তায়, ও নানা প্রকার কষ্টে তাঁহার দেহে যৌবনেই পরিণতির চিহ্ন সকল আবির্ভূত হইয়াছে, ললাটে গভীর আকুঞ্চন-রেখা, চক্ষুর পার্শ্বে কালিমার ছায়া পড়িয়াছে, শরীর শস্ত্রক্ষতচিহ্নময়। চিতোর দেখিয়া মনে কত কি মনে হইতেছে। তাঁহার পিতৃগণের গৌরব, বীর্য্য, কীর্ত্তি, ক্রমান্বয়ে মানস-নেত্রে কত দেখিলেন। অবশেষে দেখিলেন গৌরবের সুবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র মসীতে বিশ্রী হইয়া যাইতে লাগিল। ঐ দেখ রাণা উদয়সিংহ গৌরবের চিরাবাসস্থান চিতোর হইতে পলাইতেছেন। মানস-নেত্রে এই দৃশ্য দেখিয়া প্রতাপ স্তম্ভিত হইয়া যাইলেন। তাঁহার পর আপনার দুরবস্থা মনে হইল। মনে হইল শত্রুগণ দয়া করিয়া তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতেছে না। দয়া, অনুকম্পা বীর পুরুষের অসহ্য। অবজ্ঞা সহ্য হয়, ঘৃণাও সহ্য হয়, কিন্তু বীরপুরুষের পক্ষে, রজপুতের পক্ষে, শত্রুর অনুকম্পার পাত্র হওয়া অপেক্ষা আর কি অধিকতর যন্ত্রণাকর হইতে পারে?

প্রতাপের মনে সতত অসুখের অনল জ্বলিতে লাগিল। শরীরের উপরও অনেক ঝড় চলিয়া গিয়াছে। প্রতাপ শয্যাশায়ী হইলেন, মৃত্যু আসন্ন। প্রতাপের মৃত্যুশয্যাও স্বদেশানুরাগ-মমতার আধার। যেমন হানিব্যাল্ তাঁহার পুত্র হামিল্কারকে শপথ করাইয়া লইয়াছিলেন, তেমনি প্রতাপও তাঁহার পুত্রদ্বারা দেশের স্বাধীনতার জন্য শত্রুগণের সহিত যাবজ্জীবন যুদ্ধ করিবেন এই শপথ করাইয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাতে তাঁহার সন্দেহ হইল। মুমূর্ষু প্রতাপ দীন ভাবে কুটীরে শয়ান, শয্যাপার্শ্বে তাঁহার বিশ্বস্ত অমাত্যগণ বিষণ্ন মনে তাঁহার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছেন—এমন সময় প্রতাপের কণ্ঠ হইতে কাতরধ্বনি নির্গত হইল। অমাত্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "মৃত্যুর সময় কিসে মহারাজের শান্তির ব্যাঘাত করিতেছে"? প্রতাপ বলিলেন আমার দেশ আমার মরণান্তর তুর্কদিগের হস্তে সমর্পিত হইবে না যতক্ষণ এই আশ্বাস না পাইতেছি ততক্ষণ আমার আত্মা কুশলে দেহ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছে না। আমার পুত্রের উপর আমার নির্ভর হইতেছে না। আমার সন্দেহ হয় আমার মৃত্যুর পর সে বিলাসভোগে রত হইবে, স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ঘৃণিত আরাম ক্রয় করিবে। তোমরা জান না, আমি একদিন একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অমর (প্রতাপের পুত্র) এক দিন একটী কুটীরে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সামান্য কুটীর আমার বাসস্থানের নিমিত্ত প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। কুটীর অতি অল্প উচ্চ। প্রবেশ করিতে অমরের উষ্ণীষ

একটা বাঁশে বাঁধিয়া গেল; অমর তাহাতে বিরক্ত হইয়া বাঁশখানি টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।—আমার বোধ হয়, আমার মত, সে কষ্ট স্বীকার করিতে পারিবে না। আমার বোধ হইতেছে এই কুটীর-সকলের পরিবর্ত্তে এখানে সুখ-ভোগ্য সৌধ-রাজি নির্ম্মিত হইবে, নিরাপদ সুখভোগের ইচ্ছা হইবে, যে স্বাধীনতার নিমিত্ত আমরা কতবার রুধিরসিক্ত-কলেবর হইয়াছি, বিলাস-প্রিয়তা হেতু তাহা মোগলদিগের নিকট বিক্রীত হইবে, আর তোমরাও—আমার সেনাপতিগণ! তোমরাও আমার পুত্রের কুদৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইবে"। অমাত্যবর্গ সকলে প্রতিজ্ঞা করিলেন তাঁহারা জীবন থাকিতে কখন স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিবেন না। রাজপুত্রের নিমিত্তও তাঁহারা দায়ী থাকিলেন। তখন প্রতাপ পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং সানন্দে পরলোক গমন করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতাপের জীবন এইরূপে সমাপ্ত হইল। প্রতাপ অদ্যাপিও সিসোদিয়া রাজপুতগণের প্রাণের ধন, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা; এবং যতদিন তাহাদিগের অন্তরে বিন্দুমাত্র স্নেহানুরাগ থাকিবে, ততদিন প্রতাপকে তাহারা পূজা করিবে। প্রতাপ একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা মাত্র। পৃথিবীতে সেই সময় সম্রাট্ আকবরের ন্যায় কেহই প্রভাবশালী ছিলেন না। তথাচ যে প্রতাপ কেমন করিয়া, কি সাহসে,—আক্‌বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তাহা কয় জন বুঝিতে পারে? একজন বৈদেশিক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যদি মীবারের থিউসিডাইডিস্ (Thucydides) অথবা ঝিনোফেন (Xenophon) থাকিত, তাহা হইলে লোকে দেখিতে পাইত পিলপনিসসের সমরে অথবা "দশ সহস্রের প্রতিসারে" (the Retreat of the Ten Thousand) ইতিহাসের কীর্ত্তন-যোগ্য এমন কিছুই নাই যাহা মীবারের পরিবর্ত্তন-পরম্পরার মধ্যে প্রতাপের রাজত্বকালে ঘটে নাই। একদিকে নির্ভীক বীর্য্য, অদমনীয় দৃঢ়তা, অভূতপূর্ব্ব অধ্যবসায় এবং অতুলনীয় প্রভুভক্তি; অন্যদিকে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা, অসীম ধন সৈন্য এবং দুরন্ত মুসলমানদিগের ধর্ম্মোন্মাদ, কিন্তু এই সকল একত্রীভূত হইয়াও একজন মাত্রের অজেয় হৃদয়কে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। আর্ব্বলি পর্ব্বত শ্রেণীতে এমন একটী উপত্যকা নাই যাহা প্রতাপের কীর্ত্তিতে পবিত্রীকৃত হয় নাই—প্রতাপ কোথায় বা দীপ্তিময় বিজয়লাভ করিয়াছেন, কোথায় বা জয় হইতে অধিকতর গৌরবান্বিত পরাজয়ে, সাহস ও বীর্য্যে আপনাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন।

হলদিঘাট মীবারের থর্ম্মপিলি এবং দীবার তাঁহার মারাথন।*

* See Tod's Rajosthan, Annals of Mewar, Chap. XI. from which the above is taken.

বঙ্গকবিবৃন্দ! প্রতাপের কীর্ত্তি পাঠ করিয়াও তোমাদিগের বীণা নিস্তব্ধ কেন? একবার,—

"মিলায়ে তান
ভরিয়া প্রাণ
গাও রে গান,
মাতাও জগৎ, ভাসাও হৃদয়,"—

দেখিবে,——

"স্বদেশিগণে
প্রত্যেক মনে
উন্মত্ত মনে
শুনিবে সেই গীত যশোময়।"

বৈদেশিক হৃদয় প্রতাপের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া নাচিয়া উঠিল, আর তোমাদের হৃদয় তন্ত্রী নীরব?

প্রতাপের জীবন আলোচনা করিয়া ইতালীয় একজন সন্ন্যাসীর জীবনের বিষয় চিন্তা করিতে ভাল লাগিবে কি? লাগিবে। তাঁহারও জীবন প্রতাপের ন্যায় পবিত্র ও পূজ্য। তিনি রাজার সন্তান নহেন বটে, তথাচ তাঁহাব করস্পর্শ-যোগ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে বিরল। তিনি কিশোর বয়সে মাতৃভূমির জন্য যে জীবন চিরকালের নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই জীবনের উচ্চ সাধনা জগতে অনুকরণীয়। এই ব্যক্তি নব্য ইতালীর স্বাধীনতার জন্মদাতা মহানুভব ম্যাট্‌সিনি। তুমি যদি প্রকৃত দেশানুরাগ কি জানিতে চাও,—অভিসন্ধিশূন্য আত্মত্যাগ কি শিক্ষা করিতে চাহ,—একজন নির্ধন সহায়হীন নির্ব্বাসিত ব্যক্তি উৎসাহ, অধ্যবসায় ও চেষ্টা দ্বারা একটী সমগ্র জাতির মধ্যে কি বিপ্লব উপস্থিত করিয়া দিতে পারে তাহা জানিতে চাহ, তাহা হইলে ম্যাট্‌সিনির জীবন-চরিত অধ্যয়ন কর। তুমি যদি উপর্য্যুপরি বিফলীকৃত হইয়াও, বন্ধুবর্গের দ্বারা প্রতারিত হইয়াও, দেশ হইতে দেশান্তরে বহিষ্কৃত হইয়াও, জনক জননী ভগিনী এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু প্রিয় বস্তু আছে তাহা * পরিত্যাগ করিয়াও, দারিদ্র্যের অঙ্কুশতাড়না সহ্য করিয়াও, † কি প্রকারে মন্ত্রের সাধন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিতে চাহ, তাহা হইলে ম্যাটসিনির জীবন চরিত মনোযোগপূর্ব্বক অনুধাবন কর। ইহা অধিকদিনের কথা নহে। ইতালীতে, ইউরোপে অদ্যাপি অসংখ্য লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা এই মহাত্মাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত ও তাঁহার মন্ত্রে চালিত হইয়াছিলেন। আমাদিগের এই প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট আয়তন অতিক্রম করিয়াছে, আমরা ম্যাট্‌সিনির বিপ্লবমূলক ও ঘটনাবহুল জীবনীর কয়েকটী ঘটনামাত্র উল্লেখ করিয়া অদ্য এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

ম্যাট্‌সিনি ব্যবহার-জীবীর (lawyer) ব্যবসায়ে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু

* Mazzini, Vol. II. p. 48.

† Do. Vol. III. p. 176.

ইতালীর দুরবস্থা, অধীনতা, তাঁহার হৃদয়ে গভীররূপে অঙ্কিত হইল, প্রপীড়িত জনের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে সজোরে আঘাত করিল, ইতালীর দুঃখে তাঁহার জীবন বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। প্রতাপ যেমন দুঃখ-চিহ্ন স্বরূপ বৃক্ষপত্রে ভোজন করিতেন, তৃণশয্যায় শয়ন করিতেন, এবং শ্মশ্রু ধারণ করিয়াছিলেন, ম্যাট্‌সিনিও সেইরূপ ইতালীর স্বাধীনতা-বিলোপের শোকচিহ্ন স্বরূপ আপনাকে "কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছেদে সতত আচ্ছাদিত রাখিতেন। যৎকালে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাষ্ঠ-মঞ্চকে উপবিষ্ট, অন্যান্য সমপাঠী বালকবৃন্দ তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রফুল্লমনে হাসিতেছে, খেলিতেছে, বেড়াইতেছে, তখন তিনি বিষণ্ণ ও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।"* ১৮২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে জেনোয়া নগরে জননীর সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় কতিপয় নিষ্ফল পীডমণ্টিস্ বিদ্রোহিগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেই দিন হইতে ম্যাট্‌সিনি ইতালীর স্বাধীনতা-সাধন-ব্রতে রত হইলেন। চিরদিন এই ব্রত-পালনই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। ম্যাট্‌সিনি কার্‌বোনারি-জ্‌ম নামে এক গুপ্ত সম্প্রদায়ের সভ্য হইলেন। এবং অতি শীঘ্রই একজন ষড়যন্ত্রী বলিয়া ধৃত এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। স্নেহময়ী জননীর তাঁহার জীবনের নিমিত্ত আশঙ্কা ও কষ্ট মনে করিয়া ম্যাট্‌সিনির মনে বড় কষ্ট হইত। কিছুকাল পরে ম্যাট্‌সিনি কারামুক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসনের কঠোর আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। ম্যাট্‌সিনি ফরাসিদেশে যাইলেন। মার্‌সেল্‌স নগরে "নব্য ইতালী" (Young Italy) নামক এক সভা এবং সংবাদপত্র সংস্থাপন করিলেন। ইতালীকে স্বাধীন করা, অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করাই এই সভার, এবং ইতালীয় দিগকে স্বাধীনতা জ্ঞানে শিক্ষিত ও উৎসাহিত করা এই সংবাদ-পত্রের উদ্দেশ্য। ইহা আগ্নেয় গিরির ধাতুনিঃস্রবের ন্যায় ইতালীয়দিগের হৃদয়ে পড়িতে লাগিল। ইতালীর শাসন-সমিতিসকল ভীত হইলেন, ফরাসি গবর্ণমেণ্টকে ম্যাট্‌সিনিকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ফ্রান্স হইতে ম্যাট্‌সিনির নির্ব্বাসন-আজ্ঞা প্রচার হইল। ম্যাট্‌সিনি সে আজ্ঞা পালন করিলেন না। তিনি মার্‌সেলসে লুকায়িত থাকিয়া সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টকে ধিক্কার দিয়া এক তেজস্বী পত্র লিখিলেন। ফরাসি গবর্ণমেণ্ট আরও কুপিত হইলেন। "নব্য ইতালী" সংবাদপত্র যাহাতে বিনষ্ট হয়, এবং ম্যাট্‌সিনি যাহাতে ধৃত হয়েন তাহার বিশেষ চেষ্টা করা হইতে লাগিল। এই সময় হইতে ম্যাট্‌সিনির, একটী ক্ষুদ্র কক্ষের প্রাচীর-চতুষ্টয় মধ্যে

* "ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত"—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ এ প্রণীত।

বিংশতি-বর্ষ-ব্যাপী স্বেচ্ছাকৃত কারাবাস আরম্ভ হইল।* ম্যাট্‌সিনি এক বৎসর এখন মার্সেল্‌সে লিখিতে লাগিলেন, "প্রুফ" সংশোধন করিতে লাগিলেন, এবং নিশীথে আবশ্যক মতে লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে ম্যাট্‌সিনির অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও উদ্যোগে ইতালীর স্বাধীনতার জন্য এক দল সৈন্য অচিরাৎ ইতালী অভিমুখে যাত্রা করিবে স্থির হইল। এখন এই সৈন্যের কে অধিনায়কতা করিবে এই প্রশ্ন উঠিল। জন-সাধারণের ইচ্ছা রামোরিণো-নামক কথঞ্চিৎ খ্যাতনামা ও উচ্চপদস্থ এক ব্যক্তি এই সৈন্যের অধিনায়ক হন। এই ব্যক্তির উপর ম্যাট্‌সিনির উপযোগিতার এবং সততার বিশ্বাস ছিল না, বরঞ্চ তিনি জানিতেন যে তিনি এ প্রকার গুরুতর কার্য্যের নিমিত্ত সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, সাধারণ লোকে নামের মোহন আকর্ষণ চাহে। ম্যাট্‌সিনি কার্য্যাধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগকে তাঁহাদিগের বিষম ভ্রম বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বলিলেন যে রামোরিণোকে ছাড়িয়া তাহারা কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইবেন না এবং মনে করিলেন ম্যাট্‌সিনি এক দিকে যেমন মন্ত্রণা-বিষয়ে প্রভুত্ব করিতেছিলেন তেমনি অন্যদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিত্ব করিবার স্বার্থপর ক্ষমতা-তৃষ্ণায় চালিত হইয়া রামোরিণোর নেতৃত্বাভিষেকে এবম্বিধ প্রতিবাদ করিতেছিলেন। নিঃস্বার্থ ও কেবলমাত্র দেশহিতার্থী ম্যাট্‌সিনি তাঁহার বন্ধুদিগের এই সম্পূর্ণ অমূলক ও নিতান্ত নিষ্ঠুর সন্দেহ জানিবা মাত্র প্রকাশ্যেই অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না।* তিনি দেশের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন—আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই; স্নেহময় জনক জননী, প্রিয়তমা ভগ্নী—সংসারের যাহা কিছু সুখ আছে তাহা সকলই ছাড়িয়াছেন—তাহার পুরস্কার, তাহার প্রতিফল এই। ম্যাট্‌সিনি অবশেষে অগত্যা, কিন্তু হতাশ্বাস হইয়া, রামোরিণোর নেতৃত্বে স্বীকৃত হইলেন।—

"ম্যাট্‌সিনি সৈনাপত্য তাঁহার (রামেরিণোর) হস্তে প্রদান করিয়া নিজে একটী বন্দুক মাত্র হস্তে লইয়া পদাতিক সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেন; কিন্তু রামোরিণো * * সৈন্যদিগকে হ্রদের ধার দিয়া অকারণ ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা হাঁটাইয়া লইয়া গেলেন; কেন যাইতেছেন কোথায় যাইতেছেন কাহাকেও কিছু বলিলেন না; ইহাতে সৈন্যগণ ভগ্ন-হৃদয়, ক্লান্তশরীর ও উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব হইয়া উঠিল।

"এত দিনে ম্যাট্‌সিনির শরীর ভাঙ্গিল।

*And then began for me the life I have led for twenty years out of thirty—a life of voluntary imprisonment within the four walls of a little room.—Mazzini.

* There are those yet living who witnessed the convultion of bitter tears that overcame me at the first idea of that accusation.—Mazizni. Vol. I. p. 346.

বিগত তিন মাস ধরিয়া তিনি যে রাত্রি-দিন খাটিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর অন্তঃসার-শূন্য হইয়াছিল। গত সপ্তাহে তিনি একবারও শয়ন করেন নাই। দশ পনর মিনিট্ কখন কখন নিদ্রা গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা চেয়ারে বসিয়াই। চিন্তায় জর্জ্জরিত—বিজয়-বিষয়ে বিশ্বাসশূন্য, বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ব্ব লক্ষণে মর্ম্মাহত, অভাবনীয় রূপে প্রতারিত, এইরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাঁহাকে আবার সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য সহাস্য-বদন হইতে হইত।

"যখন তিনি পদাতিক সৈন্যে প্রথম প্রবিষ্ট হন, তখন হইতেই জ্বরে তাঁহাকে ভস্ম কবিতেছিল। যদি উভয়-পার্শ্বস্থ সৈনিকেরা তাঁহাকে ধরিয়া না রাখিত,তাহা হইলে বোধহয় তিনি পড়িয়া যাইতেন। সে রাত্রিতে ভয়ানক শীত হইয়াছিল, এবং ম্যাট্সিনি অনবধানতা বশতঃ তাঁহার কোট ভুলিয়া আসিয়াছিলেন। শীতে তাঁহার দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হইতেছিল, তিনি যেন স্বপ্নাবস্থায় চলিতে লাগিলেন। এক জন সৈনিক পুরুষ তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া কাতর হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠ নিজ ক্লোক দ্বারা আবৃত করিলেন। ম্যাট্সিনির এমন শক্তি ছিল না যে তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করেন" † তথাচ ম্যাট্সিনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান। ম্যাট্সিনির বোধ হইল তাঁহারা নিরূপিত দিক্ ছাড়িয়া অন্যদিকে যাইতেছেন। তিনি দৌড়িয়া রামরিণোর নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন "তুমি যদি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট পথে গমন না কর তাহা হইলে ঈশ্বরের অভিসম্পাত তোমার মস্তকে পড়িবে।" রামরিণো বারবার তাঁহার নিকট নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়া হইবে বলিয়া গম্ভীর ভাবে শপথ করিলেন। তিনি রামরিণোর সহিত কথা কহিতেছিলেন এমন সময়ে হঠাৎ যেন বন্দুকের শব্দ হইল। ম্যাট্সিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত, বুঝি যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ম্যাট্সিনি শব্দ স্থানে যাইলেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষীণ দৃষ্টি রহিত হইল, ম্যাট্সিনি সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক রামোরিণো যেই এই সংবাদ পাইলেন, তিনি অমনি সৈন্যদিগকে বিচ্ছিন্ন হইবার আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। ম্যাট্সিনির যখন সংজ্ঞা লাভ হইল তিনি তাঁহার শয্যা-পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমরা কোথায় রহিয়াছি?" উত্তর "সুইজারল্যাণ্ডে।" ম্যাট্সিনি পুনর্ব্বার,"আমাদের সেনাদল কোথায়?" উত্তর, "সুইজারল্যাণ্ডে।" শয্যাশায়ী ম্যাট্সিনির দেশানুরাগ-পূর্ণ হৃদয়ে নৈরাশ্যের দারুণ আঘাত লাগিল। ম্যাট্সিনির জীবনের কোন্ ঘটনাটী ছাড়িয়া কোন্‌টি বলিব? তাঁহার সমুদায় জীবনী অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকারের উদাহরণ স্থল; সমুদায় কার্য্যেই তিনি যে

† যোগেন্দ্র বাবুর "ম্যাট্সিনি" পৃঃ ২৩৭।

আপনাকে দেশের মঙ্গলের জন্য বলিদান দিয়াছিলেন তাহাই ইতিহাসে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা তাঁহার জীবনের আর দুইটী মাত্র ঘটনা উল্লেখ করিব। ইতালীতে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, বিখ্যাত গ্যারিবল্ডি একদলে সৈন্য লইয়া ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে এক জন সৈনিক পুরুষ দূর হইতে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে সেনাপতিকে ডাকিয়া বলিলেন "মহাশয়! আমি এই সৈন্যদল-ভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আপনার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করি।" সেনাপতি এবং অন্য সৈন্যগণ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন এই ব্যক্তি মহাপুরুষ ম্যাট্সিনি। তাঁহাকে চিনিবামাত্র সৈন্যদিগের মধ্যে হৃদয়ানুভূত এক উচ্চ আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল, এবং সকলে একমত হইয়া তাঁহার হস্তে সেই দলের পতাকা অর্পণ করিল। ম্যাট্সিনি রণক্ষেত্রাভিমুখে পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; তিনি এখন পীড়িত ও দুর্ব্বল এবং সৈনিক পুরুষের কঠোর পরিশ্রম ও সহনশীলতাতে অনভ্যস্ত। সেই সময়ে অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল। পাছে তাঁহার মহামূল্য জীবন এই প্রকার অবস্থায় অকালে বিনষ্ট হয়, এই নিমিত্ত এই যুদ্ধ-যাত্রা হইতে নিরস্ত হইবার জন্য ম্যাট্সিনির বন্ধুগণ অনেকবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না; সৈন্যদিগের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন; পথিমধ্যে দেখিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন সৈন্য বস্ত্রাভাবে শীতে বড় কষ্ট পাইতেছিল, তিনি আপনার গাত্র হইতে নিজের ক্লোক্ খুলিয়াদিলেন।

আবার ম্যাট্সিনি যখন গ্যারিবল্ডির সহিত একত্র হইয়া শত্রুবেষ্টিত রোম, অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশল, উৎসাহ ও সাহসের সহিত পরিরক্ষণ করিতেছেন তখন তাঁহাকে দেখ। সমগ্র ইউরোপ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইল। অদ্ভুত বীরত্বের ধারা-বাহিক উচ্ছ্বাস। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? রোম শত্রুহস্তে নিপতিত হইল। এই ঘটনাতে দুঃখে, শোকে দেশানুরাগ-রচিত ম্যাট্সিনি উন্মত্ত প্রায়। কল্পনার নেত্রে ইতিহাসের সাহায্যে ঐ দেখ, স্বর্গীয় উন্মাদ-গ্রস্ত সন্ন্যাসী ম্যাট্সিনি রোমের রাজবর্ত্মে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বিজয়ী বিপক্ষ সেনা রোমে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে, নির্ভীক ম্যাট্সিনি তাহাদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান। স্নেহময়ী জননীর মৃত্যু হইলে শিশু সন্তান যেরূপ কবরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে, একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইলে শোক-ক্ষিপ্তা জননী তাহার মৃতদেহও ত্যাগ করিবেন না সঙ্কল্প করিয়া তাহাকে যেরূপ আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া থাকেন, হিন্দু সতী স্বামীর চিতারূঢ় দেহের পার্শ্বে শয়ন করিতে যেরূপ উদ্যত হয়—

ম্যাট্‌সিনি অদ্য কবলিত রোমে সেইরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

আমরা এই খানেই ম্যাট্‌সিনির জীবন অনিচ্ছার সহিত সমাপ্ত করিলাম। তাঁহার জীবনের মূল ঘটনাগুলিও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে যাইলে এক খানি দীর্ঘ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবন-চরিত নব্য ইতালীর ইতিহাস; ইতালীবাসিদিগের রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক শিক্ষার কারণ-পরম্পরা,মস্তিষ্ক এবং হৃদয়-নিঃস্রাবের পরিপ্লাবন। তাঁহার জীবন চিন্তাময়, কার্য্যময়, উচ্ছ্বাসময়, তরঙ্গময়—অদমিত, অক্লান্ত,—বিঘ্ন মানে নাই, কারাগার, নির্ব্বাসন, অনাহার ও মৃত্যুকেও এক দিনের জন্যও ভয় করে নাই, তিনি এক জন প্রকৃত সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী দেশের মুক্তি, সন্ন্যাসী মানব-জাতির জীবন। যে দেশে সন্ন্যাসী নাই, তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। বঙ্গদেশের অদ্য এত দুর্দ্দশা কেন? বঙ্গদেশে সন্ন্যাসীর অভাব, এই নিমিত্ত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ ভিন্ন দেশের ত্রাণ নাই। তুমি যদি প্রকৃতপক্ষে দেশের মঙ্গল সাধিতে চাহ, যদি তোমার দেশহিতৈষিতা কেবলমাত্র কপটতার রূপান্তর না হয়, সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হও। একজন মাত্র সন্ন্যাসী জন্মিলে তাঁহার শিক্ষাতে, তাঁহার দৃষ্টান্তে, কতজনের জীবনের পথ প্রশস্ত হইবে, কত জনের আশা ও উদ্দেশ্য উচ্চ হইবে, কতজন পশুভাব ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব গ্রহণ করিবে। অদ্য দেশে চতুর্দ্দিকে নীচতা, পশুর আচরণ—মনুষ্যত্ব নাই, অভিমান নাই, সাহস নাই, পুরুষত্ব নাই। সদা সর্ব্বদা কেমন যেন সঙ্কুচিত, যেন নিজের জীবন নিজের নহে, যেন নিজের মত নিজের নহে, যেন প্রতিপদ-বিক্ষেপে ভয়, গণনা, ক্ষতি লাভের গণনা, জীবন যেন আতঙ্কময়—পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার অপেক্ষা অধিক ভয়, মৃত্যুর ভয়ে মূর্চ্ছিত। আমার জিজ্ঞাস্য, যে জীবনের কোন মূল্যই নাই, তাহার প্রতি আমাদিগের এত মায়া কেন? আমরা বাঁচি কেন? আহার নিদ্রার নিমিত্ত। নীচতা অভ্যাস-মলে নিমজ্জিত হইবার নিমিত্ত। মস্তকে চর্ম্মপাদুকার প্রহার সহ্য করিতে শিখিবার নিমিত্ত।

ভাই! তুমি আর গোপনে মধুময় শ্বেতাঙ্গ লেহন করিয়া বাহিরে আসিয়া বীরত্ব করিও না, চক্ষে সহে না। তুমি ভাই, দেশানুরাগের নাম লইয়া নিজের কপট স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোককে আহ্বান করিও না। আর তুমি ভাই ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া, মাতা ভগিনীকে পর করিয়া, হ্যাট্‌ কোট্‌ পরিয়া, স্ত্রীর হাত ধরিয়া, তীক্ষ্ণত্বময় জীবনে সাহেবী করিয়া, আমরা গরিব বাঙ্গালী—আমাদিগকে—জ্বালাতন করিও না। আর তুমি ভাই দুই একখানি কাব্য লিখিয়া, বা একখানি অসার সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইও না। আর তুমি ভাই জবর্দ্দস্ত হাকিম, মিত্য মিত্য শ্বেতপদা-

খাত খাইয়া, গরিব কেরাণী মহলে দরিদ্রলোকের উপরে তোমার প্রতাপ প্রকাশ করিয়া তোমার নিজের চাপ-রাশির ন্যায় ঘৃণিত হইও না। তুমি ভাই ব্যবহারজীবী (lawyer) স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, প্রতিকথায় বাতাহত লতার ন্যায় হুজুরের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া, উচ্চ ব্যবসায়ের উপর কলঙ্ক আনিও না। তুমি ভাই প্রকাণ্ড জমীদার, তোমাকে জঠরানলে জ্বলিতে হয় না, তথাচ সুবিধা পাইলেই শ্বেত-বিগ্রহের পাদ-পদ্মে তোমাদের অঞ্জলি নিক্ষেপ কর কেন? "থ্যাংক্স," না "রায় বাহাদুর," না "রাজা" না "মহা-রাজা বাহাদুর" না "নক্ষত্র," (Star) পাইবার নিমিত্ত? কিন্তু ভাই তোমাকে আমি বলি তোমার সকল উপাধি, সকল মাহাল মৌজা একত্র করিলেও, তুমি সেই স্কট্‌ল্যাণ্ডের কৃষক কবির পদরেণু স্পর্শ করিবার যোগ্য নহ।

"For a' that, and a' that
His riband, star, and a' that
The man of independent mind,
He looks and laughs at a' that."

ভাই! চরিত্রে একটু স্বাধীন ভাব কোথাও দেখি। আমরা সকলেই নীচ—তুমি আমি সকলেই। দেশ ভীরুতাতে, নীচতাতে পরিপূর্ণ। তুমি আমি পশুর অপেক্ষাও ঘৃণিত। সত্য কথাতে রাগিলে নাচার।

দেখ আমরা কি ছিলাম, আর কি হইয়াছি। ভারতবর্ষ কি ছিল, আর অদ্য কি? যেখানে পূর্ব্বে বিজ্ঞান, সাহিত্য, উদারতা, শৌর্য্য, সভ্যতা—অদ্য সেখানে মূর্খতা, নীচতা, কাপুরুষতা বর্ব্বরতা—যেন নন্দন কানন মরুভূমি হইয়া গিয়াছে, যেন নাট্যশালা সমাধি-মন্দির হইয়াছে, যেন পৌর্ণমাসীর কৌমুদী অমাবস্যার ঘন তিমিরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেন সেই স্থানই নহে, সেই দেশই নহে, সেই জাতিই নহে।—ভাগীরথীর দুই পারে সর্ব্বত্রই শ্মশান—অনবরত চুলি জ্বলিতেছে—অগণ্য ভস্মস্তূপ, চতুর্দ্দিকে গলিত মৃতদেহ শৃগাল কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইতেছে—যেন প্রেতপিশাচগণ উপরে শূন্যমার্গে ফিরি-তেছে ও বিকট হাস্য হাসিতেছে, নৃমুণ্ড লইয়া ক্রীড়া করিতেছে—কি ভীষণ শ্মশান এই ভারত-ভূমি! কিন্তু শ্মশানে বিবাহের উৎসব কেন, বিলাসের পুষ্পমালা কেন, প্রেয়সীর সহিত মধুরা-লাপ কেন? শ্মশান সন্ন্যাসীর বিচরণ-স্থল, শ্মশান সাধকের অধিগম্য স্থান, শ্মশান শব সাধনার যোগ্য ভূমি। এই শ্মশানে সাধনা করিবে এমন কি কেহই দেশে নাই?—যদি না থাকে তাহা হইলে দেশের আর দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই, ঘোরা রজনী আরও ঘোরতরা হইবে। তাই বলি, ভাই! জীবন পবিত্র কর, প্রকৃত সন্ন্যাস অবলম্বন কর। আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হও। দীক্ষা-গুরুর যদি অভাব হয়, তাহা হইলে

ইতিহাস উদ্ঘাটন কর, তাহাতে কত গুরু পাইবে। সক্রেতিস্, বুদ্ধ, ঈশা, লুথার, কন্‌ফিয়স্‌কো, কসথ্, লাফেট, নানক, গুরুগোবিন্দ, ম্যাট্‌সিনি, প্রতাপ, চৈতন্য, ফ্রাই, নাইটিঙ্গেল্, হাউয়ার্ড—যাঁহার নিকটে যাইবে, তিনিই তোমাকে আত্মত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন।

হে বুদ্ধদেবের ছায়া! হে প্রতাপের স্মৃতি! হে চৈতন্যের আত্মা! হে মহাপুরুষগণ! আমাদিগকে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত কর।

তবে ভাই, একবার আশাপতাকা উড্ডীন কর, উৎসাহ তূরীর গম্ভীর নিনাদে জগৎ পুরাইয়া দেও, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অসি নিষ্কোষিত কর। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন সন্ন্যাসী দণ্ড, কমণ্ডলু, রক্তবস্ত্র, ধারণ করিবে।* আমরাও বলি বিষয়-বিতৃষ্ণা-স্বরূপ গৈরিক বসন পরিধান কর। জ্ঞানপূর্ণ কমণ্ডলু এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কার্য্য রূপ দণ্ড ধারণ কর। ভাই কার্য্য চাহি; কেবল চিন্তাতে, চক্ষুজলে, কিছু হইবে না। প্রকৃত কথা—

"শুধু চক্ষুজলে, কি হবে ভাসিলে
তাতে কি রজনী হবে অবসান?
সুদৃঢ় সঙ্কল্পে আজ প্রতিজন
করুক উৎসর্গ নিজের জীবন;
দেখ দেখি তায়, যায় কি না যায়
এ ঘোর দুর্দ্দশা রজনী তোমার।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র রায়চৌধুরী।

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম-সংস্করণ।

শতশত বৎসর ধরিয়া হিন্দু সমাজে ক্রমশই অধোগতি হইতেছিল। সেই অধোগতির পরিশেষ কোথায় হইত ইহা এক্ষণে স্থির করা নিতান্ত সহজ নহে। দাসত্ব ও মূর্খতার বিষময় ফলে হিন্দুসমাজ প্রাণ শূন্য হইল। যে সকল জাতীয়-জীবন-রক্ষিণী শক্তি দ্বারা মনুষ্য সমাজ সজীব থাকিয়া ক্রমশঃ উন্নতিপথে পরিধাবিত হয়, একে একে সেই সকল শক্তি হিন্দু-সমাজে অদৃশ্য হইল—মৃতদেহের ন্যায় ইহা স্থিতিশীল হইয়া রহিল। সমাজের এরূপ অবস্থা হইলে সঞ্জীবনী শক্তির নিতান্ত আবশ্যক। যতদিন পর্যন্ত এইরূপ কোন পুনর্জ্জীবন-দায়িনী শক্তিবলে সমাজ পরিচালিত না হয় ততদিন তাহার দুর্গতির আর পরিসীমা থাকে না। যে সকল সদ্‌গুণ-বশতঃ মরুভূমি প্রফুল্ল উদ্যানে পরিণত

* দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র সন্ন্যাসীতিকীর্ত্তিতঃ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি-খণ্ডে।

হয়, এবং পর্ব্বত-গুহা-বাসী আম-মাংস-ভোজী দ্বিপদ জন্তু মানব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়, তখন কালক্রমে সেই সকল সদ্‌গুণের চিহ্নমাত্র আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহস, বীর্য্য, অধ্যবসায়, সত্যানুরাগ, এরূপ পঙ্কিল সমাজে তিলার্দ্ধ স্থান পাইতে পারে না। মনুষ্যের মন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়, ক্রমশঃ বুদ্ধি-শক্তির হ্রাস হয়। পৃথিবীর অনেক সভ্য সমাজ এইরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছে, আবার তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। যে সকল জাতির অদ্যাপি পুনরুদ্ধার হয় নাই, যাহারা অদ্যাপি অবনতিরূপ ঘোর অন্ধকারে কালযাপন করিতেছে, এই সকল সৌভাগ্যশালী পুনরভ্যুন্নত সমাজ তাহাদের পক্ষে আশার প্রদীপ-স্বরূপ।

গঙ্গার মহানা দিয়া ইংরাজ বণিক্ যদি বঙ্গদেশে (এস্থলে আমরা শুধু বঙ্গদেশের কথা বলিব) প্রবেশ না করিত, তাহা হইলে সে কতদিন যে এই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত বলিতে পারা যায় না। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গীয় সমাজে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও অদ্যাবধি ঘটিতেছে, ইংরাজী সভ্যতা ও ইংরাজী সাহিত্য তাহার মূল কারণ এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যখন আমরা আমাদের জাতীয় পুনরুদ্ধার জন্য ইংরাজের যশোকীর্ত্তন করিব, তখন যেন রাজা রামমোহন রায়ের পবিত্র নামোচ্চারণ করিতে বিস্মরণ না হয়।

রামমোহন রায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইবে কেন? বঙ্গদেশের জন্য তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন তৎ সমস্তই তাঁহার মৃত্যুর বিংশতিবর্ষমধ্যে ইংরাজী সভ্যতার বলে আপনিই হইত; বিশেষতঃ দেশে যদি ইংরাজী সাহিত্যের বিস্তার না হইত তাহা হইলে তাঁহার প্রয়াস কোনকালে সফল হইতে পারিত কি? এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কারণ এইরূপ কূট তর্ক মধ্যে মধ্যে দুই এক জনের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। রামমোহন রায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইবে কেন? আমরা জিজ্ঞাসা করি, না হইবেই বা কেন? যদি বস্তুতই তাঁহার দ্বারা দেশের কোনও উপকার না হইয়া থাকে তথাপি তাঁহার সাহস, অধ্যবসায় ও স্বদেশানুরাগ বশতঃ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত। আর তিনি দেশের কোন মঙ্গল সাধনে কৃতকার্য্য হন নাই, এ কথা কোনক্রমেই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। যাঁহার নাম মহৎ ও ক্ষুদ্র, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী বাঙ্গালী মাত্রেই বিদিত আছে; যাঁহার মতামত কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই কিছু না কিছু জানে, যাঁহার প্রতিভাবলে নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরার্চ্চনাকে গোঁড়া হিন্দু হইয়াও কেহ যাবনিক ধর্ম্ম বলিয়া অবজ্ঞা করিতে সাহস করে না, তাঁহার দ্বারা দেশের কোন মঙ্গল সাধন হয় নাই

এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? পঞ্চাশৎ বৎসর হইল রামমোহন রায় সহস্র সহস্র ক্রোশ অন্তরে বিজাতীয়দিগের মধ্যে ভূশয্যায় শায়িত আছেন, তথাপি তাঁহার নাম বাঙ্গালীর যেমন পরিচিত তেমন আর কাহারই নহে। কিন্তু এই কথা লইয়া অধিক বাগাড়ম্বরের বিশেষ প্রয়োজন দেখি না।

বাঙ্গালী মাত্রই আশৈশব দুইটী প্রধান ধর্ম্মে পরিবেষ্টিত—হিন্দু ও মুসলমান। এক ধর্ম্মে জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা, অন্য ধর্ম্মে এই দুই কলঙ্কের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না। এক ধর্ম্মের মতে বিদেশ গমন নিষিদ্ধ; ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন রমণীর পরম ব্রত; নবমবর্ষীয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতার পক্ষে গৌরীদানের ফল এবং চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া অনূঢ়া বালা ও কুল-কলঙ্কিনী এতদুভয় আত্মীয় স্বজনের পক্ষে সমান নিন্দার কারণ। অন্য ধর্ম্ম-মতে বিদেশ গমন দোষাবহ নহে; ভর্ত্তা গতাসু হইলে বিধবা ইচ্ছামত পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিতে পারে, না করিলেও বিধবা সংসার-সুখে এককালে বঞ্চিতা নহে। তরুণমতি বালিকাকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধা করিয়া পিতা এই ধর্ম্মমতে কোন সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন না, কিম্বা বালিকা যৌবন প্রারম্ভাবধি অবিবাহিতা থাকিলে তাহার আত্মীয় বর্গকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। এই দুই ধর্ম্মের দিকে মহাত্মা রাম মোহনের চক্ষু শৈশবাবস্থাতেই আকৃষ্ট হইল। যখন তাঁহার সঙ্গিগণ শৈশবোচিত ক্রীড়ায় নিমগ্ন, যখন খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামের অপরাপর বালকবৃন্দ আপন আপন পিতামহীর নিকটে অবাক্ হইয়া দেব দেবীগণের গুণকীর্ত্তন শ্রবণে নিযুক্ত, সেই সময় হইতে বঙ্গের বাল-সূর্য্যের হৃদয় গভীর চিন্তায় আলোড়িত হইল। সেই চিন্তা কি?—স্বদেশের দুর্দ্দশা, মনুষ্যের ঐহিক মঙ্গল, পরকাল, ঈশ্বর! আমরা সামান্য মনুষ্য; আমরা বুঝিতে পারি না বালকের অন্তরে এই সকল চিন্তা কেমন করিয়া প্রবেশ করিল! তিনি আপনি বলিয়াছেন 'যখন আমার বয়স ষোড়শ বৎসর, আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম অমূলক এই বিষয় লইয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম।'* মহাপুরুষদিগের সকলই অদ্ভুত!

আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের কুসংস্কারপূর্ণতা, হিন্দু সমাজের দুর্গতি, জনসাধারণের ঘোর মূর্খতা, এই সকল দেখিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই রামমোহন রায়ের অন্তরে বিতৃষ্ণা ও অনুকম্পার উদয় হইল। তিনি এই সকল বিষয় লইয়া যত চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই হিন্দুধর্ম্মের উপরে তাঁহার বিদ্বেষ বাড়িতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা যেমন সমাজ-গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় তেমন

* Auto-biographical sketch.

অন্য কোন পৌত্তলিক ধর্ম্মে হয় না।* সুতরাং তাঁহার মতে হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় হেয় ও জঘন্য ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। মহাত্মা রাম মোহনের এই কথা কোন ক্রমেই অপ্রামাণিক নহে। হিন্দুধর্ম্মানুরাগী পাঠক আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমাদেরও এই ধর্ম্মের প্রতি লেশমাত্র আস্থা নাই। আমরাও বলিয়া থাকি যে মানবজাতির সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু আমাদের এইরূপ বিশ্বাস হইলেও রামমোহন যতদূর গিয়াছিলেন ততদূর যাইতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা এমন কথা বলিতে চাহি না যে হিন্দুধর্ম্ম জগতের সর্ব্বাপকৃষ্ট ধর্ম্ম। সত্য এই ধর্ম্ম বহু ভ্রম ও কলঙ্কে পরিপূর্ণ, তথাপি অন্বেষণ করিলে ইহাতে রত্নলাভ করিলেও করিতে পারা যায়। ইহা জগতের সর্ব্বাপকৃষ্ট ধর্ম্ম নহে। রামমোহন রায়ের এই বিদ্বেষাধিক্যের কারণ নির্দ্দেশ নিতান্ত দুরূহ নহে। তিনি সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। সংস্কারকগণের ব্রত অতি কঠিন। তাঁহাদিগকে পুরাতন নীতি, পুরাতন বিশ্বাস, এই সকল চূর্ণীকৃত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন সামগ্রী নির্ম্মাণ করিতে হয়। সুতরাং 'সর্ব্বমতিমাত্রং দোষায়' এই উপদেশ বাক্য যে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইবে ইহা কিছু বিচিত্র নহে। বোধ হয় রামমোহন রায়ও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মের উপরে তাঁহার বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইলে মুসলমান ধর্ম্মের দিকে তাঁহার নয়ন স্বতই আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই ধর্ম্মে কোটিকোটি দেব দেবী নাই, জাতিভেদ নাই, বাল্য বিবাহ বিধি নাই, সহমরণ নাই। ইহার অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বর পূজা দেখিয়া তাঁহার মন প্রথমে তৎপ্রতি সানন্দে ধাবিত হইল। বস্তুতঃ শেষ পর্য্যন্ত তিনি মহম্মদের ধর্ম্মকে কোন কালেই নিতান্ত অবজ্ঞা করেন নাই; কারণ তিনি আপনার মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে 'খ্রীষ্টান্ মিশনরিগণ যে ধর্ম্মের প্রচার করিয়া বেড়ান, তদপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্ম অধিক পরিমাণে মানব-বুদ্ধি-গ্রাহ্য।'* কিন্তু মহম্মদের ধর্ম্মের প্রতি প্রথমে তাঁহার কিঞ্চিৎ অনুরাগ জন্মিলেও সেই অনুরাগের পরিবর্ত্তে শীঘ্রই তাঁহার মনে বিরক্তির উদয় হইল। তিনি দেখিলেন মহম্মদ খড়্গের দ্বারা আপনার ধর্ম্ম বিস্তার করিতে অনুমতি দিয়াছেন; তিনি আরও দেখিলেন যে মহম্মদ স্বয়ং তাঁহার ক্রীতদাসের রমণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া সেই রূপসীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইহা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। যে ধর্ম্ম নররক্ত পান করিয়া পরিপুষ্ট, যে ধর্ম্মের

* Preface to an English Translation of the Vedanta (1816).

* Miss Carpenter's Book.

গুরু—অন্য কেহ নহে, স্বয়ং গুরু—পর-খ্রীষ্ট ধর্ম্ম নাশ করিলেন, সে ধর্ম্ম কথনই সত্যধর্ম্মনামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে, সে ধর্ম্মের দ্বারা মনের প্রকৃতির উচ্চতা সাধনের সম্ভাবনা কি? ... সময় হইতেই বোধ হয় তিনি বৈদিক ধর্ম্মানুশীলন আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে ব্রাহ্মণগণ যে ধর্ম্মের শিক্ষা দেন তাহা বহু-ভ্রমাত্মক বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম নহে। তাঁহার বিশ্বাস হইল যে বৈদিক ধর্ম্মই যথার্থতঃ আর্য্য ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম (তাঁহার মতে) একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দেয়। সাকার উপাসনা এই বৈদিক ধর্ম্মের অনুমত নহে। এই সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম ব্যতীত আর একটী ধর্ম্ম-কোষাগারে তিনি প্রবেশাধিকার পাইলেন। রামমোহন আমাদের মত বাল্যকালে ইংরাজি শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বোধ হয় পাঠক-বর্গের অবিদিত নহে। পরে তিনি কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে ইংরাজি শিথিতে আরম্ভ করিলেন। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি এই কঠিন বৈদেশিক ভাষায় অল্পকালে এমন ব্যুৎপন্ন হইলেন, যে যাঁহারা আজীবন এই ভাষা এক্ষণে শিক্ষা করিতেছেন তাঁহাদিগকেও তাঁহার ব্যুৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ইংরাজি ভাষা স্বায়ত্ত করিয়া তিনি বাইবেল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, এবং ঈশার বিশুদ্ধ জীবনে ও ধর্ম্মোপদেশে মোহিত হইলেন। *

আমাদের জানিতে বড় ইচ্ছা হয়, কোন্ দিন কোন্ মুহূর্ত্তে রামমোহন সর্ব্ব প্রথমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন; কারণ সেই দিন, সেই মুহূর্ত্ত আমাদের জাতীয় ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হওয়া উচিত। বাইবেল অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের কথায় আমরা পাঠকবর্গকে জানাইতে ইচ্ছা করি। তিনি বলিয়াছেন † 'সত্যানু-সন্ধানে বহুদিন একাগ্রচিত্তে নিযুক্ত থাকিয়া পরিশেষে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে খ্রীষ্টের উপদেশ যেমন নৈতিক উন্নতির সহযোগী ও বুদ্ধিজীবী প্রাণীর পক্ষে উপযুক্ত তেমন আমার জানিত অন্য কোন ধর্ম্মই নহে।' সুতরাং এক্ষণে আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে বৈদিক ধর্ম্ম বল, আর যে কোন ধর্ম্মই বল, রামোহন রায়ের বিশ্বাস প্রধানতঃ বাইবেল-নিহিত উপদেশ দ্বারা গঠিত অথবা রূপান্তরিত হইয়াছিল। এস্থলে পাঠকবর্গ একটী মহাভ্রমে পতিত হইতে পারেন। তাঁহারা মহাত্মা রামমোহনের খ্রীষ্টীয় গ্রন্থের উপরে এই গাঢ় অনুরাগ দেখিয়া এমন বিবেচনা করিতে পারেন যে রামমোহন রায় একজন খ্রীষ্টান্ ছিলেন। এরূপ

* Miss Carpentor's Book.

† Ibid.

সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক হইবে। সত্য, তিনি দুই এক সময়ে আপনাকে খ্রীষ্টান্ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টান্ শব্দে সচরাচর আমরা যাহা বুঝি, রামমোহন রায়ের অর্থ তাহা নহে। ইউনিটেরিয়ান্ ব্যতীত যাবতীয় খ্রীষ্টান্ সম্প্রদায়ের তিনটী বিষয়ে গাঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, যথা—ঈশ্বরের তৃত্ব, আদিম পাপ, এবং ঈশার সাহায্য ব্যতীত মুক্তিলাভের অভাব। এই তিন মৌলিক বিষয়ে যাঁহার বিশ্বাসাভাব তাঁহাকে খ্রীষ্টানেরা আপনাদের ধর্ম্মান্তর্গত বলিতে কোন মতেই প্রস্তুত হইবেন না। অতএব এই বিশ্বাস-ত্রয়ে রামমোহন রায়ের মতামত জানা নিতান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরের তৃত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন 'আমি অনেক দিন হইতে আধুনিক হিন্দুধর্ম্মোপদিষ্ট বহু দেবতার অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে তদ্রূপ অপর এক উপদেশ গ্রহণ করিতে সক্ষম নহি। পরমাত্মা তিন ভাগে বিভক্ত একথা যদি বিশ্বাস করিতে হয় তবে বহু দেবতার উপাসনায়ও কোন দোষ নাই।' * আদিম পাপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ' আমি এই বিশ্বাসের এ পর্য্যন্ত কোন কারণই দেখিতে পাইলাম না।'† ঈশার সাহায্যে মুক্তিলাভ সম্বন্ধে বলিয়াছেন 'পাপের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় অনুতাপ।' ‡ সুতরাং খ্রীষ্টান্ শব্দে আমরা যাহা বুঝি, রামমোহন রায় সে দরের খ্রীষ্টান্ ছিলেন না। পাঠক-বর্গের জানা উচিত যে মিশনারিগণ যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, মহাত্মা রামমোহন তাহাকে নিতান্ত ঘৃণা করিতেন। 'এই সকল ধর্ম্মোপদেশকেরা যে ধর্ম্মের উপদেশ দেন, তাহা মুসলমান ধর্ম্মাপেক্ষা নিকৃষ্ট, এবং অনেক বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্মের তুল্য কুসংস্কার-পরিপূর্ণ।' কিন্তু মিশনারিদিগের ধর্ম্মে তাঁহার এইরূপ প্রগাঢ় বিরাগ সত্ত্বেও, ঈশা ও বাইবেলের উপরে তাঁহার অনুক্ষণ অচলা ভক্তি ছিল। আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে তাঁহার এই ভক্তিকে আমরা সকল সময়ে প্রশংসা করিতে সক্ষম নহি। তাঁহার মতে ঈশা পরমাত্মার অংশ নহেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহাকে যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর, অধিক কি স্বর্গীয় দূত (Angel) গণেরও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন। ঈশ্বর তাঁহাকে অমানুষিক ক্ষমতা দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল অতি-স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াছিলেন সে সমস্তই সত্য। তাঁহার পুনরুত্থান অবিশ্বাস-যোগ্য নহে; অধিক কি ঈশার জীবনের এই ঘটনাটী দেখিয়াই তিনি মৃত্যুর পরে তাঁহার নিজের অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া

* Miss Carpenter's Book.

† Ibid.

‡ Second Appeal (Probably in reply to Dr. Marshman.)

জানিতেন।* আমরা সরল চিত্তে স্বীকার করিতেছি আমরাও বাইবেল ও ঈশার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি, কিন্তু তথাপি এরূপ বিশ্বাসকে ভ্রমাত্মক না বলিয়া থাকিতে পারি না। কুমারী কার্পেণ্টার যে রামমোহন রায়কে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা নিতান্ত অযুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। উক্ত গ্রন্থ-কর্ত্রী প্রণীত জীবন-চরিত পাঠে আমাদের বোধ হয় যে সর্ব্ব-ধর্ম্মাপেক্ষা ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্মে রাম-মোহন রায়ের অধিক আস্থা ছিল। এতৎ-সম্বন্ধে পশ্চাতে আর কিছু বক্তব্য রহিল।

পাঠকবর্গের জানা উচিত যে রাম-মোহন রায়ের কার্য্যক্ষম জীবনের প্রথম-ভাগ প্রায় অর্থ-চিন্তাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাই বলিয়া কেহ যেন এমন বিবেচনা না করেন যে হিন্দুসমাজ-সংস্করণরূপ মহালক্ষ্য এই সময়ে তাঁহার দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইয়াছিল। যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের অগ্রে প্রথমে রণসজ্জা করেন, তদ্রূপ মহাত্মা রামমোহন, অচিরে তাঁহাকে যে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তাহার জন্য এই সময়ে আভ্যন্তরীণ বল সংগ্রহ করিতে-ছিলেন। অবশেষে তিনি ১৭৩৫ শকে † তাঁহার মহাব্রত সাধনার্থে রঙ্গপুর হইতে কার্য্যত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে দিন কলিকাতায় তিনি প্রবেশ করিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহাকে যুগপৎ দুই ভীষণ বৈরীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই দুই বৈরীর একজনের সংখ্যা অগণ্য; অপরের সংখ্যা স্বল্প, কিন্তু ক্ষমতা বিস্তর; একজন মূর্খতায়, অন্য জন জ্ঞানাধিক্যে দুর্দ্ধর্ষ; এবং গোঁড়ামিতে দুইজনেই সমান। এই দুই বৈরীর নাম হিন্দু ও খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম। রামমোহন রায় উভয় শত্রুকেই তাহাদের আপনার আপনার অস্ত্র দ্বারা নিরস্ত করিতে লাগিলেন। বৈদিক শাস্ত্র দ্বারা তিনি হিন্দুদিগকে দেখাইতে লাগিলেন যে তাঁহারা এক্ষণে যে ধর্ম্মানু-সারে দেবার্চ্চনা করেন সে ধর্ম্ম কাল্পনিক ও অসত্য,—তাহাকে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না। এবং বাইবেলের সাহায্য লইয়া মিশনারিদিগকে দেখা-ইতে লাগিলেন যে তাঁহারা যে ধর্ম্মের প্রচার করেন তাহা যথার্থতঃ খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্ম্ম নহে—তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রকৃত নাম পেগান বা পৌত্তলিক ধর্ম্ম। এইরূপে তিনি তর্ক বিতর্কে ও পুস্তক প্রচারে অনুক্ষণ ব্যস্ত রহিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ভবনে আত্মীয় সভা নামে এক সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই সভায় রাজা সবন্ধু বান্ধবে নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরার্চ্চনা করিতেন। ক্রমে তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

* Miss Carpenter's Book.

† এই স্থলের অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে সংগৃহীত।

অনেক কপট ব্যক্তিও রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার সভায় আসিয়া দেবার্চ্চনার নিন্দা ও ব্রহ্মোপাসনার গুণ কীর্ত্তন করিত। যথার্থ ভক্ত শিষ্যবর্গের মধ্যে আমরা দুইজনের নাম প্রায়ই দেখিতে পাই—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব। এই দুই ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে আমাদের বড় ইচ্ছা* হয়। চন্দ্রশেখর দেব সম্প্রতি অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। তারাচাঁদ সম্বন্ধে

* তারাচাঁদ ও রামমোহন সম্বন্ধে একটী বড় কৌতুকাবহ গল্প আছে। রাজার সাংসারিক ভোগসুখের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রতিদিন তৈলকার গৃহ হইতে এক ছটাক টাট্‌কা তৈল আনাইয়া তাহা ভালরূপে গাত্রে মর্দ্দন করিতেন; পরে বড় বড় টবে কা শীতল জলে গিয়া পড়িতেন। স্নান করিতে অনেক ক্ষণ লাগিত। এই সময়ে তিনি গীত রচনা করিতেন ও তাহা উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেন। স্নানান্তে তাঁহার সুদীর্ঘ কেশ বিন্যাস করিতে বসিতেন, তাহাতে অনেক সময় যাইত। অনন্তর প্রতিদিন বন্ধুবর্গের সহিত সমাংস অন্ন গ্রহণ করিতেন। মাংস নহিলে রাজার আহারের সুবিধা হইত না। একদিন এইরূপ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পাচক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিয়া গেল। রাম-মোহন তখনও কেশ বিন্যাস করিতে-ছেন। রাজা আহারে বসিতেছেন না, সুতরাং সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন এবং ওদিকে অন্ন ব্যঞ্জন শীতল হইয়া যাইতেছে। তারাচাঁদের তাহা গায় সহিল না। রাজার অপেক্ষা তাঁহার বয়স অনেক অল্প, সুতরাং রাজার সহিত তাঁহার রহস্য ভাল দেখায় না। কিন্তু তারাচাঁদ একটু ঠোঁটকাটা দরের লোক ছিলেন। রাজা কেশ বিন্যাস করিতেছেন এবং তিনি তাঁহার পশ্চাতে যাইয়া মৃদুস্বরে অথচ সকলে শুনিতে পায় এমন করিয়া ধীরে ধীরে আপনা আপনি বলিলেন,—"মহাশয়! একটা কথা বল্‌ছিলেম, সেই যে একবার একটা গীত রচনা করিয়াছিলেন 'দর্পণেতে মুখ আর কতই দেখিবে মন ইত্যাদি' তা সেটা কি শুধু পরের জন্যই হইয়া-ছিল?" অমনি চারিদিক্ হইতে হাস্য-ধ্বনি উঠিল। রাজা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন 'হাঁ হাঁ তারাচাঁদ, সত্য আজ বড় বিলম্ব হয়েছে, বড় বিলম্ব হয়েছে।' এই বলিয়া রামমোহন দর্পণের সম্মুখ হইতে উঠিলেন ও সকলের আহার আরম্ভ হইল। আমাদের বোধ হয় এই দিন হইতে রামমোহন তারা-চাঁদ কাছে থাকিলে মনের সাধে কেশ বিন্যাস করিতে পারিতেন না। আমরা এই গল্পটী কোন শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মের মুখে শুনিয়াছি। ইহাঁর পিতা রাম-মোহনের একজন শিষ্য ছিলেন, এবং বাল্যকালে তিনি স্বয়ং রামমোহনকে দেখিয়াছেন।

এই মাত্র জানি যে তিনি কবে মরিয়াছেন এবং কখন কি করিয়াছিলেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। এই দুই ব্যক্তিকে রীতিমত ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপনের মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়। ইতিপূর্ব্বে রামমোহন খ্রীষ্টীয় বৈরীর বক্ষে এক মহা শস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি তৎকাল-প্রসিদ্ধ প্রটেস্‌টাণ্ট মিশনারি এডাম্ সাহেবকে তর্কে পরাভূত করিয়া স্বধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। এডাম্ সাহেব ১৭৪৯ শকে সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যাকালে হরকরা-কার্য্যালয়ে ব্রহ্মোপদেশ দিতেন। একদিন রামমোহন বন্ধুবর্গের সহিত এইস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর ও তারাচাঁদ উল্লেখ করিলেন যে ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত যদি একটী সমাজ-গৃহ নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে আর বিজাতীয়দিগের দ্বারে যাইতে হয় না। ১৭৫১ শকে যোড়াশাঁকোস্থিত সমাজ-গৃহ নির্ম্মিত হইয়া প্রসিদ্ধ ১১ই মাঘ তারিখে উপাসনা আরম্ভ হয়।

উল্লিখিত হইয়াছে যে বাইবেল ও ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্মের উপরে রামমোহনের প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি ছিল; কিন্তু ১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে উপাসনা-কার্য্যে কিছুতেই এই অনুরাগ লক্ষিত হয় নাই। আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে বৈদিক শাস্ত্রাপেক্ষা বাইবেলের উপরে রামমোহনের অধিক ভক্তি ছিল, অথচ সমাজের উপাসনা-কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বৈদিক ভিত্তির উপরে সংগঠিত হইল ইহার তাৎপর্য্য কি? আমরা কুমারী কার্পেণ্টার-রচিত রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত পাঠে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইয়াছি। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি বাইবেলের উপরে রামমোহনের গভীর বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এই গভীর বিশ্বাস সত্বেও তিনি এ কথা মানিতেন না যে বাইবেল নহিলে মনুষ্যের পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। তিনি যে ধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন তাহা বাইবেলে আছে, বৈদিক শাস্ত্রে আছে, কোরাণে আছে, মনুষ্য-বুদ্ধিতে আছে। তন্মধ্যে বাইবেলে ও মনুষ্য-বুদ্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। যিনি এই কথা না বুঝিয়াছেন তিনি রামমোহন রায়ের ধর্ম্মের মধ্যে সুন্দররূপে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। রামমোহন হার্বাড্ কালেজের ডাক্তার ওয়ারকে যে এক পত্র লেখেন তাহাতে এই প্রশ্নের এক প্রকার চূড়ান্ত হইয়াছে। উক্ত ডাক্তার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে ভারতবাসীদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে আনয়ন করা উচিত কি না। রামমোহন ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২ রা ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রত্যুত্তরে কলিকাতা হইতে লিখিলেন 'আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আমি তাহার উত্তর দিতেছি না। আমি বুদ্ধির দ্বারা এই স্থির করিয়াছি, এবং

বাইবেলেও একথা লিখিত আছে যে, যে কোন জাতীয় লোক হউক্ না কেন, যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন এবং সৎকার্য্য করেন তিনিই তাঁহার প্রিয়।'* ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্ম তাঁহার প্রিয় ধর্ম্ম ছিল বটে, কিন্তু সকলকেই যে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে একথা তিনি কখন মানিতেন না। বিলাতে গিয়া তিনি এক ইউনিটেরিয়ান্ সভায় বলিয়াছিলেন আপনারা যাহা যাহা বিশ্বাস করেন, আমিও প্রায় সেই সমস্ত বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু আমি আমার আপনার শান্তি ও উদ্ধারের জন্য এরূপ করিয়া থাকি।'† এস্থলে 'আমার আপনার' এই কথা দুইটীর গূঢ় অর্থ সুবুদ্ধি পাঠককে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অতএব ইহা একরূপ প্রতিপন্ন হইল যে রামমোহন স্বয়ং ইউনিটেরিয়ান্ হইয়াও কখন এরূপ বিশ্বাস করিতেন না যে ধর্ম্ম-বিশেষের অন্তর্গত না হইলে মনুষ্যের পারত্রিক মঙ্গল সম্ভবপর নহে। তাঁহার মতে পরিত্রাণ-পথ এত সংকীর্ণ নহে, যে উহার উপলব্ধির জন্য হিন্দু কি খ্রীষ্টান্ কি মুসলমান কি অন্য কোন ধর্ম্ম-বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক। যে কেহ অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মকে ভয় করেন তিনিই সাধু। রামমোহন তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে এই সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষা দিবার জন্য বৈদিক শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হিন্দু সমাজের ধর্ম্ম-সংস্করণার্থে তিনি এই পন্থা অবলম্বন করিলেন কেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথম কারণ বৈদিক শাস্ত্রের উপরে তাঁহার কোন অনাস্থা ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এতদ্দ্বারা যেমন হিন্দুদিগের পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা, অন্য কোন তর্কে বা যুক্তিতে সেরূপ সম্ভাবনা নাই। অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে এই পন্থা অবলম্বন করিয়া তিনি যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি আমাদের স্বল্প বুদ্ধিতে এক এক বার বোধ হয় এই পন্থা নিতান্ত ভ্রমশূন্য নহে। যদি বৈদিক শাস্ত্রকেই হিন্দুদিগের একমাত্র প্রামাণিক ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত সমুদায় গ্রন্থকে সমান সম্মান করা উচিত। আমরা আপন ইচ্ছামত এক অংশ ত্যাগ এবং অন্য অংশ গ্রহণ করিলে বৈদিক ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রামাণিকতা রহিল কোথায়? কিন্তু তাহা হইলে বৈদিক শাস্ত্রমতে নিরাকার অনাদি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দেবতা উপাস্য নহে একথা কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায় আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা এই প্রবন্ধ রচনা করিতেছি এবং আমাদের সম্মুখে এক খণ্ড ঋগ্বেদ সংহিতা পড়িয়া রহিয়াছে। সংহিতা খানি খুলিবামাত্র প্রথম সূক্তের সপ্তম ঋক্

* Miss Carpenter's Book.

† Ibid.

আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িল "উপত্বাগ্নে দিবে দিবে ইঃ" 'হে অগ্নি রাত্রি দিন বুদ্ধি পূর্ব্বক নমস্কার করত তোমার নিকটে আমরা প্রত্যহ আগমন করিয়া থাকি।' পরে দেখিলাম যে দ্বিতীয় সূক্তের প্রথম ঋকে বায়ু দেবতার উদ্দেশে লিখিত রহিয়াছে "বায়বায়াহি দর্শতে মে ইঃ' 'হে শোভনীয় বায়ুদেব এই যজ্ঞে তুমি আগমন কর।' এই-রূপে ক্রমে ক্রমে দেখিলাম যে এই সংহিতায় অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দিক্‌পালগণ অর্চ্চিত হইয়াছেন। অতএব বৈদিক শাস্ত্র যদি প্রামাণিক হয় তবে ঋগ্বেদও অবশ্য প্রামাণিক, এবং ঋগ্বেদ যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অবশ্য পূজনীয়। কিন্তু তাহা হইলে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মো-পাসনারূপ ধর্ম্ম রহিল কোথায়? আমাদের বোধ হয় যে রামমোহন রায়ের শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই আপত্তি বুঝিয়াছিলেন; কারণ তত্ত্ববোধিনী * পত্রিকার ঋগ্বেদ-অনুবাদক এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে 'আমাদিগের উপরে ঈশ্বরের করুণা দেখাইবার জন্য ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের উপাসনা বেদে বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্যের অন্তর্যামী যে কোন দেবতা তিনি সূর্য্য-দেবতা; বায়ুর অন্তর্যামী যে কোন দেবতা তিনি বায়ু দেবতাই ত্যাদি। কিন্তু বৈদিকেরা এতদ্দ্বারা বাহ্য জড় সূর্য্য বায়ু প্রভৃতির উপাসনা না করিয়া তাহাদের অন্তর্যামী যে চৈতন্য পুরুষ তাঁহারই উপাসনা করেন।' সুবিজ্ঞ অনুবাদকের এই তর্ক আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। স্থানাভাব না হইলে আমরা প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইতাম যে পূর্ব্বে যে সকল ঋকের উল্লেখ করা হইল তৎ-সমুদায় দ্বারা বস্তুতই ইন্দ্র সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের উপাসনা করা হইয়া-ছে। কিন্তু ক্রমে আমাদের স্থান সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, অতএব আমরা এই স্থলেই প্রবন্ধ সমষ্টির চেষ্টা করিলাম। মহাত্মা রামমোহন যে ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন তাহার প্রকৃত নাম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরার্চ্চনা যেমন করিয়া কর না কেন তুমি নিশ্চয়ই সাধুসমাজ-গণ্য হইবে। এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের এই এক মোহিনী মূর্ত্তি যে ইহাতে মনুষ্যবুদ্ধি অতি উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ধর্ম্মে মনুষ্য-বুদ্ধির গৌরব দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই আমরা একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া থাকি। ভরসা করি এই সনাতন ধর্ম্মের গুণে বঙ্গবাসীর গৃহে অমৃত ফল ফলিবে—এই সনাতন-ধর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গীয় সমাজ হইতে দেব-দেবীর অর্চ্চনারূপ কলঙ্ক চিরদিনের জন্য দূরীকৃত হইবে।

শ্রী————মিত্র।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৬৯ শক।

সমর শেখর।

নবম পরিচ্ছেদ।

" Black spirits and white,
Red spirits and grey;
Mingle, mingle, mingle
You that mingle may "

MACBETH.

শশিশেখরের বাটীর এক নিভৃত কক্ষ-মধ্যে এক শয্যা-পার্শ্বে গিরিবালা উপবিষ্ট রহিয়াছে; শয্যায় একটী রুগ্ন যুবা পুরুষ নিশ্চেষ্ট ভাবে শয়ান। যুবকের সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ; বদন প্রভাত-চন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ; নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত, স্থির ও সজীবতাহীন; ভ্রূযুগ ঈষৎ কুঞ্চিত, যেন অন্তরাত্মার কোন দুঃসহ যাতনা নীরবে প্রকাশ করিতেছে। দুঃসহ যাতনা! আন্তরিক না বাহ্যিক? শরীর ও আত্মা এতদুভয়ের যথার্থ সহানুভূতি আছে। একের সুখে অন্য হাঁসে,—একজন কাঁদিলে অন্যজন কাঁদে। উভয়ের অতিশয় একতা—অতিশয় সদ্ভাব। শরীর বিষম আহত হইল,—আত্মা তাহাতে ব্যথিত, কত কাঁদিল—কত উদ্বিগ্ন হইল; কিসে বেদনা আরাম হয়—কিসে যাতনার শমতা হয়,—এই চিন্তায় অহর্নিশ উৎকণ্ঠিত। যখন যাতনার শমতায় শরীর শান্ত হইল,—দেখিয়া আত্মাও শীতল হইল—আনন্দে হাস্য করিল। তদ্রূপ আত্মাও আঘাতপ্রাপ্ত হইলে শরীর ম্লান হয়—চিন্তায় শুষ্ক হইয়া যায়। আত্মা আনন্দিত হইলে শরীর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এইরূপ শরীর ও আত্মা উভয়ে এক অভিন্ন সহানুভূতি-সূত্রে দৃঢ়-সংবদ্ধ। তবে কি আমাদের যুবকের অন্তরাত্মা কোন বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে? ঐ যে গিরিবালা যুবকের কক্ষদেশে অজস্র বারি-সেচন করিতেছে। ঐ দেখ কি বীভৎস!—জঘন্য ক্ষত! কক্ষদেশ একবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন!! ক্ষত-স্থানের উপরিভাগে একটী বন্ধনি দৃঢ় সংলগ্ন। আবার ও কি?—শোণিত! পরিধেয় বস্ত্র ও শয্যাবরণি যে সমস্তই রক্তাপ্লুত! বন্ধনি ভেদ করিয়া শোণিত-ধারা উদ্গত হইতে লাগিল। গিরিবালা পার্শ্বস্থ পাত্র হইতে বারি লইয়া অঞ্জলিদ্বারা ঘন ঘন সেচন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে তাহার তাম্রেক্ষণ হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া প্রত্যেক অঞ্জলিকেই কিয়দংশে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

"ওহ! হতাশা! আর কতক্ষণ তোর

দুর্ভেদ্য লৌহময় শৃঙ্খলে রুদ্ধ করিয়া রাখিবি? পরিত্যাগ কর্। অনেকক্ষণ হইয়াছে—আর নয়। একবার পরিত্যাগ কর,—এ ঘোর যাতনা হইতে মুক্ত হই;—হৃদয় শান্ত হউক। উঃ রক্তবেগ যে ক্রমেই বাড়িতে লাগিল! আর কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে! আঃ! এত রক্তও শরীরে ছিল, যে, ক্রমাগত দুই প্রহর ধরিয়া সমভাবে বহির্গত হইতেছে! আর শরীরে কি আছে? সর্ব্বাঙ্গ নীলিমায় পরিপূর্ণ হইতেছে! কি হইবে কিছুই বুঝিতে পারি না। জগদীশ্বর! পুরোপকারীর কি এই প্রকার পুরস্কার? পরের হিতসাধনে যাঁহার অন্তঃকরণ সদা বিব্রত, বিপন্নের উদ্ধার-সাধন যাঁহার একমাত্র বীজমন্ত্র, সেইরূপ সর্ব্বহিতৈষী মহাত্মার এরূপ দুরবস্থা? জগতে যেন আর কেহ তবে পরের উপকার না করে।" গিরিবালা সাশ্রুনয়নে ঘন ঘন জলসেক করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যুবকের আকৃতিতে অকস্মাৎ পূর্ব্বভাবের সম্পূর্ণ বিকার ঘটিল। রক্তক্ষরণ ক্রমে থামিয়া আসিল; সর্ব্বাঙ্গে সজীবতা দৃষ্ট হইল—যুবক চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। গিরিবালার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল, "বুঝি বিধাতা এতক্ষণে অনুকূল হইলেন। রোগের অনেক উপশম লক্ষিত হইতেছে।" গিরিবালা! ইহা তোমার বুঝিবার ভ্রম। নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপের শেষ উজ্জ্বলতা মাত্র। ঐ দেখ কি সর্ব্বনাশ ঘটিল! যুবকের আপাদ-মস্তক সর্ব্বশরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; ক্রমে হস্তপদাদি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কঠিন হইয়া আসিল; দন্তে দন্ত ঘর্ষিত ও নিশ্বাস ঘনায়ত হইতে লাগিল; নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উর্দ্ধভাগে ধাবিত হইল;—যুবক এক বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। গিরিবালা হতাশ ও বিপন্ন স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। যুবকের আর্ত্তনাদ এক পরিচারিকার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; সে তদনুসন্ধানে মন্দ মন্দ পদে আসিতেছিল, কিন্তু আবার গিরিবালার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে আসিয়া বিপন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে?—কি হইয়াছে?" "আর কি হইবে,—সর্ব্বনাশের উপক্রম হইতেছে। তুমি শীঘ্র দেখ পিতা ওঝাকে লইয়া কতদূর আসিতেছেন।" "দেখি," বলিয়া দাসী সোৎকণ্ঠে শীঘ্র ধাবিত হইল। "হা বিধাতঃ! হতভাগিনীকে কি চিরকালের জন্য হতাশা-সাগরে নিক্ষেপ করিলেন?" গিরিবালা অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই শশিশেখর একজন চিকিৎসক সমভিব্যাহারে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সরলা বালিকা পিতাকে দেখিবামাত্র রোদন করিয়া উঠিলেন। "কেন, মা, ভয় কি? ইনি মন্ত্র দ্বারা এখনি সকল রোগকে দূরীকৃত করিবেন" শশিশেখর গিরিবালাকে শান্ত

করিলেন এবং চিকিৎসককে নিকটে আনিয়া সতীশের ক্ষতস্থান দেখাইয়া দিলেন। চিকিৎসক সতীশের সর্ব্বাঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন অকস্মাৎ তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইল, তাঁহার বক্ষঃস্থল ঘন ঘন স্ফীত হইতে লাগিল।—কি জানি, তাঁহার হৃদয় সহসা কিসে ব্যথিত হইল! তিনি গোপনে অশ্রুসম্বরণ করিয়া সতীশের নয়নদ্বয়ে শীতল বারিসেচন করিতে বিধান দিয়া অনন্যমনে সর্ব্বরোগাপ-হারক মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন।

"কালিকা, করালী, কালান্তকারিণি,
করাল-কৃপাণ খর্পর-ধারিণি,
কামাখ্যা, কামদা, যোগিনী যোগধ্যা,
যোগিনি, ডাকিনি, প্রেতিনি, শংখিনি,
কালভয়হরী, কাললয়ঙ্করী,
কালকূটকণ্ঠ-কালসহচরী,
কালিকা, নমামি, কালান্তকারিণি,
করাল-কৃপাণ-খর্পর-ধারিণি।
উর ত্বরা করি, সহ সহচরী,—
কাললয়ঙ্করি,—কালভয়হরি,
উর, উর, উর,—কালভয় হর,
করাল-কিঙ্করী সহিত বিহর,
উর শিরোপরি, রুদ্র-সহচরি!
উর, উর, মাতঃ! উর ত্বরা করি;
নমামি কালিকা, কালান্ত-কারিণি,
কালকূট-কণ্ঠ-বক্ষ-বিহারিণি।
ডাক, মা! ডাকিনী,ডাক, মা! শংখিনী,
প্রেতিনী, যোগিনী, যক্ষিনী, নাগিনী,
ডাক পঞ্চভূতে, স্কন্ধহীন ভূতে,
অনল, অনিলে, আকাশে, সলিলে,
ডাক চন্দ্রসূর্য্যে, গ্রহতারা-দলে;
ছাড় যোগবল,—করুক চঞ্চল—
আকাশের মেঘ, জলধির জল,
ভীম কড়মড়ি, গগন বিদারি
চলসৌদামিনি সজোরে উপাড়ি,
ছিড়ি রসাতল, ভুজঙ্গিনী-দল
দাঁতেতে কামড়ি, নখাঘাতে ছিঁড়ি,
টানি ভীম বলে করুক চঞ্চল,
উগারিয়া বিষ—কাল হলাহল,
ঢাকুক আকাশ, ঢাকুক পাতাল।
বাজুক ডমরু ডাকিনীর করে
বাজুক সজোরে ডিম্ ডিম্ স্বরে
গা'ক জলনিধি—কাল জলধর,
নাচুক আমোদে প্রেতিনী নিকর,—
উদ্ধফণা করি কাল বিষধর,
নাচুক যোগিনী, নাচুক নাগিনী;
নাচরে যক্ষিণি—শংখিনি—ডাকিনি,
উলাঙ্গিনী-বেশে নাচ মুক্তকেশে,—
হা হা হা হা হা হা বিকটাট্ট হেসে;
কাঁপুক মেদিনী, কাঁপুক দামিনী;
আন দুষ্টজনে সজোরেতে টানি,
দাঁতেতে কামড়ি নখাঘাতে ছিঁড়ি,
টান-টান-টান নাকে দিয়ে দড়ি;
ছাড়, বেটা! ছাড়, দুষ্ট অভিলাষ,
টানিয়া প্রেতিনী হাড়, রক্ত-মাস,
দাঁতেতে কামড়ি নখাঘাতে ছিঁড়ি
খা'ক হাত পায় পেট নাড়ি ভুঁড়ি;
ছাড়, বেটা! ছাড় দুষ্ট অভিপ্রায়,
সতীশের ঘা শুকুক ত্বরায়॥"

এ চীকিৎসক কে? মন্ত্রপাঠ করিতে

করিতে কেনই বা তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল? কেনই বা সতীশের আরোগ্য বিধানের জন্য সে এত যত্ন করিল? কে বলিতে পারে, কি জন্য তাহার বক্ষঃস্থল ঘন ঘন স্ফীত হইতেছিল? তবে কি এ ব্যক্তি সতীশের কোন আত্মীয়?

চিকিৎসক ধীরে ধীরে শশিশেখরের বাটীর বাহিরে আসিয়া অশ্রু জল মোচন করিয়া অবিষাদে মনে মনে কহিল "হা বিধাতঃ! আর কতদিন এ যন্ত্রণা ভোগ করিব? সতীশের এ দুরবস্থা যে আর দেখিতে পারি না।"

গিরিবালা মন্ত্রের বীভৎস বর্ণন শুনিয়া কম্পিতহৃদয়ে স্বীয় পিতৃসন্নিধানে সরিয়া বসিলেন এবং বিস্ময়প্রসারিত নয়নে এক একবার চিকিৎসকের শ্বেত-শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চিকিৎসক উপর্য্যুক্ত মন্ত্র বারত্রয় জপ করিলেন এবং একপ্রকার চূর্ণ শশিশেখরের হস্তে দিয়া কহিলেন "এই ঔষধ গ্রহণ করুন্; ক্ষণকাল পরেই সতীশ যখন চৈতন্যলাভ করিবেন ইহার ষষ্ঠাংশ লইয়া তাম্বূলরসে সিক্ত করিয়া উহাঁকে পান করাইবেন এবং অপর পঞ্চাংশ আগামী পঞ্চ উষাকালে সেবন করাইবেন, আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম।"

সতীশ যে কি প্রকারে এরূপ বিষম আহত হইয়াছেন, তাহার প্রকৃত কারণ তিনি ভিন্ন আর কেহই জানিত না। সেই দিন রজনীযোগে যখন তিনি পান্থশালা হইতে সমরের সহিত অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন; কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন এমন সময় দূর হইতে কাহার করুণ আর্ত্তস্বর তাঁহাদের শ্রবণগোচর হইল; "ভ্রাতঃ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। দুরাচার রমেশ কতিপয় দস্যুসমভিব্যাহারে শশিশেখরকে আক্রমণ করিয়াছে। কুমার! যথাশক্তি অশ্বকে দ্রুতবেগে চালিত করে।" সমর সতীশকে ইঙ্গিত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তুরঙ্গমকে তদ্দিকে তাড়িত করিলেন। ক্ষণেক মধ্যেই উভয়েই সেই ভীষণ রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কয়েকজন কালদর্শন ভীমাকার দস্যু বৃদ্ধ শশিশেখরকে বেষ্টন করিয়া নিজ নিজ করাল যষ্টি উন্নত করতঃ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতেছে। "কুমার! তুমি রাক্ষসদিগের যথোচিত শাস্তিবিধান কর, আমি উহাঁকে অগ্রে নিরাপদ করিতেছি। এই বলিয়া সমর সলম্ফে ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভয়ার্ত্ত শশিশেখরকে তদুপরি আরোহিত করিলেন, এবং স্বয়ং পুনরারূঢ় হইয়া তাড়িত বেগে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এদিকে সতীশ স্বীয় ভীষণ তরবারিসাহায্যে দুষ্ট দস্যুদিগের এই পৈশাচিক আচরণের বিলক্ষণ প্রতিফল প্রদান করিয়া প্রত্যাগমনেচ্ছায় যেমন অশ্ব ফিরাইবেন অমনি তাঁহার কক্ষদেশে অকস্মাৎ এক দারুণ বেদনা অনুভূত হইল, ফিরিয়া দেখিলেন একব্যক্তি দীর্ঘশূল ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল; দেখিবামাত্র সেই নরপিশাচকে চিনিতে পারিলেন।

আর্য্যসঙ্গীত। *

জাতীয় নিগ্রহ।

কাব্য।

তৃতীয় খণ্ড।

অষ্টাদশ সর্গ।

নীরব প্রকৃতি, বিশ্ব গভীর তন্ময়! ভয়-বিস্ময়-বিভ্রান্তচিত্ত ভারত-নন্দন,
দেখিল মানসনেত্রে, হত্যাভূমি কুরুক্ষেত্রে,
আর্য্যরক্ত-তরঙ্গিণী বহে খর স্রোতে; তাহে, ভেসে যায় আর্য্যদের জাতীয় জীবন।

২

কালপ্রবাহেতে এই আর্য্যের অদৃষ্টতরী উজানে বহিতেছিল অনুকূল বায়
প্রতিকূল স্রোতোমুখে, ভাঁটাল, ঘটনাপাকে
পড়িয়া দাঁড়াল কভু, পুনর্ব্বার স্রোতাধিক্যে তর তর বেগে তরী অধঃপথে ধায়।

৩

নিম্ন হ'তে নিম্নতর নামিতে নামিতে ক্রমে কিরূপে অতলে মগ্ন আর্য্যের নিয়তি
সেই কথা সবিস্তারে, জিজ্ঞাসি গিরীন্দ্রবরে,
এইরূপ চিন্তি চিত্তে ভারত-সন্তান পুনঃ সম্ভাষি সম্ভ্রমে করে হিমালয়ে স্তুতি।

৪

"অহো তাত মহাকায় শৈলেশ বীরেশ প্রভো! অশেষ গুণের নিধি প্রেমের আধার
প্রকৃতির রাজা তুমি, দেব! তব ক্রীড়াভূমি
বিশাল আসিয়া খণ্ড, অতুল প্রকৃতি-রত্নে বিভূষিতা যেই সেই, চরণে তোমার।

৫

তব বিশ্ব-প্রেমিকতা কে বর্ণিতে পারে? প্রভো! তবগুণে প্রকৃতির অতুল উন্নতি,
তোমার প্রেমাশ্রুপাতে বহিতেছে খরস্রোতে
সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি মর্ত্তে বিখ্যাত বিশাল অতি পূত স্রোতস্বতী।

৬

বিগত প্রলয় জলপ্লাবনে যখন প্রভো! বহু সহস্রাব্দ জলে ছিলে নিমগন,
পৃথ্বীর সর্ব্বোচ্চভাগে, তুমিই জাগিলে আগে,

---

* ১ম ও ২য় খণ্ড (আর্য্য-সঙ্গীত দ্রৌপদী নিগ্রহ) স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে।

তোমার শ্রীঅঙ্গ ধৌত কুসুম চন্দনে, সর্ব্ব প্রথমে এ আর্য্যাবর্ত্ত হইল সৃজন,

৭

এই সে কারণে তুমি প্রকৃতির আদি প্রভো! আর্য্যদের বিশেষতঃ আশ্রয় মহান্,
তব অত্যুন্নত ক্রোড়ে, আর্য্যভাগ্য ক্রীড়া ক'রে,
কিরূপে ক্রমশঃ মগ্ন দক্ষিণ সাগর—ঘোর অতলস্পর্শেতে? তাই কহ ভগবান্?

৮

যে পথে আর্য্যের সেই অদৃষ্ট-তরণী, প্রভো! গেছে অধঃপাতে তাহা কর প্রদর্শন,
সেই পথে যায় সবে, অধঃপাত হয় হবে,
অদৃষ্টের সঙ্গে তথা হয় যদি দেখা, তবে অবশ্যই উদ্ধারিব জাতীয় জীবন।"

৯

এতেক কহিয়া ধীর হইলা নীরব, দেখ সহস্র প্রকৃতি স্বর্গ সৌন্দর্য্যে ভাসিল,
সহসা গগনে যেন নব ঘন গরজন,
শব্দ সুগম্ভীর, তাহে মধুর শীতল প্রভা স্বর্গীয় অমৃতময়ী বিদ্যুৎ হাসিল।

১০

বহে স্বর্গগন্ধবহ সুরভি অমৃত রেণু অপ্সরা-সুকণ্ঠগীতি, বীণাবেণু তান,
গিরি তরঙ্গিণীচয়, সহসা উজানে বয়,
বিরাট অক্ষয় শান্তি প্রস্রবণ শৈলরাজ সম্বোধি গম্ভীরে কহে "ভারত সন্তান!"

১১

আর্য্যের নিয়তি-সূত্র ধরি মোর বাক্য পথে চল, চল, পুত্র! অদৃষ্টের পাবে দরশন,
স্বজাতি-বৎসল তুমি—তব প্রতি প্রীত আমি,
অবশ্য লঙ্ঘিবে তুমি দুর্ভাগ্য জলধি তবে শুন বলি অতঃপর ঘটিল যেমন।

১২

মহাযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে ভারতের বীরবৃন্দ করিলে শয়ন, হল শান্তির উদয়,
আত্মহত্যা করিবারে, কিরূপ অকুতোভয়ে,
মহারণে বীরবৃন্দ প্রকাশি বিক্রম, সবে তৃণবৎ ত্যজে গেল সংসার-আলয়।

১৩

আপনা বধের পাপ-অগ্নিতে কিরূপে নিজ বাহুবল গর্ব্বাহুতি দিল আর্য্যগণ।
মনুষ্যের বাহুবলে, কিরূপ কুফল ফলে,
বাহুবল কতদূর পায় পরিণতি তাহা স্বচক্ষে দেখিল ক্ষুব্ধ আর্য্যের নন্দন।

১৪

কুরুক্ষেত্রে শবারণ্যে শরশয্যা-শায়ী ভীষ্ম কহিলা যে শান্তি-কথা শুনিল সংসার
গোবিন্দ কহিলা যোগ, "শান্তি-হীন ইহলোক
ধন, জন, বাহুবল ব্যর্থ সমুদয়! শুদ্ধ পরলোক-সুখমাত্র স্থায়ী সত্য সার।"

১৫

শান্তি শান্তি শান্তিরবে পূরিল সংসার, আহা! শান্তি কি পদার্থ শান্তি কোথা গেলে পাব?
কে আছে এমন জন, করে পথ প্রদর্শন?
ধন, জন, বাহুবল, ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ সুখ, অশান্তি নিদান—তবে কোথা সুখী হব?

১৬

ছাড় ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্র শস্ত্রব্যবসায়, ছাড় ইহলোক মায়া মোহ রাজ্যধন জন,
চলহ সংসার ছেড়ে, সংসার সমুদ্র পারে,
আছে সুখ-শান্তি-পূর্ণ স্বর্গ প্রাণারাম, এস এই পথে মহাযাত্রা করি ভ্রাতৃগণ!"

১৭

এই শিক্ষা দিয়া পৃথ্বীপতি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ ভার্য্যাদি স্বগণ সহ গেল শান্তিপুরে।
শান্তির কারণে সবে, ব্যাকুল হইল ভবে,
ভূদেব ব্রাহ্মণগণ শান্তিরাজ্যে নেতা, তারা কহিল "আমরা পথ দেখাব সবারে

১৮

"এই দেখ বেদ বিধি মুক্তির মহৎ মন্ত্র আমাদের হাতে, মোরা ধর্ম্ম-অবতার।
যা করে ব্রাহ্মণগণ ভক্তি ভাবে তাই শুন।
বেদব্রহ্মে তোমাদের নাই অধিকার, শুদ্ধ আমাদের কথা শুনে পাইবে নিস্তার।"

১৯

যা চাহে সংসার তার শিক্ষক ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মমায়া কি অদ্ভুত বস্তু জানে বিজ্ঞ জন,
ব্রাহ্মণ্য-কুহকে পড়ে, বেদের দুশ্ছেদ্য ডোরে,
বিবদ্ধ সংসার, ডাকে ত্রাহি ত্রাহি রবে। ক্রমে এমনি ব্রাহ্মণ্য কাল হইল তখন।

২০

সকলে সমস্ত-ত্যাগী মুক্তি-আশে ব্রাহ্মণের চরণে বিক্রীত, তবু না পায় অন্তর।
ভূদেব ব্রাহ্মণগণে বসাইয়া শীর্ষস্থানে
পুষ্পাঞ্জলি দাও পদে হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া, তবু না পাইবে তাঁহাদের বেদের গুমর।

২১

বেদ ধর্ম্ম, বেদ অর্থ, বেদ মোক্ষকাম, হেন বেদেতে বঞ্চিত করি শূদ্র সাধারণে,
স্বার্থের সেবার তরে, কল্পনায় মানবেরে,

আচ্ছন্ন করিয়া, ক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ধ্বজা বহুশত বর্ষ উড়ে সংসার-গগনে।

২২

স্বার্থের সঙ্কীর্ণ পথে ব্রাহ্মণ্য জ্ঞানের স্রোতঃ সীমাবদ্ধ হ'ল, ক্রমে প্রকৃত তত্ত্বেতে
অশ্রদ্ধা করিয়া সবে, প্রভুত্ব-সাগরে ডুবে—
বিকৃত করিল সত্য সরল স্বর্গীয় পথে, অমৃত মন্থনে বিষ উঠিল ভারতে!

২৩

কাল্পনিক আড়ম্বরে মাতায়ে সংসারে ক্রমে ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আচরে সকলে,
বৈষম্যে বিরুদ্ধ ভাবে শূদ্রগণ ত্রাহি রবে
করে আর্ত্তনাদ! ক্রমে প্রকৃতির প্রিয় পুত্র সাম্য অবতার বুদ্ধ উদয় ভূতলে,

২৪

দয়ার সাগর বীর প্রকৃত যোদ্ধার বেশে বৈদিক রীতির মূলে হানিয়া কুঠার,
ব্রাহ্মণের অত্যাচার নাশি ন্যায়-স্বত্বোদ্ধার
করিয়া মুক্তির পথ দেখাতে সংসারে, মর্ত্তে জন্মিলেন শুভক্ষণে বুদ্ধ-অবতার।

২৫

বেদের বিরুদ্ধে কথা কে কহে তখন? কেবা এত স্পর্দ্ধা ধরে এই অবনী-মধ্যেতে?
প্রকৃত পুরুষ-সিংহ বাক্যবীর শাক্য-সিংহ
ন্যায়ের সুতীক্ষ্ণ অশি ধরি দৃঢ়মতে, প্রভু অবতীর্ণ হইলেন জ্ঞান-সংগ্রামেতে।

২৬

ন্যায়ের নির্ম্মল জ্যোতিঃ-প্রভায়, অচিরে ম্লান হইল, স্বার্থের ভাব দেখিল সংসার।
ব্রাহ্মণে বিজয় করি, বেদের শৃঙ্খল ছিঁড়ি,
জীবে উদ্ধারিয়া দিল মুক্তি-মন্ত্র সবে! বুদ্ধ উদার ভাবেতে বর্ণ না করি বিচার।

২৭

জ্ঞানের ঈশ্বর বুদ্ধ, দয়ার সাগর বীর—কামনা-বিজয়ী ভবে শান্তির আধার।
নাই ছোট বড় জ্ঞান, নাহিক স্বার্থের ভান,
নাই বর্ণ বিচার আচারে শ্রেষ্ঠতম পূতমুক্ত আত্মা মুক্তি পথে সহায় সবার।

২৮

বুদ্ধের অধ্যাত্ম-জ্ঞান কিরূপ উন্নত সত্যসার-সমন্বিত তাহা দেখিল সকলে,
আর্য্যের অদৃষ্টতরী যুগেক দাঁড়াল ফিরি,
ভারত প্লাবিয়া স্রোতঃ বহিল উজানে, ক্রমে আমার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ লঙ্ঘি বেগবলে,

২৯

তিব্বত, তাতার, চিন, জাপান প্রভৃতি দেশ প্লাবিয়া ক্রমেতে লঙ্ঘি দুস্তর সাগর,
সিংহলে বহিল স্রোতঃ, স্পর্শিয়া অর্ণবপোত,—
ইউরোপে গ্রীস আদি প্রাচীন সুসভ্যদেশে উঠিল তরঙ্গ! ধন্য বুদ্ধ গুণাকর!

৩০

ধন্য ধন্য ধন্য রবে পূরিল সংসার, বৌদ্ধ ধর্ম্মের গৌরব-ধ্বজা উড়িল অম্বরে,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, নির্ব্বাণ মুক্তির মর্ম্ম,
বুঝিয়া অনেকে ত্যজি রাজ্য, ধন, জন লয়ে কৌপীন সম্বল ত্যজি চলিল সংসারে,

৩১

আর্য্য-মধ্যে ধর্ম্মভেদে দুই দল হ'য়ে ঘোর জ্ঞানের সংগ্রামে মত্ত হ'ল আর্য্যগণ,
ধর্ম্ম-বিপ্লবের ফলে চিন্তার অনলজলে,
উঠিল ভারতে, হ'ল অতুল হৃদয়োৎকর্ষ অধ্যাত্ম-উন্নতি যাহা হয়নি কখন।

৩২

ভারতের রত্নগর্ভ রাশি রাশি ধনরত্ন করিছে প্রসব—তাহে নাই প্রয়োজন,
বণিক্ বিলাসী যারা ধনরত্নে বদ্ধ তারা,
জ্ঞানী চাহে চিরশান্তি নির্ব্বাণ-মুকতি তরে বাসনা জিনিতে, আর ভক্তি, প্রীতিধন।

৩৩

নাই হত্যা নিষ্ঠুরতা, না হয় তুমুল রণে রুধির বর্ষণ, সুখে পরিপূর্ণ পুরী,
ধার্ম্মিক সে মুক্তি আশে ত্যজি যায় গৃহবাসে,
বিধর্ম্মী বিলাসী সুখে বিভোর সতত! সুখ খুঁজিতে না হয়, যথা তথা ছড়াছড়ি।

৩৪

একদল অধ্যাত্ম-চিন্তায় নিমগন, তাহে জন্মিল তত্ত্বজ্ঞ ন্যায় দার্শনিকগণ,
অপর বিলাসে মত্ত, না চাহে কঠোর তত্ত্ব,
সরস সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত নৃত্যতে মগ্ন, তার ফলে জন্মিল গায়ক নটগণ।

৩৫

বৌদ্ধ বুঝাইল জীবে নির্ব্বাণ মুকতি, প্রাজ্ঞ দার্শনিক অনভাবে বুঝালেন তাই,
ধার্ম্মিক নির্ব্বাণ-পথে, যায় অবনত মাথে,
ইহকাল জঞ্জাল যাদের সংস্কার, যারা মুক্তির উপায় চিন্তি অস্থির সদাই,

৩৬

ইহকাল যাহাদের পরীক্ষার স্থল, কিম্বা অবিদ্যা-কল্পিত অতি অকিঞ্চিৎকর।
তাহারা কিসের তরে পূজিবে ইহ সংসারে?

দেবতা তাহারা, স্বর্গ নিবাস তাদের, এথা এসেছে ভোগিতে দুঃখ যাইবে সত্বর।

৩৭

জন্মিল অনেক শিল্পী, নট, সুগায়ক, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী, দার্শনিক, কিন্তু কিহ'ল তাহাতে?
অনায়াস-লভ্য জনে, সুখী হ'ল সর্ব্বজনে,
তাহাতেই কি হইল? যা হইল তাহা, আশু সুখকর বটে, কিন্তু অশুভ গৌণেতে।

৩৮

গায়ক গাহিল চিত্ত-সুখের উচ্ছ্বাস, তাহে ভোগ-সুখ-লালসা বাড়ায় বিধিমতে,
তাহাবো অভাব নাই, যাহা চাই তাহা পাই,
এরূপ সুখের ফল আলস্য জড়তা, ইথে মানবেরে ধীরে ধীরে লয় অধঃপাতে।

৩৯

এ জাতির অদৃষ্টের গতি কোন্‌দিকে, তাহা চিন্তা করি ফেটে যায় পাষাণ হৃদয়,
সংসারে কিছুই যারা চাহে না, অথবা যারা
না চাহিতে পায়, হেন জাতির যে পরিণাম ঘটেছে সমস্ত, বুঝে দেখিলেই হয়।

৪০

এইরূপে কিছুকাল হইলে অতীত ক্রমে বৌদ্ধগণ পৌত্তলিক হইল কার্য্যেতে,
অদ্যাবধি অবনীতে, আস্তিক্য, নাস্তিক্য পথে,
যে দিকে যে থাক, যত হ'ক সূক্ষ্মতত্ত্ববাদী, পরিণামে পৌত্তলিক হইবে হইতে।

৪১

মূলতত্ত্ব অবিকৃত থাকে যতদিন, ভবে ততদিন স্থির থাকে ধর্ম্মের জীবন।
যাহে যত সত্য রবে, তাই তত স্থায়ী হবে,
মিথ্যাহীন সত্য কোথা দেখেছ ধীমান্? তবে সমধিক সত্য বটে বুদ্ধের বচন।

৪২

"নিষ্কাম" "নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম" চিন্তার চরম সীমা কল্পনার পরাকাষ্ঠা কিন্তু প্রেমহীণ,
প্রেমের প্রকৃতি এই, পর-মুখাপেক্ষি সেই,
"নিষ্কাম" "নির্ব্বাণ" কারো করে না অপেক্ষা, তাহে মনুষ্যের অনুরাগ রহিবে কদিন?

৪৩

প্রেম যাহে নাই তাহে কিরূপে তিষ্ঠিবে বল মানব-হৃদয়? শুদ্ধ বুদ্ধি, চিন্তা, জ্ঞান,
হৃদয়ে অপেক্ষা ক'রে ক'দিন থাকিতে পারে?
ক দিন থাকিবে বৌদ্ধ কঠোর তাত্ত্বিক? ক্রমে যুড়াইতে জ্ঞানানল-তপ্ত মনঃ প্রাণ।

৪৪

প্রেমের শীতল সুধা হ্রদেতে ডুবিয়া সেই জ্ঞান-গুরু শাক্যসিংহে দেখিল নয়নে,
অভ্রান্ত অজেয় জ্ঞান কামজয়ী ভগবান্,

মুক্তি-কল্পতরু প্রভু ভক্তির আধারে হৃদে স্থাপিল তৎক্ষণে,

৪৫

জ্ঞান, মুক্তি, পরকাল, চিন্তায় বিভোর কেহ, কেহ অনায়াস লব্ধ সুখে নিমগন,
কেহ যায় বৌদ্ধমতে, কেহ বা বৈদিক পথে,
নানামতে মতান্তর, মনান্তর জনে জনে, হেনকালে কে ঠেলিল পশ্চিম তোরণ?

৪৬

কে ওই বীরেন্দ্র? শ্বেত-কান্তি সুবিশালতনু? আজানুলম্বিত ভীমবাহু, বক্ষপাটা—
বিস্তৃত কপাট-সম, সিংহগ্রীব, অনুপম—
বীরভাব-রঞ্জিত, সতেজ চক্ষু-প্রভা, রণ-প্রতিভা-পূর্ণিত দীর্ঘ ললাটের ঘটা?

৪৭

শ্যাম-শ্মশ্রু-সুশোভিত বদনমণ্ডলে বীর-স্ফূর্ত্তি অনুপম, শিরে কিরীট লোহার,
লৌহ পরিচ্ছদ পরা, কৃষ্ণকায় অশ্বে চড়া,
অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত, করে জয়ধ্বজা, তাহে লিখা আছে "দিগ্বিজয়ী আলেক্-
জাণ্ডর!"

৪৮

ভারতের সিংহদ্বারে আঘাতি সবলে মহাপরাক্রান্ত বীরবর দিগ্বিজয়ীভাবে,
জলদ-গম্ভীর-স্বরে গগন বিদীর্ণ ক'রে,
ডাকিতেছে আর্য্যদিকে সংগ্রাম কারণে, পৃথ্বী শঙ্কিত কম্পিত তার সৈন্যপদ-দাপে।

৪৯

মুক্তি-সুখ-মগ্ন আর্য্য, অদৃষ্টের আশ্রয়েতে সুখে নিদ্রা যায়, নাই ভ্রূক্ষেপ কিছুতে,
বীরের আহ্বান কানে পশিল না, কেহ শুনেও
শুনিল না, সন্নিকটে আছিল যাহারা, তা'রা জাগিল সহসা ঘোর অশনি-সম্পাতে!

৫০

নিদ্রিত নিশ্চেষ্ট আর্য্য চমকিত, বিঘূর্ণিত, বিভ্রান্ত হইয়া নেত্র করে সম্মিলন,
যে দিকে নিরখে হায়! আকাশ পাতাল তায়!
নাই সূর্য্য, নাই চন্দ্র নক্ষত্র, কেবল ঘোর নিবিড়ান্ধকারে হয় বজ্র বরিষণ।

ইতি অষ্টাদশ সর্গ।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ক্রমশঃ

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মানস-কানন কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীরুক্মিণীকান্ত ঠাকুর প্রণীত। জি, সি, বসু কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আজি কালি সচরাচর যে প্রকার কবিতাগ্রন্থ দেখা যায় এ গ্রন্থ খানিও তদ্রূপ। ইহাতেও একটী পাগলিনী আছে, দুই একটী প্রণয়-ঘটিত আক্ষেপোক্তি আছে, শ্মশান, হিমাদ্রি শেখর, যমুনা, গঙ্গা, স্বপ্ন, নিদ্রা, অশ্রুপাত, ভেরী প্রভৃতি সকলই আছে। কেবল শ্যামের বংশীধ্বনি দেখিলাম না। দুই একটী কবিতা হেমবাবুর ছন্দেও রচিত আছে, কেবল অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখিলাম না। বাকি গুলি বোধ হয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। কবিতার মধ্যে সর্ব্বস্থানে ভারতের দুরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশও আছে।

রচনা মন্দ নহে। তাহাতে লালিত্য ও মিষ্টতা আছে। পড়িতে কোন খানে বাঁধে না। কিন্তু কোন খানে বিশেষ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দেখিলাম না। আজি কালি সর্ব্বদা যেরূপ ছোট ছোট ফুট্‌ফুটে কবিতা দেখা যায়, এই গ্রন্থখানি সেই প্রকার কবিতায় পরিপূর্ণ। কবি ভারতদুঃখে কাতর হইয়া সকল দেবতার নিকট,—যমুনা তটে, হিমাদ্রি-শেখরে মৃদুরবে কাঁদিয়াছেন, অবশেষে সেই ক্রন্দনরব ভেরীকে ঘোষণা করিতে বলিয়াছেন। দেখি এত লোক ক্রন্দন করিলে ভারতের দুঃখ হ্রাস হয় কি না? শোকসন্তপ্তা প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনি যেমন সময়ে সময়ে আমাদের শ্রবণ ও হৃদয় আহত করে, ভারতবাসীর সেইরূপ কাতরোক্তি ও রোদন-ধ্বনি আমরা সময়ে সময়ে শুনিতে পাই। সে ধ্বনি ক্ষণিক পরে নিস্তব্ধ হয়, আবার ভারত মহানিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকও শোক অপনোদন করিয়া আবার সংসারকার্য্যে প্রবেশ করে, কিন্তু ভারতবাসীর সে চেষ্টা কই? ভারতবাসী চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন, এক একবার যেন ক্রন্দনের জন্যই জাগরিত হয়েন। সেই ক্রন্দন কবিতায় ও বক্তৃতায় মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। রুক্মিণী বাবু একবার সেইরূপ কাঁদিয়া উঠিয়াছেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি এখন রুক্মিণী বাবু ঘুমাইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত সহৃদয় কবির কার্য্য কি? লর্ড বাইরন্ যে গ্রীশের জন্য কাতর হইয়াছিলেন, যাহার জন্য তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, যাহার দুঃখে তিনি নিজ কবিতাবলি পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রীশের

উন্নতিচেষ্টায় তিনি মিসলনগির বিদুর বাসে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাহারই হৃদয় যথার্থ কবির হৃদয় এবং মানব-দুঃখে প্রকৃত পক্ষে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গ কবি, তোমার ক্রন্দন স্ত্রীলোকের ক্রন্দন অপেক্ষাও হীনতর। তোমার হৃদয়হীন ক্রন্দনে কোন রস নাই।

বাইরণ মানবদুঃখে হৃদয়ের সহিত ক্রন্দন করিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহার ব্যথাপূর্ণ কবিতাপাঠে মন মাতিয়া উঠে। যে হৃদয়ের সহিত কাঁদিতে পারে, তাহারই ক্রন্দনরবে জগৎ কাঁদিয়া উঠে। বাঙ্গালীর হৃদয় আজিও তত কাঁদিয়া উঠে নাই, সুতরাং তাহার ক্রন্দনে মন মাতিয়া উঠে না। বাঙ্গালী কবিকে লর্ড বাইরণের মত ভারতের হিতব্রতে যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেই হইবে, নহিলে তিনি কবি নহেন, আমরা একথা বলিতে চাহি না, কিন্তু আমরা এই কথা বলি যদি তিনি হৃদয়ের সহিত কাঁদিতেন, তাঁহার কবিতায় সে ভাব বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িত, এবং তিনি কার্য্যক্ষেত্রে কখন স্থির থাকিতে পারিতেন না। সমালোচ্য কবিতাবলিতে আমরা যে প্রকার ঈষদুষ্ণ হৃদয়ভাব দেখি, এক্ষণকার কবিতাবলিতে প্রায় অধিকাংশই এই প্রকার ভাব দেখিতে পাই। তাহাতে উদ্বোধনকরী শক্তি কিছুই নাই। সামান্য আক্ষেপ মাত্র।

বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গল। *

কবিকুলচূড়ামণি সেক্ষপীয়ার পাগলের সহিত যে কবির তুলনা করিয়াছেন বিহারী বাবুর এই দুই খানি কাব্য পড়িলে তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। বিহারী বাবুর কাব্যের প্রতি ছত্রে উন্মত্ততা, প্রতি অক্ষরে উন্মত্ততা। তাঁহার উপহারে উন্মাদ, তাঁহার সুরবালায় উন্মাদ, তাঁহার পরাধীনীতে উন্মাদ, তাঁহার বিষাদিনীতে উন্মাদ; তাঁহার প্রেয়সী, বিরহিণী, প্রিয়তমা, অভাগিনী—সকলেই উন্মাদিনী। তাঁহার সাধের সারদাও "ভাবভরে মাতোয়ারা, যেন পাগলিনী পারা" এবং তিনি স্বয়ংও প্রেমোন্মত্ত। বস্তুতঃ বঙ্গের যদি কোন কবি নিজের ভাবোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া গিয়া থাকেন ত বিহারী বাবু। বঙ্গের কোন কবি যদি নিজের ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন ত বিহারী বাবু। পাগল যেমন পরের নিন্দা সুখ্যাতির আশা রাখে না, আপন চিত্ত তাহাকে যে দিকে লইয়া যায় সে কেবল সেই দিকেই ধাবিত হয়, ইচ্ছামত গতি পরিবর্ত্ত করিতে পারে না; সেইরূপ পাগল কবি বিহারী বাবু লৌকিক যশ অযশের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিজের ভাবোচ্ছ্বাস তাঁহাকে যে দিকে লইয়া গিয়াছে, তিনি সেই দিকেই ধাবিত হইয়াছেন।

---

* শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। নূতন বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিত।

ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে তাঁহার যুক্তিশক্তি ক্ষীণপ্রভ হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার 'সাধের স্বপনের ললনা, সারদাকে কখন ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছেন, কখন প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতেছেন, কখন স্নেহের উৎসে উক্ষিত করিতেছেন। কি বলিতেছেন, জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই, পূর্ব্বাপর সঙ্গতি বোধ নাই। তিনি সারদাতে, সারদা তাঁহাতে, সারদা জগতে, জগৎ সারদাময়—অদ্ভুত তন্ময়ত্ব।

বাইরণের ন্যায় কবি নিজেই স্বকীয় কাব্যের নায়ক। যে আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বোচ্চ কবিত্বের লক্ষণ, যে আত্ম-বিস্মৃতি-শক্তিবলে সেক্ষপীয়ার কালিদাস প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ কবিবৃন্দ বিপরীত-চরিত্রশালী পাত্র ও পাত্রীও অদ্ভুতরূপে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, বাইরন্ বা বিহারী বাবুতে সে আত্মবিস্মৃতির ভাগ অধিক নাই। বাইরন্ যেমন আপনার হৃদয়ের ভাবনিস্রবে নিজ কাব্য প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন, বিহারী বাবুও তদ্রূপ তাঁহার কাব্যের স্তরেস্তরে নিজের হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস সংক্রামিত করিয়াছেন। তিনি যে মানবজাতির অসদ্ব্যবহারে চটিয়া তাহাদিগের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ-বিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার "উপহারে" তাহা উজ্জ্বলরূপে পরিব্যক্ত। আর তিনি যে, মানবজাতিকে বড় ভাল বাসিতেন, কেবল তাহাদিগের দুর্ব্ব্যবহারেই তাহা-দিগের উপর এরূপ বিরক্ত হইয়াছেন, সেই উপহারেই তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। কারণ তাঁহার প্রেমিক হৃদয় কৃতঘ্ন মানব জাতিকে ফেলিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও বার বার স্নেহ-দৃষ্টিতে তাহা-দিগের দিকে তাকাইতেছে। ইচ্ছা যে মানবজাতি যদি সৎ হয় তিনি তাহা-দিগকে ছাড়িয়া যান না। তাঁহার অতৃপ্ত প্রেমিক হৃদয় মানবজাতির নিকট প্রেমের প্রতিদান না পাইয়া, হরিণীর নয়নে সহানুভূতিসূচক অশ্রুজল দেখিয়া, প্রমত্তের ন্যায় তাহার নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া, তাহার দিকে "মৃত্যুকালে মিত্র এলে, লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে" তেমনই করিয়া চাহিয়া রহিল।

আগ্নেয় গিরির অভ্যন্তর হইতে যেমন ধাতুনিস্রব নির্গত হয়, বাইরন্ ও বিহারী বাবুর হৃদয়-গহ্বর হইতে সেই-রূপ প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস নির্গত হইয়াছে। পৃথক্ এই যে আগ্নেয় গিরির ধাতুনিস্রবের দাহিকা শক্তি আছে, যে দিক্ দিয়া প্রবা-হিত হয়, গ্রাম নগর পুড়াইয়া ভস্মরাশি করিয়া যায়; কিন্তু বাইরন্ ও বিহারী বাবুর জলন্ত ভাবোচ্ছ্বাসে পাঠকের হৃদয় গলিত হয়—পুড়ে না। তবে বাইরণে ও বিহারী বাবুতে পৃথক্ এই যে বাইরণে ভাবোচ্ছ্বাসের বিষয় বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু বিহারী বাবুর ভাবোচ্ছ্বাস কেবল প্রেম-মূলক। এই জন্যই বাইরণের এত আদর; এবং সেই জন্যই বঙ্গীয় সমাজে বিহারী বাবু এত নির্ণাম।

বিহারী বাবু সেক্ষপীয়ার ও কালি-দাসের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবি না হউন্, কিন্তু তিনি যে এক জন উচ্চদরের কবি তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

আমার জীবনের ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেবেন্দ্রের পত্র।

পরদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম বেলা অনেক হইয়াছে। প্রভাত-সূর্য্যের দুই একটী কিরণ-রেখা খেলিতে খেলিতে পথ ভ্রান্ত হইয়া যেন জানালার ভিতর দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পারিতেছে না। সেই সকল কিরণ-রেখায় পরমাণুমালা ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, আবার ভাসিয়া উঠিতেছে, তথনই আবার অদৃশ্য হইতেছে। আমার চক্ষু নিদ্রামুক্ত হইয়া প্রথমেই সেইদিকে ধাবিত হইল। অনেক ক্ষণ এক দৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিলাম বলিতে পারি না। ক্রমে পূর্ব্ব দিবসের ঘটনাবলী স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রের অসুখ—দাসী—অসুখের কারণ কি— ইত্যাদি বহুচিন্তা যুগপৎ হৃদয়কে অভিভূত করিল। স্বপ্নকুহকিনী আবার এই সকল চিন্তাকে গত রজনীতে কত রঙ্গেই রঞ্জিত করিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে এমন সময় বোধ হইল দেবেন্দ্র যেন আমার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন 'শ্যামাঙ্গিনি! তুমি নাকি আমার অসুখের কথা শুনিয়া কত কাঁদিয়াছ? কৈ, আমার কি অসুখ হইয়াছে; এই যে আমি তোমার কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, চাহিয়া দেখ দেখি।' আমি অমনি উন্মত্তের মত উঠিয়া বসিলাম—কি দেখিলাম? গভীর নিশীথ; পৃথিবী স্পন্দহীন, অন্ধকারে পরিপূর্ণ; গৃহের ভিতরে ক্ষীণালোক প্রদীপ। চারি দিকে চাহিলাম, কত খুঁজিয়া দেখিলাম—সে মধুর কণ্ঠধ্বনি কোথায়, দেবেন্দ্র কোথায়? বাহিরে স্তূপে স্তূপে অন্ধকার, ঘরের ভিতরে অনুজ্জ্বল মৃতপ্রায় দীপালোক, আর সকলই শূন্যময়! বুঝিলাম সকলই স্বপ্নের শঠতা, কিন্তু বুঝিয়া লাভ হইল কি? হৃদয়ের যন্ত্রণাত কমিল না, নৈরাশ্য বাড়িল বৈত কমিল না। বহুক্ষণ শয্যা-প্রান্তে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া রহিলাম। ক্রমে শরীর অলস হইতে লাগিল ও চক্ষু আকুঞ্চিত হইয়া আসিল। তথন আর বসিতে না পারিয়া পুনরায় শয়ন করিলাম। অবিলম্বে একটু নিদ্রা আসিল, কিন্তু হতভাগিনী সে নিদ্রায় শান্তি পাইল না। হৃদয়ের ভিতরে যে কালসর্প পুষিয়া রাখিয়াছিলাম, শান্তির সাধ্য কি তাহার কাছে স্থান পাইবে? আবার সেই চিন্তা মনে উঠিল। আমার

বোধ হইল দেবেন্দ্র যেন বলিতেছেন 'শ্যামাঙ্গিনি আমি চলিলাম।' সেই কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যেন বলিলাম 'হতভাগিনীকে ফেলিয়া কোথায় চলিলে?' দেবেন্দ্র উত্তর করিলেন 'কোথায় যাইতেছি জানি না; অদৃষ্ট যেখানে টানিয়া লইয়া যাইবে, সেই খানেই যাইব।' এই কথা শুনিয়া আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, এবং সেই ঘোর মানসিক উদ্বেগে তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখিলাম প্রদীপটী পূর্ব্ববৎ মিটি মিটি জ্বলিতেছে ও থাকিয়া থাকিয়া ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমন স্পন্দহীন, এমন প্রাণশূন্য যে শুদ্ধ সেই ক্ষীণপ্রভ দীপালোকটী দেখিয়া মনে কিঞ্চিৎ ভরসার সঞ্চার হইল যে পুনরায় প্রভাত হইবে, পুনরায় প্রকৃতি জীবন লাভ করিবে। আমার শয্যার অনতিদূরে একজন দাসী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সেই নির্জ্জনভাব আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। আমার মনে কেমন এক প্রকার ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল, বোধ হইল দাসী যেন মৃতদেহ এবং আমি যেন কোন বিস্তীর্ণ শ্মশানে একটী ক্ষুদ্র আলোক জ্বালিয়া সেই মৃতদেহ শৃগাল প্রভৃতি শবভোজী নিশাচরগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছি। এই চিন্তার উদয় হইবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, ও ললাটে ঈষৎ ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। একবার ইচ্ছা হইল নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দাসীকে জাগরিত করি, আর বার ভাবিলাম অনর্থক তাহার সে সুখে বিঘ্ন উৎপাদন কেনই বা করি? অবশেষে নিঃশব্দে পদক্ষেপণ করিয়া সেই নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখা নিবাইয়া দিলাম। প্রদীপ নিবিবামাত্র স্তূপে স্তূপে অন্ধকার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া ঘর বাহির যেন এক হইয়া গেল, এবং সেই অন্ধকারে আমি শয্যার এক প্রান্তে গিয়া চক্ষু মুদিয়া শুইলাম। তাহার পর কখন নিদ্রাকর্ষণ হইল বলিতে পারি না। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ-রেখা মুখের উপরে পড়িয়া আমাকে জাগরিত করিয়াছে।

জাগরিত হইলে পরে কিয়ৎকাল আমি হতবুদ্ধির মত শয্যায় পড়িয়া রহিলাম। ক্রমে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সকল মনে পড়িল, এবং সেই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে গাত্রোত্থান করিলাম। ক্ষণেক পরে দৈনিক গৃহ-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা পাইলাম; কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইল। এই বিরক্তি-বোধ সেই দিন যে নূতন হইল তাহা নহে। যে কাল মুহূর্ত্তে জানিতে পারিলাম হৃদয়ের ভিতরে শূন্য, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই গৃহকর্ম্মের প্রতি হতশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কিন্তু আজি সেই হতশ্রদ্ধা যৎপরোনাস্তি প্রবল হইল। তথাপি অনুরাগের সহিত

হউক আর না হউক দুই একটী কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহাতে যন্ত্রণার যে অনেক লাঘব হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপে কথঞ্চিৎ ব্যস্ত থাকিয়া দিবসাতিপাত করিলাম এবং দেখিতে দেখিতে দিনমণি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। ইহার প্রায় দুই তিন দিন পূর্ব্বে স্বামী কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, সুতরাং গৃহে আমি একাকিনী। সেই মধুর সন্ধ্যায় আমি নির্জ্জনে বসিয়া নৈশ গগনের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলাম স্মরণ হয় না। অসীম ব্যোমদেশ মানসিক ব্যাধির কি চমৎকার ঔষধ! যে হতভাগ্য জীব একবার হৃদয়-যন্ত্রণায় জ্বলিয়াছে, সেই বলিতে পারে প্রশান্ত নিশায়, কিম্বা দ্বিপ্রহরে—যখন চারি দিক্ সূর্য্য-কিরণে জ্বলিতে থাকে তখন, আকাশের দিকে চাহিলে মনে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। জীবন ধারণ করিয়া আমি যদি কোন সুখের অধিকারী হইয়া থাকি ত সে সুখ এই। রোগ হউক শোক হউক দুঃখ হউক, পাপের পঙ্কিল স্রোতে হউক আমি এ পর্য্যন্ত এ সুখে বঞ্চিত হই নাই। সুনীল অনন্ত আকাশের দিকে কিয়ৎ কাল চাহিয়া থাকিলে আমার আত্মবিস্মৃতি হয়, এবং বোধ হয় আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অসম্ভব—আমি সেই শ্যামল, উজ্জ্বল, অসীম আকাশের অংশ মাত্র—তাহার জীবন ও আমার জীবন দুইই এক। যে সন্ধ্যার কথা আমি এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, তৎকালে হতভাগিনী এই সুখের কিঞ্চিৎ আস্বাদন পাইয়াছিল। শরতের আকাশ গাঢ় নীল, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে একটু একটু উজ্জ্বল শ্বেত মেঘের আঁচড় পড়িয়াছে। সেই অনন্ত সুজ্জ্বল গগনের দক্ষিণ পশ্চিম দেশে ষষ্ঠীর বঙ্কিম চন্দ্র দেখিতে কি অপূর্ব্ব হইয়াছিল! কিয়ৎকাল সেই বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয় মোহিত হইল; বোধ হইল যেন এক খানি ক্ষুদ্র রজত-তরী অসীম আকাশে হেলিতে হেলিতে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে। পৃথিবী চন্দ্রের জ্যোতির্বর্ষণে ধবলিত হইয়াছিল; এবং নৈশসমীরণ-সঞ্চালিত শ্যামল বৃক্ষ-পত্র হইতে কিরণ-মালা থাকিয়া থাকিয়া স্ফুরিত হইতেছিল। কিন্তু গগনের প্রান্তভাগে যে চন্দ্র ভাসিতেছিল তাহারই দিকে নয়ন অধিকতর আকৃষ্ট হইল। একবার ইচ্ছা হইল তাহাকে পাড়িয়া হৃদয়ের ভিতরে পূরিয়া রাখি, এবং তাহার অমৃত-স্পর্শে অন্তর জুড়াই; আর বার ইচ্ছা হইল যদি আমাকে কেহ ঐ ক্ষুদ্র তরী খানির ভিতরে রাখিয়া আইসে, তাহা হইলে পৃথিবীর সুখ দুঃখ ভুলিয়া যাই; মনুষ্যের নৃশংসতা স্বার্থপরতা পরশ্রীকাতরতা পরগ্লানি পরনিন্দা—এ সকল ভুলিয়া নিয়ত অনন্ত কাল ঐ অনন্ত আকাশে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াই। এইরূপ কল্পনা-স্রোতে মন ভাসিয়া

চলিয়াছে এমন সময় দেখিলাম দূরে একটী স্ত্রীলোক আমার দিকে আসিতেছে। কিয়ৎ পরেই দেবেন্দ্রের যে দাসীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দাসীকে দেখিবা মাত্র আমি সেই সুনীল গগন, সেই চন্দ্রালোক, সেই নৈশ সমীরণ ভুলিয়া গিয়া দেবেন্দ্র কেমন আছে, কি করিতেছে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। দাসী পূর্ব্ববৎ দেবেন্দ্রের অসুখের সমাচার দিয়া তৎপ্রেরিত একখানি পত্র আমার হস্তে সমর্পণ করিল। পত্র পাইবা মাত্র আমার মনের ভাব কি যে হইল বলিতে পারি না। আমার বুকের ভিতরে গুর্ গুর্ করিতে লাগিল, থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং নৈশ সমীরণের প্রতি প্রবাহে সর্ব্বাঙ্গ বল্লরীর মত যেন বিকম্পিত হইতেছে বোধ হইল। এইরূপ ঘোর আবেগাবস্থায় স্খলিত স্বরে দাসীকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিলাম এবং ঘরের ভিতরে যাইয়া প্রদীপের সম্মুখে স্বিন্নাঙ্গুলিতে পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। দেবেন্দ্র যাহা যাহা লিখিয়াছিল তাহার একটী কথা, একটী অক্ষরও অদ্যাবধি স্মৃতি-পথের বহির্ভূত হয় নাই। জীবন থাকিতে সে সকল কথা ভুলিবার সাধ্য কি! যদি কখন আমার মরণ হয় তবে হত-ভাগিনীর পাষাণ-বক্ষ একবার বিদীর্ণ করিয়া দেখিও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে এ জীবনে যে অগণ্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটীতে হৃদয়ে এক এক দুর্ব্বিষহ ব্রণ উৎপন্ন হইয়াছে—তাহা হইলে ভাই! বুঝিতে পারিবে চির-দুঃখিনী কি যাতনা পাইয়া মরিয়াছে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন্ সে অগ্নিতে মনুষ্য যেন দগ্ধ না হয়। যে পরম শত্রু—যে মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়, আশার পথে চির কণ্টক দেয়, ক্রোড়স্থ সুপ্ত শিশু সন্তানের রক্তে বক্ষ দেশ প্লাবিত করে, সেও যেন এক দিন, এক মুহূর্ত্তের তরে কখন এ জ্বলনে না জ্বলে!

দেবেন্দ্রের পত্রের কথা বলিতেছিলাম। এই পত্রে সে যাহা যাহা লিখিয়াছিল তোমাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতেছি;—

'শ্যামাঙ্গিনি!—রজনী প্রভাত হইলে আমার সন্ধান এখানে আর পাইবে না। ইচ্ছা ছিল যাইবার সময় একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব—একবার তোমাকে শেষ দেখা দেখিয়া যাইব। অপরাধ মার্জ্জনা করিও, তাহা পারিলাম না,—হৃদয়কে ততদূর বিশ্বাস করিতে সাহস হইয়া উঠিল না। আমার মন বড়ই অসুস্থ, কিন্তু অসুখ কি তাহা কেমন করিয়া বলিব? গৃহত্যাগ এক্ষণে আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ হইয়াছে, সুতরাং কল্য প্রত্যূষে স্থানান্তরে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম আপাততঃ এখানে একদিনের জন্যও অবস্থান আর কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। থাকিয়াই বা সুখ কি?

যাহার পিতা নাই, মাতা নাই, হৃদয়ার্দ্ধ-ভাগিনী নাই—ত্রিজগতে আপনার বলিবার যাহার কেহ নাই, গৃহে তাহার সুখ কি?—সংসার-বিড়ম্বনায় তাহার প্রয়োজন কি? আজি কয়েক দিন ধরিয়া আমার হৃদয় নরকের তুল্য হইয়াছে; দুরভিসন্ধি—দুষ্ট অভিলাষ-রূপ নরকাগ্নি দিবানিশি তাহাতে জ্বলিতেছে। দেখি যদি স্থানান্তরে যাইলে সেই বহ্নির জ্বলন হইতে নিষ্কৃতি পাই। কিন্তু শ্যামাঙ্গিনি! তুমি সাবধান। একটু স্থির হইয়া বুঝিয়া দেখ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত প্রায়—এই বেলা সাবধান! পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর হইতে নিম্নস্থ তরঙ্গপূর্ণ অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাহার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে, সে যদি পূর্ব্বপশ্চাৎ একটু ভাবিয়া দেখে ত তাহার মঙ্গল। কিন্তু সেই সমুদ্রে একবার পড়িলে আর কে কবে নিস্তার পাইয়াছে? অতএব এই বেলা সাবধান! তোমার ভাবনা কি? তোমার সোণার ঘর, সোণার সংসার। যিনি তোমাকে তাঁহার বিভবের অদ্বিতীয়া অধিকারিণী করিয়াছেন তিনি নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ও সকলের শ্রদ্ধেয়। তুমি তাঁহার প্রাণবায়ু—জীবনের জীবন স্বরূপ। তবে তোমার ভাবনা কি? রমণীর সুখ্যাতি তৃণাপেক্ষাও লঘু বলিয়া জানিও—অপবাদের একটু নিশ্বাস বহিলে তাহা কোথায় উড়িয়া যাইবে কেহ বলিতে পারে না। শ্যামাঙ্গিনি! আজি হইতে তুমি আমাকে পরম শত্রু বলিয়া ভাবিও। কালসর্প দেখিলে লোকে যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, আমার কথা মনে হইলে তদ্রূপ করিও। কিন্তু তথাপি একেবারে ভুলিওনা—চিরদিনের জন্য হতভাগ্যকে স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত করিওনা। শ্যামাঙ্গিনি! ত্রিজগতে তাহার আপনার বলিবার যে কেহ নাই—তাহার দুঃখে দুঃখী হইবে, তাহার সুখে সুখী হইবে, এমন যে কেহ নাই; তাই আজি সে তোমার নিকটে এই শেষ ভিক্ষা চাহিতেছে। তাই সে প্রার্থনা করিতেছে এক একবার তাহাকে মনে করিও। কিন্তু কি বলিয়া তাহাকে মনে স্থান দিবে? শ্যামাঙ্গিনি! যদি কখন তাহার কথা মনে পড়ে তবে তাহাকে এই বলিয়া ভাবিও—'পর, অপরিচিত, দুই একবার দেখিয়াছি বটে, চির দুঃখী, অনুকম্পার পাত্র।' তাহা হইলেই তাহার জীবন সার্থক হইবে, তাহার চির অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। শ্যামাঙ্গিনি! অধিক কি বলিব, যদি ইহা স্থির জানিতে পারি যে আমার দুরদৃষ্টের কথা শুনিলে এক বিন্দু জল বর্ষণ হইবে, অধিক নহে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহিবে, তাহা হইলে লোকালয়ে হউক, আর বিজন অরণ্যে হউক, যেখানে থাকিব, এ জীবন একরূপে চলিয়া যাইবে। কিন্তু আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আমি বহু অপরাধ করিয়াছি। সেই সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়া, এবং এই দুঃখ-পূর্ণ জীবনের বহু দুঃখের

কথা একবার মনে করিয়া হতভাগ্যকে বিদায় দাও।

চিরদুঃখী
দেবেন্দ্র।'

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইল। প্রথমে কিয়ৎকাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন হঠাৎ শূন্যগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে বোধ হইতে লাগিল। আশা ভরসা অভিলাষ শোক দুঃখ ইত্যাদি কোন চিহ্নই হৃদয়ে লক্ষিত হইল না। দেহে জীবন প্রবাহিত হইতেছে কি না তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না। এইরূপ অচেতন জীবিতাবস্থায়,——সচেতন মৃতাবস্থায়, সেই রজনী অতিবাহিত করিলাম।

নৈরাশ্য—দুঃসাহস।

নৈরাশ্যে মন অতল জলে নিমগ্ন হয়; নৈরাশ্যে মন নূতন আশায়, নূতন ভরসায় প্রোৎসাহিত হয়। এই দুই মানসিক ভাব পরস্পর-বিরোধী হইয়াও যে একত্র অবস্থান করে তাহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। যে রাত্রিতে দেবেন্দ্রের পত্র পাইলাম, আমার মন নৈরাশ্যের প্রথমোক্ত ক্রিয়ার অধীন হইয়া রহিল। সেই রজনী কি অবস্থায় যে অতিবাহিত করিলাম বলিতে পারি না। অকস্মাৎ বিষম আঘাতে শরীর যেরূপ অচেতন হইয়া পড়ে, দেবেন্দ্রের পত্র পাঠ করিয়া মন তদ্রূপ সংজ্ঞাহীন হইয়া রহিল। হৃদয়ে বিশেষ কোন দুঃখ কি যন্ত্রণা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেবল চারি দিক্ শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল—আলোক-চিহ্ন, মনুষ্য-স্বর কি পশু পক্ষীর রব সকলই নিতান্ত বিরক্তিজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কেবল বেগবাহী নৈশ সমীরণের সঙ্গীত কর্ণে অপূর্ব্ব অমৃত রস বর্ষণ করিতে লাগিল। হৃদয় সেই অমৃত পান করিয়া অধিকতর অচেতন হইয়া পড়িল। তাহার পর কি অবস্থায় রজনী অতিবাহিত হইল বিশেষ স্মরণ হইতেছে না।

রজনী প্রভাত হইল। উষার অর্দ্ধস্পষ্ট আলোক গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি বাহিরে আসিয়া বসিলাম। প্রভাত-সমীরণে আমার দেহে নূতন জীবন সঞ্চার হইল, এবং সেই নববাহী জীবন-স্রোতের সহিত নূতন আশা নূতন বলও নূতন অভিলাষ—হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিল। আজি হইতে আমার ভাবী সর্ব্বনাশ এক-প্রকার অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে যে সকল চিন্তায় মন শিহরিয়া উঠিত, এক্ষণে সেই সকল চিন্তাকে মনে সাদরে স্থান দিতে লাগিলাম। এমন কোন দুঃসাহসিক অভিসন্ধি রহিল না যাহাকে আলিঙ্গন করিতে মন ভীত হইল।—অবশেষে এই স্থির করিলাম 'তিনি যেখানে গিয়াছেন আমিও তথায় যাইব; তাঁহারও যে গতি আমারও সেই গতি। কিন্তু তাঁহার জন্য মন এত ব্যাকুল কেন? তিনি যদি আমাকে চাহিতেন তাহা হইলে কখনই এমন করিয়া যাইতেন না।—দেবেন্দ্র! কাযটা কি ভাল করিয়াছ?

এই কি তোমার ধর্ম্ম? যে তোমার জন্য অকূল পাথারে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত, তাহার সহিত এই ব্যবহার? মুখের একটা কথা—একবার চক্ষুর দেখা, তাহাও নহে! লোককে দেখা দিয়া কি একটা কথা কহিয়া কে কবে গরিব হইয়া গিয়াছে? তবে এমন নির্দ্দয়ের মত কর্ম্ম করিলে কেন—এমন নিষ্ঠুর হইলে কেন? তুমি আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গেলে, কিন্তু আমি অধিক দিন থাকিতেছি না। কোথায় গিয়া থাকিবে তুমি? পৃথিবী ছাড়া অন্যত্র যখন যাইতে পারিবে না তখন ভাবনা কি? যেখানেই থাকনা কেন, হতভাগিনীকে অচিরে পদতলে দেখিতে পাইবে। যদি স্বয়ং মৃত্যু বিকটাকার ধরিয়া পথ রোধ করে তথাপি সে আর ভীতা নহে। তোমারই বা তাহাতে ক্ষতি কি? কোন প্রত্যাশা করি না, কোন যাচ্ঞা করি না—তবে তোমার ক্ষতি কি? এক একবার শুধু চক্ষুর দেখা দেখিব; দূর হইতে—অনিমেষ নয়নে মুখের দিকে চাহিয়া হৃদয়ের তৃষ্ণা ঘুচাইব—তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? কিন্তু লোকে বলিবে কি?—যাহা ইচ্ছা তাহা বলিবে; সে কথায় আমার প্রয়োজন কি? লোকে যদি হৃদয়-ব্যথার শতাংশের—সহস্রাংশের একাংশভাগী হইত তাহা হইলে এককালে লোকের কথা শুনিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যখন নহে—হৃদয়-যন্ত্রণা যাহার তাহারই শুধু যখন—তখন পরের সহিত আমার সম্পর্ক কি? পরের যাহা ইচ্ছা হয় বলুক, আমার যাহা ইচ্ছা হয় আমি তাহা করিব। তাহাতে মঙ্গল হয় ভালই, অমঙ্গল হয় আমার হইবে, পরের তাহাতে ক্ষতি কি?' এইরূপে মন দুরভিসন্ধি-স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে বেলা অনেক হইল, এবং সূর্য্যের উত্তপ্ত রশ্মিতে চারি দিক্ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন আমি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম। সেই মুহূর্ত্ত হইতে বোধ হইল যেন হঠাৎ অমৃত-বৃষ্টি হইয়া হৃদয়ের পূর্ব্ব যন্ত্রণা এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। দুঃসাহসিক চিন্তায় অন্তর পরিপূর্ণ হইল;—দুষ্ট সরস্বতীর কুহকে দিক্‌বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া মন ক্রমশঃ পাপাভিলাষ-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই পথের পরিসমাপ্তি হইল কোথায় তাহা তোমাকে বলিবার প্রয়োজন নাই!

(ক্রমশঃ)

শ্যাম—

হানিমান্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যে নবোদ্ভাবিত চিকিৎসা-প্রণালীর (হোমিওপ্যাথির) সত্যতা মানবজাতির বহুল উপকার সংসাধন করিতে আরম্ভ করিল, জীবন্ত জলন্ত আশার আশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া, হানিমান্ অসন্দিগ্ধ প্রবল প্রমাণ প্রয়োগাদি দ্বারা সেই বিষয়ের তত্ত্ব অধিকতররূপে প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইলেন। স্বয়ং যখন সমীক্ষণ (Observation), পরীক্ষণ (Experiment) দ্বারা যে বিষয়ের যাথার্থ্যে আসিয়া উপনীত হইতেন, বন্ধুবর্গ সমক্ষে তাহা প্রমেয় বোধ করিতেন। বলা বাহুল্য, যাহা তাঁহার নিজের পক্ষে স্থির হইত, অন্যত্র কুত্রাপি তাহার ব্যত্যয় ঘটে নাই; বন্ধুগণের চক্ষেও অবিকল প্রতিভাত হইত।

"কম্পজ্বরে কুইনাইন্ অমোঘ ঔষধ" কিউলিনের এই উক্তির মধ্যে "অমোঘ" শব্দের প্রতি তাঁহার গভীর চিন্তাশীল দৃষ্টি প্রথমে ও প্রধানতঃ আকৃষ্ট হয়; এবং এই ব্যাপারের আলোচনা ও অনুসন্ধান ফল, সদৃশ ব্যবস্থা প্রথার (Homœpathic System) উৎপত্তির প্রকৃত কারণ।*

এলোপ্যাথিক মতে, "যে রোগের যে সকল অবস্থায় প্রযুক্ত হইলে যে পদার্থে বিভিন্নরূপ অবস্থা উৎপাদন করিয়া দেয়, সেই পদার্থ সেই পীড়ার সেই সকল অবস্থার পক্ষে প্রকৃত ঔষধ।"—কম্পজ্বরে কুইনাইন "অব্যর্থ" (মহৌষধ) এই কথার উপর নির্ভর রাখিয়া যাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, এলোপ্যাথির সেই মূল মতের দিকে প্রধাবিত হইলেন, সুতরাং এলোপ্যাথির মূল কম্পজ্বরে প্রয়োগ করিতে বুঝিলেন, বিপরীত লক্ষণাবলি দৃষ্ট হইবে। অতএব কম্প-জ্বরে, কুইনাইন্ একমাত্র অমোঘ উৎকৃষ্ট ঔষধ, কি কুইনাইন ও কম্পজ্বর এই দুয়ের মধ্যে, কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা সম্ভব? বহুকালাগত এলোপ্যাথিভক্ত অনেকে হয়ত ভাবিতেছেন, হানিমানের ঐ প্রকার বাড়াবাড়ি রকমের সন্দেহ, তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বা অকাল-পক্কতার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহা যে আদৌ সম্যক্ প্রশস্ত মত নামে গ্রহণীয় হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, বক্ষ্যমাণ বিবরণে তাহা বিলক্ষণরূপে সংসূচিত হইবে। যিনি স্বাবলম্বিত চিকিৎসায় ইতিপূর্ব্বে বিস্তর বিত্তবিভব সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহার যশঃ-সৌরভ ইউরোপের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত ছিল, সেই খ্যাতি প্রতিপত্তি, সেই ধনলিপ্সা পরিবর্জ্জনের ইচ্ছা বা প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে তাহার

* ১২৮৫, চৈত্র সংখ্যা আর্য্যদর্শন দেখ।

পরিণতি করিতে যিনি লক্ষ্য হইতে রেখা-প্রমাণ বিচলিত হন নাই, তাঁহার পক্ষে কিউলিনের বাক্য ভ্রম-প্রমাদ-বিবর্জ্জিত বোধ না হওয়া কোন মতেই বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না। মনীষা-সম্পন্ন প্রত্যেক মনস্বী যদি, 'যেহেতু অমুক কথা অমুক বড় পণ্ডিত নিষ্পত্তি করিয়া গিয়াছেন, অতএব তাহা সম্পূর্ণ সত্য—তাহাতে কণা-পরিমাণ অসত্যাংশ বিমিশ্রিত থাকা সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত ও অবিশ্বাস্য,' এইরূপ নিষ্কর্ষ স্বতঃপ্রমাণ বা স্বীকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত করিতেন, তবে জগতের আজ এই যে এত অভ্যুদয় দেখিতেছি,তাহা নিশ্চয় ভবিষ্যৎ-গর্ভে নিহিত থাকিত, তাহাতে আর কি কোন সন্দেহ আছে? সেরূপ হইলে, মানবের স্বাধীন-চিন্তার গতি প্রতিহত হইত। জগতের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, হানিমানের প্রশস্ত অন্তরে ঐ প্রকার অনুচিত অনুদার হেয় মত, স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। পরীক্ষায় যাহা সাধু প্রতিপন্ন হয়, তাহাতে আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন সহজ অথচ স্বাভাবিক। তিনি ঐরূপ সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইবার পর নির্ব্যাধি-শরীরে কুইনাইন সেবন আরম্ভ করিলেন। জ্বর-রোগে কুইনাইনের বিপরীত অবস্থা উৎপাদন করিবার যে শক্তির কথা এলোপ্যাথি "ঔষধতত্ত্ব গ্রন্থে" বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বিভিন্ন অবস্থার (জ্বরাভাবে) হানিমান্ কুইনাইন্-সেবনে জ্বরাক্রান্ত হইলেন; সুতরাং কথিতরূপ জ্বরের উপর সেবন করিলে ঐ সামান্য জ্বর হইতে, সমধিকতর বিপরীত প্রকৃতির প্রবল জ্বর উৎপন্ন হওয়া দূরে থাকুক, ফল তাহার বিসদৃশ পরিদৃষ্ট হইল। ইহাতে হানিমান্‌কে যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিল। তিনি বারাধিক ক্রমাগত যতই কুইনাইন ব্যবহার করিলেন, সর্ব্বত্র একই ফল ফলিল। পরিচিত আপামর জনসাধারণের উপর উহা পরীক্ষণ করিলেন; কার্য্য অবিকল অনুরূপ হইল। তাঁহার সুহৃদ্বর্গের মধ্যে মহা হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরীক্ষিত হইলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য যে, তাঁহারাও হানিমান্-প্রোক্ত কথার প্রামাণ্যের পাত্র হইলেন। তিনি একটীমাত্র ঔষধ কুইনাইনকে নানা মতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিবৃত্ত থাকিবার লোক ছিলেন না। এতাবৎ হানিমান্ কোন ফলিতার্থে আসিয়া উপনীত হইতে সমর্থ হন নাই। তবে এত দিন নিতান্ত সংশয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এখন যেন এক সূত্রপাতে পদক্ষেপ করিতে পারিবেন, তাহার আশা সঞ্চারিত হইতে থাকিল। কুইনাইন্-ব্যতিরিক্ত অপরাপর ঔষধের মধ্যেও বিলক্ষণ পরীক্ষার প্রবাহ চলিতে লাগিল; তন্মধ্যে গন্ধক (Sulphur), পারদ (Mercury or Quicksilver), মৃগনাভি (Musk), আর্সেনিক (Arsenic), ধুস্তূর (ধুতুরা), সর্পবিষ ইত্যাদি এলোপ্যাথি-চিকিৎসক-

দিগের সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ সমূহের প্রকৃত রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ধুতুরা-ব্যবহারে নীরোগ দেহের মত্ততা জন্মায়, আবার উন্মত্ত অবস্থায় ধুস্তূর ঔষধের কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহা সু-প্রমাণিত হইল।

প্রায় সকলেরই বিদিত আছে, সর্প-বিষ কি ভয়ানক দ্রব্য! সেই বিভীষণ ভাব—অরোগ-দেহে ঔষধ-স্থানীয় না হউক, মুমূর্ষুর লুপ্ত স্বাস্থ্য পুনরাহ্বানে বিলক্ষণ দক্ষ, ইত্যাদি।

প্রত্যেক ঔষধের পরীক্ষায় মহাত্মা হানিমানের সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, "যে ভেষজ সেবন করিলে কিংবা করাইলে, যে সকল উপদ্রব সুপ্রবীণ চিকিৎসকের বিষয়-গোচর হইতে থাকে, সেই সকল উপদ্রব যে কোন ব্যাধিতে বর্ত্তমান থাকুক, ঐ ঔষধ-প্রয়োগে রোগোপসর্গ নিরাকৃত হয়, সুতরাং তাহাই সেই স্থলে যথার্থ ঔষধ-পদ-বাচ্য।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া হানিমান্ এই অভিনব মত-সংক্রান্ত ভূরি-প্রমাণ পুস্তক-রচনায় নিমগ্ন রহিলেন। ইতি-পূর্ব্বেই এলোপ্যাথি ঔষধের গুণ-পরীক্ষায় আবিষ্ট ছিলেন, এখনও তাহা হইতে অবসৃত হইলেন না। হানিমানের এই কার্য্যে অপর সাধারণ, বিশেষতঃ তাঁহার সমব্যবসায়ী মহাপুরুষগণের হানিমানের উপর বিজাতীয় বিদ্বেষ অনুদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে হানিমান্ তাহাতে কর্ণ-পাতমাত্রও না করিয়া, স্বকীয় লক্ষ্যে অটলভাব দর্শাইতেছিলেন। তিনি একে ত তাঁহাদের সমব্যবসায়ী, তাঁহাতে আবার পূর্ব্ব হইতেই ডাক্তারগণের প্রথম শ্রেণীতে সমারূঢ় ছিলেন, এবং সম্প্রতি আবার, তিনি যে দিকে অভিমুখীন, তাহাতে তাঁহার বিপক্ষগণের অকৃতার্থতা ও তাঁহার কৃতকার্য্যতা-লাভের অনেক নিদর্শন সুব্যক্ত। এই জন্যই সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রতিবাদ। সেই জন্যই চতুর্দ্দিকে হানি-মানের পরীবাদ রটনা! তদানীং তাহা-দের কার্য্যই এই হইয়া উঠিল, কি উপায়ে হানিমানের উন্মাদ-রোগ প্রতিপন্ন করা যায়। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "গ্রীক পণ্ডিত হিপক্রিটিসের কাল হইতে, এপর্য্যন্ত কেহ পণ্ডিত হয় নাই, হানিমানই কেবল বিদ্বান্ জন্মিয়াছেন। আজন্ম-সম্মানিত শাস্ত্র সর্ব্বৈব মিথ্যা, আর হানিমান্ প্রামাণ্য!" এই শ্রেণীর চিকিৎসক মহানুভাবেরা হানিমান-প্রচারিত নবীন চিকিৎসা-তত্ত্বের কদাচ পরীক্ষা করেন নাই, পরীক্ষায় নিশ্চয় সুফল দৃষ্ট হইতে পারিবে, এ বোধও তাঁহাদের অনেকের ছিল। কিন্তু পাছে গুণ গ্রহণ করিতে হয়, তজ্জন্য তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে বিষয়ের পরীক্ষা করিতে পশ্চাৎ-পাদ ছিলেন। এই সকল লোকের মতে অনাস্থা প্রদর্শন মহত্ত্বের লক্ষণ। ইহা করিয়াও তাঁহাদের মনের সাধ পূরে নাই। ইহাঁরা এক চক্রান্ত-পাশ বিস্তার করিয়া লিপ্‌জিক নগরের শাসন-কর্ত্তার নিকট হানিমানের বিরুদ্ধে আজ্ঞাপত্র বাহির করাইলেন, "কোন

ডাক্তারই নিজে রোগীকে ঔষধ দিতে পারিবেন না। ডাক্তার-প্রদত্ত ব্যবস্থা-পত্রানুযায়ী ঔষধ, ঔষধ-বিক্রেতারা রোগীকে দিবে।” হানিমানের ইহাতে যার পর নাই ক্লেশ হয়। অধিক কি, নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে অগত্যা লিপ্‌জিক্ পরিত্যাগ করিতেও বাধ্য হইতে হইল। কেন না, তিনি স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিতেন; অপরে যাহা প্রস্তুত করে, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না; তিনি অন্য-দত্ত ঔষধে সন্দেহ করিতেন। পাছে ঔষধ প্রকৃত না হয়, এই তাঁহার প্রধান চিন্তা। তাহাতে পীড়িতের মৃত্যু সম্ভাবনা এবং তাঁহারও অধ্যবসায়ের সমূলোৎপাটন ঘটিবে। এতদপেক্ষা আর এক বিপদ্ হানিমানের হইল। ঔষধ-বিক্রেতৃগণ তাঁহার আদেশমত ঔষধ প্রস্তুত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। সুতরাং “ব্যবস্থাপত্র দৃষ্টে ঔষধ-বিক্রেতাদিগের রোগীকে ঔষধ দিতে হইবে” অনুশাসন-পত্র-নির্দ্দেশিত এই অনুজ্ঞা হানিমানের পক্ষে কুলিশ-পাতোপম বোধ হইতে লাগিল। এই সময় তাঁহার দারিদ্র্যের একশেষ। অর্থের অপ্রতুলে পরিজন প্রতিপালন করা তাঁহার সাধ্যের অতীত হইয়া উঠিল। হানিমানের জীবনের এই শোচনীয় কাল, কি কূট পরীক্ষার পরিচয় দান করিতেছে!!!

এই পৃথিবীতে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কত শত মানব ঘোরতররূপে অবমানিত হইয়াছেন। অসত্য যুগের কাণ্ডজ্ঞান-রহিত নামমাত্র মনুষ্যের ন্যায়, কত মূঢ় কত উদার হৃদয়বান্‌কে পদদলিত করিয়াছে, ভূত কালের সাক্ষী ইতিবৃত্ত তাহার প্রমাণ-স্থল। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিবেন, প্রাচীনেরা তাঁহাকে কম কি লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন? ধর্ম্ম-সংস্কারকের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই, খৃষ্ট, মহম্মদ, গুরুগোবিন্দ সিংহ, রামমোহন রায় ইহাঁদিগের কত উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল! জীবন লইয়া টানাটানি হইয়া গিযাছে। ইটেরিয়ার খ্যাতনামা দার্শনিক গ্যালিলিওকে পৃথিবীর গতি-স্বীকার করিতে গিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি কারাগারে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। প্রচলিত দেব দেবীর আরাধনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গ্রীশ-দেশীয় পণ্ডিত সক্রেটিসের অন্যায়-রূপে মৃত্যু হয়।

সম্প্রতি আমরা হানিমানের পূর্ব্ব অবস্থার প্রাদুর্ভাব চিন্তা করিব। হানিমান্ ইহার পূর্ব্বেই দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। গোমারেণ নামক স্থানে যখন তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, কোন ঔষধ-বিক্রেতার হেন্‌রিএটি নাম্নী দুহিতার সহিত হানিমান্ পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। উদ্বাহের কিয়ৎ কাল বিগত হইলে পর, তিনি শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া, ড্রেস্‌ডেনে গমন করেন। এখানে তাঁহাকে চারি বৎসর অতিবাহিত

করিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিনিধি চিকিৎসকের কার্য্যে নিয়োজিত হন। এখন তিনি এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন।

এই প্রতিনিধিত্বে হানিমানের বিদ্যাবত্তার অশেষপ্রমাণ পাওয়া যায়। এই অবস্থায় হানিমান্ রোগীর এরূপ আশ্বাসস্থল হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলে, রোগী আপনাকে সুস্থ ভাবিত। সুতরাং তাঁহার নাম তৎকালে চারি দিকে বিস্তৃত হইল। হানিমান্ স্বয়ং পুস্তকোক্ত চিকিৎসায় বিরত থাকিয়া রোগলক্ষণ মত রোগ নির্ব্বাচন করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন। লোকের বিশ্বাস—দৃঢ় সংস্কার, তিনি অদ্বিতীয় ডাক্তার। হানিমান্ নিজে কিন্তু আপনাকে ভ্রম-শূন্য বুঝিয়া রাখেন নাই। ঈদৃশ অবস্থায় কাল-যাপন করিতে করিতে, তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্তঃসার-হীনতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং এই সময় হইতেই তাঁহার অপযশের সূত্রপাত। যাঁহারা তাঁহাকে বিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, প্রথম প্রথম তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ঐ জনশ্রুতিতে শ্রদ্ধা-সমর্পণে কুণ্ঠিত হন। হানিমান্ ভ্রমসঙ্কুল অনিশ্চিত প্রণালীকে হতাদর করিয়া চিকিৎসা-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। যাহা মিথ্যা, তাহার কল্যাণে লোকের নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন, তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। যে সকল রোগী তাঁহার ব্যবস্থিত ভেষজে ব্যাধির আক্রমণ হইতে উপশম লাভ করিত, সেইরূপে চিকিৎসিত না হইলেও অনায়াসে যথাসময়ে তাহাদের প্রকৃতিস্থ হইবার বহুল সম্ভাবনা, ইহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস।—তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, ন্যায়বান্ ঈশ্বরের রাজত্বে সমূহ বিষয়ের শৃঙ্খলা রহিয়াছে; ভাল, চিকিৎসা-শাস্ত্রে কি তাদৃশ সংঘটনের কোন বাধা আছে? এই উদ্দেশ্য যাহাতে কার্য্যে পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ হন, তদুদ্দেশে তিনি ভাল করিয়া রসায়ন-শাস্ত্রের দ্বিতীয় বার অনুশীলন করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাহাতে অভীষ্ট-সিদ্ধি পূর্ব্ববৎ বিফল হইল।

মহোদয়গণের ভাগ্যে জীবিত কালে সম্মান লাভ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। হানিমানেও প্রকৃতির অবিরোধী সেই নিয়মের বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হইতে দেখা যায় না। যাহা হউক, এই অবস্থায় পড়িয়া যখন তিনি বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক লিপ্‌জিক পরিত্যাগ করেন, তখন পথিমধ্যে যান-ভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার একটী পুত্র কাল কবলে পতিত ও একটী দুহিতা আহত হয়। যখন এই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখনও যদি পুনরায় পূর্ব্বাশ্রিত চিকিৎসা-প্রণালী-অবলম্বনে মনঃস্থ করিতেন, অদৃষ্ট-শ্রী নিঃসন্দেহ তাঁহার সাহায্য করিতেন। কিন্তু, তিনি সে ধাতুর মানুষ নহেন। যাহা একেবারে সত্য বুঝিয়াছেন, দারিদ্র্যের অত্যাচারে

তাহা পরিবর্জন, হানিমানের অসাধ্য হইল। যাহা হউক অতঃপর তাঁহার উন্নতি সোপানের সূচনা আরম্ভ হইল।

এই সময়ে আন্হল্ট কোথেনের ডিউক হানিমানকে সাদরে আহ্বান করিলেন। তিনি ডিউকের এই প্রার্থনীয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তথায় গমন করিলেন। হানিমান্ এই স্থানে আর এক নূতন চিকিৎসার আরম্ভ করিয়াছিলেন। দগ্ধ হইলে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, প্রাচীনেরা সুস্নিগ্ধ জল দ্বারা তাহার উপশম করিতেন। হানিমান্ তৎপরিবর্ত্তে যে উপায় উদ্ভাবিত করেন, তাহা ইউরোপের সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রলুপ্ত গৌরব তখনও পুনর্লব্ধ হইতে অবশিষ্ট রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।

স্কচ্-ইতিবৃত্ত-সম্বলিত

বীরবর ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্কট্-রাজ বেলিয়লের পরিণাম।

বারউইক্ ও ডন্বার সমর।

(স্কট্লণ্ডের শোচনীয় অবস্থা।)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এড্ওয়ার্ড বেলিয়লের স্বাপক্ষ্যে স্কটিশ্ সিংহাসন বিধান করিলেন। তদনুসারে ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে ২০ শে নবেম্বর তারিখে বেলিয়ল্ শপথ গ্রহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডেশ্বরের সামন্ত-রূপে স্কটিশ রাজ্যের অধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত মাসেরই ৩০ শে তারিখে তিনি স্কুন্ নগরের শিলাপট্টে বসিয়া মস্তকে স্কট্লণ্ডের রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর নিউকাসল্ দুর্গে তাঁহাকে ভবিষ্যৎ বিশ্বাস রক্ষার জন্য এড্ওয়ার্ড সকাশে দ্বিতীয় বার শপথ গ্রহণ করিতে হইল।

কিন্তু এই রাজমুকুট তাঁহার মস্তকে কণ্টকমুকুট বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। কথায় কথায় এড্ওয়ার্ড তাঁহাকে সামান্য ব্যারণের ন্যায় ইংলণ্ডের রাজ-সভায় আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজসিংহাসন বেলিয়লের কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি যখন এড্ওয়ার্ডের সহিত সসৈন্য ইউরোপ যাত্রা করিতে আদিষ্ট

হইলেন, তখন আর তাঁহার ধৈর্য্য রহিল না। সেই কাপুরুষের অন্তরেও তখন বীর্য্যবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি স্কটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশ্য দরবারে এড্ওয়ার্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করেন; এবং ফরাশিরাজ ফিলিপের সহিত গাঢ় সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন। এরূপ কার্য্যের পরিণাম কি হইবে বুঝিতে পারিয়া স্কট্লণ্ডবাসিগণ এক বাক্যে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। জাতীয় বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ করিলেন। পাছে অগ্রেই এড্ওয়ার্ডের দুরন্ত সেনা আসিয়া স্কট্লণ্ডের চতুর্দ্দিকে ধ্বংস বিস্তার করে, এই ভয়ে তাঁহারা অগ্রেই ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া ইংলণ্ডকে সমরক্ষেত্র করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তাঁহারা অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাদিগের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহারা কম্বর্লণ্ড অতিক্রম করিয়া নিউকাসল দুর্গ আক্রমণ ও তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিয়া, ৮ই এপ্রিল নর্দ্দাম্বর্লণ্ড প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক লেনার উপকূল এবং হেক্সাম্ নগর লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন।

এদিকে এড্ওয়ার্ড এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া অচিরকাল মধ্যেই বারউইক নগরের সমীপে মহতী সেনা সমবেত করিলেন। স্কট্লণ্ড লার্গস্ যুদ্ধের পর একবারও সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন নাই। সুতরাং স্কটিশ্ সেনা যদিও বীর্য্যবত্তা ও সজ্জায় এড্ওয়ার্ডের সেনা অপেক্ষা কিছুতেই ন্যূন ছিল না; তথাপি শাসন ও বহুদর্শিতা সম্বন্ধে ইউরোপ রণক্ষেত্রে রণদীক্ষিত বীরদর্পী এড্ওয়ার্ডের সেনার সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না। যাহা হউক্ তথাপি বারউক নগরের অবরোধ কালে স্কট্সেনা অবরোধক এড্ওয়ার্ডের ষোল খানি রণতরি বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এড্ওয়ার্ড আর সহ্য করিতে না পারিয়া সসৈন্য প্রবল বেগে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্যম প্রতিহত হইল। ইংরাজ-বল যাহা সাধিতে অক্ষম হয়, ইংরাজ-কৌশল তাহা সংসিদ্ধ করে। এড্ওয়ার্ড বলে বারউইক্ গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া কৌশল অবলম্বন করিলেন। এবার কৃতকার্য্য হইলেন। এই নগর গ্রহণ করিয়া তিনি নগরবাসিদিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার কালোপম সৈনিক পুরুষগণকে অধিবাসিবৃন্দের প্রতি যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতে আদেশ করেন, তাহা পাঠ করিয়া, আমাদিগের শোণিত শুষ্ক হয়, তাহা পাঠ করিলে নৃশংস পামরেরও হৃদয় বিগলিত হয়। ইংরাজেরা অন্ধ-কূপহত্যার ঘটনা লইয়া সিরাজকে নরপিশাচ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু অন্ধকূপহত্যা সিরাজের ইচ্ছা-

প্রণোদিত হয় নাই। অন্ধকূপ হত্যা সিরাজের অনবধানতার ফলমাত্র। কিন্তু এড্‌ওয়ার্ডের আদেশে সে দিবস বার্‌-উইকের বালবৃদ্ধবনিতা পর্য্যন্তও শাণিত তরবারির হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। এড্‌ওয়ার্ডের আদেশে বারউইক যজ্ঞ-ক্ষেত্রে সর্ব্বশুদ্ধ সপ্তদশ সহস্র নিরস্ত্র নিরীহ অধিবাসীর বলিদান হয়। ২৮ এ এপ্রিল সুপ্রসিদ্ধ ডন্‌বার সমরে উভয় দলের তুমুল সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে ওয়ারেন্‌ ও সরের আরল্‌দ্বয় মহতী ইংলণ্ডীয় সেনার অধিনায়কত্ব পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তাঁহারা অশিক্ষিত ও বিশৃঙ্খল স্কটিশ সেনার অসাময়িক আক্রমণ অনায়াসে প্রতিহত করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। ওয়ালেসের জীবনী-লেখক অন্ধ কবি হেন্‌রীর মতে এই দুই যুদ্ধের পরাজয়ের প্রধান কারণ জাতীয় বিশ্বাস-ঘাতকতা। স্কটিশ সিংহাসনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী মার্চ্চের আরল এড্‌ওয়ার্ডের সহিত যোগ না দিলে এবং ডন্‌বার দুর্গের গবর্ণর সার্‌ রিচার্ড সিউয়ার্ড ইংরাজ-সেনাপতি ওয়ারেণের হস্তে ডন্‌বার দুর্গ সমর্পণ না করিলে, এই সমরের পরিণাম কি হইত বলা যায় না। এই বিশ্বাস-ঘাতক সিউয়ার্ড একজন স্কট্‌-রাজগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত আশ্রিত নর্ম্মান্‌ সামন্ত। সুতরাং স্কট্‌লণ্ডের জাতীয় গৌরব ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইনি বিন্দুমাত্রও ব্যগ্র ছিলেন না। আর মার্চ্চের আরল্‌ যদিও এক-জন সম্ভ্রান্ত-প্রাচীন-বংশ-সম্ভূত স্কট্‌ সামন্ত, তথাপি তিনি অপদস্থ হইয়া বেলিয়লের অধীনে থাকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া অধিকতর গৌরবের বিষয় মনে করিলেন। যাহা হউক এই জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ডন্‌বার রণক্ষেত্রে দশ সহস্র স্কট্‌ প্রাণ হারাইল। নির্লজ্জ বেলিয়ল্‌ অতীত কার্য্যের নিমিত্ত অনুতাপ প্রকাশ করিয়া প্রাণ ভিক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু সপুত্র লণ্ডন টাওয়ারের ভীষণ কারাগারে প্রক্ষিপ্ত হইলেন; এবং অসংখ্য স্কটিশ সামন্ত শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

এরূপ কথিত আছে যে ধূর্ত্ত এডওয়ার্ড, ব্রুসের পুত্রকে বিদ্রোহী বেলিয়লের সিংহাসন প্রদান করিবেন এই প্রলোভন দেখাইয়া ব্রুস্‌ ও তদীয় পক্ষকে আপনার স্বাপক্ষ্যে আনিয়াছিলেন। এই লুব্ধ আশ্বাসে ডন্‌বার রণে ব্রুস্‌ ও তদীয় দল জাতীয় দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। যুদ্ধের পর ব্রুস্‌ এড্‌ওয়ার্ডকে তদীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলে, বিজয়দৃপ্ত এড্‌ওয়ার্ড বলিয়া উঠিলেন—"কি! আমার কি আর কোন কর্ম্ম ছিল না যে আমি তোমার জন্য—জাতীয় অর্থে ও জাতীয় রুধিরে রাজ্য জয় করিব?" ব্রুস নীরবে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সেই অবধি তিনি তদীয় ইংলণ্ডস্থিত জমিদারিতে নিভৃতভাবে বাস

করিতে লাগিলেন। তদবধি তিনি আর কোন রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তদীয় পুত্র রবার্ট ব্রুস্ এই সময় মাতৃসম্বন্ধে ক্যারিকের আরলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইক্ষণেও তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশ বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি পিতৃবৈবাগ্যে সন্তুষ্ট না হইয়া অতঃপর পিতা হইতে স্বাধীন ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

ডন্‌বার বিজয়ের পর ওয়েল্‌স্ ও আরল্‌ও হইতে পঞ্চদশ সহস্র সজীবসৈন্য আসিয়া এড্‌ওয়ার্ডের সহিত মিলিত হইল। এড্‌ওয়ার্ড সেই উপচিত বিজয়ী সৈন্য লইয়া একবিংশতি সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া সমস্ত স্কটলণ্ড আলোড়িত করিয়া বেড়াইলেন। তিনি শুদ্ধ লোকের ধন প্রাণ নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি জাতীয় পুনর্জ্জীবনের প্রধান উদ্দীপক জাতীয় কাগজপত্র ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন ও জাতীয় রাজভক্তি উত্তেজক কুন্‌-নগরস্থিত সুপ্রসিদ্ধ অভিষেক-শিলা ওয়েষ্টমিনিষ্টরে প্রেরণ করিলেন।

যাইবার সময় তিনি জন্ ওয়ারেন্ ও সরের আরল্‌কে স্কটলণ্ডের শাসনকর্ত্তা, ক্রেসিংহামকে কোষাধ্যক্ষ, অর্মেস্‌বাইকে প্রধান বিচারপতি, ওয়ারেনের ভাগিনেয় পার্সীকে গল্‌ওয়ে প্রদেশের রক্ষক ও আয়ারের সেরিফ, এবং ক্লিফোর্ডকে পূর্ব্ব স্কট্‌লণ্ডের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। বোধ হইল যেন তিনি স্কটলণ্ডকে অষ্ট পৃষ্ঠে শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিলেন। বোধ হইল যেন সে শৃঙ্খল ভেদ করিয়া স্কট্‌লণ্ড আর কখন উঠিবে না! যেন আর কখন ইহার অদৃষ্ট-গগনে সৌভাগ্য-রবি উদিত হইবে না!

চতুর্থ অধ্যায়।

ওয়ালেসের শবসাধন।

স্কটিশ শ্মশান ক্ষেত্র।

লাউডনগিরি যুদ্ধ।

যখন বারউইকে ও ডন্‌বারে এই তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন সাধকবর ওয়ালেস্ গভীর শব সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। বারউইক্ ও ডন্‌বার সমরের কি পরিণাম হইবে তিনি তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে এডওয়ার্ডের সুশিক্ষিত ও ও রণবৃদ্ধ সৈনিক-বৃন্দের সহিত স্কট্‌লণ্ডের অশিক্ষিত ও নব-চযিত সেনা কখনই সম্মুখসমরে জয়লাভ করিতে পারিবে না। জানিয়া তিনি সবলকায় কষ্টসহ যুবা বীরপুরুষগণ লইয়া একটী মহতী সেনা সংগ্রহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ দিকে তাঁহার অলৌকিক অবদানপরম্পরা, অমানুষ শারীরিক বল, অবিচলিত সহিষ্ণুতা, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অদমিত স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের—যশ সর্ব্বত্র প্রসৃত হওয়ায়, অসংখ্য বীরবৃন্দ আসিয়া

তাঁহার অধিনায়কত্ব স্বীকার করিল। বস্তুতঃ এড্ওয়ার্ডের দুর্ব্বৃত্ত সৈনিক-গণের অসহ্য অত্যাচারে, ও তদীয় পিতৃ-ভ্রাতৃ-বধে ওয়ালেসের অন্তরে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের ভাব এতদুর প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, যত দিন শত্রু-নির্যাতন না হইতেছে তত দিন এ জীবন তাঁহার নিকট দুর্ব্বিষহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি অন্ত-র্নিগূহিত ক্রোধানলে আপনিই দগ্ধ হইতে লাগিলেন, স্বজাতির চরণে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই—উৎসর্গীকৃত প্রাণ স্বজাতির উদ্ধারব্রতে ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছিলেন বলিয়াই—ওয়ালেস্ অমর হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি একাকী লক্ষ লোকের বল ধারণ করিতেন। সেই অমিতবলশালী স্বদেশানুরাগোন্মত্ত দৈব-শক্তিসম্পন্ন ওয়ালেসের পতাকামূলে ক্রমে কতিপয় স্বজাতি-প্রেমিক আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেই স্বর্গীয় দল লইয়া দেবোপম ওয়ালেস্ বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে একপ্রকার বিশৃঙ্খল গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

আয়ারের দুর্ঘটনার পর ওয়ালেস্ রিকার্টনে আসিয়া জননীর সহিত বাস করিতেছিলেন; এই সময় উক্ত বীরবৃন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। তাহার মধ্যে সার্ রিচার্ডের তিন পুত্র এডাম্, রিচার্ড, ও সাইমন্, এবং রবার্ট বয়েড্ ও নেলাণ্ড,—এই কয়জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওয়ালেস্ জননীর নিকট বিদায় লইয়া রিকার্টন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কয়জন মাত্র সহচর সহ সুবিখ্যাত রণক্ষেত্র ম্যাক্লিন্ মুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নিদাঘকাল সমাগত। প্রকৃতি চতুর্দ্দিকে যেন হাস্য বিস্তার করিতেছেন। একদিকে স্কট্-লণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ দুর্ভিক্ষের জ্বালায় অস্থির, অন্য দিকে পর্য্যাপ্তভোজী ও অপরিমিতপায়ী এড্ওয়ার্ডের সৈন্য-গণের বিলাসোন্মাদ। এ দৃশ্যে জাতীয় দলের হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হইল। প্রতিহিংসাবৃত্তি ওয়ালেসের হৃদয়ে প্রবলতর বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নিরন্তর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। অনতিকাল-মধ্যেই সুবিধা আসিয়াও উপস্থিত হইল।

তাঁহাদিগের ম্যাক্লিন্ মুরে অবস্থিতির অনতিবিলম্বেই সংবাদ আসিল যে ফেন্উইক্-নামক এক জন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ আয়ারের সেরিফ পার্সীর জন্য কার্লাইল নগর হইতে দ্রব্যসামগ্রী-পূর্ণ সেনাপরিবৃত কয়েকখানি শকট লইয়া যাইতেছে। এই ব্যক্তির হস্তেই ওয়ালেসের পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং ওয়ালেস্ এই সংবাদে নিতান্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি অবিলম্বে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই উদ্দেশে তাঁহারা লাউডন্ অভিমুখে

যাত্রা করিলেন। পঞ্চাশ জন মাত্র বীরপুরুষ তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল। রজনী আগতপ্রায়—এমন সময় তাঁহারা অদূরবর্ত্তী এক বন মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। সমস্ত রজনী তথায় অবস্থিতি করিয়া শুনিতে পাইলেন যে অদূরে সেই সৈনিক দল আসিতেছে।

এদিকে ঊষা দেবী পূর্ব্ব দিক্ রঞ্জিত করিয়া গগনপটে উদিত হইয়াছেন। সেই ক্ষুদ্র পেট্রিয়ট্ (১) দল এই পবিত্র সময়ে নতজানু হইয়া ভক্তিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন, এবং তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন—যে হয় এই যুদ্ধে জয় লাভ করিবেন, নয় প্রাণত্যাগ করিবেন। ভারতেও স্বজাতি-প্রেমের এরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। চিনেল্‌ওয়ালা সমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে বীর-চূড়ামণি শিখগণ আপন আপন শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমাপন করিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারাও সেই যুদ্ধে—বিজয় লাভ বা প্রাণত্যাগ—এই দুইএর অন্যতর পক্ষ স্থির করিয়াছিলেন।

ওয়ালেস্—ফেন্‌উইক্ কর্ত্তৃক পিতৃ-বধের ঘটনা উল্লেখ পূর্ব্বক সহচরবৃন্দের অন্তরে প্রতিহিংসাবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিলেন। সেই বীরবৃন্দ বিশেষ আগ্রহের সহিত ইংরাজ সেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফেন্‌উইক্—দুই শত ইংরাজ অশ্বসেনার সঙ্গে আসিতেছিল। সে ঊষার স্বর্ণ আলোকে দূর হইতে ওয়ালেস্‌কে চিনিতে পারিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল; ভাবিল 'এই দুরাচার আমাদিগের কারাগার হইতে বড় রক্ষা পাইয়াছে; ইহাকে এইবার বন্দী করিয়া পার্সীর নিকট লইয়া যাই।' এই আশায় উদ্দীপিত হইয়া ফেন্‌উইক্ সামগ্রীপূর্ণ শকট-মালার ভার বিশ জন সৈনিকের উপর ন্যস্ত করিয়া অবশিষ্ট একশত অশীতিজন সৈনিক পুরুষ লইয়া সেই ক্ষুদ্র পেট্রিয়ট্ দলকে আক্রমণ করিল।

ওয়ালেসের সর্ব্বশরীর লৌহ-কঞ্চুকাবৃত; মস্তক লোহিত-সিংহ-সূচিত হেল্‌মেটে সুশোভিত; স্কন্ধে একখানি ত্রিকোণ ঢাল, দ্বিকর তরবারি, গদা ও বর্শা; এবং কটিদেশে শাণিত ছুরিকা। তাঁহার সহচরবৃন্দও তদনুরূপ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত। তাঁহারা ইংরাজ অশ্বারোহিগণের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া প্রবলবেগে তাহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ফেন্‌উইক্ ভাবিয়াছিল যে সবেগে তাঁহাদিগের অভিমুখে অশ্বচালনা করিয়া বিনা প্রতিঘাতে সেই বীর-দলকে অশ্বপদদলিত করিবে, কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিল দেখিয়া বিস্ময়মগ্ন হইল।

(১) যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন তাঁহাদিগকে পেট্রিয়ট্ বলে। এই শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নাই, এবং সংস্কৃত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হওয়াও দুরূহ এই জন্য আমরা প্রেট্রিয়ট্ শব্দই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।

স্কট্ দিগের আক্রমণ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। তাঁহারা ব্যূহ ভেদ করিয়া সবেগে ইংরাজ সৈন্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিলেন। কিন্তু ছিন্ন ভিন্ন ইংরাজ অশ্বারোহিগণ মুহূর্ত্ত-মধ্যে ফিরিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ওয়ালেসের বর্শা ও তরবারির আঘাতে অসংখ্য অশ্বারোহী ভূপাতিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বোচ্চ-অশ্ব পৃষ্ঠারূঢ় ফেন্‌-উইকের উপর পতিত হইল। তিনি অন্তর্বর্ত্তী অসংখ্য ব্যক্তিকে শমন-সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক ক্রোধোদ্দীপ্ত সিংহের ন্যায় প্রচণ্ড গর্জ্জন পূর্ব্বক ফেন্‌উইকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেসের প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে ফেন্‌উইক্ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইল; অমনি বয়িড্ আসিয়া উপস্থিত হইয়া খড়্গাগ্র দ্বারা তাহাকে ভূমিসংলগ্ন করিল। ফেন্‌উইক্‌কে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ইংরাজ সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া বয়িডের উপর পতিত হইল। এমন সময় ওয়ালেস্ আসিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিল। দুই বীর-কেশরী প্রতি-রোধকারিদিগকে কাটিতে কাটিতে ব্যূহ ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন। ইংরাজ সৈনিকগণ নায়কের মৃত্যুতে ভগ্ন-হৃদয় হইয়াও দ্বিতীয় সেনানায়ক বোমণ্ড কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া অদম্য তেজে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে রিকার্টনের যুবা—ওয়ালেসের হস্তে বোমণ্ডও ভূতলশায়ী হইল। দুর্নিবার্য্য ইংরাজ তেজ ইহাতেও প্রশমিত হইবার নহে। ইংরাজ অশ্বারোহিগণ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া পদাতিকভাবে ঘোরতর রণে মগ্ন হইল। কিন্তু ওয়ালেস্ ও তদীয় বীরবৃন্দের অসামান্য বীর্য্যবত্তার নিকট সকলই পরাস্ত হইল। রণক্ষেত্রে শতাধিক ইংরাজদেহ রাখিয়া অবশিষ্ট ইংরাজ সৈন্য বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিল। জাতীয় দলের কেবল তিনজন মাত্র হত হইয়াছিল।

ফেন্‌উইকের সমভিব্যাহারে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বিজয়ী স্কট্‌দিগের হস্তগত হইল। বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ শকটরাজি, বিংশাধিক শত সুসজ্জিত অশ্ব, সুবর্ণ, সুরা, ও অন্যান্য পর্য্যাপ্ত পরিমিত খাদ্য দ্রব্য—এ সমস্তই তাঁহাদিগের করতলস্থ হইল। এ সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া তাঁহারা ক্লাইডেসডেল্ বনে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। যে অশীতি-সংখ্যক ইংরাজ সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে আয়ারের গবর্ণর পার্সীর নিকট এই শোচনীয় বার্ত্তা লইয়া গেল।

ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ওয়ালেসের এই সর্ব্ব-প্রথম সম্মুখ-সমর। এই প্রথম সমরেই ওয়ালেস্ চতুর্গুণ ইংরাজ সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। লাউডান্ পাহাড় স্কট্‌লণ্ডের পাণিপথ। এই

খানে তিনবার স্কট্‌লণ্ডের অদৃষ্ট পরীক্ষিত হয়। এখানে একবার রোমীয়দিগের সহিত, ও দ্বিতীয়বার ইংরাজদিগের সহিত স্কটদিগের ভীষণ সমর হয়। তৃতীয় বার প্রথম চার্লসের সময় ধর্ম্মবিষয়ক ও বিধিবিষয়ক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া রাজকীয় দলের সহিত লোকতান্ত্রিক দলের ঘোরতর রণ হয়।

পার্সী এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। আহারীয় দ্রব্যের অল্পতা নিবন্ধন আযার দুর্গের সেনাদল অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল। তিনি ওয়ালেস্‌কে মৃতবোধে আয়ার দুর্গের প্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য হইয়াছিল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি অনুযোগ করিতে লাগিলেন; এবং অতঃপর কার্লাইল হইতে স্থলপথে দ্রব্যসামগ্রী না পাঠাইয়া জলপথে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন।

এদিকে ওয়ালেস্ ও তৎসহচরবৃন্দ একবিংশতি দিন ক্লাইডেস্‌ডেল্ অরণ্যে অজ্ঞাত বাসে থাকিয়া জাতীয় শত্রুদিগকে জ্বালাতন করিবার বিবিধ নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ভয়ে সেই সময় সে পথে আর একটীও ইংরাজ পরিদৃষ্ট হইত না। ক্রমে লাউডন্ পাহাড়ের যুদ্ধের সংবাদ স্কট্‌লণ্ডের সর্ব্বত্র প্রসৃত হইল; এবং ওয়ালেসের নামে একদিকে যেমন ইংরাজ-শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল, অন্য দিকে উৎপীড়িত স্কট্‌লণ্ডবাসিগণের অন্তর উৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

পার্সী অনতিবিলম্বে গ্লাস্‌গো নগরে ইংরাজ সামন্ত ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের একটী মহতী সভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় প্রায় দশ সহস্র ইংরাজ সমবেত হন। সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ওয়ালেস্। বথ্‌ওয়েল্-নিবাসী সার্ আমের্ ডি ভালেন্‌স্ নামক একজন স্বজাতি-বিশ্বাসঘাতক স্কট্ পরামর্শ দিল যে এড্‌ওয়ার্ডের আদেশ আশা পর্য্যন্ত ওয়ালেসের সহিত একটী সাময়িক সন্ধি হউক্। পার্সী বলিলেন যে ওয়ালেস্ সন্ধিতে সম্মত হইবেন না। ভালেন্‌স উত্তর করিল যে ওয়ালেসের খুল্লতাত রিকার্টনের সেরিফ্ সার্ রেণাল্ড দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে, এবং সন্ধি রক্ষার জন্য সার্ রেণাল্ডের ভূমি-সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সার্ রেণাল্ড তৎক্ষণাৎ আহূত হইলেন। ওয়ালেস্‌কে দমন করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া তিনি তাহাতে প্রথমে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পার্সীর একান্ত অনুরোধে পড়িয়া অবশেষে তিনি স্বীকার করিলেন। পার্সী এড্‌ওয়ার্ডের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন যে যতদিন এই সন্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন কেহই ওয়ালেসের কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না। সার্ রেণাল্ড এই সন্ধিপত্র সহ ক্লাইডেস্‌ডেল্ অরণ্যে গমন করি-

লেন। ওয়ালেস্ ভোজনে বসিতে-ছিলেন এমন সময় সার্ রেণাল্ড তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই জনে পরম প্রীতির সহিত পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। অবশেষে দুই জনে মনের উল্লাসে পান ভোজনাদি সমাপনের পর, রেণাল্ড ওয়ালেসের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে ইহাতে স্বীকৃত হইতে অনুরোধ করিলেন; এবং বলিলেন এই সময়ের মধ্যে তিনি ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে পারিবেন। ওয়ালেস্ সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "ধূর্ত্ত বিশ্বাসঘাতকের সন্ধিতে বিশ্বাস কি?" কিন্তু অবশেষে সহচরবৃন্দের পরামর্শে ও খুল্লতাতের বিপদ্ভয়ে ইংরাজগণের সহিত একটী স্বল্পকালস্থায়ী সন্ধি সংবদ্ধ করিলেন। এই সন্ধি দশমাস কালমাত্র স্থায়ী হইবে। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই সন্ধি সংগ্রথিত হয়। এই সন্ধির পর সেই পেট্রিয়ট দলের প্রত্যেকেই স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। ওয়ালেস্ও খুল্লতাত সমভিব্যাহারে করস্বী নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু একটী ইংরাজচরণ স্কট্লণ্ড ভূমিতে থাকিতে ওয়ালেসের হৃদয় স্থির থাকিবার নহে। ইংরাজেরা আয়ার্ নগরে এক্ষণে কি করিতেছেন দেখিবার নিমিত্ত একদিন ওয়ালেস কৌতূহলো দ্দীপিত হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়ালেস্ আত্মগোপনমানসে আপাদমস্তক ধর্ম্মাবৃত করিয়া আসিয়াছিলেন। নগরের অভ্যন্তরে আসিয়া দেখিলেন একজন ইংরাজ—বক্লার হস্তে ফেন্সিং ক্রীড়া করিতেছে। এই ব্যক্তি বিদ্রূপ করিয়া ওয়ালেস্‌কে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে আহ্বান করিল আর বলিল "ওহে, বর্ম্মধর! তোমার যত বিদ্যা অগ্রেই বুঝা গিয়াছে।" এই বিদ্রূপ-বাক্য ওয়ালেসের অসহ্য বোধ হইল। তিনি তদীয় করাল অসি এরূপ প্রচণ্ডবেগে তাহার মস্তকের মধ্যভাগে প্রক্ষেপ করিলেন যে তাহা তাহার মস্তক দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল। ওয়ালেস্ অকুতোভয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে আপন দলের ভিতর আসিলেন। ষোল জন মাত্র সহচর তাঁহার সহিত আসিয়া-ছিল। অনতিবিলম্বেই সপ্তগুণিত বিশ জন অস্ত্রধারী পুরুষ আসিয়া তাঁহা-দিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। যদিও ওয়ালেসের দলে বড় অধিক লোক ছিল না, তথাপি যে কয়জন ছিল, সকলেই সবিশেষ পরীক্ষিত, ও অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগে সুঅভ্যস্ত। সুতরাং তাঁহা-দিগের শাণিত খড়্গাঘাতে অনেক ইংরাজকেই ধূলি চুম্বন করিতে হইল। অচিরে পরাজিত ইংরাজ সৈনিকগণের সাহায্যার্থ দুর্গ হইতে এক দল সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। ওয়ালেস্ তথায় আর থাকা উচিত বিবেচনা না করিয়া তথা হইতে সদলে প্রস্থান

করিলেন। নবাধিক বিংশতি জন ইংরাজকে ধরাশায়ী করিয়া সেই ক্ষুদ্র বীর দল আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ল্যাঙ্‌লেন্‌ অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সকলেই অনুমান করিল যে এ সেই কুহকী ওয়ালেস্‌। অন্যথা আর কে এত অল্পসংখ্যক অনুযাত্রিক লইয়া এরূপ অমানুষ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়? এই যুদ্ধে যদিও পার্সীর তিন জন স্বসম্পর্কীয় লোক হত হয়, তথাপি আপনারাই ইহার উত্তেজক বলিয়া, পার্সী ওয়ালেসের উপর সন্ধি-ভঙ্গের দোষারোপ করিতে পারিলেন না। তিনি সার্‌ রেণাল্ডকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে—"তুমি ওয়ালেস্‌কে কোন প্রকাশ্য বাজারে বা মেলায় উপস্থিত হইতে বারণ করিবে। কারণ সে সকল স্থলে তিনি উপস্থিত হইলে উভয় দলে এইরূপ বিবাদ হইবার সম্ভব।" এই পত্র পাইয়া রেণাল্ড করস্‌বী যাত্রা করিলেন, কারণ ওয়ালেস্‌ তখন ল্যাঙ্‌লেন্‌ অরণ্য হইতে আসিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। তথায় আসিয়া তিনি ওয়ালেস্‌কে পার্সীর পত্র দেখাইলেন। রেণাল্ডের প্রতি ওয়ালেসের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; সুতরাং তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যতদিন তিনি তাঁহার আশ্রয়ে থাকিবেন, ততদিন যাহাতে তাঁহার অনিষ্ট হইতে পারে এমন কোন কার্য্য তিনি করিবেন না।

কি ছিল ভারতে?

১

জলদ-সঞ্চারী হিমাদ্রি-শেখরে
প্রকৃতির শ্বেত উচ্চ স্তম্ভোপরি
"কহ দাঁড়াইয়া সুগভীর-স্বরে
"কি ছিল ভারতে—কি নাই এখন?"—
কহ দাঁড়াইয়া—"ভারত-শ্মশান
"ছিল কি এমনি সমাধির স্থান?
"এমনি প্রতাপ (?) এমনি একতা (?)
"এমনি সরস-জ্ঞান-তরু-লতা (?)
"এমনি বীরত্ব (?)—অক্ষয় অটল
"ছিল কি ভারতে মানবের বল?
ছুটিত কি বীর সমর-মদে?

২

কি শুনিবে তবে?—করুণ-রোদন
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি!
কাননের পশু—যত ব্যোমচর
গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র নিকর,
তরু গুল্ম লতা পর্ব্বত পাষাণ—
উঠিবে কাঁদিয়া—জ্বলিবে শ্মশান!
এ মহা প্রশ্নের কে দিবে উত্তর?

৩

কে দিবে উত্তর?—যদি পার তুমি
নৈসর্গিক চিত্র তন্ন তন্ন করি,

(ভারতের এক ভাব ইতিহাস।)
দেখিও চিত্রিত ভারত-লহরী।

৪

এই চিত্রে লেখা ভারতের শক্তি
এই চিত্রে লেখা ভারত-মহিমা!
এই ইতিহাসে—জ্বলন্ত ভাষায়
লিখিত ভারত-গৌরব-গরিমা!
এই চিত্রে মূর্ত্তি মণি-মণ্ডলিনী
অযুত আদিত্য চরণে লুটায়!
অঙ্গে দীপ্তগ্রহ!—কিরণে কিরণে
বিশ্বের প্রকৃতি নীরবে হাসায়
দেখ——
অই প্রভাস্তরে ফুটিয়া ফুটিয়া
প্রতিভার বিশ্ব উঠিছে হাসিয়া!
অঞ্চলে লুটিছে—অঞ্চলে খেলিছে
বজ্রের কিরণে তুলিছে ফুল!
হিমাদ্রির শৃঙ্গ ভাঙ্গিছে চরণে!
বাসুকী গরল ঢালিছে বদনে!
এরাই ভারত হৃদি-মুকুল!

৫

আরো স্পষ্টতর—চিত্র ভানু আভা
প্রভাতের পটে উজ্জ্বল যেমন;
চাও কি দেখিতে—ভারত-গৌরব
অনশ্বর চিত্রে—চিত্রিত কেমন?

৬

যাও তবে যাও—আরো এক পদ
হও অগ্রসর; হিরণ্য-তোরণ—
চির স্মৃতিধাম, অক্ষয়, অমর
ভারতের এই মণি-নিকেতন!—
এই কুরুক্ষেত্র—আর্য্য-তীর্থস্থল
ভারত-শক্তির জ্বলন্ত-উজ্জ্বল
অভিজ্ঞান-স্থান!—বিদ্যুত মণ্ডল!
এই কুরুক্ষেত্রে পবিত্র নির্ম্মল!

৭

এই কুরুক্ষেত্র—প্রতি তৃণে পত্রে
প্রতি বালুকায়,—পরমাণু-স্তরে
প্রতি রশ্মি-সূত্রে—গগনের কক্ষে
আজিও জ্বলন্ত রুধির সঞ্চরে!

৮

এই কুরুক্ষেত্র আর্য্যচিতা-স্থল
নিবিবে না চিতা কোটী কল্পযুগে;
এই কুরুক্ষেত্র ভারতের স্মৃতি
সুখ-ভস্ম-রাশি! অতীত-নিয়তি!

৯

কহ এই খানে বজ্রভেদী স্বরে
"কি ছিল ভারতে কি নাই এখন?"
এখনি জ্বলিবে কিরণ-মণ্ডল!
এখনি ছুটিবে গ্রহ তারা দল!
কোটী উল্কাপিণ্ড পড়িবে খসিয়া!
অমর শক্তির কিরণ জ্বলিয়া;
দীপ্ত-রাগ বর্ণ ঢালি ব্যোমস্তরে
বিশ্ব চেতনার আলোক-লহরে;
"দিক্‌দাহ" মেঘ রুধির কুন্তল
ভ্রমি বায়ু-চক্রে উগরি অনল,
খুলিবে বিচিত্র মণির ভাণ্ডার
বীর-বহ্নি দীপ্ত দৃশ্য চমৎকার!

১০

বীর-বংশে যদি জন্মে থাক তুমি
না হও কুপুত্র কুলের অঙ্গার,
অই বীর-বহ্নি-কুণ্ডের ভিতরে
প্রসারিত কর নিভিকে অঙ্গার!

১১

হীন কাপুরুষ—কুলের অধম,
নির্বীর্য্য—নিরগ্নি—নির্লজ্জ পামর
পারে না স্পর্শিতে এ পবিত্র বহ্নি
বীর-অস্থি-রন্ধ্রে জ্বলে নিরন্তর !

১২

(তাই যুগে যুগে, বহুল বৎসর
জ্বলে আর্য্যভূমে—আর্য্যের শ্মশান !
নাহি কেহ আর আর্য্য-বংশধর
নিবায় এ চিতা——চির অনির্ব্বাণ !)

১৩

যদি পার তুমি——আর্য্য-অস্থি-রাশি
তুলিয়া দেখিও যুগান্ত জ্বলনে (ও)
রুধিরের উগ্র তরঙ্গ-প্রবাহ
বহে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যুৎ-চাপনে !
অই রক্ত-বিন্দু অগ্নিতে অক্ষয় !
অই ক্ষুদ্র স্রোতে বিশ্ব হবে লয় !

১৪

অই ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র বিন্দু'পরি'
শত হিমালয় দাও চাপাইয়া;
ইন্দ্রের দম্ভোলী—শক্তির আয়ুধ
মহেশের বিশ্ব—প্রলয়ের তেজ,
গগন-প্রমাণ দেব শক্তি রাশি,—
মহা উগ্র—মহা ব্রহ্মাণ্ড-বিদারী,
হান বার বার—একাত্ম বন্ধনে
হবে ভস্মীভূত !—প্রলয় প্লাবনে
আর্য্য-রক্ত বহ্নি জ্বলিবে গগনে !
ব্রহ্মাণ্ডের তেজ হবে নিমজ্জন !
"কি ছিল ভারতে" দেখিও তখন !

শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উপাসনা
ও
ব্রহ্মজ্ঞান।

কি ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে, কি সাংসারিক ব্যবহারে আজ কাল উপাসনার অর্থ, তোষক বাক্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা। আধুনিক ধর্ম্মোপাসকগণের স্তোত্রের ও লৌকিক উপাসকগণের স্তুতিবাদের মর্ম্মগত অর্থ, ভিক্ষা; এবং এই উভয়বিধ ভিক্ষুকেরই সাধারণ পরিচয় অশক্তি বা অক্ষমতা।

আবার এই অশক্তি অক্ষমতার দশাই সর্ব্ববিধ দুঃখের প্রতিরূপ এবং তদ্-বিপরীতে পূর্ণশক্তি ও প্রভাবই সর্ব্ববিধ মুক্তি ও সুখের নির্ম্মল মূর্ত্তি।

অসক্ত অক্ষম ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বারায় মুক্তিলাভ করিতে পারে না; ভিক্ষার পথে মুক্তি নাই; স্বাবলম্বন ও কঠিন উদ্যমে মুক্তি আয়ত্ত করিতে-হয়। সাংসারিক, শারীরিক ও মানসিক যাবদীয় অভাব স্বাবলম্বন ও নিজশক্তির

উপর নির্ভর করে। আত্মশক্তির উন্নতিই সকল মুক্তির মূল, আর আত্মশক্তির ত্যাগই সকল দুঃখবন্ধের হেতু।

যদি মুক্তি ও সুখই জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে যে উপায়ে এই উভয় আয়ত্ত হইতে পারে, তাহার অনুশীলনই প্রকৃত সাধকগণের যথার্থ সাধন, ও তাহার আকাঙ্ক্ষা বা অনুধ্যানই প্রকৃত উপাসকগণের যথার্থ উপাসনা।

এক্ষণে দেখা যাউক মুক্তি ও সুখ কাহাকে বলে, এবং কি উপায়েই বা এই উভয় আয়ত্ত হইতে পারে।

পূর্ণ-মুক্তি ও পূর্ণ সুখের আদর্শ সংসারে নাই; সুতরাং উহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সামান্য সংগ্রহে পূর্ণমুক্তির চিত্র প্রদান করা সহজ নহে। সামান্যতঃ যেরূপ হইতে পারে আমাদিগের বুদ্ধি-অনুযায়ী আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি।

সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে জীবনের যে নিষ্কৃতি তাহারই নাম মুক্তি। এই মুক্তি হইতে যে সুখ তাহা মুক্তি-অনুষঙ্গী বা অন্যবিধ সংজ্ঞায় অভাবক (Nagative) সুখ। আর অন্তর কোন সৌন্দর্য্যের প্রেমে উহাঁতে সংযোগ লাভ করিলে উহা হইতে যে সুখোৎপত্তি তাহাই প্রেমানুষঙ্গী বা অন্যবিধ সংজ্ঞায় সংযোজক (Positive) সুখ। এই উভয়বিধ সুখ এই প্রকার;—মনে কর, কোন জনশূন্য বা অবান্ধব স্থলে কোন ব্যক্তি পতিত হইয়া ক্ষুধার যাতনায় অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছে, সহসা তৃপ্তিকর খাদ্যের সম্মিলনে ক্ষুধা শান্তিতে সে ব্যক্তি যে এক প্রকার সুখবোধ করিতে থাকে, উহাই ক্ষুধা-দুঃখ-মুক্তি-জনিত মুক্তি-অনুষঙ্গী সুখ। এইরূপ ক্ষুৎ পিপাসা রোগ শোকাদি যাবদীয় শারীর ও মানসিক দুঃখ নিচয়ের নিষ্কৃতি হইতে যে ক্ষণিক কিছু কিছু সুখ, উহারাই প্রত্যেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে মুক্তি-অনুষঙ্গী সুখের আদর্শ। এক্ষণে অনুধাবন কর, যদি কোন উপায়ে জীবন এই সর্ব্ববিধ শারীর ও মানসিক দুঃখের হাত হইতে একেবারে পূর্ণ ও স্থায়ী নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তবে উহার তাৎকালিক যে দশা তাহারই নাম জীবন-মুক্তি; এবং ঐ অবস্থার যে পূর্ণ অখণ্ড সুখ তাহাই মুক্তি-অনুষঙ্গী সুখের সর্ব্বাঙ্গ-সমন্বিত সুসম্পন্ন প্রতিরূপ। দুঃখের অভাব হইতে এই সুখের উৎপত্তি বলিয়া ইহাকে অভাবক (Negative) সুখ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। এই অভাবক বা মুক্তি-জনিত সুখ স্বতঃসিদ্ধ নহে; জীবনে আর এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ সুখের আদর্শ আছে, তাহা এইরূপ;—মনে কর, কোন সুস্থচিত্ত অনুরাগী ব্যক্তির শ্রুতিপথে একটী অতীব মধুর স্বর আনীত হইল, ঐ স্বরের সহিত চিত্তের যে অলক্ষ্য সম্বন্ধ তদনুসারে ঐ স্বর ঐ ব্যক্তির চিত্তে নীত হইবামাত্র চিত্ত তাহার যাবদীয়

বৃত্তির সহিত একেবারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; চিত্ত ঐ স্বরের মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্যে একান্ত প্রেমিক হইয়া উহার প্রতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তরঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিল; এই ক্রীড়াকালে চিত্ত কখন উন্মত্ত, কখন বিহ্বল, কখন উহাতে তন্ময় হইয়া যাইতে লাগিল, এই উন্মত্ত বিহ্বল তন্ময় ভাবই প্রেমানুষঙ্গী সুখের খণ্ড দৃষ্টান্ত। এইরূপ, মনোহর দৃশ্য, মধুর আস্বাদ, সুরভি আঘ্রাণ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাবদীয় সৌন্দর্য্য ও হৃদয়গ্রাহী স্মৃতি; স্বর্গীয় কল্পনা প্রভৃতি অন্তরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য * যাবদীয় সৌন্দর্য্যে অন্তরের যে ক্ষণিক ক্রীড়া, ইহারাই প্রত্যেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে প্রেমানুষঙ্গী সুখের আদর্শ। এক্ষণে মনে কর, যদি কোন উপায়ে জীবনে এই বাহ্যান্তর-সর্ব্বেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সমগ্র সৌন্দর্য্যের প্রেমে চিত্তের নিরবচ্ছিন্ন স্বেচ্ছাচার ঘটনা হইয়া উঠে, তাহা হইলে জীবনের তাৎকালিক যে দশা তাহাই প্রেমানুষঙ্গী সুখের সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন অখণ্ড প্রতিরূপ! সৌন্দর্য্য-সংযোগে এই সুখের স্বতঃই উৎপত্তি বলিয়া ইহাকে সংযোজক (Positive) সুখ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে।

এই অভাবক ও সংযোজক উভয়বিধ সুখ কোন উপায়ে জীবনে এককালে অখণ্ড দাঁড়াইলে, জীবনের সেই নির্ম্মল পবিত্র জ্যোতি হৃদয়ে ধারণা করাই অসাধ্য। কিন্তু এই উভয়বিধ সুখই নানাবিধ আগন্তুক বা বশবর্ত্তী কারণে ক্ষণভঙ্গুর। রোগ শোকাদি শারীর ও মানসিক উপদ্রবে, এবং অন্যান্য বাহ্য উপদ্রবের বশে এই উভয়বিধ সুখই সর্ব্বদা অস্থির। জীবনে এই উভয়বিধ সুখের এইরূপ চাঞ্চল্য দর্শনে উহাদিগকে স্থায়ি উপভোগ মানসে ও উহাদিগের অব্যাহত করিবার ইচ্ছায় প্রাচীন কাল হইতে মানবগণ উৎকট উদ্যমে নিমগ্ন আছে। পৃথিবীস্থ প্রাচীন মনীষিগণের ও আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই উদ্দেশ্যের মন্ত্রণা ও কার্য্যপ্রণালী একইরূপ; কেবল ভারতবর্ষীয় যোগশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের উদ্দেশ্য বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও মন্ত্রণা ও কার্য্য-প্রণালীতে প্রভেদ আছে; কিরূপ, আমরা তাহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা এই প্রস্তাবের অঙ্গ মনে করিতেছি।

প্রাচীন ও আধুনিক গণের সাধারণ উদ্দেশ্য, একদিকে, জীবনকে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের হাত হইতে পূর্ণ নিষ্কৃতি দানে নির্ব্বিরোধ মুক্তি-সুখ আয়ত্ত করা; অপর দিকে, এই মুক্তিতে জীবন সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরাগী অন্তরের ইচ্ছানুরূপ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে প্রেমানন্দের উপভোগে জীবনকে কৃতার্থ করা। সংক্ষেপে অভাবক ও সংযোজক সুখের পূর্ণগোলক-আলোকে একেবারে এই জীবনকে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারে বিমুক্ত করা।

* অন্তরেন্দ্রিয়—মন।

এইত গেল মর্নসিজ (Idial) উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করার উপায় কি? বৈদিক ঋষিগণের, ও বৌদ্ধ খৃষ্ট, মুসলমান ধর্ম্ম-প্রণেতৃগণের এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মুক্তি বিষয়ের সাধারণ মন্ত্রণা এইরূপ;—তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ ধারণায়, অবিদ্যাই সর্ব্বদুঃখের হেতু এবং বিদ্যা বা জ্ঞানই সর্ব্বদুঃখ-নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। শরীর-তত্ত্বের অনভিজ্ঞতা হইতে শারীর দুঃখ সকলের উৎপত্তি ও উৎপত্তি হইলে ঐ সকলের নিবারণের অনুপায়; এবং জড় জগতের তত্ত্ব সকলের অনভিজ্ঞতা হইতে বাহ্য উপদ্রবের দুঃখ সকলের উৎপত্তি ও উৎপত্তি হইলে ঐরূপ নিবারণের অনুপায়। আবার বিদ্যা বা জ্ঞানের বলে, বাহ্যপ্রকৃতির সহিত বাহ্য প্রকৃতির, ও বাহ্য প্রকৃতির সহিত শারীর নিগূঢ় সম্বন্ধ সকলের সন্ধান আয়ত্ত করিতে পারিলে জড়শক্তি সকলের সংযোগ বা সহায়ে মানব শক্তির বল ক্রমে পরিস্ফুট হইতে হইতে ঐ জ্ঞানের চরম উন্নতির সীমায় এই চরাচর বিশ্বের আমূল পল্লবে মানবশক্তি সর্ব্বতোমুখী হইয়া দাঁড়ায়, এবং ঐরূপ দাঁড়াইলে তাৎকালিক মানবের যে প্রভাব তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে না। মহামুনি শাক্যসিংহের মতে মানব একবার এই দশায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তখন আর তাহার ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন নাই; যেহেতু মানবের সেই অবস্থাই সর্ব্বশক্তিমানের অবস্থা। এক্ষণে সকলে অনুমান করিতে পারেন জ্ঞানের রাজ্যে কি অচিন্ত্য অসীম সংকল্প নিহিত রহিয়াছে; অতএব জ্ঞানের বলে মানবশক্তির চরম উন্নতিই জীবন-মুক্তি ও অতুল সুখের একমাত্র উপায়; এবং যেমন কেবল জ্ঞানের পথেই এই শক্তি ও জ্ঞানের পথেই এই মুক্তি, এই নিমিত্তই প্রাচীন ঋষিবাক্য জ্ঞানেই মুক্তি ও আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বাক্য জ্ঞানেই শক্তি; এবং তৎপরে আমরা বলি ঐ জ্ঞানেই পরমানন্দ লাভ; কিরূপে, আমরা তাহা পরে দেখাইব।

আমরা প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণের সাধারণ উদ্দেশ্য ও মন্ত্রণার কথা বলিলাম। এক্ষণে তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালীর কৌশল ক্রমে দেখাইতেছি।

কার্য্য-প্রণালীর কৌশল বিষয়ে কেবল যোগশাস্ত্র প্রণেতারাই স্বতন্ত্র পথাবলম্বী। অতএব তাঁহাদের বিষয়ই সর্ব্বাগ্রে বলিতেছি।

যোগশাস্ত্রিকেরা বিবেচনা করেন জ্ঞানেই শক্তি ও জ্ঞানেই মুক্তি। একথা সত্য বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানের বলে মানবের বিশ্ব-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র; এবং উহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব হইলেও কঠোর অধ্যবসায়ে যুগ যুগান্তরে তুমুল সমরে যদি মানুষ তাহাতে কথঞ্চিৎ পারগ হয়। সাংখ্যকার এইস্থলে এই বিশ্ব-বিজয়ের চিন্তায় হতাশ হইয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির

সহিত পুরুষের যে সংযোগ অর্থাৎ এই জীবনের আবির্ভাবই সর্ব্ব দুঃখের হেতু এবং উহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ অর্থাৎ মৃত্যুই সর্ব্ব দুঃখের নিষ্কৃতি বা মুক্তি। যোগীরাও তদনুরূপ ঐ উপায়কে ভ্রম প্রমাদযুক্ত বা দুরসাধ্য মনে করিয়া সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আশু কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত উপায় এইরূপ ;—তাঁহারা বিরোধী বাহ্য প্রকৃতিকে জীবন-ক্রীড়ার অনুরূপ গঠনে আনা একরূপ অসাধ্য বিবেচনায়, তাহাদের দমনের চেষ্টায় বিরত হইয়া বাহ্য প্রকৃতি যত প্রকারে বিরোধী বা বিবাদী হউক না কেন, জীবনকে তাহার অনুরূপ গঠনে গঠিত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন, এবং জীবনও স্বয়ং আত্মস্বভাবগত ক্ষুৎপিপাসাদি যে সকল দুঃখের অধীন, উহাকে ঐ অধীনতা হইতে উদ্ধার করাও কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে জীবনকে একরূপ সর্ব্ব উপদ্রব ও সর্ব্বদুঃখ সহিষ্ণুতায় দৃঢ় করিয়া জীবন-মুক্তি লাভের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বাহ্য উপদ্রব ও অনিষ্ট-পরিপূর্ণ এই সংসার-সাগরে ক্ষুদ্র জীবনকে কেবল জীবন-প্রকৃতির বলে দৃঢ় ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় বিশ্ব-বিজয়ের সাহস হইতে ন্যূন সাহসের সঙ্কল্প নয়। বিশ্ববিজয়ে জ্ঞানের গতি গভীর ও ব্যাপ্তক্ষেত্রে অনন্ত শেষোক্ত উপায়ে উহার গতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে অসীম। তান্ত্রিকদিগের যোগ শাস্ত্রের প্রথম অঙ্গ প্রাণায়ামাদি সাধন শরীরের সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল যেন উদ্ভাবিত হইয়া জীবনের বলে জীবনকে অক্ষুণ্ণ করত জীবন-মুক্তির উপায় সংরচিত হইয়াছে। জ্ঞানের বলে এইরূপে জীবন-মুক্তি লাভের পর, যোগশাস্ত্রের শেষ অঙ্গে ঐ জ্ঞান যোগে পরমানন্দ লাভের যে উপায় বিবৃত আছে তাহা অতীব সূক্ষ্ম-কৌশলময়। ঐ কৌশলের আভাস কথঞ্চিৎ এইরূপ ;—

তান্ত্রিক যোগীদের মতে বাহ্য বস্তুর সৌন্দর্য্যে স্থায়ী বা ইচ্ছার তৃপ্তি-যোগ্য যোগ-সাধন হইতে পারে না ; যেহেতু মনোহর দৃশ্য, মধুর স্বর—এই সকলই ক্ষণভঙ্গুর বা নশ্বর। তবে অন্তর কোন স্থায়ী যোগাশ্রয়ে সংযোগী হইয়া তৃপ্তিযোগ্য আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। সমস্ত জাগতিক সৌন্দর্য্য যে শক্তির ক্রিয়া, সেই শক্তিই অবশ্য সমস্ত সৌন্দর্য্যের বীজ, তাহা হইতেই এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও ক্ষণস্থিতির পর উহাতেই পুনর্ব্বার বিলয় ; অতএব সৃষ্টির অভ্যন্তরে সেই নিত্য সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধানে নিমগ্ন হও, এবং সেই নিত্য সৌন্দর্য্যে অন্তরকে সংযুক্ত করিয়া ইচ্ছার তৃপ্তিতে স্থায়ী আনন্দ উপভোগ কর। কিন্তু সেই নিত্য শক্তির অনুসন্ধান অনন্ত জগতে কোথায় ? মানব-শক্তি ক্ষুদ্র, অতএব সঙ্কীর্ণ স্থলেই তাহার অনুসন্ধান কর। যদি আমিই জাগতিক পদার্থের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পদার্থ হই, যদি আমার

জীবন সেই শক্তির কার্য্যের প্রকাশ মাত্র হয়, তবে অবশ্যই উহা আমার প্রকৃতির মূলে নিহিত আছে। আবার আমাতে আমার যেরূপ বোধ বা জ্ঞান, জাগতীয় অন্য পদার্থের উপর আমার বোধ, উপবোধ মাত্র। অতএব আমারি বোধ বা জ্ঞান সূত্রের মূলে যে শক্তি গাঁথা আছে চৈতন্যকে সেই মূল শক্তি স্থলে নিমগ্ন করাইয়া সেই শক্তির সহিত সংযোগে ধীরে ধীরে তাহাকে বোধ সূত্রের পথে আনিয়া পূর্ণ বোধ বা জ্ঞানের শিরে তাহাকে উঠাইয়া উপভোগ কর। কি সুন্দর কল্পনা! কি সুন্দর ভাব! ইহাই ষট্‌চক্র ভেদের যোগ। ঋষিরা যদি এই যোগ সাধনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্য সত্যই জীবনের ইন্দ্রজাল কাটিয়া মানবের নিমিত্ত দিব্য পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যোগাভ্যাসে সিদ্ধ না হইলে কোন ব্যক্তিরই তাঁহাদের কৃতকার্য্যতার উপর মতামত দিবার অধিকার নাই। আমরা যোগী নহি, সুতরাং আমাদিগের মতামত এই স্থলেই নিবৃত্তি রাখা উচিত। তান্ত্রিকদিগের যোগশাস্ত্র গভীর আলোচনার বিষয়। ষট্‌চক্রভেদ যেন বিশুদ্ধ শারীর জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ হয়। মেরুদণ্ডের মূলদেশ সমস্ত দেহের কেন্দ্র-স্বরূপ; গর্ভকোষে দেহের উৎপত্তিকালে ঐ স্থানেরই গঠন সর্ব্বাগ্রে রচিত, সুতরাং দেহের মূল শক্তির আধার ঐ স্থানেই কল্পিত হইয়াছে। দেহব্যাপ্ত জ্ঞানবাহিনী স্নায়ুজাল এই মেরুদণ্ড সংলগ্ন মূল স্নায়ু সকলের শাখা প্রশাখা মাত্র। শ্রুতি, স্পর্শ প্রভৃতি বাহেন্দ্রিয়ের যাবদীয় জ্ঞান ঐ সকল শাখা প্রশাখার যে স্থলেই উৎপত্তি হউক না কেন, মেরুদণ্ড-সংলগ্ন মূল স্নায়ু দিয়া মস্তিষ্কে নীত হইলে সেই সেই বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। মূল স্নায়ু সকল মস্তিষ্কে আসিয়া পরিশেষিত সুতরাং মস্তিষ্কেই পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ। ঋষিরা যেন এই শারীর জ্ঞানের সূক্ষ্ম সন্ধানের উপর ষট্‌চক্র ভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। মেরুদণ্ডের মূলদেশ হইতে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, চিত্রিণী, বজ্রাখ্যা প্রভৃতি মূল স্নায়ু বা নাড়ীর কল্পনা আছে। ঐ নাড়ীসূত্রে গাঁথা আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর প্রভৃতি সাতটী পদ্ম, পায়ুদেশ, লিঙ্গমূল, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূমূল ও মস্তক প্রভৃতি স্থলে অধঃ হইতে ঊর্দ্ধক্রমে সংস্থিত। প্রত্যেক পদ্মেই এক এক রূপ শক্তির স্থিতি; ঐ সকল পদ্মের কাহার চতুর্দ্দল, কাহার ষষ্ঠ, কাহার অষ্ট, কাহার ষোড়শ প্রভৃতি দল ও প্রত্যেক দলেই লং বং রং প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের কল্পনা; ঐ সকলের রূপক ভেদ করা সহজ নহে। তবে এই মাত্র অনুমান হয়, যেমন পদ্ম সকলের ঊর্দ্ধ গতিতে ক্রমে দলের সংখ্যার বৃদ্ধি, উহা কেবল বোধ বা জ্ঞানের ক্রম-পরিস্ফুটতার কল্পনা মাত্র। মেরুদণ্ড মূল বা পায়ুদেশস্থিত

আধার নামক চতুর্দ্দল পদ্মে কুণ্ডলিনী নামক শক্তি নিদ্রিত আছেন; চৈতন্যকে সেই আধার-পদ্মস্থিত শক্তির তলে নিমগ্ন করাইয়া উহার সহিত সংযোগে, ঊর্দ্ধগতিতে ক্রমে প্রত্যেক পদ্মস্থিত শক্তির সহিত উহার সম্মিলনে সহস্রদল পদ্ম বা মস্তিষ্কে উহাকে আনিয়া উহার পূর্ণ জ্ঞান লাভ করাই ষট্‌চক্রভেদ যোগ সাধনের উদ্দেশ্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইরূপ ব্রহ্মযোগ সাধনের ফলাফলের উপর আমাদিগের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা নাই; তত্রাচ এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই তান্ত্রিক উপাসকগণের পরমানন্দ উপভোগ যোগ-সাধন সম্বন্ধে যাহাই হউক, তাঁহাদিগের মুক্তি-বিষয়ক মন্ত্রণা সঙ্কীর্ণ ও ভ্রমাত্মক; সুতরাং ইহাও বলিতে পারি, জীবন-মুক্তিতে পূর্ণাধিকার অভাবে তাঁহাদিগের পরমানন্দ উপভোগও নির্ম্মুক্ত বা অব্যাহত নহে। যোগশাস্ত্রের উদ্ভাবিত প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারায় কথঞ্চিৎ শারীর ও বাহ্য উপদ্রব নিবারণে শরীরকে অক্ষুণ্ণ করিতে পারিলেও আগন্তুক উপদ্রব নিবারণের উপায়ে তাঁহারা অকৃতকার্য্য ছিলেন। মনে কর কোন যোগী বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া যোগানন্দে নিমগ্ন আছেন; হঠাৎ কোন হিংস্র পশু অথবা কোন বর্ব্বর মনুষ্য আসিয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছায় ছিন্নভিন্ন করত যোগচ্যুত ও যাতনার দুঃখভাগী করিতে পারে। যোগীরা এই আগন্তুক উপদ্রবের ভয়ে কখন কখন ভূগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া যোগসিদ্ধিতে নিমগ্ন হইতেন; কিন্তু ভূগর্ভেই বা উপদ্রবের অভাব কি? শুদ্ধ আত্ম-পবিশুদ্ধিতে মুক্তি লাভ হইতে পারে না। যে জগতে আমি প্রতিষ্ঠিত সেই জগতের সমস্ত উপদ্রবের পরিশুদ্ধি ব্যতীত আমার পূর্ণ নিস্তার নাই। যোগীদিগের যোগশাস্ত্র একাঙ্গীন পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ নহে। যোগীরা ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ আয়তনে একরূপ যেন মানব-জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তদ্বিপরীতে প্রাচীন ধর্ম্ম প্রণেতৃগণের আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকগণের, মানবের উৎপত্তি কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, কঠোর উদ্যমে, মানব জীবনের কার্য্যের সূত্রপাত হইয়া দাঁড়াইতেছে মাত্র। যাঁহাদিগের উদ্দেশ্য বিশ্ব-বিজয়, তাঁহাদিগের সেই দুর্ল্লভ জয়, তাঁহাদিগের সেই বৈকুণ্ঠ-রাজ্য বোধের অতীত সুদূর পথে এখনও সংস্থাপিত আছে। এক্ষণে হয়ত বুঝা গিয়াছে কেবল মাত্র জ্ঞানানুশীলনেই মানব-জীবনের যাহা কিছু আবদ্ধ আছে। জ্ঞানেই শক্তি, জ্ঞানেই মুক্তি, এবং জ্ঞানেই পরমানন্দ, সুতরাং একমাত্র জ্ঞানই মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম। মূর্খের শক্তি নাই, মূর্খের মুক্তি নাই, মূর্খের ভাগ্যে নির্ম্মল পরমানন্দের আস্বাদ নাই। সংক্ষেপে মানবধর্ম্মে এককালে মূর্খের অধিকারই নাই। যে জ্ঞানানুশীলনে মানবের বুদ্ধি সর্ব্বতোমুখী, সেই জ্ঞানানু-

শীলনেই মানবের হৃদয় অনন্ত ব্যাপৃতি লাভ করিতে থাকে। বুদ্ধি এবং হৃদয়ের এই অনন্ত ব্যাপৃতি না জন্মিলে অনন্ত-দেবের অনন্ত ভাব ধারণে পশুবৎ জড় অপরিস্ফুট মূর্খের অন্তরের অধিকার কি? সৃষ্টির অতীত সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্যের আভাস-আবেশ-সুখে যে অবসন্ন বা তন্ময়ত্ব দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাই মানবের সর্ব্বযোগসিদ্ধির পূর্ণ বা শেষ কাণ্ড, তাহাই মানবের সহস্র-দল বিকাশের নির্ম্মল পরমানন্দ উপভোগ, এবং তাহাই মানবজীবনের শেষ সমাধি। ইহাই নির্ম্মল ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃতি, এবং যিনি ইহারি সাধক তিনিই পুরুষার্থবান্ প্রকৃত ব্রাহ্ম। এই পুরুষার্থবান্ ব্রাহ্মের নির্ম্মল ব্রহ্ম-যোগের বাক্‌স্ফূর্ত্তি নাই, বাহ্যজ্ঞান নাই; যোগভঙ্গে যোগী ইহার এই মাত্র ব্যাখ্যা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়ের যাহা গ্রাহ্য নয়, বাক্যের যাহা অতীত, তাহাই আমার বোধে আসিয়াছিল; কিন্তু উহা কি, তাহা আমি জানি না। এই কথা প্রস্তাবের শেষভাগে ব্রহ্মজ্ঞান বিচারে আমরা পরিষ্কার রূপে বুঝাইব।

যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্ম বলিয়া আজ কাল পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহারা এক্ষণে বুঝিয়া দেখুন, বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনায় স্তোত্র বা গুণ সঙ্কীর্ত্তন নাই, যেহেতু উহা বাক্‌স্ফূর্ত্তির অতীত, উহা বাক্‌স্ফূর্ত্তির অতীত বলিয়া উহার প্রচারও নাই; একমাত্র জ্ঞানের প্রচারেই উহার প্রচার। আবার ভ্রাতৃগণের উপস্থিতিতে এই উপাসনা হইতে পারে না, ইহাতে এক ব্যক্তি একাকীই নিমগ্ন হইতে সক্ষম। অন্যের উপস্থিতির বোধ ও অলৌকিক নির্গুণ পদার্থের প্রতি লৌকিক গুণারোপের স্তোত্র কীর্ত্তনাদি, প্রকৃত উপাসনায় নিমগ্ন হইবার একান্ত বিরোধী।

পৃথিবীস্থ বর্ত্তমান বহুবিধ ধর্ম্মের বহুবিধ মূর্ত্তির আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিলে সাধারণতঃ উহাদিগের দুইটী বই দশা উপলব্ধি হয় না। জ্ঞানের পথে একটী নির্ম্মল উন্নত ভাবাপন্ন, আর মূর্খতার পথে অপরটী কলুষিত ও অবনতি-দশাগ্রস্ত। জ্ঞানবান্ উপাসকের উপাসনার ফল উন্নতি ও মুক্তি, মূর্খ উপাসকগণের উপাসনার ফল অবনতি ও দুর্গতি। বর্ত্তমান ধর্ম্মসকলে আমরা এই উভয়বিধ দশার আলোচনা করিতেছি।

জীবনের অনন্ত দুঃখ নিবারণের মহৎ কার্য্যে ও অপর দিকে সমস্ত চরাচরকে সুখ-ক্রীড়ার উদ্যানস্বরূপ করিয়া যোগের বৃহৎ ব্যাপারে ক্ষুদ্র মানবশক্তি একাকী সহস্র গুণে অযোগ্য। মানবশক্তি সকলের সংযোগ ব্যতীত এই মহৎ ব্যাপার সাধিত হইতে পারে না। তড়িৎ, বায়ু, বাষ্প, প্রভৃতি জড়শক্তিরাই সংসারের যাবদীয় কার্য্যের সাধক; ইহাদের শক্তিতেই নিখিল বিশ্ব পরিচালিত, অতএব এই সকল শক্তির আয়ত্তিতেই জগৎ আয়ত্ত। জীবন-মুক্তি

প্রয়াসী ঐ সকল শক্তির আয়ত্তির নিমিত্ত একান্ত লোলুপ ও পিপাসী। তাঁহারা ঐ সকল শক্তির গুণে বিমোহিত; কবিত্বপূর্ণ হৃদয়ে কেহ বা উহাদের দেবমূর্ত্তি কল্পনায় প্রেম সঙ্গীত গানে মত্ত, কেহ বা উহাদের সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইয়া উহাদের নির্যাতনে আত্ম জীবন ত্যাগেও কুণ্ঠিত নন; প্রত্যেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকেই এক এক জন বিশেষ বিশেষ জড়শক্তির মহৎ উপাসক বলিতে পারা যায়; কিন্তু এই সকল উপাসকগণের উপাসনার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীন, হৃদয়ের নিঃস্বার্থ কবিত্ব বিকাশ মাত্র। কিন্তু তদ্বিপরীতে মূর্খের জড় শক্তির উপাসনার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মূর্খ-উপাসকগণের উপাসনার প্রকৃতি একান্ত দাসত্ব, ও স্বার্থময় কামনা বা ভিক্ষায় পরিপূর্ণ। প্রথমোক্ত উপাসকগণের উপাসনার জীবন অনুরাগ, এই অনুরাগ হইতে উদ্যমতা বা চেষ্টা ও চেষ্টার ফল উন্নতি। শেষোক্ত উপাসকগণের উপাসনায় জীবনে অনুরাগ অভাবে উহা হইতে নিরুদ্যম বা নিশ্চেষ্টতা এবং ঐ নিশ্চেষ্টতার ফল অবনতি। প্রত্যেক প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মে আমরা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতেছি:—

বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; মহাজ্ঞানী বৈদিক ঋষিরা ঋক্‌সামাদি স্তোত্রে ইন্দ্র, অগ্নি, মরুদ্গণ প্রভৃতি জড়শক্তিগণের গুণ গান করিতেছেন; ঐ সকল শক্তির সাহায্যে সাংসারিক দুঃখ বিমোচনে সুখ আয়ত্তির নিমিত্ত তাঁহারা একান্ত ব্যতিব্যস্ত; কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল শক্তির দ্বারে অক্ষম বা অতুরের ন্যায় ভিক্ষুক নহেন। তাঁহারা স্বীয় বলে অপরাহত দুঃখ সকলের পরাজয়ে উদ্যত; কেবল ঐ সকল জড়শক্তির সহায়তার তাঁহারা প্রত্যাশী। বেদানুশীলনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তাৎকালিক ঋষিরা কি চমৎকার একতায় সংযম, কঠোর উদ্যম ও স্বাবলম্বনে দুঃখ বিমোচনের ও সুখ আয়ত্তির চিন্তা করিতেছেন। সোমাদি যজ্ঞে পার্থিব উপভোগ আহরণে সবান্ধবে তাঁহারা সমবেত হইয়া জড়শক্তি সকলকে পরম বন্ধুর ন্যায় সপ্রেমে ঐ সকল যজ্ঞের অংশ উপভোগে আহ্বান করিতেছেন। বেদের এই সুন্দর কবিত্ব সহৃদয় পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু বৈদিক ঋষিগণের এই জড়শক্তির উপাসনা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা নহে। জড়শক্তিগণের প্রকৃতির গুণে বিমুগ্ধ ঋষিগণ সুন্দর সহৃদয় কবি; ঋক্ সামাদি স্তোত্র সকল ঋষিগণের কবিত্ব-পূর্ণ প্রেম-সঙ্গীত মাত্র। অপূর্ব্ব বেদপাঠে কাহার কাহার হয়ত এরূপ সংস্কার জন্মিতে পারে যে বৈদিক ঋষিরা কেবল মাত্র জড়োপাসক। জড়শক্তির আভ্যন্তরীণ কোন শক্তির জ্ঞান যে তাঁহাদিগের ছিল না তাহা নহে; উহার গতি বিশুদ্ধ জ্ঞানে তাঁহারা জ্ঞানী ছিলেন। ঐ শক্তির উপাসনা নিষ্কাম ও নির্ব্বাক্, এই নিমিত্ত তাহার স্তোত্র নাই, গান নাই। কিন্তু

জড়শক্তি সকলের উপাসনা কালে যে আদি শক্তির উল্লেখ নাই, তাহা নহে। স্থানে স্থানে কোন কোন স্তোত্রে এরূপ ভাব আছে—যে হে মরুৎগণ! তোমরা যে অখণ্ড প্রভাবে দিগন্ত পরিভ্রমণ করিতেছ, জানি কোন মহতী শক্তি দ্বারায় তোমরা পরিচালিত ইত্যাদি।* বৈদিকদিগের ব্রহ্মজ্ঞান বেদান্ত দর্শনে পরিষ্কার বিবৃত আছে। মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থকে বাক্যের বর্ণনায় লঘু করিতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ ছিলেন। উহার উপাসনা উপভোগ তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র কাণ্ড ছিল।

এক্ষণে সেই বৈদিক ধর্ম্মের অপভ্রংস হিন্দুধর্ম্মের উপাসকগণ তেত্রিশ কোটি জড়শক্তির উপাসনা করিতেছেন, কিন্তু সেই নির্ম্মলজ্ঞানী স্বাধীন-বুদ্ধি ঋষিগণের জড়োপসনা ও আধুনিক হিন্দু উপাসনায় কি প্রভেদ! ঋষিগণ মানব-শক্তির বলে দুঃখ বিমোচন করিব বলিয়া ঐ শক্তির উন্নতির নিমিত্ত জড় শক্তি সকলের সহায়তা লাভ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। আধুনিক হিন্দুরা আত্মশক্তি পরিচালনা না করিয়া অক্ষম আতুরের ন্যায় ক্ষুদ্র দুঃখ সকল নিবারণের নিমিত্ত তেত্রিশ কোটি ছোট বড় শক্তির দ্বারে হতভাগার ন্যায় ক্রোন্দনে বিলুণ্ঠিত। স্বাধীন উপাসনায় প্রাচীন আর্য্যেরা মহত্বের পথে অনেক দূর আনীত হইয়াছিলেন, অধীনতার ভিক্ষায় হিন্দুরা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছেন ও ক্রমে আরো যাইতেছেন। যে ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের এই সর্ব্বনাশী মুমূর্ষুত্বের ধ্বংস কামনা করেন, সেই ব্যক্তির আত্মাই প্রকৃত দেশহিতৈষী। আজ কাল শিক্ষিত সম্প্রদায় কাঁচিয়া বসিতেছেন দেখিয়া আমরা ক্রমেই হতাশ হইতেছি। ভারতবর্ষে এককালে ধর্ম্ম না থাকিয়া ঘোর উচ্ছৃঙ্খলার উৎপত্তি হয় সেও ভাল, তত্রাচ এই অধীনতা-ধর্ম্ম শিক্ষায় আর অণুমাত্রও প্রয়োজন নাই। হিন্দুরা একান্ত অক্ষম, অশক্ত ও মূর্খ; সুতরাং নির্ম্মল ব্রহ্মোপাসনায় তাহাদের যে এককালে অধিকার নাই ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আবার বৈদিক ধর্ম্মের পর বৌদ্ধ ধর্ম্মের দশা ঐরূপ দেখ। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদি জীবন এইরূপ:—বৌদ্ধেরা অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরের প্রসঙ্গ একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতে দ্বাদশায়তন—অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের অধীন দেহের উপাসনাই সর্ব্ব উপাসনার সার। বাক্, পাণি, পাদ, গুহ্য ও লিঙ্গ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মন ও বুদ্ধি এই দুই অন্তরেন্দ্রিয় বা উভয়েন্দ্রিয়; এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়কে সাধ্যমত পূর্ণ প্রসন্ন

* যে স্থান হইতে এই প্রস্তাব লিখিত হইল, সেখানে পুস্তকাদির সংগ্রহ দুঃসাধ্য, এজন্য বেদের দুই একটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

কর। ইহার অর্থ অতি গভীর ও বিশাল। সংক্ষেপে ইউরোপীয় আধুনিক দর্শনের চরম লক্ষ্যের বিষয় আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার, ও ইহার লক্ষ্য একই। কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়ই মানব জীবনের যাহা কিছু; এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বাঙ্গীন প্রসন্নতাতেই জীবন-মুক্তি ও সমাধি নিহিত আছে; এবং উহাতেই মানব সিদ্ধ হইলে বা কৃতকার্য্যতা লাভ করিলে বোধিস্বত্বের দশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বয়ংই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে এই মানবের ক্ষমতাই সর্ব্বতো-মুখী হইয়া দাঁড়ায়।

এক্ষণে সকলে বুঝিতে পারিবেন, বৌদ্ধেরা কি বিশাল জ্ঞান-ক্ষেত্রকেই মুক্তির লক্ষ্য করিতেছেন। ইহাঁদের মতে পরকাল নাই, দেহান্তেই জীবনের নির্ব্বাণ। ইহাঁরা কোন শক্তির নিকট কোন অনুগ্রহের কামনা রাখেন না; ইহ জীবনের ফলাফলের পর জীবনে প্রত্যাশী নন; এমন স্বাধীন—স্বাবলম্বী মহত্ব লাভের অতি বিশুদ্ধ মার্জ্জিত ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কই, মূর্খের হস্তে ইহারই বা কি হইল? ইহারও দশা বৈদিক ধর্ম্মের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। আধুনিক বৌদ্ধেরা হতভাগ্য হিন্দুদিগের ন্যায় বুদ্ধকেই এক দেবতা করিয়া তাঁহার পদে পূজা অর্পণ করিয়া জীবন-মুক্তির প্রত্যাশায় নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট আছে।

আবার ইহার পরে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের দুর্দ্দশাও ঐ প্রকার। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কবিত্ব-কল্পনার মাধুর্য্যে অতীব হৃদয়গ্রাহী। যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিমার্জ্জিত বিশুদ্ধ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি খ্রীষ্টধর্ম্ম হৃদয়গ্রাহী কাব্যরসস্রোতে বিভাসিত। ভিক্টর হুগো (Victor Hugo) এই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কবিত্বকে কাব্যরসে অতুল্য বলিয়া গিয়াছেন। স্বভাব-সৌন্দর্য্যের অনুপম রচনা ইডন উদ্যানে কবি কর্ত্তৃক বিশুদ্ধমতি আদম ও হবা মনসিজ (Idial) নর নারী প্রতিষ্ঠিত। শরীর জরা ব্যাধি হইতে মুক্ত, বিনা কষ্টে বিনা পরিশ্রমে উদ্যানস্থ তরু লতা অমৃত ফলে ক্ষুৎ পিপাসা চরিতার্থ করিতেছে। হিংস্র জীবেরা হিংসা পূর্ব্বক স্বভাব পরিত্যাগ-বশবর্ত্তী হইয়াছে, সুখ সৌন্দর্য্যে জীবকুল যথামত সন্তোষ সাধন করিতেছে; সুখোপভোগের ব্যাঘাতকারী কিছুই নাই। জড়জগৎ যেন এই প্রেমিক দম্পতীর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিতোষার্থে মৃৎ-পিণ্ডে গঠিত হইয়া রহিয়াছে। বাহ্য-জগতের এহেন অবস্থায় এই সুখের দম্পতী অভ্যন্তরে ইচ্ছা মত ঐশিক শক্তির আবির্ভাব দেখিতেছেন। সর্ব্ব যোগ সর্ব্ব-সাধন-সিদ্ধির ফলের পরাকাষ্ঠার চিত্র। এই স্বর্গীয় দশা হইতে মানব ভ্রষ্ট হইল, সে ভ্রষ্টতা মানবের আজ-কালকার এই বর্ত্তমান দশা। এহেন

অবস্থা হইতে মানবের উদ্ধারের উপায় কি? কি উপায়ে আবার মানব সেই স্বর্গীয় দশা প্রাপ্ত হইতে পারে? কবি আবার আর একটী চরিত্রের অবতারণ করিলেন। সেই চরিত্র অনন্ত প্রেম ও অনন্ত ক্ষমার আধার। সেই পরম পুরুষ খ্রীষ্ট মানবকুলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,তোমরা যদি মুক্তির প্রয়াসী হও, ঈশ্বরে সংযোগী হইতে চাও, তবে তোমাদিগকে আমার অভ্যন্তর দিয়া তাঁহার নিকট যাইতে হইবে, আমা ভিন্ন অন্য পথ নাই। আমাতে আত্ম সমর্পণ কর, তবে তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবে। কিন্তু আমাতে আত্ম সমর্পণ করিলেও আশু তুমি একাকী মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না; শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। সেই শেষ দিনে একেবারে সমস্ত মানবকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী করিব। বাইবেলের রহস্য এখন হয় ত সকলে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। খ্রীষ্টের অভ্যন্তর দিয়া গিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, তাহার অর্থ, খ্রীষ্টের ন্যায় অতিমানব মহত্ত্ব লাভেই ঈশ্বর সমাগম। মানব একাকী মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না, তাহার অর্থ আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগতের পরিশুদ্ধি ব্যতীত শুদ্ধ আত্ম-পরিশুদ্ধিতে মুক্তি নাই; সুতরাং শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে, তবে তিনি স্বর্গ-সমাগম করাইবেন, তাহার অর্থ এই—সমস্ত মানুষ সমভাবে মহত্ত্ব লাভ করিলেই, এই পৃথিবীই আদম হবার ইডন উদ্যান হইয়া উঠিবে।

বৈদিক ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভৃতির ন্যায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মেরও মূল তাৎপর্য্য মহত্ত্ব লাভ। কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের দুর্দ্দশাও হিন্দুধর্ম্মের দুর্দ্দশার ন্যায় অনেকটা একই রূপ দাঁড়াইয়াছিল; কেবল সৌভাগ্য-বলে, ইউরোপীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান—খ্রীষ্ট উপাসকগণকে অধঃপাত হইতে ক্রমে অন্য পথ দিয়া তুলিতেছে।

মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতির গতিও ঐরূপ, উহাদিগের আলোচনা বাহুল্য মাত্র। আমরা এক্ষণে আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় কিছু আলোচনা করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

মহাত্মা রামমোহন রায় এই ধর্ম্মের প্রণেতা; সাধারণ লোক তাঁহাকে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রণেতা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, অজ্ঞানতার অধঃপাত হইতে হিন্দুদিগকে উদ্ধার করাই তাঁহার মূল সংকল্প ছিল। অযোগ্য-ধর্ম্মনীতির পশুবৎ দাসত্বে হিন্দু সমাজের একান্ত জর্জ্জরিত দশায় তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়া উহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই সহৃদয় ব্যক্তির মর্ম্ম ব্যথা ও তাঁহার কার্য্যের ব্যাকুলতা তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তে অতিশয় উজ্জ্বল। নির্জ্জীব হিন্দুদিগকে চেতন করিবার নিমিত্ত তিনি তাহা-

দিগের ধর্ম্মনীতি ও তাহাদিগের সমাজ নীতির শিরে বজ্রাঘাত করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার জীব নাবশান হইল। রামমোহন রায় কোন নূতন ধর্ম্মের সংস্থাপন-কর্ত্তা ছিলেন না, তিনি সমাজ ও ধর্ম্মের ঘোরতর বিপ্লব-কর্ত্তা ছিলেন। তিনি বেদ-ধর্ম্মের জীবন্ত ভাবের দিকে কেবল মাত্র আকৃষ্ট হইতেছিলেন, কিন্তু বেদ-ধর্ম্মের পূর্ণ-ধর্ম্ম গ্রহণে তখনও তিনি সমর্থ হয়েন নাই; যেহেতু এক ঈশ্বরের জ্ঞান তাঁহার অন্তরে সম্বদ্ধ হইলে তিনি সমাজবদ্ধ সকাম ঈশ্বর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তে জানা যায়—তিনি সবান্ধবে মুক্তি ও পরকালের নিমিত্ত সুদূর ঐশিক শক্তির নিকট প্রার্থনা করিতেন। এই কথাটীর মর্ম্ম আমরা একটু পরিষ্কার রূপে বুঝাইব; যেহেতু আমাদিগের আধুনিক ব্রাহ্ম ভ্রাতারা এই স্থলের ভ্রমে পতিত আছেন।

পণ্ডিতবর মিল্ তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধত্রয়ে মানুষের একেশ্বর জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়টি এইরূপ মর্ম্মে বুঝাইয়াছেন:—

"অতি আদিম অবস্থায়, স্থূল আত্ম-জ্ঞানই মানুষের জ্ঞানের সম্বল মাত্র ছিল। এই অবস্থায় মানুষ যেমন আপনি নড়িতেছে, চলিতেছে, সেইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্রাদিকে চলিতে দেখিয়া বোধ করে, উহারাও বুঝি মানুষের ন্যায় ইচ্ছা-বিশিষ্ট এক একটী প্রাণী। চেতন এবং অচেতনের পৃথক্ জ্ঞান তৎকালে মানুষের উপস্থিত হয় না। পরে ক্রমে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবিষ্ট হইলেই মানুষ চেতন অচেতন জীব ও জড়ের বিভিন্ন ভাব বুঝিতে সক্ষম হয়। জীব ও জড়ের জ্ঞানোৎপত্তির পর, তখন এই তর্কের স্বাভাবিক আবির্ভাব হইয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদিরা যদি প্রস্তরাদির ন্যায় অচেতন, তবে উহাদের গতিশক্তি কিরূপে জন্মিল? মীমাংসায় এইস্থলে লোকাতীত শক্তির ভাব আসিয়া মানব-বুদ্ধিকে আশ্রয় করিল। আমি যেমন কোন জড় বস্তুকে না চালাইলে সে চলিতে পারে না, চন্দ্র সূর্য্যাদিরা জড় হইলে অবশ্যই কোন অতীত শক্তি উহাদিগের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া উহাদিগকে চালিত করিতেছে; সেই সকল শক্তির বলেই সূর্য্য তাপ, চন্দ্র কিরণ, মেঘ বৃষ্টি দান করিতেছে; অতএব ঐ সকল শক্তির প্রত্যেকেই কম বেসী মানুষের সুখ দুঃখের বিধাতা। তৎকালে লৌকিক জ্ঞান ভিন্ন মানুষের অন্য জ্ঞান নাই, সুতরাং ঐ সকল দেবতাদিগকে-মানুষ, মানুষের ন্যায় দয়া মায়া হিংসা দ্বেষাদি গুণের আধার বিবেচনায় এবং তাহাদিগের শক্তি ক্ষুদ্র মানব-শক্তি হইতে অতিশয় প্রবল দেখিয়া, প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের অধীনতা স্বীকারে উহাদিগের অনুগ্রহ বা দয়ার কামনায় উহাদের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই স্থলেই শক্তির প্রতি

লৌকিক গুণের আরোপ ও অধীনতায় উপাসনার উৎপত্তি। জ্ঞানের এই অদ্বিতীয় সোপানে পৃথিবীর বর্ত্তমান অশিক্ষিত লোকরাশি অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু পণ্ডিতগণের বুদ্ধি, অনুভব ও ধারণা—সীমান্তদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জ্ঞানের তৃতীয় পদবীতে আলোচনার অধিকতর গভীরতায়, এই বিশ্ব চরাচর যে একই নিয়মজালে পরস্পর আবদ্ধ, একের সত্তা যে অপরের সত্তার সহিত অলঙ্ঘ্য সম্বন্ধে গ্রথিত এই তত্ত্ব মানুষ দৃঢ় বুঝিবামাত্র পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বা দেবতার জ্ঞান তিরোহিত হইয়া বিশ্বাত্মক এক দেবতা বা এক ঈশ্বরের জ্ঞান মানব-বুদ্ধিতে আবির্ভূত হয়।" মিল্ মানুষের একেশ্বর-জ্ঞানোৎপত্তির বিষয় এই পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছেন।

এইরূপে মানুষের পৃথক্ পৃথক্ বহু দেবতার জ্ঞান ঘুচিয়া এক ঈশ্বরের জ্ঞান উৎপত্তি হইলেও, জ্ঞানের দ্বিতীয় পদবীতে যে দেবতা সকলের প্রতি লৌকিক গুণের জ্ঞান ও কদর্য্য অধীনতায় উপাসনায় প্রবৃত্তি, উহা মানব-বুদ্ধি হইতে তিরোহিত হইল না। রাজা রামমোহন রায় এই তৃতীয় পদবীর ব্রহ্মজ্ঞানে আরূঢ় হইয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের শেষ সীমায় তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি দয়া মায়াদির আধার লৌকিক-গুণ সম্পন্ন বহু দেবতার উপাসনার পরিবর্ত্তে ঐরূপ এক দেবতার নিকট সকাম অধীন উপাসক ছিলেন মাত্র। যে জ্ঞানের গভীর সীমায় প্রাচীন ব্রহ্মর্ষিরা ঈশ্বরকে নির্গুণ নির্ব্বিকার আখ্যা দিয়াছেন, সেই জ্ঞান লাভেই মানব-বুদ্ধি ঈশ্বরে লৌকিক গুণের আরোপ-রূপ কুসংস্কার হইতে ও সকাম উপাসনার অধঃপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। কেহ হয়ত এরূপ বলিতে পারেন, রাজা রামমোহন রায় তাঁহার রচিত বহুতর গীতে ঈশ্বরকে নির্গুণ নির্ব্বিকার আখ্যা দিয়াছেন, অতএব তাঁহার নির্গুণ নির্ব্বিকারের জ্ঞান অবশ্যই ছিল। আমরা বলি, তাহা নয়। তিনি বেদ হইতে নির্গুণ নির্ব্বিকার শব্দ মাত্র আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুই শব্দের সহিত যে বিশাল জ্ঞানের রাজ্য সম্বন্ধ আছে, তাহা তিনি গ্রহণে সমর্থ হয়েন নাই; তাহা হইলে তিনি কখনই সমাজবদ্ধ মুক্তি ভিক্ষায় সকাম উপাসনা ঈশ্বরের নিকট করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। আমরা এক্ষণে জ্ঞানের চতুর্থ পদবীর কথা বলিতেছি, তৎপরে ক্রমে নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্মোপাসনার তাৎপর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা পাইব।

যখন মানব দেখিল, কেবল একমাত্র অলঙ্ঘ্য নিয়ম সকলের প্রকাশে এই বিশ্ব ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে, নিয়ম ভিন্ন বিশ্বকার্য্যে অপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, তখন মানব-বুদ্ধি স্বভাবতঃই বলিয়া উঠিল, এই বিশ্বকার্য্যে প্রবৃত্তি-ইচ্ছাময় দেবতার কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞান ভ্রমমাত্র। মানব-বুদ্ধি এই স্থানে পূর্ব্ব

কুসংস্কারের আবরণ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মুক্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান হইল। এই শ্রেণীর পণ্ডিতবর্গ অধস্তন সকাম উপাসকগণ দ্বারা নাস্তিক সংজ্ঞায় উপেক্ষিত বা নিন্দিত হইয়া থাকেন; কিন্তু নিম্নতর পদবীর উপাসকেরা জানেননা যে, তাঁহারা কঠিন কুসংস্কার-রোগে বিনাশের মুখে দিন দিন জীর্ণ হইতেছেন; যাঁহাদের তাঁহারা নাস্তিক সংজ্ঞায় অপদার্থ মনে করিয়া থাকেন, যথার্থই তাঁহারা সেই বিনাশ-রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত, যদিও বহুকালের কুসংস্কার-রোগ-ভোগে শীর্ণকায়। ইহাঁদের পূর্ণ স্বাস্থ্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত কেবল পোষক পদার্থের সংযোগের প্রয়োজন।

মানব বুদ্ধির পঞ্চম দশায় মানব অতীত শক্তির নিকট কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মের প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত হয়। বীজের অভ্যন্তরে অঙ্কুর আবদ্ধ আছে, কিন্তু রস উত্তাপ প্রভৃতি যে সকলের সহিত তাহার উদ্গমের সম্বন্ধ, তাহাদের সহিত সংযোগ ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাহার বিকাশ হইতে পারে না, সুতরাং বিশ্বকার্য্য নিয়ম ছাড়া ঘুণাক্ষরে বিচলিত হইতে সমর্থ নহে। কিন্তু মানবের এই নিয়মজ্ঞানের প্রকৃতিই বা কি, গভীরতর আলোচনায় বুদ্ধি তখন তাহা ধারণ করিতে পারে। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-কার্য্য অখণ্ড ও এক। আমার উদ্ভব, অমুকের মৃত্যু, দিবা, রাত্রি, তড়িৎপাত, বৃষ্টি, প্লাবনাদি সামান্য সামান্য কার্য্যগুলি অস্তে অখণ্ড একমাত্র ব্রহ্মাণ্ড-কার্য্যসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড বীচি মাত্র। একমাত্র অখণ্ড কার্য্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বুঝিতে গিয়া তাহাদের ব্যবচ্ছেদের আভ্যন্তরীণ কাল্পনিক রেখা গুলির প্রতি মানবের নিয়মভ্রান্তি হইয়া থাকে। অতএব অখণ্ড বিশ্বকার্য্যে নিয়মজ্ঞান মানুষের বোধের সংকীর্ণতা বা ভ্রমমাত্র।

মানব বুদ্ধি এই পঞ্চম দশায় নিয়মজ্ঞান বা নিয়ম-সংস্কার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ষষ্ঠ দশায় উপনীত হয়। এই দশায় বুদ্ধি এখন নিয়মের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিতে এই অখণ্ড এক নিখিল চরাচর কার্য্যের প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মানব-বুদ্ধিতে এখনও কর্ত্তা বা 'কারণ' সংস্কার বিদ্যমান আছে। অখণ্ড বিশ্বকার্য্যকে মানব বিশ্লেষণ-বুদ্ধিতে বুঝিতে গিয়া বুঝিল, এই ব্রহ্মাণ্ড-কার্য্য কেবল মাত্র পরমাণু ও পরমাণু-আসক্ত শক্তির ক্রিয়া মাত্র। শক্তি ও পরমাণুর (Matter and force) ক্রীড়াই এই জগৎ; জগতে ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। ঐ শক্তিই আদি শক্তি এবং ইহাই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ও আদি কারণ। ঐ আদি কারণ এই বিশ্ব ক্রীড়ায় আপনাতেই আপনি প্রসন্ন। সত্ব রজঃ তম বা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদির কার্য্য সকলকে বিভিন্ন ও ঐ সকল বিভিন্ন কার্য্যে কাহার বিভিন্ন গুণের

জ্ঞান বা সংস্কার হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য অখণ্ড এবং এক ও তাঁহার স্বভাবের গতি নিরবচ্ছিন্ন ধারা। সেই শক্তির মহোচ্ছাস মুর্ত্তিই এই বিশ্বরূপ উৎস; উহাতে সত্ব রজঃ দয়া মায়াদি গুণের বর্ণ নাই; সুতরাং ইহা পবিত্র, নির্ম্মল ও নির্গুণ; এবং উহা আপনাতেই আপনি প্রসন্ন, তোমার ক্রন্দন, কাতরতা বা অন্য কোন আকর্ষণেই উহা বিচলিত নহে, এই নিমিত্ত উহা অবিচলিত বা নির্ব্বিকার। মানব তাঁহার জ্ঞানে, তাঁহার প্রয়োজনে লয় হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিজের প্রয়োজনে কখনই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। ইহাই মানবের নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম জ্ঞান। ইহার পরেই মানবের সপ্তম বা শেষ সমাধি দশা। তাহার উৎপত্তি এইরূপ:—মানুষ বিশ্বকার্য্যের শেষ পর্য্যালোচনার বিবেচনা করিল, পরমাণুতে আশক্ত শক্তিই বিশ্বকার্য্যের কারণ, এরূপ সংস্কারের প্রকৃতি কি? কৈ, পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র শক্তির জ্ঞান মানবের কি আছে? অথবা শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন কেবল মাত্র পরমাণুর জ্ঞানই বা মানবের কি? এই বিশ্বকার্য্য স্বয়ংই রূঢ়—অখণ্ড বা স্বতঃসিদ্ধ *। অতএব শক্তি ও জড়ের বিভিন্নতা বোধ হইতে কারণের জ্ঞান মানবের ভ্রমমাত্র। এই চরাচরই স্বতঃসিদ্ধ অখণ্ড বা একমাত্র কার্য্য। এই কার্য্যই ব্রহ্ম এবং আমিও এই কার্য্যের আভ্যন্তরীণ সুতরাং আমিও ব্রহ্ম। এক্ষণে আবার সেই কার্য্য জ্ঞানেও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উহাতে অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞান, এবং আত্মজ্ঞান ঘুচিয়া উহাতে সেই ব্রহ্ম জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় মানব চরম দশায় বিশ্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত আত্মরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের সংযোগে একমাত্র পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানে লয় হইয়া যায়। ইহাই জীবের সপ্তম দশা বা সমাধি। বিশ্ব-বিজয়ে জীবন-মুক্তিতে বিশুদ্ধ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে স্থির প্রসন্ন বা সমাধিযুক্ত সংসারের সমগ্র-মানবের দশা কে চিন্তা করিতে সমর্থ হইবে? ক্ষুদ্র মানব বুদ্ধি উহার কল্পনা করিতেও কম্পিত হয়।

আমরা এই সমাধিকেই জীবের চরম ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া থাকি। এক্ষণে আমাদিগের ব্রাহ্মভ্রাতারা অনুমান করুন, তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানের কোন্ সুদূর পদবীতে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্ব সংস্কারের পরিত্যাগেই নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি, কিন্তু তাঁহারা সেই সকল সংস্কার পরিত্যাগ করার পরিবর্ত্তে দিন দিন কত প্রকার ঘোরতর কুসংস্কারে জড়িত হইতেছেন।

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক, মুক্তি-সমাধি-বিষয়ক প্রাচীন-দর্শন-জ্ঞানের অভি-

* এই স্থলে শক্তি ও পরমাণুর বিভিন্ন জ্ঞান পরিত্যাগ করিতে গিয়া এক শ্রেণীর পণ্ডিতবর্গ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে কেবল শক্তি (Force) বলিয়া থাকেন; অপর শ্রেণীর পণ্ডিতেরা উহার পরিবর্ত্তে উহাকে কেবল জড় (Matter) বলিয়া থাকেন। ইহারাই শক্তি ও জড়বাদী।

সুন্দর রূপক কল্পনা। ঐ নাটকের প্রথম অঙ্কে কাম রতিকে কহিতেছেন, "আমাদের কুলে বিবেকের ঔরসে বিদ্যানামে এক রাক্ষসীর উৎপত্তি হইবে, এবং ঐ বিদ্যার উৎপত্তি মাত্র উহার প্রভাবে দয়া মায়া পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—বিবেক বা অনুশীলন হইতে বিদ্যা বা জ্ঞানের উদ্ভব; এই জ্ঞানের যে পরিমাণে আবির্ভাব, সেই পরিমাণে অন্তর হইতে পাপ পুণ্য-ধর্ম্মাধর্ম্ম-পরকালাদির সংস্কার সকল তিরোহিত হইয়া অন্তর নির্ম্মল মুক্তিতে স্বয়ংই ব্রহ্মজ্ঞানে সিদ্ধ হইবে। পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম পরকালাদির ও যাহা কিছু ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি এই সমস্তই লোকাচার বা লৌকিক ব্যবহার মাত্র। ইহার সহিত নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন সম্বন্ধ নাই। এই কথা বিশদরূপে বুঝাইতে হইলে স্বতন্ত্র প্রস্তাব একটি লেখার প্রয়োজন হইয়া উঠে, এস্থলে আমাদের তাহার প্রয়োজন নাই। আমাদিগের বর্ত্তমান ব্রাহ্মভ্রাতারা এই লোকাচার বা লৌকিক ব্যবহার সকলকে পাপ পুণ্য ভ্রমে এবং ঐ সকল পাপ পুণ্যের ভ্রম-সংস্কারের সহিত পরকালের ভাব সংযুক্ত করিয়া, ঈশ্বরকে পুরস্কার তিরস্কার ক্ষমা দয়াদি লৌকিক গুণের একটি প্রভু করিয়া, মূর্খ পৌত্তলিকেরা যেরূপ সেই প্রভুর নানা গুণের নানা মূর্ত্তির পুতুল গড়াইয়া, অধীনতার দাসত্বে ঐ সকল দেবতার নিকট, প্রত্যেক সুখ দুঃখের নিমিত্ত কাঁদিয়া থাকে, আমাদিগের ব্রাহ্মভ্রাতারাও ঐরূপ সমস্ত লৌকিক গুণের পৃথক্ পৃথক্ দেবতা না গড়াইয়া, একটি মাত্র দেবতা মনে মনে আঁকিয়া তাঁহার নিকট অধীনতার দাসত্বে ভিক্ষার নিমিত্ত কাঁদিতেছেন। পৌত্তলিক ও বর্ত্তমান ব্রাহ্মে প্রভেদ এই। অধীনতার উপাসনায় মানব প্রকৃতি যে দিন দিন নীচতা ও অধঃপাতে যাইতেছে, সহৃদয় ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত একান্ত ব্যথিত। যাঁহারা আজ কাল ইয়ুরোপীয় সভ্যতার গতি পর্য্যালোচনা করিতেছেন, তাঁহারাই বুঝিতেছেন, ইয়ুরোপ, কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজ্য সর্ব্ব বিষয়িণী স্বাধীনতার নিমিত্ত কিরূপ পিপাসাতুর ও উন্মত্ত। মানবের আত্ম-গৌরব-জ্ঞানই সর্ব্ব উন্নতির মূল এবং অধীনতা ও দাসত্বের নীচ ভাবই সর্ব্ব অবনতি ও অধঃপাতের কারণ। সহৃদয় ব্যক্তি হৃদয় ফাটাইয়া বলিয়া উঠিবেন, পৃথিবীতে ধর্ম্ম এক কালে না থাকে সেও ভাল, তথাচ এই অধীনতা বা সকাম উপাসনার ধর্ম্ম এই দণ্ডে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হউক। অতএব ভারতবাসিন্! কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজ্য সর্ব্ব-বিষয়িণী অধীনতার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভে পূর্ণ স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ঘোরতর বিপ্লবে ইয়ুরোপের আদর্শে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হও।

কেহ কেহ বিপ্লবের বিরোধী; কিন্তু

তাঁহারা জানেন না, কেবল এক জ্বলন্ত বিপ্লব-মূর্ত্তিতেই স্বাধীনতার আবির্ভাব। স্বাধীনতা কখন প্রচ্ছন্ন বা মৃদু সঙ্কুচিত ভাবে পাদক্ষেপ করে না, উহা নির্ভীক; ঔজ্জ্বল্যে সকল বিপত্তির প্রতিকূলে স্বপ্রকাশ—সম্মুখীন।

স্বাধীনতাই মুক্তি, স্বাধীনতাই সুখ, এবং আমরা যাহা বলিয়াছি, সেই সর্ব্ব সংস্কারের বিমুক্তি অথবা সর্ব্ব স্বাধীনতার সারাৎসারই মোক্ষ বা সমাধি, এবং যেমন আমিই ব্রহ্ম, স্বাধীনতার এই চরম জ্ঞানেই নির্ম্মল পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান; এই হেতু হে মানবকুল! হে ভারতবাসিগণ! হে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! অজ্ঞানতাব অধীনতা পরিত্যাগে স্বাধীনতারূপ ব্রহ্মজ্ঞানে লয় হইতে কাহাকে ভয়? অন্য প্রকার পাপ পুণ্যের জ্ঞানকে,বুদ্ধি হইতে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, যাহা কিছু এই স্বাধীনতার বিরোধী, মহাপাপ জ্ঞানে তাহারই সংহারে প্রবৃত্ত হও; এবং যাহা কিছু এই স্বাধীনতার পোষক বা সহায়, প্রেমালিঙ্গনে আত্মার সহিত তাহাকে একীভূত বা লয় করিয়া ফেলিতে ত্রুটি করিও না।

পরিশেষে সাধারণের মনে এই তর্কের উদয় হইতে পারে যে, এই বিশ্বরূপ কার্য্যের জ্ঞান হইতে যে ব্রহ্ম জ্ঞানের উৎপত্তি তাহারই বা প্রকৃতি কি? কার্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞান ইহাই বা কেন এক প্রকার অজ্ঞ সংস্কার নহে? এই অখণ্ড বিশ্বকার্য্যকে যে মানব কার্য্য চিন্তা করিতে গিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রকৃতি যেরূপ, আমরা সর্ব্বশেষে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভারত-সভা।*

যখন ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমরা 'ভারতেব ভাবী পরিণামে' ইহাব ভাবী পরিণামে কি হইবে, অগ্রেই বলিয়া দিয়াছিলাম। অধুনা বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন-সমাজবন্ধন, অসংখ্য-ভাষাকথনশীল ও নানা-পরিচ্ছদপরিশোভিত ভারতের মিশ্র-অধিবাসিবৃন্দের পরস্পর-মিলনের একমাত্র উপায় 'ভারত-সভা'। আমরা প্রথম হইতেই ইহার যে গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম, ইহা ধীর ও নিশ্চিত পাদবিক্ষেপে ঠিক সেই গতি-পথে চলিতেছে। সমস্ত ভারতকে একটী কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক সমাজের সহিত গ্রথিত করিতে, ইহা বিবিধ চেষ্টা ও উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। ইহার প্রচারকগণ নানা স্থানে গিয়া উদ্দীপনা-

* The Third Annual Report of the Indian Association, 1878—79.

বাক্যে তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দকে কেন্দ্রীভূত সভার সহিত সূত্রবদ্ধ করিতেছেন। সমস্ত ভারত যেন ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে। কলিকাতা, এলাহাবাদ, লাহোর, বোম্বে ও মান্দ্রাজ—যেন এক সূত্রে সম্বন্ধ হইতেছে। এ সূক্ষ্ম সূত্র সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন এখনও সকলে দেখিতে পাইতেছেন না বটে, কিন্তু কালে যখন ইহা স্থূলতর ও বন্ধন গাঢ়তর হইবে—তখন ইহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইবে। ভারত-সভা বিলাতের হাউস্ অব্ কমন্সের প্রতিরূপ; এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ সভা হাউস্ অব্ লর্ডের প্রতিরূপ। যখন ইংলণ্ডে পর্লিয়ামেণ্টের প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন হাউস্ অব্ কমন্সের অস্তিত্ব ছিল না। ইংলণ্ডের রাজারা কোন বিষয়ে কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, কেবল ব্যারণ্ বা ভূম্যধিকারিগণকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিতেন। লোক সাধারণের প্রতিনিধিগণকে তাঁহারা পরামর্শ করিবার যোগ্য-পাত্র বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু প্রকৃতির গতি কে রোধ করিতে পারে? অসংখ্য লোকের সুখ দুঃখের নিয়মন অতি অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে থাকা অস্বাভাবিক, তাহাতে অবিচার ও পক্ষপাত হইবেই হইবে। অসংখ্য লোকের রক্তশোষণ করিয়া অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা পরিবার অস্বাভাবিকরূপে পরিতুষ্ট হইবে এবং সাধারণ লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইবে, এইরূপ অবস্থা অধিক দিন চলিতে পারে না। লোকে বহুকাল নিমীলিত নেত্রে থাকিতে পারে না। ক্ষুধার জ্বালায় ও অবিচারের কশাঘাতে তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। তখন অন্তর্বিপ্লব অনিবার্য্য; এইরূপ নিরন্তর অন্তর্বিপ্লবে ইংলণ্ডীয় রাজাগণ ক্রমেই অপহৃত প্রাকৃতিক স্বত্ব সকল পুনঃ প্রাপ্ত হইতেছেন। হাউস্ অব্ কমন্স টিউডার রাজবংশীয়গণের সময় পদে পদে অপমানিত ও তিরস্কৃত হইত, সেই হাউস্ অব্ কমন্সই এখন ইংলণ্ডে সর্ব্বে-সর্ব্বা। এখন ইহার প্রতাপে হাউস্ অব্ লর্ডস কম্পিত-কলেবর। অচিরকাল মধ্যেই বোধ হয় হাউস্ অব্ লর্ড্স, হাউস্ অব্ কমন্সের কুক্ষিগত হইবে। আমেরিকাতে হাউস্ অব্ কমন্স ও হাউস অব্ লর্ড্স বলিয়া দুইটী স্বতন্ত্র সভা নাই। একটী মাত্র সভা সমস্ত জাতির প্রতিনিধি! ইহাতে কমন্স ও লর্ড্স দুইই সমান ভাবে বসিয়া, স্বদেশের মঙ্গল সাধন ও ব্যবস্থাপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্টও এই আদর্শে সংগঠিত হইয়াছে। এই বিশ্বজনীন সাম্যের ভাব সর্ব্ব প্রথমে ফ্রান্সেই আবির্ভূত হয়। ফ্রান্স হইতে আমেরিকায় যাইয়া পরিশোধিত হইয়া আবার বিশুদ্ধ অবস্থায় ফ্রান্সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে আমেরিকা ও ফ্রান্সের আদর্শে গঠিত

করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। কত দিনে তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক, যখন সভ্যতায় অধিকতম সমুজ্জল, জাতি-সকল বৈষম্যের ভিত্তিভূমি-স্বরূপ ব্যবস্থাপক ও নিয়ামক সভার ঐকতানিকতা সম্পাদন করিয়াছেন বা করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন, তখন ভাবতবর্ষ সেই পরিত্যক্ত সৌধের উপর রাজনৈতিক প্রাসাদ নিম্মাণ. করিতে কেন ইচ্ছা করিতেছেন? যখন বিশ্বজনীন একতার নিতান্ত প্রয়োজন, তখন জমিদারগণ লৌকিক সমাজের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে স্বীকৃত না হন কেন? দাসগণের মধ্যে আবাব ছোট বড় ভেদ কেন? জমিদাবগণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা নামক একটী স্বতন্ত্র সভা না রাখিয়া ভারত সভার সহিত সম্পূর্ণ মিলিত হইলে, জাতীয় উদ্দীপনা-কার্য্য কত শীঘ্র সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা বোধ হয়, তাঁহারাও বুঝেন। তবে আর কেন বৃথা অভিমানভরে এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্য করিয়া আপনাদিগের কার্য্যকরণশক্তির অপব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের অর্থ ও লোকতান্ত্রিক দলের অধ্যবসায় ও উৎসাহবত্তা একত্র সম্মিলিত হইলে, জাতীয় সমন্বয়-কার্য্য অতি শীঘ্র সম্পাদিত হইতে পারে। ভারত সভার অধ্যবসায় ও উৎসাহ অমিত, কিন্তু ইহার অর্থ নাই। জমিদার সভার অর্থ আছে, কিন্তু তত দূর উৎসাহ অধ্যবসায় নাই। এই দুই একত্র মিলিত হইলে ভারতের আর কি অভাব? প্রজাগণের সহিত—জনসাধারণের সহিত—জমিদারগণের প্রতিদ্বন্দিতায় তাঁহাদিগের উচ্ছেদ বৈ মঙ্গল নাই। লোকসাধারণ তাঁহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবে, কিন্তু তাঁহারা কখন লোকসাধারণের উচ্ছেদ-সাধন করিতে পারিবেন না। ভারতসভা সর্ব্বশুদ্ধ পোনরটী শাখা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বারটী বঙ্গে, দুইটী উত্তর-পশ্চিমবিভাগে ও একটী পঞ্জাবে। মান্দ্রাজ ও বোম্বে এখনও ভারত-সভার অন্তর্ভুক্ত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা সকল সাধারণ-বিষয়েই ভারত-সভার সহিত ঐকতানে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের সহানুভূতির অপ্রতুল নাই। তবে তাঁহারা প্রাদেশিক অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া এখনও মাধ্যমিক সমাজের অধীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, ভারতে পূর্ণ একতা সংস্থাপিত করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কোন মাধ্যাত্মিক সভার অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। জাতীয় শক্তির কেন্দ্রীকরণ ভিন্ন জাতীয় শৃঙ্খলা ও একতা সম্ভবপর নয়।

গত বৎসর ভারত সভা কয়টী গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফলে আমরা সর্ব্বপ্রকার উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত। কোন

বিভাগেরই শীর্ষস্থানীয় হইতে আমাদিগের কোন অধিকার নাই। যেন বিধাতা আমাদিগকে শ্বেত পুরুষের অধীন হইয়া থাকিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। রোম যখন গ্রীসের স্বাধীনতা হরণ করেন, তখন গ্রীসেরও এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। গ্রীকেরা বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যে রোমীয়গণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি অতি সামান্য সামান্য কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকিত মাত্র। আমরা বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যে ইংরাজদিগের শ্রেষ্ঠ না হই, সুশিক্ষিত দলের অনেকেই তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। যদি সিবিল্ সার্ব্বিস্ পরীক্ষা ভারতে গৃহীত হইত, যদি ইংরাজদিগকে ভারতে আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী কভেনেণ্টেড্ সার্ব্বিস্ একচেটিয়া করিয়া লইত। বিলাতে পরীক্ষা গৃহীত হওয়ায় সে সার্ব্বিসের দ্বার অধিকাংশেরই নিকট রুদ্ধ হইয়াছিল। দুই চারি জন করিয়া প্রতি বৎসর সার্ব্বিসের জন্য যাইতেছিল, তাহারা প্রায় অধিকাংশই দেশীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় সকল হইতে পরিক্ষিপ্ত। যাহা হউক পূর্ব্বে বয়সকাল একবিংশতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তবু দুই চারি জন করিয়া প্রতি বৎসর যাইতেছিল, এবং তাহার মধ্যে অনেকেই কৃতকার্য্যও হইতেছিল। কিন্তু এখন বয়স কাল অষ্টাদশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার অর্থ, ভারতবর্ষীয়দিগকে আর কভেনেণ্টেড্ সার্ব্বিস্ দেওয়া হইবে না; কারণ কোন্ অভিভাবক সপ্তদশবর্ষীয়, একাকী ও অসহায় বালককে সেই দূর দেশে প্রেরণ করিবেন? সুতরাং সে দ্বার ভারতবাসিগণের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে।

স্থিতিশীল গবর্ণমেণ্ট ব্যথিত ভারতবাসিগণকে ভুলাইবার জন্য একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন 'ভারতবাসিগণকে অনেক অর্থ ব্যয়ে ও জাতীয় নির্যাতন সহিয়া বিলাত গমন করিতে হয়। লাভের সহিত তুলনায় যে ক্ষতি হয়, তাহার পূরণ হয় না। অতএব এখন হইতে তাহাদিগকে আর সে কষ্ট লইতে হইবে না; এখন হইতে ভারতে থাকিয়াই তাহারা অভীষ্টলাভ করিবে।' এই কথায় প্রথম প্রথম অনেকেই ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু ভারত সভা তাহাতে ভুলিবার নন। ভারত-সভা জানিতেন, ইহারই অভ্যন্তরে কোন গূঢ় অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন আছে; তাঁহারা জানিতেন যে, আন্দোলনকারিগণের মুখবন্ধ করিবার নিমিত্তই তাঁহারা এই সাময়িক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন; তাঁহারা জানিতেন যে, দুই একটী অযোগ্য পাত্রে সেই উচ্চ কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া তাহারা অক্ষম হইলে তাহাদিগের অক্ষমতা লইয়া তাঁহারা বিশেষ আন্দোলন

করিবেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন যে, ভারতবাসী এখনও উচ্চ পদের যোগ্য হয় নাই। এই জন্য ভারত-সভা প্রথম হইতেই এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা অনুগ্রহ চাহেন না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাহেন। কারণ, তাঁহাদিগের মতে অনুগ্রহলব্ধ সৌভাগ্য, জাতীয় অধঃপতনের লক্ষণ-মাত্র। বিজেত্রী জাতির সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা-সমরে অবতীর্ণ হইয়া বিজয়ী হইয়া তাঁহারা জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে চাহেন। এই জন্য তাঁহারা স্থিতি-শীল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পার্লেমেণ্টে আবেদন করিবার নিমিত্ত এক জন প্রতিনিধি পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। সকলেই জানেন, প্রসিদ্ধনামা লাল মোহন ঘোষ সেই প্রতিনিধিত্ব পদে অভিষিক্ত হন। প্রতিনিধি পাঠাইতে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহার জন্য ভারত সভাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মদেশ সমস্ত ভারত এক বাক্যে ভারতসভার এই উদ্যোগের অনুমোদন করেন। ইহার ফল আর কিছু না হউক, ভারতের গ্রন্থন-সূত্র স্থূলতর হইয়াছে। ভারত যে একতানে কার্য্য করিতে পারেন, তাহার প্রমাণ হইয়াছে।

ভারত সভা দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাযন্ত্র বিধির বিরুদ্ধে সবিশেষ আন্দোলন করিয়া উন্নতিশীল দলের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। স্থিতিশীল দল ভারতে কিরূপ অপ্রিয় হইয়াছিলেন, ভারত-সভা এরূপ আন্দোলন না করিলে ইংলণ্ডের নির্ব্বাচকেরা কিছুতেই তাহা জানিতে পারিতেন না; তাহা হইলে নির্ব্বাচন কালে তাঁহাদিগের হৃদয় কোন্ দিকে লীন হইত, কে বলিতে পারে? মুদ্রা-যন্ত্র-বিধিব ব্যবস্থাপনের পর ভারত-সভা ভারতের গগন বিদারিয়া এইরূপ আন্দোলন না করিলে ইহার পরিশোধন হইত কি না সন্দেহ। তাহা না হইলে সেই কঠোর বিধি কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া দেশ রসাতলে দিত, সাহিত্য-রাজ্য ছার-খার করিত সন্দেহ নাই।

ভারত-সভা আফ্‌গান যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধে ন্যস্ত করা ন্যায়-বিগর্হিত—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া পার্লেমেণ্টে আবেদন করেন। ভারত-সভার ক্রন্দনে পার্লেমেণ্টের হৃদয় কাঁদিয়াছে কি না জানি না; তবে অন্ততঃ এই উপকার হইয়াছে যে সেই মহতী সভার সভ্যেরা এখন জানিতে পারিয়াছেন, ভারত-বাসীরা অন্তরের দুঃখ সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে। সম্মুখে কাতর স্বরে কাঁদিলে অতি পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। একবার দুইবার তিন-বার—সে ক্রন্দন উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু চতুর্থবারে সে ক্রন্দন না শুনিয়া আর থাকিতে পারে না। সুতরাং এইরূপ বারবার ক্রন্দন করিতে করিতে আমরা একদিন নিশ্চয়ই সিদ্ধ-কাম হইব।

আমরা বোধ হয় অনেকেই জানি, আমাদিগের লজ্জা নিবারণের জন্য ইংরাজেরা আমাদিগের দেশ হইতে তুলা লইয়া গিয়া কাপড় বুনিয়া আমাদিগের জন্য ভারতে আনিয়া থাকেন। ইংরাজেরা আমাদিগকে কাপড় না দিলে আমাদিগকে উলঙ্গ থাকিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের লজ্জার বিষয় আর কি কিছু আছে? জাতীয় অধঃপতনের ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু অপ্রিয় হইলেও ইহা অকাট্য সত্য যে, আমরা এ বিষয়ে অতি অসভ্য জাতিরও অধম। ইংরাজেরা কলে কাপড় বুনিতে পারেন বলিয়া আমাদিগের তন্তুবায়গণ অপেক্ষা অনেক সস্তায় কাপড় দিতে পারেন। এই জন্যই আমাদিগের তন্তুবায়কুল ক্রমেই নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। ভারতের তন্তুবায়কুলকে রক্ষা করিবার জন্য একটী রক্ষাকর (Protection duty) সংস্থাপিত হয়। ভারত হইতে ম্যান্চেষ্টারে যত তুলা যায়, তাহার উপর কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে শুল্ক ধার্য্য করিলে বিলাতী কাপড়ের দর চড়িয়া যাইতে পারে তাহা হইলেই দেশীয় কাপড় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক কাটিতে পারে, সুতরাং ভারতের তন্তুবায়-কুল একেবারে নির্ম্মূল হয় না, এবং রাজস্বেরও বিশেষ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ সঙ্গত উপায়ে রাজস্ব বৃদ্ধি হইলে প্রজাদিগের প্রতি অযথা কর-স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। কোন দুর্ব্বল জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বাধীন বাণিজ্যের গতি রোধ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর যে করস্থাপন করা হয়, তাহারই নাম রক্ষাকর। যেমন কোন পালওয়ানের সহিত মল্লযুদ্ধে দুর্ব্বলের প্রাণসংশয়, সেইরূপ অতি উন্নতিশীল জাতির সহিত স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের মত দুর্ব্বল জাতির প্রাণধ্বংসের সম্ভাবনা। এই জন্য রক্ষাকর আমাদিগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। লর্ডনর্থব্রুকের সময়ে স্যালিস্‌বরী যখন রক্ষাকর উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হন, তখন সেই সহৃদয় গবর্ণর জেনেরেল্ ভারতের ভাবী দুঃখ অনিবার্য্য ভাবিয়া নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্ররোচনায় অসময়ে নিজের কার্য্য হইতে অবসৃত হন। যে ব্যক্তি সেই দুরূহ কার্য্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম, তাঁহারই হস্তে ভারতের ত্রিশ কোটী অধিবাসীর অদৃষ্ট সমর্পিত হইল। সকলেই জানেন, এই নৃশংস কার্য্য লর্ড লীটন আসিয়া এক দিনে সম্পন্ন করিলেন।

এই রক্ষাকর ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য ভারত সভা পার্লেমেণ্টে আবেদন করেন। ইহারও ফল অব্যবহিত কিছু না হউক, ব্যবহিত কিছু আছেই সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সরফরাজ খাঁ পতন—ঐতিহাসিক নাটক। কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আলাবর্ট প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা চারি আনা। গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশিত, গ্রন্থকার যিনিই হউন্, তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই। তিনি প্রণয়শূন্য নাটক লিখিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাটক প্রেম-প্রধান-ঘটনামূলক হইয়া পড়িয়াছে। অথচ তিনি যে প্রেমের চিত্র দিয়াছেন, তাহা অতি সামান্য। তাঁহার নায়িকা জুল্‌ফ স্বর্গীয় প্রেম কখন হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে নাই। জুল্‌ফ মনে মনে দেল্ মহম্মদকে বরণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পিতা মাতা হাজী-পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিলেন। জুল্‌ফ এই সংবাদে মনে মনে বলিতেছে—"মাতা হাজী পুত্রকে মনোনীত করেছেন, হাজী ও কম ধনী নয়—তবে তা'ই হউক। মুখ ফুটে বলতে পারি না।" টাকা থাকিলেই জুল্‌ফের আর কোন আপত্তি নাই। অধিক কি জুল্‌ফ যে নবাবপুত্রকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, তাহাও অর্থ ও জাঁকজমকের জন্য—"কত হীরা মাণিক্য মুক্তায় খচিত হয়ে শোভা পাব। * * নবাবের পুত্রবধূ হ'য়ে, সজ্জিত হয়ে বসে থাক্‌ব।" জুলফ-হৃদয়ে এই সকল চিন্তা সমুদিত হইত। এই নাটকের ঘটনা-স্রোতের নায়ক রহিম। জুল্‌ফ প্রেম তাহার সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক। জুল্‌ফকে পাইবার নিমিত্ত সে নানা উপায়ে আপনাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত করিল, হাজীর অপমান করিল, এবং অবশেষে যখন নবাবপুত্রের সহিত জুল্‌ফের বিবাহ হইল, তখন জুল্‌ফ প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ঘোরতর প্রতিহিংসাব্রতে ব্রতী হইল। এখন হইতে জুল্‌ফের সর্ব্বনাশ সাধন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। সরফরাজ বংশের ধ্বংস সাধন করিয়া সে অবশেষে পূর্ণকাম হইল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইল, আবার রহিমের অন্তরে জুল্‌ফ-লালসা বলবতী হইল। পতিহন্তা রহিম জুল্‌ফের নিকট গিয়া এইরূপে আত্ম মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে—"তুমি আমার এই কার্য্যের মূল। তোমাকে প্রাপ্তি-কামনা আমার জপমালা ও চেষ্টা। তোমাকে পাব ব'লে, ও সব করেছি—পৃথিবীতে এমন্ কোন্ অকর্ম্ম আছে, যাহা তোমাকে পেলে রহিমের অসাধ্য? তোমাকে লয়ে যাব বলে এই যুদ্ধান্তে এসেছি। এস এখন যাই।" কিন্তু রহিমের ভালবাসা রূপজ মোহমাত্র। রহিম স্বর্গীয় ভালবাসা কাহাকে বলে,

তাহা জানিত না। জানিলে এ নাটকের ঘনা-পুঞ্জ অবতারিত হইত না, এবং সরফরাজবংশ ধ্বংস ও নায়ক নায়িকার শোচনীয় অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইত না।" নাটকীয় গুণে ও ভাষা-বৈচিত্র্যে এ খানি নিকৃষ্ট দৃশ্য কাব্যের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ (হোমিওপেথিক) ১ম খণ্ড।* ইহা এক খান সঙ্গ্রহ-পুস্তক। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানব জীবনে যে যে ব্যাধি সংঘটিত হয়, তত্তাবতের চিকিৎসার ঔষধাদির বিষয় এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইবে। বর্ত্তমান খণ্ডে জন্ম হইতে দন্তনির্গম কাল পর্য্যন্ত তাবৎ রোগের চিকিৎসা বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমপাঠী ও প্রবীণ চিকিৎসক। পুস্তকের ভাষা যার পর নাই প্রাঞ্জল হইয়াছে। মহেশ বাবুর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আশা করি, তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন। ইংরাজী ভাষায় যেমন "Library of Medicine" নামক বিস্তৃত গ্রন্থ আছে, ইনি বাঙ্গালা ভাষায় তদ্রূপ এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচারে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

সমালোচ্য পুস্তক খানির বিশেষ গুণ এই যে, ইহা কেবল সংস্কৃত, হকিমী, (মুসলমানী,) এলোপ্যাথি ও এতদ্দেশ-প্রচলিত চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুবাদ বা সংগ্রহ নহে; তুলনা করিয়া যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে উপকারী, গ্রন্থকর্ত্তা তাহারই সম্মাননা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি এক জন বহুদর্শী ও উদারপ্রকৃতি ডাক্তার তাহার সন্দেহ নাই। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের "দাতব্য চিকিৎসালয়ে" চিকিৎসা করিয়া তিনি যে ঔষধকে অনেক স্থলে ফলপ্রদ বুঝিতে পারিয়াছেন, অথচ তাহা হানিমান্ হইতে এতাবৎ কেহই উল্লেখ করেন নাই, এমন ঔষধেরও তিনি আবশ্যক মত স্থল-বিশেষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালির নূতন-মত-উদ্ভাবনী শক্তি স্বীকার করেন নাই, ইহাতে তাঁহাদের ভ্রমাপনোদন হইবে।

হোমিওপেথি চিকিৎসা যে সমধিক ফলদায়ক, আজ কাল অনেকেরই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। আমরা স্বীয় জীবনে হোমিওপেথির গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উপযুক্ত লোক দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য সমাহিত হইলে, হোমিওপ্যাথির গুণে অচিরেই জন-সাধারণ আকৃষ্ট হইবেন। দুঃখের বিষয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য অতি অল্পসংখ্যক লোকই ইহাতে যোগদান করিতেছেন। যতই হোমিও-পেথির বহুল প্রচার হইবে, আমরা ততই আনন্দিত হইব, এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রেরও এতদ্দেশে দিন দিন উন্নতি হইতে থাকিবে।

* ডাক্তার শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সংগৃহীত। ৫নং মুসলমান পাড়া লেন বেঙ্গল সুপিরিয়র যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ২॥ টাকা।

মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

কলিকাতা।

সন ১২৮৫ সাল।

বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক	...	৩৲

সন ১২৮৭ সাল।

বাবু ব্রজনাথ বসু ...	...	৩৲
" চণ্ডীচরণ সিংহ ...	...	৩৲
" দেবশঙ্কর দে ...	...	৩৲
" উমেশচন্দ্র ঘোষ	...	৩৲
" হীরালাল ঘোষ	...	৩৲
" কেদারনাথ বর্ম্মণ	...	২৲
" বনওয়ারিলাল দে	...	৩৲
" সত্যচরণ রায়	...	৩৲
" বিষ্ণুচন্দ্র রায়	...	২৲
" মোহিনীমোহন দত্ত	...	৩৲
" ভোলানাথ দে	...	৩৲
" নীলমণি পাল চৌধুরী	...	৩৲
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	...	১৲
" মাখনলাল নাগ	...	২৲
" শ্যামাচরণ কুণ্ডু	...	৩৲
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১৷৷০
" দীননাথ মিত্র	...	৩৲
" হেমচন্দ্র দেব	...	১৲
" বামাপদ ঘোষ	...	৩৲
" বিহারীলাল শাহা	...	১৲
" রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৲
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	...	১৲
" দেবেন্দ্রনাথ কুণ্ডার	...	৩৲
" কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক	...	৩৲
" দেবেন্দ্রনাথ পাল	...	২৲
" বিপিনবিহারী দাস দে	...	৩৲

মফঃস্বল।

বাবু বেচারাম চক্রবর্ত্তী	(নবগ্রাম)	৩৲

মফঃস্বল ও কলিকাতার অন্যান্য মূল্য প্রাপ্তি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

যাঁহার প্রয়োজন হইবে, পত্র লিখিলে পাইবেন। পূর্ব্বে এই ঔষধের যন্ত্র দ্বারা রস প্রস্তুত হইত, কিন্তু দুই বৎসর গত হইল ডাক যোগে অনেক শিশি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে এবং অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতঃ কখন কখন ঔষধ নষ্ট হওয়ায় আমার অনেক ক্ষতি হওয়াতে আমি বহু যত্ন ও আয়াস সহকারে এই চূর্ণ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছি এবং এক বৎসর কালাবধি ইহার পরিক্ষা করিয়া বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে ইহা অমৃতরস অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও অধিক ফলদায়ক, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণীত হইয়াছে।

অমৃত চূর্ণ সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য, অসাধ্য ও কষ্টসাধ্য রোগের শান্তি হয়। এমন কি ক্ষয়, যক্ষ্মা বহুকালের শূল, শিরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ হৃদ্‌কম্প, অম্লপিত্ত অম্লশূল, পুরাতন জ্বর প্লীহা, যকৃৎ, গ্রহণী, অতিসার, বাত, পুরাতন প্রমেহ ও উপদংশ, পারান্ধটিত দোষ, রক্তবিকার, মূত্রকৃচ্ছ্র বা বহুমূত্র এবং নানাবিধ জড়িত ও একত্রীভূত পুরাতন ও কঠিন রোগ প্রতীকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোক দিগের কতকগুলিন বিশেষ রোগের ইহা আশু প্রতীকারক। যথা, সূতিকা, রক্তস্রাব, প্রদর, মূর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নেভয়দর্শন, মৃতবৎসা প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয়। ইহা এরূপ নির্দ্দোষ ঔষধ যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও গর্ভবতী স্ত্রীরও সেব্য। ইহাতে কোন প্রকার মাদক ও বিষাক্ত বস্তুমাত্রই নাই। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক, পৌষ্টিক ও বলবর্দ্ধক।

প্রত্যেক বাণ্ডিল অর্থাৎ এক প্রস্থ অমৃতচূর্ণের মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র। প্যাকিং খরচ।০ চারি আনা ও ডাক মাসুলও।০ আনা মাত্র। ইহা ২০ দিন সেবনীয়। ইহাতেই রোগ আরোগ্য হয়। অধিক পুরাতন ও কঠিন রোগে ঔষধ কিছু অধিক দিন সেবন করা আবশ্যক। এই ঔষধ এক বৎসরের অধিক কাল অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে। জল মিশ্রিত না করিলে নষ্ট হয় না। ইহা পাঠাইবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। ভাঙ্গিবার ভয় নাই, নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। ৪।৫ চারি পাঁচ প্রস্থ ঔষধ ॥০ আট আনা ডাক্ মাসুলে যাইতে পারে। যিনি একেকালীন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মূল্যের ঔষধ ক্রয় করিবেন, তাঁহাকে ১৪ বাণ্ডিল ঔষধ দেওয়া যাইবে। ইহাতে তাঁহার ছয় টাকা লাভ হইবে। এবং ১৲ এক টাকা মাত্র ডাক মাসুল লাগিবেক। পোষ্টেজ্ ষ্ট্যাম্প অথবা কোর্টফি দ্বারা কদাচ ঔষধের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। নোট্ কিম্বা মণি অর্ডার দ্বারা মূল্য পাঠাইবে।

বাণ্ডিলের দুই পার্শ্বে আমার মোহর দেখিয়া লইবেন।

ওলাউঠার অমোঘ বটিকা।

সকল প্রকার প্রকাশিত ঔষধ অপেক্ষা এই বটিকা আশু-ফল-প্রদ। শতকরা ৯০ জনের অধিক রোগী আরোগ্য হইতেছে। ওলাউঠার ৫০টী বটিকার মূল্য এক্ষণে ৩৲ তিন টাকা ও প্যাকিং ৷৹ আট আনা করা গেল। পূর্ব্বে ইহার মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা ছিল। ইহাতে ২০ জনের অধিক আরোগ্য হইবে।

যাঁহারা আরোগ্য-সমাচার-পত্র দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাকে পত্র লিখিবেন।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
মিশির পোখরা, বেনারস।

স্কচ্-ইতিবৃত্ত-সম্বলিত

বীরবর ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

গ্লাসেগো সভা।

পার্সীর ভৃত্যগণ নিহত—আরল্ (র্জো) ম্যাল্কমের সহিত ওয়ালেসের সাক্ষাৎ—
গার্গনিক্ ও কিঙ্কেডন্ দুর্গ অধিকার—সর্টউড্ সা যুদ্ধ—
সেণ্ট জনষ্টন্ শত্রুহস্তে পতিত।

১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস উপস্থিত। স্কট্লণ্ডের শাসন জন্য কতিপয় আইন করিবার নিমিত্ত গ্লাস্গো নগরে একটী মহতী ইংরাজসভা আহূত হইল। ডর্হামের যাজক এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সকল প্রদেশের সেরিফগণ এই সভায় আহূত হইলেন। সুতরাং আয়ারের কৌলিক সেরিফ সার্ রেনাল্ডও আহূত হইলেন। তিনি, ওয়ালেস্ ও আর দুই জন অনুযাত্রিক-সমভিব্যাহারে গ্লাস্ নগর-অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। একটী বালক রেনাল্ডের সুন্দর অশ্বটী লইয়া অগ্রেই যাত্রা করিয়াছে। ওয়ালেস্ দুই সহচর সহ সেই বালককে আসিয়া ধরিয়াছেন; এদিকে বৃদ্ধ রেনাল্ড পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। পথিমধ্যে পার্সীর কতিপয় ভৃত্যের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। বহুমূল্য-দ্রব্য-পরিপূর্ণ এক খানি শকটের রক্ষক হইয়া পার্সীর অধীনস্থ পাঁচ জন পদাতিক ও তিন জন অশ্বারোহী গ্লাস্গোর অভিমুখে গমন করিতেছিল। শকটের অশ্ব অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়ায়, তাহারা রেনাল্ডের অশ্ব শকটে যোজিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ওয়ালেস্ নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, সন্ধির অবস্থায় এরূপ দস্যুবৃত্তি অক্ষমণীয়। কিন্তু তাহারা শুনিল না—অশ্বকে শকটে যোজিত করিল। ওয়ালেস্ ক্রোধে অধীর হইয়া এরূপ দস্যুবৃত্তির সমুচিত প্রতিফল দিবার নিমিত্ত—রেনাল্ডের অনুমতি লইবার জন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। রেনাল্ড তখন মুয়ারসাইড্ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌহুছিয়া ছিলেন। তিনি ওয়ালেস্কে শান্তি অবলম্বন করিতে

বলিলেন। ওয়ালেস্ ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার অধীনতাবন্ধন-ছেদন করিলেন; এবং প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অশ্বারোহণে অতি দ্রুত-গতিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্ রেনাল্ড ওয়ালেসের এই দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন; পাছে পার্সী এই প্রতিহিংসাব্যাপারে তাঁহাকেও লিপ্ত করে, এই ভয়ে তিনি মুয়ারসাইড্ হইতে আর এক পদও অগ্রসর হইলেন না, এবং সমস্ত রাত্রি ওয়ালেসের পরিণাম ভাবিয়া অনিদ্রায় যাপিত করিলেন।

এদিকে ওয়ালেস্ সেই দুই সহচর-মাত্রকে সহায় করিয়া পূর্ব্বতাক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে পার্সীর ভৃত্যেরা ক্যাথ্‌কার্টের অদূরে আসিয়া পড়িয়াছিল। ওয়ালেস্ অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাদিগকে আসিয়া ধরিলেন। ওয়ালেস্ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং ভীম পরাক্রমে তাহাদিগের কয় জনকেই নিহত করিয়া যাবতীয় বহুমূল্য দ্রব্যের সহিত অশ্বদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া প্রদোষে বৃক্ষসেতু দ্বারা ক্লাইড্ নদী পার হইলেন। গ্লাস্‌গোর এত নিকটে থাকা কোন মতে যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া অনুযাত্রিক-সহ লেনক্সের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরল্ ম্যাল্‌কম্ এই সময়ে লেনক্স দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন; তিনি এখনও এড্-ওয়ার্ডের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই; সুতরাং ওয়ালেস্ ও তাঁহার অনুযাত্রিক-দ্বয়ের মহাসমাদরে তথায় পরিগৃহীত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহারা একেবারেই ম্যাল্‌কমের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দুই চারি দিন কাল তথায় এক পান্থ-বাসে অবস্থিতি করিলেন। এদিকে পার্সীর নিকট এই সংবাদ যাইবা-মাত্র তিনি স্থির করিলেন যে কুহকী ওয়ালেসেরই এই কার্য্য। এই স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সার্ রেনাল্ডের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত আসিয়া দেখিল—সার্ রেনাল্ড মার্নসে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু পার্সীর ভৃত্যগণের হত্যাকাণ্ড গ্লাস্‌গোর অনতি দূরেই সংঘটিত হইয়াছে। রেনাল্ড বিচারালয়ে আনীত হইলেন। কিন্তু প্রমাণ হইল—তিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ও ভ্রাতুষ্পুত্রের তদানীন্তন গতিবিধির বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

যখন তিন চারি দিন ধরিয়া গ্লাস্‌গোয় সভার অধিবেশন হইতেছিল, তখন ওয়ালেস্ লেনক্সে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। তাঁহার নিকট তথায় সংবাদ আসিল যে, সভা তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য আইন জারি করিয়াছেন। রবার্ট বয়িড্ নেলাল্ড প্রভৃতি এই সভার অধিবেশন-কালে গ্লাস্‌গো নগরে ছিলেন। তাঁহারা দলপতির এই বিপদে বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ওয়ালেস্ কোথায় আছেন, অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহারা গুপ্ত-

ভাবে গ্লাস্‌গো হইতে বহির্গত হইলেন। ওয়ালেসের অন্যান্য বন্ধুগণও কে কোথায় ছত্রভঙ্গ হইয়া রহিয়াছেন, তাহারও নির্ণয় নাই। এই অবস্থায় ওয়ালেসের মনে উদ্বেগের পরিসীমা রহিল না।

তিনি সেই পান্থাবাস পরিত্যাগ করিয়া আরল্‌ ম্যাল্‌কমের নিকট উপস্থিত হইলেন। ম্যাল্কম্‌ মহা সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। লেনক্‌স তৎকালে রণকুশল বীরবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল; এবং আজও এড্‌ওয়ার্ডের প্রতাপ উপেক্ষা করিতেছিল। আরল্‌ বলিলেন—"যদি আপনি লেনক্‌সে বাস করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমার সমস্ত বীর অনুযাত্রিকবর্গ আপনার আদেশবর্ত্তী হইবে। কিন্তু ওয়ালেস্‌ ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন। কারণ, যে মহাত্মা সমস্ত স্কট্‌লণ্ডকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিবেন,—তাহাতে প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, এরূপ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ প্রস্তাবে তিনি কি বলিয়া সম্মত হইবেন? ওয়ালেস্‌ তাঁহার এই গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া ম্যাল্‌কমের নিকট উত্তরাভিমুখে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

উত্তরে গমন করিবার পূর্ব্বে তিনি গেরিলা যুদ্ধে অবতারিত করিবার জন্য এক দল ক্ষুদ্র সৈন্য দীক্ষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রমির্ডলস্‌ রোমের পত্তনকালে ও শিবজি মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাপন-কালে আত্মদল বৃদ্ধির যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ওয়ালেসও ঠিক্‌ সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেন। তিনি দীক্ষিতগণের সহস্র দোষ উপেক্ষা করিয়া স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগের সকলকেই স্বদলভুক্ত করিতে লাগিলেন। অধিক কি, অনেক আয়র্লণ্ডবাসীকেও তিনি নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। যাহারা ওয়ালেসের দীক্ষাগুরুত্ব স্বীকার করিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই ওয়ালেসের নিকট শপথ গ্রহণ করিতে হইল। এই ক্ষুদ্র সেনা লইয়া ওয়ালেস্‌ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আরল্‌ ম্যাল্‌কম্‌ বিশেষ সম্মানের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন। তিনি ওয়ালেসকে পর্য্যাপ্ত অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলেন, কিন্তু ওয়ালেস্‌ তাহাতে অসম্মত হইলেন। ওয়ালেস্‌ অর্থগৃধ্নু ছিলেন না। পার্দীর লুণ্ঠিত সম্পত্তি এখনও বিশোধিত হয় নাই, সুতরাং অর্থের অভাব ছিল না বলিয়াই তিনি ম্যাল্‌কমের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া ছিলেন। তিনি বরং যাইবার সময় দীন দুঃখীকে তাঁহার অর্থের কিয়দংশ দান করিয়া গেলেন।

ষ্টার্লিং সায়ারের অদূরে ইংরাজগণ-কর্ত্তৃক গার্গনক্‌ নামে একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ওয়ালেস্‌-অধিনীত দশাধিক-

পঞ্চাশৎ বীর পুরুষ এই দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে কাপ্তেন থার্ ওয়াল্ নামক এক সৈনিক পুরুষের উপর এই দুর্গের রক্ষা-ভার ন্যস্ত ছিল। দুর্গের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য দুই জন গুপ্ত চর রজনীযোগে তথায় প্রেরিত হইল। তাহারা দেখিয়া আসিল, যে দুর্গের পরিখার উপর সেতু বিলম্বিত রহিয়াছে; যদিও দুর্গের দ্বার রুদ্ধ, তথাপি প্রহরী ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছে। ওয়ালেস্ এই সংবাদ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র সেনাদল লইয়া সেতুপার হইয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গদ্বার সুদৃঢ় অর্গলে আবদ্ধ ছিল। সেই অর্গল ভগ্ন করিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিবার বিবিধ চেষ্টা হইতে লাগিল; কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যাহত হইল। অবশেষে স্বয়ং ওয়ালেস্ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি এক প্রচণ্ড করাঘাতে প্রাচীরের কিয়দংশ সহ প্রাচীর-সংলগ্ন সেই অর্গল তুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই ভীমপরাক্রমে সকলে বিস্মিত হইল। বস্তুতঃ শারীরিক বলে আমাদিগের দেশের ভীমের সহিত কেবল ওয়ালেসেরই তুলনা হইতে পারে। ক্ষণকাল পরেই তাঁহার প্রচণ্ড পদাঘাতে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই ভীষণ শব্দে দুর্গরক্ষকদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দ্বার-রক্ষক শাস্ত্রী সহসা উঠিয়াই হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা ওয়ালেসের মুখে আঘাত করিল। ওয়ালেস্ তাহার হস্ত হইতে সেই যষ্টি গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি প্রহারে দ্বার-রক্ষককে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর তিনি কাপ্টেন্‌কে লক্ষ্য করিয়া সেই যষ্টির আঘাতে তাহাকেও সেই দশা প্রাপিত করিলেন। তাঁহার বীর সহচরগণ ক্রমে তাঁহার সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলে, দুর্গস্থ সকলেই যমালয়ে প্রেরিত হইল। ওয়ালেসের কেহই বালক ও স্ত্রীলোকের গাত্রস্পর্শও করিতে পারিল না। সেতু তুলিয়া ওয়ালেস্ চারি দিন ধরিয়া সেই দুর্গে নিরাপদে অবস্থিতি করেন। এই দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার এত নিভৃতরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে, এ কয় দিবসের মধ্যে এ সংবাদ দুর্গের বাহিরে যায় নাই। তাঁহারা দুর্গপতির স্ত্রী ও পুত্রগণকে মুক্তি দিয়া—দুর্গের বহুমূল্য দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া দুর্গের গৃহ সকলে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক রাত্রিযোগে ফোর্ত্ত পার হইয়া অদূরবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই অরণ্যের নাম মেথ্‌বেন্ অরণ্য। ইহা সেণ্ট জন্‌ষ্টন্ পার্থ নগরের অদূরে অবস্থিত। ওয়ালেস্ মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। তিনি এখানে আসিয়া এক তীরে একটী সুন্দর হরিণ বিদ্ধ করিলেন। এই হরিণমাংসে তিনি সহচরবৃন্দকে পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করাইলেন। তথায় রজনী যাপন করিয়া তিনি প্রত্যূষে একাকী গুপ্তবেশে সেণ্ট জন্‌ষ্টন্ নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরের অদূরে আসিয়া তিনি লোক দ্বারা কোটালের

নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। কোটালের অনুমতি পাইয়া তিনি নগর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোটাল তাঁহাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নামধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আত্মগোপন করিয়া বলিলেন "মহাশয়! আমার নাম উইল্ ম্যাল্কম্-সন্; আমার পিতার নাম ম্যাল্কম্। আমি এট্রিক্ অরণ্য হইতে আসিতেছি। বাস-যোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে আমি এই উত্তর প্রদেশে আসিয়াছি"। কোটাল বলিল, "মহাশয়! আমি কোন মন্দ উদ্দেশে এই সকল প্রশ্ন করিতেছি না; তবে সম্প্রতি পশ্চিম প্রদেশ হইতে ওয়ালেস-নামা এক পাপিষ্ঠ আসিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের সমস্ত লোক জন মারিয়া ফেলিল, এই অশুভ সংবাদ আসিয়াছে বলিয়াই, এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইয়াছি"। ওয়ালেস্ এমনি ভাবে উত্তর করিলেন যে, কোটালের মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না; তিনি তাঁহাকে অবাধে নগর-মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন।

কি রূপে সেণ্ট জন্‌ষ্টন্ অধিকার করা যাইতে পারে, ইহার নির্ণয় করাই তাহার এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন, দুর্গদ্বার অতি সুদৃঢ় এবং দুর্গপ্রাচীর অতি স্থূল। ইহা দেখিয়া দেখিয়া তিনি এ দুর্গ অধিকার করার সঙ্কল্প আপাততঃ পরিত্যাগ করিলেন। এখানে শুনিলেন যে, পার্থ নগরে ইংরাজদিগের কিংক্লেভন্ নামক একটী দুর্গ আছে। সার্ জেম্‌স্ বট্‌লার্ নামক এক জন নিষ্ঠুর নাইট্ এই সময় এই দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। ওয়ালেস্ শুনিলেন—সেই দিন সেণ্ট জন্‌ষ্টন্ হইতে এক দল ইংরাজ-সৈন্য গিয়া সেই দুর্গের বলবৃদ্ধি করিবে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র ওয়ালেস্ তাহাদিগকে পথে আক্রমণ করা স্থির করিলেন; এবং গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া মেথ্‌বেন্ অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আসিবার কালে কাহাকেও কিছু বলিয়া আসেন নাই, এই জন্য তাঁহার সহচরেরা তাঁহার বিষয়ে নিতান্ত ভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দূর হইতে ওয়ালেসের শৃঙ্গরব শুনিয়া মৃত দেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন। ওয়ালেস্ শৃঙ্গ-ধ্বনি করিতে করিতে যেমন অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার সহচরবৃন্দ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাঁহাদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তদীয় অভিপ্রায় অবগত হইবামাত্র শীঘ্র রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুন্দর শৃঙ্খলায় অরণ্য হইতে বহির্গত হইলেন।

তাঁহারা টে নদীর তীরবর্ত্তী নিবিড় বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ইংরাজদিগের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিন জন্য অশ্বারোহী চলিয়া গেল, তাহার অতি অব্যবহিত পরেই

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নবতিসংখ্যক ইংরাজ অশ্বারোহী পরিদৃষ্ট হইল। ওয়ালেস্ ও তৎসহচরবৃন্দ সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। এই হঠ আক্রমণে তাহারা সকলেই প্রথমে স্তম্ভিত হইল। অবশেষে আক্রমণকারিগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইংরাজেরা আক্রমণকারীদিগের প্রতি বর্ষাক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং সবেগে তাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালিত করিয়া তাঁহাদিগকে ভূপাতিত করিবে সঙ্কল্প করিতেছে, এমন সময়ে ওয়ালেস্ সদলে ভীম রবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণের বেগ সম্বরণ করা ইংরাজদিগের অসাধ্য হইয়া উঠিল। প্রথম আক্রমণেই অসংখ্য ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। ওয়ালেসের বর্ষা সহসা ভগ্ন হইলে তিনি গদাহস্তে তাড়িতবেগে শত্রুদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মত্তহস্তী যেমন শুণ্ডাঘাতে সম্মুখের সমস্ত দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ ওয়ালেস্ প্রচণ্ড গদার আঘাতে অসংখ্য ইংরাজ অশ্বারোহীকে অশ্বের সহিত ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সার্ জেম্‌স বট্‌লার্ এই সৈনিকদলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি অশ্ব হইতে নামিয়া অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওয়ালেসের প্রচণ্ড অসি প্রচণ্ডবেগে তাঁহার মস্তকের মধ্যদেশে পতিত হইয়া তাঁহার দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিল। ইংরাজসেনা তাহাতেও ভগ্নহৃদয় না হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু স্বজাতি প্রেম ও স্বদেশানুরাগের বলবতী উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত বীরবৃন্দের বেগ ধারণ করে, কাহার সাধ্য? ইংরাজেরা ক্রমে হতবল হইয়া রণস্থলে ত্রিগুণিত বিংশতি সংখ্যক সহচর রাখিয়া সহসা রণে ভঙ্গ দিয়া কিংক্লেভেন দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিল। দুর্গাভ্যন্তরে শস্ত্রধারী পুরুষ অতি অল্পই ছিল। দুর্গবাসীর মধ্যে স্ত্রী ও যাজকের সংখ্যাই অধিক ছিল। তাঁহারা দুর্গপ্রাচীরের উপর হইতেই এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন; এক্ষণে সেতু বিলম্বিত করিয়া ও দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রাণভয়ে পলায়মান সেই সৈনিকবৃন্দকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। কিন্তু যৎকালে সেতু বিলম্বিত ও দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল; সেই অবকাশে শত্রুমিত্র মিশ্রিতভাবে দুর্গাভ্যন্তরে লব্ধপ্রবেশ হইল। ওয়ালেস্ ও তদীয় বিজয়ী সহচরবৃন্দ দুর্গমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া বাল স্ত্রী ও দুই জন যাজক ব্যতীত আর সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধে ওয়ালেসের পাঁচ জন মাত্র সঙ্গী নিহত হয়। ওয়ালেস্ দুর্গের বাহিরে ও অভ্যন্তরে যে সকল মৃত দেহ ছিল, সে সমস্ত সমাধিনিহিত করিয়া, সেতু উত্তোলন ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া, নিরাপদে দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সাত দিন এখানে বিশ্রাম করিয়া ওয়ালেস্ আর এখানে থাকা উচিত নয় ভাবিয়া দুর্গের যাবদীয় বহুমূল্য দ্রব্য লুণ্ঠনপূর্ব্বক রাত্রিযোগে অদূরবর্ত্তী "সর্টউড্‌সা" নামক অরণ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া আসিলেন; ফিরিয়া আসিয়া বন্দীদিগকে উন্মুক্ত করিয়া দুর্গে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় সেই অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দহ্যমান দুর্গের প্রচণ্ড অগ্নিশিখা চতুর্দ্দিক্‌স্থ অধিবাসিবৃন্দকে প্রকৃত ঘটনা জানাইল। এদিকে কাপ্‌টেন্ বট্‌লারের বিধবা রমণী উন্মুক্ত হইয়া সেণ্ট জনষ্টন্ দুর্গের অধ্যক্ষ সার জিরার্ড হেরনের নিকট আসিয়া আমূল সমস্ত ঘটনা বিবরিত করিল। হেরন্ বুঝিলেন—কুহকী ওয়ালেসেরই এই কার্য্য; বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সহস্র সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাহার অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন।

এদিকে ওয়ালেস্ আক্রমণ-আশঙ্কায় অরণ্যমধ্যে একটী সুন্দর কাষ্ঠ নির্ম্মিত দুর্গ প্রস্তুত করিলেন; ছয়টী চক্রাকার কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীরে দুর্গটীকে আবৃত করিলেন; প্রত্যেক প্রাচীরে দুইটী করিয়া গুপ্ত দ্বার রাখিলেন, অভিপ্রায় এই যে, এক একটী প্রাচীর শত্রু হস্তগত হইলে, তাঁহারা গুপ্ত দ্বার দিয়া ক্রমেই পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রাচীরের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; সমস্ত প্রাচীরগুলি শত্রুগণের হস্তগত হইলে তাঁহারা শেষ গুপ্ত দ্বার দিয়া নিবিড়তর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিবেন।

কিংক্লেভন্ যুদ্ধে নিহত সার্ জন্ বট্‌লারের পুত্র সার্ জেম্‌স্ বট্‌লার্ পিতৃবধের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আক্রমণকারী ইংরাজ-সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দুই শতমাত্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সার্ জিরার্ড অরণ্য ঘিরিয়া রহিলেন। বট্‌লার্ যখন সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ওয়ালেসের দুর্গ সমাপ্ত হয় নাই। ওয়ালেস্ অধিকাংশ সঙ্গীদিগকে দুর্গের সমাপনে নিযুক্ত করিয়া অল্পমাত্র অনুযাত্রিক সঙ্গে লইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। ইংরাজদিগের সঙ্গে এক শত চল্লিশ জন তীরন্দাজ ও অশীতিসংখ্যক বর্শাধারী ছিল। কিন্তু ওয়ালেসের সঙ্গে বিংশতি জন মাত্র তীরন্দাজ ছিল। ওয়ালেসের নিজ হস্তে এক খানি প্রকাণ্ড ধনু ছিল। ইহা তিনি ভিন্ন আর কেহই টানিতে পারিত না। তিনি বৃক্ষশাখানির্ম্মিত কৃত্রিম দুর্গমধ্য হইতে এই ভীম ও প্রকাণ্ড ধনুকে বাণযোজনা করিয়া অসংখ্য ইংরাজকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার তীরন্দাজ-সকল ইংরাজ তীরন্দাজগণ কর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে শাখাভ্যন্তরে অধিকতর গুপ্ত দেহ নিক্ষেপ করিতে বলিলেন, এবং স্বয়ং অশ্রান্ত-

ভাবে ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনিও কণ্ঠদেশে বাণবিদ্ধ হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি গলদেশে লৌহকলার (Collar) পরিধান করিয়াছিলেন, এই জন্য সেই বেধ সাংঘাতিক হয় নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ আততায়ীর উপর পতিত হইল। তিনি অকুতোভয়ে সলীল গতিতে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া পলায়নোন্মুখ অপরাধীকে ধরিয়া খড়্গ দ্বারা তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করিলেন। তিনি স্বয়ং অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন বটে,—তাঁহার অমোঘ শরে পঞ্চদশ ইংরাজ শমন সদনে প্রেরিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার ধনুর্দ্ধরেরা ক্রমে ইংরাজশরে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় চতুর্দ্দিকে ইংরাজ-সেনা আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিবা ফেলিল। হয়, রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিব, নয়—রণে জয়লাভ করিব, ওয়ালেসের এই উদ্দীপনা-বাক্যে সেই ভগ্ন-হৃদয় স্কট্‌সেনা আবার নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। মধ্যাহ্নকাল সমাগত! অসংখ্য ইংরাজসেনাব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে কেবল পঞ্চদশ-মাত্র বীর অবস্থিত আছে, এমন সময় নিহত বট্‌লারের ভাগিনেয় উইলিয়ম্‌ লোরেন্‌ সহসা তিন শত সৈন্য লইয়া বনপ্রান্ত হইতে আবির্ভূত হইয়া স্কট্‌দিগকে আক্রমণ করিল। বট্‌লার্‌-পুত্র সার্‌ জন্‌ আসিয়া লোরেনের সহিত যোগ দিল। এদিকে সার্‌ জিরার্ড হেরন্‌ এরূপ ভাবে বন ঘিরিয়া আছে যে, ওয়ালেস্‌ বন হইতে সহসা পলায়ন করিতেও অক্ষম। তাঁহারা অতি নৈপুণ্যের সহিত এই সমবেত ইংরাজ-সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থা আর নিরাপদ নহে বুঝিয়া, ওয়ালেস্‌ আর একটী দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রায় অধিকাংশ সঙ্গী রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিল। অবশেষে তিনি যুদ্ধস্থলে জীবিতাবস্থায় শত্রুহস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করিয়া অল্প মাত্র সহচর সহ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় তিনি এক লম্ফে বট্‌লারের সম্মুখে আসিয়াই সবেগে তাঁহার উপর এক খড়্গাঘাত করিলেন। খড়্গের বেগ শাখায় প্রতিহত হওয়ায় সে আঘাত সাংঘাতিক হইল না বটে; কিন্তু বট্‌লার্‌ আহত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন ও ভূপতিত হইল। তৎক্ষণাৎ অসংখ্য ইংরাজসৈন্য আসিয়া মূর্চ্ছিত ও আহত সেনাপতিকে স্থানান্তরিত করিল। লোরেন্‌ এই দৃশ্যে মর্ম্মাহত ও ক্রোধোদীপ্ত হইয়া সবলে আসিয়া ওয়ালেস্‌ ও তদীয় রণবীরগণকে ঘিরিয়া ফেলিল। ওয়ালেসের প্রখর দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ লোরেনের উপর পতিত হইল। ওয়ালেস্‌ মুহূর্ত্তমধ্যে তাড়িত বেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক লোরেনের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। লোরেনের

সাহায্যার্থ কেহ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ওয়ালেসের অসি তদীয় দেহকে নির্মুণ্ড করিয়া ফেলিল। ওয়ালেসের বীর সহচরবৃন্দ তৎক্ষণাৎ আসিয়া ওয়ালেস্‌কে শত্রুমধ্য হইতে লইয়া গেল। ওয়ালেসের সেই পঞ্চদশ সহচরের মধ্যে সপ্ত বীর রণে নিহত হইয়াছেন, কিন্তু ইংরাজপক্ষে শতাধিক বিংশতি জন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। ওয়ালেস্ এক্ষণে সেই অষ্টমাত্র সহচর লইয়া বন হইতে বহির্গত হইয়া অদূরবর্ত্তী দুর্গমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ইংরাজদিগের সমস্ত চেষ্টা প্রতিহত করিতে লাগিলেন। এদিকে লোবেনের মৃত্যুতে সমস্ত ইংরাজ সেনা ভগ্নহৃদয় হইয়া উঠিল। হেরন্ অতঃপর একটী সমর-সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় তাহাদিগের সে দিবস সমর হইতে নিবৃত্ত হওয়া স্থির হইল। তাঁহারা সেই বনের নানা স্থান খুঁড়িয়া অপহৃত ধনরাশি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা কিছুতেই সফল হইল না। অবশেষে তাহারা শোকাকুল মনে সেণ্ট জনষ্টন্ নগরে ফিরিয়া আসিলেন। যুদ্ধের পরদিন রজনীযোগে স্কটেরা অদূরবর্ত্তী দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া "সর্টউড্‌সা" বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পৃথ্বীকুক্ষিনিহত রত্নরাশি তুলিয়া "মেথ্‌বেন্"অরণ্যাভিমুখে লইয়া গেলেন। তথায় দুই দিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা সহসা "এল্‌কোপার্ক" অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থানে তাঁহারা কিছু কাল অবস্থিতি করিবেন, স্থির করিলেন।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, সেণ্ট জনষ্টনে এক পরমা সুন্দরী রমণী ওয়ালেসের প্রণয়িনী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ওয়ালেস্ যাজকের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সেণ্ট জনষ্টনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রমণী বহু দিন বিচ্ছেদের পর মহাসমাদরে নায়ককে গ্রহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইলে ওয়ালেস্ তিন দিন পরে আবার তদীয় আবাসেই তাহার সহিত দেখা হইবে বলিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক "এল্‌কোপার্ক" অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ওয়ালেস্ আত্মগোপনে বিশেষ দক্ষ হইলেও—অশ্বগোপন বিষয়ে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেও, তদীয় শত্রুবৃন্দ-মধ্যে এক জন তাহাকে চিনিতে পারিয়া হেরন্ ও কট্‌লারের নিকট এই সংবাদ জানাইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীলোককে তাহাদিগের নিকট আনাইলেন। সে ওয়ালেসের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তাঁহারা বলিলেন, "যদি তুমি প্রকৃত ঠিক্ কথা ব্যক্ত না কর, তাহা হইলে তোমাকে জলন্ত চিতায় আরোহণ করিতে হইবে, আর যদি মুক্তকণ্ঠে প্রকৃত সত্য প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমায় ধন ও উপাধিতে অলঙ্কৃত করা হইবে, এবং তোমার মনোমত এক জন

নাইটের সহিত তোমার বিবাহ দেওয়া হইবে"। ভয়ে ও প্রলোভনে অভিভূত হইয়া সেই রমণী ওয়ালেসের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে স্বীকৃত, হইল। ওয়ালেস্ কোন্ সময় আসিবেন, তাহা সে ঠিক্ করিয়া বলিল। সেই সময়ে সেই রমণীর গৃহের বাহিরে কোন গুপ্ত স্থানে সশস্ত্র পুরুষ সকল আসিয়া লুকাইয়া রহিল। কুহকী ওয়ালেস্‌কে দেখিবার নিমিত্ত তাহাদিগের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

এদিকে ওয়ালেস্ এ ষড়যন্ত্রের বিষয় ঘুণাক্ষরেও কিছু জানিতে না পারিয়া প্রতিশ্রুত সময়ে প্রণয়িনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বাসঘাতিনী বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল। ওয়ালেস্ কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রামের পরই প্রস্থান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। পিশাচী তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি তথায় যাপন করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু ওয়ালেস্ বলিলেন—"সহচরবৃন্দকে একবার না দেখিলে আমার নিদ্রা হইবে না"। পাপীয়সী দেখিল যে, ষড়যন্ত্র বিফল হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়; সুতরাং কাঁদিয়া কাটিয়া ওয়ালেস্‌কে রাত্রি যাপন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিল। যখন ওয়ালেস্ কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। নিজের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, সে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল; ভাবিল—"যে মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমকেও মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, সে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলাম কই? এ জন্মে যাহা হইবার তা ত হইল, এক্ষণে পরকালে আমার গতি কি হইবে?" এই অনুশোচনা তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সে আর থাকিতে পারিল না, ওয়ালেসের অশ্রুজলের সহিত নিজের পাপ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ওয়ালেস তাহার অনুতাপ অকৃত্রিম বুঝিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন; অনন্তর তাহার পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক রমণীবেশে দক্ষিণ তোরণদ্বার দিয়া সবেগে বহির্গত হইলেন। "ওয়ালেস্‌কে গৃহে আবদ্ধ করিয়া আমি চলিয়া আসিতেছি, তোমরা শীঘ্র আমার গৃহে গিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলিত কর" এই কথা বলিয়া ওয়ালেস্ অস্ত্রধারী পুরুষগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া ও তাহাদিগকে অন্য কার্য্যে আবদ্ধ রাখিয়া দ্রুতপদে "এল্‌কোপার্কের" অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার দ্রুতগমনে কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তারা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ওয়ালেস্ ক্রুদ্ধ সিংহের ফিরিয়া তাহাদিগের অগ্রগামী দুই এক জনকে বধ করিলে, অবশিষ্টেরা ভয়ে পলায়ন করিল। তিনি নির্ব্বিঘ্নে অভীপ্সিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ওয়ালেসের অনুসরণ—তৎকর্ত্তৃক ফডনের শিরশ্ছেদ।

কাপেলের হস্তে হেরণের পতন—
গাস্ক দুর্গ—ফডানের প্রেতমূর্ত্তি—ওয়ালেসের
খড্গাঘাতে বটলারের মৃত্যু—
টরউড বিধবা রমণীর গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ—
পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ—
ডন্দাফ ও গিলব্রাণ্ড গমন।

১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের অমাবস্যা নিশিতে ওয়ালেস্ সেণ্ট্ জন্ষ্টন্ হইতে পলাইয়া অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করিলেন। ওয়ালেসের পলায়ন কালে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হয়, সেই অবকাশে ওয়ালেস্ পদ্মিনী অতর্কিত-ভাবে অন্তর্হিত হয়। ওয়ালেস নিজ পলায়নপথে যে সকল মৃতদেহের শ্রেণী রাখিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুরা সেই শ্রেণী ধরিয়া ‘এল্‌কাপাকে” আসিয়া উপস্থিত হইল। শত্রুদিগের সঙ্গে একটা শিকারী কুকুর ছিল। তাহারা ওয়ালেসের গুপ্ত স্থান খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহাকে তথায় ছাড়িয়া দিল। এই কুকুরের সঙ্গে সঙ্গে এক শত অস্ত্রধারী পুরুষ যাইতে লাগিল। এদিকে সেনাপতি বট্‌লার সৈন্য লইয়া ত্রিশত-পার্ক ঘিরিয়া রহিলেন এবং সেনাপতি হেরন্ দুই শত সৈন্য লইয়া চরম কালে তাঁহাদিগের সাহায্য করিবার নিমিত্ত অদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশৎ-মাত্র স্কটিশ রণবীর সেই দশ-গুণিত ইংরাজসেনার কবলসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত—পলাইবার পথ নাই, সুতরাং যুদ্ধ প্রদান করা ভিন্ন তাঁহাদিগের আর গত্যন্তর ছিল না। অতএব তাঁহারা যুদ্ধ প্রদান করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই ক্ষুদ্র বীরসেনা এরূপ প্রচণ্ডবেগে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল, যে প্রথম আক্রমণেই চল্লিশ জন ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। বট্‌লারের সৈন্য ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িল। তাহাদিগের শিথিলতা দেখিয়া ওয়ালেস্ সদলে শ্রেণী ভেদ করিয়া আপনাদিগের দুর্গাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা দ্রুতপদে টে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টে নদীর অপর পারে তাঁহাদিগের দুর্গ। তাঁহারা হাঁটিয়া টে নদী পার হইবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু আসিয়া দেখিলেন—টে অতি গভীর, এবং বিনা সন্তরণে ইহা পার হওয়া অসম্ভব। তাঁহার সহচরবৃন্দের অধিকাংশই সন্তরণ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অগত্যা সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। নদী-জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করা অপেক্ষা, রণক্ষেত্রে শত্রুরুধিরে পিতৃলোকের তর্পণ করিতে করিতে প্রাণ উৎসর্গ করা সর্ব্বথা শ্রেয় মনে করিয়া সেই বীরদল ফিরিয়া পরিত্যক্ত রণভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। বট্‌লার্ এই বীর-

বৃন্দের পুনরাগমনে ভীত না হইয়া ছত্রভঙ্গ সেনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অমিত তেজে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু উৎসর্গীকৃতজীবন, স্বজাতি-প্রেমিকের বেগ ধারণ করে—কাহার সাধ্য? সেই দৈবীশক্তিসম্পন্ন বীরবৃন্দ সমরক্ষেত্রে অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন দৈবীশক্তি তাঁহাদিগকে রণে অজেয় করিয়া দিয়াছেন। দৈবীশক্তিবলেই সেই অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় জাতীয় দল অসংখ্য ইংরাজের মৃতদেহে রণক্ষেত্র শ্মশানক্ষেত্র করিয়া তুলিল। দুই বীরের যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ একশত ইংরাজ ধরাশায়ী হয়। বট্‌লার্ ভগ্নহৃদয় হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী সেনাপতি হেরনের সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন, সেই অবসরে ওয়ালেস্ তদীয় নিহতাবশিষ্ট ষোড়শমাত্র সহচর লইয়া অবাধে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বট্‌লার্ হেরন-সমবেত-সেনা লইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। রণস্থল শূন্য দেখিয়া তাঁহারা ওয়ালেসের অনুসন্ধানার্থ আবার সেই শিকারী কুকুর প্রেরণ করিলেন। অদ্ভুত-শক্তিসম্পন্ন কুকুর ওয়ালেসের পথ চিনিয়া ফেলিল। তিনি গাস্ক অরণ্যের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাকে অগত্যা সে পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিতে হইল। তাঁহার এক জন অনুযাত্রিক "ফড্‌ন" নামক আয়র্লণ্ডবাসী তাঁহার সহিত যাইতে অস্বীকৃত হইল। তাহাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া ওয়ালেস্ তৎক্ষণাৎ শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার মৃতদেহ তথায় ফেলিয়া সদলে অধিত্যকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়ালেসের অজ্ঞাতসারে ষ্টিফিন্ ও কার্লে নামক তদীয় সহচরদ্বয় তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই প্রদেশের কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন।

এদিকে বট্‌লার্ ও হেরন্ হতাবশিষ্ট পঞ্চশত ইংরাজ-সৈন্য লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুকুর ফডনের মৃতদেহ ফেলিয়া এক পাদও অগ্রসর হইল না। সকলেই নিবিষ্টচিত্তে সেই মৃতদেহ নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় কার্লে ও ষ্টিফেন্ অতর্কিত ভাবে আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইল। সে গোলমালে কেহই তাহাদিগকে শত্রুপক্ষীয় বলিয়া চিনিতে পারিল না। হেরন নিপুণ হইয়া সেই মৃতদেহ পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় কার্লে তাঁহার তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশে এক সাংঘাতিক আঘাত প্রদান করিলেন। আঘাত করিয়াই তাঁহারা দুই জনে অদৃশ্য হইলেন। এদিকে সেই আঘাতেই হেরন্ ধরাশায়ী হইলেন। সকলেই স্থির করিল যে, ওয়ালেস্ নিশ্চয় অদূরে অবস্থিত আছেন, তিনি বা তৎসহচরবৃন্দের অন্যতর ভিন্ন এ কার্য্য আর কেহই করে

নাই। হেরনের মৃত্যুতে ইংরাজসৈন্য বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। বট্‌লার্ বিলুপ্তধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি কিছু কাল নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। পরে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া চল্লিশ জন সৈন্যসহ হেরনের মৃতদেহ সমাধিনিহিত করিবার জন্য সেণ্ট জনষ্টনে প্রেরণ করিলেন; এবং অবশিষ্ট সৈন্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া ওয়ালেসের অনুসন্ধানার্থ নানা দিকে প্রেরণ করিলেন। স্বয়ং কতকগুলি সৈন্য লইয়া অদূরবর্ত্তী বন রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ওয়ালেস্ অধিত্যকাপ্রদেশে কিয়দ্দূর উঠিয়া প্রিয় সহচর কার্লে ও ষ্টিফেন্‌কে না দেখিয়া তাঁহাদিগকে শত্রু-পরিগৃহীত মনে করিয়া শোকাকুলচিত্তে নামিলেন—চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা গাস্ক দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গের প্রশস্ত ও বায়ুসঞ্চালিত দালানে তাঁহারা শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী কৃষক ভবন হইতে দুইটী মেষ আনিয়া কাটিয়া রন্ধনপূর্ব্বক তাঁহারা প্রবল ক্ষুধা নিবারণ করিলেন। আহারান্তে তাঁহারা বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় অদূরস্থিত পাহাড় হইতে শৃঙ্গধ্বনি শ্রবণগোচর হইল। এইরূপ শৃঙ্গধ্বনি করিয়া ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণকে একত্রিত করা স্কট্‌লণ্ডবাসীদিগের একটী প্রথা ছিল। এ শৃঙ্গধ্বনি কে করিল, জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলোদ্দীপিত হইয়া ওয়ালেস্ প্রথমে দুই জনকে পাঠাইলেন। কিন্তু সে দুই জন ফিরিল না। আবার সেই শৃঙ্গরব শ্রুত হইল, ওয়ালেস্ আবার দুই জনকে পাঠাইলেন। এ দুই জনও ফিরিল না। সে শৃঙ্গরবও শ্রবণবিদারপূর্ব্বক প্রবাহিত হইতে লাগিল। ওয়ালেস্ অধীর হইয়া এবার অবশিষ্ট নয় জনকেই পাঠাইলেন। কিন্তু কেহই ফিরিল না। তিনি একাকী সেই বিজন প্রদেশে বসিয়া ঘোরতর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। একে ঘোরা রজনী, তাহাতে সেই বিজনপ্রদেশে সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় একাকী আসীন; তাহার উপর বন্ধুগণের অদর্শনজনিত যাতনা—এই অবস্থায় ওয়ালেসের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার কল্পনা উন্মাদিনী হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার শত্রুরা ঐ শৃঙ্গরব করিতেছে। তিনি অসি নিষ্কোশিত করিয়া শব্দের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দুর্গের দালান পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, এমন সময় তাঁহার বোধ হইল, দালানের দ্বারে "ফডন্" তদীয় মস্তক করে ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সেই মুণ্ড তদীয় চরণাভিমুখে প্রক্ষেপ করিল; কুড়াইয়া লইয়া যেন আবার প্রক্ষেপ করিল। তাঁহার রুধির ভয়ে ঘনীভূত হইল। তিনি নিশ্চয়ই স্থির করিলেন—ইহা "ফডনের" প্রেতযোনি—মানবী

মূর্ত্তি নহে। ভয়ে আকুল হইয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দ্বারে "ফডনের" প্রেতমূর্ত্তি দণ্ডায়মান, সুতরাং তিনি সে দিক্ দিয়া প্রস্থান করিতে সাহস না করিয়া একটী রুদ্ধ জানালার কপাট পদাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তথা হইতে এক লম্ফে দশ হস্ত নিম্নে পতিত হইয়া তাড়িত বেগে তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

অদূরবর্ত্তিনী নদী পার হইয়া ওয়ালেস্ আপনাকে নিরাপদ মনে করিলেন। তখন তিনি সেই দুর্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন দুর্গ জ্বলিতেছে; তিনি "ফডনের" প্রেতমূর্ত্তিকেই ইহার কারণ স্থির করিলেন। ফডনের প্রেতাত্মাই তাঁহার সঙ্গীদিগকে লইয়া গিয়া মারিয়াছে, তাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়-বদ্ধ হইল। তৎকালে এরূপ ভৌতিক ভয় ও ভৌতিক বিশ্বাস প্রায় অনেকেরই ছিল। ওয়ালেস্ এই ভৌতিক উৎপাতে ভীত ও বিষণ্ণ হইলেন। তিনি নদীতীরে বেড়াইয়া বেড়াইয়া অতি কাতর ভাবে ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন; উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সহসা উষাদেবী পূর্ব্বাকাশে হাসিয়া উঠিলেন। রজনীর তিমির-রাশি সূর্য্যভয়ে পলায়ন করিয়া পর্ব্বত গুহায় লুক্কায়িত হইল, এমন সময় বট্লার্ দূর হইতে ওয়ালেস্কে দেখিতে পাইলেন। তিনি স্কট্দিগের গতি-রোধ করিবার মানসে সেই নদীতীরে অশ্বপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছিলেন, ওয়ালেস্কে দেখিয়াই সবেগে তদভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন; এবং তথায় আসিয়া ওয়ালেস্কে তাঁহার নাম-ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ওয়ালেস্ আত্মগোপন করিয়া বলিলেন, তিনি সার্ জন্ ষ্টুয়ার্টের নিকট কোন সংবাদ লইয়া যাইতেছেন। বট্লার্ বলিলেন, "তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তুমি নিশ্চয়ই ওয়ালেসের অনুচর" এই বলিয়াই তিনি অসি নিষ্কোশিত করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। ওয়ালেসের শাণিত তরবারি নিমেষমধ্যে উত্তোলিত হইয়া বট্লারকে ছিন্নপদ করিয়া ফেলিল। পদহীন ইংরাজ সেনাপতি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন। ওয়ালেস্ তদীয় অশ্বের গলাধারণ পূর্ব্বক এক খড়্গাঘাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বট্লারকে ছিন্নমুণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এক জন ইংরাজ-সৈনিক দূর হইতে সবেগে তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ওয়ালেস্ তাহার বর্শা কাড়িয়া লইয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক বট্লারের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তাড়িতবেগে ডাল্-রিয়ক-অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। অসংখ্য ইংরাজ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যাহারা অতি নিকটে আসিতে লাগিল, তাহারা ওয়ালেস্ কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ নিহত হইতে লাগিল। এইরূপে

অসংখ্য ইংরাজ-রক্তে জন্মভূমি প্রক্ষালিত করিতে করিতে ওয়ালেস্ নক্ষত্র-বেগে ছুটিতে লাগিলেন। বট্‌লারের অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বও এই তাড়িত গমনে ক্রমে রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িল। ওয়ালেস্ অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করিলেন। অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আসিয়া আর একটী অশ্ব পাইলেন। সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া যেমন ইহাকে চালিত করিলেন, অমনি অসংখ্য ইংরাজ-সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। তিনি প্রচণ্ড বেগে অশ্ব চালিত করিলেন, তথাপি কেহ২ তাঁহার অতি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ শাণিত তরবারির কবলস্থ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিংশতি-জন ইংরাজ নিহত হইল। অবশেষে ওয়ালেস্ এক জলার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অশ্ব পড়িয়া গেল, আর উঠিতে পারিল না। তাহাকে অগত্যা আবার পদব্রজে যাইতে হইল। তিনি অতি প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইয়া শত্রুদিগের দৃষ্টিপথাতীত হইলেন; অবশেষে তিনি ফোর্থের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কাম্বক্স নগরের নিকট ইহা উত্তরণ পূর্ব্বক শত্রুদিগের হস্ত হইতে আপাতত রক্ষা পাইলেন।

এইরূপে অনুসরণকারীদিগের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া ওয়ালেস্ ডরউড্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পর দিন অরুণোদয় না হইতে তিনি তথায় এক পূর্ব্বপরিচিত বিধবা রমণীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অবসন্ন শরীর যে বিশ্রামের জন্য একান্ত লালায়িত হইয়াছিল, এখানে আসিয়া তিনি সেই বিশ্রাম লাভ করিলেন। বিধবা রমণী স্বয়ং ওয়ালেসের জন্য পাকাদি ক্রিয়ায় নিযুক্ত হইলেন। তদীয় কুটীর ওয়ালেসের পক্ষে নিরাপদ নহে বলিয়া তিনি অদূরবর্ত্তী বনমধ্যে বৃক্ষতলে তাঁহার জন্য একটী শয্যা পাতিয়া দিলেন। রমণীর দুই পুত্র তাঁহার শুশ্রূষায় নিরত রহিল। এদিকে তিনি ওয়ালেসের সঙ্গিগণের সংবাদ লইবার জন্য এক জন স্ত্রীলোককে গাস্ক দুর্গাভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং ওয়ালেসের আগমন-বার্ত্তা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার আর একটী পুত্রকে ডনিপেসে তদীয় পিতৃব্যের নিকট প্রেরণ করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়াই তদীয় পিতৃব্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেসের সহিত তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। তিনি ওয়ালেসের উদ্যমকে উন্মাদ-বিজৃম্ভিত বলিয়া উপহাস করিলেন এবং বলিলেন—"তুমি একাকী এড্‌ওয়ার্ডের সেনাসাগরে ঝাঁপ দিয়া কেবল আপনিই ডুবিবে, নিমগ্ন স্বদেশকে কখন তুলিতে পারিবে না। অতএব আমার অনুরোধ——তুমি এ অসাধ্য সাধনের সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক এড্‌ওয়ার্ডের অধীনে একটী লর্ডশিপ্ গ্রহণ

করিয়া সুখে ও সম্পদে কাল যাপন কর। এড্ওয়ার্ড যে ইহাতে সম্মত হইবেন, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।" এই বাক্য ওয়ালেসের কর্ণে অতি কর্কশ লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"তিনি হয় স্কট্লণ্ডে শান্তি পুনঃ স্থাপিত করিবেন, নয় সেই সাধনায় জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, স্কট্লণ্ড পরাধীন থাকিতে তিনি কোন সুখের প্রার্থী নহেন।" ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য তোমার স্বজাতিপ্রেম! তোমার ন্যায় রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর চরণরেণু যে দেশে পড়ে, সে দেশের চিরদাসত্বও বিদূরিত হয়!

ওয়ালেসের দৃষ্টান্তের মোহিনী শক্তিতে পিতৃব্যের মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি অন্তরের সহিত ওয়ালেসের উদার সঙ্কল্পের অনুমোদন করিলেন। তাঁহাদিগের কথোপকথন, কার্লে ও ষ্টিফেনের সহসা আবির্ভাবে স্থগিত হইল। দলপতি ওয়ালেস্কে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে তথায় অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদিগের আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না। তাঁহারা কি উদ্দেশে ওয়ালেসের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পথিমধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, এবং তাহার পর কি কি কার্য্য করিয়াছেন, ওয়ালেসের নিকট সে সমস্ত পরিচয় দিলেন। ওয়ালেস্ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগের মুখেই শ্রবণ করিলেন যে, ইংরাজ সেনাপতি সার্ জিরার্ড তাঁহাদিগের শাণিত খড়্গাগ্রের তীক্ষ্ণ বেধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যখন তাঁহারা সকলে এইরূপে মনের আনন্দে সেই রমণীর আবাসে বাস করিতেছেন, এমন সময় যে স্ত্রীলোকটী গাস্ক দুর্গে প্রেরিত হইয়াছিল, সে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিতে লাগিল "দেখিয়া আসিলাম, গাস্ক দুর্গে যাইবার পথ মৃত ইংরাজসৈনিকগণের মৃতদেহে সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, (পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে, ওয়ালেস্ তদীয় অনুসরণকারিবর্গকে নিহত করিয়া তাহাদিগের মৃতদেহে গাস্ক দুর্গাগমন-পথ প্রেতভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন) দেখিলাম—উক্ত দুর্গের ও ইহার দালান সম্পূর্ণরূপে অক্ষত রহিয়াছে, তাহার একটী প্রস্তরও উত্তোলিত হয় নাই; কিন্তু শৃঙ্গরবে যে সকল লোক দূরসমাকৃষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কোন সংবাদ পাইলাম না।" এই সংবাদে ওয়ালেসের অন্তরে ফডনের প্রেতমূর্ত্তিবিষয়ক বিশ্বাস অধিকতর বদ্ধমূল হইল।

ওয়ালেস্ সেই অরণ্যে আর অধিক দিন থাকিতে অসম্মত হওয়ায়, রমণী ঔদার্য্যগুণে তাহাকে যথেষ্ট রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রদ্বয়কে তাহার সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। আর তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট ঘোটক ও বীরোচিত পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। সেই রজনীতেই ওয়ালেস্ কার্লে ও ষ্টিফেন্ এবং বিধবা রমণীর পুত্রদ্বয়-সমভিব্যাহারে "ডনৃভাফ" অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সার্ জন্ গ্রেহাম্ নামক এক বৃদ্ধ নাইট্—যিনি লার্গস্ যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই স্থানের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি বৃদ্ধকাল শান্তিতে অতিবাহিত করিবার মানসে অগত্যা এড্ওয়ার্ডের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু এড্ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ওয়ালেস্কে পাইয়া তিনি পরম প্রীত হইলেন। ওয়ালেস্ নিরাপদে ও রাজসমাদরে তদীয় দুর্গে তিন দিন অবস্থিতি করিলেন। পিতৃনামে অভিহিত তাঁহার এক পুত্র ছিল। ইনি যৌবনকালেই প্রান্ত সমরে স্কট্রাজ আলেক্জাণ্ডারের বিশেষ সাহায্য করাতে তিনি তাঁহাকে "বার্উইকের নাইট্" উপাধি প্রদান করেন। এই বীর যুবা পুরুষের সহিত ওয়ালেসের বিশেষ মৈত্রী জন্মিল। তাঁহাদিগের এই মৈত্রী মৃত্যুতেও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। গ্রেহাম্ যত দিন জীবিত ছিলেন, কখন ওয়ালেস্কে পরিত্যাগ করেন নাই। অরণ্যে, দুর্গে, পথে, রণস্থলে——যেখানে ওয়ালেস্ সেই খানেই গ্রেহাম্ ছায়ার ন্যায় ওয়ালেসের পশ্চাদ্বর্ত্তী। ওয়ালেসের কষ্ট-যন্ত্রণাময় জীবনে গ্রেহাম্ তাঁহার প্রধান শান্তিস্থল ছিলেন।

ওয়ালেস্ প্রস্থানোদ্যত হইলে গ্রেহাম্ তাঁহার অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ওয়ালেস্ নিষেধ করিলেন, বলিলেন—এরূপ বিপদসঙ্কুল বৈপ্লবিক জীবনে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সবিশেষ সতর্কতা শিক্ষা করিতে হইবে; সেই শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইবেন; ইতিমধ্যে তিনি তাঁহাকে সাধ্যানুসারে সৈন্যসংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। গ্রেহাম্ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং বলিলেন, তিনি সংবাদ পাইবামাত্র সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

ওয়ালেস্ তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া সহচর-চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে "বথওয়েল্ মুর্"—অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় ক্রকোর্ড নামক তদীয় জননীর স্বসম্পর্কীয় এক ব্যক্তির গৃহে গুপ্তভাবে সে দিবস তাঁহারা অতিবাহিত করিয়া, পর দিন প্রাতে উঠিয়া "গিলব্যাঙ্ক"—অভিমুখে গমন করিলেন। এই স্থানে তৎকালে তদীয় অন্যতর পিতৃব্য অচিণ্‌লেক্ অবস্থিতি করিতেছিলেন। ওয়ালেস্ ও তদীয় অনুযাত্রিকবর্গ তদীয় আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে আয়ারে পার্সীর নিকট ওয়ালেসের এই সকল অতিমানুষ অবদানপরম্পরার সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরাজ-সৈন্যদলে হুলস্থূল উপস্থিত হইল। সকলেরই বদনমণ্ডলে গভীর চিন্তারেখা দেখা দিল। কেহ কেহ এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, যখন ওয়ালেস্কে

ষ্টার্লিঙ্‌ সেতু পার হইতে দেখা যায় নাই, তখন অনুমান হয়, তিনি ফোর্থে জলমগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু পার্সীর অন্তরে সে অনুমান স্থান পাইল না। পার্সী ভাবিলেন যে, ওয়ালেস্ যেরূপ অলৌকিক-বলশালী ও যেরূপ সাবধান, তাহাতে তাঁহার জলমগ্ন হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাঁহার মন ভবিষ্যৎ ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে সার্‌জন্ ষ্টুয়ার্ট সেণ্ট জন্‌ষ্টনের সেরিফের পদে অভিষিক্ত হইলেন।

এদিকে ওয়ালেস্ গিল্‌ব্যাঙ্কে পৌছিয়াই করস্‌বীতে পিতৃব্য সার্ রেনাল্ডের নিকট, বিকার্টনে ভ্রাতা এডাম্ ওয়ালেসের নিকট, এবং বন্ধুদ্বয় বয়েড্ ও ক্রেয়ারের নিকট আপনার বৃত্তান্ত জানাইবার নিমিত্ত কার্লেকে প্রেরণ করিলেন। ওয়ালেসের কৃতকার্য্যতার সংবাদ পাইয়া তাঁহারা আনন্দে অভিভূত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্যার্থে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিলেন।

এইরূপে ওয়ালেস্ নির্ব্বিঘ্নে খ্রীষ্ট-মহোৎসব-কাল গিল্‌ব্যাঙ্কে কাটাইলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে জলমগ্ন, হত, বা নষ্ট মনে করিয়া তাঁহার বিষয় আর কোন সন্ধান লইল না। এ দিকে সার্ রেনাল্ডের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয়, তাহার অবসান হইতে আর চারি মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।

গিল্‌ব্যাঙ্কে অবস্থিতি-কালে তিনি কৌতূহলোদ্দীপ্ত হইয়া প্রায়ই মধ্যে মধ্যে "ল্যানার্ক" সায়ারাভিমুখে যাত্রা করিতেন। তাঁহার শাণিত তরবারি ইংরাজ-রক্তে প্রায়ই বিরঞ্জিত হইত। পথি-মধ্যে বিশ্লিষ্ট ইংরাজ-সৈন্য দেখিলেই তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন। তাঁহার করাল অসি হইতে কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারিত না; অধিক কি, সংবাদ দিবার জন্যও কেহ গৃহে ফিরিয়া যাইত না। হেসিল্‌রীগ্ ল্যানার্ক সায়ারের সেরিফ ছিলেন। হেসিল্‌রীগের প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর ও যথেচ্ছাচারী ছিল। এবং চতুর্দ্দিকের প্রজাবর্গ তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। কে এইরূপে তাঁহার সৈন্যক্ষয় করিতে লাগিল, তিনি ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি আপনার সৈন্যদিগকে কোন স্থানে যাইতে হইলে আত্মরক্ষার্থ অনেকে একত্র হইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ওয়ালেস্ শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা যখন অত্যন্ত অধিক দেখিতেন, তখন কোন প্রকার বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহার চারি জন সহচর ছায়ার ন্যায় সতত তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেন।

সপ্তম অধ্যায়।

ওয়ালেস্ প্রণয়ী। লক্‌মেবেন্ ও ক্রফোর্ড দুর্গ-অধিকার।

বীরের হৃদয়ও প্রেমের অস্পৃশ্য নহে। প্রণয় যে হৃদয়ে কখন রাজত্ব করে নাই, এমন হৃদয় দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাজার অট্টালিকা, দরিদ্রের কুটীর—প্রণয় সর্ব্বত্রই বিরাজমান। অনুরাগ, সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া থাকে। ওয়ালেস্ রাজনৈতিক সন্ন্যাসী হইয়াও ইহার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। পরমযোগী দিগম্বরও ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। যাঁহার হৃদয় স্বদেশের দুরবস্থায় শোকমগ্ন, স্বদেশের উদ্ধার সাধন না করিয়া যিনি কোন প্রকার পার্থিব সুখ ভোগ করিব না বলিয়া গৃহীতব্রত হইয়া ছিলেন, আজ তিনি প্রেমের বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি জাতীয় ব্রতের সহিত বিসম্বাদী বলিয়া হৃদয়কে এ বেগ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু হৃদয় সে অনুরোধে কর্ণপাত করিল না। ল্যানার্ক সায়ারের কোন অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী হৃদয়-লোভনীয়া সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভবা কোমল-প্রকৃতি মহিলা তাঁহার এই আকস্মিক চিত্ত-বিকারের মূল।

ল্যানার্ক সায়ারে ল্যামিঙ্টন্ নামে একটী নগর আছে। তথায় হিউগ্ ব্রড্ফুট্ নামে এক জন সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই রমণী তাঁহারই দুহিতা; বালিকাবয়সেই পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-বিয়োগে ইনি অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। হেসিল্রীগের হস্তেই ইহাঁর একমাত্র ভ্রাতার মৃত্যু হয়। অসহায়া বালিকাকে আশ্রয় দান করার নিষ্ক্রয়-স্বরূপ হেসিল্রীগ্ এই রমণীর নিকট হইতে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন। এরূপ জনরব যে, হেসিল্রীগ্ সেই বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণীর সহিত নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। রমণী উপায়ান্তর না দেখিয়া ওয়ালেসের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি নিজ দাসী দ্বারা ওয়ালেস্কে বলিয়া পাঠাইলেন। দাসী ওয়ালেস্কে সঙ্গে করিয়া গুপ্তভাবে উদ্যান-মধ্যস্থ খিড়কি-দ্বার দিয়া রমণীর গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহার সমুচিত আতিথ্য সৎকারের নিমিত্ত বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইল। যুবক যুবতী প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। তাঁহারা বিভোর হইয়া বিবিধ প্রেমালাপে নিমগ্ন হইলেন। যুবতী বলিলেন "আমি আজ হইতে আপনার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলাম; জলে স্থলে, বনে জঙ্গলে, রণক্ষেত্রে বা শান্তিনিকেতনে আপনি যখন যেখানে থাকিবেন, দাসী ছায়ার ন্যায় আপনার অনুগামিনী হইবে; প্রতিজ্ঞা করিলাম, আপনি ভিন্ন আর কোন পুরুষের পত্নী হইব না; এক্ষণে প্রার্থনা—আপনি দাসীকে গ্রহণ করুন্"। ওয়ালেসের হৃদয় রমণীর প্রেমে বিগলিত হইল বটে, কিন্তু তিনি আপাততঃ বিবাহে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যত দিন স্কট্লণ্ড শত্রু হস্তে রহিবে, তত দিন বিবাহে আমার অধিকার নাই;

যে দিন স্বদেশকে শক্রকণ্টকোদ্ধৃত করিতে পারিব, সেই দিন তোমার পাণি-গ্রহণ করিব; আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তুমি ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোককেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না।" এইরূপে পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহারা এক প্রকার নৈতিক দম্পতীরূপে পরিণত হইলেন। এই দিন হইতেই তাঁহারা পরস্পরের প্রতি পতি পত্নীর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। নৈতিক বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা পরম সুখে আহার করিলেন।

ওয়ালেস্ পর দিন অতি প্রত্যূষেই সহচরচতুষ্টয়-সমভিব্যাহারে গিল্‌ব্যাঙ্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ষীডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কর্ষীডে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র টম্ হ্যালিডে ও ভ্রাতা এড্‌ওয়ার্ড লীটল্ বাস করিতেন। তাঁহারা ওয়ালেস্‌কে রণে নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিলেন। ওয়ালেস্ মনের উল্লাসে তথায় তিন দিন অবস্থিতি করিলেন। চতুর্থ দিবসে তাঁহারা কয় জনে লক্‌মেবেন্-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা এক্ষণে সর্ব্বসমেত ষোল জন অশ্বারোহী হইয়াছেন। নগরের অদূরবর্ত্তী নক্‌উড্ নামক অরণ্য-মধ্যে সকলকে রাখিয়া ওয়ালেস্—লীটল্, কার্লে ও হেলিডেকে লইয়া নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা কোন পান্থাবাসে আহার প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া ও তথায় অশ্ব রাখিয়া সমীপবর্ত্তী ভজনালয়ে গিয়া উপাসনা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অনুপস্থিতি-কালে উদ্ধত ক্লিফোর্ড চারিজন অনুযাত্রিক সহ সেই পান্থাবাসে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পান্থাবাসের দ্বারে এ সকল কাহার অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে?" পান্থাবাস-স্বামিনী অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—"মহাশয়! পশ্চিমাঞ্চল হইতে চারি জন ভদ্র লোক আসিয়া আজ আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, এ অশ্ব চারিটী তাঁহাদিগেরই।" গর্ব্বিত ক্লিফোর্ড উত্তর করিল—"সে ভূতেরা এমন সুন্দর ঘোটক লইয়া কি করিবে?" এই বলিয়া অশ্ব চতুষ্টয়ের লাঙ্গুল কর্ত্তন করিয়া দিল। আশ্রমস্বামিনী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সেই আর্ত্তনাদে ওয়ালেস্ ও তৎসহচর-বৃন্দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে ক্লিফোর্ড লাঙ্গুল কর্ত্তন করিয়াই প্রস্থান করিয়াছে। ওয়ালেস্ প্রকৃত ঘটনা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ভয়ানক ক্রোধের অবস্থাতেও এই হাস্যকর ঘটনায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ওয়ালেস্—সহচরগণ সহ তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে পরিহাসচ্ছলে বলিতে লাগিলেন—"বন্ধুবর! তুমি যে উৎকৃষ্ট ক্ষৌরকার, তোমার কার্য্যেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে; আমিও এক জন ক্ষৌরকার

পশ্চিম দেশ হইতে উৎকৃষ্ট আজীবের আশায় এখানে আসিয়াছি। সেই শিক্ষা-কৌশল তোমায় দেখাইব, নিতান্ত ইচ্ছা"। এই বলিতে বলিতে ওয়ালেস্ ক্লিফোর্ডের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি তাঁহার ভীম অসি ক্লিফোর্ডের মস্তকে পড়িয়া তদীয় দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিল; দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সেই অসি আর এক জনের মস্তকে পড়িয়া তাহাকেও গতাসু করিল। এদিকে ওয়ালেসের সহচরেরাও অবশিষ্ট তিন জনকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন।

তাঁহারা ক্লিফোর্ডের ঘোটক লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন, এবং আহার পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া আশ্রম-স্বামিনীকে আহারের মূল্য প্রদান পূর্ব্বক আপনাদিগের ছিন্নলাঙ্গুল অশ্ব-চতুষ্টয় ও ক্লিফোর্ডের অশ্ববরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ক্লিফোর্ডের বধ-সংবাদ নগরে প্রচারিত হইবামাত্র ইংরাজ-দুর্গ হইতে সপ্তগুণিত বিংশতি অশ্বারোহী সৈন্য ওয়ালেস্ ও তদীয় সহচর চতুষ্টয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল।

ওয়ালেস্ নগর হইতে বহির্গত হইয়া আপনার দলের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত বেগে নকৃউড্ অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই বন অতি ক্ষুদ্র; সুতরাং অনুসরণকারী শত্রুসেনা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম বলিয়া তাঁহারা সে বন পরিত্যাগ করিয়া গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই উদ্দেশে তাঁহারা অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলেন, এমন সময় দূর হইতে ইংরাজ-অশ্বের খুরধ্বনি শ্রুত হইল; অক্লান্ত বলবান্ অশ্বের উপর ইংরাজ অশ্বারোহিগণ আসীন; তাঁহাদিগের শাণিত তরবারির উপর সূর্য্য কিরণমালা প্রতিফলিত হইয়া নয়ন ঝল্‌সিয়া দিতেছে। ওয়ালেস্ সকলকেই অশ্বারোহণ করিতে ও "ইষ্টার্ মুর্"-অভিমুখে ধাবিত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ভয় হইল, পাছে তাঁহাদিগের ক্ষত অশ্ব অশক্ত হইয়া পড়ে। ইংরাজ সৈন্য যেমন স্কট্‌দিগের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, অমনি ইংরাজ অশ্বারোহীর ধনুক হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া দুই জন স্কট্‌কে আহত করিল। ওয়ালেস্ সহচরদ্বয়ের গাত্রে রক্তপাত হইতে দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় একাকী ইংরাজদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। নিমেষ-মধ্যে তাঁহার প্রচণ্ড অসি পঞ্চদশ ইংরাজ অশ্বারোহীকে ধরাবিলুণ্ঠিত করিল। অবশিষ্ট ইংরাজ-সৈন্য এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দ্রুতপদে দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিল। স্কটেরা সেই পলায়মান ইংরাজ-সেনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। পথিমধ্যে ক্যালিডে

দেখিতে পাইলেন—দুই শত ইংরাজ-সেনা অদূরবর্ত্তী বনে লুক্কায়িত রহিয়াছে; দেখিয়াই পিতৃব্যকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিলেন।

স্কটেরা কর্ষীড্-অভিমুখে পলাইতে উদ্যত বুঝিয়া সেই প্রচ্ছন্ন ইংরাজ-সেনা বন হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপদে তাঁহাদিগের অনুসরণ আরম্ভ করিল। সার্ হিউ নামক এক জন সুদক্ষ ইংরাজ-সেনাপতি এই অনুসরণকারী ইংরাজ-সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তিনি লৌহবর্ম্মে আবৃত হইয়া রমণীয় অশ্বে আসীন ছিলেন। ওয়ালেস্ এক ওক বৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া সার্ হিউয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সার্ হিউ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার করাল অসি তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ডবেগে পতিত হইল। অসি, মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করিয়া গ্রীবাদেশে আসিয়া প্রতিহত হইল। ওয়ালেস্ তৎক্ষণাৎ হিউয়ের অশ্বে আরোহণ করিলেন। অধিনায়কের পতনে ইংরাজ-সেনা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ওয়ালেস্‌কে আসিয়া ঘিরিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহচরবৃন্দ তাঁহার রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। হ্যালিডে পদভরে অমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ওয়ালেস্ অশ্বপৃষ্ঠে ও বর্শা হস্তে সিংহ-পরাক্রমে শত্রু উন্মথন করিতে লাগিলেন। তিনি যেন চতুর্দ্দিকে মৃত্যু বিকীরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইংরাজেরা হতবল ও হতাশ্বাস হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের সেনাপতি ভিন্নও আর বিংশতি জন সৈন্য নিহত হয়, এবং অনেকেই আহত হয়। কিন্তু একটী স্কট্‌ও হত হয় নাই, কেবল পঞ্চ জন মাত্র ক্ষত হইয়াছিল।

গ্রে-ষ্টক্ নামে এক ইংরাজ-সৈনিক বীর-পুরুষ সার্ হিউয়ের নিম্ন পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় স্কট্‌সেনার সম্মুখে পলায়মান ইংরাজ-সেনাকে তিরস্কার করিয়া তিন শত সৈন্য লইয়া স্কট্‌দিগকে আক্রমণ করিলেন। ওয়ালেস্ ও তৎ-সহচরবৃন্দ এক্ষণে সকলেই অশ্বারূঢ়; ওয়ালেস্ পার্ষ্ণিরক্ষায় নিযুক্ত। এই অবস্থায় তাঁহারা ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমে শত্রুদিগকে এক সঙ্কীর্ণ গিরিপথে আনিয়া ফেলিলেন। ওয়ালেস্ এই অল্প সেনা লইয়া সেই মহতী ইংরাজ-সেনার সহিত সমতল-ক্ষেত্রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস করেন নাই, এই জন্য তিনি কৌশলে তাহাদিগকে এক সঙ্কীর্ণ স্থানে আনিয়া ফেলিলেন। তিনি জানিতেন, এই সঙ্কীর্ণ স্থলে সংখ্যা-বাহুল্যে কোন ফল দর্শিবে না। ইংরাজেরা আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। ওয়ালেস্ এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিতে সাহস করিলেন না।

এই অবস্থায় উভয় সৈন্য রহিয়াছে—এমন সময় ওয়ালেসের প্রিয়বন্ধু গ্রেহাম্ ও কার্কপ্যাট্রিক ওয়ালেসের অনুসন্ধানে সসৈন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রেহামের সহিত ত্রিশ জন ও কার্কপ্যাট্রিকের সহিত পঞ্চাশ জন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ছিল। দূর হইতে সেই বন্ধু-সেনা দেখিতে পাইয়া ওয়ালেস্ আক্রমণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদিগের যে সঙ্কল্প সেই কার্য্য। প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় তাঁহারা আসিয়া সেই ইংরাজ-সেনার উপর পড়িলেন। দৈবীশক্তি-সম্পন্ন স্বজাতি-প্রেমিক বীরদলের বেগ ধারণ করে, কাহার সাধ্য? নিমেষ-মধ্যে অসংখ্য ইংরাজ-দেহে রণস্থল সমাচ্ছাদিত হইল। এ তাড়িত-তেজ ইংরাজদিগের পক্ষে দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল। ইংরাজেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সেনাপতি গ্রে-ষ্টক্ শত জন মাত্র সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করিল। কিন্তু সেই পলায়মান ইংরাজ-সেনাপতির সম্মুখে গ্রেহাম্ ও কস্প্যাট্রিক সবলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে ওয়ালেস্ বিদ্যুদ্দণ্ডের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে ইংরাজ-সেনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। ওয়ালেস্ দূর হইতে গ্রেহাম্‌কে দেখিতে পাইয়া গ্রেষ্টক্‌কে আক্রমণ করিতে তাঁহাকে তীব্র স্বরে আদেশ করিলেন। নিমেষ-মধ্যে গ্রেহাম্ ইংরাজ-সেনাপতির সম্মুখীন হইয়া প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে ইংরাজ-সেনা ভয়ে বিশৃঙ্খলভাবে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। অনেকেই সেই অনুসরণকারী স্কট্‌সেনার নিশিত অস্ত্রে ধরাশায়ী হইল। সংবাদ দিবার নিমিত্ত অতি অল্পমাত্রই জীবিত রহিল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়া ইংরাজ-শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইল।

যুদ্ধের অবসান হইলে বিজয়ী স্কট্-সেনানায়কগণ পরস্পর মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের আজ আনন্দের সীমা নাই। অনেক দিনের পর মিলন, তাহাতে আবার এরূপ অভাবনীয় বিজয়লাভ! সোণার উপর সোহাগা। যুদ্ধের সময় তীব্রস্বরে আদেশ করায় ওয়ালেস্ স্বাভাবিক ঔদার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রেহামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এদিকে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন; এবং নিশা সতী ধীরে ধীরে গগনপ্রান্তে আসিয়া দেখা দিলেন। অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য, তাঁহাদিগের এই বিষয়ের পরামর্শ হইতে লাগিল। ওয়ালেস্ সেই রজনীতেই লক্‌মেবেন্ দুর্গ আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; বলিলেন—যুদ্ধে যেরূপ সেনা হত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, দুর্গ-রক্ষার নিমিত্ত অতি অল্প লোকই অবশিষ্ট আছে। সকলেই, তাঁহার এই সঙ্কল্পের

অনুমোদন করিলেন, এবং অবিলম্বেই সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। সেই তামসী রজনীতে সেই বীর-দল লক্‌মেবেন্‌-দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। টম্ হ্যালিডে সেই প্রদেশ সবিশেষ অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনিই তাঁহাদিগের পথ-দর্শক হইলেন। হ্যালিডের সহচরবর্গের অন্যতম জন্ ওয়াট্‌সন্ নামক এক ব্যক্তি কিছু কাল এই দুর্গে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার সহিত দুর্গ-বাসী সকলের পরিচয় ছিল। সে অগ্রে একাকী দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে দুর্গদ্বাররক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, "ওয়াট্‌সন্! কি সংবাদ?" ওয়াট্‌সন্ উত্তর করিল—"সেনাপতি স্বয়ং আসিতেছেন, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দিউন্"। না বুঝিয়া সে অনুরোধানুসারে দ্বার খুলিয়া দিল। হ্যালিডে প্রচ্ছন্ন ভাবে পশ্চাতেই ছিলেন। রক্ষক যেমন দ্বার খুলিল, অমনি হ্যালিডের শাণিত তরবারি তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। দ্বাররক্ষকের হস্তে যে চাবির তোড়া ছিল, ওয়াট্‌সন্ সেই চাবির তোড়া হস্তে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, এবং হ্যালিডে ও অন্যান্য সকলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাদিগকে বাধা দিল না। তাঁহাদিগকে বাধা দেয়, দুর্গ-মধ্যে এমন কেহই ছিল না। দুই জন ভৃত্য ও কয়েক জনমাত্র স্ত্রীলোক দুর্গে অবস্থিত ছিল। সুতরাং তাঁহারা অবাধে সর্ব্বত্র বেড়াইতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন তাঁহারাই দুর্গের প্রকৃত অধীশ্বর। দুর্গ-পর্য্যবেক্ষণের পর সকলে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া যুদ্ধে নির্গত ইংরাজগণের জন্য যে সকল আহারীয় ও পানীয়ের আয়োজন ছিল, তদ্দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতে লাগিলেন; কেবল ওয়াট্‌সন্ দুর্গ-দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। এই সময় রণস্থল হইতে পলায়িত হতাবশিষ্ট ইংরাজ-সেনা আসিয়া দুর্গদ্বারে দণ্ডায়মান হইল। দুর্গ যে শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে, তাহারা বিন্দুমাত্রও জানিতে পারে নাই। সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ যাচ্ঞা করিল। ওয়াট্‌সন্ অবাধে তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে যাইতে দিল। তাহারা যেমন প্রবেশ করিল, অমনি বিজয়ী স্কট্‌সেনা তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিল। একজনমাত্র যোদ্ধাও অবশিষ্ট রহিল না।

পর দিন প্রাতঃকালে স্কটিশ অধিনায়কগণ ওয়াট্‌সনের হস্তে দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া এবং ইংরাজ-মহিলাগণকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি দিয়া, কর্হীডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে দিবস তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিয়া পর দিন স্নানাহারের পর অশ্বারোহণে ক্রফোর্ডমুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা বিভক্ত হইলেন। টম্

হ্যালিডে কর্হল্ দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গত যুদ্ধে তিনি যে লিপ্ত ছিলেন, ইংরাজেরা তাহা বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিলেন না। তিনি নিরাপদে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কার্কপ্যাট্রিক্ এস্কডেল্ অরণ্য-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখানে ইংরাজগণ হইতে তাঁহার কোন ভয়ের আশঙ্কা ছিল না।

ওয়ালেস্ ও গ্রেহাম্ চল্লিশ জনমাত্র অনুযাত্রিক সহ ক্রফোর্ড দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়ালেস্ সেই রজনীতেই উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। এই সময় মার্টিণ্ডেল্ নামে এক জন কম্বরলণ্ডবাসী ইংরাজ দুর্গাধিপতি ছিলেন। ওয়ালেস্ অদূরে ক্লাইড্ নদীর তীরে সমস্ত সৈন্য রাখিয়া এডওয়ার্ড লীটল্নামক এক-জন-মাত্র সঙ্গী লইয়া নগর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দুর্গের অনতিদূরবর্ত্তী এক পান্থাবাসের নিকট আসিয়া ওয়ালেস্ এক স্কট্ রমণীর মুখে অবগত হইলেন যে, ইংরাজ সেনা এক্ষণে সেই পান্থাবাসে পানভোজনে মত্ত রহিয়াছে। সেই রমণী বলিল, "যদি তুমি স্কট্ হও, শীঘ্র পলায়ন কর; কারণ উহারা ওয়ালেস্-নামক এক জন স্কটের এবং তৎকর্ত্তৃক লক্মেবেন্ দুর্গের অধিকার-বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিল; সুতরাং ও দিক্ দিয়া যাইলে তোমাদিগের বিপৎ ঘটিবার সম্ভাবনা"। ওয়ালেস্ রমণীকে প্রকৃত হিতৈষিণী মনে করিলেন বটে, কিন্তু তাহার উপদেশের বিপরীতাচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বীর-হৃদয় ওয়ালেস্ তৎক্ষণাৎ পান্থাবাস-স্থিত ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি দূর হইতে গ্রেহাম্কে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সঙ্কেত করিয়াই স্বয়ং পান্থাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এড্ওয়ার্ড লীটল্ দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি উপহাসচ্ছলে বলিলেন "আশীর্ব্বাদ করি, আপনাদিগের মঙ্গল হউক।" ইংরাজ-সেনাপতি তাঁহাকে স্কট বলিয়া স্থির করিয়া বলিলেন, "তুমি কে হে? কি সাহসে তুমি আমাদিগের নির্জ্জন প্রমোদাবাসে প্রবেশ করিলে? সেনাপতির মুখ হইতে এই বাক্য উচ্চারিত হইতে না হইতেই ওয়ালেসের নিষ্কোশিত অসি প্রমোদমত্ত ইংরাজ-সৈনিকগণকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। তাহারা ক্ষণকাল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মদিরা তাঁহাদিগের কার্য্য-শক্তি হরণ করিয়াছিল; সুতরাং ওয়ালেস্ অবাধে তাঁহাদিগের সকলকেই নিহত করিলেন। দ্বার-রক্ষক লীটল্ও পঞ্চ মুণ্ডে ধরা শোভিত করিল। এদিকে গ্রেহাম্ ওয়ালেসের আদেশানুসারে দুর্গ দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। দুর্গ-দ্বার প্রজ্বলিত দেখিয়া ওয়ালেস্ সেই দিকে ধাবিত হইলেন। অচির কাল মধ্যে দুর্গ-

দ্বারের ভস্মরাশির উপর দিয়া তাঁহারা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুর্গাভ্যন্তরে কেবল কয়জন-মাত্র স্ত্রীলোক ছিল, সুতরাং তাঁহারা দুর্গাভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দুর্গ-মধ্যে আহারীয় কিছুই পাওয়া গেল না; অবশেষে পান্থাবাস হইতে খাদ্য সামগ্রী আনাইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তাঁহারা সে রাত্রি তথায় যাপিত করিলেন। প্রত্যূষে স্ত্রীলোকদিগকে মুক্তি-প্রদান করিয়া দুর্গ-গৃহে অগ্নি-প্রদান-পূর্ব্বক ডনৃডাফ্-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে রাত্রি তাঁহারা ডনৃডাফে মাহানন্দে যাপিত করিলেন।

মানব তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শাসন ও শিক্ষা।

আমরা পূর্ব্বে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের যে উপায় উল্লেখ করিয়াছি, তদনুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কএকটী বাধা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মানবগণ ভবিষ্যতে সুখ পাইব বলিয়া আপাতত মধুর সুখত্যাগে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, ও সকল মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমান প্রকার না থাকায় সকলে ভবিষ্যত সমান রূপ বুঝিতে পারে না। আবার কাহারও ২ বৃত্তি-বিশেষ এত প্রবল থাকে যে কার্য্য কালে তাহার শক্তিকে সে পরাস্ত করিতে পারে না। যখন প্রকৃতিই কার্য্য উৎপাদনের মূল, তখন কিরূপে সেই তেজস্বিনী শক্তির প্রকৃতি উল্লঙ্ঘন করিবে? প্রবল তেজস্বী কিরূপে সর্ব্বদা বিনয়ী হইবে? এবং রাগান্ধ কি রূপে ক্ষমাশীল হইবে? এই বিঘ্ন নিবারণের দুইটী উপায় আছে; অর্থাৎ সুশাসন ও সুশিক্ষা মনুষ্যদিগের শক্তি সর্ব্বদা সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত থাকে। যদিও শিক্ষা ও শাসন মানবের নূতন শক্তি উৎপাদন করিতে পারে না, কিন্তু উহা শক্তি-বিশেষের প্রবলতা ও দুর্ব্বলতা সম্পাদন করিতে পারে। দেখা যাইতেছে পরিচালন দ্বারা অঙ্গ বিশেষের বৃদ্ধি ও পরিচালনের অভাবে ক্ষুদ্রত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোন বৃক্ষকে দীর্ঘে উন্নত করিতে হইলে তাহার শাখা প্রশাখা ছেদন করিতে হয়। লৌহ-খণ্ডকে লম্বে বাড়াইতে হইলে পরিসর

কমাইতে হয়; অধিক বহনে বাহক ও হল-শকট-চালক গো সকলের স্কন্ধের স্থূলতা বৃদ্ধি হয়। কেবল মাত্র মানসিক বৃত্তি চালনে শরীর ও শরীর চালনে মনোবৃত্তি সকল দুর্ব্বল হয়। ব্যবহার না করিলে অস্ত্র সকলের তীক্ষ্ণতা থাকে না। নিয়ত নরহত্যা করায় ঘাতকের দয়া থাকে না। এইরূপে দেখা যায় যে যে বৃত্তির পরিচালন অধিক হয় তাহার প্রবলতা ও যাহার পরিচালন কম হয় তাহার দুর্ব্বলতা সম্পাদিত হয়। শাসন ও শিক্ষা বৃত্তিবিশেষকে পরিচালিত ও বৃত্তি বিশেষের শক্তি প্রকাশে বাধা দিয়া অপরিচালিত রাখে। তাহাতেই কোন বৃত্তি বর্দ্ধিত ও কোন বৃত্তি দমিত হয়। বাস্তবিক শাসন ও শিক্ষা কোন শক্তির উৎপাদন ও কোন শক্তির লয় করিতে পারে না। যদিও শাসন ও শিক্ষাতে প্রকৃতি-গত কোন প্রভেদ নাই কিন্তু মানবহৃদয়ে উহাদিগের কার্য্য-কারিতা শক্তি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এজন্য উহাদিগের বিষয় পৃথক্ রূপে বিবরণ করা আবশ্যক। শাসন দ্বারা কোন বৃত্তির বিকাশ বা বৃদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু প্রবল বৃত্তি দমিত হওয়াতে অপ্রবল বৃত্তি দুর্ব্বলীকৃত বৃত্তি অপেক্ষা তেজস্বিনী হইয়া উঠে। শিক্ষা দ্বারা দুর্ব্বল বৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রবল বৃত্তি অপেক্ষা তেজস্বিনী হয়। শাসন ও শিক্ষায় প্রভেদ এই যে শাসন দ্বারা ভয় উৎপাদন করিয়া কার্য্য-বিশেষ সম্পন্ন করিতে বাধা দেয় এবং শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান উৎপাদন করিয়া কার্য্য-বিশেষ সাধন অকর্ত্তব্য জানাইয়া তৎ-সাধনে নিবৃত্ত করে। সুতরাং শাসন দ্বারা শাসিত হওয়াতে পরিচালিত হইতে না পারিয়া বৃত্তিবিশেষ দমিত হয় এবং শিক্ষা দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরিচালিত হওয়ায় বৃত্তিবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও অপ্রকাশিত বৃত্তির বিকাশ হয়। সুশাসনও অনেক সময় কুফল উৎপাদন করে কিন্তু সুশিক্ষার ফল সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট। শাণিত হইলে অস্ত্র যেরূপ তীক্ষ্ণধার হয় শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিও সেইরূপ মার্জ্জিত হয়; বেশ ভূষা করিলে শরীর যে রূপ শোভিত হয় শিক্ষা দ্বারা অন্তরের ও সেইরূপ সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। বস্তুত শিক্ষা দ্বারা মানব গণ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে, প্রকৃত স্বার্থ কি বুঝিতে পারে, পরার্থ যে স্বার্থ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে, বৃত্তি সকলের সামঞ্জস্য করিবার শক্তি জন্মে; এবং তাহাই আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য। শিক্ষানিয়ত ব্যক্তির শাসনান্তরের আবশ্যক করে না; যাহারা শিক্ষায় শাসিত হয় না তাহা-দেরই শাসনান্তরের আবশ্যক। শিক্ষা দ্বারা না হইয়া কেবল মাত্র শাসন দ্বারা শাসিত মনুষ্য দ্বারা অনেক সময়ে অনেক কুফল জন্মিয়া থাকে। তাহার উদাহরণ ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় সহস্র সহস্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। শাসনের ন্যায়

কুশিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারায়ও অনেক কুফল উৎপাদন হইয়া থাকে, শিক্ষা দ্বারা নূতন শক্তি উৎপাদিত হয়না বটে, কিন্তু শিক্ষা দ্বারা শক্তি সকলের বিকাশ হইয়া মানবগণ এরূপ ভিন্ন প্রকারের হয় যে অশিক্ষিত দিগের সহিত তাহাদিগকে একই পদার্থ বলিয়া চিনিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠে। বিশেষ অনুধাবন করিয়া না দেখিলে বোধহয় যেন শিক্ষায় নূতন শক্তি সকলের উৎপাদন করিয়া দিয়াছে। সুতীক্ষ্ণ তরবারি সামান্য লৌহ হইতে কোন দ্রব্যবিশেষে ভিন্ন নহে কিন্তু উভয়ের শক্তির পার্থক্য দেখিলে একই পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। ঐরূপ ভীল কুলি হইতে আর্য্য জাতি ভিন্নধর্ম্মী না হইয়াও অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। শিক্ষা দ্বারা প্রকৃতিতত্ত্ব, রাসায়নিক সংযোগ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া সংযোগফলে নানা রূপ পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে। তাহার ফলে নির্ব্বোধ বংশে বুদ্ধিমান, কুৎসিত বংশে সুন্দর ও ভীরু বংশে বীর্য্যবান সন্তানের উদ্ভব হইয়া থাকে। ঐ প্রকারে এক্ষণে ইউরোপের নানা স্থানে পশু ও পক্ষী সকলের আশ্চর্য্য উন্নতি হইতেছে, ও ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা বিশেষ শিক্ষিত ও ক্ষত্রিয়েরা প্রবল বীর্য্যবন্ত ছিলেন। কতকগুলি সামান্য বন্য শস্য পুনঃ পুনঃ বপন দ্বারা উৎকৃষ্ট গোধূম রূপে পরিণত হইয়াছিল। অতএব যদিও শিক্ষার দ্বারায় নূতন পদার্থ বা শক্তি বিশেষ উৎপন্ন হয় না কিন্তু শক্তি সকলের বিকাশ ও সংযোগে এরূপ উন্নত শক্তি সকল উদ্ভূত হইতে পারে যে তাহা দেখিয়া অনেকে নূতন উৎপাদিত শক্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন। শাসন দ্বারা যদিও শিক্ষার ন্যায় প্রশস্ত ফল উৎপাদন হয় না কিন্তু উহা মানব সমাজের অল্প প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। অসভ্য বা অগম্য কালে শাসন ভিন্ন সমাজ রক্ষার অন্য কোন উপায়ই ছিল না এবং সভ্য কালেও অসভ্য ব্যক্তি দিগের শাসনই একমাত্র শিক্ষা। বাল্য কালেও শাসনের আবশ্যকতা আছে। শাসন অনেক প্রকার তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটী স্থল বিশেষে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ধর্ম্ম-শাসন।—মানব যখন প্রথমে পৃথিবীতে আসিয়াছিল তখন সমাজ ছিলনা, রাজা ছিল না, নৈসর্গিক বৃত্তির অভাব পূরণ করণ জন্য যে সকল নৈসর্গিক পদার্থের আবশ্যক তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তখন মানব ইতর জন্তুর ন্যায় অনাচ্ছাদিত দেহে আবাস শূন্য হইয়া অনায়াসলব্ধ ফল মূল ভক্ষণ করিয়া ইচ্ছামত বাস করিত। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু প্রভৃতি ভিন্ন আর কেহ তাহা দিগের কার্য্যেরা বাধা দিত না। সুতরাং ঐ সকল জন্তু ও মেঘ, বজ্রাঘাত প্রভৃতি ভিন্ন মানবের আশঙ্কার বিষয় আর কিছুই

ছিল না। তখন মানবগণ কোথা হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়, কোথা হইতে নদীর জল আইসে, কিরূপে বৃক্ষের ফল সকল জন্মে, এবং কেনই বা ঐ সকলের অভাব হয়, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিত না। যখন তাহারা বৃষ্টি, পানীয় জল ও ফলাদি আকাঙ্ক্ষা করিয়া পাইত না অথচ পাইবার কোন উপায় জানিত না, তখন অনন্য-উপায় হইয়া নৈসর্গিক শক্তি-বিশেষকে উৎপাদক জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে দেবতা বিবেচনা করিত। ঐ দেবতা প্রসন্ন হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে এবং অপ্রসন্ন হইলে ঐ সকল দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইবে এই বিশ্বাস তাহাদিগের ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। ঐ সময় হইতে মানবগণ দেবতাগণকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং যে কর্ম্ম দেবতার অপ্রসন্নকর বিবেচনা করিল, তাহা করিতে বিমুখ হইতে লাগিল। ঐ দেবভক্তি ক্রমে এত প্রবল হইল যে, নিতান্ত নিষ্ঠুর, ঘৃণাকর ও লজ্জাকর কার্য্য সকলও দেব-প্রীতিকর বোধে তাহারা অবিকৃত মনে সম্পাদন করিতে লাগিল। পৃথিবীর এই উন্নতাবস্থাতেও তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ সহস্র সহস্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এ বিষয়ের উদাহরণ অসভ্য দিগের সামান্য ধর্ম্ম হইতে দিবার আবশ্যক করে না, অত্যুন্নত ও বিশেষ মার্জ্জিত ধর্ম্মতেও অনেক পাওয়া যায়। ঐ দেব-ভক্তি ও পরকালে দেবতার প্রসন্নতা লাভের আশায়, আবার মানবগণ এরূপ নিঃস্বার্থ হয় যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহারা ঐ কারণে আপনার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, এমন কি—আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাসমতে দেব-প্রীতিকর বলিয়া যাহা বোধ হইবে, তাহা হিতকর হউক বা অহিতকর হউক, লজ্জাকর হউক বা শ্রদ্ধাকর হউক, ঘৃণাকর হউক বা প্রীতিকর হউক, নিষ্ঠুরতা হউক বা সদয়তা হউক, দেশ উৎসন্নকর হউক বা মহৎ-উন্নতিকর হউক, বিবেচনা না করিয়া প্রীত মনে সম্পন্ন করিবে। কেন না তাহারা জানে না যে, তাহারা কি—চতুঃপার্শ্বস্থ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিই কি; এ সকল কোথা হইতে আইল, কি জন্য আইল, কেন এই সকলের বিনাশ হয়, ও পুনরায় উৎপত্তি হয়, কেন রথ-চক্রের ন্যায় সুখ ও দুঃখ আবর্ত্তন করিতেছে, কি জন্য রোগ, শোক, দারিদ্র্য মানবগণকে কষ্ট প্রদান করে, কি জন্য অতুল সম্পদ, সম্ভ্রম, বন্ধু-প্রীতি মানবগণকে প্রসন্ন করে, এবং কি জন্যই বা মানবগণ মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়, এবং তাহার পরেই বা তাহাদিগের কি গতি হয়। এ সকলের মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া জ্ঞানাতীত দেব পদার্থের উপর নির্ভর করে। যখন তাহারা জানিল, সেই পরাৎপর দেব-

তাহাদিগের সকল সুখ-দুঃখের হেতু, যখন জানিল যে, তিনি তুষ্ট হইলে সুখী হইব ও তাঁহার অতুষ্টিতে দুঃখ জন্মিবে, তখন যে কার্য্যে তাঁহার তুষ্টি হইবে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিবে, তাহা সম্পাদন করিতে ও যে কার্য্য করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন বিবেচনা হইবে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে মানবগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই সর্ব্বস্ব ধন দেবদেবের আরাধনা করিতে মানবগণ না করিতে পারে এমন কর্ম্মই নাই। মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই সকল দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, মানবগণকে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে ও কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে দেবাজ্ঞা যে রূপ উৎকৃষ্ট উপায়, এরূপ আর কিছুই নাই। এই ভাবিয়া তাঁহারা যে সকল কার্য্য দেশের হিতকর বিবেচনা করিলেন, সেই সকলকে দেবাজ্ঞা বলিয়া প্রচার করিলেন। ঐ সকল ব্যবস্থা ক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্র-রূপে পরিণত হইল। ঐ ধর্ম্মশাস্ত্র দেব-প্রণীত বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে চলাই মানবের মুখ্য কার্য্য বলিয়া স্থির হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিপরীতাচারী মানব নামের যোগ্য নহে। তাহাকে স্পর্শ করিলেও দেবতার অপ্রীতি-ভাজন হইতে হইবে, বিশ্বাস জন্মিল। অতি প্রাচীনকালে ধর্ম্মশাসন ভিন্ন আর কোনও প্রকার শাসন ছিল না। তখন লোকের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ছিল, ধর্ম্মভয়ে কোন ব্যক্তি বিশ্বাসানুরূপ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। এক মাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রই মানবের সকল অভাব দূর করিয়া দিত। তখন ধর্ম্ম-শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা এবং ধর্ম্ম-শাসনই প্রধান শাসন ছিল। বাস্তবিক ধর্ম্ম শাসনের তুল্য উৎকৃষ্ট শাসন আর নাই। কেন না, ধর্ম্মভাবে যে কার্য্য করা হয়, তাহা অন্তরের সহিত করা হয়; তাহাতে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা বা কুটিলতা থাকে না। উহাতে অন্তরের মলিনতা দূর করে; এবং উহার আরাধনায় মনের পবিত্রতা জন্মে। আহা! সেই প্রাচীন কাল—সেই সত্যকাল—সেই পুণ্যকাল মানবগণের কি সুখেরই ছিল। তখন ধর্ম্মরূপ বৃষ চারি পাদে অবস্থিতি করিতেন। তখন সকলেই ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ছিলেন, ধর্ম্মই মানবের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। এমন কি, সাংসারিক বিবাদাদি অনর্থ সকল ধর্ম্ম দ্বারাই মীমাংসিত হইত। ঐ প্রাচীন কালের ন্যায় যদি চির কাল মানবের মনে ঐ রূপ ধর্ম্মভাব থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী কি সুখের স্থানই হইত। তাহা হইলে আর কোন প্রকার শাসনের আবশ্যক হইত না। কিন্তু জগতের কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি। এমন সুন্দর ভাবও অধিক দিন থাকিতে পাইল না। ক্রমে মানবের ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সকলেই একই প্রকার দেবতাও একই প্রকার দেবাজ্ঞা অবগত হইয়াছিল। ক্রমে তাহার ভিন্নত্ব উপলব্ধি

হইতে লাগিল। আদিম বৈদিককালে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতারূপে পরিগণিত ছিলেন। পরে ঔপনিষদিক কালে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্ম সকল দেবের দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইল। ক্রমে দার্শনিকগণ কেহ পুরুষ, কেহ প্রকৃতিকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিলেন; পৌরাণিকেরা কৃষ্ণ, কালী, শিব প্রভৃতি পরম দেবতার সৃষ্টি করিলেন। আবার বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও নাস্তিকতা সঙ্গে সঙ্গে অবতারিত হইল। দেশ বিদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি সহস্র সহস্র ধর্ম্ম প্রচলিত হইল। ধর্ম্ম নানা-প্রকার হইল। কিন্তু তাহার আধার এক মাত্র মানব রহিল। সুতরাং মানবের মহা বিপদ। কাহাকে ঈশ্বর বলিবে, কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্র-লিখিত ব্যবস্থা ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া মানিবে, তাহা তাহাকেই নির্ণয় করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল, তাহা স্খলিত হইল। সত্য-সন্ধিৎসু নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কিছু দিন পরে যখন জানিল যে, সে ধর্ম্মও প্রকৃত নহে, আবার নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই রূপে ধর্ম্মের প্রতি মানবের যে অচল বিশ্বাস ছিল, তাহার খর্ব্ব হইতে লাগিল। সুতরাং প্রাচীনকালে ধর্ম্ম-শাসন দ্বারা মানবের যে উপকার হইত, ক্রমে তাহার অল্পতা হইতে লাগিল। প্রত্যুত ধর্ম্ম শাস্ত্র দ্বারা এক্ষণে অপকারের ভাগ অধিক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, ধর্ম্ম শাস্ত্র সকলে যে সকল ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিলে অনেক সময়ে মহা অনিষ্ট সাধন হইয়া থাকে। অনেক ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারের স্বার্থপরতা, অথবা কাল ও অবস্থানুযায়ী প্রথাই এই সকলের কারণ। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রতি যাহাদিগের অটল বিশ্বাস আছে, তাহারা ঐ সকল কার্য্য করিয়া দেশের মহান্ অনিষ্ঠসাধন করিয়াছে। আলেক্‌জেণ্ড্রীয় পুস্তকালয়-দাহন ও সোমনাথ প্রভৃতির মন্দির ধ্বংস ইহার প্রমাণস্থল। যাহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি অটল বিশ্বাস নাই, অর্থাৎ অযৌক্তিক ব্যবস্থা দেখিয়া যাঁহারা ধর্ম্মব্যবস্থায় সন্দিগ্ধ হন, অথবা নানা প্রকার ধর্ম্মে নানাবিধ বিপরীত ব্যবস্থা দেখিয়া ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হয়েন ও প্রকৃত ধর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা পরিশেষে প্রায়ই নাস্তিক হইয়া পড়েন অথবা ধর্ম্ম-শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েন। সুতরাং ধর্ম্ম-শাস্ত্র এক্ষণে কি অটলবিশ্বাসী কি সন্দিগ্ধচিত্ত কাহারও উপকার সাধন করিতে পারিতেছে না। বরং এক্ষণে উহা সমূহ অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যদিও ধর্ম্ম-শাসনের তুল্য উৎকৃষ্ট শাসন আর নাই, কিন্তু কাল-ধর্ম্মানুসারে উহার শক্তি এক্ষণে কিছুই নাই। সুতরাং মানব শাসনের জন্য শাসনান্তর আবশ্যক হইয়াছে।

সামাজিক শাসন।—মানবের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন করিতে ধর্ম্মশাসন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইলেও যখন ধর্ম্মের প্রতি মানবের বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইল ও যখন ধর্ম্মশাস্ত্রে নানাবিধ অন্যায় বিধি

প্রবিষ্ট হইল, তখন ধর্ম্মশাসন দ্বারা বিশেষ উপকার না হওয়ায় শাসনান্তরের আবশ্যক হইল। বিশেষত অনেকে পরকালের ভাবীসুখ বা দণ্ড ভাবিয়া আপাত-মধুর সুখত্যাগ করিতে পারে না। কেন না, তাহাদের বিবেক-শক্তি অপেক্ষা সুখাভিলাষ চরিতার্থ করিবার বৃত্তিসকল প্রবল। তাহাদিগের জন্য শাসনান্তর একান্ত প্রয়োজন। মানবগণ প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরধন, পরদার-গ্রহণে লোলুপ হইল। ঐ সকল নিবারণের জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লৌকিক শাসনের আবশ্যক হইয়া উঠিল। মানব সমাজ-প্রিয়, সমাজ ভিন্ন মানব একাকী থাকিতে পারে না। স্ত্রী, পরিজন, প্রতিবাসী সতত প্রয়োজন; এমন কি, সর্ব্বদা ব্যবহৃত দ্রব্য সকলও পরস্পর বিনিময় করিয়া না লইলে পাওয়া যায় না। এই জন্যে সমাজ কোন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে তাহাকে বিশেষ দণ্ড দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কার্য্য করিলে সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ সমাজস্থ কোন ব্যক্তি তাহার সহিত ভোজন করে না, কেহ তাহাকে কন্যাদান করে না, প্রয়োজনীয় কোনও দ্রব্যই তাহার সহিত আদান প্রদান করে না। সুতরাং অন্যায়-কারী ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া সমাজের শরণাগত হয়, এরূপ কর্ম্ম পুনরায় করিব না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং সমাজের নিয়মানুসারে দণ্ড গ্রহণ করে। সমাজের এ প্রকার শাসনের নাম সমাজিক শাসন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সামাজিক শাসনই আমাদের প্রধান শাসন; এবং সমাজই আমাদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। কেন না, যত কিছু ন্যায় বা অন্যায় কার্য্য আছে, তৎসমস্তই সমাজ-ঘটিত। ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও যে সকল ন্যায় অন্যায় বিধান আছে, উপাসনা ব্যতীত তৎসমস্তই যে সমাজ সম্বন্ধীয়, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যাইবে। আমাদের উন্নতি অবনতি, স্বাধীনতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি সমস্তই সমাজ লইয়া। একের উন্নতি ও অবনতিতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সমাজের যৎসামান্য উপকার হইতে যদি সহস্র উন্নত ব্যক্তির ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাও ভাল; কিন্তু সমাজের সামান্য ক্ষতি করিয়া লক্ষ ব্যক্তির বিশেষ উন্নতিও ভাল নহে। কেন না সমাজের উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি; ব্যক্তিগত উন্নতি উন্নতিই নয়। আজি ভারত পরাধীন। ভারতের কোটি ব্যক্তি ইংলণ্ডে যাইয়া স্বাধীনভাবে বাস করিলে ভারতের কিছুই উপকার হইবে না। ভারত সেই পরাধীনই থাকিবে। কিন্তু ভারতের ঐ কোটি ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া যদি ভারতকে স্বাধীন করিতে পারে, তবেই ভারত স্বাধীন

হইবে। ভারতের আচার ব্যবহার ভাল নয় বলিয়া নিজে সাহেব সাজিলে ভারতের কিছুই হইবে না। ভারত-সমাজের আচার-ব্যবহার ভাল করিতে পারিলেই প্রকৃত উন্নতি করা হইবে। যিনি নিজের উন্নতি-অভিলাষে সমাজকে পরিত্যাগ করেন, তিনি পৃথিবীর উন্নতি করা দূরে থাকুক, বিশেষ অনিষ্ট করেন এবং সমাজেরও ক্ষতি করেন। রাজ্য মধ্যে থাকিয়া যিনি উন্নতি করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত উন্নতি করেন কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মের ন্যায় সমাজের অবস্থাও ভাল নয়। সামাজিক নিয়ম সকল নানা প্রকার দূষনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে ঐ দূষনীয় নিয়ম প্রতিপালন করিতে না পারিয়া এবং অনেকে সামাজিক উৎকৃষ্ট নিয়মও নিজের অশক্তি জন্য প্রতিপালনে অশক্ত হইয়া সমাজচ্যুত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে সমাজ এক স্থানে একটী ভিন্ন অধিক ছিল না। কিন্তু সমাজস্থ ব্যক্তি-গণের পরস্পর মতের অনৈক্য হেতু উন্নতি দ্বারা সামাজিক নিয়ম প্রতি-পালনে অশক্তাহেতু সমাজ-ভঙ্গ হইয়া বহুবিধ সমাজে বিভক্ত হইয়াছে। তাহাতেই ব্রাহ্মণসমাজ, ক্ষত্রিয়সমাজ ও বহুবিধ বর্ণ-সঙ্কর-সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকারে ভারতে অসঙ্খ্য সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। সমাজ ভিন্ন হইলে সামাজিক নিয়মও ভিন্ন হয়। সুতরাং সামাজিক শাসন দ্বারা এক সমাজ অপর সমাজকে শাসন করিতে পারে না; কেবল আপন সমাজস্থ লোককেই শাসন করিতে পারে। এক্ষণে আবার তাহাও হইতেছে না। এক্ষণে কোন সমাজস্থ লোকই সমাজকে ভয় করে না। সুতরাং সমাজ নাই বলিলেও হয়। অতএব সামাজিক শাসনের কোন উপকারিতাই নাই।

রাজ-শাসন।— যখন সমাজ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া গেল, যখন এক সমাজের লোক অপর সমাজকে শাসন করিতে পারিল না, তখন রাজশাসন বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিল। রাজা সকল সমাজের শাসন করিতে সক্ষম। কেহ আদিম কালে রাজাকে ঐ ক্ষমতা দেয় নাই। তিনি নিজ বাহুবলে বহু লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া-ছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ লোক সকল তাঁহার শাসনে বশীভূত হইয়া ও তাঁহার কার্য্যকলাপ দৃষ্টে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাঁহার সহায় হইয়া উঠিল। তিনি ঐ সহায়-বলে ক্রমে ক্রমে বহু সমাজের অধিপতি হইলেন। সকল দেশেই ঐরূপ এক বা বহুসংখ্যক লোক জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে যিনি শক্তি ও গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনিই প্রকৃত রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। রাজাও মানব, প্রজাবর্গও মানব; বিশেষ, মানব নিতান্ত স্বার্থপর ও ভ্রান্তিপূর্ণ। অনেক সময়ে রাজাগণ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ও ভ্রমবশতঃ প্রজাবর্গের

অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকেন। প্রজাবর্গ যখন সে সকল সহ্য করিতে না পারে, তখন তাহারা বিদ্রোহী হয় এবং ঐ রাজার পরিবর্ত্তে অন্য এক জন বলবান ও গুণবান্ ব্যক্তিকে রাজপদ প্রদান করে। পূর্ব্ব রাজাও আপনার পদ-রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। ঐ সময়ে দেশে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়। রাজ-শাসন-অভাবে দেশে সমূহ অত্যাচার হয়, এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দ্বারা দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়। এই জন্য যাহাতে রাজ-বিপ্লব না ঘটে, তাহার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। ঐ চেষ্টা রাজা ও প্রজা উভয়েরই করা বিধেয়। রাজাকে বিবেচনা করিতে হইবে যে তিনি প্রজাগণের বেতনভূক কর্ম্মচারীমাত্র। প্রজাগণ যাহাতে সুখে থাকে, তাহার বিধান করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। তিনি তাহাতে অবহেলা করিয়া স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা অসাবধান হইয়া পদে পদে ভ্রম করিলে প্রকৃতি-বর্গের সমূহ অনিষ্ট হইবে; তাহাতে তাঁহার কার্য্য থাকিবে না এবং কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলা জন্য তিনি পাপী হইবেন। প্রজাবর্গের বিবেচনা করিতে হইবে, যে রাজা তাঁহাদিগের হিতের জন্য দিবানিশি চিন্তা করিতেছেন, সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতেছেন এবং এমন কি অনেক সময়ে নিজের প্রাণপর্য্যন্তও দিতে প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহাকে এত অধিক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় যে, তাহাতে পদে পদে ভ্রম হওয়া সম্ভব। বিশেষ, প্রজাগণ যে কার্য্য অন্যায় বিবেচনা করিতেছে, তাহা প্রকৃত অন্যায় কি না তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। অন্য এক জন রাজা হইলেও হয়ত তাঁহাকেও ঐরূপ কার্য্য করিতে হইত। অতএব রাজার বিদ্রোহাচরণ করা কোন [illegible]চিত নয়। করিলে হয়ত কিছুই [illegible] হইবে না—অনর্থক দেশে রক্ত[illegible] দুর্ভিক্ষাদির আপদ সকল আ[illegible]ত হইবে এবং আপনারাও রাজ-কোপে পতিত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইব। এই জন্য মনু বলিয়াছেন :—

বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥

দহেদগ্নির্নরমেকং... [illegible]

একমেব দহত্যগ্নি... [illegible]

হয়। এবং বিজিত দেশের প্রকৃতি, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি পরাজিত দেশের সহিত একরূপ মিল না হওয়ায় পরাজিত-গণের মনোগত ভাব ইচ্ছাদি বিজিতেরা বুঝিতে পারেন না ও সেই দেশে সর্ব্বদা অবস্থিতি না করায় তাহাদিগের কষ্ট সকলও জানিতে পারেন না। কাযেই কি পরাধীন ভারত, কি পৃথিবীর অপর স্বাধীন দেশ কোন স্থানেই রাজশাসন অব্যাহত ভাবে আধিপত্য করিতেছে না। অর্থাৎ কোন প্রজাই এক্ষণে রাজবিধান সকল আপনাদের মনোনীত না হইলে কেবল রাজা দেবতা অথবা অতি বিচক্ষণ, তাঁহার কৃত কার্য্য অবশ্যই উত্তম হইবে, এরূপ ভাবিয়া তাঁহার অধীনস্থ থাকিতে চাহে না। সুতরাং রাজশাসন দ্বারা এক্ষণে পূর্ব্বকার ন্যায় ফল হইতেছে না অর্থাৎ এই কার্য্য রাজ-নিয়মানুসারে গর্হিত, ইহা করা অন্যায়; এরূপ বিবেচনায় কেহ ঐ কার্য্য-সম্পাদন করিতে নিবৃত্ত হয় না। তবে যে নিবৃত্তি হয়, সে কেবল রাজদণ্ড-ভয়ে মাত্র।

জুলু-ক্ষেত্রে রাজ্ঞী উজিনী।

১

এই উত্তমাশা অন্তরীপ কূলে,
এই না সে জুলুজাতির ভূমি ?
তব অভাগিনী জননীকে ভুলে
শান্তি নিকেতনে গিয়াছ তুমি॥

২

সাম্রাজ্য-সম্ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া
হারাইয়া পুন সে হেন স্বামী।
একমাত্র তব মুখ নিরখিয়া
ধরায় জীবিত ছিলাম আমি॥

৩

রাজ-রাণী হ'য়ে কাঙ্গালিনী-বেশে
হইয়া গৌরব বিভব-হীন।
ল'য়ে তোরে বক্ষে ফিরি দেশে দেশে
কাটায়েছি কত দুখের দিন॥

৪

ছিলাম জগৎ-বাসনার স্থল,
কে নাহি কাঁপিত আমার নামে ?
তুমি বিনা আজ্ কোন্ সুখ বল,
ছিল অভাগীর এ ধরা-ধামে ?

৫

পর দেশে আমি পর-দাসী হ'য়ে,
পরান্নে পালিনু জীবন মম।
ছিলে মোর তুমি, অভাগী-হৃদয়ে,
তামসী নিশিতে আলোক-সম॥

৬

হইলাম হায়! কব কি এখন,
শাখা-হীন যথা নীরস তরু।
আজি দেখ্ তোর মায়ের জীবন
বিভীষিকাময় ভীষণ মরু॥

৭

হায়, বিধাতার বিধান কেমন!
কেমন কালের কুটিল গতি!!
চক্রনেমি-সম মানব-জীবন
ঘুরি'ছে জগতে বিচিত্র অতি!!!

৮

জনম তোমার সেই বীর-কুলে,
যে কুল বিখ্যাত রণ-অনুরাগে।
তব জীবনের শেষ, রণ স্থলে
হইবে, অভাগী জানিত আগে॥

৯

তব পিতামহ সেণ্ট হেলেনায়,
ব্রীটেনে জনক, বিধান-ক্রমে।
জানিতাম, তোর সমাধি ধরায়,
হইবে না কভু জনম-ভুমে॥

১০

বীরের তনয়া, দুঃখ নাহি তায়।
বীর-প্রসূ, পুন বীরের জায়া—
একমাত্র দুঃখ রহিল ধরায়,
না ত্যজি যাবৎ এ মর কায়া॥

১১

যেই বোনাপার্টী-বীর্য্যে কম্পবান্
আছিল অগণ্য নৃপতি-রাজি।
হ'ত কি সে শেষ বীর্য্য-তিরোধান
অসভ্য জুলুর সমরে আজি?

১২

নেপোলিয়নের যেই বীর বংশ
ভুবন-বিখ্যাত ভুজ-পরাক্রমে।
হ'ত কি সে শেষ শোণিতের ধ্বংস
চির বালুময়ী জুলুর ভুমে?

১৩

আর এক দুঃখ—কুমার বয়সে
পড়িলে কালের কুটিল হাতে।
হা ধিক্ বিধাত! বল কোন্ দোষে
দলিলে কোরক অশনি-পাতে?

১৪

কোথা সেই দিন—বহু দিন নয়,
যবে জনমিলে এ মর লোকে।
সাময়িক শ্লথ ধমনী হৃদয়
স্নেহে নেচেছিল হেরিয়া তোকে॥

১৫

আর আজ বৎস! এই এক দিন,
হইয়া নিয়তি-পথের পন্থী,
চির তরে হায়! হইলে বিলীন
ছিঁড়ি' অভাগীর হৃদয়-গ্রন্থি॥

১৬

সম্রাট্-প্রাসাদ আকাঙ্ক্ষা-আকর
যথায় জনম লভিলে তুমি।
কোথা পারীসের সে সৌধ-শিখর
কোথা আজি এই জুলুর ভূমি?

১৭

হইয়া যখন স্বতঃ রণোৎসুক
প্রণমিলে আসি' বিদায় তরে।
ধরিয়া তোমার সে কম চিবুক
বলেছিল এই অভাগী তোরে॥

১৮

"হইয়া সমর-কুশলী কুমার!
"ফিরিয়া আসিও—ব্রীটেন দ্বীপে।
"এই আশীর্ব্বাদ—বাসনা আমার—
"আলোকি' ভুলোক যশের দীপে॥"

১৯

"ভুলিও না সেই প্রজাতন্ত্রীগণে"
যবে অভাগিনী বলিল তোরে।
অসি পরশিয়া আরক্ত লোচনে
বলেছিলে তিতি নয়ন-নীরে॥

২০

" হই ক্ষমবান্ আশীষ মা তুমি,
" প্রতিবিধিৎসিতে প্রুশিয়া-রাজে।
" রণ-শিক্ষা তাই বাসনার ভূমি
" হয়েছে দাসের হৃদয়-মাজে॥

২১

" যবে চলি' গেলা পিতা চির তরে
" ত্যজি ধরাধাম মুদিয়া নেত্র।
" এই শেষ কথা ছিল ওষ্ঠোপরে
" সী-ড-ন্, সী ড-ন্ সমর-ক্ষেত্র॥

২২

" ভুলিব কি-মতে সীডন্-সমরে—
" পিতৃজয়ী সেই প্রুশিয়া–রাজে ?
" প্রজাতন্ত্রী যত দেশীয় পামরে
" রেখেছি অঙ্কিত হৃদয়-মাজে॥"

২৩

কই তাত ! তব সে উচ্চ বাসনা
হইল সফল জগতী-মাজে ?
ইহ লোকে আর দেখিতে পাব না
সেই বীর-বপু সমর-সাজে॥

২৪

যেই অসি তব জনকের দেহ
শোভিয়াছে সদা, পড়িয়া ওই।
তোমাদের কুলে রহিল না কেহ
লভিতে ও অসি উরোপ জয়ী॥

২৫

অভাগীরে তব জনক ত্যজিল,
তুমিও ত্যজিলে এ ধরা-তল।
একাকিনী এই দুখিনী রহিল
ভুগিতে কেবল করম-ফল॥

২৬

জানি, সুখ দুঃখ এ পাপ ধরায়,
নহে বহু দিন—কি কব তোরে।
অনন্ত কালের তুলনায় হায় !
মানব-জীবন ক দিন তরে ?

২৭

আমা সম কত শত অভাগিনী
সেই সে কালের স্রোতেতে আসি,
ক্ষণেকের তরে ভাসি' একাকিনী
গেছে বিম্ববৎ সে স্রোতে মিশি'॥

২৮

তথাপি ও কেন কাঁদে রে হৃদয়
তমময় হেরি' জগৎ—নেত্রে।
জানিলাম, এই বিশ্ব মায়াময়;
গ্রথিত দেহীরা কি মোহ-সূত্রে !!

২৯

এই শেষ বিন্দু শোণিত তোমার
এখন পতিত এ ক্ষিতি-তলে।
বিদায়—বিদায়—লভিনু কুমার !
ধু'য়ে সে রুধির নয়ন জলে॥

৩০

পবিত্র এ ভূমি, যেই ভূমি তোকে
দিল শেষ স্থল হৃদয় পাতি'।
শেষ বিচরণ সুরয-আলোকে
করিলে যথায় সমরে মাতি'॥

৩১

আর এ পাষাণ-হৃদয় আমার,
তব চির-বাস, এই সে হিয়া।
বিদায়—বিদায়—লভিনু কুমার !
পরশি' এ ভূমি সে হৃদি দিয়া॥

৩২

তবে আমি বৎস! বিদায়—বিদায়—
ভোগি' ক্ষণকাল হৃদয়-ব্যথা।
পুন দরশন লভিব তথায়
পঞ্চভূত-দেহ নাহিক যথা॥

শ্রীশ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমর শেখর।

দশম পরিচ্ছেদ।

"————In that Manor now no more
Is cheerful feast and sprightly ball;
For ever since that dreary hour
Have spirits hunted Cumnor Hall!"—MICKLE.

রঘুনাথপুরে শশিশেখরের বাটীর কিঞ্চিৎ উত্তরে একটী প্রাচীন অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হয়। অট্টালিকাটী হঠাৎ দেখিলেই জনহীন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ তাই। যে দিন ধর্ম্মাত্মা শশিশেখর সামরিণের মন্ত্রিত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে আর কেহই এ গৃহে প্রবেশ করে নাই। সামরিণ, তৎকালপ্রিয় মন্ত্রীর বাসের নিমিত্ত আপন প্রাসাদের অনুকরণে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কালিকুটের রাজভবনের সহিত ইহার এতদূর সৌসাদৃশ্য ছিল যে, ভ্রমণকারীরা হঠাৎ এই অট্টালিকা-দর্শন করিলে, রঘুনাথপুরকে কালিকুট বলিয়া মনে করিত, এবং অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইয়া রাজদর্শন-মানসে শশিশেখরের আতিথ্য-সৎকার গ্রহণ করিত। কিন্তু কালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে রঘুনাথপুরের সে সৌন্দর্য্য-গৌরব অনেক দিন বিনষ্ট হইয়াছে! যে রমণীয় ভবনের শোভায় সমস্ত রঘুনাথপুর হাস্য করিত, উৎসবের আনন্দধ্বনিতে যাহা প্রতিধ্বনিত হইত, নৃত্যগীত প্রভৃতি বিবিধ বিমল আনন্দপ্রদ নৈশ লীলাভিনয়ে যাহা প্রকৃত রঙ্গভূমির মত ছিল, আজ কালবশে তাহা শ্মশানে পরিণত! আজ সেই পবিত্র প্রমোদভবন পিশাচগণের আবাসভূমি! ধন্য কাল! তোমার বিচিত্র মহিমা! কালিকুট-রাজভবনের সেই সমুদায় শোভাই রহিয়াছে;—সেই ধবল সৌধমালা—সেই উজ্জ্বল আলোকাগার—সেই আনন্দময় রঙ্গভূমি—সেই সুবিস্তৃত রম্য সভাগৃহ, এ সকল সৌন্দর্য্যই ত অদ্যাবধি সমভাবে রহিয়াছে; কিন্তু রঘুনাথপুরের সেই সমুদায় কোথায়? যে সকল সৌন্দর্য্যগুণে রঘুনাথপুর এক দিন কালিকুটের সমকক্ষ

হইয়াছিল, তাহা কোথায়? আর কেহ এখন ভ্রমেও রঘুনাথপুরের দিকে চাহিয়া দেখে না। পথিকগণ দূর হইতে শশিশেখরের পুরাতন অট্টালিকার দিকে চাহিয়া দেখিয়া অশ্রু-সম্বরণ করিতে করিতে চলিয়া যায়। যে সুরম্য হর্ম্মের সুধাধবলিত শিরোদেশ নানা বর্ণের পতাকা-নিচয়ে সুশোভিত থাকিত, আজ্ তাহা অশ্বথের কঠোর মূল-সমূহে শতধা বিভিন্ন! যাহার চতুঃপার্শ্ব মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিবেষ্টিত ছিল, আজ্ তাহার সেই স্থলে আরণ্য লতাগুল্ম সঞ্জাত হইয়া তাহাকে গাঢ়তর আবৃত করিয়া রাখিয়াছে! নিষ্ঠুর কাল! তোমার কঠোর ব্যবহার হইতে কেহই নিষ্কৃতি পায় না। তোমার নির্দ্দয় আচরণে রাজামাত্য শশিশেখর আজ্ নিঃসম্বল—পথের ভিখারীস্বরূপ। তাঁহার প্রমোদভবন অরণ্যে পরিণত!

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত। চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে সমস্ত প্রকৃতি হাস্য করিতেছে। রঘুনাথপুরের কোন গৃহেই কোন প্রকার শব্দ শুনা যাইতেছে না। সকলেই নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিতেছে। সমগ্র প্রকৃতিই নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে পেচকের কর্কশ কণ্ঠরব ও গৃহপালিত কুক্কুরগণের বিকট চীৎকার, থাকিয়া থাকিয়া নৈশ-গগনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এমন সময় শশিশেখরের পুরাতন বাটীর পশ্চাদ্ভাগে দুইটী মানব-মূর্ত্তি পার্শ্বস্থ জঙ্গল হইতে ধীরে ধীরে দেখা দিল। কি আশ্চর্য্য! ইহাদের মনোমধ্যে কি ভয়ের লেশমাত্র নাই? নতুবা কি সাহসে ইহারা এই ভয়ানক স্থানে আসিল? এ অট্টালিকা যে এখন পিশাচগণের আবাসভূমি হইয়াছে! কোন নাগরিকই সাহস করিয়া দিবাভাগে ইহার নিকট আসিতে পারে না। তবে ইহারা কি করিয়া এই নিশীথ সময়ে এই স্থানে আসিল! মনুষ্যদ্বয় ক্রমে ক্রমে বাটীর পশ্চাদ্ভাগস্থ গুপ্তদ্বার-সম্মুখে আসিয়া ধীরে ধীরে দ্বারদেশে করাঘাত করিল। অমনি ভিতর হইতে হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত হইল। এক জন খর্ব্বকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বাম হস্তে একটী অনত্যুজ্জ্বল মশাল ধারণ করিয়া ঈষৎ বিনীত ভাবে আগন্তুক-দ্বয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক দুই জন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে দ্বারদেশ পুনর্ব্বার নিঃশব্দে রুদ্ধ হইল। বাটীর বাহিরে সমস্ত পৃথিবী উজ্জ্বল-চন্দ্র-কিরণে আলোকিত; কিন্তু ইহার ভিতরে গভীর নিস্তব্ধতা, ঘোর অন্ধকার বিরাজমান। অনুচর মশাল লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, আগন্তুক-দ্বয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যে ক্ষীণ অনুজ্জ্বল আলোক মশাল হইতে বাহির হইতেছিল, তাহাতে বাটীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা এক প্রকার অস্পষ্ট-ভাবে লক্ষিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে ভিত্তি-চ্যুত ইষ্টকচূর্ণ একত্র রাশী-কৃত; কোথায় বা অট্টালিকার দ্বিতীয়তলস্থ

বহিরঙ্গণ হইতে এক একটী স্তম্ভ, সমূলে স্খলিত হইয়া একবারে দ্বিখণ্ডিত ভাবে পতিত। অরণ্য-লতা ও দীর্ঘ তৃণরাজি সেই সেই স্থলে সঞ্জাত হইয়া তৎসমুদয়কে গভীর-রূপে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মশাল-নিক্ষিপ্ত ক্ষীণোজ্জ্বল আভা তাহাদের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে অল্পে অল্পে প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু পর ক্ষণেই আবার গভীরতর অন্ধকারে প্রোথিত করিয়া ফেলিল। মানব-ত্রয় ক্রমে ক্রমে একটী অৰ্দ্ধভগ্ন সোপানের উপর দিয়া একটী বৃহৎ কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গৃহমধ্যে একটী কাষ্ঠ-দীপাধারে এক উজ্জ্বল প্রদীপ এক পার্শ্বে জ্বলিতেছিল। গৃহটী দৈর্ঘ্যে অষ্টাদশ হস্ত ও প্রস্থে দশ হস্ত; তাহার উচ্চতাও প্রায় চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত হইবে; স্থানে স্থানে ইহার প্রাচীন গৌরবের নষ্টাবশেষমাত্র পরিলক্ষিত হইতেছিল। পরন্তু অধিকাংশই চর্ম্মচটিকা ও পারাবত-পুরীষে বিকৃত, এবং সৌধশিরোজাত অশ্বত্থের মূল-জালে গাঢ় আবৃত। অনুচর আগন্তুক-দ্বয়কে সেই গৃহে লইয়া আসিল; এবং তাহারা উভয়েই সম্মুখস্থ মত্তুবাসনে উপবিষ্ট হইলে আপন হস্তস্থ মশাল রক্ষা করিয়া তাহাদের গাত্রাবরণ খুলিয়া লইল। দীর্ঘ গাত্রাবরণ তাহাদের মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া তাহাদের প্রকৃত অবয়ব সম্পূর্ণ ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। বহিরাবরণ উন্মোচিত হইলে ভিতর হইতে উভয়েরই সসজ্জ বেশ স্পষ্ট লক্ষিত হইল। কটীদেশে তীক্ষ্ণ ছুরিকা-সম্বলিত চর্ম্মকোষ ও তৎপার্শ্বে এক হস্ত-পরিমিত ভীষণ 'পিস্তল লম্বমান! মস্তক ও গ্রীবাদেশ আবৃত করিয়া কঠিন লৌহ উষ্ণীষ সংস্থিত। অনুচর একে একে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র গুলি উন্মোচন করিয়া ভিত্তিনিহিত দারুময় নাগদন্তকে স্থাপিত করিল। ক্ষণকাল পরেই আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি—যাহার বেশ বিন্যাস অন্যের অপেক্ষা অনেকাংশে চাক্‌চিক্যশালী ছিল—ভ্রূকুটী সহকারে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "এই বার দেখিব, রমেশের হস্ত হইতে নরাধম কিসে পরিত্রাণ পায়।" সে তৎপরেই পার্শ্বস্থ সহচরের দিকে ভ্রূভঙ্গ-বিকৃত মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "মহাকেতু! কেমন অনুচরেরা চারি দিকেই গুপ্ত বেশে থাকিলেই বিশেষ সুবিধা হইবে না?" মহাকেতু সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া উত্তর করিল, 'হুঁ! তাহা আবার বলিতে! একটী পিপীলিকা পর্য্যন্তও তাহাদের গ্রাস হইতে পলাইতে পারিবে না।" সে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া রমেশের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু, প্রভু! এ রাত্রে বোধ হয়, কেহই আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই!" রমেশ মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিল—"উঃ! এত রাত্রে? এত রাত্রে কি কেহ জাগিয়া আছে? আর যদ্যপিও

ছুই এক জন প্রহরী দূর হইতে এক বার দেখিয়া থাকে, ভয়ে দ্বিতীয় বার আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিতে তাহাদের আর সাহস হয় নাই; কারণ এই প্রকার ছদ্ম বেশে রাত্রিতে যখনই তাহাদের সম্মুখে পড়িয়াছি, তাহারা ভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া 'রাম' 'রাম' শব্দে সরিয়া গিয়াছে। মহাকেতু!—" সে মহাকেতুর স্কন্ধে মৃদু স্নেহপূর্ণ দক্ষিণ করাঘাত করিয়া আহ্লাদে বলিতে লাগিল "আর মহাকেতু! আমাদের যেরূপ অভিসন্ধি, তদুপযোগী বাসস্থানও ঈশ্বর মিলাইয়া দিয়াছেন। আবশ্যক হইলে দিবাভাগেও আমরা এ স্থানে নিরাপদে থাকিতে পারিব। রাত্রিত পরের কথা, দিবাকালে কোন নাগরিকই ইহার ত্রিসীমায় আসিতে সাহস করে না; তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস যে, শশিশেখরের স্থানান্তর গমন হইতে এ গৃহে ভূত ও পিশাচগণ বাস করে।" অকস্মাৎ রমেশের হৃদয়ে অন্য ভাবের উদয় হইল। সে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সদুঃখে পুনর্ব্বার বলিল," আহা! সেই দিন হইতে আমারও জীবন-স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।—উঃ! আজ প্রায় তিন বৎসর!"—

মহাকেতুও নিজ প্রভুর দেখাদেখি একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিবার মানসে বলিল, "যাক্, সে জন্য আর বৃথা দুঃখ প্রকাশ করিয়া কি হইবে? আর যখন আমরা পুনর্ব্বার সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন অবশ্যই গিরিবালা আপনারই উপভোগ্যা হইবে।" মহাকেতুর এ সান্ত্বনা-বাক্য রমেশের কর্ণে স্থান পাইল না। সে তখন অন্য বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। "সেই দিন—উঃ! সেই দুর্দ্দিন হইতে গিরিবালার মুখের প্রফুল্লতা আর দেখিতে পাই নাই। হাস্যময়ী গিরিবালার অপাঙ্গে কালিমা পড়িয়াছে। আমারও হৃদয় সেই দিন হইতে অন্ধকারে আবৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উঃ! মহাকেতু—" গভীর নিশ্বাসে রমেশের বক্ষঃস্থল স্ফীত হইল। সে দীন ভাবে মহাকেতুর দিকে ফিরিয়া সেই ভাবেই বলিতে লাগিল, "উঃ! মহাকেতু! সেই দিন আমার হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, তাহার মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা আর প্রশমিত হইল না—আর বোধ হয়, হইবেও না। সেই দিন হইতে দিব্য করিয়া বলিতে পারি—আজ্ প্রত্যেক দিনের ঘটনা জাজ্বল্যরূপে মানসপটে চিত্রিত রহিয়াছে—সেই দিন হইতে এক মুহূর্ত্তেরও জন্য সুখ কেমন, তাহা জানিতে পারি নাই—সেই দিন হইতে হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে—তাহা ত আর নির্ব্বাপিত হইবার নয়! যেন দারুণ অনুতাপের যন্ত্রণাময় নরককুণ্ডে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে নিক্ষেপ করিতেছে—উঃ! মহাকেতু! মহাকেতু! এ যন্ত্রণা নিতান্ত

অসহ্য।" সন্তাপের প্রবলতম উচ্ছ্বাসে রমেশের হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুলিত হইল। সে স্বীয় অশ্রুসিক্ত বদন মহাকেতুর স্কন্ধে রাখিয়া ক্ষণকাল নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। মহাকেতুও প্রভুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া খিন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "প্রভু! অনুতাপ কেন? আপনার অনুতাপ কিসের জন্য? আপনি ত কখন কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হয়েন নাই, তবে আপনার হৃদয়ে অনুতাপ কেন স্থান পাইবে?"

রমেশ ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "মহাকেতু! পাপ কাহাকে বলে, তাহা জানি না। এ হৃদয়ে যাহাতে সুখ হয়, তাহাই করিয়াছি—তাহাই করিব। এক দিকে সমস্ত জগৎ-সংসার—অন্য দিকে আমার হৃদয়ের পরিতৃপ্তি; সমস্ত জগৎ-সংসার কেন ছারখার হউক না, কিন্তু যদি তাহাতে আমার হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয়, আমি আহ্লাদে তাহা তৎক্ষণাৎ করিব। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা কই? যে কাল্পনিক সুখের আশা হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম, তাহার কি হইল? পিতা ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মাত্মা শশিশেখরের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিলেন, সামরিণ্ অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া নির্দ্দোষীর দণ্ড-বিধান করিল। শশিশেখর পদচ্যুত হইল। বালিকা গিরিবালার দুঃখের সূত্রপাত হইল; কিন্তু তখন বালিকা—আমিও বালক; হিতাহিত জ্ঞানহীন; কাহাকে সুখ—কাহাকে দুঃখ বলে, কিছুই জানিতাম না। গিরিবালা কে, জানিতাম না,—গিরিবালার জন্য হৃদয় কাঁদিত না। তাহার পর ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। পিতা, মাতা, আত্মীয় পরিজন সকলকেই জানিতে পারিলাম, কিন্তু 'গিরিবালা কে?' তখনও তাহা জানিতে পারিলাম না। গিরিবালা কে? যাহাকে দেখিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত হইতাম, যাহাকে দেখিতে পাইলে আর সকলকে ভুলিয়া যাইতাম—সে কে? জানি না; কিন্তু এ জগতে যদ্যপি আমার কোন সুখের বস্তু থাকে—তাহা গিরিবালা। কিন্তু যাহা ভাবিয়া সেই কাল হইতে যে আশাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি, তাহা কি সফল হইবে না? যে একমাত্র আশায় নির্ভর করিয়া এই সকল গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার কি ফল ফলিল? দুরাশার তীব্র ছুরিকা মর্ম্মস্থলে নিরন্তর দারুণ আঘাত করিতেছে; তাহাও সহ্য করিয়াছি—কেবল একমাত্র আশায়—গিরিবালা আমার হইবে। কিন্তু এ অনুতাপ কিসের জন্য, তাহা জানি না; কেনই বা হৃদয় এখন সে অনলে দগ্ধ হইতেছে—বলিতে পারি না। সেই অল্প বয়সে যে চিন্তার সিদ্ধান্ত করিয়া এই আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়াছি; তাহা কি পাপ? বলিতে পারি না, কিন্তু যদি তাহা পাপ হয়, তবে ইহা তাহারই অনুতাপ। পাপ—পুণ্য—পরলোক—কিছুই মানি না; কিন্তু যদি পাপ থাকে,

—যদি সে চিন্তা পাপ হয়—আর যদি পাপের শাস্তি ও অনুতাপ থাকে--তবে কি ইহা তাহারই শাস্তি?—তাহারই অনুতাপ?"—রমেশ মহাকেতুর মুখের দিকে চাহিল—অকস্মাৎ গৃহের দীপ নির্ব্বাণ হইল! হঠাৎ একটা পেচক গৃহাভ্যন্তরে ডাকিয়া উঠিল। রমেশের হৃদয় সহসা শিহরিয়া উঠিল!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"Have, then, thy wish"—he whistled shrill,
And he was answered from the hill."

—*The Lady of the Lake.*

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, অপ্রতিহত-বেগে অতীত হইয়াছে, কালস্রোত অনিবার্য্য-বেগে অনন্ত সাগরে পতিত হইতেছে; কিন্তু এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে জগতের যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা এক বার ভাবিতে গেলে, হৃদয় স্তম্ভিত হয়, প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, অন্তর্নিগূহিত শোকানল আবার জ্বলিয়া উঠে। আজ এই যৌবনের দুরন্ত মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া এক বার সেই কৈশোরের কমনীয় কুসুমতরুলতা-শোভিত মনোহর ছায়াকুঞ্জের দিকে চাহিয়া দেখিলে সকলি স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। সেই হাস্যময় সংসারের সুখের লহরী একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে, জীবনের সহচর প্রিয় সুহৃদ্গণ একে একে বিদায় লইয়াছেন, জীবন-রঙ্গালয়ের উজ্জ্বল আশা-প্রদীপ এক এক করিয়া নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এখন চারি দিকেই গভীর অন্ধকার। কাল সেই হাস্যময় উজ্জ্বল রঙ্গশালায় এই অন্ধকারময় যবনিকা নিক্ষেপ করিয়াছে; তথাপি স্মৃতির মধুর হিল্লোলে এই দৃশ্যপটকে দুলাইয়া থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল ও ক্ষীণভাবে সেই আলোক এক এক বার বিদ্যুতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। স্নেহময় জনকের মধুর চুম্বন, বাল্যসুহৃদের নির্ম্মল প্রেমোচ্ছ্বাস, এবং সেই সুখময় সংসারের লাবণ্য-লহরী এখনও থাকিয়া থাকিয়া এই অন্ধকার গৃহে ক্ষীণালোক বিস্তার করিতেছে। আজ এই অনন্ত-সাগরের উপর ভেলাগর্ভে দাঁড়াইয়া সেই সুদূরস্থিত হাস্যপূর্ণ তীরভূমি ক্ষীণোজ্জ্বল রেখার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। সেই শান্তোজ্জ্বল চিত্রই এই দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু। তাহাকে ভুলিতে হইলে, জীবনকে ভুলিতে হইবে। মানবমাত্রেই যখন সেই সুখের পক্ষপাতী—সেই বস্তুর উপাসক, তখন রমেশ কি সে সুখের সামগ্রীকে ভুলিবে?—না, সে বস্তু যে তাহার জীবনের মূলাধার। সে পার্থিব সুখ, সম্পদ, গৌরব সকলই পরিত্যাগ করিতে

পারে, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকেই ভুলিতে পারে, তথাপি সেই স্বর্গীয় সুখের সামগ্রীকে ভুলিতে পারিবে না। আহা! কোথায় সেই রঘুনাথপুরের শান্তিময় সংসারের সুখলহরী? কোথায় সেই হাস্যোৎফুল্ল শৈশবসহচরী গিরিবালার প্রেমময়ী মূর্ত্তি, কোথায় সেই জীবনতোষিণী আশার শান্তোজ্জ্বল আভা? সকলই ত রহিয়াছে, কিন্তু সে সুখ কোথায়? যে রঘুনাথপুর রমেশের বাল্যলীলাস্থল, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে দিবারাত্রি দেখিলেও হৃদয় তৃপ্ত হইত না, প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার সৌন্দর্য্য নূতন বলিয়া বোধ হইত, সে রঘুনাথপুর আজ শ্মশান তুল্য কেন? যে মনোহর লতাকুঞ্জ ও কুসুমতরু-শোভিত প্রমোদোদ্যান তাহার পক্ষে এক দিন মর্ত্ত্যে নন্দন-কাননের তুল্য ছিল, যাহাতে বাল্যসহচরী গিরিবালার সঙ্গে প্রত্যহ সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, উদ্যানে নানা জাতীয় সুরভি ফুল ফুটিত, উভয়েই অঞ্চল পুরিয়া ফুল তুলিয়া দুই তিন গাছি করিয়া মালা গাঁথিত, রমেশের মালা অপেক্ষা গিরিবালার মালা ভাল হইত, রমেশ বদল করিতে বলিত, সরলা বালিকা হাঁসিয়া বলিত "কেন আমি বদল করিব? তুমি চিরকালই আমার ভাই থাকিবে বল?" আহা! সেই সুধাময় আধ আধ অপরিস্ফুট বাক্য এখনও মধুর নিক্কণে রমেশের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে!—হায়! সেই প্রমোদ কানন আজ মরুময় বোধ হইতেছে কেন? রঘুনাথপুরের সেই সকলই ত রহিয়াছে;—সেই উদ্যান, সেই বাটী, সেই আকাশের সেই চন্দ্র—যাহার অমৃতময় কিরণ সকলের আগে অনুভব করিবার জন্য, তাহারা দুই জন সর্ব্বাগ্রে ছাদের উপর উঠিত;—সে সকলই ত রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সেই সকল মনোহারিণী শোভা ফুরাইয়াছে কেন? আজ সেই রঘুনাথপুরের দিকে চাহিতে আর ইচ্ছা হয় না কেন? যে হৃদয় এক দিন প্রফুল্ল আশার শান্তোজ্জ্বল আভায় আলোকিত ছিল, তাহা আজ অন্ধকারময় কেন? রমেশ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখে নাই, দেখিলে বুঝিতে পারিত যে, তাহার হৃদয়ে একটী মহৎ অভাব ছিল। সে ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা জানিত; কিন্তু কাহাকে ভালবাসিতে হয় তাহা জানিত না। সেই অভাবেই তাহার হৃদয় শূন্য হইয়াছে; তাহার ও অভাগিনী গিরিবালার ঐহিক সুখের পথে কণ্টক পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি সে গিরিবালাকে ভুলিতে পারিবে? গিরিবালার আশা তাহার পক্ষে দুরাশা। কিন্তু রমেশ কি তাহা পরিত্যাগ করিবে? সে সমস্ত পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে, জীবনের মমতা ত্যাগ করিতে পারিবে, তথাপি জীবনের মূলস্বরূপ গিরিবালার আশা

কখনই ত্যাগ করিতে পারিবে না। গিরিবালা তাহাকে ছাড়িয়া সতীশকে ভাল বাসিল, রমেশের আশাদীপ নির্ব্বাণ হইল; তাহার হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু সেই অন্ধকার-মধ্যে যে ভয়ঙ্করী হৃদবৃত্তি অদৃশ্য-ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা রমেশের কালস্বরূপ। তাহার দ্বারাই রমেশের জীবন স্রোত সেই দিন হইতে চালিত হইতে লাগিল। সে গিরিবালার হৃদয়ে স্থান পাইল না, সতীশ পাইলেন। সতীশ সেই দিন হইতে তাহার ভীষণ শত্রু হইলেন। সে তাঁহাকে বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিল। সতীশ কে?—এক জন অজ্ঞাতকুলশীল দস্যু হইয়া সে গিরিবালার প্রেমের পাত্র হইবে? রমেশ তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। সমস্ত জগৎ যদ্যপি সতীশের পক্ষ হয়, তথাপি রমেশের দারুণ জিঘাংসা হইতে সে কখনই নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে না। দুর্বৃত্ত রমেশ সেই দিন হইতে সতীশের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সতীশ তাহা বুঝিলেন। যে তীব্র দৃষ্টিতে সে সেই দিবস তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল, তাহার অর্থ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি গিরিবালার নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথপুর হইতে প্রস্থান করিলেন। সহস্র প্রয়োজন থাকিলেও তিন দিবসের অধিক কোথাও অবস্থান করেন না। কিন্তু পীড়াবশতঃ তাঁহাকে এক মাস এক পক্ষকাল রঘুনাথপুরে থাকিতে হইল। আরোগ্যলাভ করিবা-মাত্র তিনি সমরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাঞ্জাবের দিকে যাত্রা করিলেন। যদিও তিনি সমরকে নিষ্ঠুর দস্যুপতি বলিয়া সময়ে সময়ে তিরস্কার করিতেন, তিনি কদাপি তাঁহার গুণের অপক্ষপাতী ছিলেন না। সমর তাঁহাকে প্রাণের সোদর তুল্য স্নেহ করিতেন, এক দণ্ড না দেখিতে পাইলে অত্যন্ত বিকল-চিত্ত হইতেন। সতীশ দেড় মাস পীড়িতাবস্থায় রঘুনাথপুরে রহিলেন। সমর কি তাহাতে নিশ্চিন্ত ছিলেন? যাহাকে এক দণ্ড না দেখিলে তিনি চারি দিক শূন্য দেখিতেন, যাহার অঙ্গে কুসুমের আঘাত লাগিলে, তাঁহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ হইত, সেই সতীশ দেড় মাস কাল অরক্ষিত শরীরে পীড়িতাবস্থায় রঘুনাথপুরে রহিলেন, সমর কি তাহাতে নিশ্চিন্ত ছিলেন? যে চিকিৎসক সমধিক যত্নসহকারে তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত—সে কে? সতীশ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই,—সেই সমর!

সতীশ সমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটী পর্ব্বত-প্রদেশের মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। যদিচ রঘুনাথপুর হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাজপথ ছিল, কিন্তু তিনি সে পথ অবলম্বন না করিয়া সেই সময় পর্ব্বত-পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সমর তাঁহাকে পর্ব্বত ও কানন-পথ দিয়া যাইতে বলিতেন।

কেন যে সমর তাঁহাকে এরূপ করিতে বলিতেন—তিনি জানিতেন না। কিন্তু সমরের বাক্য তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান—সুতরাং প্রাণপণেও তাহা রক্ষা করিতেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর। প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণে সমস্ত পর্ব্বত-প্রদেশ যেন দগ্ধ হইতেছে। বাতাসের নাম গন্ধ নাই; দারুণ গ্রীষ্মের প্রভাবে শ্বাস রুদ্ধ, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত। সতীশ আর অশ্বপৃষ্ঠে থাকিতে পারিলেন না। অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক পদব্রজে নিকটস্থ এক নারিকেল-কুঞ্জমধ্যে আশ্রয় লইলেন। কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অশ্বের রজ্জু একটী নারিকেল-বৃক্ষগাত্রে বন্ধন করিতে যাইবেন, অকস্মাৎ স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্মিত নয়নে চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। কোন দিক হইতে কিছুই তাঁহার নয়ন-গোচর হইল না। কেবল অস্পষ্ট অশ্বের ক্ষুরধ্বনি অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু কোন্ দিক হইতে যে তাহা আসিতেছে, সতীশ তদ্বিষয়ের কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল। অবশেষে মানবকণ্ঠ-নিঃসৃত অস্ফুট কোলাহল সতীশের শ্রুতি-গোচর হইল। তাহাদের উৎসাহব্যঞ্জক উচ্চ রব শ্রবণ করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন "হয় ত কোন পলায়িত শত্রুর অনুসরণে তাহারা আসিতেছে।" কিন্তু "সতীশ দস্যু—নরহন্তা—পামর—" এই সমুদয় বাক্য যখন স্পষ্ট শ্রুত হইল, তখন তিনি নিশ্চয় জানিলেন যে, কোন শত্রু তাঁহারই অনুসন্ধানে আসিতেছে। কিন্তু এ জগতে তাঁহার শত্রু কে? তিনি ত কখনও কাহার কোন প্রকার অনিষ্ট-সাধন করেন নাই; উপকার ভিন্ন অনুপকার কাহারও কখনও করেন নাই, তবে তাঁহার শত্রু কে? এ জগতে এমন নরাধম কে আছে, যে উপকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিবে?

সতীশ তৎক্ষণাৎ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া স্থির নয়নে শব্দ-নির্দ্দিষ্ট দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল কাহারও কোন কণ্ঠরব শ্রুত হইল না। কেবল ঘন ঘন অশ্বের ক্ষুরধ্বনি পর্ব্বত-পার্শ্ব হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বোধ হয় পাছে তাহাদের কোলাহল শ্রবণ করিয়া পলায়িত ব্যক্তি গুহ্য স্থানে লুক্কায়িত হয়, এই ভয়ে সকলে নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সতীশ সেরূপ ভীরু-স্বভাব নহেন। কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া স্থিরান্তঃকরণে তিনি তাহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পশ্চিম-পার্শ্বস্থ সঙ্কীর্ণ পথ দ্বারা কতিপয় অশ্বারোহীকে দ্রুতবেগে উপত্যকা-দিগ্‌ভাগে আগমন করিতে দেখিয়া, সতীশ ভ্রূকুটী করিয়া সবেগে তদ্দিকে অশ্ব চালিত করিলেন। সিংহ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিলে আস্ফালন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, সতীশ তদ্রূপ ভীম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শত্রুদলের প্রতি ধাবিত হইলেন।

নৈদাঘ সন্ধ্যা।

১

নৈদাঘ সায়াহ্ন, সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, চেয়ে দেখ হে ভাবুক বিশ্ব-প্রকৃতি-মাধুরী।
নাই ঘোর ঘন ঘটা বিকট বিদ্যুৎ-ছটা
শূন্যভেদি অশনি-সম্পাত ঘোরতর, নাই বাত্যা, বৃষ্টি করকা কবাল ঝর ঝরি!!

২

গগনমণ্ডল স্থির প্রশান্ত নির্ম্মল নীলোজ্জ্বল-দরশন সব শক্তিময় দেখি,—
পশ্চিম আকাশ-কূলে কাল সাগরের জলে,
রক্ত রাগছটাভানু ডুবিতেছে দেখ দেখ প্রাচীতে উদিত পুনঃ সন্ধ্যা সুধামুখী;

৩

কুসুমযৌবনা সন্ধ্যা সরলা কুমারী, কিবা শ্যামোজ্জ্বল দ্যুতি অতি অপূর্ব্ব মাধুরী,
ছায়া সহচরী সঙ্গে বেদবালা খেলে রঙ্গে,
ফুল আভরণ অঙ্গে ফুলের বসনে তনু আবৃত দু হাতে ফুল ছড়ায় সুন্দরী!

৪

স্বর্গীয় সুরভি-রাশি বিতরিয়া ধীরে, ধীরে ধীর গন্ধবহ সন্ধ্যাদেবী শান্তিতরে,
সন্ধ্যা এল এল ব'লে বিহঙ্গেরা কুতূহলে
গায়িছে বন্দনা-গীতি করি কল ধ্বনি, বিশ্ব হাসিছে ভাসিছে যেন পুলক পাথারে!

৫

সন্ধ্যা এল ব'লে সুখে বিচলিত তরুরাজি কানন-বল্লবী-বৃন্তে ফুটে ফুলকুল,
সন্ধ্যা সম্ভাষণতরে জাহ্নবী আহ্লাদ ভরে,
সংযত তরঙ্গে যেন দাঁড়াল থমকি, পুনঃ মধুর হৃদয়োচ্ছ্বাসে গায় কুল্ কুল্!

৬

পবিত্রা জাহ্নবী স্নেহে সন্ধ্যা কুমারীরে ক্রোড়ে লইয়া সাদরে, করি স্নেহ সম্ভাষণ,
চুম্বিলা বদন-শশী শ্যামা-শ্যাম-অঙ্গে পশি,
গাঢ় শ্যামকান্তি, ক্রমে আরো গাঢ়তর শ্যাম, ক্রমেই প্রগাঢ় সন্ধ্যা হইল কেমন?

৭

সন্ধ্যার শ্যামল বর্ণে জাহ্নবীর শ্যাম শোভা মিশায়ে অলক্ষ্যে ক্রমে সৃজিল আঁধুলি।
গঙ্গার তিমির বক্ষে উড়িতেছে ক্ষুদ্রপক্ষে
সন্ধ্যানিল-সেবী-বাবুপূর্ণ পোতগুলি, দেখা যায় শুনা যায় ঐ সঙ্গীত কাকুলী।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

যোগ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

[প্রায়োপবেশন।]

পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে এই ক্ষণ প্রায়োপবেশনের অবশিষ্ট লেখা যাইতেছে। প্রায়োপবেশন-বিধি সাধারণ বিধির অন্তর্গত নহে। এটি বিশেষ বিধির অন্তর্ভূত। প্রায়োপবেশন বানপ্রস্থাশ্রমীদিগেরই শেষ কার্য্য। তথাপি গৃহস্থাশ্রমীরা যখন প্রায়োপবেশন যোগাবলম্বন করত কলেবর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইবেন, তখন তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বন করিতে হইলে যে সকল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, তাহা সম্পাদন করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বন করত প্রথমে আশ্রমোচিত ক্রিয়া করিবেন। তৎপর যখন ব্যাধি বা বার্দ্ধক্য বশতঃ আশ্রমোচিত ক্রিয়াসম্পাদনে এবং আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানাভ্যাসে অক্ষম হইবেন, তখন প্রায়োপবেশনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া যে যে ক্রিয়া করিবেন, তাহা নিম্নে লেখা যাইতেছে।

প্রথমতঃ যোগী আপন আত্মাতে জ্ঞানাগ্নি সমারোপণ করিয়া আমিও আমার এই জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া নিজ ভৌতিক দেহকে আকাশাদিতে যথাযথ বিলীন করিবেন।

পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহকে পঞ্চ মহাভূতে যে প্রকারে বিলীন করিবেন তাহার ক্রম।—শরীরস্থ ছিদ্রগুলিকে আকাশে, নিঃশ্বাসকে বায়ুতে, উষ্মাকে তেজে, রক্ত ও শ্লেষ্মা ও শুক্রকে জলে এবং অবশিষ্ট অস্থি-মাংসাদি কঠিন পদার্থগুলিকে পৃথিবীতে বিলীন করিবেন। তৎপর বক্তব্যের সহিত বাক্যকে অগ্নিতে, শিল্পের সহিত দুই হস্তকে ইন্দ্রদেবে, গতির সহিত দুই পাদকে বিষ্ণুতে, রতির সহিত উপস্থকে প্রজাপতিতে, মল-ত্যাগের সহিত পায়ুকে মৃত্যুতে, শব্দের সহিত শ্রোত্রকে সর্ব্বদিকে, স্পর্শের সহিত ত্বককে বায়ুতে, রূপের সহিত চক্ষুকে সূর্য্যে, প্রচেতার সহিত রসনেন্দ্রিয়কে জলে, গন্ধের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পৃথিবীতে, মনোরথের সহিত মনকে চন্দ্রে, বোধের সহিত বুদ্ধিকে পরব্রহ্মে, অহঙ্কারের সহিত কর্ম্ম সকলকে রুদ্রদেবে, চেতনার সহিত চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে, ভোক্তৃত্বাদি বিকার-বিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে সত্ব রজঃ তমো-গুণের সহিত নির্ব্বিকার ব্রহ্মে—যাহার যে প্রকারে উৎপত্তি, তাহাকে তদনুসারে বিলীন করিবেন। এইরূপ পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে প্রধানতত্ত্বে, প্রধানতত্ত্বকে পরমাত্মাতে, বিলীন করিলেই সকল তত্ত্বের শেষ হয়।

এইরূপে উপাধি সকলের লয় হইলে পর, শেষে যে বিজ্ঞানময় পরমাত্মা থাকিবেন, তাঁহাকে অক্ষয়-স্বরূপ জ্ঞান করত দ্বৈতজ্ঞান-শূন্য হইয়া——আমি, তুমি ইত্যাকার জ্ঞান-বিরহিত হইয়া (কাষ্ঠ দগ্ধ হইলে নির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায়) নির্ব্বাণপদ লাভ করিবেন। ইহার পর আর স্বীয় শরীর আছে কি না, সে জ্ঞান থাকিবে না। এরূপ হইলে আর আহারাদির কোন প্রয়োজন থাকিবে না। ক্রমে ২১ এক-বিংশতি দিবসের মধ্যে অনাহারে যোগীর দেহ আপনাপনি পতন হইবে। ঐ পতিত শরীর দাহাদি না করিয়া জলমগ্ন করা বিহিত। যখন প্রয়োপবেশন-যোগ-প্রভাবে যোগী স্বীয় পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিবেন, তখন যোগীর পর-ব্রহ্মে সমর্পিত আত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ রূপ ধারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থ নারায়ণে প্রবেশ করিবে। *

প্রায়োপবেশন-যোগ, অপরাপর যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য যোগে যেমন যোগাঙ্গ-সাধনার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, ইহাতে প্রাণায়াম ব্যতীত আর কিছুরই আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যে সে ব্যক্তি এ যোগ-সাধনায় অধিকারী হইতে পারে না। যাঁহাদিগের প্রকৃতি সত্ত্ব-গুণাবলম্বিনী, যাঁহারা অকপট ভগবদ্ভক্ত-সংসারে বিগত-স্পৃহ, তাঁহারাই উক্ত যোগের প্রকৃত অধিকারী।

* শ্রীমদ্ভাগবতের ২ স্কন্ধ, ১২ অধ্যায়।

বোধোপায়।

যেমন এই স্থূল দেহে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থা ঘটে, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, সমাধি-দশাদিও তদ্রূপ উপস্থিত হয়। যথা,—

ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতং।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাম দ্বারা রূপরসগন্ধ-স্পর্শশব্দাদি বোধ হওয়ার নাম জাগ্রদবস্থা। মনুষ্যের যখন নিদ্রা হয়, তখন ইন্দ্রিয়-কার্য্য-সকল রহিত হওয়ায় জীব জাগ্রদ-বস্থাতে ইন্দ্রিয় সকলদ্বারা যে সকল বিষয় উপভোগ করাতে যে দৃঢ়রূপ সংস্কার জন্মে, সেই সংস্কার বশতঃ নিদ্রাবস্থাতে ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতীত যে যে বিষয় উপভোগ করেন, তাহাকে স্বপ্ন বলা যায়। প্রমাণ ঃ—

জাগরিতঃ সংস্কারজন্যঃ সবিষয়ঃ প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ॥ ইহা শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্ম-বিবেকের মত। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে শুকদেব ঋষি-স্বপ্নের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন যে, নিদ্রিত পুরুষ নিজ মায়া-সহকারে মনে মনে কেবল স্বপ্নে বস্তু সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করত বিহার করেন; পরমাত্মা নিজ মায়া দ্বারা জগৎ সৃজন করিয়া সেই জগতের মধ্যে নিজে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করেন, সেইরূপ স্বাপ্নিক ব্যাপার।

ইন্দ্রিয়বর্গের সাহায্য ভিন্ন নিরব-চ্ছিন্ন চৈতন্য দ্বারা চিহ্নিত বিষয় জীবের উপলব্ধি নয়। যেহেতু, ঐ সময়

মূর্চ্ছা-প্রভাবে শরীরস্থ প্রাণবায়ু হৃদ্‌যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সুষুম্না নামক শ্রেষ্ঠ ধমনীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চৈতন্য দেবকে লইয়া মস্তকে অবস্থিতি করিলে মূর্চ্ছাগত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাম মরুভূমির ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং উহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। কারণ, এ অবস্থায় চৈতন্যদেব ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিত্যাগ এবং স্থির ভাব অবলম্বন করেন। এবং শরীরস্থ রক্তের সহিত চৈতন্যদেবের সংস্রব থাকে না। মূর্চ্ছার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বলা হইল। অতঃপর সমাধিতে যে বোধ জন্মে, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লেখা যাইতেছে। যখন যোগী সকল পবনাভ্যাস-যোগে কৃতকার্য্য হইয়া যোনিমুদ্রা বন্ধন করিয়া হৃদয়স্থ প্রাণবায়ুর সহিত সর্ব্ব শরীরস্থ চৈতন্য-দেবকে স্তম্ভিত করত সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে পূরিত করিয়া ভ্রূদ্বয়-মধ্যে কিম্বা ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন পূর্ব্বক পরমাত্মা চিন্তা করেন, তখনি সমাধি অবস্থা ঘটে। এ অবস্থায় কোন কোন যোগী খেচরী মুদ্রাও বন্ধন করেন। যাঁহারা খেচরী মুদ্রাবন্ধন করিয়া সমাধি অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের দেহ কেবল শত-ব্রহ্মা-পতন পর্য্যন্ত সাক্ষীস্বরূপ থাকিতে পারে। তিনি ইচ্ছা না করিলে, তাঁহার দেহ-পতন হয় না। খেচরী-মুদ্রার বিষয় পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। অতঃপর জ্ঞানা-ভিসন্ধি যোগভ্রংশ-নিবারক শরীরস্থ চতুর্দ্দশ নাড়ীর ষট্‌চক্রের বিষয় এখানে লেখা যাইতেছে। ইহা তন্ত্রশাস্ত্রে প্রাঞ্জলরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা যোগীদিগের একান্ত জ্ঞাতব্য। সুধী পাঠক-বৃন্দ স্থিরচিত্তে নিরালস্য হইয়া পাঠ করিলে, ইহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিবেন। বিশ্বাস আর মন স্থির না হইলে এ আধ্যাত্মিক বিষয়ের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না। যোগ-সাধনায় কেবল স্থৈর্য্য আর প্রত্যয় এই দুইটী অপেক্ষা করে। যে চতুর্দ্দশ নাড়ীর কথা বলা হইয়াছে, তাহা দিগের স্থূল বৃত্তান্ত এই শরীরের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সার্দ্ধলক্ষত্রয় নাড়ী আছে; তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ীই প্রধান বলিয়া তাহাদিগের নাম ও তাহাদিগের স্থান ও ক্রিয়ার বিষয় লেখা যাইতেছে।

সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ
গান্ধারী-হস্তীজিহ্বিকা।
কুহূ-সরস্বতী-পূষা
শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী।
বারণ্যলম্বুষাচৈব
বিশ্বোদরী যশস্বিনী।
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ
পিঙ্গলেড়া সুষুম্নিকা॥

সুষুম্না, ঈড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তীজিহ্বিকা, কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী—এই কয়েকটী নাড়ী, ইহার অন্যান্য নাড়ী হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না অত্যন্ত প্রধানা। এই প্রধানতমা নাড়ী-ত্রয় ব্যতীত যে একাদশ প্রধান

ধমনীর বিষয় বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারা যে যে স্থানে থাকিয়া কার্য্য করে, তাহা লেখা যাইতেছে। যথা—

অন্যা যাস্থাপরা নাড়ী
মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ।
রসনা-মেঢ্রবৃষণ-
পাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ শ্রোত্রকং॥
কুক্ষি-কক্ষাঙ্গুষ্ঠকর্ণং
সর্ব্বাঙ্গ-পায়ু-কুক্ষিকং।
লব্ধাতা বৈ নিবর্ত্তন্তে
যথাদেশসমুদ্ভবাঃ॥

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ভিন্ন অপর যে প্রধানা একাদশ নাড়ী মূলাধার হইতে সম্যক প্রকারে উত্থিত হইয়াছে, তাহারা সমুদয় শরীরের এক এক অঙ্গ পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়া আপন আপন কার্য্য করিতেছে।

গান্ধারী নাম্নী নাড়ী মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া জিহ্বা পর্য্যন্ত গিয়া রসাস্বাদন করাইতেছে। এইরূপ হস্তী জিহ্বিকা শিশ্নে গিয়া শিশ্নের কার্য্য সম্পাদন করাইতেছে। কুহু নাড়ী চক্ষুতে গিয়া চক্ষুর কার্য্য করাইতেছে। সরস্বতী নাড়ী কর্ণে গিয়া কর্ণের; পুষানাড়ী পদাঙ্গুষ্ঠে গিয়া পদাঙ্গুষ্ঠের; শঙ্খিনী নাড়ী কুক্ষি পর্য্যন্ত গিয়া কুক্ষির; পয়স্বিনী নাড়ী কক্ষদেশে গিয়া কক্ষের; বারুণী নাড়ী বৃষণ পর্য্যন্ত গিয়া বৃষণের; অলম্বুষা নাড়ী হস্তাঙ্গুষ্ঠে গিয়া হস্তাঙ্গুষ্ঠের; বিশ্বোদরী নাড়ী নাসিকায় গিয়া নাসিকায় ও যশস্বিনী নাড়ী শরীরের অন্যান্য স্থানে গিয়া সেই সেই স্থানের কার্য্য সম্পাদন করাইতেছে।

এতাভ্য এব নাড়ীভ্যঃ
শাখোপশাখতঃ ক্রমাৎ।
সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং জাতং
যথাভাগব্যবস্থিতং॥

ঐ একাদশ প্রধানা নাড়ী হইতে শাখা উপশাখায় ক্রমশঃ সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া কার্য্য করিতেছে। এই সকল গুলিই রক্তবাহিনী নাড়ী। অতঃপর প্রধানতম যে নাড়ীত্রয় আছে, তাহাদিগের বৃত্তান্ত লেখা যাইতেছে। তাহাদিগের প্রভাবে যোগী সকল যোগসিদ্ধ হইতেছেন। ঐ নাড়ীত্রয়ের বিষয় লিখিবার অগ্রে মূলাধারের বিষয় লেখা আবশ্যক। মূলাধার তাবৎ নাড়ীর আধার এবং কুলকুণ্ডলিনীর বিশ্রাম-স্থান।

মূলাধার গুহ্যদ্বার হইতে দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধ আর লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলী অধঃ, সর্ব্বসমেত চারি অঙ্গুলী পরিমিত যে স্থান, তাহাকে মূলাধার বলা যায়। যথা—

গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং
মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
চতুরঙ্গুলবিস্তার-
মাধারং বর্ত্ততে সমং॥

এই মূলাধার প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পের ন্যায়। মূলাধার-পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে অতি শোভান্বিত ত্রিকোণাকৃতি যোনিমণ্ডল বিদ্যমান আছে। এই যোনি-

মণ্ডলের মহিমা সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রে গোপনীয়। যথা—

তস্মিন্নাধারপাথোজে
কর্ণিকায়াং সুশোভনা।
ত্রিকোণা বর্ত্ততে যোনিঃ
সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥

এই যোনিমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুল্লতাকারা সর্পাকৃতি পরদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি সার্দ্ধত্রিবৃত্তা হইয়া অর্থাৎ ঐ স্থানস্থ স্বয়ম্ভু-লিঙ্গরূপী শবে আত্ম-শরীর সাড়ে তিন বেষ্টন দিয়া সুষুম্না নাড়ীর ছিদ্রের মধ্যে মুখ রাখিয়া অবস্থান করিতেছেন। যথা—

অত্র বিদ্যুল্লতাকারা, কুণ্ডলী পরদেবতা।
সার্দ্ধত্রিবৃত্ত্যা কুটিলা, সুষুম্নামার্গসংস্থিতা॥

তন্ত্রান্তরে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-বেষ্টনের বিষয় বলা হইয়াছে। গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে তাহা এ স্থলে লেখা গেল না।

জগজ্জননী কুণ্ডলিনী হইতে এই স্থূল আর সূক্ষ্ম উভয় জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে বলিয়া, কুণ্ডলিনীই জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন, এরূপ অনুভব হয়। কুণ্ডলিনীই সৃষ্টিরূপা বাগ্‌দেবতা; অথচ বাক্যের অগোচর বৈষ্ণবী মায়া, সর্ব্বদেব-নমস্যা। যোগিগণ পরমাদরে সমাধির পূর্ব্বে এই কুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিয়া কুণ্ডলিনী-সাক্ষাৎকার হইলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

কুণ্ডলিনীকে বাগ্দেবতা বলার হেতু এই যে, মূলাধারে সুষুম্না নামে যে নাড়ী আছে, সেই নাড়ীমূলে কুণ্ডলিনীর আস্য দেশ আছে। সেই আস্য দ্বারা উক্ত নাড়ীর মূলে আঘাত করিলে, ব্যক্ত বর্ণ সকল উৎপন্ন হয়। বর্ণ নির্গত হইলে, শব্দ উৎপন্ন হয়। সেই শব্দ হইতে পদ ও পদ হইতে বাক্য উৎপন্ন হয়। এতাবতা বাক্যের মূল কারণ বাগ্দেবী কুণ্ডলিনী বৈ আর কেহই নাই। প্রমাণ—

জগৎসংসৃষ্টিরূপা সা,
নির্ম্মাণে সততোদ্যতা।
বাচাম বাচ্য বাগ্দেবীং
সদা দেবৈর্নমস্কৃতাং॥

তন্ত্রসার।

সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে অব্যক্ত বর্ণ সকল নিহত আছে। তজ্জন্য কুণ্ডলিনীর আঘাতে ব্যক্ত বর্ণ সকল উৎপন্ন হয় এই সাদৃষ্টি কন্যায়ানুসারে বীণাযন্ত্র হইতে নানাবিধ শব্দ উৎপন্ন হইতেছে। বীণাযন্ত্রে যেমন মূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তার সংলগ্ন থাকায় সেই তারে মের্জ্জাপের আঘাত পাইলে ব্যক্ত শব্দ উৎপন্ন হয়——বীণাযন্ত্রস্থ তারের মধ্যে যেমন অব্যক্ত শব্দ নিহত থাকায় বীণার তার ব্যক্ত শব্দ প্রকাশ করে, সেইরূপ শরীরের মধ্যে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া ইড়া-পিঙ্গলা, সুষুম্না নামক নাড়ী, ত্রয় আছে। সেই নাড়ী সকলের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীতে অব্যক্ত শব্দ সকল বিদ্যমান থাকায় এবং কুণ্ডলিনী তাহাতে আঘাত করেন বলিয়া ব্যক্ত বর্ণ সকল উৎপন্ন হয়। সংগীত-তরঙ্গিণী কিম্বা শিব-সংহিতা দেখ।

এক্ষণে অতি প্রধানা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে যে নাড়ীত্রয় আছে তাহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। ইহা যোগীদিগের একান্ত ধ্যেয়।

ইড়া নাম্নী তু যা নাড়ী,
বাম মার্গে ব্যবস্থিতা।
সুষুম্নায়াং সমাশ্লিষ্ট-
দক্ষনাসাপুটং গতা॥

মূলাধার হইতে মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া যে অতি প্রধানা তিন নাড়ী উত্থিত হইয়া নাসারন্ধ্র দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার মধ্যে ইড়া নামে যে নাড়ী আছে, সেই নাড়ী মেরুদণ্ডের বাম ভাগ দিয়া সুষুম্না নাড়ীকে মধ্য ভাগে রাখিয়া এবং সুষুম্না নাড়ীকে স্পর্শ করত দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে গমন করিয়াছে।

পিঙ্গলা নাম যা নাড়ী,
দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।
মধ্য-নাড়ীং সমাশ্লিষ্ট,
বামনাসাপুটং গতা॥

মেরুদণ্ডের মধ্য স্থানে যে সুষুম্না নাড়ী আছে, সেই নাড়ীর দক্ষিণ দিকে পিঙ্গলা নাড়ী, মধ্য নাড়ীকে বেষ্টন করিয়া বামনাসাপুটে গমন করিয়া বায়ু বহন করিতেছে। ইড়াও এইরূপ দেহের কার্য্য-সাধন করিতেছে।

ইড়া-পিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে
সুষুম্না যা ভবেৎ খলু।
ষট্ স্থানেষু চ ষট্ শক্তিং
ষট্ পদ্মং যোগিনো বিদুঃ॥

ইড়া আর পিঙ্গলার ঠিক মধ্য স্থানে যে নাড়ী আছে, তাহার নাম সুষুম্না নাড়ী। সেই নাড়ীর ছয় স্থানে ছয়টী গ্রন্থি আছে। ঐ গ্রন্থিগুলি পদ্মাকারে নির্ম্মিত; এজন্য যোগী সকল উহা নিয়ত ধ্যান করেন। ই এই সকল পদ্ম যোগী বৈ অন্যে দেখিতে পান না। উহা আধ্যাত্মিক পদার্থের অন্তর্গত। ঐ সকল পদ্মের বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে লেখা যাইতেছে।

যে সকল নাড়ীর কথা লেখা গেল, উহারা সকলেই বায়ুসঞ্চারকারক ও রক্তবাহক; এ প্রযুক্ত শরীরের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে আছে। ধৌতি যোগ দ্বারা নাড়ী সকলকে পরিষ্কার করিতে হয়। নাড়ী পরিষ্কৃত হইলে পবনাভ্যাসের সুবিধা হয়। পবনাভ্যাস-যোগ সিদ্ধ হইলে, তাবৎ যোগ সিদ্ধ হইতে পারে হঠ-যোগ-প্রকরণে ধৌতি-যোগের বিষয় বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে। পবনাভ্যাসের ক্রম পূর্ব্বে সংক্ষেপে লেখা গিয়াছে। এক্ষণে যে জঠরানল-প্রভাবে দেহী সর্ব্বসুখ লাভ করে, সেই জঠরাগ্নির বিষয় লেখা আবশ্যক; সুতরাং তাহা লিখিতেছি। জননী যেমন গর্ভস্থ সন্তান পরিপোষণ করেন, তদ্রূপ জঠরাগ্নি, শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া শরীরকে পোষণ ও বর্দ্ধন করেন। জঠরাগ্নির ব্যত্যয় হইলে শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হইয়া পড়ে। মহাদেবের অংশ বৈশ্বানর নামক যে অগ্নি আছে, সেই বৈশ্বানর অগ্নির অংশ জঠরাগ্নি। বৈশ্বনরাগ্নি সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থ

ও সূর্য্যমণ্ডলের দ্বাদশকলা-সংযুক্ত। ইনি শরীরের মধ্যে বস্তিদেশে অর্থাৎ নাভিতে থাকিয়া সকল প্রকার ভুক্তান্ন পরিপাক করেন। ভুক্তান্ন পরিপাক হইলে রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আয়ুর্ব্বেদে প্রমাণ আছে—

সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থঃ
কলা-দ্বাদশ-সংযুতঃ।
বস্তিদেশে জলদ্বহ্নি-
র্ব্বর্ত্ততে চান্নপাচকঃ।
বৈশ্বানরাগ্নি বৈধায়
সমতেজোংশ-সম্ভবঃ।
করোমি বিধিবৎ পাকং
প্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ॥
আয়ুপ্রদায়কো বহ্নি
র্বলং পুষ্টিং দদাতি স।
শরীরপাটবঞ্চাসি
ধ্বস্ত-রোগ-সমুদ্ভবঃ॥

যদি জঠরাগ্নি, জঠরে অবিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, তবে আয়ুঃপ্রদান বল-পুষ্টি ও দেহের পটুতা দান করত জাত রোগ সকল নষ্ট করেন।

তস্মাদ্বৈশ্বানরাগ্নিঞ্চ
প্রজ্বাল্য বিধিবৎ সুধীঃ।
তস্মিন্নন্নং হুনেৎ যোগী
প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া॥

উক্ত কারণ বশতঃ উত্তম বুদ্ধিমান্ যোগী গুরু-উপদেশক্রমে যথাবিধানে জঠরাগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া কুণ্ডলিনীর মুখে প্রতিদিন হোম করিবেন। এই প্রকারে আহার করিলে যোগীর শরীরে ও অন্তঃকরণাদিতে কোন দোষ জন্মিতে পারে না। গুরু-উপদেশার্থ কুণ্ডলিনীর জাগ্রদবস্থায় যথাবিধানে যোগীদিগের আহারের যেরূপ বিধি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; তদনুসারে যে যে সময় কুণ্ডলিনী জাগ্রৎ ও নিদ্রিত থাকেন, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অতঃপর শরীরস্থ জীবাত্মার সুখ-দুঃখ-ভোগের কারণ বলা যাইতেছে :—

ইত্থং প্রকল্পিতে দেহে
জীবো বসতি সর্ব্বগঃ।
অনাদিবাসনামালা-
লঙ্কৃতঃ কর্ম্মশৃঙ্খলঃ॥

এইপ্রকার অর্থাৎ মায়োপাধিক পঞ্চভূত-বিনির্ম্মিত কলেবরে সর্ব্বগতজীব বসতি করেন। যে বাসনার মূল নাই, সেই বাসনা-মালা-সমূহে ভূষিত হইয়া জীব কর্ম্ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছেন।

নানাবিধগুণোপেতঃ
সর্ব্বব্যাপারকারকঃ।
পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি
ভুনক্তি বিবিধানি চ॥

সর্ব্বব্যাপারকারী বহুবিধ গুণে ভূষিত জীব, ভৌতিক শরীরে বাস করিয়া পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মফল সকল ইহ জন্মে ভোগ করিতে থাকেন।

যদ্যৎ সংদৃশ্যতে লোকে
সর্ব্বং তৎ কর্ম্মসম্ভবং।
সর্ব্বান্ কর্ম্মানুসারেণ
জন্তুর্ভোগান্ ভুনক্তি বৈ॥

ইহ জন্মে শরীরী জীবকে কখন সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করিতে যে দেখা যায়, সে কেবল জন্ম-জন্মান্তরীণ সদসৎকর্ম্মের ফল। সকাম কর্ম্মই সুখ-দুঃখের কারণ।

তৎ কর্ম্মেব কেন ভবতি ?

রাগাদিভ্যঃ।

ঐ কর্ম্ম জীব কাহা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল যে, রূপাদি হইতে অর্থাৎ বাসনাদি হইতে জীব কর্ম্ম সফল প্রাপ্ত হইয়াছে।

অজ্ঞানাদ্রাগাদির্ভবতি।

অজ্ঞানতায় রাগাদি জন্মে।

অজ্ঞানং কেন ভবতি ?

জগৎ প্রসবিনী-মায়য়া।

জগৎ প্রসবিনী মায়াতে অজ্ঞান অর্থাৎ ভ্রম জন্মে। সেই মায়া পরমাত্মার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি। আব্রহ্ম স্তম্ভ-পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ এক পরমাত্মার শরীর। ঐ মায়াতে ঐ আত্মীয় দেহকে জগদাকারে পরিদৃশ্যমান হইতেছে।

সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।

যেমন তুষারমণ্ডিত কোন পর্ব্বতে বাল-সূর্য্য কিরণ পতিত হইলে দূর হইতে সেই পর্ব্বতের কোন স্থান স্বর্ণবর্ণ, কোন স্থান নীলবর্ণ, কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান পীতবর্ণ, কোন স্থান শুক্লবর্ণ, কোন স্থান হরিদ্বর্ণ, কোন স্থান ধূম্রবর্ণ, ও কোন স্থান পাটলবর্ণ দেখা যায়— সেইরূপ পরমাত্মাকে মায়া দ্বারা জগদাকারে পরিণত করায় পরমাত্মাকে স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে না।

মায়োপহিত-চৈতন্যাৎ
সর্ব্বং বস্তু প্রজায়তে।

পরমাত্মা মায়াতে স্পর্শিত হইলে সকল প্রকার বস্তু জন্মে। ইহার ভাব এই— মায়া যখন পরমাত্মাকে স্পর্শ করেন, তখনি পরমাত্মার স্বরূপ জগদাকারে বিমিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় পরমাত্মার স্বরূপ অপ্রত্যক্ষ হইয়া যায়। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ যোগীরা মায়িক জগৎকে পরমাত্মার ন্যায় আনন্দময় ও চিন্ময় সন্দর্শন করেন।

যথাকালোপভোগায়
জন্তূনাং বিবিধোদ্ভবঃ।
যথা দোষবশাচ্ছুক্তৌ
রজতারোপণং ভবেৎ।
তথা স্বকর্ম্ম-দোষাদ্বৈ
ব্রহ্মণ্যারোপ্যতে জগৎ॥

যেমন এক পরমাত্মা মায়া-প্রভাবে নানাপ্রকার জন্তু হইয়াছেন, তেমনি আবার তিনিই ঐ সকল জন্তুদিগের যথাকালে উপভোগ করিবার জন্য নানা-প্রকার দ্রব্য হইয়াছেন। যেমন ভ্রমাধীন মনুষ্য ঝিনুককে রূপা বোধ করে।

সেইরূপ মানবগণ আপন আপন কর্ম্মদোষে পরমাত্মাতে পৃথক্‌রূপ জ্ঞান করেন। আপন কর্ম্ম-দোষার্থ বাসনা-বিরহিত হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া। বাসনা শূন্য হইয়া আত্মতত্ত্ব

জ্ঞানলাভ করা সকলের পক্ষে ঘটে না। যেহেতু, মনুষ্যমাত্রের একই প্রকার প্রকৃতি, জন্মে না। কাহার বা সাত্ত্বিকী, প্রকৃতি কাহার বা রাজসিক প্রকৃতি কাহার বা তামসিক প্রকৃতি। এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির কারণ, মনুষ্যের পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম। এজন্য অধিকাংশ লোক রজঃ ও তমোগুণাবলম্বী হয়। এরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বহু কষ্টে ও বহু বিলম্বে চেষ্টা করিলে আশবিরহিত হইয়া আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন; ইহা ভগবানের নিতান্ত অনুগ্রহ বলিতে হইবে। যোগ-ক্রিয়া কেবল ভক্তিমার্গ। যোগ ব্যতীত শত্রুতা, মিত্রতা ও বাৎসল্য এই কএক ভাবেও ভগবানকে লাভ করা যায়। ইহা পুরাণ-প্রণেতার দিগের মত। বস্তুতঃ ভক্তি আর জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যত দিনে জীবের বাসনা নিবৃত্তি না হইবে, তত দিন সমস্ত ভ্রম বিদ্যমান থাকিবে। বাসনারূপ রাজা হইতে জীব যখন নির্ব্বাসিত হইবেন, তখনই ভ্রমশূন্য হইয়া অদ্বৈত পরমাত্মা-সন্দর্শন করিতে ক্ষমবান্ হইবেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে পরমাত্মার স্বরূপ রূপের সাক্ষাৎ-কার জ্ঞান হইতে পারে না। অপরঞ্চ—

সাক্ষাদ্বিশেষ-দৃষ্টিস্তু
সাক্ষাৎ-কারিণি বিভ্রমে।
কারণং নান্যথা যুক্তা
সত্যং সত্যং ময়োদিতং॥

ভগবতীর প্রশ্নানুসারে মহাদেব বলিতেছেন:—এক পরমাত্মাতে জগৎ বলিয়া ভ্রম জন্মে কাহার? যে বহুবিধ বাসনাতে চিত্তকে মলিন করিতেছে। তাহারই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করায় মনোমধ্যে সেই ইন্দ্রিয় চরিতার্থ-কারক বিষয় গুলিকে দেখিতেই পায়; তদ্ভিন্ন অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক পদার্থকে দেখিতে পায় না। ইহা মহাভ্রমের কার্য্য বৈ অন্য কিছুই নহে। ইহা আমি তোমাকে সত্যই বলিলাম।

সাক্ষাৎ-কার-ভ্রমং সাক্ষাৎ
সাক্ষাৎ-কারিণি নাশয়েৎ।
সোহিনাস্তীতি সংসারে
ভ্রমোনৈব নিবর্ত্ততে॥

বিশেষ দর্শক পরমাত্মা সাক্ষাৎকারী যোগীদিগের নিকটে জগৎ বলিয়া যে দ্বৈতজ্ঞান, তাহা নষ্ট হয়। সেই বিশেষ দর্শন অর্থাৎ পরমাত্মা-সাক্ষাৎকার-জ্ঞান যোগীদিগের যত দিন না ঘটিবে, তত দিন জগৎ-জ্ঞান-নিবারণ হইবে না। বিশেষ দর্শন হইলেই অর্থাৎ সত্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেই মিথ্যাজ্ঞান নাশ পায়; এতদ্ভিন্ন তাহা নাশ পায় না। যেমন কোন ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ ঝিনুককে রূপা বলিয়া বোধ করে; কিন্তু শুক্তি-জ্ঞান হইলে, রজত জ্ঞান থাকে না। এই হেতু সংসার-জ্ঞান নাশার্থ বাসনা পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্তিস্তু
বিশেষ দর্শনাদ্ভবেৎ।

অন্যথা ন নিবৃত্তিস্যা-
দৃশ্যাতে রজতভ্রমঃ ॥
যাবন্নোৎপদ্যতে জ্ঞানং
সাক্ষাৎকারে নিরঞ্জনে।
তাবৎ সর্ব্বাণি ভূতানি
দৃশ্যন্তে বিবিধানি চ ॥

যে অবধি নিরঞ্জন পরমাত্মার সাক্ষাৎকার জ্ঞান না হইবে, সে পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার স্থাবর, অস্থাবর ও জীবজন্তু দেখিতে থাকিবেন।

যদা কর্ম্মার্জ্জিতং দেহং
নির্ব্বাণে সাধনং ভবেৎ।
তদা শরীর-বহনং
সফলং স্যান্ন চান্যথা ॥

যে পর্য্যন্ত কর্ম্মসম্ভব দেহ নির্ব্বাণপদ-প্রদ পরমাত্মার সাধনা করিতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত শরীর-বহনের সার্থকতা হইবে। নচেৎ কেবল ভার বহন করা হইবে।

যাদৃশী বাসনা মূলা
বর্ত্ততে জীবসঙ্গিনী।
তাদৃশং বহতে জন্তুঃ
কৃত্যা কৃত্যবিধৌ ভ্রমং ॥

জীবের সঙ্গিনী মূলা বাসনা জীবকে যেরূপ ভ্রম বহন করাইবেন, জীব তদনুসারে কার্য্যাকার্য্য-ভ্রম বহন করিবে।

আত্মানমাত্মনা পশ্যন্
কিঞ্চিদিহ পশ্যতি।
তদা কর্ম্মপরিত্যাগে
ন দোষোস্তি মতং মম ॥

যোগী যে সময় নিজ আত্মাতে পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিতে ক্ষমবান্ হইবেন—অন্য কিছুই দেখিতে পাইবেন না, তখন তিনি বৈধাবৈধ কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিলে, কোন প্রকার পাপগ্রস্ত হইবেন না, ইহাও আমার মত।

বিষয়াসক্ত-পুরুষা
বিষয়েষু সুখেপ্সবঃ।
বাচাভী রুদ্ধনির্ব্বাণা-
ছর্ত্তন্তে পাপকর্ম্মণি ॥

শিবসংহিতা।

যে সকল পুরুষ নিতান্তই বিষয়ে লিপ্ত, আর বিষয়কর্ম্মেই সুখেচ্ছা করেন, তাঁহারাই নির্ব্বাণ-পথকে বাক্যে অবরুদ্ধ করত অর্থাৎ বাচনিক-ফল-কামনা করিয়া, পাপ কর্ম্মকে ভয় করেন না। আন্তরিক ও বাচনিক উভয় ফল কামনাই যোগভ্রংশের কারণ। এজন্য রজোযোগসাধক যোগীরা ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, যোগ সাধনা করেন। ফলকামনার অর্থ, স্বর্গাদিভোগ-বাসনা।

কামাদয়ো বিলীয়ন্তে
জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
অভাবে সর্ব্বতত্ত্বানাং
মম তত্ত্বং প্রকাশতে ॥

শিবসংহিতা।

যোগীর যখন আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানলাভ হয়, তখন কামাদি সমস্ত লয় পায়, ইহার অন্যথা হয় না। মনে যখন বাহ্য বিষয় সকল বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন কেবল আত্মতত্ত্বই প্রকাশ পাইতে থাকে।

বায়ুর বিষয়।

পূর্ব্বে শরীরস্থ বায়ুর বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে অতি প্রধানতম প্রাণাপান নামক বায়ুদ্বয়ের বিষয় বিশেষ রূপে লেখা হয় নাই। এক্ষণে সেই বায়ুদ্বয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত লেখা যাইতেছে। যথা—

হৃদ্যস্তি পঙ্কজং দিব্যং
দিব্যলিঙ্গেন ভূষিতং
কাদিঠান্তাক্ষরোপেতং
দ্বাদশার্ণবিভূষিতং ॥
প্রাণো বসতি তত্রৈব
বাসনাভিরলঙ্কৃতঃ।
অনাদি-কর্ম্মসংসৃষ্ট
প্রাপ্যাহঙ্কার-সংযুতঃ ॥
প্রাণস্য বৃত্তিভেদেন
নামানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে তানি সর্ব্বাণি
কথিতুং নৈব শক্যতে ॥
তত্রাপি বায়বঃ পঞ্চ
মুখ্যাঃ স্যু র্দশতঃ পুনঃ।
তত্রাপিশ্রেষ্ঠকর্ত্তারৌ
প্রাণাপানৌ ময়োদিতৌ ॥
শিবসংহিতা।

মানব-হৃদয়ে উত্তম-লিঙ্গ-শোভিত অপূর্ব্ব দ্বাদশ দলযুক্ত যে পদ্ম আছে, সেই পদ্মের দ্বাদশ দলে ক অবধি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ আছে।

সেই পদ্মে নানা-বাসনাযুক্ত প্রাণবায়ু বাস করেন। যে প্রাণবায়ু অনাদি কর্ম্মসংসর্গ-প্রাপ্ত-অহঙ্কার-বিশিষ্ট। এতাদৃশ প্রাণবায়ুর বৃত্তি অর্থাৎ কার্য্য-ভেদে নানাপ্রকার নাম। সেই নানা-মত নামধারী বায়ু, মানব-দেহে অবস্থিতি করে। সেই সকল নাম বলা দুঃসাধ্য। তথাচ প্রধানতঃ গৌণ মুখ্য ভেদে যে দশ প্রকার বায়ু, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তা প্রাণাপান বায়ুর বিষয় শিববাক্যানুসারে লিখিত হইতেছে। বায়ু-যন্ত্র যথা— মানবহৃদয়ে দ্বাদশ-দল পদ্ম আছে। সেই দ্বাদশ দলে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই বিন্দুযুক্ত দ্বাদশ বর্ণ আছে। এই সকল বর্ণযুক্ত দলের মধ্য স্থলে কর্ণিকার। সেই কর্ণিকারের মধ্য স্থলে ত্রিকোণাকার পীঠ আছে। সেই পীঠ-মধ্যে যংকার নামক বায়ু যন্ত্র। সেই বায়ুযন্ত্রে প্রাণবায়ু বাস করেন। যোগী সকল এই প্রাণবায়ুকে বশীভূত করিয়া যোগ-সিদ্ধ হন। ইহাকে বশীভূত করিতে না পারিলে, যোগসিদ্ধ হইবার উপায় নাই। যেরূপে প্রাণবায়ুকে বশীভূত করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এক প্রাণবায়ুর কার্য্য এবং স্থান-ভেদে বহুতর নাম আছে। সে সকল নাম বর্ণন করা, এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তথাপি দশসংখ্যক প্রাণবায়ুর মধ্যে পঞ্চ প্রকার প্রাণবায়ু শ্রেষ্ঠ। ঐ পঞ্চ প্রকারের মধ্যে দুই প্রকার প্রাণবায়ু অতি শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ বায়ু-দ্বয়কে প্রাণাপান বায়ু বলে। তাহার

মধ্যে প্রাণ-বায়ুর বিষয় বলা হইল। এক্ষণে অপান বায়ুর বিষয় বলা যাইতেছে।

গুহ্যদেশে যে চতুর্দ্দল পদ্ম আছে, সেই পদ্ম বং শং ষং সং এই চারিটী বর্ণে সুশোভিত। সেই সুশোভন পদ্মের মধ্য স্থলে ত্রিকোণ যন্ত্র। সেই যন্ত্রের মধ্যে লিঙ্গ-বেষ্টিতা পরদেবতা কুণ্ডলিনী সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে মুখ রাখিয়া নিদ্রা যান। এই স্থানে অপান বায়ু বাস করিয়া শারীরিক কার্য্যবিধান করিতেছেন। এই স্থান যোগীদিগের নিতান্ত ধ্যেয়। এতাদৃশ অপান বায়ুকে যিনি সিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তিনি যোগসধনার ফললাভ করিতে সমর্থ।

ইতি বায়ু বিবরণ।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

কি শিখিলাম।

আমরা বিদেশীয় ইংরাজগণকে স্বদেশ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তদ্বিনিময়ে যাহা লাভ করিতেছি, তাহা অমূল্য ধন; তাহা এই স্বদেশের কোন স্থানে ছিল না বলিয়াই সেই স্বদেশকে বিসর্জ্জন দিয়াছি। দেশে যাহা যাহা থাকিলে দেশ রক্ষিত হয়, তাহার কিছুই ছিল না বলিয়াই ভারতবর্ষ বিদেশীয়-গণের করতলগত হইয়াছে। ইহা অবশ্য ঘটিবে; ইহা বিশ্বজনীন রাজনৈতিক নিয়ম। তবে আমাদের সৌভাগ্য এই আমরা মুষলমানগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ইংরাজগণের অধীনস্থ হইয়াছি। আজি ইংরাজগণ অল্প স্বার্থসিদ্ধির বিনিময়ে যে ধন বিতরণ করিতেছেন, সেই ধনে ভারতবর্ষ যবে ধনী হইবে, তখন ভারতের অদৃষ্ট ফিরিয়া যাইবে।—ভারত নবজীবনে চিরদিনের জন্য আবার জাগরিত হইয়া উঠিবে। মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা ইংরাজগণ ভারতের মৃতদেহে অল্পে অল্পে, চৈতন্য সঞ্চার করিতেছেন। অসাড় ভারত এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে। শত শত বর্ষ ধরিয়া ইংরাজগণ রাজত্ব করুক, ভারতে তাহাদিগের রাজত্ব দৃঢ়-প্রোথিত হউক, এই আমাদিগের আন্তরিক বাসনা, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

সুসভ্য রোম একদা অসভ্য ইয়োরোপে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে রোমের লাভ অতি অল্পই হইয়াছিল; বরং রোমের ধ্বংসের তাহাই অন্যতম কারণ। কিন্তু অসভ্য ইয়োরোপ রোমের কাছে যাহা লাভ করিয়াছিল, তাহারই জন্য ইয়োরোপ আজি দাঁড়াইয়া আছে; আজি ইয়োরোপ পৃথিবীর গৌরব ভূমি।—এক রোমের ধ্বংস হইয়াছে, ইয়োরোপে শত শত রোম উত্থিত হইয়াছে। রোম

ত বিধ্বস্ত হয় নাই, রোম স্থান ও মূর্ত্তি পরিবর্ত্ত করিয়া ইয়োরোপের প্রতি বিঘায় নবজীবনে সমুত্থিত হইয়াছে। আজি রোমজাতীয় প্লিবিয়নের ভাব *ইয়োরোপীয় সামান্য জনগণের হৃদয়গ্রন্থি;* পেট্রিসিয়ানের ভাব ইয়োরোপীয় উচ্চ বংশধরগণের গৌরব ও হৃদয়ের প্রধান সম্পত্তি। রোমের স্বদেশ ও স্বজাতি-অনুরাগ ইয়োরোপীয়গণের বিশেষ ধর্ম্ম ও বল। এই সমস্ত ভাব গ্রীশ রোমকে শিক্ষা দিয়াছে, রোম সমগ্র ইয়োরোপমণ্ডলে তাহা শিক্ষা দিয়াছে। শুধু শিক্ষা নয়, ইয়োরোপের অন্তরে অন্তরে তাহা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইয়োরোপ এই অগ্নিতে আজি এত তেজস্বী যে, সে তেজ সমস্ত পৃথিবীতেও ধারণা হয় না। সে অগ্নি সংক্রামক; তাহার উষ্ণতা ও তাপ ইয়োরোপীয়গণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীময় বিস্তার হইতেছে।

রোম রাজনৈতিক প্রভুত্ব হারাইয়া পতিত হইল, কিন্তু যে রোম একবার পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছে, সে রোম সহসা পতিত হইয়া থাকিবার নহে। রোম অন্যবিধ প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিল; পৃথিবীতে ধর্ম্ম-রাজ্য ও শাসন স্থাপন করিল। ইয়োরোপ রোমের নিকট নতশির হইয়া আবার প্রণাম করিল। প্রণত ইয়োরোপের শীর্ষদেশ রোম আবার পদদলিত করিল। রোম এই প্রভুত্বের গৌরবে উন্নত হইয়া উঠিল। উন্মত্ত ধর্ম্ম-রোমের শির টলিল। তাহার বুদ্ধি বিবেচনা রহিত হইল। রোম ইয়োরোপে যথেচ্ছা শাসন করিতে লাগিল। ধর্ম্ম-রোম জানিত না যে, তদীয় পূর্ব্বপুরুষ রাজনৈতিক রোম যে অগ্নি ইয়োরোপময় সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে ইয়োরোপ এত তেজস্বী ও পরিপুষ্ট হইয়াছে যে, তাহার পরাক্রম আজি প্রতিরোধ করিতে তাহার ক্ষমতা নাই। যেখানে ইয়োরোপ রোমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, রোম অমনি তথা হইতে পরাস্ত হইয়া পলাইয়া আসিল; জানিল, যে তেজ প্রাচীন রোম হারাইয়াছে, সেই তেজ আজি ইয়োরোপের বল ও দুর্গ। তাহার সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য?

ইয়োরোপ রোমের আইন ও ব্যবস্থা পাইয়াছিল; রোমের নিকট স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম শিক্ষা করিয়াছিল। রোমের ব্যবস্থায় ন্যায়, অন্যায়, প্রতি লোকের স্বত্ব ও অধিকার তন্ন তন্ন করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল। প্লিবিয়নদিগের যে তেজ ও স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ, তাহা সংক্রামিত হইয়া ইয়োরোপময় বিস্তারিত হইয়াছিল। সেই তেজ ও অনুরাগ ক্রমশঃ সামান্য জনগণের মধ্যে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। ইয়োরোপীয়গণ আপন আপন স্বত্ব ও অধিকার এত তন্ন তন্ন বুঝিত, স্বাধীনতার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ এত প্রবল

ছিল যে, তাহারা তাহাতেই চালিত হইয়া সকল অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবিরুদ্ধে দাঁড়াইত; একদা তাহারই বলে রোমের ধর্ম্ম-রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল—প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের সৃষ্টি করিল; এই ধর্ম্মের নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শত শত ধর্ম্ম-মঠ ধরাশায়ী করিল। হাজার হাজারউদাসীন লোক ধর্ম্ম মঠের অন্ধকার হইতে উন্মুক্ত হইয়া পার্থিব কার্য্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিল। ইহাতে ইয়োরোপের যে শুভফল ঘটিয়াছে, তাহা সমৃদ্ধ ইংলণ্ড অতি স্পষ্টরূপে পরিচয় দেয়। আজি ইংলণ্ডের জনগণ স্বদেশকে স্বর্গতুল্য করিয়াছে। তাহাদিগের পরিশ্রমবলে দেশ স্বর্ণময় হইয়াছে। ঐহিক সুখে ইংলণ্ড পরিপূর্ণ হইয়াছে।

ইংলণ্ড আজি ভারতের শিক্ষা গুরু! ইংলণ্ড ভারতকে যে বিদ্যা ও শিক্ষা দান করিতেছে, ভারত সে শিক্ষা কুত্রাপি পাইত না। সেই শিক্ষাভাবে ভারত পতিত ও পরাধীন হইয়াছে। মুষলমানগণ ভারতকে সে শিক্ষা দিতে পারে নাই, ভারতীয় ইতিহাসে, ভারতীয় সাহিত্যে সে শিক্ষা নাই। ইংরাজগণ যদি ভারতকে আপন বিদ্যাদান না করিত, আজি ভারত পূর্ব্বের ন্যায় অনভিজ্ঞ থাকিত। ইংরাজগণ হইতে আমরা এই চারিটি প্রধান ও নূতন ভাব লাভ করিয়াছি।

১। ঐহিক সুখের প্রতি অনুরাগ।
২। স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ।
৩। স্বদেশের প্রতি অনুরাগ।
৪। স্বজাতির প্রতি অনুরাগ।

১। শঙ্করাচার্য্যের ঔদাসীন্য বোধ হয় ভারতের যত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, এত দুঃকিছুতেই করে নাই। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ভারতীয় সকল ধর্ম্মের উপদেশ। সাংসারিক সুখ তুচ্ছ করিয়া পরমার্থ-চিন্তা ও অনুধাবন করাই ভারতের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মনীতি। এই ধর্ম্মনীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভারতবাসিগণ চিরকাল সংসার-কার্য্য ও ঐহিক সুখের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবাসিগণ চিরদিন ভাবিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীতে পৃথিবীর জন্য আসেন নাই, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য আসিয়াছেন। পৃথিবী উৎসন্ন যাউক, তাহাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি নাই, কিন্তু কিছুতেই ঈশ্বর-চিন্তায় না ব্যাঘাত ঘটে, এইমাত্র আবশ্যক। সংসার, সমাজ, স্বদেশ তাঁহাদিগের চিন্তায় কখন প্রবিষ্ট হয় নাই। তাঁহারা ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া চিরদিন লালায়িত হইয়াছেন। দেশের প্রতি চাহেন নাই, সমাজের প্রতি চাহেন নাই, এমত কি, আপনার শরীরের প্রতিও চাহেন নাই। আমি বলি না, সকল ভারতবাসীই বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। আমি এই বলিতে চাহি, যে ভারতবাসী সাধারণ-লোকের অনুরাগ বৈরাগ্যের দিকে যত ছিল, সংসারের প্রতি তত ছিল না। তাঁহারা সংসার

অপেক্ষা সংসারের প্রতি ঔদাসীন্যকে উচ্চতর জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদিগের মনের গতি ঔদাসীন্যের দিকে যত ধাবিত হইত, সংসারের দিকে তত ধাবিত হইত না। সাংসারিক সুখ অতি নীচ বিষয় বলিয়া তাহা অনুধাবনে তত যত্ন করিতেন না। সাংসারিক সুখ হয় হউক, না হয় নাই হউক, এই রূপ ভাবিয়া সংসারধর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা, তজ্জন্য অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করা তাঁহাদিগের মতে অতি হেয়জ্ঞান ছিল। যাহারা কেবল সংসার লইয়া ব্যস্ত তাঁহাদিগের মতে তাহারা অতি নীচ ও অপদার্থ লোক। ভারতীয় সভ্যতার প্রবণতা এই ছিল। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরানুরাগই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান চিহ্ন। ভারতীয় সভ্যতা সাংসারিক সুখে ব্যস্ত ছিল না। ব্রাহ্মণজাতি ভারতীয় সভ্যতার প্রধান জাতি। বৈশ্য ও ব্যবসায়ী জাতি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। পরিশ্রম, ব্যবসা, বাণিজ্যকে ভারতীয় সভ্যতা অতি হেয়জ্ঞান করিয়াছে। ইহা কখন অর্থের জন্য লোলুপ হয় নাই। রাজ্য, ধন, সম্পত্তি ইহার বিষয়ীভূত নহে। যে বিদ্যা ইহা আলোচনা করিয়াছে, তাহা পরমার্থবিদ্যা ও মোক্ষধর্ম্ম। ভারতের ইতিহাসে মোক্ষধর্ম্ম, দর্শনে মোক্ষধর্ম্ম, পুরাণে মোক্ষধর্ম্ম। পুরাণই তাহার প্রধান সাহিত্য। দেবালয়ে তাহার শিল্প চাতুর্য্য প্রদর্শিত হইত। পারমার্থিক ব্যয়ই ধনের সদ্ব্যয়। ইতর জাতির অনুষ্ঠান উচ্চ জাতির অবলম্বনীয় নহে। সংসার-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রস্তুত, নির্ম্মাণ ও অবলম্বন করিয়া থাকা ইতর জাতির কার্য্য। ম্লেচ্ছ রীতি-নীতি অবলম্বনীয় নহে। ম্লেচ্ছজাতি অস্পৃশ্য। সিন্ধু নদী পার হইলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত। যে দেশে এরূপ সভ্যতা প্রচারিত, সে দেশের কি কখন উন্নতি হয়? উন্নতির সকল পথে ভারতীয় সভ্যতা কণ্টকার্পণ করিয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতা কখন উন্নত হয় নাই। তাহাতে উন্নত ভাব প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। তাহার গতি এক দিকেই ছিল। এক দেশ মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে আর কোন বিদেশীয় ভাব প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। ধর্ম্ম হইতে তাহা উত্থিত হইয়াছে, চিরকাল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই তাহা ব্যস্ত ছিল। ইজিপ্ত, ফিনিসিয়, গ্রীশীয় সভ্যতার পত্তন ভূমি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া যেমন তাহা স্বতন্ত্র দিকে ধাবিত হইয়াছিল, ভারতীয় সভ্যতার মূল তেমনি ধর্ম্মশাস্ত্র হওয়াতে চিরকাল তাহা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই পাগল হইয়াছে।

আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রবণতা অন্যরূপ। সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করাই এই সভ্যতার লক্ষ্য। পরলোকের অদৃশ্য, ও কাল্পনিক স্বর্গের দিকে ইহার লক্ষ্য নহে, ইহলোককেই স্বর্গতুল্য করা ইহার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মচিন্তা ইহার সাধন নহে; প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান, পরিশ্রম, যত্ন, ব্যবসা, শিল্প,

বাণিজ্য, উন্নতিচিন্তা, দেশ-পর্য্যটন, বহুদর্শন, চিন্তা, কল, কৌশল প্রভৃতি ইহার অসংখ্য সাধন। সুখভোগ, সমৃদ্ধি, উন্নতি, প্রভৃতি ইহার বিষয়। এ সভ্যতাও নিরীশ্বর নহে। তবে ইহার ঈশ্বর বনের ঈশ্বর নহে, যোগের ঈশ্বর নহে, কল্পনার ঈশ্বর নহে, ধ্যানের ঈশ্বর নহে। ইহার ঈশ্বর সংসার ধর্ম্মের ঈশ্বর, লোকধর্ম্মের ঈশ্বর, সমাজ ধর্ম্মের ঈশ্বর, রাজধর্ম্মের ঈশ্বর, ও কার্য্যের ঈশ্বর। চীরপরিধান করিয়া অসাড় হইয়া থাকিলে ইহার যোগসাধন হয় না। কিন্তু চীরপরিধান করিয়া কেবল কার্য্য করিলে ইহার যোগসাধন হয়। ইহার দেবালয় বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যালয়, বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান ও সমুদায় বিদেশ। ধর্ম্ম ইহার পত্তনভূমি নহে, কিন্তু ইহার পার্শ্বস্তম্ভ। সংসারী হইয়া সন্ন্যাসী হও, এই ইহার আদেশ ও ধর্ম্মনীতি। ইহার ধর্ম্মনীতি কহে, যদি উদাসীন হইতে চাও, তবে সমাজের হিতের জন্য, স্বদেশের হিতের জন্য, বিদ্যার উন্নতির জন্য, একদা ঔদাসীন্য অবলম্বন কর। বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস, অর্থতত্ত্ব প্রভৃতি এ সভ্যতার বিদ্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্র। লৌহবর্ত্ম ও সমুদ্র ইহার বাহন। তাড়িত-তার ইহার দূত। ইহার যোগীগণ দেশবিদেশে যাইয়া উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছে। ইহার ঋষিগণ সংসারাশ্রমে বসিয়া জ্ঞানের উন্নতি সাধন ও চিন্তার পথ প্রসারিত করিতেছে। এ সভ্যতা যে দেশে যায় সে দেশ হাসিতে থাকে। ইয়োরোপ হইতে আমেরিকায় গিয়া ইহা আমেরিকাকে হাসাইয়াছে। আমেরিকার মৃত্তিকায় স্বর্ণ ফলিয়াছে। তাহার চির-তুষারাবৃত দেশ সমূহে উন্নতির পতাকা রোপিত হইয়াছে।

এই সভ্যতার প্রধান বাহক ইংরাজগণ। ইংরাজগণ ইহাকে পৃথিবীর সর্ব্বদেশে লইয়া যাইতেছেন। যেখানে তাহাদিগের অভ্যুদয় ও রাজত্ব সেই খানেই ইয়োরোপীয় সভ্যতার হাস্যময় বদন-বিকাশ। আমরা তাহাদিগের নিকটেই এই সভ্যতার নবভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। এতদ্দেশীয় প্রাচীন সভ্যতার সহিত ইহার তুলনা করিয়াছি। তুলনা করিয়া ইহাকে শুদ্ধ শ্রেষ্ঠত্ব দিই নাই, ইহাকে আদরের সহিত অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইহা আমাদিগের চক্ষুঃ ফুটাইয়া দিয়াছে। আমাদিগের দৃষ্টি এক নূতন বিষয়ে নিয়োজিত করিয়াছে। এখন ঐহিক সুখ ও উন্নতির প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন বুঝিয়াছি সংসারকে পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম নহে কিন্তু মহাপাতক। সংসারের কার্য্য করাই প্রধান ধর্ম্ম, যোগ, ধ্যান ও জ্ঞান। যদি উদাসীন হইতে চাও তবে সংসারের কার্য্য করিবার জন্য উদাসীন হও। সংসারের কর্ত্তব্য সাধন করিলেই ঈশ্বরের উপাসনা, ধ্যান ও সন্তোষ হয়।

তদ্ভিন্ন অন্য যোগ নাই, অন্য ঈশ্বর-সাধনা নাই। সংসার বিচ্ছিন্ন ঈশ্বর নাই, সংসারকে ত্যাগ করিলে কখন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সংসার ধামেই মানব দেবভাব প্রাপ্ত হয়; মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধিত হয়, তাহার সকল উৎকৃষ্ট গুণের স্ফূর্ত্তি হয়। যিনি ঐহিক সুখের বৃদ্ধি করিতে পারেন, তিনিই পারলৌকিক সুখের ভাগী হন; তিনিই যথার্থ পুণ্যবান, তাহারই জীবন পবিত্র। যিনি ঐহিক সুখ ত্যাগ করেন তিনি উভয় সুখেই বঞ্চিত হন। যে মানব পৃথিবীর অলঙ্কার ও শোভা, যিনি পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিবেন, নানা শোভায় শোভিত করিবেন, নানা সুখে পরিপূর্ণ করিবেন তিনি পৃথিবীর প্রতি উদাসীন থাকিলে পৃথিবীর ভাগ্য যে অতি শোচনীয় হইবে তাহার আর সংশয় কি?

২। এদেশে স্বাধীনতার ভাব যে কখন বিদ্যমান ছিল এমত বোধ হয় না। যে দেশ চিরকাল ভূপতির অলঙ্ঘনীয় প্রভুশক্তির অধীন, যে দেশে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু, যে দেশে রাজা পৃথিবীতে দেবতা স্বরূপ, যাহার বিরুদ্ধাচরণ স্বপ্নেও আনা মহাপাপ, সে দেশে স্বাধীনতার ভাব কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে? অধীনতার অলঙ্ঘ্য নিগড় যে দেশে প্রকৃতিবর্গের অলঙ্কার, সম্পূর্ণ রূপে ভূপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া যে দেশে প্রজামণ্ডলীর প্রধান কর্ত্তব্য, যে দেশে রাজাজ্ঞাই শাসন, যে দেশে ধর্ম্ম ব্যতীত রাজশক্তির আর কোন শাসন নাই, সে দেশে স্বাধীনতার ভাব কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে? সে দেশে যদি কেহ স্বাধীন থাকিতে পারে সে রাজা। যে দেশে স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারিতার প্রভেদ জানিবার কোন উপায় নাই, সে দেশে কখন প্রকৃত স্বাধীনতার ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। এ দেশে স্বাধীনতার অর্থ চিরকাল আপেক্ষিক ভাবে প্রয়োজিত হইয়াছে। বিদেশীয় রাজার যাহা অধীন নহে তাহাই স্বাধীন। এই অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে স্বাধীনতা শব্দ বোধ হয় ভারতবর্ষে কখন প্রয়োজিত হয় নাই। রাজার একাধিপত্য থাকিতে ভারতে প্রকৃতিবর্গের স্বাধীনতা শব্দের অর্থ হয় না।

সাধারণ জনগণের অধীনতা যে শুদ্ধ রাজ সম্বন্ধেই এই রূপ ছিল এমত নহে। এখানে আর এক প্রকার সামাজিক অধীনতা ছিল। জাতি ও বর্ণভেদে তাহার উৎপত্তি। ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রাহ্মণজাতির অপরিসীম ক্ষমতা। অন্য সর্ব্বজাতি ব্রাহ্মণের পদানত, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্রাহ্মণের হস্তগত। ধর্ম্মশাস্ত্র রূপ মহা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ প্রমত্ত ভাবে সমাজকে আত্ম শাসনে রাখিতেন। পৃথিবীতে রাজাই একাকী দেবতা নহে, ব্রাহ্মণগণ পরম আরাধ্য ও দেবার্চ্চনীয়। ভূপতিও ব্রাহ্মণকে শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেন। ব্রাহ্মণ দেবতার দেবতা। তাহার [illegible]

অলঙ্ঘনীয়; তাহার আদেশই শাস্ত্র, তাহার ভ্রূকুটিই শাসন। তাহার অভিসম্পাতভয়ে সর্ব্বজনই সর্ব্বক্ষণ শঙ্কাকুল। যাহার যাহা বিপদ ও দৈবদুর্ব্বিপাক ঘটিত তিনি তাহা ব্রাহ্মণকোপের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত রাজার শাসনদণ্ড অপেক্ষা ও ভয়ার্হ। এই ব্রাহ্মণ জাতির শাসনে সমাজ থরহরি কম্পবান। ব্রাহ্মণাজ্ঞা লঙ্ঘন করেন ভূপতিরও ক্ষমতা নাই। স্বার্থপর ও ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ জাতিও আপন স্বার্থসাধন জন্য সমাজকে যথেচ্ছা চালিত ও শাসিত করিয়া লইতেন। যখন তাহার শক্তির আর অবধি রহিল না তখন তিনি অগ্রসর হইয়া এক নূতন শাস্ত্রের প্রণেতা হইলেন। সেই শাস্ত্রের নাম পুরাণ। চিরদিনের জন্য আপনাদিগের ক্ষমতা প্রবর্ত্তিত রাখিবার জন্য এই মহাস্ত্র প্রস্তুত করিলেন। সেই মহাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্রে তাঁহারা আজিও সমাজকে শাসন করিয়া আসিতেছেন। যে দেশে এক জাতির এতদূর শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি স্বীকৃত হয় সে দেশে সামাজিক স্বাধীনতার ভাব কখন স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না।

কিন্তু সমাজে যে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ জাতিরই শ্রেষ্ঠত্ব এমত নহে। এ দেশে এই জাতিবিভাগ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সমাজ নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্ট জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীস্থ জাতিগণ অত্যন্ত ঘৃণার্হ, অস্পৃশ্য ও নিতান্ত হেয়। সমাজে তাহাদিগের ক্ষমতা ও অধিকার কিছুই নাই। তাহারা উচ্চশ্রেণীস্থ জাতির অবজ্ঞাপাত্র হইয়া নিতান্ত মনোবেদনায় ও সম্পূর্ণ অধীনতায় জড়ভাবে দিনযাপন করে। তাহারা এই নীচভাবে এতদূর অবসন্ন যে তাহাদিগের উচ্চ কথা কহিবারও সাহস নাই। তাহারা সমাজে অতি দীন ভাবে অবস্থান করে। অথচ তাহারাই লোক সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগেরই হাতে কৃষি, বাণিজ্য ব্যবসা প্রভৃতি সমাজের সকল প্রয়োজনীয় ও গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত আছে। তাহারা যে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিবে, ব্রাহ্মণসেবায় তাহার অর্দ্ধেক ব্যয়িত হইবে। রাজা যাহা পারিবেন কাড়িয়া লইবেন। তাহারা নিতান্ত মূর্খ, অনায়াসেই প্রতারিত হইতে পারে, সুতরাং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনায়ও তাহাদিগের বিত্ত বিলক্ষণ ব্যয়িত হয়। যে জাতিরা এত নিঃস্ব ও হেয় তাহারা কি কখন তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ হইতে পারে? যে দেশের সামাজিক ও ধর্ম্ম্য অধীনতা এতদূর, সে দেশে যে কখন স্বাধীনতার ভাব বিদ্যমান ছিল এমত অনুমিত হয় না।

এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার অধীনতায় এ দেশ চিরকাল অনুশাসিত হইয়া আসিয়াছে। এই অধীনতার নাম পারিবারিক অধীনতা। সমগ্র দেশের মধ্যে রাজার অধীনতা, সমগ্র সমাজের

মধ্যে জাতীয় অধীনতা, আবার গৃহধামে কর্ত্তৃজনের সম্পূর্ণ অধীনতা। কোন স্থানে লোকের একটু মাত্র স্বাধীনতার ভাব স্ফূর্ত্তি পাইবার যো ছিল না। সমাজে তাহার ঘোর অধীনতা, রাজদ্বারে তাহার কৃতাঞ্জলি, গৃহধামে তাহার একান্ত বশবর্ত্তিতা। এখানে আর এক প্রভুতার নিতান্ত অধীন হইয়া না থাকা মহাপাপ ও নিন্দার কথা। পিতৃগণ যে রূপই হউন না কেন, চিরদিন তাঁহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতেই হইবে। তাঁহাদিগের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় ও শিরোধার্য্য। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে তুমি কথা কহিতে সাহসীও হইতে পার না। তাঁহারা তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন ভালই, সে পরামর্শ তোমাকে অতি দীনভাবে তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহারা যাহা করিবেন তাহার বিরুদ্ধে তোমার কোন কথা কহিবার যো নাই। তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। একান্নবর্ত্তী হইয়া পরিবার মধ্যে তাঁহাদিগের অধীন থাকা ভিন্ন তোমার আর অন্য গতি নাই। শৈশব হইতে তাঁহাদিগের এই সম্পূর্ণ অধীনতায় তোমার প্রকৃতি এত নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, বয়স হইলে সে প্রকৃতির আর কিছুই তেজ থাকে না। যে সময়ে তুমি আবার কর্ত্তৃত্ব পাও তখনও নিজ সন্তান সন্ততিগণকে সম অধীনতায় অভ্যস্ত করিয়া আনিতে চাও। বংশপরম্পরায় এই ঘোর পারিবারিক অধীনতা চলিয়া আসিতেছে। এই অধীনতায় কখন স্বাধীনতাব ভাব সম্যক স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না।

আর এক প্রকার অধীনতাব দৃষ্টান্ত আমবা পরিবার মধ্যে দেখিতে পাই। তাহা স্ত্রীজাতির অধীনতা। আমাদিগের পুরস্ত্রীগণ একেবারে অধীনতার মূর্ত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বামী তাহাদিগের দেবতা। স্বামী তাহাদিগের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। স্বামীব বিপক্ষে তাহাদিগের উচ্চ বাচ্য কহিবার যো নাই। স্বামীব অত্যাচারে ও ব্যবহারে তাহাবা দিনযামিনী ক্রন্দন করিলেও কেহ তাহাদিগের আহা বলিবার লোক নাই। তাহারা যখন আবার বধূ অবস্থায় গৃহমধ্যে অবস্থান করে, তখন তাহাদিগের যে শুদ্ধ স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিতে হয় এমত নহে, তখন পরিবার মধ্যে সকল বয়োধিকাগণের অধীনতা স্বীকাব করিয়া থাকিতে হয়। সন্তান সন্ততিগণ শৈশব হইতেই মাতার এই ঘোর অধীনতার দৃষ্টান্ত অহরহ দেখিতে থাকে। মাতার পক্ষে তাহাদিগের কিছুই করিবার যো নাই, বলিবারও যো নাই। মাতার সেই অধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের প্রকৃতি নিস্তেজ হইয়া আইসে। তিনি আশৈশব যে অধীনতার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন, বয়স হইলে আবার আপন কলত্রকে তদ্রূপ অধীনতায় না রাখিতে পারিলে সুখী হইতে পারেন

না। পরিবারের কর্তৃত্ব পাইলে, পুরস্ত্রী-গণকে যে অধীনতার বশবর্ত্তিনী বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন তিনি আবার তাহা দিগকে সেই অধীনতায় রাখিয়া থাকেন। চারিদিকের এই ঘোর অধীনতার দৃষ্টান্ত মধ্যে কি স্বাধীনতা ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে?

ব্যবসা বৃত্তিতেও এই অধীনতা। ভারতবাসিগণ জাতি অনুসারে জীবন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। আমার প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, ক্ষমতা যেরূপ হউক না, আমি যদি কৃষক হইয়া জন্মিয়া থাকি তবে সেই কৃষিকার্য্য ভিন্ন অন্য পথে আমার যাইবার যো নাই। আমাকে কৃষক হইয়া থাকিতেই হইবে। অন্য লোক অন্য বৃত্তি অবলম্বনে কেন সম্পন্ন হইয়া উঠুক না, আমি তাহাতে দর্শক মাত্র হইতে পারি, আমি তাহার মত কার্য্য করিতে পারিব না। আমি যে পিতার ঔরসে জন্মিয়াছি তাহার বৃত্তি ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে যদি আমি না পারি তবে আমার স্বাধীন কার্য্যশক্তি কোথায়? শৈশব হইতে পিতৃ ব্যবসায়ে আমাকে অভ্যস্ত হইয়া আসিতে হইবেই হইবে। ঘোর জাতীয় অধীনতার মধ্য হইতে কি কখন স্বাধী-নতার ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে?

এতপ্রকার অধীনতায় থাকিয়া ভারত বাসীগণের মনে কখন স্বাধীনতা ভাব সঞ্চারিত হয় নাই। যাহাকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে, যাহাকে সামাজিক স্বাধীনতা বলে, যাহাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে, তাহার কোন প্রকার স্বাধীনতা যে ভারতবাসীগণের কখন ছিল না, একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। আজি মিল যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শিক্ষা দেন,—যাহা সামাজিক স্বাধীনতা ভাবের স্ফূর্ত্তি ও ফল, তাহা ভারতবাসীগণ কখন স্বপ্নেও আনিতে পারিতেন না। যে সামাজিক ও রাজ-নৈতিক স্বাধীনতার জন্য ইংরাজগণ জনের রাজত্ব কাল হইতে বরাবর সমান যুদ্ধ, বিগ্রহ, ও বিপ্লব করিয়া আসিতেছে যাহার জন্য তাহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া শত সমুদ্র পারে আমেরিক অরণ্যে গিয়া ও বাস করিয়াছে, যাহার জন্য তাহারা স্বদেশীয় ভূপতিগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বলিদান দিয়াছে, যাহার জন্য তাহারা ভিন্নদেশীয় রাজকুমারকে স্বদেশীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, সে স্বাধীনতার যুদ্ধ, সে স্বাধীনতার বিপ্লব কি কোন কালে ভারতে ঘটিয়াছিল? এই আন্তরিক স্বাধীনতার জন্য কি কখন ভারতে বিন্দুমাত্র রক্তপাত হইয়াছে? কই ভারতীয় ইতিহাসে তাহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই আন্তরিক স্বাধীনতার ভাব স্ফূর্ত্তি না হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সম্পূর্ণতা হইতে পারে না এবং স্বাধীনতার প্রতি দৃঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না।

ভারতীয় ভূপতিগণ বিদেশীয় রাজ-

গণের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছেন, তলিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, তাহা স্বাধীনতার জন্য নহে, তাহা স্বদেশের জন্য নহে। তাহা রাজত্বের জন্য, তাহা রাজকীয় ক্ষমতার জন্য, তাহা রাজত্বের সুখ ভোগ জন্য, তাহা রাজত্বের বৃদ্ধি, না হয় রক্ষার জন্য। ভারতীয় সৈন্য কখন স্বাধীনতার জন্য রণমদে মত্ত হয় নাই; তাহারা চিরকাল যে রাজার লবণ খাইয়াছে, যাহার অন্নে তাহাদিগের অন্ন, যাহার স্বার্থে তাহাদিগের স্বার্থ, সেই রাজার রাজত্ব রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এদেশে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পূর্ণ রাজকীয় ব্যাপার, তাহাতে রাজার স্বার্থ, ও রাজার প্রয়োজন। তাহাতে সাধারণ জনগণের কোন ক্ষতি লাভ নাই, কোন স্বার্থ নাই; সুতরাং তাহাতে তাহাদিগের তাদৃশ মনোযোগও নাই। আমরা যে রাজপুতনার যুদ্ধ লইয়া এত গর্ব্ব করিয়া থাকি, তাহা কি বাস্তবিক স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ঘটিয়াছিল? রাজপুত সেনানীগণ কি স্বাধীনতার মহিমা উচ্চরবে ঘোষিত করিয়াছিল? স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সৈন্যগণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল, যাহাতে আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা হয় এজন্য কি সৈন্যগণ রণরঙ্গে ধাবিত হইয়াছিল? রাজপুত কুলাঙ্গনাগণ কি আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রণাগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল? ইতিহাসে বোধ হয় কোন খানে স্বাধীনতার অক্ষর মাত্র নাই। রাজপুত ভূপতিগণ আপনাদিগের রাজত্ব ও কুলগৌরব রক্ষা করিবার জন্য মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পাছে ম্লেচ্ছগণের বশীভূত হইতে হয় বলিয়া সৈন্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধমুখে ধাবিত হইয়াছিল। যাহাতে আপনাদিগের সতীত্ব ও ধর্ম্ম রক্ষা হয় তজ্জন্য রাজপুত মহিলাগণ যুদ্ধে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া অবশেষে আপনাদিগের প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত যদি আমরা বলি, রাজপুতনার যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ, তাহা আমরা জোর করিয়া বলি, তাহা প্রকৃত সত্য নয়। যে হেতু স্বাধীনতার ভাব ভারতে কখন উদয় হয় নাই। ভারতে কেন, ইহা এসিয়াস্থ কোন দেশে কখন উদয় হয় নাই। যে সমস্ত দেশে রাজক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত, নিরঙ্কুশ, ও মুক্ত, যে সমস্ত দেশে রাজা দেবতার ন্যায় পূজ্য ও আরাধ্য হন, যেখানে রাজার একাধিপত্য, ও তাহার স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণের কোন উপায় ও ব্যবস্থা নাই; যেখানে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা, যে সমস্ত দেশে সাধারণ জনগণের ও প্রকৃতিবর্গের রাজত্বে কোন অধিকার ও ক্ষমতা নাই; রাজকার্য্যে কোন হাত নাই, দেশীয় রাজকার্য্য ও ব্যবস্থায় কোন স্বত্ব নাই, যেখানে তাহারা রাজক্ষমতার প্রতিরোধ, শাসন ও দমন করিতে পারে না, আপনাদিগের

অধীনতা ক্রমশঃ বিমোচন করিতে পারে না, স্বাধীনতা কি তাহা বুঝিতে পারে না, তাহার আস্বাদ জানিতে পারে না, সে সমস্ত দেশে স্বাধীনতার ভাব কি রূপে সঞ্চারিত হইতে পারে? এসিয়াস্থ সমস্ত দেশে রাজার একাধিপত্য ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা; প্রকৃতিগণের কিছু ক্ষমতা, স্বত্ব, ও অধিকার নাই; সুতরাং সেখানে কখন স্বাধীনতার ভাব সাধারণ জনগণের মনে সঞ্চারিত হয় নাই। স্বদেশীয় রাজত্বের সহিত তাহাদিগের কোনস্বার্থ নাই, সুতরাং সে রাজত্ব রক্ষার জন্য তাহাদিগের কখন প্রাণপন চেষ্টা হয় নাই। এসিয়ায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যবল ইয়োরোপীয় পঞ্চ সহস্র সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। যিনিই রাজা হউন না কেন তাহাতে প্রকৃতিবর্গের ক্ষতিলাভ কিছুই নাই। যে রাজার অত্যাচার কম, তাহাকেই তাহারা ভাল রাজা বলিয়াছে। তাহার অধীনতায় থাকিতে চাহিয়াছে। বিদেশী রাজা যদি অত্যাচারী না হন, যদি দেশীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার রক্ষা করেন, তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে তাহারা উক্তিমাত্র করিবে না। সে অধীনতায় সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিবে। যে হেতু রাজপরিবর্ত্তে তাহাদিগের অবস্থার কিছু ইতর বিশেষ হয় নাই। তাহারা এক রাজার যে রূপ অধীন প্রজা ছিল, অন্য রাজার কাছে ও তাই থাকিবে। সকল রাজাকে তাহাদিগের সমান সেবা শুশ্রূষা করিতে হইবে, সমান সম্মান করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে। রাজকার্য্যে যে প্রজাদিগের কিছু অধিকার হইতে পারে, রাজ্যমধ্যে রাজার ক্ষমতা যেমন, প্রজার-ও তেমনি ক্ষমতা ও স্বত্ব থাকিতে পারে, দেশীয় রাজত্ব যে দেশসাধারণ জনগণের রাজত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে, একথা কখন স্বপ্নেও তাহাদিগের মনে উদয় হয় নাই। এসমস্ত ভাব সম্পূর্ণ ইয়োরোপীয় ভাব। প্রাচীন গ্রীশে ইহার উৎপত্তি। প্রাচীন রোমেও ইহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল দেশে রাজা প্রজার প্রভু ছিল না, কিন্তু প্রজাই রাজার প্রভু ছিল। জনসাধারণ ইচ্ছা পূর্ব্বক রাজাকে রাখিত অথবা সিংহাসনচ্যুত করিত। কত অমিতচারী ভূপালগণ প্রজাহস্তে নিহত হইয়াছে। প্রজার স্বত্বাধিকারে একটু মাত্র হস্তক্ষেপ করিলে রাজার আর রক্ষা থাকিত না, তাহার জীবন সংশয় হইত, রাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইত। এজন্য প্রকৃতি-বর্গের স্বার্থহানি করিতে কোন নৃপতি সাহসী হইতে পারিত না। দেশীয় রাজত্বে প্রকৃতিগণের এতদূর জোর, এত ক্ষমতা, এত বিক্রম ছিল। সে রাজত্বে তাহারা যত স্বাধীন, নিজে রাজা তত স্বাধীন ছিল না। প্রকৃতি-বর্গ যে পরিমাণে রাজার অধীন তদপেক্ষা রাজা প্রকৃতিবর্গের অধীন।

উভয় পক্ষই পরস্পরের অতিশয় ও অযথা বিক্রম প্রতিরোধ এবং নিবারণ করিত। উভয় পক্ষীয় ক্ষমতা সমতুলে রক্ষা হইত। রাজাকে প্রজারা বাড়িতে দিত না, প্রজাবর্গকে রাজা বাড়িতে দিত না। প্রাচীন গ্রীশ ও রোমের এই অবস্থা ছিল। আজি ইয়োরোপময় এই অবস্থা। নেপোলিয়ানের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফরাশিগণ তাহার অনুধাবন করিয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়ান ফান্সে আসিয়া যখন একাধিপত্য ও অযথা বিক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন, ফরাশিগণ সেই দুর্দ্ধর্ষ ও গৌরবরবি নেপোলিয়ানকেও দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি ফ্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা কিছুই ভাবিলেন না। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কতবার ঘটিয়াছে। এই ইতিহাস আজি ইংলণ্ড ভারতকে প্রদান করিয়াছেন। যে স্বাধীনতার যুদ্ধ ও গৌরব ঘোষণা ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের প্রতিপত্রে স্ুবর্ণ অক্ষরে বর্ণিত আছে যে স্বাধীনতার অনুরাগে ইংলণ্ডবাসিগণ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, যাহার যুদ্ধে আজি আয়ারলণ্ডবাসিগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পার্লেমেণ্টের মহাসভায় যে স্বাধীনতার বাক্‌যুদ্ধ প্রতিদিন চলিতেছে, সেই স্বাধীনতার ইতিহাস ইংরাজগণ আমাদিগকে মুক্ত হস্তে প্রদান করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় ক্ষুদ্ররাজ্যের অভ্যন্তরে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ, সমগ্র ইয়োরোপ মণ্ডলেও সেই যুদ্ধ। একরাজ্যের সহিত অন্য রাজ্যেও সেই স্বাধীনতার যুদ্ধ। সমস্ত রাজ্যের ক্ষমতাও স্বত্বাধিকার যাহাতে সমতুলে রক্ষিত হয় ইয়োরোপ মণ্ডলে তজ্জন্য কতবৎসর ধরিয়া কত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক, সমগ্র ইয়োরোপীয় ইতিহাস আমাদিগের নিকট কেবল স্বাধীনতা-বিকাশের বৃহৎ ইতিহাস বলিয়া প্রতীত হয়; যে ইতিহাসের আদি প্রাচীন গ্রীশ, যাহার শেষ অনন্তকালেও হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা ইয়োরোপে ঘটিয়াছে সমগ্র পৃথিবীতে তাহা একদিন ঘটিবার সম্ভাবনা। সমগ্র পৃথিবীতে যখন এই স্বাধীনতার যুদ্ধ বিগ্রহ আরব্ধ হইবে তখন পৃথিবীর এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে। হায়, সে কাল কতদিনে উদয় হইবে, কতদিনে জগৎশুদ্ধ লোকে এক মহা মানব-স্বাধীনতারণে প্রমত্ত হইয়া আপন আপন স্বত্ব ও অধিকার গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সম্ভোগে চিরসুখী হইবে।

ইংরাজগণের ইতিহাসে, কাব্যে, সাহিত্যে, ও রাজ্য প্রণালীতে আমরা এই স্বাধীনতার ভাব দেখিতে পাই। ইহার উজ্জ্বল আলোকে ইংলণ্ড আলোকিত রহিয়াছে। এখন আমরা শিক্ষা করিতেছি স্বাধীনতা না থাকিলে মানব জাতির সম্যক্ উন্নতি সাধন হইতে পারে না। মানব-মনের সমস্ত গুণ ও

ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। মানবের যে সমস্ত স্বর্গীয় গুণ আছে স্বাধীনতা না হইলে তাহার উন্মেষণ হয় না। যে পরিমাণে মানব স্বাধীনতা পাইবে সেই পরিমাণে তাহার গুণ-গরিমার স্ফুরণ হইবে। স্বাধীন শিক্ষা নহিলে মানব-মনের উদারতা জন্মিতে পারে না, স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্র নহিলে মানবীয় ক্ষমতার সম্যক্ প্রসার ও বিকাশ হইতে পারে না। মানব-মন যেমন স্বাধীনতায় সুখে ও অবাধে বিচরণ করিতে চাহে, মানব কার্য্যশক্তি এবং ক্ষমতাও তদ্রূপ স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করিতে চাহে। ইহা না হইলে মানবের সম্যক্ উন্নতি কখনই সম্ভবে না। এই উন্নতিপক্ষে মানবের আন্তরিক ও ব্যক্তি-গত স্বাধীনতা চাই; এবং সামাজিক, পারিবারিক, ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার একান্ত আবশ্যক। মানব যখন একবার এই স্বাধীনতার আস্বাদ প্রাপ্ত হয় তখন মানব ইহার রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জন দিতে পারেন।

৩। স্বদেশানুরাগ বা পেট্রিয়টিসম ভারতের ইতিহাসে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এবাক্য ভারতের প্রতি উক্ত হয় নাই। ভারতবাসিগণের জন্মভূমি ভারতবর্ষ নহে, তাহা কোন গ্রাম, পল্লী অথবা পল্লীস্থ সেই ক্ষুদ্রপ্রসর স্থান মাত্র যেখানে তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। আমাদিগের উদাসীনেরা এক যুগের পর এক দিন জন্মভূমি দেখিতে আসেন। সে জন্মভূমি কি তাহাদিগের ভূমিষ্ঠ হইবার স্থানমাত্র নহে? যে গৃহধামে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেই গৃহধাম দেখিয়া গিয়া তাহারা সাতত্তীর্থের পুণ্য সঞ্চয় করে। আমরা ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে বাস করি না কেন এই জন্মভূমি ছাড়িয়া থাকিলেই সে স্থান আমাদিগের বিদেশ। সেই বিদেশের প্রতি আমাদিগের অণুমাত্র অনুরাগ নাই। যে স্বদেশানুরাগ এত সঙ্কীর্ণ সে স্বদেশানুরাগ কখন ইয়োরোপীয় পেট্রিয়টিসমের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না।

যে দেশে চিরকাল অবিসম্বাদী একাধিপত্য চলিয়া আসিয়াছে, সে দেশের লোকের স্বদেশের প্রতি কত অনুরাগ জন্মিতে পারে তাহা বোধ হয় আমরা পূর্ব্বে এক প্রকার বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি। রাজা ভিন্ন দেশের উন্নতি-কল্পে আর কাহার তত স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে না, সুতরাং আর কাহার তত অনুরাগ জন্মিতে পারে না। এজন্য ভারতে আমরা অনেক শাস্ত্রকারের নাম শুনিয়াছি, অনেক ধর্ম্মসংস্কারকের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু কখন পেট্রিয়টের নাম শুনি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত পার্থিব হিতের কোন সম্পর্ক নাই, যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল পরমার্থ লইয়াই ব্যস্ত। তবে ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা তদ্ব্যবসায়ীরা যে ঐহিক স্বার্থসিদ্ধ করেন তদ্ব্যতীত ইহাতে

আর কোন দেশীয় সাধারণ ইষ্টসিদ্ধি দেখা যায় না। এজন্য ধর্ম্মসংস্কারকগণকে আমরা পেট্রিয়টের মহৎ নামে অভিহিত করিতে পারি না। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বরং বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া স্বদেশানুরাগের মূলে একেবারে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। সংসার ধাম তুচ্ছ করিয়া যাহারা কেবল পরমার্থ হিতাকাঙ্ক্ষায় সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন তাহাদিগের মনে কখন স্বদেশানুরাগ জন্মিতে পারে না। অতএব কি রাজকীয় শাসন প্রণালী, কি ধর্ম্মীয় শাস্ত্র প্রণালী, কি ঐহিক, কি পারমার্থিক রাজ্য প্রণালী কিছুতেই ভারতবাসিগণকে স্বদেশানুরাগী করিতে পারে নাই। ভারতবাসিগণ ভারতের প্রতি চিরকাল উদাসীন ছিল। বৈরাগ্য উপদেশক ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন ভারতে অন্য বিদ্যার তত আদর ছিল না। সুতরাং ভারতবাসিগণ বিরাগী ভিন্ন অনুরাগী হইতে পারে নাই। তাহারা পরমার্থ বিষয়ে অনুরাগী, সংসার বিষয়ে চিরকাল বিরাগী ছিল।

আদিম আর্য্যগণের মনে কখন স্বদেশানুরাগ ছিল কি না, তাহা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু দেশীয় রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার প্রভাবে যখন তাহা আর্য্যগণের হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে তখন তাহা পূর্ব্বে ছিল বলিয়া আর গৌরবের বিষয় হইতে পারে না। যখন ইহা একবার অন্তর্ধান করিয়াছে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উন্নতিলক্ষ্মীও অন্তর্ধান করিয়াছেন। আর্য্যগণ ভারতে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়া দেখিলেন তাঁহারা চারিদিকেই ইতর জাতি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। অপর জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি সকলই নিকৃষ্ট ও পরিত্যজ্য। তাহারা নিজেই অপর জাতির আদর্শ ও শিক্ষাদাতা। অপর জাতির নিকট তাহাদিগের কিছুই শিখিবার নাই। তাঁহারা সেই গৌরবে মত্ত হইয়া অপর জাতির সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। আপনারা আর্য্যধাম ভারতের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিলেন। ভারতে যে সমস্ত আদিম অপর জাতি ছিল তাহারা আর্য্যগণের পরিত্যজ্য হইয়া বনে, পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আর্য্যদিগের সহিত তাহাদিগের কোন সংস্রব রহিল না। একমাত্র প্রবল জাতি আর্য্যগণই প্রভুত্ব করিতে লাগিল। তাহারা ভারতের প্রায় চারি দিকেই দেখিলেন সমুদ্র, এক দিকে হিমাদ্রির অলঙ্ঘ্য প্রাচীর। যেদিকে কেবল বিদেশীয়গণের সহিত সংস্রব ঘটিতে পারে সে দিকে তাঁহারা নিজে নিজে এক অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করিলেন। সিন্ধুনদীকে সে দিকের পরিসীমা করিলেন। তাহার পরপারে যাইলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে এই ব্যবস্থা বাহির হইল। সুতরাং আর্য্যগণ ভারতে একাকী রহিলেন। একাকী ভারত মধ্যে নিবদ্ধ থাকাতে তাঁহাদিগের

নিঃসম্পর্কীয় ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সিন্ধু নদীর সীমার সহিত তাহাদিগের উন্নতিও সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। যাহাতে স্বদেশানুরাগ স্ফূর্ত্তি পায় সে পথে তাঁহারা চিরদিনের জন্য কণ্টকার্পণ করিলেন। যে জাতি যত নিঃসম্পর্কীয় হইবে তাহাদিগের স্বদেশানুরাগ ততই শীতল হইয়া আসিবে। অপর দেশের সহিত সংশ্রব না রাখিলে স্বদেশের প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি হয় না। অপরের সহিত প্রতিযোগিতা না থাকিলে আপনার উন্নতি পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতবাসিগণের কখন প্রতিযোগিতা ঘটে নাই। যেহেতু ভারতের প্রতিযোগী দেশ কখন নিকটবর্ত্তী ছিল না। ভারতবাসিগণ অপর দেশের কোন সংবাদ রাখিত না। অপর দেশের সহিত তাহারা কখন সংঘর্ষেও আসে নাই। সুতরাং ভারতবাসিগণ নিতান্ত অন্ধ হইয়া আপনারাই যাহা ভাল বুঝিত তাহাই করিত। তাহাদিগের স্বদেশানুরাগ যাহাতে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে এমত ঘটনা শত সহস্র বৎসরেও একবার ঘটে নাই। অপর দেশের উন্নতি দেখিয়া যে স্বদেশের কোনরূপ উন্নতিসাধন করিবে সে পথে তাহারা একেবারে কণ্টকার্পণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদিগের স্বদেশানুরাগ রূপ অগ্নি কখন ইন্ধন পায় নাই। তাহা ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা এতদূর শীতল হইয়া গিয়াছিল যে যৎকালে তাহা একান্ত প্রয়োজনীয় হইল তখন দৃষ্ট হইল যে তাহা একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তদভাবে যাহা ঘটিবার তাহা ভারতের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বহুকাল হইতে ভারত পরাধীন হইয়াছে। পূর্ব্বে যদি কিছু থাকে, বহুকালের দাসত্বে ভারতবাসিগণের স্বদেশানুরাগ হৃদয় হইতে একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে। এখন স্বদেশানুরাগ ও পেট্রিয়টিসম ভারতবাসিগণের নিকট একটী নূতন ভাব। ইংরাজগণ ও ইংরাজী সাহিত্য যাহার শিক্ষাদাতা।

প্রাচীন গ্রীশ ইয়োরোপকে স্বদেশানুরাগ শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীন গ্রীশে ইহার মহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। সেই মহাগ্নি ইয়োরোপময় ব্যাপ্ত হয়। প্রাচীন গ্রীশও এককালে ভারতের ন্যায় কেবল গ্রীকজাতিতে পরিপূর্ণ ও বিভক্ত ছিল। তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে গ্রীক জাতিরাই বাস করিত। এক এক গ্রীকজাতি এক এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ভারতেও এইরূপ নানা স্থলে আর্য্যগণের বিভিন্ন বিভিন্ন রাজ্য স্থাপিত ছিল। বিভিন্ন বটে কিন্তু স্বতন্ত্র নহে। আর্য্যগণের রাজ্য সমস্ত একতন্ত্র ছিল। স্পার্টা, ও এথেনীয় রাজ্য প্রভৃতি গ্রীক রাজ্য সকল যে কেবল বিভিন্ন ছিল এমত নহে তাহা স্বতন্ত্রও ছিল। স্পার্টীয় ব্যবস্থাবলি ও রাজ্যশাসন-প্রণালী এথেনীয় রাজ্যতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন

ছিল। কিন্তু এই স্বতন্ত্র রাজ্য সকল পরস্পর নিঃসম্পর্কীয় ছিল না। তাহারা সকলই হয় বৈরভাবে, না হয় প্রতিযোগিতায়, না হয় মিত্রতায় সম্বন্ধ ছিল। স্পার্টা ও এথেন্সের প্রতিযোগিতায় পরস্পরের স্বদেশানুরাগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। গ্রীশের শ্রীবৃদ্ধি কালীন তদ্দেশ বাসিগণ বহু বহু দেশ দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। গ্রীক বাণিজ্যপোত নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিত। গ্রীক পণ্ডিতগণ দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া নানাদেশীয় রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া আসিত। গ্রীশ কেবল স্বদেশ মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, তাহা পৃথিবীর সহিত নিঃসম্পর্কীয় ছিল না, তাহা ক্রমশঃ বহির্দ্দেশের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছিল। গ্রীকেরা বিদেশের সহিত আপনাদের দেশের পৃথকত্ব বিলক্ষণ অনুভব করিত। তাহার উন্নতিকল্পে সকলই ব্যতিব্যস্ত ছিল। এইরূপে গ্রীশের সকল রাজ্যই উন্নতির ধুমধামে পরিপূর্ণ হইতেছিল। সর্ব্বরাজ্যই স্বদেশানুরাগে পরিপুষ্ট হইতেছিল। সকলই প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য লাভের জন্য একান্ত চেষ্টিত ছিল। ইহাই স্পার্টা, এথেন্স, করিন্থ প্রভৃতি গ্রীক রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ। বিদেশের সহিত সংস্রব থাকাতে তাহারা স্বদেশের মায়ায় বিশেষ রূপে অনুবিদ্ধ হইয়াছিল। স্বদেশ তাহাদিগের কত প্রিয়তর পদার্থ তাহা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিত। বিদেশের সহিত স্বদেশের বলের পরীক্ষা করিত। এইরূপ পরীক্ষারও অবসর ঘটিয়াছিল। এই পরীক্ষাকালীন গ্রীশ স্বদেশানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া শতগুণ বলে বৈরদল সমক্ষে দণ্ডায়মান হইত। বৈরদল তাহার বীর্য্য ও পরাক্রম প্রভাবে পরাভূত হইত। ইহাতে গ্রীকজাতির স্বদেশানুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইত। এই স্বদেশানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া তাহারা একদা পরস্পর প্রতিযোগিতায় পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। পিলপনিসস মধ্যে মহা গৃহ যুদ্ধের প্রলয় বাঁধিল। ইতিহাসে তাহার ফলাফল বর্ণিত আছে।

ভারতীয় আর্য্যদিগের রাজ্যসমস্তের অবস্থা অন্যবিধ। আর্য্যজাতির রাজ্যসকল যদিও পরস্পর পৃথক ছিল বটে, কিন্তু সকলই এক তন্ত্রে আবদ্ধ। সর্ব্বদেশেই একরূপ রাজ্যতন্ত্র, ও একপ্রকার রাজ্যশাসন ছিল। এক শাস্ত্র, এক ধর্ম্ম, এক প্রকার রীতি নীতি, ও আচার ব্যবহার সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল। ভূপতিগণ সকলই স্বরাজ্য মধ্যে প্রধান বটে কিন্তু সকলই একশাস্ত্র, একধর্ম্ম ও এক রীতি নীতির অধীনতা স্বীকার করিত। রাজ্যসকল অতি দূরস্থিত ছিল। পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিত না। কেহ কাহার প্রতি চাহিয়া দেখিত না। নিজ নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট ছিল। পরস্পরের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও বড় ঈর্ষা বৃদ্ধির কারণ ঘটিত না, কারণ

প্রায় সকলেরই অবস্থা ও ভাগ্য সমান। যদি ঘটনাক্রমে কোন এক রাজ্য কথঞ্চিৎ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিত, একবার দিগ্বিজয় করিতে পারিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত। নির্দ্ধারিত কর ব্যতীত অধীন রাজ্যের সহিত আর কোন সম্পর্ক থাকিত না। একবার অবসর পাইলেই অধীন রাজ্য সকল অমনি স্বাধীন হইয়া যাইত। পরস্পরের সহিত এই মাত্র সম্বন্ধ। ভারত ব্যতীত অন্যদেশের সহিত ভারতের কথন সম্বন্ধ ঘটে নাই। ভারতের একান্ত অভ্যুদয় কালে কোন বিদেশীয় শত্রু ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই। ভারতকে রক্ষা করিবার ভার ভারতবাসিগণের স্কন্ধে কথন নিপতিত হয় নাই। ভারতের আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় ভারতবাসিগণ কথন উৎসাহিত হয় নাই। কোন বহির্দ্দেশীয় প্রভাব ও কারণ ভারতকে কোন অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করে নাই। ভারতবাসিগণ কথন ভারতের বাহিরে বিদেশে বিদেশে ভ্রমণ অথবা বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে যায় নাই। ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্বপ্রণীত শাস্ত্রকলাপ ভিন্ন অন্য জ্ঞানে জ্ঞানী হয় নাই। বহুদর্শন কিরূপ ভারত-বাসিগণ তাহা জানিত না। অন্যের সহিত আত্ম অবস্থার তুলনা করা কিরূপ তাহা কথন শিক্ষা করে নাই। কেবল নিজ নিজ গৃহ ও দেশমধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ইহাতে কি উন্নতি হয়, না স্বদেশানু-রাগের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে? পরের সহিত সম্বন্ধে না আসিলে কথন আপনার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে না। ভারত কথন পরের সম্বন্ধে আইসে নাই, সুতরাং ভারতের স্বদেশানুরাগ ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা অবশেষে একেবারে যখন অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল তখন ভারত যবন কর্তৃক আক্রান্ত হইল। তখন সেই অনুরাগের একদা প্রয়োজন হইল। তখন ভারতের শীতল দেহে স্বদেশানুরাগের তাপ মাত্রও নাই। ভারত আস্তে আস্তে দাসত্বের শৃঙ্খল ধারণ করিলেন।

ইয়োরোপে জনসাধারণ কতদূর স্বাধীন, তাহারা রাজার সহিত স্বদেশ মধ্যে কেমন সম স্বত্বাধিকারী, দেশ মধ্যে তাহাদিগের কতদূর ক্ষমতা, তাহা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। এই কারণে কতদূর স্বদেশের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে।

ইয়োরোপে যখন আবার ফিউডাল ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচারিত ও স্থাপিত হইল তখন জনসাধারণের এই স্বত্বাধিকার আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহারাও এক প্রকার স্বদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বা অধিকারী হইয়াছিল। ইহাতে যদিও গৃহযুদ্ধের বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে কিন্তু, ইহাতে তাহাদিগের স্বদেশানু-রাগেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্বদেশের ভূমির প্রতি তাহাদিগের অধিকতর

স্বত্ব ও অধিকার হওয়াতে তাহারা সে স্বত্ব ও অধিকার সহজে পরিত্যাগ করিত না। এই স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার্থ তাহারা সর্ব্বদা রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকিত। এবং যাহার জন্য তাহারা প্রাণপণ যুদ্ধ করিত তাহার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ ক্রমশই বর্দ্ধিত হইত। তাহারা স্বদেশে যে শুদ্ধ প্রভু ছিল এমত নহে, সেই স্বদেশ তাহাদিগের গৌরবের স্থল ছিল। এক এক দেশ এক এক ক্ল্যান অথবা উচ্চ-বংশীয়ের দলবলের গৌরবে পরিপূর্ণ ছিল। সেই দেশে তাহারা সম্পূর্ণ প্রভু, তাহা তাহাদিগের বিগ্রহ ব্যাপারের ক্রীড়াস্থল, তাহা তাহাদিগের আত্মীয় স্বজন, ও অনুগত জনগণে পরিপূর্ণ। সে দেশকে তাহারা সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিত। তাহার জন্য কতবার রক্তপাত করিয়াছে, কত শত বীরের রক্ত তাহাতে নিপতিত হইয়াছে, কত শত বীর সন্তান তাহার জন্য বিসর্জ্জিত হইয়াছে। সেই স্বদেশের দুর্গে দাঁড়াইয়া তাহারা জগৎশুদ্ধ লোককে অবজ্ঞা-দৃষ্টিতে দেখিতে পারিত। সেখানে তাহাদিগের পরাক্রম ও প্রভাব দুর্জ্জয় [illegible] ছিল। প্রতি পার্ব্বতীয় দেশ তাহাদিগের গৌরব প্রতিধ্বনিত করিত। প্রতি কাননে ও গৃহে বীরগান সঙ্গীত হইত। প্রতি ক্ষেত্র, প্রতি ভূমি, বীর যশে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা এই স্বদেশের প্রতি অনুরাগে একেবারে উন্মত্ত হইয়া থাকিত। সে উন্মত্ততার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় কাহার সাধ্য। আজি যদি তুমি দেশ অধিকার কর, কালি হউক, পরশ্বই হউক তোমার দেহ খণ্ড বিখণ্ডিত হইবেক। যত দিন না স্বদেশের উদ্ধার হয়, কাহারও নিস্তার নাই, স্বদেশবাসিগণের নিদ্রা নাই। তত দিন স্বদেশানুরাগ প্রতি লোকের কাণে কাণে উৎসাহ-বাক্য বর্ষণ করিবে, প্রতি লোকের শিরায় শিরায় বল দিবে, এবং চতুর্গুণ উৎসাহে উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক এক জন স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, এবং আপনার সহিত শত জনের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যিনি সিদ্ধিলাভ করিতেন, তিনি পেট্রিয়ট নামে চির-গৌরবে ভূষিত হইতেন। পেট্রিয়টের জলন্ত স্বদেশানুরাগ কিরূপ, একবার এই ইয়োরোপীয় পেট্রিয়টগণের জীবনে অবলোকন কর। অবলোকন করিয়া বল, ইহাদিগের কণামাত্র পেট্রিয়টিসম যে দেশে থাকে, সে দেশের কিছুমাত্র ভাবনা নাই। ঐ পেট্রিয়টিসম্ জলন্ত বহ্নি-স্বরূপ। তাহার তেজে দেশশুদ্ধ তেজীবান্ হয়। সে বহ্নিতে হস্তক্ষেপ করে কাহার সাধ্য?

ইয়োরোপে এই স্বদেশানুরাগের ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি হইয়া আসিয়াছে। ইহার উদ্দীপনায় এক একবার সেনানীদল উন্মত্ত হইয়া রণরঙ্গে ধাবিত হইয়াছে। ইহার উদ্দীপনায় জনসাধারণ ক্ষিপ্তপ্রায়

হইয়া দেশের জন্য তুমুল কাণ্ড উত্থাপিত করিয়াছে। সেই ক্ষিপ্তপ্রায় লোক-মণ্ডলীর উন্মত্ততা দেখিয়া রাজসৈন্য কম্পিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। সেই লোকমণ্ডলীর হস্তে কত নৃপতির শীর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, কত রাজ-সিংহাসন বিচূর্ণ হইয়াছে। ইয়োরোপের এক দেশে স্বদেশানুরাগের জ্বলন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে এক একবার তাহাতে ইয়োরোপশুদ্ধ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে হাজার হাজার লোকের আহুতি হইয়াছে। এবং সে বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে রুধির প্রবাহের আবশ্যকতা হইয়াছে। এই স্বদেশানু-রাগ একজনে যখন ঘনীভূত হয়, তখন তাঁহাকে পেট্রিয়ট কহে। সেই পেট্রি-য়টের তেজ অপরিসীম; তাহার তেজে দেশশুদ্ধ উত্তপ্ত হইয়া থাকে।

নিপীড়নে এই স্বদেশানুরাগের ভীষণতা ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। অত্যাচার নিবারণ জন্য ইহা অসি হস্তে যুদ্ধ করে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইহা দেশ শুদ্ধ জ্বালাইয়া দেয়। বীরবর নেপোলিয়ানও ইহার জ্বলন্ত বহ্নির সম্মুখে মসকাউ হইতে অপমানের সহিত কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইয়া আসেন। ইহা গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং প্রকাশ্যে অসি হস্তে অগ্নিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার শান্তভাবও আছে। সেই ভাবে দেখিলে ইহাকে অতি রমণীয় বোধ হয়।

স্বদেশ মধ্যে যখন শান্তি বিরাজিত থাকে, তখন স্বদেশানুরাগ অতি মঙ্গল মূর্ত্তিতে কার্য্য করিতে থাকে। কিসে দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় তখন ইহার এই চেষ্টা। এই চেষ্টাতেও ইহার প্রখলতা কিছু ন্যূনকল্পে প্রকাশিত হয় না। ইহার নিঃস্বার্থ ও পবিত্র ভাব এই সময়ে দেখিয়া ইহাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। বাস্তবিক যাঁহারা স্বদেশানু-রাগে উত্তেজিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে কেবল দেশের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা জগতে আরাধ্য হইয়া আছেন। তাহাদিগের ক্লেশার্জ্জিত সুখভোগে সুখী হইয়া প্রতিদিন প্রতি গৃহে প্রতি পরিবার তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। এই প্রাতঃস্মরণীয় পেট্রিয়ট গণের নামোচ্চারণ করিয়া লোকে শয্যা হইতে উত্থিত হয়। প্রতি পূজাগৃহে তাঁহাদিগের নাম অর্চ্চিত হয়। তাঁহারা গৃহের দেবতা, দেশের দেবতা স্বরূপ। তাঁহাদিগের গর্ব্বে দেশশুদ্ধ গৌরবে পরিপূর্ণ হয়।

আত্মসুখ ও আত্ম অর্থ বিসর্জ্জন দিয়া শুদ্ধ সমাজের ও দেশের মঙ্গল-সাধনে ব্রতী থাকা ইয়োরোপীয়গণের নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যব্রত। এই প্রকার নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম শুদ্ধ ইয়োরোপে চলিত দেখা যায়। সামাজিক মঙ্গল ও স্বদেশীয় মঙ্গল ইয়ো-রোপীয়গণের উপাস্য দেবতা। রাজ্যের সকল কার্য্য ও ব্যবস্থা এই লক্ষ্যে চালিত হয়। রাজা ও উচ্চবংশধরগণের অবদান

পরম্পরা এই লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। যখন আত্ম অর্থের সহিত এই লক্ষ্য বিরোধী হইয়া পড়ে, তখন নিজ স্বার্থ অবিলম্বে পরিত্যাজ্য হয়। কত শত লোক ইহার জন্য বিপুল ধন ব্যয় করিতেছেন। কত নিঃসন্তান লোক ইহার জন্য অপরিসীম সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছেন। কত লোক ইহার জন্য দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন এবং কত কষ্টে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। ইহার জন্য ভূপতিও সূত্রধরের কার্য্য করিয়া স্বরাজ্যকে উন্নতিপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন এবং অতুল গৌরবে উত্তোলিত করিয়াছেন। আজি রুসিয়ার উন্নতির পরিসীমা নাই।

ইয়োরোপে স্বদেশানুরাগ যে স্বদেশকে কত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়াছে, কত সুখ সৌকর্য্যে পূর্ণ করিয়াছে, কত দেশের কত সুখ সামগ্রী ও রত্নজাত আনিয়া স্বদেশের ভাণ্ডার পরিপূরিত করিয়াছে, কত সমৃদ্ধি রাশিতে স্বদেশকে পরিশোভিত করিয়াছে, তাহা দেখিলে মন অতুল আনন্দরসে আর্দ্র হইয়া যায়। যখন স্বদেশানুরাগকে এই সমস্ত অলঙ্কার দামে ভূষিত দেখা যায় তখন ইহাকে কি রমণীয় বোধ হয়! এই স্বদেশানুরাগে প্রেরিত হইয়া কত ভ্রমণকারী আহ্লাদের সহিত আফ্রিকার নিবিড় অরণ্য ও মরু-প্রান্তর, এবং আমেরিকার ভয়সঙ্কুল পার্ব্বতীয় অরণ্যানী ও বিশাল তুষারময় ক্ষেত্র ভেদ করিয়া স্বদেশের জ্ঞানরাজ্য বিস্তার করিতেছে। কত সিংহ-পরাক্রমধারী বেলযোনি মিশর দেশীয় মৃত্তিকা ও পূর্ব্বরাজ্যের ভগ্নাবশেষ খনন করিয়া বৃহৎ বৃহৎ অদ্ভুত দ্রব্যজাত উত্তোলিত করিয়া স্বদেশের সংগ্রহমন্দির শোভিত করিতেছে। কত অধ্যবসায়শীল লেয়ার্ড নিনিভার ক্ষেত্রে ভূতপূর্ব্বরাজ্যের বিস্তার ও পরিসীমার পরিমাণ করিতেছে। কত ক্লাইব ও উলফ স্বদেশীয় সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতেছে। কত হেষ্টিংস ও র‍্যালে স্বদেশীয়গণকে রত্নভাণ্ডার ও স্বর্ণখনি দেখাইয়া দিতেছে। কত নেলসন ও ব্লেক রণতরির গৌরব সমুদ্রমাঝে বিস্তার করিতেছে। কত ওয়েলিংটন স্বদেশীয় জয়পতাকা বিদেশমধ্যে গৌরবের সহিত অধিরোপণ করিতেছে। কত ওয়ালেস, টেল, ম্যাটসিনির চিত্ত অনুরাগে অগ্নিপরীত হইয়া নানা কষ্ট সহ্য করিয়াও স্বদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করিতেছে। কত বাণিজ্যপোত বিদেশীয় রত্নজাত-পরিপূর্ণ হইয়া স্বদেশীয় ধনাগার সমৃদ্ধ করিতেছে। স্বদেশানুরাগের এই সমস্ত মহৎকার্য্য দেখিলে মনোমধ্যে যে বিপুল আনন্দরসের সঞ্চার হয় তাহা আর কিছুতেই দিতে পারে না। মন তখন উল্লাসে বলিয়া উঠে, ধন্য স্বদেশানুরাগ, ধন্য তোমার কার্য্যকলাপ, ধন্য তোমার প্রভাব ও মহিমা!

এই স্বদেশানুরাগ বিরহে ভারত আজি রোদন করিতেছে। এই স্বদেশানুরাগের

কণামাত্র থাকিলে তাহার সম্পন্ন বিশাল রাজ্য মুষলমান যবন হস্তে পতিত হইয়া চির অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না। তাহার সৈন্যবল মুষলমানের অন্নে পরিপুষ্ট হইয়া বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী মুষলমান রাজগণের জন্য আপনাদিগের রক্তপাত করিতে অগ্রসর হইত না। তাহার নীচ সন্তানগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বদেশকে পরহস্তে ন্যস্ত করিত না। স্বদেশানুরাগ না থাকিলে মনুষ্য যে কত নীচ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, অধোগতির কত নিম্নস্থলে আনীত হয় ভারতবর্ষ তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। ইংরাজ রাজ্য চিরস্থায়ী হউক, ইংরাজী সাহিত্য ভারতের চারিদিকে আলোচিত হউক, ইংরাজের উচ্চ ব্যবহার ভারতবাসিগণের আদর্শস্থানীয় হউক, তাহাদিগের উচ্চ গুণ ও শিক্ষা ভারতের গ্রহণীয় হউক, তাহাদিগের মহৎ ব্যবসায় ও কার্য্যকলাপ ভারতবাসিগণ অবলম্বন করুক, তাহাদিগের স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করুক, এই আমাদিগের প্রার্থনা ও একান্ত অভিলাষ।

৪। স্বজাতিপ্রেম ইয়োরোপীয়গণের একটী বিশেষ ধর্ম্ম ও লক্ষণ। ইহা তাহাদিগের মধ্যে এত প্রবল যে ইহাদ্বারাই ইয়োরোপীয় জাতিসমূহ জগতীয় অপরাপর মানবজাতি হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর আর কোন জাতিতে এই বন্ধন তত সুদৃঢ় দৃষ্ট হয় না। অথবা আর কোন জাতিমধ্যে ইহা সমপ্রবল আছে কি না তাহা অদ্যাপি পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট হয় নাই। যেহেতু ইয়োরোপীয় জাতি ভিন্ন আর কোন জাতির বিদেশীয় অধিকার ও রাজ্য নাই। আর কোন জাতি বিদেশীয় বাণিজ্য, ব্যবসায় ও অপরাপর কার্য্যে প্রবৃত্ত নাই। অন্যান্য জাতি সকলেই স্বদেশ মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু ইয়োরোপীয়গণ পৃথিবীর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত থাকাতে, এবং পৃথিবীর নানা দেশীয় কার্য্যকলাপে লিপ্ত থাকাতে তাহাদিগের জাতীয় প্রেম সময়ে সময়ে অতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। এমত কি, যদিও তাহারা পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত আছে, শুদ্ধ যেন এই বন্ধন তাহাদিগের সকলকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এইরূপ বোধ হইতে থাকে। তাহাদিগের মধ্যে যেন এক আত্মা, এক ভাব, এক সৌহার্দ্দ, এক অদ্ভুত সহানুভূতি ও অনুকম্পা সূত্রে সকলকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। কেহ কাহার পরিচিত হউক, বা নাই হউক, এক জন স্বজাতিকে দেখিলেই অন্য স্বজাতীয়ের হৃদয় উৎফুল্ল বা কাঁদিয়া উঠিবে। তাহাকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিবে ও তৎপ্রতি আত্মীয়ের ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবে। স্বজাতিপ্রেমের সহিত স্বদেশীয় গৌরব মনে পড়িবে। একজন স্বজাতীয়ের অপমানে দেশ শুদ্ধ লোক অপমানিত জ্ঞান করিয়া মাতিয়া উঠিবে। এই প্রবল জাতীয়ভাব যেমন বিদেশীয়

বিস্তারিত ক্ষেত্রে পরিদৃশ্যমান হয় এমত স্বদেশ মধ্যে হইতে পারে না। স্বদেশ মধ্যে স্বজাতিপ্রেমের বরং বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহার স্ফূর্ত্তি হইবার তত সম্ভাবনা নাই।

ইংরাজগণ মধ্যে এই স্বজাতিপ্রেম বিশেষরূপে প্রবলতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার জীবন্তভাব আমরা প্রতিদিন তাহাদিগের ব্যবহার ও কার্য্যকলাপে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তাহাদিগের সাহিত্য ও ইতিহাসে আমরা অন্য শিক্ষা পাইতে পারি, কিন্তু স্বজাতিপ্রেমের শিক্ষা গ্রন্থ-নিবদ্ধ নহে। ইহা দ্রষ্টব্য বিষয়; এবং ইহার দৃষ্টান্ত জীবিতক্ষেত্রে আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করিয়া এই স্বজাতিপ্রেমের উদারতায় মোহিত হইয়াছি। এই ভাবটী যে এদেশে একেবারে নাই তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।

ভারতে এই ভাব বহুকাল বিনষ্ট হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে একদিন যখন আদিম আর্য্যগণ পঞ্চনদ পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন তখন তাহাদিগের যে এই ভাব ছিল না এমত বলিতে চাহি না। কিন্তু তৎপরে যখন তাহারা ভারতময় বিস্তৃত হইলেন, চারিদিকে যখন আপনাদিগের রাজ্য স্থাপন করিলেন তখন তাহাদিগের ব্যবস্থা ও নিয়মাবলীই তাহাদিগের অধোগতির কারণ হইতে লাগিল। যখন তাহারা হল ধরিয়া কেবল কৃষি ব্যবসায়ে আর্য্য নামে অভিহিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন তখন তাহাদিগের মধ্যে একভাব, আর যখন তাহারা বৃহৎ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া দেশের রাজা হইয়া দাঁড়াইলেন তখন তাহাদিগের মধ্যে ক্রমশঃ আর একভাবের উদয় হইতে লাগিল। তাহাদিগের প্রবলতম ধর্ম্মীয় ভাব ও উৎকৃষ্ট জাতীয় গৌরব এবং গর্ব্বই তাহাদিগের সর্ব্বনাশের মূল। তাহাদিগের জাতিবিভাগ এই ধর্ম্মীয় ভাব ও গর্ব্বের ফল এবং ইহা তাহাদিগের অধোপতনের একটী প্রধান কারণ।

এই জাতিবিভাগের ব্যবস্থা দ্বারা যে সমস্ত কুফল ফলিয়াছে এই স্থানে তাহার সমুদায় আলোচনা হইতে পারে না। ইহা দ্বারা আর্য্যগণের স্বজাতি প্রেমের যে একেবারে উচ্ছেদ হইয়াছে তাহাই আমরা প্রদর্শন করিতে চাহি।

এই জাতিবিভাগ প্রণালী যতদিন ব্যবসায় ও কার্য্যগত ছিল, অর্থাৎ যত-দিন কেবল ব্যবসায় ও কার্য্য দেখিয়া যে, যে জাতিতে বিভক্ত হইবে এমত নির্ণীত হইত, ততদিন ইহাদ্বারা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ এই জাতি বিভাগ কুল-ক্রমাগত হইয়া পড়িল। যখন ইহাতে ইতরত্ব ও ভদ্রত্বের ভাব প্রবিষ্ট হইল, তখন হইতেই যত অনিষ্টের সূত্রপাত হইল। প্রথমকার চারিবর্ণেও আর কুলান হইল না। উৎকৃষ্ট হইতে ক্রমশঃ নি-কৃষ্টের পর অসংখ্য নিকৃষ্ট জাতির সৃষ্টি

হইল। এই নিকৃষ্টতা গর্ব্ব ও ঘৃণার চিহ্ন, ইহাতে পরস্পরের বিদ্বেষানল ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে পূর্ব্বকার চারি বর্ণের আর চিহ্ন-মাত্র রহিল না। ক্রমে ভারত মধ্যে প্রায় সকলই ইতর জাতিতে পরিণত হইল। এক ব্রাহ্মণ সকলের উপরে বসিল। নিম্নস্থ সকল শ্রেণীকেই সেই ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত অবজ্ঞা-চক্ষে দেখিতে লাগিল। ক্রমে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়গণও তন্নিম্নস্থ জাতি-দিগকে ঘৃণা করিতে লাগিল। বৈশ্যগণ উভয়েরই ঘৃণিত হইল। আবার যখন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র মিশিয়া অসংখ্য সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হইল, তখন আর এই বিদ্বেষভাব ও ঘৃণার ইয়ত্তা রহিল না। ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিয়া, সকল সঙ্করবর্ণই আপন আপনাকেই প্রধান জ্ঞান করিল। অপর বর্ণ অস্পৃশ্য ও ঘৃণার্হ। এক জাতি অপর সকল জাতিকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। আবার এক জাতি-মধ্যেও যে সদ্ভাব ছিল, বল্লালসেন বঙ্গদেশে তাহাও বিনষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি এক জাতিমধ্যেও আবার নানা শ্রেণী বিভাগ করিয়াদিলেন। সেই শ্রেণী-মধ্যে কৌলীন্য প্রদান করিলেন। সৌভাগ্য এই, ভারতের অপরাপর দেশে বল্লালী প্রণালী মত অন্য প্রণালী চলিত নাই। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই কি যথেষ্ট নহে?

যেখানে ঘৃণা সেখানে প্রেম কোথায়? যাহারা পরস্পর অস্পৃশ্য ও ঘৃণার্হ তাহা দিগের মধ্যে সহানুভূতি ও অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? আবার প্রতি জাতির সহিত এক এক ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্যবসায়ের অপকৃষ্টতা ও উৎকৃষ্টতা নিবন্ধনও নিকৃষ্ট জাতি মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব বিলক্ষণ বিদ্যমান দেখা যায়। স্বর্ণকার, কুম্ভকার ও কর্ম্মকারকে ঘৃণা-চক্ষে দেখিয়া থাকে। কর্ম্মকার ঈর্ষা-নলে জ্বলিয়া স্বর্ণকারের পাশ দিয়াও যায় না। তৈলকার, ক্ষৌরকারকে দেখিতে পারে না। এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীকে ঘৃণা করে; কিন্তু স্ববৃত্তিধারীকে শত্রু জ্ঞান করে। এক জন স্বর্ণকার অন্য জন স্বর্ণকারের সহিত ব্যবসায়ের কায কর্ম্ম হেতু প্রায় বৈরভাবে অবস্থিত। ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে যাজন লইয়া মহা কলহ ও পরস্পর বিদ্বেষ। কিন্তু সে কার্য্য কাহারও পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিবার যো নাই। ব্রাহ্মণকে চিরকাল যাজন-কার্য্যেই ব্রতী থাকিতে হইবে। কুম্ভকারকে চিরদিন কলসই নির্ম্মাণ করিতে হইবে! কুম্ভকার ভাল কারীগর হইলেও স্বর্ণকারের ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই রূপে জাতি মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষভাব ও বৈরভাব বিলক্ষণ সঞ্জাত হইয়াছে। কেহ কাহারও সহিত সদ্ভাবে মিলিত নাই। সদ্ভাবে মিলিত থাকা দূরে থাক, একে বরং অন্যের অনিষ্ট সাধন করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। যে দেশে অধিবাসিগণের মধ্যে

এত বৈরভাব, বিদ্বেষ ও ঘৃণাভাব সে দেশে কি জাতীয় প্রেম সঞ্জাত হইতে পারে? বরং যাহা থাকে তাহা ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া যায়।

এই বর্ণবিভাগ ব্যতীত আর এক প্রকার জাতিবিভাগও ভারতবর্ষে সমভাবে প্রবল ছিল ও এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। ভারতবর্ষ একটী বৃহৎ দেশ, এবং ইহা নানা দেশে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিভিন্ন দেশবাসিগণও এক এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদিগের ভাষা বিভিন্ন, এবং কোন কোন বিষয়ে অল্পাংশে আচার-ব্যবহারও বিভিন্ন হইয়াছে। কোন কোন স্থানে আর্য্য রীতি-নীতির সহিত ভারতের আদিম অধিবাসিগণের ম্লেচ্ছ রীতি-নীতি মিশ্রিত হইয়াছে। এই রূপ মিশ্রিত হইয়া এক এক দেশবাসিগণকে এক এক স্বতন্ত্র জাতি করিয়া তুলিয়াছে। যদিও সর্ব্বদেশেই প্রধানতঃ আর্য্য ব্যবহার চলিত আছে বটে, কিন্তু এক এক বিষয়ে একটু একটু প্রভেদ দেখা যায়। সেই গুলি স্থানীয় মিশ্রণ হেতু সমুদ্ভূত হইয়াছে। উৎকলের দেশাচার বঙ্গ দেশাচারের সহিত কিয়দংশে প্রভিন্ন দেখা যায়। যেমন উৎকলীয় ভাষা বঙ্গ ভাষা হইতে বিভিন্ন হইয়াছে, অথচ মূলতঃ এক; তদ্রূপ এই দেশাচারও মূলতঃ আর্য্যভাবাপন্ন থাকিলেও স্থানীয় মিশ্রণে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। ইহার ফল এই, যে উৎকলবাসিগণ, বঙ্গবাসিগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় হইয়া গিয়াছে। যাহা উৎকল ও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বলা গেল, এই রূপ ভারতবর্ষময় ঘটিয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষে অসংখ্য বিভিন্ন জাতি বাস করিতেছে। এই জাতিগণের মধ্যে কাহারও কোন সংস্রব এবং সম্বন্ধ নাই। কোন প্রকার বন্ধনে ও সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ নাই। সকলই স্বতন্ত্র। কেহ কাহার সহিত সদ্ভাব রাখিতে ইচ্ছা করে না; বরং চিরকাল অসদ্ভাবে অবস্থিত আছে। বঙ্গবাসিগণ উৎকলবাসিগণকে ঘৃণা করে। মহারাষ্ট্রীয়গণ তৈলঙ্গজাতিকে অবজ্ঞা করে। রাজপুতগণ গুজরাটীকে স্পর্শ করিতেও চাহে না। এক জন রাজপুতের কাছে মহারাষ্ট্রী যে, বাঙ্গালীও সে এবং তৈলঙ্গবাসীও সে। তাহারা সকলকেই বিদেশী জ্ঞান করে। এইরূপ ভারতের এক দেশীয় জাতি অন্য সকল দেশীয় জাতিকে বিদেশী জ্ঞান করিয়া থাকে; এবং চিরকাল সেইরূপ জ্ঞান করিয়া আসিতেছে। তখন তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাব ও জাতীয় প্রেমের কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

আমাদিগের দায়ভাগের ব্যবস্থাও দায়াদগণের মধ্যে পরম শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব সঞ্জাত করিয়া দেয়। অন্যান্য কারণেও ভারতবাসিগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং বরাবর স্বতন্ত্র ছিল। কেহ কাহারও সহিত কখন সদ্ভাবে মিলিত হয় নাই। সমুদয় কারণ আমরা বলিতে

চাহি না। যাহা উক্ত হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভারতবর্ষে কখন জাতীয় প্রেম ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ সঞ্জাত ও বর্দ্ধিত হয় নাই। বরং ক্রমশই তাহা লয়প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন এই অনুরাগের বল আমরা ইংরাজগণের ব্যবহারে দর্শন করিতেছি; দেখিতেছি—ইহা জাতীয় বলের একটী প্রধান উপকরণ। যে দেশ যত জাতীয় প্রেমে সম্বদ্ধ, সে দেশ তত বলিষ্ঠ ও দুর্জ্জয়। যে সমস্ত বন্ধনে স্বদেশ সুরক্ষিত হয়, এই বল তাহার অন্যতম। ইহা স্বদেশীয় গৌরব ও সম্মান রক্ষা করে এবং অনুরাগের বৃদ্ধি করিয়া স্বদেশকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে। স্বদেশ এই বলে বলীয়ান্ হইয়া অন্য দেশের সমক্ষে অজেয় দুর্গ স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ভারতে ইহার অভাব থাকাতে সমগ্র ভারত কখন মিলিত হইতে পারে নাই; সুতরাং তাহা মুসলমান-হস্তে পতিত হইয়াছিল।

এক্ষণে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে চারিটি বিষয় আমরা আলোচনা করিলাম, তাহা সমুদায় বিদেশীয় ভাব ও তাহা ইংরাজগণের নিকট আমরা শিখিয়াছি। ইয়োরোপে এই কতিপয় ভাব বিদ্যমান থাকাতে ইয়োরোপ কেমন উন্নতি-শিখরে উঠিতেছে, কেমন অজেয় বলে ক্রমশই বলীয়ান্ হইতেছে, কত অতুল সমৃদ্ধি-রাশিতে সম্পন্ন ও ভূষিত হইতেছে। ইয়োরোপ আজি সুখ সম্পত্তির আকরভুমি। তাহার বল বিক্রম আর তাহাতে ধারণা হয় না। তাহা চারি দিকে প্রসারিত হইয়া পড়িতে চাহে। তাহা একদা জগতের ভীতি, গৌরব,ও আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবাসিগণ, তোমাদিগের নিকট কি এই শিক্ষা বিফল হইবে? তোমরা যে এক অভিনিবেশ-সহকারে ইংরাজগণের সাহিত্য, ইতিহাস, ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছ, তাহার উপদেশ কি গ্রহণ করিবে না? এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কবে তোমাদিগের উদ্বোধন হইবে! কবে ভারতের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে?

শ্রীপূঃ—

নাটক চন্দ্রিকা।

অতি প্রাচীন সময়ে * সংস্কৃত ভাষায় মহাভারতাদির কোন প্রখ্যাত বৃত্তান্ত অথবা কবি প্রৌঢ়োক্তি-সম্ভূত, কিম্বা লোকাচার-সংঘটিত কোন কল্পিত আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া, নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ ও প্রহসন প্রভৃতি দশবিধ রূপক এবং নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী ও হল্লীশ প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার উপরূপক লিপিবদ্ধ হইয়া সহৃদয় সামাজিকদিগের তাৎকালিক রুচি অনুসারে উক্ত নাটক নাটিকা প্রভৃতি দৃশ্য কাব্যগুলি কোন রাজার অথবা রাজকীয় কোন উচ্চ পদাভিষিক্ত লোকের নাট্যশালায় অভিনীত হইত †।

পূর্ব্বকালে অভিনয়াদি-সম্বন্ধে তাৎকালিক কবিদিগের ও দর্শকমণ্ডলীর যে প্রকার রুচি ছিল, তাঁহারা তদনুসারে নাটকাদি দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়া সামাজিকদিগের চিত্তবিনোদন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইদানীন্তন কবি ও সামাজিকদিগের রুচি তাৎকালিক রুচি অপেক্ষা অনেকাংশে বিলক্ষণ, সুতরাং সংপ্রতি সেই সমস্ত প্রাচীন মতকে অবলম্বন করিয়া নাটকাদি দৃশ্যকাব্য লেখা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

যে সময় যেরূপ সহৃদয় জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং দেশীয় রীতি-নীতির প্রবাহ যে রূপে চলিতে থাকিবে, সেই সময়ে উক্ত প্রণেতৃগণের অন্তঃকরণের বৃত্তি ও সামাজিক রীতি পদ্ধতি এই দুই বিষয়ের সমীচীন সমালোচনা করিয়া, নাটককারের দৃশ্যকাব্য প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য।

নাটকাদি দৃশ্যকাব্য প্রণয়ন করিতে গিয়া প্রাচীন সমস্ত রীতিই যে, পরিহার করিতে হইবে এরূপ নহে। যে সকল প্রাচীন রীতি বা পদ্ধতি আধুনিক সামাজিকদিগের মত পোষিকা বলিয়া বোধ হইবে, সে গুলি অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। নাট্যকলা কৌশল লিখিয়া ব্যক্ত করিতে হইলে, দেশ কাল ও পাত্রদিগের প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে কোন লোকাতীত অসম্ভব কার্য্যের অবতারণা সভ্যগণের যেরূপ হৃদয়হারিণী ছিল, বর্ত্তমানকালে আর সেরূপ নাই। এখন নাটকাদি দৃশ্যকাব্যে অস্বাভাবিক সামগ্রী পরিপোষক সহৃদয় সভ্যমণ্ডলীর

---

* প্রায় ২০০০ বৎসর গত হইল, হিন্দু-সমাজে নাটকাদির অভিনয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কারণ মৃচ্ছকটিক নামে প্রকরণ ও নাগানন্দ নামক নাটক যখন মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তখন ঐরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

† যে স্থানে অভিনয় কার্য্য সমাহিত হয় তাহাকে (Stage) কহে।

নিতান্ত অরুচিকর, সুতরাং স্বাভাবিকী রচনাই ইদানীন্তন সভ্যগণের হৃদয়-গ্রাহিণী, অতএব সংপ্রতি অতিভূমিগত কোন বিষয়কে আশ্রয় করিয়া নাটকাদি দৃশ্যকাব্য প্রণয়ন করা উচিত নহে।

নাটকের কোথায় আশীঃ (১) প্রভৃতি নাট্যালঙ্কার, কোথায় প্রকরী (২) কোথায় বিলোভন (৩) কোথায় সম্ফেট (৪) কোথাই বা পঞ্চসন্ধি (৫) এবং উক্ত পঞ্চসন্ধির উদ্দেশ্যই বা কি? সংস্কৃত নাটকাদির ন্যায় বাঙ্গালা নাটকাদিতে তাহার অনুসন্ধান করা, কিম্বা ঐ সকল নাটকাঙ্গকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোন বাঙ্গালা নাটক লেখা, নিতান্ত অনাবশ্যক, কারণ ঐ সকল লক্ষণ নিষ্কম্প রাখিয়া, আধুনিক নাটকাদির শোভা সম্পাদন করিতে গেলে, নাটকাদির রস বা বস্তু অক্ষুণ্ণ থাকে না, এজন্য বঙ্গীয় নাটকাদিতে সন্ধ্যাদি কোন অঙ্গকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দৃশ্যকাব্য লেখা কর্ত্তব্য নহে।

সংস্কৃত নাটকাদি রচনার নিমিত্ত মহামুনি ভরত যে সকল নিয়ম ও সূত্র লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে যে গুলি বঙ্গীয় নাটক রচনার নিতান্ত উপযোগী সেইগুলি ও ইদানীন্তন সহৃদয় সামাজিকদিগের রুচির অনুযায়ী আর কতকগুলি নিয়ম ও সূত্র এই নাটক চন্দ্রিকায় লিখিত হইল। সংপ্রতি বঙ্গ ভাষায় যে সকল পুস্তক বাহির হইতেছে, তাহার মধ্যে প্রায় সকল গুলিই নাটক—অথবা অসারতার আকর। অধুনাতন শিক্ষিত যুবকগণ এই সকল নাটকের নিতান্ত বিদ্বেষী। ভবিষ্যতে নাটককারগণ যাহাতে সুরুচিকর ও সুপ্রণালী-বিশিষ্ট নাটক প্রকাশ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে নিয়মাদি ও দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

অথ প্রতিকৃতি

কোন রূপ চিত্রপট দ্বারা যে নদী, পর্ব্বত, বন ও উপবন প্রভৃতির প্রতিচ্ছায়া প্রদর্শন, তাহার নাম প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতির নামান্তর অন্তঃপটী বা চিত্রপট।

মহামুনি ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র, নাটক-দীপিকা বা নাটক-চন্দ্রিকার মধ্যে চিত্রপট দ্বারা প্রাসাদ, বন, উপবন, কিম্বা শৈল প্রভৃতির প্রতিচ্ছায়া দেখাইবার কোন রূপ নিয়ম স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, তৎকালেও অন্তঃপটীক্ষেপ ও

---

(১) আশীরিষ্ট জনাশংসা। যথা শাকুন্তলে—"যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা পত্যুর্বহুমতাভব" ইতি।
(২) "প্রকরী নায়কস্য স্যান্ন স্বকীয় ফলান্তরং"।
(৩) "গুণাখ্যানং বিলোভনং" যথা বেণ্যাং দ্রৌপদী—"নাথ কিং দুষ্করং তুএপরি কুবিদেন"।
(৪) "সম্ফেটো রোষভাষণং।" যথা—বেণ্যাং রাজা অরেরে মরুত্তনয়! বৃদ্ধস্য রাজ্ঞঃ পুরতো নিন্দিতমপ্যাত্মকর্ম্ম শ্লাঘ্যসে? ইত্যাদি। (৫) পঞ্চসন্ধি যথা "মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহৃতি ইতি পঞ্চাস্য ভেদাস্যুঃ ক্রমাল্লক্ষণমুচ্যতে।'

প্রতিকৃতি-পরিবর্ত্তন দ্বারা বন, উপবন ও পর্ব্বতাদির প্রতিচ্ছায়া অবশ্যই দেখান হইত। কারণ তাহা না হইলে পৌর ও জানপদবর্গের অপবাদ-ভয়ে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতা পরিহার সময়ে একমাত্র রঙ্গস্থলে একবার অযোধ্যায় রাজপ্রাসাদ আবার তৎক্ষণাৎ ভগবান বাল্মীকির তপোবন কিরূপে দেখান হইবে? অতএব প্রতিকৃতির পরিবর্ত্তন দ্বারা পূর্ব্বে ঐ সকল ব্যাপার অবশ্যই দেখান হইত। এইরূপ অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক নাটকের অভিনয় করিতে গিয়া, সূত্রধার একস্থানে থাকিয়া প্রতিকৃতি ভিন্ন কিরূপে একবার কণ্ব মুনির তপোবন ও আর একবার মহারাজ দুষ্মন্তের রাজপ্রাসাদ দেখাইতে সমর্থ হইবে? অতএব অভিনয়-কার্য্যের সময়ে যখন যে রূপ দর্শনের প্রয়োজন হইবে, তৎক্ষণাৎ চিত্রপট প্রক্ষেপ করিয়া, সেইরূপ প্রতিচ্ছায়া দেখাইতে হইবেই হইবে, তাহা না করিলে অভিনয়-কার্য্য অত্যন্ত নীরস হইয়া পড়িবে।

যবনিকা বা বহিঃপটী।

Drop Scene.

কার্য্যানুরোধে সমস্ত রঙ্গস্থলকে আবরণ করিবার জন্য নাট্যশালার সম্মুখে যে চিত্র প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহার নাম যবনিকা বা বহিঃপটী।

যখন রঙ্গমধ্যে চিত্রপট পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, সেই সময়ে এই যবনিকার প্রক্ষেপ করিতে হয়। সংস্কৃত নাটকাদির মধ্যে যখন এই যবনিকা-পতনের নিয়ম পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন অন্তঃপটী প্রক্ষেপ দ্বারা গিরি-নদী প্রভৃতির প্রতিচ্ছায়া যে দেখান হইত, তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। প্রমাণ যথা——

"ততঃ প্রবিশন্ত্যপটীক্ষেপণাপ্সরসঃ"

ইতি কালিদাসঃ।

"তারপর যবনিকা পতন না করিয়াই উর্ব্বশী-বিরহাতুর অপ্সরোগণ রঙ্গ স্থলে প্রবেশ করিল।"

রঙ্গস্থলে অন্তঃপটী প্রক্ষেপের সময়ে যেরূপ যবনিকা পতনের প্রয়োজন, সেইরূপ পাত্র-প্রবেশের সময়ও যবনিকা-ক্ষেপের আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা না করিলে অভিনয়-কার্য্য অত্যন্ত নীরস হইয়া পড়ে। আবার পটীক্ষেপ ব্যতীতও কখন কখন রঙ্গস্থলে পাত্র প্রবেশ করিতে দেখা যায়; যথা রাজা ও আর্ত্তব্যক্তি। ইহাঁরা যবনিকা-পাত ব্যতীত প্রবেশ করিবেন *।

অথ প্রস্তাবনা।

নাটকের আখ্যায়িকা আরব্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নটী, বিদূষক কিম্বা

* তথাচ ভরতঃ।—পটীক্ষেপো ন কর্ত্তব্যঃ আর্ত্তরাজ-প্রবেশনে।

পটীজবনিকেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।

পারিপার্শ্বিক যেখানে সূত্রধারের সহিত মিলিত হইয়া, প্রকৃত প্রস্তাব বিষয়ক কথোপকথন করেন, সেই স্থানের নাটকীয় ইতিবৃত্ত-সূচক সেই প্রস্তাবকে প্রস্তাবনা কহে *। নাট্যজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবং যাঁহারা রসজ্ঞ শিরোমণি তাঁহারাও ইহার বিশেষ গৌরব করিয়া থাকেন। সংস্কৃত নাটকাদি লিখিবার নিয়মাবলি-মধ্যে মুনিবর পাঁচ প্রকার প্রস্তাবনা লিখিবার নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ পাঁচটী প্রণালী অতি আশ্চর্য্য ও সুন্দর। উহাদিগের মধ্যে চারিটী বঙ্গীয় নাটকে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মনে কর—"ঘোষেদের বাড়ি বলরাম ঘোষ তাকিয়া ঠেস দিয়া বসে আছেন. সম্মুখে খাতা হাতে বাড়ির গুরুমহাশয় বাজার খরচের হিসাব করিতেছেন" অথবা—"নিমে দ্যাখারি—নিমে দ্যাখারি—নিমে দ্যাখারি" ইত্যাদি। নাটকের প্রথমেই "প্রথম গর্ভাঙ্ক" এই কথাটী লিখিয়া, এইরূপ অনাবৃত প্রস্তাবনায় নাটকীয় ইতিবৃত্তের অবতারণা না করিয়া, নটী, বিদূষক, পারিপার্শ্বিক ও সূত্রধার প্রভৃতির পরস্পর প্রস্তাব বিশেষ দ্বারা নাটকীয় ইতিবৃত্তের সূচনা করিলে, উহা অবশ্যই সহৃদয় সামাজিকদিগের হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে; অতএব প্রস্তাবনা দ্বারাই নাটকীয় ইতিবৃত্তের উল্লেখ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অথ পারিপার্শ্বিক ও নট।

সূত্রধারের † পার্শ্বচর বন্ধুকে পারিপার্শ্বিক কহে। পারিপার্শ্বিক অপেক্ষা নটের পদ ও মর্য্যাদা কিছু কম।

পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচ প্রকার প্রস্তাবনা যথা—উদ্‌ঘাত্যক।

কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়-প্রবর্ত্তক ও অবগলিত। এই পঞ্চবিধ প্রস্তাবনার মধ্যে চারি প্রকারের লক্ষণ ও উদাহরণ ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

অথ উদ্‌ঘাত্যক।

সূত্রধার প্রভৃতির কথা শুনিয়া অন্য-প্রকার অর্থ প্রতিপাদন পূর্ব্বক যেখানে যেখানে পাত্র-প্রবেশ সংসিদ্ধ হয়, সেই স্থানে উদ্‌ঘাত্যক নামে প্রস্তাবনা হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

সূত্র। প্রিয়ে! অদ্য পৌর্ণমাসী, বড় সুখের রজনী, কিন্তু সেই দুরাত্মা ক্রুর-গ্রহ, সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে বল পূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এজন্য অন্তঃকরণ দুঃখে অতিশয় ক্লিষ্ট হইতেছে।

* নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে॥
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং বুধৈঃ প্রস্তাবনা হি সা॥

† বিদ্বান্, বক্তা, লোকাচারবিৎ তৌর্য্যত্রিকবেদী, চতুর, রসভাবজ্ঞ এইরূপ সদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তিকে সূত্রধার কহে। পারিপার্শ্বিকের গুণাবলী সূত্রধার অপেক্ষা কম।

পাঠক মহাশয়! আপনি একটু বিশেষ মনযোগী হইয়া দেখুন যে এস্থলে কি রূপে পাত্র প্রবিষ্ট হইয়া, নাটকীয় ইতিবৃত্ত সূচিত হইতেছে।

তার পর নটী সূত্রধারের এই কথার উত্তর দিতে না দিতেই নেপথ্য* হইতে চাণক্য পণ্ডিত কহিলেন—"আঃ আমি জীবিত থাকিতে ক্রূরগ্রহ অর্থাৎ নিষ্ঠুর আগ্রহ বিশিষ্ট কোন দুরাত্মা সম্পূর্ণ মণ্ডল (অর্থাৎ অখণ্ড রাজ্যবিশিষ্ট) চন্দ্রকে (অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তকে) অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে? পাঠক! আপনি দেখুন সূত্রধার, ক্রূরগ্রহ যে রাহু তদ্দারা সম্পূর্ণ মণ্ডল চন্দ্রের অভিভব দেখিয়া প্রিয়তমার নিকট আপনার দুঃখব্যঞ্জক মত ব্যক্ত করিতে গেলেন, কিন্তু তাহার বাক্যকে অর্থান্তরে পর্য্যবসিত করিয়া চাণক্য পণ্ডিত নেপথ্য হইতে বাহির হইয়া নন্দবংশীয় ইতিবৃত্তরূপ আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছিলেন; অতএব এইটি উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত হইল।

অথ কথোদ্‌ঘাত।

যে স্থলে সূত্রধারের কথা শুনিয়া, তাহার বাক্যার্থের মর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পাত্র প্রবিষ্ট হয়, তথায় কথোদ্‌ঘাত নামক প্রস্তাবনা হইয়া থাকে।

নটী। আর্য্য! আজিকার সভায় সহৃদয় সামাজিকগণের শুভাগমন হয় নাই দেখিয়া, আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছি।

সূত্র। আর্য্যে চিন্তা কি? তুমি যে-রূপ গুণবতী, তাহাতে আর ভাবনা কি? তুমি গান আরম্ভ করিলে অনেক মহোদয়েরই শুভাগমন হইবে এখনি।

নটী। আর্য্য! আপনি ভাবগ্রাহক সহৃদয় চূড়ামণি! আপনার কথার উপর নির্ভর করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; তথাপি মনে বড় সন্দেহ হইতেছে—ঐ দেখুন রঙ্গস্থলের চারি দিকে ইতর লোক সকল দণ্ডায়মান হইয়াছে।

সূত্র। আর্য্যে! তুমি প্রথমেই ঈশ্বরের গুণ গান কর, তাহা হইলেই তোমার মনোভীষ্ট এখনি পূর্ণ হইবে। জগদীশ্বর পরিতুষ্ট হইলে, তিনি দ্বীপান্তর কিম্বা সমুদ্রের মধ্যভাগ হইতেও অভিমত বস্তু আনাইয়া প্রদান করেন।

রত্নাবলী।

সূত্রধারের এই কথামাত্র শ্রবণ করিয়া রত্নাবলী নাটিকায় যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ সূচিত হইয়াছে অর্থাৎ "দ্বীপান্তর কিম্বা সমুদ্রের মধ্যভাগ হইতেও অভিমত বস্তু আনিয়া প্রদান করেন।" এই কথার সহিত সিংহলদ্বীপ হইতে যৌগন্ধরায়ণ কর্ত্তৃক সাগরিকানয়নের সাদৃশ্য আছে বলিয়া, যৌগন্ধরায়ণ নেপথ্য হইতে বলিলেন—"হাঁ সমুদ্রের মধ্যভাগ হইতেও অভিমত বস্তু আনাইয়া দেন ইহা যথার্থ বটে, দেখ কোথায় সিংহলেশ্বর দুহিতার আগমন-কালে সমুদ্রে যান

* রঙ্গশালা—সাজঘর।

ভঙ্গ, আর কোথায়ই বা সেই কন্যার এই মহারাজ বৎসরাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ; অতএব বিধি অভিমুখ হইলে, কি না হইতে পারে?" ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয়! এই প্রস্তাবনাকে অবলম্বন করিয়াই রত্নাবলী নাটিকার অপূর্ব্ব অখ্যায়িকা আরব্ধ হইয়াছে। এই প্রস্তাবনায় যে কত মাধুর্য্য ব্যক্ত হইতেছে, আপনি তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

অথ প্রয়োগাতিশয়।

যদি একরূপ প্রয়োগ করিতে করিতে ঘুণাক্ষরের ন্যায় আর এক প্রকার প্রয়োগ কৌশলে প্রযুক্ত হয়, এবং সেই প্রয়োগকে আশ্রয় করিয়া যদি পাত্র-প্রবেশ সম্পন্ন হয়, তাহাহইলে তাহাকে প্রয়োগাতিশয়-প্রস্তাবনা বলা যায়।

যেমন কুন্দবালা নামক নাটকে সূত্রধার নৃত্য-প্রয়োগের নিমিত্ত আপনার ভার্য্যাকে আহ্বান করিতে গিয়া, প্রয়োগ-বিশেষের দ্বারা সীতা ও লক্ষণের প্রবেশ-সূচনা করিয়া, আত্ম-প্রয়োগকে পরিপুষ্ট করিয়া কুন্দবালার আখ্যায়িকা সূচনা করিয়াছিল।

উদাহরণ।

নেপথ্যে—"আর্য্যা এই থানে অবতরণ করুন্" নেপথ্য হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সূত্রধার বলিলেন—"আহা কি সৌভাগ্য, আমি যে নৃত্যকথা-প্রয়োগের জন্য এখনি আর্য্যাকে ডাকিতে উদ্যত হইয়াছি, এ কোন্ মহাত্মা—"আর্য্যা এই থানে অবতরণ করুন্" বলিয়া আমার সাহায্য করিতেছেন—"ভাল দেখি না কেন এ সহযোগী বন্ধু কে।" এই বলিয়া নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া—"হা কি কষ্ট! হা কি কষ্ট!!" ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া "উঃ—আর্য্যা জনক-দুহিতা বহু দিন লঙ্কেশ্বরের গৃহে একাকিনী ছিলেন বলিয়া, লোকাপবাদ-ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া, রাজা রামচন্দ্র তাঁহাকে বনবাসিনী করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই "আর্য্যা এই স্থানে অবতরণ করুন্" বলিয়া, লক্ষণ সেই গর্ভ-ভরালসা বৈদেহীকে বনে লইয়া যাইবেন বলিয়া উদ্যোগ করিতেছেন? হায় হায়!! রাজা রামচন্দ্রের হৃদয় কি কঠিন!"

পাঠক মহাশয়! এই ক্ষণেই সীতা-লক্ষণের প্রবেশ সূচিত হইল। এস্থলে যে কি কৌশলের সহিত পাত্র প্রবিষ্ট হইবে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন। আহা! নাট্য-কলা-কৌশলের কি রমণীয়তা ও মাধুর্য্য!!!

অথ প্রবর্ত্তক।

যেখানে বর্ত্তমান সময়কে আশ্রয় করিয়া সূত্রধার বর্ণনীয় বিষয় বর্ণনা করেন, এবং সেই বিষয় আশ্রয় করিয়া পাত্র-প্রবেশ সম্পন্ন হয়, তথায় প্রবর্ত্তক

নামে প্রস্তাবনা হয়। এই প্রস্তাবনাটী বঙ্গীয় নাটকের উপযোগী নহে। সংস্কৃত ভাষাতেও ইহার তত মাধুর্য্য নাই; এই জন্য ইহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না।

অথ অবলগিত।

যেথানে একত্র সমাবেশ জন্য অর্থাৎ সদৃশোদ্‌ভাবন-হেতু পাত্র-প্রবেশ প্রসাধিত হয়, তথায় অবলগিত নামে প্রস্তাবনা হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

সূত্র। "বেগবান্ সারঙ্গ দ্বারা রাজর্ষি দুষ্মন্ত যেমন বিমোহিত-চিত্ত হইয়াছিলেন, আর্য্যে! আজি তোমার গানে আমি সেইরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছি।"

শকুন্তল নাটকে সূত্রধারের কেবল এই কথাতেই একবারে রঙ্গস্থলে দুষ্মন্তের প্রবেশ সূচিত হইয়াছে। এইরূপে নাটক লিখিবার প্রস্তাবনা শেষ হইলে, তৎপরে পাত্র-প্রবেশ ও নাটকীয় ইতিবৃত্তের সূচনা হইবে। নাটকীয় বস্তু সূচনার পর যেমন এক একটী বিষয় পরিসমাপ্ত হইবে, অমনি জবনিকা-পাত করিয়া পাত্রগণ অন্য বিষয় দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

পটীক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই নেপথ্য-মধ্যে চর্চ্চরিকার * সমালোচন করা নিতান্ত আবশ্যক; কারণ, তাহা না হইলে, অভিনয়-কার্য্য শুষ্ক হসিতের ন্যায় নিতান্ত নীরস হইয়া পড়ে।

শ্রীজটিল সন্ন্যাসী।

যুদ্ধ।

"যুদ্ধ" এই অল্পাক্ষর-গঠিত ক্ষুদ্র শব্দটী কি ভয়াবহ! কি গভীরার্থ-ব্যঞ্জক!! সামান্য দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই শব্দের অর্থ "জনগণের স্বার্থ বা মনোবাদ-জনিত দৈহিক বল-প্রয়োগ-সহকৃত কলহ-মাত্র।" সুতরাং সেই দৃশ্য ভয়াবহ হইলেও গভীরার্থ-ব্যঞ্জক হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, প্রত্যেক ঘটনার কার্য্য-কারণ এবং তাহার ভাবী শুভাশুভ ফল গণনা করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাদৃশ মনস্বীগণ এই অল্পাক্ষর-গ্রথিত সামান্যবৎ প্রতীয়মান শব্দটীর মধ্যে জগতের কত মহৎ পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করেন। তাঁহারা এই শব্দ মধ্যে জগতের বহুশতাব্দী-প্রতিষ্ঠিত

* নানা যন্ত্রের সুর একত্র মিলিত হইলে তাহাকে চর্চ্চরী (Concert) বলে। বর্ত্তমান সময়ে ইহাই একতাল সাম্য বলিয়া প্রথিত— যথা "বহুধাস্বর-সংযোগে মাধুর্য্যং চর্চ্চরী মতা।" ইতি চক্রস্বামী।

বহুল সমৃদ্ধিশালী কত জনপদের পতন, আবার নবস্থাপিত নবসৌন্দর্য্য-পরিশোভিত কত জনপদের অভ্যুত্থান পরিদর্শন করেন। কখনও কোন ন্যায়বান্ প্রজাবৎসল রাজার রাজত্ব-বিলোপ সন্দর্শনে দুঃখ-ব্যঞ্জক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, আবার কখনও বা কোন দুরাচার প্রজাপীড়ক রাজার পরাভব নিরীক্ষণে রাজ্যের ভাবী কল্যাণের আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হন। কখনও কোন রত্নমুকুট-পরিশোভিত দিব্যাভরণ-বিভূষিত নৃপেন্দ্রকে ভিখারীর বেশে পদব্রজে ভ্রাম্যমান সন্দর্শনে সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিয়া তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করেন। আবার কখনও বা সামান্য-বংশসম্ভূত চির-দারিদ্র্য প্রতিপালিত নগণ্য ব্যক্তিকে রাজমুকুট-পরিহিত স্বর্ণ-সিংহাসন-সমারূঢ় দর্শন করিয়া জগদীশ্বরের বিচিত্র লীলার মর্ম্মভেদ করিতে অপারগ হইয়া স্তম্ভিত হন। বাস্তবিক যে শব্দ দুই একটী সামান্য পল্লীর নয়, কত কত বিশাল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন-সূচক সুগভীর অর্থ প্রকাশ করে, যে শব্দ দুই একটী সামান্য ব্যক্তির নয়, কত কত নরপতির রাজ্য-বিচ্যুতির শোকাবহ ঘটনা মনোমধ্যে আনয়ন করে, তাহাকে কেন গভীরার্থ-ব্যঞ্জক না বলিব? আবার যে শব্দ উচ্চারণমাত্রেই হৃদয়-মন্দিরে জগতের যাবতীয় জীবগণের শীর্ষস্থানীয় মানব-নিচয়ের গলরুধির-পরিপ্লুত শত সহস্র ছিন্ন মুণ্ড যুগপৎ সমুদিত হইয়া মনকে ভীতি-বিহ্বল করিয়া থাকে, যে কোন শব্দ উচ্চারণ মাত্রই বীভৎস এবং ভয়ানক রস-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্তঃকরণের পুরোভাগে নৃত্য করিতে থাকে, তাহাকে কেনই বা ভয়াবহ না বলিব? সুতরাং যুদ্ধ শব্দ এক দিকে যেমনই গভীরার্থ-ব্যঞ্জক, অপর দিকে তেমনই ভয়াবহ। অদ্য আমরা সেই যুদ্ধ-সম্বন্ধে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণের সহিত অধুনাতন সুসভ্য জাতীয়দিগের তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে আমরা আর্য্যগণের, তদনন্তর ইউরোপীয়গণের যুদ্ধ-বিদ্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণন করিব।

কোন জাতির অতীতকালীয় কার্য্য-কলাপ অবগত হইতে আমরা অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের পত্রাবলী অন্বেষণ করি এবং তাহা হইতে অভীপ্সিত বিষয়ের তত্ত্ব সকল লাভ করিয়া থাকি। সুতরাং আর্য্যজাতি-সম্বন্ধীয় কোন বিষয় জানিতে হইলেও আমরা অবশ্য সেই নিয়মের অনুসরণ করিতে বাধ্য। কিন্তু বলিতে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ উপস্থিত হয়, অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, জগন্মান্য আর্য্যজাতির ইতিহাস ছিল না। যে দেশে বাল্মিকী বেদব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিকুল-চূড়ামণিগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যে দেশ মান্ধাতা, কীর্ত্তবীর্য্য রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ

নৃপকুলতিলক মহাত্মাগণের শাসন-গুণে কবি-বর্ণিত অমরাবতীর শোভা ধারণ করিয়াছিল; যে দেশ আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য,বরাহমিহির প্রভৃতি সর্ব্বজন-মাননীয় জ্যোতির্ব্বিৎগণের জন্মভূমি; যে দেশে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা-স্বরূপা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সাধ্বীললনাগণ জগতে স্বর্গের বিমল-চিত্র প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; সাগরাম্বরা ধরণীর কণ্ঠভূষা-স্বরূপ দেশ-রাজির মধ্যে যে, দেশ কৌস্তুভমণির ন্যায় দীপ্তি পাইত, সেই সোণার ভারতের ইতিহাস ছিল না!! কোন্ প্রাণে এমন বিস্ময়জনক এবং নিষ্ঠুর কথা বিশ্বাস করিব? অযুতরত্নে যাঁহার গৃহ পরিশোভিত, তাঁহার গৃহে এক মুষ্টি তণ্ডুল নাই, কে এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে পারে? কিন্তু পাঠক! যখন শ্বেতকায় মহাপুরুষগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন, ভারতে ইতিহাস ছিল না, তখন তোমার আমার প্রমাণ-বিহীন যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ-দর্শনবৎ অনুমান কে গ্রাহ্য করিবে? সুতরাং অনিচ্ছার সহিত হইলেও আমাদিগকে তাঁহাদের মতাবলম্বী হইতে হইতেছে। তবে আমরা প্রাচীন আর্য্যগণের যুদ্ধবিদ্যা-সম্বন্ধীয় বিষয় কেমনে জানিব? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—দেবীপুরাণ, রামায়ণ এবং মহাভারত প্রভৃতি অধ্যয়ন কর। সত্য বটে, ঐ সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে কবির স্বেচ্ছাচারিণী লেখনী অনেক স্থলে দূরগামিনী কল্পনার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া সত্যের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে; কিন্তু তাদৃশ কল্পনা-রাজির বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিলে যাহা প্রতীত হইবে, তাহাও অধুনাতন জনগণের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু ইহা একটী অভ্রান্ত সত্য যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে বলিষ্ঠ এবং শ্রমক্ষম ছিলেন; সুতরাং যাহা তাঁহাদের নিকট সাধ্য ছিল, তাহা আমাদের নিকট অসাধ্য প্রতীত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা যে সুদূরপরাহত কাবণীয় ঘটনাবলীর উপায় করিব, তাহা সম্যক বিশ্বাসযোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, কিঞ্চিদূর্দ্ধ তিন শত বৎসর-মাত্র অতীত হইল দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট্ মুসলমান-শিরোভূষণ মহাত্মা আকবর সাহ যখন সহস্র সহস্র সৈন্য সমভিব্যবহারে বীর-প্রসবিনী চিতোর নগরী আক্রমণ করেন, যখন চিতোর রাজকুমার পুত্ত স্বীয় সমস্ত সৈন্য সহ আকবরের সৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তখন পুত্তজননী প্রাতঃস্মরণীয়া কর্ম্মদেবী স্বীয় ষোড়শবর্ষীয়া অবিবাহিতা কুমারী এবং অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্কা পুত্রবধূর শিরীষ-সুকুমার অঙ্গে বজ্রকঠিন লৌহবর্ম্ম পরিধান করাইয়া শুধু তাঁহাদের সাহায্যে যে গিরিসঙ্কটে সম্রাটের দিগন্তর সমাগত-অযুত সৈন্যের গতিরোধে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং অতুল বিক্রমের সহিত যে দীর্ঘ কাল তাহাতে

কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন, আমরা কি তাহা মনেও ধারণা করিতে পারি? উহা কি কবি-কল্পিত চিত্রবিশেষ কিংবা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত প্রলাপ বলিয়া আমাদের মনে উদিত হয় না? যদি ভারত-বন্ধু মহাত্মা কর্ণেল টড্ বহুবায়াস স্বীকার করিয়া স্বকীয় "রাজস্থান" নামধেয় সুবিখ্যাত গ্রন্থে রজঃপুত বীরগণের অপ্রতিম শৌর্য্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তনিচয় লিপিবদ্ধ না করিতেন, যদি তিনি রাজস্থানের প্রত্যেক পল্লীকে থার্মপলি না বলিতেন এবং যদি আমরা সেই সমস্ত বিষয় শুধু আমাদের দেশীয় কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থে পাঠ করিতাম কিংবা প্রাচীন জনগণের মুখে শ্রবণ করিতাম, তবে হয় ত আমরা সেই সমস্তকে কবি কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। মনুষ্যের প্রকৃতিই এই যে, যখন সে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াও কোন গুরুতর বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, তখন অন্য ব্যক্তি সহসা তাহার চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে শুনিলে, সে প্রথমতঃ তাহা অসম্ভব মনে করিবে; কিন্তু যদি একটুকু অভিনিবেশ পূর্ব্বক সে নিজের বুদ্ধির দৌর্ব্বল্য, অল্পতা প্রভৃতি অভাবগুলি ভাবিয়া দেখে এবং কৃতকার্য্য ব্যক্তি তাহা অপেক্ষা অনেক-গুণে বলবান্ এবং বুদ্ধিমান্ এরূপ অনুমান করিবার প্রচুর কারণ পায়, তবে প্রত্যক্ষ না করিলেও তাহার আর তাদৃশ ব্যক্তির সিদ্ধান্তে উপস্থিতি-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কি শারীরিক কি মানসিক উভয়বিধ কার্য্য-সম্বন্ধেই এই নিয়ম সর্ব্বদা প্রামাণ্য। সুতরাং যাহা আমাদের সাধ্যের অতীত, তাহা যে জগৎশুদ্ধ সকলের পক্ষেই অসম্ভব, কোন ক্রমেই আমরা এমত মনে করিতে পারি না। শ্রুত বিষয়ের যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত আমাদের অভিনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন। যদি প্রগাঢ় চিন্তার পরও উহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কারণ পাই বরং তখন আমরা উহা অবিশ্বাস করিব, কিন্তু পাঠক তাই বলিয়াই মনে করিবেন না, আমরা তাঁহাকে হনুমানের শত যোজন বিস্তৃত শরীর, এক লম্ফে বিশাল সমুদ্র উল্লঙ্ঘন, প্রতি লোমে পর্ব্বতবন্ধন প্রভৃতি বিষয়কে সত্য মনে করিতে কিংবা তাহার যথার্থ অবগতির নিমিত্ত মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি। প্রাচীন পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন:—

"প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং
শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে
হংসঃক্ষীরমিবাম্ভসঃ॥

হংস যেমন জলীয় অংশ পরিত্যাগ করিয়া সারভাগ গ্রহণ করে, তদ্রূপ বিজ্ঞ ব্যক্তি বক্তাগণের ভাল মন্দ সকল প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সার

ভাগের মত গ্রহণ করিয়া থাকেন। আরও কথিত আছে:—

"অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ
শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ
পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥"

ষট্‌পদ-নিচয় যেমন পুষ্প হইতে সারভাগ মধুমাত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ কুশলী ব্যক্তি ছোট বড় যাবতীয় শাস্ত্র হইতেই সারভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাঠক মহাশয়! এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া কল্পনা হইতে সত্যোদ্ধার করিতে যত্নবান্ হউন।

আমরা সুদীর্ঘ ভূমিকা সমাপ্ত করিয়া এখন মূল বিষয়ের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু ভয় হইতেছে, পাছে "প্রভাতে মেঘডম্বরের" ন্যায় "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া" হইয়া যায়।

সাধারণতঃ আমরা মনে করিয়া থাকি, যুদ্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য এবং যাহারা সেই যুদ্ধে ব্রতী হয়, তাহাদের অন্তঃকরণ নাই। যদি তাহাদের হৃদয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তবে কি মুহূর্ত্তেকের জন্যও ভাবিতে পারি, তাহারা ভ্রাতৃ-প্রতিম জনগণের মুণ্ডকে, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না? বাস্তবিকও পৃথিবীর যুদ্ধাবলীর কারণ-নিচয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে যে, অধিক স্থলেই যুদ্ধার্থীদিগের হৃদয় পাষাণ হইতেও কঠিনতর এবং জঘন্য স্বার্থপরতা ব্যতীত তাহাদিগকে তাদৃশ যুদ্ধে প্রণোদিত করিবার অন্য কোন কারণ সম্ভবিত নয়। অধিকাংশ স্থানেই প্রবল রাজ্য-কামনা, দুর্জ্জয় ধনলোভ, দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়-প্রবলতা প্রভৃতি মনোবিকারই যুদ্ধের মূলীভূত কারণ। কারণ যেমন, কার্য্যও সুতরাং তেমনিই; এটী প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। সময় সময় বিষয়ান্তর-সংযোগে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হইলেও তাদৃশ স্থল জগতে অত্যন্ত বিরল বিধায় ঐ নিয়মকে সার্ব্বভৌমিক বলিলে বিশেষ কোন দোষ স্পর্শে না। সুতরাং মনোবিকার জনিত নীতি বিগর্হিত কারণ-নিচয় ইহাতে সমুদ্ভূত বিধায় অধিকাংশ যুদ্ধই যে পৃথিবীর নানাবিধ অনিষ্টোৎপাদন করিয়াছে, বিনা প্রমাণ-প্রয়োগেও তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে। ইতিহাসও প্রতি পৃষ্ঠায় ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু আমরা অদ্যকার প্রস্তাবে এমন সকল যোদ্ধা এবং যুদ্ধের বিষয় বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইব, যে সকল যোদ্ধা এবং যুদ্ধ—সম্পূর্ণরূপে উহার বিপরীত-ধর্ম্মাক্রান্ত। আর্য্য যুদ্ধই যে আমাদের লক্ষ্য, তাহার উল্লেখ দ্বিরুক্তিমাত্র। পরন্তু সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে যে, অনেক আর্য্যযুদ্ধও উল্লিখিত দোষনিচয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে, আর্য্য-যুদ্ধ জগতের অন্যান্য জাতীয়দিগের যুদ্ধ অপেক্ষা গৌরবার্হ এবং দোষ-

বিরলতা-সম্পন্ন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। তাঁহাদের অধিকাংশ যুদ্ধেই জগতের মঙ্গল-কামনা, যোদ্ধৃগণের ধর্ম্মের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং প্রকৃত বীরত্ব পরিলক্ষিত হয়।

আর্য্যগণের যুদ্ধ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই আমাদের চক্ষু প্রথমেই মধুকৈটভের দিকে পতিত হয়। পুরাণে কথিত আছে, বিষ্ণুর কর্ণমূল-সম্ভূত মধু ও কৈটভ নামক দুই প্রকাণ্ডকায় অসুর "ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল।" এবং তদ্দর্শনে ও তাহারা জগতের অশেষ অনিষ্টকারী বোধে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাহাদিগকে বিনাশ করেন। যদিও অধুনাতন কোন কোন লেখক পণ্ডিত-প্রবর ডারুইন্ সাহেব মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়া মধুকৈটভ প্রভৃতিকে কবি-কল্পিত বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং আত্ম-মতের পোষকতায় যথাসাধ্য যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি আমরা তাহাতে বিশেষ আস্থাবান্ হইতে পারি না। কেন না যদিও তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে সেই কালে দংশ মশ-কাদি এবং জলজন্তু প্রভৃতির উৎপত্তি সম্ভাবনীয় হয়, তথাপি শুধু নাম-মাত্রের ব্যুৎপত্তিগত মর্ম্মের প্রতি নির্ভর করিয়া বহু-কাল-প্রচলিত মতের উন্মূলন করা যুক্তি-সঙ্গত বোধ হয় না (১)। আরও দেখা যায়, শাস্ত্রোক্ত সত্যকালে অস্মদ্দেশে যে তারকব্রহ্ম নাম প্রচলিত ছিল তাহা, বোধ হয় কেহই আধুনিক রচিত বলিতে সাহসী হইবেন না। সেই তারকব্রহ্ম নাম এই :—" হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥" যিনি এই তারকব্রহ্ম নাম রচনা করেন, তিনি অবশ্যই মধুকৈটভের বিষয় অবগত ছিলেন। যদি তিনি মধুকৈটভকে দংশ মশকাদি রূপ কীট মনে করিতেন তবে স্বীয় আরাধ্য জগৎপাবন বিষ্ণুকে তিনি মধু-কৈটভনাশকারী বলিয়া কখনই স্তুতিবাদ করিতেন না; কেননা তাদৃশ কীট বিনাশ করা কখনই অতি দুর্ব্বলকায় ব্যক্তির এবং এমন কি দুগ্ধপোষ্য বালকের পক্ষেও মুহূর্ত্তেকের জন্য গৌরবার্হ হইতে পারে না। রচনার পূর্ব্বে অন্য কোন ব্যক্তি যে রচয়িতাকে কীটের পরিবর্ত্তে মধুকৈটভকে অসুর বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়াছেন, এমনও সম্ভাবিত নয়; কেননা তাহাতে পরিচয়-দাতার কোন স্বার্থ থাকা অনুমিত হয় না, বরং স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে "মধুকৈটভারি" পরিবর্ত্তে প্রকারান্তরে "দংশমশকারি" বলিলে বিদ্রূপ ভাব প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ মধুকৈটভকে দংশমশক প্রভৃতি কীট জাতীয় মনে করিলে প্রাচীন শাস্ত্রকে সামান্য বা বিনা কারণে মিথ্যা বলিতে হয়। যথেষ্ট

(১) আর্য্যদর্শন, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা ২২০।২২১ পৃষ্ঠা।

যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা শাস্ত্রকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারিলে ক্ষতি নাই, শুধু নামের প্রতি নির্ভর করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভাল বোধ করি না, কেন না কাহারও নাম গুণাবলীর পরীক্ষার পর রক্ষিত হয় না জন্মের বা সাধারণতঃ অন্নারম্ভের পরেই তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালেও এইরূপ থাকা সম্ভব নয়। অতএব আমরা যত দূর বুঝিতে পারি এবং কল্পনায় মর্ম্মোদ্ভেদ পূর্ব্বক শাস্ত্রকে যত দূর স্থিরতর রাখা যাইতে পারে, তাহাতে মধুকৈটভ এক জন দস্যু ছিল। এবং বিষ্ণু তাহাকে নিহত করেন। এইরূপ অনুমান করিলে, বোধ হয়, যুক্তি-বহির্ভূত হয় না। যাহা হউক, এই যুদ্ধের এবং ইহার পরবর্ত্তী মহিষাসুর, শুম্ভ নিশুম্ভ, সুন্দ উপসুন্দ প্রভৃতি দৈত্যগণের যুদ্ধের বর্ণনা এত দূর কল্পনা-রঞ্জিত যে মাদৃশ অল্পধী জনের পক্ষে তাহার সম্যক্ মর্ম্মোদ্ঘাটন সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে নিসংশয়ে অন্ততঃ তাহা হইতে এইমাত্র নিষ্কাশিত হইতে পারে যে, তত্তৎকালে অস্মদ্দেশীয়া ললনাগণ "পিঞ্জর-নিবদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায়" সর্ব্বদা অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠেই "লীলা খেলা" করিতেন না। আবশ্যক মতে বদ্ধ-পরিকর হইয়া শত্রুমধ্যেও প্রবেশ করিতেন এবং তাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য ব্যতীত নিন্দাজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। আর সেই বহু প্রাচীন কালেও বীরধর্ম্ম ভারতে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। কেননা তাহা না হইলে, স্ত্রীগণ কথনই সমর-প্রাঙ্গণে বহির্গত হইতেন না। আরও দেখা যাইতেছে যে, ঐ সমস্ত যুদ্ধের একমাত্র না হউক, প্রধান-তম কারণ জগতের দুর্ব্বহভার-স্বরূপ দস্যুকুলের নিপাত দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধন করা। যাহা হউক, ঐ সমস্ত যুদ্ধ কিংবা তাদৃশ অন্যান্য যুদ্ধ-সম্বন্ধে আমরা কিছু না বলিয়া, আমাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

শ্রীগঙ্গাদাস বসু।

মূল্য-প্রাপ্তি।

কলিকাতা।

১২৮৪ সাল।

বাবু নৃত্যগোপাল বিশ্বাস ৩৲
" পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ২॥০
" ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৲

১২৮৫ সাল।

বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যো কষ্টম্ হাউস্ ১৲
" অবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু ৩৲
" অমৃতলাল ঘোষ ২৲
" কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—বেরিণী ডিস্পেন্সরি ৩৲
" কেশবচন্দ্র চৌধুরী ২৲
" গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৩৲
" গুরুদাস মল্লিক ৩৲
" চণ্ডীচরণ ধর ১৲
" দ্বারকানাথ সিংহ ২।০
" পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ১৲
" প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲
" বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ১॥০
" মনোমোহন ঘোষ ৩৲
" মৃগেন্দ্রনাথ দে ২৲
" রামধন বড়াল ৩৲
" রমানাথ বড়াল ৩৲
" শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০
" অম্বিকাচরণ রায় ১৲

১২৮৭ সাল।

বাবু উপেন্দ্রলাল দাস ৩৲
বাবু উমেশচন্দ্র মৈত্র ২৲
" উমেশচন্দ্র ঘোষ ৩৲
" কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ১৲
" কুঞ্জলাল শাহা ৩৲
" কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৩৲
" কালীকুমার চৌধুরী ২৲
" কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১॥০
" গিরিজাভূষণ রায়চৌধুরী ৩৲
" গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৩৲
" গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩৲
" চণ্ডীচরণ ধর ২৲
" চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৲
শ্রীমতী চন্দ্রমণি দাসী ১॥০
বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৲
" জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ২৲
" জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৩৲
" তারিণীচরণ দত্ত ১৲
" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲
" দীনবন্ধু সান্নাল ৩৲
" নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৲
ডাক্তার নন্দলাল দে এম, বি, ৩৲
বাবু নীলমণি ভড় ১॥০
" নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ২৲
" নবীনচন্দ্র পালিত ৩৲
" নবীনচন্দ্র দাস ৩৲
" নন্দলাল দাস ৩৲

বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৲
——পব্লিক্ লাইব্রেরি টাকী	২৲
বাবু বিহারীলাল ঘোষ	৩৲
" বিপিনবিহারী আঢ্য বি, এ,	৩৲
" বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়	১৷৷০
রেভারেণ্ড্ ব্যোমন্ সাহেব	৩৲
বাবু বৃন্দাবন দত্ত	৩৲
" বলাইচাঁদ গোস্বামী	২৲
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩৲
" মন্মথনাথ চৌধুরী	৩৲
" মনোমোহন ঘোষ	৩৲
" মহেন্দ্রনাথ হালদার	১৲
" মহেন্দ্রনাথ ঘোষ জেনেরল পোষ্ট অফিস	৩৲
" মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
" যদুলাল মল্লিক	৩৲
" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—জয়মিত্রের ঘাট লেন	১৲
" যদুনাথ ঘোষ	১৲
" যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
বাবু রাসবিহারী গোস্বামী	১৲
" রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১৲
" রসিকলাল বসু	৩৲
" রামচন্দ্র মিত্র	২৲
" রাধানাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
" রামচন্দ্র মজুমদার	৩৲
" রাধামাধব বসু	৩৲
" রাজবল্লভ মিত্র	২।০
শ্রীযুক্ত রেজিষ্ট্রার জেনারল্	৪৷৷০
বাবু শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১৷০
" শরচ্চন্দ্র কুণ্ডু	৩৲
——সাবিত্রী লাইব্রেরি	৩৲
বাবু সঞ্জীবন লাহিড়ী	২৲
" হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব	১৲
" হীরালাল ঘোষ (টেলিগ্রাফ্—অফিস্)	৩৲
" হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
" হরিমোহন সেন	১৲
১২৮৮ সাল।	
বাবু শরচ্চন্দ্র কুণ্ডু	।৵০

মফঃস্বল।

১২৮১ সাল।	
বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো...বেনারস্	২৲
১২৮২ সাল।	
বাবু কৃষ্ণরমণ গোস্বামী...বাউরী	১৸১০
" কালিদাস চট্টো...ঘাটিভোগ	১।৵০
" দ্বারকানাথ রায়...মুলতান	১৷৷৵০
বাবু মধুসূদন মজুমদার...গুয়াখাড়া	৸১০
" যদুনাথ মুখো উকীল...হাজারিবাগ	৩।৵০
" যোগেশচন্দ্র মুখো...বেনারস্	২৲
" যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো...গুরুধাম	১৷৷০
" রাজকুমার মুখো...মজঃফরপুর	১৸৵

১২৮৩ সাল।

বাবু অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী জমিদার ..মুক্তাগাছা ৪৸৵০

মৌলবী আবদুলহফ্...পাবনা ৪৸৵০

শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী...ভাওয়াল ৩৷৵০

বাবু কৃষ্ণরমণ গোস্বামী...বাউরী ১৶১০

" কৃষ্ণচন্দ্র দাস...দিনাজপুর ৸০

" কালিদাস চট্টো...ঘাটিভোগ ৩৷৵০

" কুলদাপ্রসাদ মুখো উকীল... বাঁকুড়া ৪৸৵০

" কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ..রায়না ৩৲

" গৌরচন্দ্র রায় জমিদার...ঢাকা ।৶১০

" দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী তত্ত্বাবধায়ক নর্ম্মাল স্কুল...কটক ৩৷৵০

" দ্বারকানাথ রায়...মুলতান ৩৷৵০

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়·· জামুয়াকাঁদি ১৸০

রায় বৈদ্যনাথ পণ্ডিত . কটক ৪৸৵০

বাবু মধুসূদন মজুমদার...গুয়াথাড়া ২৷৷/১০

" রাজেন্দ্রকুমার বসু মুন্সেফ... রাণাঘাট ৩৷৵০

" যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো···গুরুধাম ৩৲

" রাজকুমার মুখো...মজঃফরপুর ১৷৷০

" রাধানাথ রায় জয়েণ্টইনেস্পেক্টর অফ্ স্কুল...কটক ৩৷৵০

" হরিশচন্দ্র...চৌথাম্বা ৪৲

১২৮৪ সাল।

বাবু অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী জমিদার...মুক্তাগাছা ৪৸৵০

" আনন্দমোহন বর্দ্ধন...কুমিল্লা ৸০

মৌলবী আবদুল হফ্...পাবনা ৪৸৵০

শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী...ভাওয়াল ৩৷৵০

বাবু কমলাচাঁদ হালদার...দার্জ্জিলিঙ্ ৪৸৵০

" কালীপদ চট্টো...ঘাটিভোগ ।০

" কুলদাপ্রসাদ মুখো, উকীল... বাঁকুড়া ৪৸৵০

" গোপালকিশোর ধর উকীল... বগুড়া ৪৸৵০

" গোপালচন্দ্র সান্যাল...ডোমার ৩৷৵০

" গোবিন্দপ্রসাদ দাস পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর...ভদ্রক ৪৸৵০

" গোবিন্দলাল রায় দিনাজপুর ৵০

" দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী তত্ত্বাবধায়ক নর্ম্মালস্কুল...কটক ৩৷৵০

" দ্বারকানাথ বসু...ঢাকা ৪৸৵০

" দুর্গাদাস ভট্টা...গিরিডি ৩৷৵০

" দিগম্বর চৌধুরী...পলাশডাঙ্গা ৩৲

" দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য...কাদই ১৷৷/১০

" প্রিয়নাথ ঘোষ ..আলাটিস্কুল ৪৸৵০

——বঙ্গসাহিত্য সমাজ·· পাঁড়েহাবেলী ৵০

ডাক্তার বি, গুপ্ত..পুরী ৪৸৵০

রায় বৈদ্যনাথ পণ্ডিত...কটক ৪৸৵০

বাবু বসন্তকুমার মিত্র...রাজহাট ৷৷/০

" বৈকুণ্ঠনাথ দে...বালেশ্বর ৩৷৵০

" ভুবনমোহন মুখো...কুচবিহার ৩৷৵০

মহারাজা মহাতাপচাঁদ বাহাদুর বর্দ্ধমান ৪৸৵০

কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী .. কাকিনিয়া ৪৸৵০

বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু মুন্সেফ...
রাণাঘাট ৩।৵০
" রামকুমার মিত্র...গোয়াড়ি ।৵০
" রাজকৃষ্ণ চৌধুরী...বহরমপুর ২।৵০
" যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো...গুরুধাম ।৵০
মহারাণী শরৎসুন্দরী...পুঁটিয়া ৪৸৵০
—সাহিত্য সমালোচনী সভা...ভাওয়াল
৩।৵০
বাবু হরকুমার সরকার...করচমেড়িয়া
৩।৵০
" হরেরাম চৌধুরী জমিদার...
জগদানন্দপুর ৪৸৵০

১২৮৫ সাল।

বাবু অমৃতলাল ঘোষ জমিদারশোভনা ২৲
" অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী...
মুক্তাগাছা ৪৵০
" অন্নদাপ্রসাদ মুখো, জমিদার...
উলা ৩৵০
" আনন্দমোহন বৰ্দ্ধন.. কুমিল্লা ২॥৵০
মৌলবী আবদুলহক্...পাবনা ।০
শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী...ভাওয়াল ৩।৵০
বাবু কামাখ্যাপ্রসাদ রায়...কুড়লগাছি
১॥৵০
" কিশোরীমোহন চৌধুরী...চাঁদপাড়া
৪৸৵০
" কালীপদ বন্দ্যো.. রাজসাহী ৩।৵০
" কমলচাঁদ হালদার...দার্জ্জিলিং ৵০
শ্রীমতী কৃষ্ণকিশোরী চৌধুরাণী...
তাড়াক ৩৵০
বাবু কামাখ্যা প্রসাদ রায়...কুড়ুল-
গাছি ১৸০

রাজা কালীপ্রসাদ সিংহ শৰ্ম্মা
পূৰ্ব্বধলা ১॥৵০
বাবু কুলদাপ্রসাদ মুখো, উকীল...
বাঁকুড়া ৵০
" কুলদানন্দ মুখো .সিউড়ি ৩।৵০
" ক্ষেত্রচন্দ্র দাস...কাণপুর ।৵০
" গোপালকিশোর ধর উকীল...
বগুড়া ৵০
" গোপাল কিশোর সান্যাল
ডোমার ৩।৵০
"গোবিন্দপ্রসাদ দাস পুলিশ ইন্স্পেক্টর
ভদ্রক ৪৸৵০
" গোবিন্দলাল রায় জমিদার...
তাজহাট ৪॥০
" গোপালচাঁদ নাহাটা...জিয়াগঞ্জ ৩।৵০
" তারাপ্রসন্ন সান্যাল...খালিসপুর ৩।০
" গিরিশচন্দ্র মুখো...লাহোর ॥৵০
" ত্রৈলকানাথ বসু...আলিপুর ৩।৵০
" দুর্গাচরণ রক্ষিত...সোণারপুরা ৩৲
" দিগম্বর চৌধুরী ..পলাশডাঙ্গা ৩/১০
" নিবারণচন্দ্র মুখো উকীল...
ভাগলপুর ৪৸৵০
" প্রফুল্লচন্দ্র মুখো...খিদিরপুর ৩।৵০
" প্রিয়নাথ ঘোষ...আলাটিস্কুল ১৵০
" প্যারীলাল ঘোষ...পাবনা ৩৵০
" পঞ্চানন মদক...বাঁকীপুর ৩।৵০
" প্রসন্নকুমার বসু...শিলং ৩।৵০
" বসন্তকুমার মিত্র জমিদার...
রাজবাটি ১৲
——বঙ্গ সাহিত্য সমাজ...পাড়েহাবেলী
৩।৵০

রায় বৈদ্যনাথ পণ্ডিত...কটক ৪৸৴০
ডাক্তার বি, গুপ্ত...পুরী ৩।৵০
——বঙ্গসাহিত্য সমাজ...কাশী ৩।০
বাবু বসন্তকুমার মিত্র...রাজহাট ২।৵০
" বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী...ঢাকা ৩।৵০
কুমার মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী... কাকিনিয়া ৪৸৴০
বাবু মন্মথকুমার বসু সবডেপুটী সাতক্ষীরা ৪৸৴০
মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর... বর্দ্ধমান ৩।৵০
বাবু যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী...মোস্তবাপুর ৩।৵০
" যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার, বরাহনগর ৩৲
" যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো...গুরুধাম ৩।৵০
" রাজেন্দ্রকুমার বসু মুন্সেফ্... রাণাঘাট ৪৸৴০
" রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার... গোপালপুর ৪৸৴০
" রসিকলাল দত্ত ইঞ্জিনিয়ার... ধরমতুল ৩৵০
" রামচন্দ্র চৌধুরী...কাছাড় ১॥০
" রামযাদব ঘোষাল...আওরাইল ৩৸৴০
পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন... কৃষ্ণনগর ৩।৵০
বাবু সীতাকান্ত মুখো, ডেঃ ম্যাজিষ্টেট বশীরহাট ১৸৴০
" হরেরাম চৌধুরী...জগদানন্দপুর ৩।৵০

১২৮৭ সাল।

বাবু অমৃতনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী মুক্তাগাছা ৩।৵০
" অপূর্ব্বকৃষ্ণ মিত্র ডিঃ ওভার্শিয়ার... নয়াদুমকা ৩।৵০
" অম্বিকাচরণ হাজরা পোষ্টমাষ্টার আমলাসদরপুর ৩।৵০
" আনন্দকিশোর তরফদার জমিদার সেরপুর ৩।৵০
" আনন্দচন্দ্র দাস...ধুবড়ী ৩।৵০
" আদিত্যপ্রকাশ বন্দ্যো,...সিমলা-পাহাড় ৩।৵০
" উপেন্দ্রনাথ বসু ..জমিদার পানি-সেহালা ৩।৵০
" কিশোরীমোহন চৌধুরী চাঁদপাড়া ৩।৵০
" কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়...দেহুড়দহ ৩।৵০
" কামাখ্যাপ্রসাদ রায় কুড়ুলগাছি ৩।৵০
রাজা কালীপ্রসাদ সিংহ শর্ম্মা পূর্ব্বধলা ১৸১০
বাবু কালীপ্রসাদ সিংহ . বর্দ্ধমান ৩৵০
" কেদারনাথ দত্ত...বোয়ালিয়া ৩৵০
শ্রীমতী কৃষ্ণকিশোরী চৌধুরাণী... জমিদার তাড়াশ ৩।৵০
" কৃপাময়ী দেবী...ভাওয়াল ৩।৵০
বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র আদিত্য...কর্ণেলগঞ্জ ৩।৵০
" গোবিন্দপ্রসাদ দাস...পুলিষ ইন্স্পেক্টর ভদ্রক ।৵০
" গিরিশচন্দ্র মুখো...লাহোর ৵০
" গোবিন্দলাল রায় জমিদার তাজহাট ৩।৵০

বাবু গৌরীকান্ত রায়...লাহোর ১৷০
" গোবিন্দপ্রসাদ সরকার জমিদার
নাটোর ৩৷৶০
" চারুচন্দ্র চট্টো, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর...
বাঁকুড়া ৩৷৶০
" ত্রৈলোক্যনাথ হালদার·· ফয়জাবাদ
৩৷৶০
"ত্রৈলক্যনাথ বসু...আলিপুর ৩৷৶০
" তারাপ্রসন্ন বন্দ্যো ..বারাসত ৩৷৶০
" তারিণীচরণ মুখো শিক্ষক
বারুইপাড়া স্কুল ৩৷৶০
" দ্বারকানাথ বাক্‌চি
জামালপুর ৩৷৶০
" দ্বারকানাথ মুখো...নয়াহুম্‌কা ৩৷৶
" দিগম্বর চৌধুরী
পলাশডাঙ্গা স্কুল ৸/১০
" দুর্গানারায়ণ চৌধুরী ..নড়াল ২৷০
" নীলাম্বর মুখো এম, এ, বি, এল,...
কাশ্মীর ৩৷৶০
" নরেন্দ্রনারায়ণ কর...গুজরপুর ৩৷৶০
" নিবারণচন্দ্র মুখো উকীল ··
ভাগলপুর ··· ৩৷৶০
" নরেন্দ্রনারায়ণ রায়
জামুয়াকাঁদি ৩৷৶০
" নীরদনাথ রায়চৌধুরী...
মহেশপুর ৩৷৶০
"প্রসন্নকুমার বসু ..শিলং ৩৷৶০
" প্রফুল্লচন্দ্র মুখো...খিদিরপুর ৩৷৶০
—পবলিক লাইব্রেরি...সুনামগঞ্জ ৩৷৶০
বাবু পঞ্চানন মুখো শিক্ষক...নবদ্বীপ
হিন্দুস্কুল ৩৷৶০

বাবু বসন্তকুমার মিত্র জমিদার...
রাজহাট ২৷৶০
" বিহারীলাল বসু উকীল
হুসঙ্গাবাদ ৩৷৶০
—বঙ্গসাহিত্য সমাজ...পাঁড়েহাবেলী
৩৷৶০
বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সামন্ত ..মহিষাদল ৩৷৶০
" বিহারীলাল সেন...নিমাসরাই ৩৷৶০
" ভিবিরাম বড়ুয়া ..শিলং ৩৷৶০
কুমার মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী ··
কাকিনিয়া ৩৷৶০
বাবু মন্মথকুমার বসু সবডেপুটী ..
সাতক্ষীরা ১৸৶০
" মহেন্দ্রকুমার রায়...দেওয়ান
বাড়ীহিল চট্টগ্রাম ৩৷৶০
" মনোমোহন বন্দ্যো...লক্ষীপাশা ৩৲
" মন্মথনাথ বসু . যশোর ১৲
ডাক্তার মহেশচন্দ্র ধর...ধনিয়াখালি ৩৷৶০
বাবু যদুনাথ মুখো. .জুনিয়াদহ ৩.০
" রামপদ ঘোষ...দেউলিয়া ৩৷৶০
" রাজেন্দ্রকুমার বসু মুন্সেফ...রাণাঘাট
২৷০
" রাধাচরণ বন্দ্যো জমিদার...
গোপালপুর ৩৷৶০
" রামযাদব ঘোষাল আওরাইল ৩৷৶০
" রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী হরিরপুর ৩৷৶০
" রাজবিহারী বাড়রী বিটকা ৩৷৶০
" রজনীলাল দাস গোয়ালপাড়া ৩.০
" ললিতমোহন সেন এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জন
ডিঙ্গাভাঙ্গা ৩৷৶০
" লক্ষ্মীনারায়ণ পাল, চাঁইপাঠ ২৲
" ললিতমোহন মুখো, জানিয়াদহ ৩৷৶০

মহারাণী শরৎসুন্দরী...পুটিয়া ৩।৵০
বাবু শ্যামকান্ত চক্রবর্ত্তী...দেবীগঞ্জ ৩।৵০
——সাধারণ পাঠাগার...খিদিরপুর ৩।৹

বাবু সূর্য্যকুমার পণ্ডিত...বহরমপুর ৵১০
১২৮৮ সাল।
শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী...ভাওয়াল ১॥০

ভ্রমসংশোধন।

কলিকাতার

১২৮৪র মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার-স্তম্ভে

বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র	৩৲ না হইয়া	২৲	হইবে।
" অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যো (কষ্টম হাউস)	৩৵০ "	১৵০	"

১২৮৫ র মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার-স্তম্ভে

বাবু বসন্তকুমার চট্টো, ৩৲ না হইয়া { বাবু বসন্তকুমার চট্টো (হিতকারী সভা, কুষ্টে) ২৲ ; " বসন্তকুমার চট্টো,—জেনারল পোষ্ট আফিস্ ১৲ } হইবে।

১২৮৭ র মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার-স্তম্ভে

বাবু বনওয়ারি লাল দে	পরিবর্ত্তে	দাস	হইবে।
" মাখনলাল নাগ	"	সিংহ	"
" হীরালাল ঘোষ ৩৲	"	২৲	"

OPINIONS OF THE PRESS.

Indian Mirror 29th September 1880.

"The author of the *Kabya Sundari* appears to have read the works of Babu BUNKIM CHUNDER with great care, and to have entered thoroughly into the spirit of that successful novelist. The style of this work is, we are glad to note, not characterized by that kind of long windedness and heaviness, which is intended by some writers and mistaken by some readers, for the acme of rhetorical excellence and the model of sublime eloquence. The language is simple and pleasant, and the author has therein displayed a happy nack of bringing his readers to a quick realization of the beauties and qualifications of the characters taken up for criticism."

নববিভাকর। ৭ ভাদ্র।

"বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী পাঠকগণকে এই পুস্তক খানি পাঠ করিবার জন্য আমরা বিশেষ অনুরোধ করি। পূর্ণবাবু নিজে ভাবুক ও হৃদয়ালু, পাঠকের মনে সেই ভাবুকতা ও হৃদয়ালুতা সিঞ্চন করিয়া দিতেও বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

কাব্যসুন্দরী বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন পূর্ণবাবুর কাব্যসুন্দরী না পড়িলে তাহাদের অধ্যয়ন-বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে।"

বঙ্গীয় কবি।*

"Blessings be with them, and eternal praise,
Who gave us nobler loves, and nobler cares
The Poets, who on earth have made us heirs
Of truth and pure delight by heavenly lays."

WORDSWORTH.

আমরা অবকাশাভাবে বঙ্গীয় কবির সমালোচনা কিছু কাল স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এখন আবার আরম্ভ করিলাম। কিন্তু দুই-জন মাত্র কবির রচনার আংশিক সমালোচনা করিতেই এই পত্রিকার ৩৩ পৃষ্ঠার অধিক হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার বিস্তৃত আয়তনে সমালোচন করিতে থাকিলে কেবলমাত্র এই দুই কবির সমালোচনে এক খানি মধ্যমাকারের পুস্তক হইয়া উঠে। নবীন বাবু এবং হেমবাবু ব্যতীত অন্য বঙ্গীয় কবি আছেন, তাহা আমরা ভুলি নাই। সুতরাং নবীন বাবুকে এবং হেম বাবুকে শীঘ্র পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যাতে নবীন বাবুর প্রচুর প্রশংসা করিয়া তাহার পরবর্ত্তী কয়েক সংখ্যাতে তাঁহার বিশেষ নিন্দা করিতে বাধ্য হইয়াছি। সেই জন্য এখন নবীন বাবুর প্রশংসা করিবার সুবিধা পাওয়াতে আনন্দিত হইতেছি।

তেজ, নীতি ও রুচি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন লালিত্য ও প্রসাদ গুণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। এবার আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, নবীন বাবু হেম বাবু অপেক্ষা এ বিষয়ে কোন মতেই নিকৃষ্ট নহেন। এ বিষয় নবীন বাবুর সমুদয় রচনা সাক্ষ্য দিবে। "পলাশির যুদ্ধের" আরম্ভ দেখ—কেমন সুন্দর, বিশদ, মনোমোহন;—পড়িলেই মনকে কেমন আকর্ষণ করিয়া সংলগ্ন রাখিয়া গ্রন্থের ভিতর লইয়া যায়। কেবল লালিত্য ও প্রসাদ-সম্বন্ধে কেন, আরম্ভটী সকল বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট। আরম্ভ,—

"দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী
নিবিড় জলদাবৃত গগনমণ্ডল;
বিদারি আকাশতল,—যেন দুষ্ট ফণী
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল।"

আমরা হেম বাবুর ভারতভিক্ষার আরম্ভের কয়েক ছত্র যেমন প্রতি শব্দে ব্যাখ্যা করিয়াছি, এখানেও তাহা করিব। "দ্বিতীয় প্রহরনিশি" এই রূপে সময় নির্দ্ধারিত করাতে পাঠকের মনে যে সকল চিন্তার স্ফুটন, হয় তাহা এই সর্গের

* আর্য্যদর্শনের ৫ম খণ্ড, ৪৫৮ পৃঃ পর।

পরবর্ত্তী ঘটনার, এই গ্রন্থের পরিণামের, মূল ঘটনার নিতান্ত উপযোগী। আর, কথাবার্ত্তাতে "দুপোর রাত্রি" শুনিলেই আপনা হইতেই মনে কেমন একটা বিবিধ চিন্তা জড়িত ভাবের উদয় হয়। যেন গভীর বিষাদ, * যেন পুত্রশোক-বিহ্বলা জননীর অবিরামবাহী অশ্রুধারা, যেন প্রাণপতির বিরহে প্রণয়িনীর মর্ম্ম-বেদনা রূপ দীর্ঘনিশ্বাসের হৃদয়োচ্ছ্বাস, যেন জীবনের সমুদয় দুঃখের ঘনীভূত স্মৃতি—অথবা যেন নারকী নিশাচরের নিঃশব্দ পদসঞ্চার, পাপিজনের অনুতাপ ও ভয়, অনুতপ্ত ও ভয়ার্ত্ত হৃদয়ের স্বপ্ন বিভীষিকা, প্রান্তরে ভগ্ন মন্দিরে ষড়যন্ত্র কারিগণের গূঢ় মন্ত্রণার অপরিস্ফুট শব্দ—যেন চারি দিগ চম্ চম্ করিতেছে। যেন সকলেই নিদ্রাতে অভিভূত। কেবল কেহ কেহ বিশেষ কারণ বশতঃ জাগরিত আছে—যেন এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা "দুপোর রাত্রি" এই কথাটী শুনিলেই, মনেতে আসিয়া উদিত হয়,; যেন "দুই প্রহর রাত্রি" এই বাক্যটীর কি একটী ঐন্দ্র-জালিক শক্তি আছে। তার পর "নীরব অবনী।" ইহাতে নিস্তব্ধতা, আনন্দ-শূন্যতা, প্রতীক্ষাময়তা বুঝাইতেছে। "জলদাবৃতে" অন্ধকার, "নিবিড়ে" গাঢ়-তর অন্ধকার, "জলদ" শব্দে বৃষ্টির ও মেঘগর্জ্জন ইত্যাদির সম্ভাবনা, এবং "গগন-মণ্ডলে" সমগ্র আকাশ বুঝাইতেছে।

* "In that midnight of the mind."
(*Stanza to Augusta.*—LORD BYRON.)

আরম্ভের দুই ছত্রে দেখিতেছি—ঘোরা রজনী—নিস্তব্ধতা, গাম্ভীর্য্য, গাঢ়-তম তমিস্রা, সন্নিকট মেঘগর্জ্জনের ও অশনিনিপাতের আশঙ্কাময় আয়োজন। পড়িবামাত্র বুদ্ধিমান্ পাঠক বুঝিলেন যে গতিক ভাল নহে, বড় দুর্যোগ; এ কোন একটী ভয়ানক কার্য্যের সূত্রপাত; আশঙ্কা করিলেন "কোন হতভাগ্য ব্যক্তির বুঝি সর্ব্বনাশ হয়।" নবীন বাবুর ভাষার লালিত্য ও প্রসাদগুণ সম্বন্ধে আমরা "পলাশির যুদ্ধের" কোন্ স্থান হইতে উদ্ধৃত করিব, তাহা স্থির করিতে পারি না, কারণ তাহার ভাষার সমুদয় স্থানই ললিত ও প্রসন্ন। যেমন মিষ্ট, তেমনি পড়িবামাত্রই সুন্দর পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। নবীন বাবুর এই গুণপূর্ণ-ভাব সর্ব্ববাদিসম্মত। হেমবাবুর সকল স্থান সম্বন্ধে আমরা এই প্রশংসা করিতে পারি না।

সম্ভবপরতা ও সাধারণ উপযোগিতা। এ সম্বন্ধে নবীনবাবুর অনেক স্থানে বিশেষ দোষ দেখা যায়। আমরা কেবল একটী মাত্র এখানে উল্লেখ করিব। পলাশীর যুদ্ধ পড়িলে বোধ হয় যে, নবীন বাবু রচনাকালে তাহা কি প্রণালীতে লিখিবেন, তাহা মনে পরিষ্কাররূপে স্থির করিতে পারেন নাই। একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইল সুতরাং গ্রন্থাবশেষে কিছু কাঁদা আবশ্যক সুতরাং তিনি কাঁদিয়াছেন। কিন্তু কাহার নিমিত্ত কাঁদিয়াছেন, তাহা পাঠককে বুঝিতে দেন নাই। নবাব

সিরাজদ্দৌলা কবির স্বীকার মতে নিষ্ঠুর নরহত্যাকারী, নরাধমশ্রেষ্ঠ। যবনরাজ্য, পতন সময় সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী, অজ্ঞান তিমিরাবৃত। সুতরাং তাহার জন্য ক্রন্দন শোভা পায় না। ইংরাজের জয় হইল বলিয়াই বা কাঁদেন কি রূপে? কারণ ইংরাজরাজ্য যবনরাজ্য অপেক্ষা অধম নহে। কবি যুদ্ধান্তে মোহনলালের মুখে নিজেই বলিয়াছেন

"ভারতের নয় আজি অসুখের দিন
আজি হতে যবনেরা হবে হতবল
কিবা বলী মধ্যবিত কিবা দীন হীন
আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকলে"
(পৃ ১২১)

তথাচ এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া যাইল, কাঁদিব না? অবশ্য কাঁদিব। সুতরাং মোহনলাল কাঁদিতে লাগিলেন, অস্তগামী সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া—

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি।
তুমি অস্তাচলে দেব, করিলে গমন
আসিবে ভারতে চির বিষাদরজনী—"

কেন? পলাশি যুদ্ধের পরবর্ত্তী রাত্রিতে "ভারতে চির বিষাদ রজনী" নূতন করিয়া আবার আসিবে কেন? চির-বিষাদ রজনী যদি আসিয়া থাকে, তাহা হইলে যখন যবনগণের অস্ত্রাঘাতে হিন্দু-গণ সমরে ভূতলশায়ী হইল, যখন জগন্মান্য আর্য্যসুত যবনসিংহাসন-পদতলে পদাবনত হইল, তখনই সে চিরবিষাদ-রজনীর আরম্ভ হইয়াছে। নূতন করিয়া আরম্ভ হইবার আর আবশ্যক কোথায়? তার পর,

"উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ করে,
কি দশা দেখিয়া আহা! ডুবিছ এখন?"

প্রাতঃকালে সূর্য্য যখন উঠিয়াছিল, তখন বঙ্গে নবাবের, যবনের আধিপত্য, সায়াহ্নে সূর্য্য যখন অস্তগত হইতেছে তখন ক্লাইবের, ইংরাজের আধিপত্য। নবাবের শাসন কি ইংরাজের শাসন অপেক্ষা ভাল ছিল? কবি স্বয়ং পুস্তকের আরম্ভে লিখিয়াছেন,—

"যবনের অত্যাচার করি দরশন,
বিমলহৃদয় পাছে হয় কলুষিত;
ভয়েতে নক্ষত্রমালা লুকায়ে বদন,
নীরবে ভাবিছে মেঘে হবে আচ্ছাদিত।
প্রজার রোদন, রাজ আমোদের ধ্বনি,
করিয়াছে যামিনীর বধির শ্রবণ।"

আবার,—

"ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল নিশীথিনী
নীরবে নবাব-ভয়ে করিছে রোদন;
নীরবে কাঁদিছে আহা বঙ্গবিষাদিনী,
নীহার নয়ন জলে তিতিছে বসন।"

যদি বল মোহনলালের মতে যবন রাজত্ব ভাল ছিল, তাহা হইলে মোহন-লাল যুদ্ধের সময় মুস্তাফরকে যবন রাজত্ব সম্বন্ধে কি বলিতেছেন শ্রবণ কর,—

"কিম্বা যেই পাপে বঙ্গ করেছ পীড়িত
হতভাগ্য হিন্দুজাতি, দহিয়াছ দিবারাতি
প্রায়শ্চিত্ত কাল বুঝি এই উপস্থিত।"
(পৃ ১০)

উপরেও আমরা উদ্ধৃত করিয়া

দেখাইয়াছি যে, মোহনলাল পলাশীর যুদ্ধ ভারতের পক্ষে অসুখের দিন বিবেচনা করেন। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য তবে কেন মোহনলাল পলাশির যুদ্ধ উপলক্ষে বঙ্গের দুঃখে কাঁদিয়া অস্থির? তবে কেন মোহনলাল বলিতেছেন,—

"নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধুজলে?"

নবীন বাবুর অনুকূলে এ সম্বন্ধে একটী কথা বলা যাইতে পারে। মোহনলাল তাহার অন্তিম বক্তৃতার এক স্থানে বলিতেছেন তাহা এই,—

"যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বর্দ্ধিত
কোন্ হিন্দুজাতি নাহি নিরাশাসদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা-আশায় পূরিত?
কিন্তু তব অস্ত সনে, কি বলিব আর
সেই আশাজ্যোতিঃ আজি হইবে আঁধার"
(পৃঃ১১৬)

এইটীতে কতক সম্ভবপরতা রক্ষা করিতেছে বটে, কিন্তু মোহনলালের মুখে এই কথাগুলি কত দূর সঙ্গত তাহা পাঠক বিবেচনা করুন। মোহনলাল প্রভুভক্ত, ইতিহাসে বা নবীন বাবুর "পলাশীর যুদ্ধে" অন্য কোন স্থানে মোহনলাল বঙ্গের বা ভারতের স্বাধীনতার নিমিত্ত কোন উদ্যোগ করিয়াছিলেন বা চিন্তিত ছিলেন,তাহার প্রকাশ নাই। আর মহারাষ্ট্র কর্ত্তৃক হিন্দুদিগের আবার উন্নয়ন হইবে, যদি মোহনলালের এইরূপ বিবেচনা ও আশা করিবার যথার্থই কোন কারণ থাকিত, তাহা হইলে পলাশিরণে অন্যায় যুদ্ধে, মৃজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইব জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমুদয় আশা বিলীন হইল, মোহনলালের এইরূপ স্থির করিবার কোন কারণ ছিল, তাহা আমাদিগের বোধ হয় না। যাহা হউক, এস্থলে আমরা নবীন বাবুকে তত দোষ দেই না।

পরাভূত, শোণিত-প্লাবিতদেহ, মূর্চ্ছান্তে জাগরিত, রণক্ষেত্রশায়ী মোহনলাল যে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছেন তাহা ও অস্বাভাবিক বোধ হয়। তিনি সেই ভীষণ, চাঞ্চল্যময়, যন্ত্রণাময় অবস্থাতে ভারতের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কেমন সুধীর ও নিশ্চিন্তভাবে আলোচনা করিতেছেন, তখন তিনি ভারতের "ইতিবৃত্ত প্রতি পৃষ্ঠায়" পড়িতেছেন, তখন তিনি প্রশান্তভাবে এক দিকে আবঙ্গজীব আলাউদ্দীনের অত্যাচার, অপর দিকে বাবর ও আকবরের সুশাসন (১১২ পৃঃ ১৮ শ্লো) তুলায় ওজন করিতেছেন, তখন তিনি ইংলণ্ডের অদ্য কি সুখের দিন, "সমুদয় ইউরোপ" তাহার এই সৌভাগ্য কিরূপ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া আলোচনা করিবে ইত্যাদি বিষয় অনুধাবন করিবার সময় পাইতেছেন (পৃঃ ১২০ শ্লো ১৪)। অনুমান করি, মোহনলাল কলিযুগের মনুষ্য নহে, অন্য যুগের লোক। মোহনলাল ভীষ্মদেব, কণ্টক শয্যায় শুইয়া শান্তি পথের অবতারণা করিতেছেন।

আমাদিগের বোধ হয় বিষয় নির্ব্বাচনে নবীন বাবু সৌভাগ্যশীল নহেন। পলাশির যুদ্ধে তাহার নায়কের অভাব। এই পুস্তকের প্রধান ব্যক্তি দুই জন, সিরাজ, ও ক্লাইব। সিরাজ পাপময়, ক্লাইব বিদেশীয় ব্যক্তি। এক দিকে সিরাজের পতনে শোকাকুল হইয়া পাঠকের সহবেদনা চাওয়া যেমন অসঙ্গত, তেমনি অন্য দিকে বিদেশীয় জাতির নেতা বিদেশীয় ক্লাইবের জয়ে আনন্দিত হওয়া তেমনি অসম্ভব। সুতরাং নবীন বাবু উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। যদি কেহ বলেন নবীন বাবুর দোষ নহে, দোষ বঙ্গের ইতিহাসের, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তবে নবীন বাবু স্বয়ং কেন বলিয়াছেন যে,

"বঙ্গ ইতিহাস, হায় মণিপূর্ণ খনি
করিব কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা,"

অন্য সকল গুণ সম্বন্ধে আমরা অতিবিস্তৃতি ভয়ে নিতান্ত এক কথাতে আমাদিগের মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। চরিত্রগঠনে সৃজনশীলতা, কল্পনার প্রসর,(Range of imagination) দৃষ্টির বিস্তৃতি (Comprehensiveness of view,) চিন্তার উচ্চতা, প্রাকৃতিক জগতের সহিত অনুভূতি ক্ষমতা, এই সকল বিষয়ে হেম বাবু অবিসম্বাদিতরূপে নবীন বাবুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক্ষণে নবীন বাবুর সম্বন্ধে আর একটী মাত্র কথা বলিয়া আমরা তাঁহার নিকটে বিদায় লইব। আমাদিগের স্মরণ হইতেছে যেন বঙ্গদর্শনে বা অন্য পত্রিকাতে অনেক দিন হইল পড়িয়াছিলাম "যে নবীন বাবু বাঙ্গালার বাইরণ।" আমরা সেইটী পড়িয়া বড় আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। আমরা এই কথা যখন পড়িয়াছিলাম, তখনই মনে করিয়াছিলাম যে ইহার অর্থ হয় নবীন বাবুর তোষামোদ, না হয় বাইরণের অপমান। ইংলণ্ডের সাহিত্যাকাশে নক্ষত্রের উদ্ভ্রান্ত গতিতে, জ্বলন্ত জ্যোতিতে খ্যাতিলব্ধ সার্ ওয়াল্টার স্কটের কবিতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, * যাহার উত্তপ্ত, বিপ্লাবিত হৃদয়ের ধূমময় অগ্নি, আগ্নেয়গিরির ন্যায় Childe Harold এ অবিরাম উদ্গীরিত হইতেছে, যাহার অভূতপূর্ব্ব অতুল মহিমাময় Manfredকে গেটে "a wonderful phenomenon" বলিয়াছেন, যাঁহাকে ম্যাটসিনি, "কবির সাম্রাজ্যের নেপোলিয়ন" (the Napoleon

* "While the poetical fame of Scott was at its zenith, a new star rose above the horizon, whose eccentric course and dazzling radiance completely bewildered the Spectator. * * * It was found impossible for the ear once accustomed to strains of such compass and ravishing harmony (as those of Lord Byron were) to return with the same relish to purer, it might be, but tamer melody; and the sweet voice of the Scottish minstrel lost much of its power to charm, let him charm ever so' wisely." (Prescott's Essay on Sir W. Scott.)

of Poetry) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন † তাহার সহিত আমাদিগের নবীন বাবুকে তুলনা করিতে দেখিলে লজ্জায় মুখ হেট করিতে হয়।

ভাই বাঙ্গালি! তুমি আর কথায় কথায় আপনাদিগকে ইংরাজদিগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সহিত তুলনা করিও না। আমরা অধম হইয়াছি বলিয়া কি অধম ও উত্তমের মধ্যে যে তারতম্য তাহাও কি বুঝিতে পারি না? ইংরাজের সহিত শৌর্য্যে, শক্তিতে, সাহসে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, কবিত্বে যে প্রভেদ তাহা অপরিমেয়। যাহা তোমাতে নাই তাহার নামমাত্র তোমাতে সংলগ্ন করিয়া মনকে প্রবোধ দিলে কি হইবে? ইনি বাঙ্গলার বাইরণ, ইনি বাঙ্গলার মিল্টন, ইনি বাঙ্গলার বিস্‌মার্ক, উনি বাঙ্গলার ওয়াসিংটন এ সকল কথা শুনিলে চক্ষে জল আইসে, ঘৃণাতে মরিয়া যাইতে হয়। আমরা বাঙ্গালী আবার জাতি! আমাদিগের আবার বাইরণ! আমাদিগের আবার বিস্‌মার্ক, আমাদিগের আবার ওয়াসিংটন! বাঙ্গালি! তোমার যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক, তোমার যাহা পৈতৃক সম্পত্তি, নীচতা ভীরুতা তাহা তুমি যতনে রক্ষা করিয়া দিনপাত কর। তুমি "বজ্জাতি" ইত্যাদি মহামান্য শব্দে অভিহিত হইয়া প্রশান্ত চিত্তে প্রভুত পরাক্রান্ত হাকিমী পদে পরিবর্দ্ধমান থাক, তুমি কেরাণী পদে নিযুক্ত থাকিয়া সকলের সম্মুখে ঘৃণিত শূকরের ন্যায় ভৎর্সিত ও ব্যবহৃত হইয়া, চোক মুছিতে মুছিতে মাসিক বেতন গৃহে লইয়া, নিজের ও স্ত্রীর উদর পূরণ কর; আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি, কিছু বলিও না, জানি কি যদি চাকুরী যায়। তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া কনেষ্টেবলী না লইয়া, শ্বেতাঙ্গ পুরীষশালা, শ্বেতভ্রূকুটী ভয়ে, পুরীষ মুক্ত কর। তুমি উকীল হইয়া স্বজাতির অপমানকারী ঐ পুরীষশালাস্বামীর শ্বেতপদাম্বুজের উদ্দেশে মেমোরিয়ল (Memorial) নামক অঞ্জলি প্রদান কর, পরকালে তোমার মুক্তি হইবে। তুমি সুশিক্ষায় বিভূষিত হইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব্বিত উপাধি সকল লাভ করিয়া, অথবা ন্যায়ের প্রধান শ্রেণীস্থ ব্যক্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়া, একজিবিসন (exhibition) দোহাই দিয়া চাঁদা তুলিয়া বেশ্যা

† Whence could the soul of Byron draw inspiration? Where find a symbol for *the immense poetry that burned within him*? Despairing of the world around him, he took refuge in his own heart, and dived into the inmost depths of his soul. *In it indeed was whole world*, a volcano, a chaos of raging and tumultous passions; a cry of war against society, such as tyranny had made it; against religon, such as the Pope and the craft of priests had made it; and against mankind as he saw them, isolated, degraded and deformed. He hearkened to the cry of his soul, and hurled it forth, a malediction against creation, repeated in a thousand tones, but ever with the same intensity and energy. (The Italics are ours.—Life and Writings of Joseph Mazzini vol. 1, p. 146.)

নর্ত্তকীর নৃত্যে, বারাঙ্গণা-অভিনেত্রীর অভিনয়ে ও গীতে, পাঁচ দিনের জন্য নগরের কতক লোককে আমোদে মজাইয়া, বাঙ্গালীর স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়া-সক্ত আবেশময় নীচ জীবনকে নীচতর করিয়া, তোমার সমুদয় Public spirit Patriotism ব্যয় কর। এখন জিজ্ঞাসা করি আমরা সংসার হইতে বিলুপ্ত হই না কেন? অথবা যদিও বাঁচিয়া থাকি তবে কথায় কথায় ইংরাজের সহিত আপনাদিগকে তুলনা করি কেন? এই তুলনাতে কাণে বড় বাজে, হৃদয়ে বড় আঘাত লাগে। সে দুঃখের কথা এখানে আর তুলিয়া আবশ্যক কি? কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখিয়া ফেলিলাম। পাঠক, মাপ করিবেন।

আমরা বলিতেছিলাম, যেমন বাঙ্গালী জাতির সহিত ইংরাজ জাতির তুলনা হয় না, তেমনি নবীন বাবুর সহিত বাইরণের লেখার তুলনা হইতে পারে না। বাইরণের লেখার দোষ নবীন বাবুর লেখাতে প্রচুর পরিমাণে আছে আমরা দেখাইয়াছি, কিন্তু বাইরণে লেখার যে সকল উচ্চ গুণ, তেজ, শক্তি, গভীরতা, মাহাত্ম্য তাহা নবীন বাবুর লেখায় কোথায়? তাহা আমরা নবীন বাবুর লেখাতে প্রত্যাশাও করিতে পারি না, কারণ—কাল, জাতীয়ত্ব এবং ব্যক্তিত্ব (Individuality)। এখন নবীন বাবুর জাতীয়ত্ব কোথায় যাইবে। বাঙ্গালী জাতির যে দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীতে এবং সেই জন্য নবীন বাবুতেও কতক পরিমাণে নিহিত থাকিবার সম্ভাবনা। আমরা জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, যে খানে স্বাধীনতার অভাব, সেখানে উচ্চপ্রকৃতির সাহিত্য, উচ্চ প্রকৃতির কবিত্ব পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না।

বাইরণের যতই কেন দোষ থাকুক না বাইরণের জীবন যতই কেন পাপ-বিকৃত হউক না, বাইরণ এক জন ইংরাজ, একজন স্বাধীন ইংরাজ,—মহৎ বংশে জন্ম—এবং সহৃদয় অন্তঃকরণ বিশিষ্ট। তাঁহার সহৃদয় অন্তঃকরণ ভ্রান্তিময়ী নীতিতে বিধ্বস্ত হইয়াছিল—মালিন্যময় ও বিকৃত হইয়াছিল। বাইরণের জীবনের শোচনীয় পাপ-পরম্পরা, তাহার অধিকাংশ লেখার নিতান্ত নিন্দার্হ ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রবণতা-মাপ করিবার নিমিত্ত আমরা পাঠককে বলি না। কিন্তু আমরা এখানে এই মাত্র বলিতেছি যে বাইরণ যদিও স্বকীয় রচনাতে আপনাকে মানবদ্বেষী বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিয়াছেন তথাচ তিনি একজন প্রকৃত মানবহিতৈষী ছিলেন। যদি তা না হইত, যবনদিগের অত্যাচার হইতে গ্রীসকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কেন তিনি মিসলংঘীতে (Missolonghi) প্রাণত্যাগ করিলেন? নবীন বাবুর কথা দূরে থাকুক, কোন্ বাঙ্গালী অন্য দেশের নিমিত্ত আপনার জীবন দিতে

প্রস্তুত? অন্যদেশের কথা দূরে থাকুক, নিজের দেশের জন্যই বা কোন্ বাঙ্গালী মরিতে প্রস্তুত? তাই বলি বাঙ্গালীর সহিত ইংরাজের তুলনা করা বিড়ম্বনা-মাত্র, নবীন বাবুর সহিত বাইরণের তুলনাও বিড়ম্বনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কবির প্রথম আবশ্যক হৃদয়ের বেগ, দ্বিতীয় আবশ্যক ভাষার ক্ষমতা। যে মহান্ ও উচ্চভাবে চালিত হইয়া, যে হৃদয়ের বেগে অধীর হইয়া মনুষ্য স্বদেশের স্বাধীনতার নিমিত্ত অবলীলাক্রমে প্রাণ-ত্যাগ করে, অন্যের হিতের নিমিত্ত আপনাকে অক্ষুণ্ণমনে বলিদান দেয়, সে মহান্ ও উচ্চভাব, সে হৃদয়ের বেগ বাঙ্গালীতে কোথায়? বাঙ্গালী মনেতে যাহা যেরূপ কখন অনুভব করে নাই তাহা সেরূপ কেমন করিয়া বর্ণনা করিবে? অধিকাংশ বাঙ্গালী লেখক যাঁহারা বাইরণের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বাইরণের লেখার দোষের ভাব, ইন্দ্রিয়াসক্তি-প্রবণতা ইত্যাদি কেবল গ্রহণ করিয়াছেন। বাইরণের লেখার শক্তি, মহিমাময় হৃদয়োচ্ছ্বাস, তাঁহাদিগের লেখাতে দেখা যায় না। নবীন বাবুও বাইরণের লেখার দোষ পাইয়াছেন তাহার গুণ তত পান নাই।

আমরা ইহার পরে, অবকাশ মতে অন্যান্য কবির বিষয় সমালোচনা করিব।

বাল্মীকি কল্পকুঞ্জ দৃশ্যাবলি।

বৈজয়ন্ত ধাম।

দেব সভা।

ইন্দ্রাদি দেবগণ আসীন; সকলে বিমর্ষ।

রতি।—(দেবরাজের প্রতি।)

এ বৃথা চিন্তায় দেব কি ফল ফলিবে?
বিরূপাক্ষবলে বলী রক্ষ দুরাচার
অবহেলে তাই দেবে!—সদা পাপে রত
তবু স্নেহ তার প্রতি করেন ত্রিশূলী!
কিন্তু কত দিন আর? পূর্ণ লঙ্কা পাপে!
পূর্ণতরী নীরে যদি, ডুবিবে অচিরে!
এ বৃথা চিন্তায় ফল? নিরূপিত যাহা,
নিরূপিত দিনে দেব অবশ্য হইবে।
সদানন্দময়ী নিদ্রা উৎসঙ্গ প্রদেশে
লভিতে শ্রীঅঙ্গ তব অনুমতি হেতু
সাধিছেন সকাতরে!—যাও নিদ্রা পরে
সময়ে হইবে ক্ষয় রক্ষ দুরমতি!
এ পাপের ভরা আর সবেন পিনাকী
কত দিন? যায় লঙ্কা কে রাখে তাহারে?

ইন্দ্র।—

কি সুখে ভুঞ্জিব নিদ্রা মদন বাসনা?
পড়িছে সুতীব্র অশ্রু অশোক কাননে
বিদ্যুদাগ্নি সম যেন প্রতি বিন্দু তার
দহিছে এ বক্ষ মোর!—কপর্দ্দী প্রসাদে

দুর্দ্দম রাক্ষস দর্পে দেবে অবহেলি
অনায়াসে রত পাপে!—ত্রিদিবের পতি
সমুচিত শাস্তি তার নারি বিধানিতে!
নাহি মৃত্যু—মনস্তাপে ইচ্ছি মরিবারে!
এদেব বিভব বৃথা অস্ত্র ইরম্মদ—
শক্তিধর সেনাপতি—বৃথা দেব-বল!—
দেববীর্য্য দেবনাম নাম মাত্র স্বধু!—

শচী।—

নিতান্ত কি দেব-বীর্য্য অস্তমিত তবে
হীনবল ইরম্মদ রক্ষ পরাক্রমে?
মর্ত্ত্য লোক জন্মি রক্ষ ছার নব-কুলে
অবহেলি দেবদলে বিজয়-দুন্দুভি
বাজায় গৌরবে হায় অমরার মাঝে!
অবহেলে সহে দেব! হায় কি লাঞ্ছনা
অমর হইয়া যদি রক্ষ-পরাক্রমে
ম্রিয়মাণ দেবদল রক্ষ পদরজ
মাখি অঙ্গে কর তবে মহত্ব-প্রচার!
আমি যে অঙ্গনা ইচ্ছি রণ-রঙ্গে সাজি
নিবাই এ অঙ্গজ্বালা রক্ষ রক্ত নদে!
রক্ষছলে বন্দা সতী দেবে সাক্ষী করি
কান্দিছেন দিবানিশি—নাহি মৃত্যু তাই
নতুবা শরণ তব লইত শমন
কতদিনে!—ধন্য দেব তাই অবহেলে
(দেববীর্য্য ব'লে তাই) সবে এ লাঞ্ছনা!
বৃত্রাদি-তারকাসুর-সংহারক তেজ
নিয়োজিলা বিধি বুঝি (দুরদৃষ্ট হায়)
সহিবারে এতদিনে রক্ষ-পদাঘাত!
সহ দেব—ধন্য তেজ!—বৈজয়ন্ত ত্যজি
রব মর্ত্ত্যে যত দিন এ কলঙ্ক-রেখা
রহিবে সজীব ভবে!—কেমনে সহিব
সতীর নয়ন-অশ্রু একাসনে বসি
সুর-সিংহাসনে হায়! পুরন্দর বামে?—

কার্ত্তিকেয়।—

বৃথা দেব-বীর্য্য নহে দেবেন্দ্রাণী কভু!
বৃত্রহন্তা ইরম্মদ হীনশক্তি নহে!
কিম্বা শক্তিধর নাহি ধবে শক্তি বৃথা!
সেবারে জিতিল রক্ষ বিভাবসু-বরে!
দেব-বলে বলী রক্ষ দেবে পরাভবে
নতুবা কি সাধ্য তার? শক্তির আদেশে
সম্বরিণু অস্ত্র যেই—সর্ব্বভুক ছলে
গর্ব্বিলা কুলিশে হরি ব্রহ্মতেজ যেই
জিতিল রাবণি তাই অমর-সংগ্রামে!
কিন্তু বাক্যব্যয় বৃথা—দেহ অনুমতি
সুরবৃন্দ সাজি পুন পশি লঙ্কা পুরে!
দেখিব এবার রক্ষ কোন্ দেব-বরে
বিমুখে অমরবৃন্দে? আদেশ নতুবা
একাকী মথিব লঙ্কা!—তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
সহ রক্ষ দুর্গ হর্ম্ম্য চূর্ণি রক্ষপুরী
ডুবাইব সিন্ধুনীরে! চাঁদের কলঙ্ক
সম এ সিন্ধুর ভালে লঙ্কার নিশান
দেবের কলঙ্ক-রেখা ঘুচিবেক তবে!
নতুবা দেবেন্দ্র! বৃথা শক্তিসুত আমি
বৃথা রুদ্র-তেজ মোর! বৃথা গর্ব্বে ধরি
শক্তিধর নাম দেব! দেব-সেনা-মাঝে!

(নেপথ্যে দেব-দুন্দুভি-নিনাদ)

চিত্ররথ।—

অমর-দুন্দুভি শুন বাজিছে আপনি
হে দেবেন্দ্র মহাগর্ব্বে! দেহ অনুমতি
সাজিয়া সমর সাজে পশি লঙ্কা-মাঝে
অমর গন্ধর্ব্ব যক্ষ নর সহ মিশি
লঙ্কার বিভব আজি দেই রসাতলে!

পবন।—

তার সহ যায় বিশ্ব যাক্ রসাতলে
আয়াসে পালিব বিশ্ব আমরা বাসব!
প্রগল্‌ভ রাক্ষস দুষ্ট শূলীর সহায়ে
করিবে না ইচ্ছা তাহে দেবে অপমানি!
যথেষ্ট হয়েছে জিষ্ণু আর নাহি সহে
খুলি মত্ত বায়ু-দলে, দেহ অনুমতি,
পূর্ণ দণ্ডে যত আশা পরিপূর্ণ করি।—

(দীর্ঘনিশ্বাস ও হুহুঙ্কার)

বৃহস্পতি।—

হিতে বিপরীত হবে দেখহ বিচারি
হে দেবেন্দ্র শক্তিধর গন্ধর্ব্বের পতি!
দেহ ক্ষমা প্রভঞ্জন! অসাধ্য কি তব?
দেব রক্ষ নরে মেলি আরম্ভিলে রণ
লঙ্কায়, নিশ্চয় বিশ্ব যাবে রসাতলে!
উচিত কি পুরন্দর দেখহ বিচারি!
বিদ্যা-বুদ্ধি-শাস্ত্র-শস্ত্রে-বিশারদ তুমি!
নাশিতে কণ্টকে কবে স্বহস্তে কৃষক
লাগায় অনল ক্ষেত্রে শ্রমে উপার্জ্জিত?

বরুণ।—

সত্য যা কহিলা গুরু আয়াসে পালিয়া
স্বহস্তে নাশিতে বিশ্ব না হয় উচিত!
তবে কি উপায়ে দেব দেখহ বিচারি
নির্ম্মূল হইবে রক্ষ—সদা রত পাপে?
ক্ষোভে কি কহিব গুরু দ্বিগুণ বড়বা
আগুন জ্বলিছে হৃদে! সহিছি তথায়
কি করি? শিবের বরে অজেয় রাক্ষস!

কৃতান্ত।—

এ যুক্তির অর্থ আমি নারি বুঝিবারে!
গরবে করিবে রক্ষ পদাঘাত দেবে
নিঃশঙ্কে সহিবে দেব?-যায় যাক্ বিশ্ব!
কেন?-কোন্ লোভে দেব সবে এলাঞ্ছনা?
যে পারে সহুক সেই—আর নারি আমি
একাকী চলিনু এই—

(গমনোদ্যত)—

পশি লঙ্কামাঝে
(তোমরা করহ যুক্তি) ভীম দণ্ডাঘাতে
হে নীলাম্বু তব নীরে বিচূর্ণ করিয়া
সসৌধ কাঞ্চন লঙ্কা ফেলাইব আজি!—

পবন।—

(গাত্রোত্থান করিয়া)

আমিও তোমার সঙ্গী; নহি এ যুক্তিতে।
চল অবিলম্বে তবে—বিশ্বের গীতিকা-
অভিনয় পূর্ণ আজি করিব দু জনে।

বৃহস্পতি।—

ক্ষান্ত হও হে কৃতান্ত!—তুমিও পবন!—
হিতে বিপরীত হবে—নারিবা সাধিতে
স্বকার্য্য; নতুবা দেব!—রোষিবেন শুনি
বিশ্বম্ভর এ বিশ্বের বিনাশ-যুকতি!
বড় স্নেহে বসুন্ধরে পালেন রমেশ
কি সাধ্য কাহার দেব করিতে সাধন
বিশ্বের বিনাশ!—বিষ্ণু ভকত বৎসল
বিশ্বের মঙ্গল-হেতু হরি দেব তেজ
তেজহীন করিবেন অমরে এখনি!
নহিবে শকতি তবে হে কৃতান্ত তব
তুলিতে আপন দণ্ড!—শূন্য তেজে তবে
কি করিবে প্রভঞ্জন দেখ ভাবি নিজে?
শিবের রক্ষিত লঙ্কা!—লঙ্কেশ আপনি
শৈবোত্তম—রক্ষসেনা মহা পরাক্রমী!
ত্যজ ক্রোধ, লহ যুক্তি; নাশিতে রাক্ষস,
বাসনা যদি হে দেব পূজি ভক্তিভাবে

ধর জগদম্বে তবে!—কার সাধ্য আর
ফিরাতে হরের মন হরপ্রিয়া বিনা?—

ইন্দ্র।—

বৃত্রাসুর কাড়ি স্বর্গ, বাহুবলে যবে
নিমূর্দ্দিলা দেব বলে—রুদ্রবলে বলী!—
বিপদে তারিণী তবে তারিলা দাসেরে!
দেবভাগে স্নেহাধিক সদা ভবানীর
সাধনায় সিদ্ধ গুরু অবশ্য হইবে
মনোরথ—হেন আশা হইতেছে মনে!
অস্তবায় যাইতে পাছে বা কৈলাসে
লঙ্কার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঘটান শঙ্কর—
আইস পবিত্র আজি বৈজয়ন্ত করি
আবাহনি ভবানীরে।—উরিবেন মাতা
ভকত-বৎসলা, দেব, অমরনিবাসে?
'দুর্গা' রবে সুধু বাজুক ত্রিদিবে আজি
অমর-দুন্দুভি।—কম্বু তব শক্তিধর
বাজাও সানন্দে সুধু 'দুর্গা' নাদে আজি!
'দুর্গা' রবে গুন্ গুন্ করিতে মধুরে
আদেশ কুসুম-নাথ—কুসুমবান্ধব—
কুসুমে মধুপদলে!—রসাল মন্দারে
পীকবর 'দুর্গা' নাম গাইতে পঞ্চমে!
আদেশ জীমূতদলে গরজিতে আজি
দুর্গা-রবে চিত্ররথ!—হে মরুত তুমি
স্বনি 'দুর্গা দুর্গা' সুধু প্রতি দ্বারে দ্বারে
জাগায়ে অমরবৃন্দে করহ প্রচার
এ বাসনা!—দুর্গা-রবে পূরুক ত্রিদিব!—
এস তবে দেবদল—

(শচীসহ সিংহাসন হইতে অবতরণ,—সর্ব্ব মধ্য-
স্থলে শচীসহ দেবরাজের জানু পাতিয়া
উপবেশন;—যোড়হস্তে মুদিত
নয়নে সকলের ধ্যান—)

সকলে সমস্বরে—

কোথা গো তারিণি! শৈলেন্দ্রনন্দিনি!
যোগেন্দ্রবাসনা গণেন্দ্রজননি!
সঙ্কটে অমর স্মরিছে শঙ্করি!
কৃপায় কৃতার্থ কর গো মা উরি!—
শ্মশানে মশানে গোলোকে ভূলোকে
সূর্য্য শশী নর কিম্বা ব্রহ্মলোকে
ক্ষিতি বা সলিলে অনিলে অনলে
কুলিশে কমলে অমৃতে গরলে
বিপদে সম্পদে বিষাদে হরষে
স্বরগে মরতে নরক নিবাসে
অথবা কৈলাসে হরের উরসে
ধনদ ভবনে রতন ভূষণে
হরের কুটীরে মলিন বসনে
গিরিরাজ ঘরে বাপের দুলালে
কপর্দ্দীর সহ অথবা কোঁদলে
বিরিঞ্চি ভবনে সুরত-সৃজনে
অথবা গোলকে সৃজন পালনে
অথবা কৈলাসে বিরস বদনে
হরের প্রত্যাশে বসি অনশনে
ভিকের আশয়ে—দু'দিকে দু'জন
গণেন্দ্র কার্ত্তিক করিছে রোদন
অথবা কাশীতে হরেরে তোষিতে
স্বর্ণাসনে বসি হাসিতে হাসিতে
অন্নপূর্ণা রূপে পরম যতনে
ক্ষুধিত শঙ্করে পরান্ন প্রদানে—
ভকতে তারিতে সুধার অসিতে
আপন মস্তক অথবা দানিতে
দনুজ-দলনে মনুজ-পালনে
ব্রহ্মাণ্ড-সৃজনে অথবা নাশনে!—
জাগ্রত শয়নে যে ভাবে যেখানে

আছো মা তারিণি! শৈলেন্দ্রনন্দিনি!
যোগেন্দ্রবাসনা গণেন্দ্রজননি!
সঙ্কটে অমর স্মরিছে শঙ্করি!
কৃপায় কৃতার্থ কর গো মা উরি!—

(কোমল বাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টি,—গিরিজার আবির্ভাব;—দেবগণ চরণমূলে চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক)

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—

পড়েছি বিপদে প্রসীদ বরদে
শশাঙ্ক-শেখর-অঙ্কবাসিনী।
দারুণাপমান ফণীর দংশন
যন্ত্রণায় অতি অস্থির জীবন
সহেনা সহেনা কর নিবারণ
স্মরহরপ্রিয়া শুম্ভঘাতিনী।
অশোক কাননে সতীর নয়নে
হের মা সলিল পড়িছে সঘনে
কৃপাময়ী নাম তবে গো কেমনে
এ দুঃখ নয়নে হের পাষাণী।
পাপ-পৃথিবী-ভার সহিতে
অধীরা বাসুকি নারেন ধরিতে
অধরমে রত রক্ষ দুরমদে
নাশি কর তারা স্থির ধরণী।

ভগবতী।—

অসাধ্য দেখিছি দেব একার্য্য-সাধন।
শূলীর রক্ষিত লঙ্কা!—তবে যে দুর্গতি
লঙ্কার, বাসব! তাহা আমার কৌশলে!
রাঘবের পক্ষে আমি—রঘু-বংশে দয়া
সতত আমার ইন্দ্র!—শক্তিধরা কিন্তু
লঙ্কেশে সতত স্নেহ করেন ভবেশ!—
বিষাদে ত্রিশূল হস্তে সরোষে ধূর্জ্জটি
লঙ্কার দুর্দ্দশা হেরি চাহেন পশিতে
আপনি সমরাঙ্গনে!—সক্রোধে সতত
অর্পেণ যতেক দোষ আমার উপরে!
সরোষে শঙ্কর এবে করিলা স্বীকার
ফিরিতে ত্রিশূল করে লঙ্কার চৌদিকে
আপনি!—কেমনে কহ, আর কি কৌশলে
ঢাকিব নিখিলদর্শী হরের নয়ন?
অসাধ্য আমার এবে এ কার্য্যসাধনা!—

ইন্দ্র।—

অসাধ্য এ বিশ্বে কিবা বিশ্বধ্যেয়া তব?
অসাধ্য দাসের তাহা বুঝিতে জননি!
কলুষে পূর্ণিত লঙ্কা—তুমি না নাশিলে
কলুষনাশিনি! লঙ্কা,—তুমি না মুছিলে
সতীর নয়ন-অশ্রু হইবে পূর্ণিত
আয়াসে রক্ষিত পৃথ্বী পাপেতে জননি!
না পারি' সহিতে ভার অনন্ত আপনি
ডুবিবেন রসাতলে!—কর দয়া মাত!
বিপদে অভয় পদে লয়েছে শরণ
দেবতা, অভয় দান কর মা শঙ্করি!

ভগবতী।—

হেরিলে হরের ক্রোধ হে বৃত্রবিনাশি!
কি কব অভয়া আমি সভয়ে কম্পিতা!
বীরবাহু-শোকে যবে বিষাদে রাবণ
কান্দিলা, কপর্দ্দী তবে বিষাদে নিশ্বাসি
তুলিলা ত্রিশূল দণ্ড বধিতে রাঘবে!
অনলস্ফুলিঙ্গ সব বাহিরিল বেগে
মুহুর্মুহুঃ বিভাবসু ত্রিনেত্র হইতে!

কল্লোলিনী সুরধুনী জটার মাঝারে
ভৈরবে।—সভয়ে আঁখি মুদিলা চন্দ্রমা
সভয়ে চরণে আমি পড়িনু কান্দিয়া।—
সরোষ কটাক্ষে ঘন চাহি মোর পানে,
বিষাদে রাখিলা শূল সঘনে নিশ্বাসি!
কাঁপিল আতঙ্কে গিরি কৈলাস সঘনে!
আর কি কহিব দেব? ভকতে রক্ষিতে
নহেন কুণ্ঠিত হর উপেক্ষিতে মোরে!
অসাধ্য আমার বিষ্ণু যাও যথা সবে
ভবেশ, তোষিয়া লভ ইষ্ট আশুতোষে!

রতি।—(সভয়ে মদনের হস্ত ধরিয়া কাণে কাণে)
তুমি পাছে যাও নাথ—মাথা খাও মোর
নাহি কায এস যাই নন্দনকাননে।
শুনিলে হরের নাম ডরে কাঁপে হিয়া
সংহার সাধনে সাধ সতত তাঁহার
নাহি দয়া হায়! নাথ, হরের অন্তরে!
স্মরিলে শিহরি আমি পূর্ব্বের সে কথা—।

ইন্দ্র।—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
অভয়া আপনি যদি সভয়ে কম্পিত
কার সাধ্য যায় আর রুদ্রদেব-কাছে?
বুঝিনু পাপের জয় হেতু এ সৃজন
জগদম্বে!—মিছা ধর্ম্ম মরীচিকা আশে
কাটে অল্প আয়ু ক্লেশে তৃষাতুর সাধু।—
(অধীর হইয়া)
অই মা করুণাময়ি অশোক-কাননে
কান্দিছে রাঘবলক্ষ্মী সাক্ষী দেবে!—
না পারি দণ্ডিতে আমি পাষণ্ড রাক্ষসে!
রুদ্রেশ-প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয় লঙ্কেশ
অহঙ্কারে মত্ত সদা স্বেচ্ছাচারে রত!—
পুত্র তার চিরজয়ী বিভাবসু-বরে
মোরে পরাভবি নাম বাসববিজয়ী!
রোষে ক্ষোভে অপমানে কি কব জননি!
জ্বলিছে মরমে অগ্নি! অমর—নতুবা
ইচ্ছা করে ইচ্ছাময়ি দম্ভোলি নিক্ষেপি
স্বশিরে এ মর্ম্মজ্বালা নিবাই নিমিষে!—
হায় মা ঘৃণায় মরি ত্রিদিবেন্দ্র আমি
যথা শাস্তি দুরাচারে নারি বিধানিতে!
বৃথা এ ইন্দ্রত্ব মাত! শুধু বিড়ম্বনা
কেন তবে কাত্যায়নি! অর্পিলা দাসেরে?
নাহি কায—
(রাজমুকুট ভগবতীর চরণতলে রাখিয়া)
লও মাত! দিও ভোলানাথে
কহিও অর্পণ যেন করেন লঙ্কেশে
যদ্যপি বাঞ্ছিত তার! এক ভিক্ষা মাগি
কৃপাময়ি করুণাময়ি অরূপ দাসেরে!
অমর হইয়া আর এ মরম-ব্যথা
সহিতে ডরাই মাত! কর মর দাসে।—

কৃতান্ত।—
পূজে রক্ষ, পূজে দেব, উভয়ে শঙ্করে
তবু যদি রক্ষ-পক্ষে বিরূপাক্ষ-দয়া
অধর্ম্মের আধিপত্য বাড়াইতে শুধু
আজি হতে ত্যজিলাম স্বভার জননি!
লহ দণ্ড নাহি কায দিও গঙ্গাধরে!
(দণ্ড চরণ তলে রাখিয়া)
কেন ক্লেশে কোন্ লোভে রক্ষিব ধরণী?
অপমান পুরস্কার যথেষ্ট পেয়েছি
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে মত্ত অহঙ্কারে
করুক যা ইচ্ছা রক্ষ নাহি ক্ষতি তাহে!

পবন।—
আমারও সেইকথা—মিছা পরা ভোগে,
আর নহি জগদম্বে!—দেহ সুরেশ্বর

অনুচর বায়ুদলে কারাগার খুলি!
স্বেচ্ছায় ফিরিব আমি যথা ইচ্ছা মোর
মেরুশৃঙ্গে, সিন্ধুনীরে!—বন্দী হয়ে আর
নাহি রবে প্রভঞ্জন!—নাহি ক্ষতি তাহে
উপাড়ি সুমেরু যদি পড়ে সিন্ধুমাঝে!
কিম্বা লঙ্কা ডুবে তার অতল সলিলে
সুধাংশু-শেখর-প্রিয়—নাহি ক্ষতি তাহে
রোষি যদি কৃত্তিবাস দণ্ডেন দাসেরে!
কি দণ্ডে ডরিব খণ্ড পরশু কামিনি?
বিচারি আপনি দেখ;—জ্বলিছি নিয়ত
অপমান-অগ্নি-মাঝে—এর চেয়ে আর
গুরুতর কোন্ অগ্নি আছে মা নরকে
ডরিব জননি যাহে? বলদাতা বিধি
অবশ্য দিবেন বল সহিতে তাহারে।
থাকে থাক, নাহি ক্ষতি নয় বা সহিব—

বৃহস্পতি।—

অপমান-বিষধর বিষম দংশনে
দেবের এ উন্মত্ততা ক্ষম ক্ষেমঙ্করি!
তুমি বিনা দয়াময়ি আর কার কাছে
করিবে আবদার দেবে দেবের জননি!
তব দত্ত এ ইন্দ্রত্ব—দিক দিকপালে
রক্ষিতে এ মহা সৃষ্টি।—পরম আয়াসে
সতত রত, দেবতা সে ভার বহনে!
তোমার ইচ্ছার মাত! সুব্রত সতত
দেবতা দমিতে পাপ, তুলিতে ধরমে
কিন্তু দর্পে ফিরে রক্ষ কপর্দ্দীর বলে
নিয়ত অধর্ম্মপথে দেবে দেখাইয়া।
অভাগিনী কাঁদে সতী অশোক-কাননে
আকাশের পানে আঁখি সাক্ষী করি দেবে!
শুনে হেরে নারে কিন্তু প্রতিবিধানিতে
এর চেয়ে মনস্তাপ কি আর সম্ভবে
দেবের? নগেন্দ্রবালা দেখহ বিচারি।
দেবের ভরসা আর কি আছে বিপদে
ও যুগল পদ বিনা? অভয় জানিয়া
লয়েছে স্মরণ তাহে সঙ্কটে দেবতা—
কৃপায় অভয়দান করগো অভয়া!

কার্ত্তিকেয়।—

শুনি ক্ষোভে মরি মাত! প্রগল্‌ভে রাবণি
উপহাসে দেবদলে পরাভবি রণে
বাসবে!—লঙ্কেশ মত্ত এই অহঙ্কারে
শক্তিধরে বিমুখিয়া বিমুখিল রণে
পুত্র তার ত্রিদিবেন্দ্রে! তোমার আদেশে
সব বিণু মহা অস্ত্রে!—সর্ব্বভুক ছলে
করিলা অচল বজ্রে ব্রহ্মতেজ হরি।
বিমুখিল দেবে রক্ষ!—কলঙ্কে ভরিল
সংসার!—সংহারি রণে দুরন্ত তারকে
রোপিনু যে কীর্ত্তিবৃক্ষ কৌশলে জননি!
কাটিল রাবণি তাহে! দেহ অনুমতি
ঘুচাইব এ কলঙ্ক একাকী সমরে—
দেখিব কি বলে বলী রাবণনন্দন
এবার নিবারে দাসে ওপদ-প্রসাদে।—
খরতর শরজালে পরমাণু করি
উড়াইব স্বর্ণলঙ্কা।—জলধি ভৈরবে
গর্জ্জিবে বিপুল রঙ্গে তাহার উপরে
অচিহ্ন করিয়া লঙ্কা। নতুবা আদেশ
(বৃথা কলঙ্কের ভাগী সেনাপতি-পদে
কেন হই) ত্যজি পদ যাই মা কৈলাসে
সতত পুরাই সাধ সেবি তোমা দোঁহে।

ভগবতী।—

(মুকুট ইন্দ্রের মস্তকে পরাইয়া)
পাইনু পিরিতি আজি ত্রিদিব আলয়ে
ধর্ম্মে মতি হেরি দেবে কর্ত্তব্যপালনে।
লহ দণ্ড দণ্ডধর—

(কৃতান্তে দণ্ড দান করিয়া)

রহ রত সদা
কর্ত্তব্যপালনে বৎস! তুমিও মরুত
ত্যজ রোষ। বিশ্বভার তোমা সবা'পরে
অর্পিত—তোমরা বিনা কে আর আয়াসে
সহিবে বিশ্বের হেতু? যাও, যার স্থানে।
চলিনু কৈলাসে আমি।—হইবে অচিরে
নির্ম্মূল রাক্ষসকুল।—রাক্ষস সমরে
বিজয়ী রাঘব পুন লভিবে সীতারে।
চলিনু কৈলাসে তার উপায়-চিন্তিতে।

শচী।—

বাঁচালে দাসীরে আজি কৃপাময়ী তুমি।
যে অবধি রঘুবধূ বন্দী কারাগারে
পাষণ্ড-রাক্ষস-ছলে; বিরাম-মন্দিরে
না যান ত্রিদিবনাথ সে দিন হইতে।
নিত্য নিশাকালে নিদ্রা সাধেন দাসীরে
সাধিতে ত্রিদিবনাথে—সভয়ে আপনি
বিরস বদন হেরি—না যান সমীপে।
কাঁদে সাধ্বী ধর্ম্মশীলা দেবে সাক্ষী করি
কেমনে লভেন নিদ্রা ত্রিদিবের পতি
নাহি উদ্ধারিয়া তারে? না পারি কত যে
বিষাদে ত্যজিলা শ্বাস স্মরিলে তাহারে
মরমে মরি শঙ্করি! বাঁচালে দাসীরে!
কটাক্ষে করুণাময়ি চাও যার প্রতি
কি দুঃখ সম্ভবে তার এ ভবমণ্ডলে?

ইন্দ্র।—

পেয়েছি অভয়দান দেহ পদধূলি

(ভগবতীর চরণ চুম্বন)

আনন্দে ভুঞ্জিব আজি ইহার প্রসাদে
বিরাম দায়িনী নিদ্রা।—দেহ বর দাসে
সতত অচলমতি থাকে যেন পদে।—

(যবনিকা পতন)

ক্রমশঃ।

আমার জীবনের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ধর্ম্ম ও লোকভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, দেবেন্দ্রের অনুসরণ করিব—যেখানে দেবেন্দ্র সেই খানে গিয়া অন্তরের ব্যথা জুড়াইব। এই নূতন উৎসাহে হৃদয়ের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। তৎকালে আমার বোধ হইল, বহুদিন ধরিয়া অন্তরে যে অগ্নি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাতে বারিবর্ষণ করিয়া কে যেন অকস্মাৎ সর্ব্বদুঃখ নিবারণ করিল। অভিলাষ-অনলে দগ্ধ হৃদয় পুনরায় শীতল হইল,—পুনরায় শান্তিলাভ করিল। কিন্তু হায় সে শান্তি কতদিন রহিল? পাপীয়সীর হৃদয় কতদিন সে সুধাস্বাদন করিতে পাইল? পূর্ণিমার পূর্ণশশী মেঘের অন্তরাল হইতে এক বার দেখা দিয়া

জগৎ আলোকে ভাসাইয়া পুনরায় মেঘের ভিতরে লুকাইল; অমানিশার তড়িল্লতা সহসা বিশ্ব জ্যোতিস্তরঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া চকিতে গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল! পাপ চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া কে কবে সুখী হইয়াছে? অন্তরে পাপাভিলাষ ধারণ করিয়া মনুষ্য যদি সুখাস্বাদন করিতে পারিত, তবে ধর্ম্ম তোমার এত মাহাত্ম্য হইবে কেন;— যুগে যুগে মনুজ সন্তান সর্ব্বত্যাগী হইয়া তোমার নিষ্কলঙ্ক চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিবে কেন!

যে উৎসাহে তৎকালে হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল, সে উৎসাহ কোথায় পলাইল? সংসার আবার যে বিস্বাদ হইয়া উঠিল; চন্দ্র সূর্য্য আপন আপন স্থান ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডকে পুনরায় যে গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন করিয়া চলিয়া গেল। যে দিন হইতে জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছে, সেই অবধি যে হৃদয়ের অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছি, কিন্তু তথাপি এমন ভয়ানক যন্ত্রণা ত কখন সহি নাই! আমার বোধ হইল, বিহঙ্গীর মত কে যেন আমাকে একটি ক্ষুদ্র পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পিঞ্জরের চারিদিক সুতীক্ষ্ণ লৌহ কণ্টকে পরিপূর্ণ। শুইতে, বসিতে, দাঁড়াইতে, সেই সকল কণ্টক শরীরের সর্ব্বত্র দিবা-নিশি ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। কণ্টকের জ্বালায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। লোকে হাসিলে, কি কথা কহিলে, বোধ হইত যেন সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। লোকের প্রফুল্ল মুখ দেখিলে বোধ হইত যেন হৃদয়ের অন্ধকার শতগুণ বাড়িতেছে। এ যন্ত্রণার কথা কাহাকে বলিব? বলিবার কথা হইলে এত দুর্দ্দশাই বা হইবে কেন? অমৃত ভাবিয়া যে বিষ গিলিয়াছিলাম, তাহা যে উদ্গীরণ করিবার নহে। হৃদয় অনুক্ষণ যে অনলে দগ্ধ হইতেছিল, তাহা যে বলিবার নহে। বলিলেই বা লাভ হইত কি? সে কথায় অনুকম্পা করিত কে? কলঙ্কিনী আপনি অগ্নি জ্বালিয়া আপনি তাহাতে দগ্ধ হইয়া মরিতেছে, এ কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিত কে? হৃদয়ের ভিতরে দুর্ব্বিষহ বেদনা, অথচ চারি দিকে আপনার জন; কিন্তু তথাপি সেই যন্ত্রণা শুনিয়া কেহ একবার আহা করিবে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে সাহস হইল না। হরি হরি, ইহার অপেক্ষা ভয়ানক আর কি হইতে পারে! কলঙ্কিনীর—চির দুঃখিনীর—দুঃখের কথা ভাবিয়া তাহার অপরাধ একবার ভুলিয়া যাও; একবার বলিতে সাহস হয় না—একবার তাহার কলঙ্ক ও দুর্দ্দশার জন্য এক বিন্দু অশ্রুপাত কর। তাহাহইলে তাহার যন্ত্রণা জুড়ায়; উত্তপ্ত হৃদয় শীতল হয়!

কিন্তু এত যন্ত্রণা সহিয়াও ত প্রাণ যাইল না। বালিকার হৃদয়ই কি এতই কঠিন যে দুর্ব্বিষহ দুঃখভারে প্রপীড়িত হইয়াও তাহা ভাঙ্গিল না। সে যন্ত্রণার কথা বলিব কি (এখনও মনে হইলে যে মস্তকের ভিতরে ঘুরিতে থাকে।

কিন্তু তাহা সহিয়াও ত মরিলাম না। তখনও মরিলে যে ভবিষ্যতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতাম। মরিব কি, অদৃষ্ট-লিপিতে সে সুখও যে লেখা নাই। অলঙ্ঘ্য নিয়তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ কাহার? যে কঠোর শাসন প্রভাবে মনুষ্য যুগে যুগে আপনি আপনার উচ্ছেদ সাধন করিতেছে, যে অতর্কিত শাসনের অধীন হইয়া মনুষ্য অমৃত জ্ঞান করিয়া বিষপান করিতেছে, সেই অলঙ্ঘ্য অদমনীয় নিয়তির হস্তে বালিকার জন্মের মত সর্ব্বনাশ হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?

কিন্তু এস্থলে শুধু নিজের কথা বলিলে হয়ত তৎকালীন অবস্থা সবিশেষ বুঝিতে পারিবে না; সুতরাং আমি যাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এত অস্থির হইয়াছিলাম, তাঁহার বাহিক ও আন্তরিক ভাব এই সময়ে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বলা আবশ্যক। স্বামী আমাকে বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা অতিবাহিত করিবেন প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার দুরদৃষ্টে সেই সুখ কতদূর ঘটিয়াছিল, তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ। তাঁহার হৃদয় সদা-প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় স্বভাবতঃ কোমল ছিল; তাহা তেমনি মধুর, তেমনি পরিমল-ময়। প্রণয়ের মৃদুবাহী হিল্লোলে কম্পিত হইলে সে কুসুমের শোভা শত গুণ বাড়িত কিন্তু সংসারের বিষম বাত্যা সহিবার ক্ষমতা তাহাতে কিছুমাত্র ছিল না। রজত-ধারাবাহী স্রোতস্বতীর উপরে সূর্য্যের প্রফুল্ল কিরণ পড়িলে তাহার কতই শোভা, কিন্তু আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইলে পর স্রোতস্বতীর আর সে শোভা থাকে না, তখন তাহার নির্ম্মল জলের সে স্ফটিক শোভা ঘুচিয়া গিয়া গাঢ় কালিমায় আবৃত হয়। যে সময়ের কথা বলিতেছি তৎকালে স্বামীর অবস্থা ঠিক্ এইরূপ হইয়াছিল। কয়েক দিবসের মধ্যে দেখিতে দেখিতে তাঁহার বিলক্ষণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার পূর্ণশশি-নিভ যে মুখ ইতিপূর্ব্বে যে দিকে ফিরিত, সেই দিক্ আলোকিত করিত, অকস্মাৎ তাহা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাহার সে মধুর প্রকৃতি আর রহিল না, কে যেন তাহাতে তিক্ত রস ঢালিয়া দিয়া অকস্মাৎ তাহার মধুরতা বিনষ্ট করিল। এখন হইতে তিনি পূর্ব্বের মত আর বন্ধু বান্ধবের সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন না, এবং অকারণে পরিজন-বর্গের উপরে কটুবাক্য ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে দেখিলে সকলে ভীত হইত, ভাল করিয়া কথা কহিতে কেহ সাহস করিত না। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল; ইহার কারণ কি কেহই বুঝিতে পারিল না। অপরে বুঝিবে কি? হৃদয়ের ভিতরে যে অগ্নি সঞ্চিত হইয়া অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করে, তাহার জ্বালা যে কত ভয়ানক তাহা অন্যে বুঝিবে কি? যে হতভাগ্য

জীব প্রণয়-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সেই তৃষ্ণা নিবারণে বঞ্চিত, যে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা অন্যের উপরে ঢালিয়া দিয়া তৎকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছে, সেই বুঝিতে পারে জীবনভার কি দুঃসহ, এই ক্ষুদ্র সংসার কি ভয়ানক স্থল।

ইতিপূর্ব্বে আমার কঠিনতা দেখিয়াও স্বামী আমার মনস্তুষ্টি করিবার জন্য কতই ব্যাকুল হইতেন, কত মিষ্ট কথা কহিতেন, কত বুঝাইতেন। কিন্তু এখন হইতে তিনি আমার সহিত আলাপ করা প্রায় এক প্রকার বন্ধ করিলেন। বিশেষ আবশ্যক না হইলে কোন কথা কহিতেন না, এবং তাহাও অতি কষ্টে ও যত স্বল্পে পারেন কহিতেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার চক্ষু অনুক্ষণ আমার উপরে থাকিত। আমি যখন অন্যমনে থাকিতাম তিনি আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করিতেন, এবং যদি কখন উভয়ের চক্ষু এক হইত, অমনি তাঁহার নয়নদ্বয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে ধাবিত হইত। উভয়ের সংসর্গ উভয়ের পক্ষে ক্রমে বিষ হইয়া উঠিল, বস্তুতঃ তাঁহার সে অন্ধকার মুখ দেখিলে আমার বোধ হইত যেন নিশ্বাস রোধ হইতেছে। তিনিও আমাকে আর চাহিতেন না, কিন্তু তথাপি তাঁহার চক্ষু আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। যাহা দেখিলে তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিত, সে তাহাই দেখিবে— তাঁহার শাসন না মানিয়া কেবল সেই দিকেই ধাবিত হইবে।

ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল ততই উভয়ের ঔদাসীন্য বাড়িতে লাগিল। এক দিন আমি সাহসে ভর করিয়া স্থির করিলাম তাঁহার সহিত কথা কহিব, তাঁহার মনের কথা বুঝিয়া লইব। কিন্তু কার্য্যের সময়ে সে সাহস রহিল না, কে যেন আমার মুখ চাপিয়া ধরিল; সুতরাং যাহা জিজ্ঞাসা করিব মনস্থ করিয়াছিলাম তাহা করা হইল না। কিন্তু অধিক দিন এ অবস্থায় থাকিতে হইল না; যিনি বলিবার তিনিই বলিলেন। এক দিন সেই তেজঃপূর্ণ আগ্নেয় গিরির হঠাৎ অগ্ন্যুদ্গীরণ হইল। আমি আপনার মনে বসিয়া কি ছাই ভাবিতেছিলাম স্মরণ হয় না এমন সময়ে স্বামী অলক্ষিত ভাবে আমার পশ্চাদ্দেশে আসিয়া আমাকে ডাকিলেন 'শ্যামাঙ্গিনি!' আমি চমকিয়া উঠিলাম, বোধ হইল কে যেন আমার পৃষ্ঠে হঠাৎ বেত্রাঘাত করিল। পরে যখন আমি তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলাম, তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে আমার প্রকোষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া এক দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল এই অবস্থায় থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন 'শ্যামাঙ্গিনি!' আমার সর্ব্বাঙ্গ আবার শিহরিয়া উঠিল, বোধ হইল যেন এইবার মস্তকে বজ্রাঘাত হইবে। আমি তখন সাহসে ভর করিয়া বলিলাম 'অমন করিয়া রহিলে কেন?'

স্বামী ভ্রূদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "তোমার মুখের উপরে কি লেখা রহিয়াছে তাই পড়িতেছি। তোমার চক্ষু স্পষ্ট বলিতেছে 'ভিতর বাহির সমান নহে।' এই দেখ, আপনার মুখ আপনি দেখ।" এই বলিয়া তিনি আমার মুখের কাছে একখানা দর্পণ ধরিলেন। সেই দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আমার শরীরের ভিতরে বেগে শোণিত-স্রোত তরল অগ্নি ধারার ন্যায় বহিতে লাগিল, হৃদয় বেগে বক্ষদেশে আঘাত করিতে লাগিল, এবং ললাটে মৃদু মৃদু ঘর্ম্ম বিন্দু দেখা দিল। আমি তখন সেই দর্পণের প্রতি আর চাহিতে না পারিয়া বামহস্তে আপনার চক্ষু আবৃত করিলাম এবং দক্ষিণ হস্তে দর্পণ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলাম। স্বামী গম্ভীর স্বরে তখন বলিলেন—'তবে সত্য কথা বল।'

আমি—'কি বলিব বলিয়া দাও।'

স্বামী—'কি বলিবে জান না? জানিবে কেমন করিয়া—স্ত্রীজাতি অবলা, সরলা, ভাল মন্দ কিছুই জানে না, কেবল—কেবল—।'

আমি—'পাগলের মত কি বলিতেছ।'

স্বামী—'পাগল করিল কে? তুমি আমার ক্ষুধা কাড়িয়া লইয়াছ, আমার পিপাসা কাড়িয়া লইয়াছ, আমার চক্ষুর নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছ। আমি তোমার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু তুমি আমার নও তাহা অনেক দিন জানিয়াছি; আমি তোমাকে না দেখিলে বাঁচি না, কিন্তু তুমি আমাকে না দেখিতে হইলেই ভাল থাক, তাহা আরও অনেক দিন জানিয়াছি। মণি-কুণ্ডলা-সর্পিণী; দেখিতে কত সুন্দর, যে একবার দেখিয়াছে সে আর জন্মে ভুলিতে পারে না! হরি হরি, তাহারই এত বিষ যে প্রাণ জ্বলিয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!'

তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইলে আমি বিরক্তভাবে বলিলাম 'তুমি অকারণে কেন আমার এত লাঞ্ছনা করিতেছ? যাহা বলিবার ইচ্ছা আছে স্পষ্ট করিয়া বল।' স্বামী আমার এই কথা শুনিয়া ভ্রূদ্বয় পুনরায় আকুঞ্চিত করিয়া মুহূর্ত্ত কাল আমার মুখের দিকে চাহিলেন, এবং পরে উদ্ধতস্বরে বলিলেন 'হাঁ স্পষ্ট করিয়াই বলিব। তুই অসতী, ব্যভিচারিণী, কুলটা,—কুলটাকে আমি চাহি না।' স্বামীর এই কথা আমার কর্ণে বিষের মত প্রবেশ করিল। আমি বিলক্ষণ জানিতাম অপরাধ কাহার, কিন্তু তৎকালে তাহা ভুলিয়া গিয়া উন্মত্তের মত উত্তর করিলাম—'তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। আমি যদি তোমার সুখের পথে কণ্টক হইয়া থাকি ত সে কণ্টক শীঘ্র দূর হইবে।' এই দুঃসাহসিক কথা শুনিয়া স্বামী কিয়ৎ কাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; বোধ হয় তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'একেবারে এতদূর যাওয়া ভাল হয় নাই।' আমার কথায় তাঁহার মনে যে এক প্রকার আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল

তাহা নিশ্চয়, কারণ তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না; হতবুদ্ধির মত কেবল চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, সুতরাং কিয়ৎপরে স্বামী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইলেন।

স্বামী চলিয়া গেলেন, তথাপি আমার চক্ষুর জল থামিল না। কিন্তু কাঁদিলাম কেন? স্বামী তিরস্কার করিয়াছেন বলিয়া? ব্যভিচারিণীর মান অপমান কি? তাহার আবার তিরস্কার লাঞ্ছনায় অভিমান কি? এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তথাপি নির্লজ্জ চক্ষুতে কি বলিয়া জল আসিল বলিতে পারি না—কি বলিয়া তৎকালে মনে অভিমান হইল বুঝিতে পারি না। এই অবস্থায় আমি স্মৃতি-চক্ষুতে একবার জীবনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম অতীত কণ্টকপূর্ণ বিশালভূমির ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ আরও ভয়ানক বলিয়া বোধ হইল। তাহা একেবারে শূন্যময়, এমন একটী স্থান নাই যে চক্ষু মুহূর্ত্তেক তাহাতে গিয়া বিশ্রাম করে। তখন স্বামীর সেই শেষ কথা আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল—'অসতী, ব্যভিচারিণী, কুলটা—কুলটাকে চাহি না।' অমনি মন দিক্ বিদিক্ না ভাবিয়া আপনার দুরভিসন্ধি-পথে ছুটিতে লাগিল—হতভাগিনীর অধঃপতন একদিনে সম্পূর্ণ হইল। 'অসতী,—ব্যভিচারিণী—কুলটা।' হাঁ, তাহা ত সত্যই; কবে বলিয়াছি অসতী নহি,—কুলটা নহি? কিন্তু তাহা যদি হইল তবে আর সংসার-বিড়ম্বনায় আবশ্যক কি? এ প্রতারণায় প্রয়োজন কি? অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার ঘটিবে, শীঘ্র পথ দেখিয়া লইতে হইবে।'

শীঘ্রই পথ দেখিয়া লইলাম। বিলম্ব সহিল না, আর একবার ভাবিয়া দেখিবার অপেক্ষা রহিল না। অচিরে অদৃষ্ট-লিপির এক অংশ সম্পূর্ণ হইল। অদৃষ্টতরুর একটী শাখা ফলে পরিপূর্ণ হইল। এই দুরভিসন্ধির সহিত কত দুঃখের কাহিনী জড়িত রহিয়াছে তাহা বলিবার নহে; সুতরাং সে কথা মনে হইলে মধ্যে মধ্যে এক এক বার অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু তথাপি সেজন্য আমি বিশেষ অনুতপ্ত নহি। যে সকল অবস্থার অধীন হইয়া আমি তৎকালে এই ভয়ানক সংকল্প করিয়াছিলাম, যদি এক্ষণে সেই সকল অবস্থার পুনর্ব্বার সংঘটন হয়, তাহা হইলে এত দুর্দ্দশা সহিয়াও তদ্রূপ আচরণ করিতে সংকুচিত হইব না। রমণীর পতি সর্ব্বস্ব-ধন—পতি প্রাণের প্রাণ। যে দিন সেই প্রাণের প্রাণকে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলাম সেই দিনেই ত দুষ্কর্ম্মের চরমসীমায় পদার্পণ করিয়াছি। তাহার পর যাহা যাহা হইল সে সকল ত ঘটিবারই কথা; তবে সে জন্য আর দুঃখ কি? অবশ্য একথা স্বীকার করি

যে তখন যদি স্বামীর আশ্রয় পরিত্যাগ না করিতাম তাহা হইলে পরিণামে অনেক দুর্দ্দশার হ্রাস হইত। কিন্তু যখন স্বামীর ব্যথায় ব্যথিত হইতে না পারিলাম, যখন তাঁহার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিতে না পারিলাম, তখন কোন্ মুখে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিব? কি বলিয়া তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনভাগিনী হইব? শঠতা ও প্রবঞ্চনা জাল বিস্তার করিয়া যদি কাহারও সতীনাম ক্রয় করিবার সাধ হয়, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। হতভাগিনীর জীবন বহু কলঙ্কে পরিপূর্ণ; কিন্তু তাহার এরূপ প্রবৃত্তি কখন হয় নাই, এবং ঈশ্বর করুন যেন কখন না হয়।

মাতু।

দুই দিন গেল, চারি দিন গেল, সপ্তাহ গেল, সপ্তাহের পর পক্ষ, পক্ষের পর মাস, তথাপি দেবেন্দ্রের কোন সমাচার নাই। দেবেন্দ্র কোথায় গেল, কেনই বা হঠাৎ অদৃশ্য হইল, এই কথা লইয়া সকলে তোলা পাড়া করিতে লাগিল, অথচ কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না। আরও দুই এক সপ্তাহ এইরূপে অতীত হইল; পরে সমাচার আসিল (কেমন করিয়া বলিতে পারি না) যে দেবেন্দ্র কলিকাতায় গিয়া রহিয়াছে। কেহ বলিল দেবেন্দ্র কলিকাতায় চাকরী করিতেছে, কেহ বলিল দেবেন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হইয়া পথে পথে সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছে; কেহ বা বলিল দেবেন্দ্র নাট্যশালায় অভিনয় করিতেছে, এবং তাহা ছাড়া একটা সখের দল খুলিয়াছে। নিত্য নূতন নূতন সংবাদ উঠিতে লাগিল, কিন্তু দেবেন্দ্র যে কলিকাতায় রহিয়াছে ইহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। এই সকল সদ্যঃপ্রসূত জনরবে হৃদয় কিরূপ উদ্বেলিত হইতে লাগিল তাহা কেমন করিয়া বলিব! উৎসাহের পরে নৈরাশ্য, নৈরাশ্যের পরে উৎসাহ, আবার দ্বিগুণ নৈরাশ্য—ইত্যাদি ক্রমে চিন্তাস্রোত কতবার হৃদয়কে প্লাবিত করিল তাহা কেমন করিয়া বলিব! আজি কেমন করিয়া বলিব মনে কি ভাবিলাম, কি গড়িলাম, কি ভাঙ্গিলাম; কি বলিয়া আপনাকে আপনি ভুলাইলাম, কেমন করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিলাম!

দেবেন্দ্র কলিকাতায় রহিয়াছে। ভাবিলাম, 'একবার কলিকাতায় যাইতে পারিলে—সেই বহু-কলঙ্কপূর্ণ সংখ্যাতীত জীবস্রোতের ঘূর্ণজলে একবার তৃণের মত পরিচালিত হইতে পারিলে—যন্ত্রণা জুড়ায়, প্রাণ শীতল হয়, হৃদয়ের তৃষ্ণা ঘুচিয়া যায়। কিন্তু কলিকাতা কোথায় আর আমি কোথায়? কলিকাতা কোন্ দিকে?—উত্তর না দক্ষিণ, পূর্ব্ব না পশ্চিম? কলিকাতায় যাইতে হয় কোন্ পথ দিয়া? যাইতে কতদিন লাগে?

কেমন করিয়া যাইতে হয়? কৈ তার ত কিছুই জানি না। তবে উপায় কি?' উপায় শীঘ্রই হইল! বিষবৃক্ষ একবার রোপিত হইলে তাহাতে ফল ফলিতে কত দিন লাগে? মনুষ্যের অন্তরে একবার দুষ্ট বুদ্ধি প্রবেশ করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে কতদিন লাগে? নিয়তি অঙ্গুলি বাড়াইয়া যে পথ দেখাইয়া দেয় তাহা আপনি পরিষ্কার হয়, আপনি সরল হয়,—রাজমার্গের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ বলিয়া সে পথ প্রতীয়মান হয়। হতভাগ্য জীবগণ অবাধে তাহাতে ছুটিতে থাকে। কোন প্রতিবন্ধক নাই, কোন ব্যাঘাত নাই,—এমন সুখের পথ আর কি কখন হইবে! এই পথে এক দিন হৃদয় কত উল্লাসে কত উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হায়! আজি সে উল্লাস সে উৎসাহ কোথায় গেল? যে পিশাচীকে সেই পথের প্রিয় সহচরী ভাবিয়াছিলাম, আজি তাহার কথা মনে পড়িয়া হৃদয় আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইতেছে কেন?

দেবেন্দ্রের গৃহত্যাগের অনতিকাল মধ্যেই হতভাগিনির জীবন রঙ্গভূমে এক জন নূতন অভিনেত্রী দেখা দিল। তাহারনাম মাতঙ্গিনী। মাতঙ্গিনী আমার বিবাহের কিছুদিন পরেই আমাদের সংসারে চাকরি করিতে আসিল। তখন তাহার জীবন-স্রোতে সবে মাত্র ভাঁটা লাগিতে আরম্ভ হইয়াছে। বয়স্‌কালে মাতঙ্গিনী একজন সুন্দরী ছিল বটে। বস্তুতঃ যখন সে প্রথম আমাদের বাটীতে আসিল তখন তাহার কুঞ্চিত কেশরাশি, প্রফুল্ল বদন ও অঙ্গের সৌষ্ঠবের প্রতি অনেকেই দুই একবার চাহিয়া দেখিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার চক্ষু দুটী বড়ই সুন্দর ছিল; দেখিলেই বোধ হইত যেন তাহাদের ভিতর দিয়া বুদ্ধি ফাটিয়া পড়িতেছে। বস্তুতও মাতঙ্গিনী একজন ভারি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ছিল। গৃহকার্য্যে যখন যে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইত, সে তখনই যেন তাহার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন নিশ্চয়ই করিবে। তাহার সাহসিকতার বোধ হয় ইয়ত্তা ছিল না। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে মাতঙ্গিনীকে জনপ্রাণীশূন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তরে যাইতে বল, মাতঙ্গিনী তখনই তাহা হাসিতে হাসিতে করিয়া আসিবে। যদি মাতঙ্গিনী শুনিল যে কোন কার্য্য বিশেষে কেহই সাহস করিতে পারিতেছে না, মাতঙ্গিনী নিশ্চয়ই তাহা করিবে। স্ত্রীজাতি-সুলভ লজ্জার ধার মাতঙ্গিনী বড় ধারিত না, অথচ লোকে হঠাৎ দূষ্য ভাবিবে এরূপ আচরণও কখন করিত না। মাতঙ্গিনীর মুখ সদা হাসি হাসি। ভিতরে একখানা বাহিরে আর একখানা কাহাকে বলে মাতঙ্গিনী তাহা জানিত না। এমন গুণের লোককে কে না যত্ন করিবে? অচিরে আমাদের সংসারে মাতঙ্গিনীর বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মিল। কিন্তু হতভাগিনী যে কিরূপ দরের লোক তাহা কেহই বুঝিল না। যে একবার তাহার হস্তে পড়িয়াছে

সেই বলিতে পারে তাহার অন্তর কি ভয়ানক গরলে পরিপূর্ণ! আজি তাহার কথা মনে পড়ায় আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেছে—সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শয্যাপ্রান্তে করাল বিষধর দেখিলে যেমন শিহরিয়া উঠে তদ্রূপ আমার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে। পিশাচীর কথা এক্ষণে অধিক বলিব কি, আপাততঃ এই মাত্র জানিয়া রাখ যে অনেক হতভাগিনীর সে সর্ব্বনাশ করিয়াছে; লোকের সর্ব্বনাশ করাই তাহার প্রধান ব্যবসায়।

কিন্তু রাক্ষসী এমন ভয়ানক লোক হইলেও কেহ একদিনের জন্যও তাহাকে সন্দেহ করে নাই; সুতরাং আমারও যে কখনও তাহার উপরে কোন সন্দেহ হয় নাই তাহা আর বিচিত্র কি? তাহার সাহসিকতা ও প্রত্যুতপন্নমতিত্ব দেখিয়া আমি স্থির করিলাম যে তাহার সহকারিতা ব্যতীত কখনই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। অতএব কেমন করিয়া তাহাকে আমার দিকে টানিয়া লইব কয়েক দিন ধরিয়া কেবল এই চিন্তাই করিতে লাগিলাম। মাতঙ্গিনীর চরিত্রের শতাংশের একাংশও আমি তখন বুঝি নাই, সুতরাং আমার এই আশঙ্কা হইতে লাগিল পাছে সে আমার মনোগত ভাব বুঝিয়া সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলে। কিন্তু আমার তখন কিরূপ দুর্ব্বুদ্ধি চাপিয়াছে তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারিতেছ। আমি বিলক্ষণ জানিতাম চতুরা মাতঙ্গিনীর কাছে চতুরালি খেলা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু তাহা জানিয়াও আমি স্থির করিলাম যে তাহাকে ফাঁকি দিব, অথচ তাহারই সাহায্যে অভীষ্ট সাধন করিব। কি অভিপ্রায়ে কলিকাতায় যাইতেছি তাহার চন্দ্রাংশও তাহাকে জানিতে দিব না, অথচ তাহাকেই পথের একমাত্র সহায় করিয়া লইয়া যাইব। কি অপূর্ব্ব কৌশল! কি চমৎকার চতুরতা! এমন চতুরা আমি কবে হইলাম?

এই সংকল্প করিয়া আমি মাতঙ্গিনীকে একদিন ডাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম—'মাতু তুই আগে কলিকাতায় থাকিতিস্, না?'

'ও কথা ত কত দিন বলিছি, তবে আজ আবার জিজ্ঞাসা করিলে কেন?' মাতু মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

'কলিকাতা কেমন সহর মাতু? তুই আমাকে একবার দেখাতে পারিস্?'

'বাবু তোমাকে যেতে দেবেন কেন?'

'আমি না বলিয়া যাইব। যাইব মনে করিলে কে আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে?'

'না, তুমি তামাসা করিতেছ।'

'না মাতু, আমার কলিকাতা দেখিবার বড় সাধ হয়েছে। সত্য বলিতেছি, মাতু তুই যদি আমাকে লইয়া যাস্ ত তোর সঙ্গে আমি গোপনে চলিয়া যাই।

তুই যখনই বলিবি মাতু তখনই তোর সঙ্গে যাইব।'

'না, তুমি তামাসা করিতেছ।'

'তোর দিব্য মাতু, আমি তামাসা করিতেছি না। তুই যদি আমাকে কলিকাতা দেখাইতে পারিস্ তা হলে আমি তোর কাছে চিরকালের জন্য ঋণী থাকিব।'

'কলিকাতায় গিয়া কি করিবে? বাবু যদি রাগ করেন?'

'কলিকাতায় আমি দিন কত থাকিব, দেখিব কলিকাতা কেমন সহর। তোর যত রাগের ভয়, আমার তত ভয় নাই। যদি একবার আমাকে লইয়া যাইতে পারিস্ তা হলে তুই যে আমার কত উপকার করিবি তা আমি এক মুখে বলিতে পারি না। তুই আমাকে চিরকাল কিনিয়া রাখিবি মাতু।'

মাতু স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তেক কাল আমার মুখের উপরে চাহিয়া রহিল। তাহার ভ্রূদ্বয় ঈষৎ আকুঞ্চিত হইল, তাহার চক্ষুতে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। আমার বোধ হইল মাতু মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভাবিয়া লইল। পরক্ষণেই মাতুর সে ভাব দূরীভূত হইল। তাহার চক্ষুতে যে বিদ্যুৎ খেলিতেছিল তাহা চক্ষুতেই মিশাইয়া গেল; তাহার ভ্রূদ্বয় আকুঞ্চন ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন সে স্থিরভাবে বলিল—সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাওয়া কিছু শক্ত কথা নয়। কিন্তু দোষের ভাগী হইবে কে, ভাল করে ভাবিয়া দেখ। আমি রাজি আছি। এই সামান্য কর্ম্ম করিলে যদি তোমার এত উপকার হয় ত তা না করিব কি বলিয়া। কিন্তু ভাল করে ভাবিয়া দেখ।'

'ভাবিয়া দেখ'—'কিন্তু'—ইত্যাদি কথা মাতুর মুখে আমি এই প্রথম শুনিলাম। আমি উত্তর করিলাম—'আগে ভাবিয়া দেখিয়াছি, তবে তোকে এ কথা বলিয়াছি। এত কিসের ভয় মাতু?'

'তা না ত কি? এত ভয় করিতে গেলে আর চলে না। কে কার তক্কা রাখে যে এত ভয়? যদি বুঝিতাম যে কেহ নহিলে কারুর চলে না, তা হইলে এক কালে ভয়ের কথা ছিল বটে; কিন্তু তা যখন নয়, তখন কাকে ভয়?—যদি এক বার সাহস করে বাহির হতে পার তা হলে দেখ্‌বে কলিকাতা কেমন জেয়াগা। আহা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়! স্বর্গে আছি কি কোথায় আছি বল্‌তে পারা যায় না। যে যাহা চায় সে তাই পায়; যখন যা ইচ্ছা হয় তখনই তা হাতের ভিতরে। এমন সহর যে না দেখেছে তার চক্ষুই বৃথা।'

'তাত বুঝিলাম, কিন্তু দেখাইতে পারিবি কিনা বল্ দেখি।'

'পারিব না কেন? তুমি যদি যাও ত সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া আর ভার কি? এমন করে নিয়ে যাব, এমন স্থানে গিয়ে রাখ্‌ব যে তখন বল্‌বে

যে "হাঁ মাতি আপনার লোক বটে।"

'কিন্তু কবে নিয়ে যাবি বল্ দেখি খুব শীঘ্র পার্‌বি ত?'

'শীঘ্র না ত কি।'

'দুই তিন দিনের মধ্যে?'

'তাই হবে। কিন্তু এত উথলা হলে চল্‌বে না। সাবধান, কোন মতে কথা যেন প্রকাশ না হয়, তা হলে সব বৃথা হবে। তুমি খুব স্থির হয়ে থাক। আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব যোগাড় করে ফেলব। তোমাকে কিছুই ভাব্‌তে হবে না।' এই বলিয়া মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল।

সে দিন আর কোন কথা হইল না। হৃদয় উল্লাসে পরিপূর্ণ হইল; চারি দিক্ হাস্যময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আকাশের চাঁদ হাতের ভিতরে পাইলাম। এমন সুখের দিন আর কি হইবে? 'এতদিনে যন্ত্রণা ঘুচিল, এতদিনে সুখের পথ পরিষ্কার করিয়া বুঝি বিধি সুপ্রসন্ন হইল। 'আর মাতু!—মাতুর হৃদয় কি সরল, মাতু কি পরোপকারিণী! বিধি কি আমারই জন্য তাহার সংঘটন করিল?'—বিধাতা হে কি সংঘটন করিলে তাহা ত তখন বুঝিতে পারিলাম না। একবার চাহিয়া দেখিলাম না কোথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। একবার ভাবিলাম না পরিণামে কি হইবে। দেব, যাহা হইবার হইয়াছে, আর এ যন্ত্রণা কেন? এখনও কি দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ হয় নাই?—এখনও কি পাপের সমুচিত শাস্তির বিলম্ব রহিয়াছে?

হানিমান্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিথেন্ * প্রদেশের ডিউক্ ফার্ডিনাণ্ড হোমিওপেথির প্রতি অনুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাতেই, হানিমানকে অধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় নাই পাঠকবর্গ পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহা পাঠ করিয়াছেন। তত্রত্য অধিপতি, যাহাতে হানিমান্ সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। তিনি এখানে সচরাচর নিজ গৃহে বদ্ধ থাকিতেন। কিথেন-রাজ কি তদীয় পরিবারস্থ কাহারও পীড়ার সমাচার পাইলে, কেবল তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে যাইতে হইত। এই স্থানে অবস্থিতি-সময়ে রোগীরা তাঁহার বাটীতে গতিবিধি করিত। বিদেশে আসিয়াও তাঁহার লক্ষ্য ভ্রষ্টের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিসে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দ্বার সর্ব্বসমক্ষে অবারিত ও উদ্‌ঘাটিত

* মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ পূর্ব্ববারে কোথেন হইয়াছিল।

থাকে, কি উপায়ে তাহার উন্নতি করা যায়, এই সকল দুরূহ ভাবনা লইয়া তিনি ব্যাকুল। লিপ্‌জিক্‌-বাস-কালে এ বিষয়ে অনেকটা কাজ হইয়াছিল। যাহাতে এখানে তদধিক অন্ততঃ তৎ-সদৃশ কিয়ৎ পরিমিত স্থায়ী কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন, তাহারই জন্য অনবরত চেষ্টা চলিতেছে। ভিন্ন দেশে আগন্তুকের মনোমত কার্য্য হইবার অনেক বাধা। এখানে পরীক্ষণের সুবিধা ছিল না। স্বদেশে বিনা অনুযোগে যাহা সমাহিত হইত, কিথেনে তাহার সুযোগ দুর্ঘট। এই সকল বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও হানিমান্ চিকিৎসার উন্নতিকল্পে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে অবস্থান-সময়ে (১৮২৪ খৃঃ অঃ) খ্যাতনামা অর্গাননের (Organon) তৃতীয় মুদ্রণ সম্পন্ন হওয়াতে গ্রন্থকার মনঃক্লেশ অনেকটা উপশমিত বোধ করিলেন। অর্গানন্ অকথ্য গুণের আধার। এই গ্রন্থ গ্রন্থকর্ত্তার বহুদর্শিতা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বর্ণনাতীত ধৈর্য্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ অতি মনোরম—শ্রবণারাম।

আশা—তাবৎ মানবের আশ্বাস-স্থল। আশার দুই মূর্ত্তি,—এক কালিমাময় রূপ, অপর আরামপ্রদ বিশদ প্রভা। হোমিওপেথির আবিষ্কারকের নিকটে আশার সেই উজ্জ্বল মূর্ত্তি। কুত্রাপি আমরা তাঁহাকে মরীচিকার পশ্চাৎ ধাবমান হইতে দেখি নাই। অর্গানন্ যখন তৃতীয় সংস্করণে পাদবিক্ষেপ করিল, তখন আর হানিমান্ নিশ্চিন্ত ভাবে ধ্যান-নিমগ্ন অবস্থায় কিরূপে থাকিতে পারেন? পরবর্ত্তী বর্ষে (১৮২৫ শকে) "Upon the most certain method of preventing the extension of Homœopathy." * * * * এই অভিধায় এক অভিনব গ্রন্থ মুদ্রিত করিলেন। কিথেনের অধিবাসি-নিচয় অদ্যাপি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উক্তশীর্ষক পুস্তকের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ক্রমাগত হতাশার পাছে পাছে অনুবর্ত্তন করিয়া শেষে মানুষের মনুষ্যত্ব উপার্জ্জনে অধিকার জন্মে। হানিমানের জীবনও অবিকল তাহাই ঠিক।

খৃষ্টীয় ১৮২৭ অব্দে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ডাক্তার গ্রোস্ ও ডাক্তার ষ্টাফ্ কিথেনে আহূত হন। তিনি শিষ্যদ্বয়কে স্বরচিত "পুরাতন পীড়া উৎপন্ন হইবার হেতু ও যে ঔষধ দিয়া তাহা নিরাকৃত করিতে হয়, তাহার উপায়" পরীক্ষা করিতে আদেশ দেন। পরীক্ষার পূর্ব্বে উক্ত উদ্ভাবিত বিষয়ের সত্যতা ছাত্র-দিগকে প্রতিপন্ন ও হৃদ্‌গত করাইয়া দেন। তাঁহারা আবিষ্ক্রিয়ার যখন গুণ স্বীকার করিলেন, তখন হানিমানের নিরুদ্বিগ্ন ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল।

পর বৎসরে (১৮২৮ অব্দে) "পুরাতন পীড়ার" (Cronic diseases) ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ ভাগ * ড্রেস্‌ডেনে

* ডাক্তার বিজেল্‌ ফরাসি ভাষায় উহার দ্বিতীয়-বার মুদ্রাঙ্কণ করেন।

প্রচারিত হইল। গ্রন্থকর্তার জীবিত-কালে এই পুস্তকের আরো দুই সংস্করণ বাহির হয়। যথাস্থানে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইবে। ইহা এত মহামূল্য গুণান্বিত যে, এই বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে—ডাক্তার জর্ডান্ ফ্রেঞ্চ ভাষায় ইহা অনুবাদিত করেন। ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন গ্রন্থের আবার পরীবাদ! ধন্য গোঁড়ামি! অজ্ঞতা তোমাকে ধন্যবাদ! কিছুই তোমাদের অসাধ্য নহে! তোমাদের অপার মাহাত্ম্য! তোমাদের লীলার মর্ম্ম বুঝা ভার! এরূপ অসঙ্গত পরীবাদের প্রতিবাদ বা সমালোচন হানিমানের স্বভাবোচিত ছিল না। প্রতিপক্ষেরা হাজার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করুক, হাজার গালি বর্ষণ করুক না কেন,তিনি বধির! কেবল তাঁহার কোনও বিদ্যার্থী ঐ পাগলামির শ্রাদ্ধ করেন। ইহা গুরুর উপদেশে হয় নাই। শিষ্যেরা কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে ঐরূপ করিতে বাধ্য হন। ফল, এ পুস্তক চিকিৎসা সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য মণি। হানিমানের [মেটিরিয়া মেডিকা পিউরা (Materiamedica Pura)] ভেষজতত্ত্ব ও এই গ্রন্থ অবলম্বনে চিকিৎসা বিদ্যার মর্ম্ম আয়ত্ত করা সম্ভব, এই উল্লেখকে অতিরিক্ত প্রশংসা বলা যায় না।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ মহাদেশের পূর্ব্বভাগ হইতে বিসূচিকা রোগ (ওলাউঠা) হানিমানের জন্মভূমি জর্ম্মণিতে প্রবিষ্ট হয়। হানিমান্ তখন স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত। সুতরাং তিনি স্বচক্ষে কোন রোগীই প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ কি অবকাশ পান নাই। সংবাদ পত্রিকায় রোগের বিবরণ পাঠ করিয়া ও অন্যান্য উপায়ে পীড়িত-ব্যক্তিদিগের অবস্থা শ্রবণ করিয়া তিনি ঐ ব্যাধি-বিষয়ক নূতন ঔষধ সমাচার পত্রে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। রোগ এত অধিক পরিমাণে এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হইল যে, অপরাপর অন্য কোন প্রণালী দ্বারা এতাবৎ তাহার দশমাংশের একাংশেরও নিরাকরণ হয় নাই। মানুষের প্রবল চরম শত্রু যদি কিছু থাকে, তবে তাহা এই বিসূচিকা রোগ। মুহূর্ত্ত-মধ্যে মানবের দর্প খর্ব্ব করিতে—মানুষকে অবসন্ন করিতে, বিসূচিকার সমকক্ষ পাওয়া দুর্লভ। বাস্তবিক, চিকিৎসক নিজ ব্যবসায়ে কেবল এই ব্যাধির সমীপেই স্বীয় দায়িত্ব স্মরণ করিয়া ভীত হন। এই ভয়ঙ্কর মহামারি রোগে হানিমানের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। তিনি এই পীড়ায় কর্পূর, ভিরাট্রম্ এলবম্ (Veratrum Album) ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করেন। তন্মধ্যে কর্পূর ব্যবহারে সমধিক কৃতকার্য্যতা হইয়াছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে অর্গাননের ৪র্থ ও মেটিরিয়া মেডিকার ৩য় সংস্করণ পরিসমাপ্ত হয়। এই বৎসর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী হেনিরি এটা প্রাণত্যাগ করেন।

অনেকের মতে পরলোক-গতা এই কামিনী নিরতিশয় উগ্রস্বভাবা। আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ হানিমান্ তদীয় 'আত্ম-জীবনীতে' ইহার কোন উল্লেখ করিয়া যান না। সে যাহা হউক, স্ত্রীবিয়োগে তাঁহাকে যার পর নাই ক্লেশ অনুভব করিতে হইয়াছিল। কেন না, তিনি তাঁহার সম্পদ বিপদে প্রধান মন্ত্রী ও প্রিয়সখী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই দুহিতার উপর গৃহকার্য্যের যাবতীয় গুরু ভার ন্যস্ত হইল। এরূপ আকস্মিক নিদারুণ আন্তরিক আঘাতেও হানিমানের উদ্দেশ্য বিচলিত হইল না। মহাপুরুষকে প্রিয়তম লক্ষ্য হইতে টলায়, কাহার সাধ্য?

এই ঘোর পার্থিব সুখের অভাবেও তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার লইয়া ব্যাকুল। উদাহরণ স্থলে নির্দ্দেশ করা উচিত যে, ১৮৩১ অব্দে এলোপাথি সম্বন্ধে এক অতি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ লিপজিকে মুদ্রিত হইল। এবং যে বিসূচিকায় তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত, সেই বিসূচিকা-বিষয়ক পুস্তকও এই বৎসর মুদ্রাযন্ত্র হইতে জনসমাজে বাহির হয়। পুস্তকপ্রকাশের অব্যবহিত কাল পরেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াতে, ঐ বর্ষে কিথেনে আবার দ্বিতীয় প্রচারণ হইল। ইহার কিয়দ্দিবস পরে তৃতীয় মুদ্রণ জন্য হানিমান উহা লিপ্জিকে প্রেরণ করেন ও তাহার মুদ্রাকার্য্যও অচিরেই সম্পাদিত হইল। তৎপরে কাউন্সেলর ষ্টুলার সাহেবের সম্পাদকতায় জার্ম্মণি রাজ্যের প্রধান নগর বার্লিনে বিসূচিকার চতুর্থ মুদ্রাঙ্কণ প্রকাশের স্বল্প কালের পরে সমস্ত গ্রন্থ নিঃশেষিত হইলে ১৮৩২ সালে নরেম বার্গে পঞ্চম বার মুদ্রিত হয়। খৃষ্টীয় ১৮৩৩ শকে অর্গাননের পঞ্চম ও পিউরার চতুর্থ বার মুদ্রাঙ্কণ হয়। অর্গানন, পিউরা, ক্রণিক ডিজিজ (পুরাণ পীড়া) ও বিসূচিকা-সংক্রান্ত গ্রন্থের উপর্য্যুপরি সংস্করণের উপর সংস্করণ দ্বারা এক দিকে যেমন হোমিওপেথিমতের সংবর্দ্ধন, অন্য দিকে গৌণভাবে তেমনি সাধারণের মত-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। হানিমানের জীবিত-কালে তাঁহার গ্রন্থাবলির পুনর্মুদ্রণ এই পর্য্যন্ত। অতঃপর তাঁহাকে আর কোন নূতন পুস্তক মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিতে শুনা যায় না। কিন্তু *নূতন রচনাতে তিনি বরাবর সমান* আস্থাবান্। তাঁহার নিকট হস্তলিখিত পুস্তকের অসদ্ভাব ছিল না। অতএব উন্নতি-বিষয়ে তাঁহার ঔদাসীন্য কোথায়? রোগীর অবস্থা সন্দর্শন করিয়া রোগ লক্ষণ ও ব্যবস্থামত তাহার ঔষধ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনি যে প্রকাণ্ড পুস্তক সংগ্রহ করেন, তাহা তাঁর জনৈক জীবনবৃত্ত-প্রণেতা হল্ সাহেব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সেই হস্তলিখিত পুঁথি হানিমানের কন্যার তত্ত্বাবধানে ছিল। এতদ্ভিন্ন তৎপ্রণীত

আরও অনেক পুস্তকের বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে। কিন্তু সে গুলি অদ্যাপিও অমুদ্রিত অবস্থায়। তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজি আকার ও গুণে তুল্যমূল্য।

হানিমানের শিষ্যবৃন্দ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সম্মিলিত হইয়া, তাঁহার এম্ ডি উপাধি-প্রাপ্তির পঞ্চাধিক পঞ্চাশত্তম (৫৫) বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক মহতী সমিতির অনুষ্ঠান করেন। বড় বড় সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান, যুবক ও বৃদ্ধ উচ্চ ও মধ্যবিধ, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের উপস্থিতিতে সেই সভায় নিবিড় জনতা-হয়। জীবিত-কালে এই মহোৎসব—তাই এত লোকের সমারোহ, এত আড়ম্বর। গুণগ্রাহকমণ্ডলীর এই বৃহৎ ব্যাপারে পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। সেই দিবসে হানিমান্ স্বয়ং "Central Society of the Homœopathists *" অভিধেয় এক সভার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করেন। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাতে যোগ দেন ও তাহার সভাশ্রেণী-ভুক্ত হন। এমন কি, যখন সেই সমাজ দ্বারা রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকিল, তৎকালে তাঁহাদের অধিকাংশকেই তাহার নিয়মিত শ্রোতা হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময় ইউরোপ ব্যাপ্ত করিয়া, হোমিওপাথি আমেরিকা অবধি নিজের অধিকার বিস্তার করে। এলোপাথগণের ক্রোধের ইয়ত্তা রহিল না—তাঁহাদের আক্রোশাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না—ক্রমশ প্রধূমিত হইতে লাগিল। আমেরিকা খণ্ডের সুপ্রথিত ডাক্তার হেরিং স্বদেশমধ্যে হোমিওপেথির প্রচার আরম্ভ করাতে অল্প কালের মধ্যে তিনি শুদ্ধ সুসিদ্ধ হইলেন এমন নহে, কিন্তু অবিলম্বে তথায় হোমিওপেথির কালেজ (College) চিকিৎসালয় (Hospital), ঔষধালয় (Dispensary or Medical Hall) স্থাপিত হয়। এই সংবাদ শ্রুতিগোচর হওয়ায় হানিমানের উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়া উঠে।

* সেণ্ট্রাল্ সোসাইটি অব্ দি হোমিওপাথিষ্টস্ অর্থাৎ হোমিওপাথি ডাক্তারগণের কেন্দ্রীভূত সমাজ।

দ্বিতীয় পরিণয়।

অবিশ্রান্ত অভ্যুদয়শীল সফলতা লাভের পর, হানিমানের মনোরাজ্যে এক অদ্ভুত-পূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ইহা হানি-মানের পারিবারিক জীবনের দ্বিতীয় যুগ, জীবন গ্রন্থের এক স্বতন্ত্র—এক নূতন অধ্যায়। ফ্রান্স দেশীয়, কুমারী মার্মেলো ডি' হার্ভি গোহিয়ার নাম্নী সম্ভ্রান্তবংশীয়া এক উচ্চপ্রকৃতি মহিলা কোন অজ্ঞাত কঠোর কঠিন পীড়ায় বহুকাল কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। প্রাচীনমতে (এলো-পাথিতে) চিকিৎসা করাইয়া তিনি হতাশ্বাস হন এবং অবশেষে চিকিৎসা-প্রার্থিনী হইয়া, সৌভাগ্যক্রমে

হানিমানের গোচরে আইসেন। এই উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত তাঁহাকে কিয়ৎকাল হানিমানের চিকিৎসাধীনে থাকিতে হয়। সুচিকিৎসার প্রভাবে রূপলাবণ্যবতী সেই রমণী নীরোগ হইলেন। অতিবিলম্বিত কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি হইতে নিরাময় লাভ করিলে পর কামিনী কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি-প্রকাশের কারণ আরোগ্যদাতাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। তিনি শ্রদ্ধার নিদর্শন দেখাইবার তদপেক্ষা আর কোন প্রমাণ উপলব্ধি করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাই তাঁহার পক্ষে উচ্চ ভাবের অনুপ্রাণন। বা। অসঙ্গত অত্যুক্তি বৈ আর কিছু নহে যে, অশীতি-বর্ষ-বয়স্ক-বৃদ্ধের রূপলাবণ্য তাঁহাকে বিমোহিত করে না। তাঁহার আরোগ্য প্রথার গুণে তিনি আকৃষ্ট। বস্তুতঃ ইহা হওয়াও সঙ্গত। ফ্রেঞ্চ ললনার উচ্চ আদর্শ কোন অংশে তাঁহার উচ্চ মন হইতে হীন ছিল না।

আমাদের অনেক পাঠক, পাঠিকা অথবা প্রায় সকলেই আপতবোধগম্য এই রহস্যাকর ঘটনায় বিস্মিত হইতেছেন —হয়ত কেহ বা হাস্য-সংবরণে নিতান্ত অক্ষম হইবেন। গম্ভীর ভাবে পূর্ব্বাপর আলোচনা ও বিবেচনা করিলে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু পাওয়া অসম্ভব হইবে। মিলানীর পক্ষে উপকারীর ঋণ-পরিশোধ, সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই ঋণ শোধ আন্তরিক প্রীতি ব্যতীত অন্য বিষয়ে সম্ভবে না—তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। হানিমান কিরূপে আশী বৎসরে আবার দার-পরিগ্রহ করিতে পারেন, এই এক প্রশ্ন। যে চিকিৎসা তত্ত্বের জন্য তিনি এক সময়ে ধন ও মান, সুখ ও শান্তি, নিজ জীবন ও পরিবারকেও বিপদ্-পাতিত করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, যে চিকিৎসাতত্ত্বের নিমিত্ত প্রাণপ্রতিম 'স্বর্গাদপি গরীয়সী,' জন্মভূমি ও স্বদেশের অকৃত্রিম প্রেম একদিকে এবং পুরুষত্ব ও মহত্ত্ব-সাধনের পরিচায়ক কর্ত্তব্য সাধন অন্য দিকে হইলেও যাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করিতে অশক্ত ছিল, যে সত্যের অনুরোধে প্রাণসম স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগে জলাঞ্জলি, সেই সত্যের— প্রাণ হইতেও প্রিয়তম সেই সত্যের প্রত্যক্ষ ফল, জগতের ধ্বংস পর্য্যন্ত যাহাতে ঘোষিত হইবে, সেই অবসর তিনি কেমন করিয়া ত্যাগ করেন? দ্বিতীয় পরিণীত হইয়া হানিমান্ চিকিৎসকের এক প্রধান কর্ত্তব্য সংসাধন করিয়াছেন। যদি তিনি এরূপ না করিতেন, আমরা নিশ্চয় বলিতেছি, দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি কখন ঐ ঘটনা হোমিওপেথির পুরাবৃত্তে ও তাঁর জীবনবৃত্তে এত সংলিপ্ত ও চিররূঢ় থাকিত না—মূলে কোন সংঘর্ষ থাকিত কি না তাহাই সংশয়স্থল। নব দম্পতীর দোষক্ষালনের এই যে ব্যাখ্যান দেওয়া হইল, বোধ করি তাহাই যথেষ্ট। এখন অপর ঘটনায় প্রবেশ করা যাউক।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অনেকেই বোধ করি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন, "এই মিলন অস্থায়ী এবং নানা অসুখের মূল—অনিষ্টের আকর।" কারণ পরিণয় প্রথার সাধারণ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া ইহার গতি ভিন্ন দিকে প্রধাবিত। রূপ ও বয়সে মিলন, এই প্রচলিত প্রণালীর এখানে ব্যভিচার। উহার প্রত্যুত্তরে আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, মিলানী সুশিক্ষিতা—তাঁহার অন্তর অতি উচ্চ। সুতরাং ক্ষণভঙ্গুরতা এ বিবাহের বিপক্ষ হইল না। চরিতাখ্যায়কের পদ বিষম সমস্যা। প্রথমে প্রমাণ করিতে হইয়াছে, এ কার্য্য সাধুজন-অনুমোদিত। এক্ষণে প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া চাই, বিবাহের ফল শুভ। মুখের কথার উপর আমাদের পাঠক পাঠিকা বিশ্বাস স্থাপনে প্রস্তুত নহেন, অতএব আমরা ফ্রেঞ্চ কামিনীর বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম। ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণ, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় হানিমান্-পত্নীর অসাধারণ অধিকার। তাঁহার জ্ঞান কেবল ভাষা-জ্ঞানের সীমায় বদ্ধ ছিল না। সভ্য জগতের তাবৎ সাহিত্যে তিনি অলৌকিক ব্যুৎপত্তিশালিনী। তিনি স্বীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী রচনা বিষয়ে ফ্রান্সের মধ্যে এক অলোকসামান্য কবি। তাঁহার রচিত কবিতা পাঠ করিতে করিতে মন প্রাণ বিগলিত হইয়া যায়—শরীর শিথিলিত হইয়া পড়ে। আহা কি সুন্দর মধুর কবিতা! অন্তরাত্মা উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে উঠিতে থাকে এবং ভাবগ্রহ সমাপ্ত হইলে, মন উচ্চতম ভাব ধারণ করে। ইচ্ছা করে, অনবরত তাহা আবৃত্তি করি। এই ত গেল কাব্যের কথা। চিত্র-অঙ্কনেও অনির্ব্বচনীয় যোগ্যতা—নিরূপম অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা। অধিক কি, তিনি লাভোর (Lavour) চিত্রকরগণের মধ্যে গণনীয় হইবার যথা যোগ্য পাত্রী। বিশেষতঃ, হানিমানের প্রতিমূর্ত্তিচিত্রণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্যতা। হানিমানের প্রতিকৃতি যথাযথভাবে প্রাণপণে তিনিই আঁকিতে পারিয়াছেন।—এতাদৃশ রূপ-গুণবতী বিদগ্ধ-রমণীয় রমণী বৈ তৎকালে এমন আর কে ছিলেন, যিনি হানিমানের মন অধিকারে সমর্থ। পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের প্রতিযোগিতা করিতে অপর কাহার ক্ষমতা? যে কাণ্ডে দেশ হইতে বিবাসিত হইতে হইয়াছে, সেই কাণ্ডের মোহিনী শক্তিবলে এক মোহনীয় মোহিনী আজ্ বিমোহিতা এবং বিমল প্রণয় প্রত্যাশী। তাহাকে ছাড়িয়া হানিমানের অন্যে কেন আসক্তি জন্মিবে? পরস্পর পরস্পরের মন্তব্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে উভয়ে উভয়ের দেহার্দ্ধ হইলেন। যাহা প্রমাণিত করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আমাদের এত আয়াস, এখন আমরা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত। পরিণয়ের ফল এইখানেই উদ্ধার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইটালি দেশের অন্তর্গত

প্রসিদ্ধ জেনোয়া নগরের পেশ্চিয়ার এই বিবাহের এবম্বিধ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"হানিমান্ স্বীয় বনিতার চক্ষে দেবতারূপে সম্মানিত। তিনি হানিমানকে এতাধিক ভাল বাসিতেন যে, আমরা লেখনীমুখে তাহা ব্যক্ত করিতে অশক্ত। হানিমান্ যে কয়েক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, সেই পরিমিত কালের জন্য যেন তিনি দেহ মন প্রাণ স্বামি-সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ছায়ার ন্যায় পতির অনুবর্ত্তন করিতেন ও সেবা শুশ্রূষায় নিরত থাকিতেন *। গৃহকার্য্যে তাঁহার অসীম নৈপুণ্য। ফল, তিনি সাধারণ বিষয়ে হানিমানের প্রিয়সখী। তাঁহার অনুকরণীয় চরিত্র।"

পেশ্চিয়ারের শেষ উক্তির সহিত এক হইয়া আমরা সমস্বরে এইথানে একটী ঘটনার নির্দ্দেশ করিয়া হানিমানের দ্বিতীয় ভার্য্যার বৃত্তান্ত শেষ করিব। মিলানীর নিঃস্বার্থতা তাঁহার অন্যান্য গুণের অনুরূপ। হানিমান্ এই কিথেনে বিস্তর বিত্তবিভব সঞ্চয় করিয়া রাখেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বিবাহিত হইবেন উদ্দেশ্য হইলে মিলানী অপেক্ষা রূপ-লাবণ্যসম্পন্না বিস্তর রমণী যুটিত। ধনের অসাধ্য কি? যাহাহউক, মিলানী ঐ সম্পত্তির প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। তাঁহার নিজের অর্থের কিছু অপ্রতুল ছিল না। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য হইতে তিনি অনেক দূরে। এক্ষণে তিনি হানিমানকে সেই অর্থ সমুদায় তাঁহার প্রথম-পরিণীতা পত্নীর গর্ভোৎপন্ন দুহিতাদ্বয়কে বিভাগ করিয়া দিতে বলিলেন। হানিমান্ ইহাতে কত আনন্দিত হইলেন! এইরূপ ধন-অর্পণের প্রস্তাবে মিলানী কত উন্নত, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। কি মনোহর ঔদার্য্য গুণ! ইউরোপ বল, আমেরিকা বল, আর আসিয়া বল, সর্ব্বত্রই বিমাতার কু-দৃষ্টান্তের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ বিরাজমান। কিন্তু বিপক্ষপক্ষীয়েরা এই দম্পতীর ছবি এমনই ভাবে অঙ্কিত করেন, যেন তাহাতে প্রকাশ পায়, তাঁহারা হানিমানের পূর্ব্ব বনিতার সন্ততির উপর ভয়ানক নির্যাতন করিয়াছিলেন। বিবাহ-সংক্রান্ত লেখাপড়া হইতে এইখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। ম্যাডাম্‌ম্লো-সিলি ডি' হার্ভেলি নিম্নোক্ত দুই প্রস্তাবের জন্য বিবাহের পূর্ব্বে স্বামীকে অনুরোধ করেন। যথা—

১ম। "হানিমানের জীবিত কালের মধ্যে বা মরণের পর, তিনি (মিলানী) হানিমানের পূর্ব্ব-সঞ্চিত বিষয়ের কোন অংশ গ্রহণ করিবেন না। তৎসমস্ত তাঁহার পূর্ব্ব-পরিণীতা পত্নীর সন্তানগণে বর্ত্তিবে।"

* ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাসে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভারত-অঙ্গনারাও—

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা, সখীব হিতকর্ম্মসু॥

"২য়। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি (হানিমান্) যে সম্পত্তির অধিকারী, তাহা তৎক্ষণাৎ (বিবাহের পূর্ব্বেই) প্রথমা ভার্য্যার গর্ভোৎপন্ন সন্তানগণকে বিভাগ করিয়া দিউন। এবং পূর্ব্ব নির্দ্দেশিত প্রথম নিয়ম এই দ্বিতীয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা হউক।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব তদ্দণ্ডে সম্পাদিত হইল। হানিমান্ কেবল ১৫০০০ ডলারের সুদ নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিলেন। ম্যাডাম্ হানিমান্ একটী সামান্য বৈবাহিক সুবর্ণ-অঙ্গুরীয় মাত্র গ্রহণ করিলেন।

পাঠকপাঠিকারা এখন হানিমানের পবিত্র চরিত্রের প্রতি অযথা দোষারোপ শুনিয়া অবাক্ হইবেন। তাঁহার যে সকল শত্রু বরাবর অনবরত উদ্যোগ করিয়াও এতকাল কৃতার্থ হইতে পারে নাই, এবং পক্ষান্তরে হানিমানকেও সুতরাং পরাস্ত বা বিপর্য্যস্ত করণে অক্ষম ছিল, ঐরূপ নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া বেড়ান, তাহাদের কাজ। দোষক্ষালনের ইহা অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আবশ্যক বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস নাই।

এ অবস্থাতেও হানিমানের উন্নতি চরম সীমায় সমাগত নহে। এখনও স্বকার্য্যে তাঁহার ঔদাস্য নাই। দৃষ্টান্তস্থলে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, এই বৎসরে "পুরাতন পীড়ার" তৃতীয় সংস্করণ নিষ্পাদিত হয়। এই বারের পরিবর্দ্ধন ও পরিপুষ্টির জন্য তাঁহাকে যে অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রমের আতিশয্যে পড়িতে হয়, তাহা বর্ণনার অতীত।

গ্যালিকান্ হোমিওপেথিক সমাজ।

কিছুকাল পরে ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরের গ্যালিকান্ হোমিওপেথিক সোসাইটীর সম্পাদক হানিমানকে অবৈতনিক সভাপতি (Honorary President) ও সম্মানিত সভ্য [Honorary Member] পদবী প্রদান করিলে, তিনি উক্ত সভাকে স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতা ও সৌজন্যপূর্ণ নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন :—

" প্রিয় বন্ধু ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ,—

"আপনাদের মাননীয় সম্পাদক দ্বারা আপনারা পরম শিষ্টাচার ও অনুগ্রহ সহকারে আমাকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার জন্য আমি অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি আপনাদের বৃহতী সমিতির "সম্মানিত সভ্য ও অবৈতনিক সভাপতির" উপাধি অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

"আপনাদিগের পত্রে অবগত হইলাম, ফ্রান্স রাজ্যে আমাদের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। এবং সাধারণের নিকট ফ্রান্সের ঐরূপ উন্নতির বিষয়ও শুনিয়াছি। পারিসস্থ আপনাদের এই নবপ্রতিষ্ঠিত সভাও ঐ কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। আমি ফ্রান্স দেশ ও

তাঁহার উদারচরিত অধিবাসিকুলকে পূর্ব্ব হইতেই প্রাণের সহিত ভালবাসি। ফ্রেঞ্চ জাতিকে আমি অতি মহান্, সমদর্শী, ও সত্যানুসন্ধায়ী জাতি বলিয়া জানি। সম্প্রতি আমার সেই সংস্কার, ফ্রান্স-দেশীয়া উচ্চবংশীয়া এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত বিবাহে দৃঢ়তর হইয়াছে। তিনি সর্ব্বাংশে তাঁহার দেশের অধিবাসীদিগের তুল্য।

"আপনারা মানব জাতির সুখ স্বচ্ছন্দতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত সংস্করণ-কার্য্যের উন্নতি হেতু, আমার প্রিয় সহযোগী।' ঈশ্বর আমাদের সমবেত চেষ্টাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমি ঐশ্বরিক কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত-মাত্র। এখনও অনেকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে অন্ধ। অতএব আসুন, আমরা এমন ভাবে কাজ করি, যাহা দেখিয়া সকলের হোমিওপেথর উপর বিতৃষ্ণা দূর হইবে। এই রূপে কার্য্য করিলে, আমরা তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইব। কেন না, আমাদের চিকিৎসা-প্রথা, সূর্য্য-কিরণের ন্যায় জগতের এক প্রধান সত্য।

"ভরসা করি, আপনারা আমাকে বিস্মৃত হইবেন না। আমি আপনাদের বন্ধু এবং আপনাদের স্বাস্থ্য ও সুখের প্রার্থী।

কিথেন। ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫। } বশংবদ সামুয়েল্ হানিমান্।"

কিথেন্ পরিত্যাগ ও পারিসে অবস্থান।

হানিমান্ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কিথেন্ হইতে পারিসে গমন করেন। তাঁহার কোন জীবনচরিত-লেখক বলেন, পত্নীর উত্তেজনা বাক্যে তাঁহাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হয়। আমাদের বোধ হয়, ফ্রান্সের জলবায়ু, ফ্রান্সের হোমিওপেথিক চর্চ্চার প্রাদুর্ভাব, ফ্রেঞ্চজাতির ঔদার্য্য— তাঁহাকে পারিসে লইয়া যাইবার যথেষ্ট কারণ। ফ্রান্সের গুণ গরিমার বৃত্তান্ত তিনি তদীয় ভার্য্যার সকাশ হইতে শ্রবণ করিয়া ফ্রান্সের অভিমুখে যাইতে-কৃত-সঙ্কল্প হন। ফরাসি জনপদ তাঁহার অতি প্রিয়, পূর্ব্ব পত্রে তাহা অবগত হওয়া গিয়াছে। কিথেনে তাঁহার দুহিতারা বসতি করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ফ্রান্স আগমন-সূত্রে পেশ্চিয়ার যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধার করা গেল।—

"হানিমান্ পরিশেষে পারিসে আসিয়া উপনীত হন। অতীত কিংবা বর্ত্তমান কালের মহামান্য কোন ব্যক্তি নগরে কি সহরে আসিলে, যেমন সেই আগমন লইয়া মহা ধূমধাম কাণ্ড পড়িয়া যায়, হানিমানের আগমনে তাদৃশ কোন আড়ম্বর অনুষ্ঠিত হয় নাই। হাতে কলমে এত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এখন সেই ক্লান্তি দূর করা পারিসে আসিবার কারণ। নববিবাহিতা

বনিতা সঙ্গে পারিসে পৌছিয়া কঠিন পরিশ্রম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা ব্যতীত ফ্রান্স আগমনের অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি ফরাসি ভাষায় এক বৃহদাকৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন। এখানে আসিয়া নিশ্চিন্তভাবে সেই গ্রন্থের সমাধা করিতে আরম্ভ করিলেন। ফান্সবাসিগণের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া ঐ পুস্তক বিরচিত হয়। হোমিওপেথি প্রথা উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বে, ফ্রান্সে বহু বৎসর ধরিয়া তর্ক স্রোত বহমান থাকে। অধিক আর কি বলিব, হোমিওপাথেরাও আবিষ্কারকের বহুতর মতের প্রতিবাদ করিতেন; তাঁহার কত মত বিতণ্ডা দ্বারা খণ্ডন করিতেন। হানিমানের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতের স্থানে তাঁহাদিগকে বিভিন্ন মত স্থাপন করিতে শুনা যায়।—হানিমান্ ঐ সকল শুনিয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন। অপর কর্ত্তৃক খণ্ডিত মতের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী চালনা করিবেন, কিছুকাল পরে প্রচারিত হইল।

"এখানে অলক্ষিত ভাবে থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা। প্রায় এক পক্ষ কি তদপেক্ষা কিছু অধিক দিন হইবে, তিনি পারিসে আসিয়াছেন, অথচ তাঁহার নিতান্ত প্রিয়পাত্রেরাও তাহা জানিতে পারেন না। প্রকাশ্য পথের ধারে থাকিলে, পাছে কেহ টের পায়, এজন্য তিনি অত্যন্ত অপরিসর গলিতে থাকিতেন।

"অতি অল্প দিন ঐরূপে অতিবাহিত হইতে না হইতে, তাঁহার আবাসবাটী সকলের পরিচিত হইয়া পড়িল। জর্ম্মণির ন্যায় এখানেও রোগী ও দর্শক-বৃন্দের আগমনে তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণ প্রত্যহ পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।"

এখন হইতে কূট তার্কিকগণের সমালোচনার উত্তর-সমাধানে তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হয়। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায়ে ফ্রান্সরাজের সচিব বিমুগ্ধ হন। রাজ-মন্ত্রী গিজানীর অনুরোধে প্রকাশ্যে চিকিৎসা করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। পারিস এই সময় চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মধ্যবিন্দু। ক্রমে ক্রমে ফ্রান্সে হোমিওপেথিক সভা, হোমিওপেথিক বিদ্যামন্দির, হোমিওপেথিক সাময়িক পত্রের উদ্ভব হইতে লাগিল। হানিমানের উত্তম উত্তম প্রবন্ধের অনুবাদ ঐ পত্রিকার প্রতিপাদ্য। দুইটী হোমিওপেথিক হাঁসপাতাল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সাধারণের উপকার হইতে থাকিল। হল্ সাহেব বলেন, ঐ কালেজের শিক্ষা কার্য্য অতিশয় সুচারু।

অত্রত্য বাসভবন নানাপ্রকার চিত্রে সুসজ্জিত। পুস্তকালয় বহু প্রকার নবীন ও প্রাচীন জ্ঞানগর্ভ পুস্তকে সমাকীর্ণ; দেখিলে অকস্মাৎ দ্বিতীয় বোড্লিয়ান্ লাইব্রেরি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে।

জন্মতিথি মহোৎসব।

তাঁহার জীবনের শেষভাগ কেমন সমাদরে, কেমন আমোদে অতিবাহিত হইয়াছে জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইলে, জন্মতিথি-বিবরণের বর্ণন আবশ্যক। কতকগুলি বন্ধু ও অন্তেবাসী মিলিত হইয়া, তাঁহার জন্মতিথি-উৎসব পরম সমারোহে সম্পন্ন করেন। তদুপলক্ষে সুসভ্য ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত মহানন্দে বিহ্বল হয়। তথায় আমন্ত্রিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, ধনবান্ ও সম্ভ্রান্তগণের অসদ্ভাব ছিল না। আহূত, অনাহূত স্তুতিবাদকগণের উপস্থিতিতে গৃহাঙ্গণ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সজ্জিত প্রাঙ্গণের কেন্দ্র স্থলে শুভ্র প্রস্তরময়ী হানিমানের দেহ-পূর্ব্বার্দ্ধের প্রতিমূর্ত্তি। সেই প্রতিকৃতি, হানিমানের প্রিয় সুহৃৎ ডেভিডের যত্নে ক্ষোদিত। অতুলনীয়-কীর্ত্তি পারিসের ডাক্তার লিওন্ সিমন্,—লাউএল্‌গিন্, কাউণ্ট ডেস্ গিডি প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া পুষ্পমালা-মণ্ডিত প্রাঙ্গণে হানিমানকে লইয়া গেলেন। তৎপরে সিমনের অনর্গল মধুর বক্তৃতায় সকলের মন প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। বাগ্মী উপসংহার কালে হানিমানকে মানব জাতির 'জীবনবন্ধু' নির্দ্দেশ করিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। তাহার পর ফ্রেঞ্চ ও ইতালীয় ভাষায় দুইটী ছন্দোময়ী কবিতা পঠিত হইল।

উপসংহার।

বহুল যত্নে যত দূর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহার ত্রুটি করা হয় নাই। এক্ষণে আমরা হানিমানের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে সমাগত। ক্রমাগত কঠিন পরিশ্রমে হানিমানের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হন। ঐ রোগে তাঁহাকে ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া পরলোক গমন করিতে হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২রা জুলাই প্রদীপ্ত হানিমান্ সূর্য্য সহসা অস্তমিত হইল। ফ্রান্স কাঁদিল—জর্ম্মণি কাঁদিল—সমগ্র ইউরোপ কাঁদিল, সেই সঙ্গে আমেরিকাও কাঁদিল। মানবজাতির সেই অকৃত্রিম বন্ধু-বিরহে শত্রু মিত্র সকলে বিহ্বল—সকলেরই চক্ষে দুঃখাশ্রু।

হানিমান্ যার পর নাই সরলমনা ও উদার ছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান-মতাবলম্বী। তাঁহার জীবনে অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার সমদর্শিতা হৃদয়ঙ্গম হইলে চমকিত হইতে হয়। এত উচ্চ উচ্চ গুণের সহিত বিনম্রতা তাঁহাতে অবস্থিত ছিল। নিজ দেহে তিনি ৯০ নব্বুইটী ঔষধের পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাতেই বোধ হয় তিনি আর অধিক দিন জীবিত রহিতে পারিলেন না। গ্রীক্ ও লাটিন, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজি, ইটালীয় ও জার্ম্মাণ ভাষায় তাঁহার চূড়ান্ত পাণ্ডিত্য। কৃষি, রসায়ন, সাহিত্য ও চিকিৎসা-সম্বন্ধীয়

ন্যূনাধিক চতুর্ব্বিংশতি গ্রন্থ তাঁহা কর্ত্তৃক অনুবাদিত হয়। ৭৫ খানি পুস্তক তাঁহার নিজের বিরচিত। মৃত্যুকালেও তাঁহার চক্ষুর দীপ্তি অতি জ্যোতিষ্মান্‌ এবং স্মৃতি-শক্তি অতি তীব্র ছিল। মরণ-পীড়ার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রায়ই কোন রোগ ভোগ করিতে হয় না। তিনি সাধারণতঃ শান্তপ্রকৃতি ও কৃতজ্ঞ। তিনি জগতকে এক নূতন অমূল্য সত্য দিয়াছেন, তাহা কেহ কখন বিস্মৃত হইবে না—বরং অনন্তকাল গৌরবের সহিত আদরের সহিত অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইবে, হানিমানের চরিত্রের ততই গুরুত্ব বাড়িতে থাকিবে। সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়, ব্যাধির অস্তিত্ব বরং দূরীকৃত হইবে, তথাপি হানিমানের নাম কখনই জগত হইতে তিরোহিত হইবার নয়। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—তিনি মৃত হইয়াও যশে জীবিত। এরূপ প্রতিভাশালী মহাজন জগতে জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ।—শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।

ম্যাক্‌বেথ্‌।

চরিত্র-সৃজন-সম্বন্ধে, যাহা কিছু সাধারণ হইতে অসাধারণ, তাহারি অবতারণ করাই কবির কার্য্য। চরিত্রের অসাধারণত্বই মহত্ত্ব, এবং মহত্ত্বের বীজ সৌন্দর্য্য।

চরিত্রের অসাধারণত্ব বা মহত্ত্ব প্রতিপাদনে কবি-কৌশল মূলতঃ এক হইলেও উহার প্রণালী দুই। মানব চরিত্রের বলকে বাহ্যবল সকলের সহিত সংঘর্ষে আনিয়া, বাহ্যবল সকলের পরিমাণের তুলনায় চরিত্রের বল অনুমান করাই মূল কৌশল। এই মূল আবার দুই শাখা বা প্রণালীতে বিভক্ত। যেখানে বাহ্যবল সকল চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়া চরিত্রের বল দ্বারা পরাহত হইয়া যায় এবং চরিত্রের বল অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পরাহত বাহ্যবল সকলের পরিমাণের তুলনায় নিজ মহত্ত্বের পরিমাণ দেখাইতে থাকে, সেই থানে সেই কার্য্য-কৌশলকে মূল *কাব্য-কৌশলের সংযোজন বা সংগঠন* প্রণালী কহে। কাব্যকৌশলের দ্বিতীয় প্রণালীতে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমিত মানব চরিত্র-বলের বিরুদ্ধে তাহা অপেক্ষা প্রবলতর বাহ্যবল সকল একে একে বা সমবেতভাবে প্রযুক্ত হইয়া ক্রমে চরিত্রের বলকে শিথিল, ভগ্ন, খণ্ডিত ও চূর্ণ বিচূর্ণিত করিয়া বাহ্যবল সকলের আক্রমণ দমন ও আঘাত সকলের গুরুত্বের পরিমাণের অনুমানে, চরিত্রের গুরুত্ব, সংযতি, দৃঢ়তা ও কাঠিন্যের যে তুলনায় অনুমান, উহাকেই কাব্যকলার

বিয়োজন বা বিভঞ্জন প্রণালী কহে। ম্যাক্‌বেথ কবিকৌশলের এই বিয়োজন প্রণালীর প্রদর্শিত সুমহৎ চরিত্র।

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি-সংস্কারান্ধ ব্যক্তিগণ, কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক ম্যাক্‌বেথের মহত্ত্বের নাম শুনিয়াই হয়ত বিরুদ্ধমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে মহানরক-যোগ্য এ হেন জীবের জঘন্য, নীচ মূর্ত্তিই প্রতিভাষিত হইতে থাকে; কিন্তু সেই জীবের বাহ্যছবি পরিত্যাগ করিয়া আভ্যন্তরীণ সংস্কার-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল মহচ্ছবির প্রতি তাঁহাদের বাহ্যদৃষ্টি প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনায় যাহা কিছু ভগ্ন হয়, তাহাই অসার; কিন্তু কোন্ বস্তু কিরূপ আঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, পরিশেষে কিরূপ শক্তি সকলের মিলিত গুরুতর আঘাতে ভগ্ন হইল, এই সকল বিরোধী শক্তির পরিমাণের তুলনায় বস্তুর শক্তি অনুমান করিতে সমর্থ নহেন; সুতরাং ইহাঁদিগ কর্ত্তৃক ম্যাকবেথ-চরিত্রের অসারত্বই অনুভূত হইয়া থাকে।

আমারাও স্বীকার করি, যাহা কিছু অমানুষিক বা অলৌকিক, ম্যাক্‌বেথ্ সেরূপ চরিত্রের আধার নহেন। মানবত্ব যে সকল প্রবৃত্তি ইচ্ছাদির বিকারের অধীন, ম্যাক্‌বেথ্ তাহার অতীত নহেন; কিন্তু মনুষ্যত্বের যে চূড়ান্ত সীমাক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রেরই এক প্রদেশস্থ জীব। অমানুষিক বা অলৌকিক নির্ব্বিকার ভাব কেবল একমাত্র ঈশ্বরেই আরোপিত আছে, মানুষ কি দেবতা তাহার অতীত নহে। ম্যাক্‌বেথ্ চরিত্র অমানুষিক বা অলৌকিক না হইলেও সাধারণ হইতে অসাধারণ; সাধারণ মনের চরিত্রের বল হইতে ম্যাক্‌বেথ চরিত্রের বল কতদূর অসাধারণ, এবং কিরূপ চমৎকার পরাকাষ্ঠা-কৌশলে কবি কর্ত্তৃক উহা প্রতিপাদিত, তাহা আমরা একরূপ দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছি।

ম্যাক্‌বেথ্ চরিত্র কাব্য-কৌশলের বিয়োজন-প্রণালীর অধীন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই বিয়োজন বা বিভঞ্জন-প্রণালীর প্রয়োজনানুসারে নির্দ্দিষ্ট পরিমিত ম্যাক্‌বেথ চরিত্রের বলকে ভগ্ন ও সমভূম করিতে, তাহার প্রতিকূলে তাহার যোগ্য বাহ্য বলের সমাবেশের আবশ্যক। এই বাহ্যবল সকলের বেষ্টন, আক্রমণ, দমন, (Pressure) ও আঘাত সকলের মিলিত শক্তির পরিমাণের অনুমানে, ম্যাকবেথ্ চরিত্রের গুরুত্ব, সংযতি, দৃঢ়তা ও কাঠিন্যের পরিমাণ অনুমিত হইবে।

কবি ম্যাক্‌বেথের প্রতিকূলে, দৈববল, মানবীয় বল ও সাংসারিক বল, এই ত্রিবিধ বলেরই সমাবেশ করিয়াছেন। সাংসারিক শক্তির বল অপেক্ষা মানবীয় শক্তির বল অধিক এবং মানবীয় শক্তির বল অপেক্ষা দৈব শক্তির বল অধিকতর। আবার এই সাংসারিক বলের যাহা কিছু প্রবলতম, মানবীয় বলের

যাহা কিছু প্রবলতম, ও দৈব বলের যাহা কিছু সুপ্রবল, এই ত্রিবিধ বলের একত্র সমাবেশের সমষ্টি শক্তি মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও বলের পক্ষে শেষ। এক্ষণে এই ত্রিবিধ বলের সমষ্টি শক্তির শেষ ম্যাক্‌বেথের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে। প্রবলতম সাংসারিক শক্তি একা ম্যাক্‌বেথের অঙ্গ স্পর্শ করিতেও যোগ্য নহে; সেইরূপ কি মানবীয়, কি দৈব প্রবলতম কোন শক্তিই একাকী ম্যাক্‌বেথ্‌ চরিত্রকে ভঙ্গ করিতে অশক্ত। এই নিমিত্ত ঐ ত্রিবিধ বলের এককালীন সমাবেশ প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই সমবেত ত্রিবিধ বলও ইচ্ছামত যখন তখন প্রযুক্ত হইয়াও অটল ম্যাক্‌বেথ্‌ চরিত্রকে টলাইতে সাহসী নহে; ইচ্ছামত অযথা সময়ে আক্রমণ করিয়া ইহারও কার্য্য সাধনে যেন পরাঙ্মুখ; এই নিমিত্ত উপযুক্ত সময়ের সমাগম বুঝিয়া প্রবলতম দৈবশক্তিই আগে উহার প্রতি লক্ষিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকের বিজয়োল্লাসে যখন মন সংসারোন্নতির আশায় অভিষিক্ত, এই সময়কে উপযুক্ত সুযোগ বিবেচনায় অন্তরের সেই কোমলভাবকে লক্ষ্য করিয়া দৈবশক্তি—প্রথম আক্রমে উদ্যত। ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে প্রথমতই যে দৈববলের পরাক্রম নিনাদিত হইল, উহা ভবিষ্যৎবাণী। কিন্তু এই ভবিষ্যৎবাণী অদৃশ্য আকাশবাণীও নহে; অদ্ভুত-মূর্ত্তি তিনটী অপার্থিব যোনি নির্জ্জন প্রদেশে প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইয়া নিজ নিজ বাগ্‌যন্ত্র নিনাদে ম্যাকবেথের কর্ণে ঐ ভবিষ্যৎবাণী ধ্বনিত করিল। প্রথম যোনি যে বাণী উক্তি করিল, উহা ভবিষ্যৎবাণী নহে, উহা বর্ত্তমানসিদ্ধ বাক্য। সুসিদ্ধ বাক্যের উক্তি দ্বারা যোনিগণ জানাইতেছে যে, ম্যাক্‌বেথের অবস্থা তাহাদের অজানিত নহে। তাহারা ইহার পরে যে উক্তি করিবে, তাহার প্রতি ম্যাকবেথের অধিকতর আস্থা ও প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য তাহারা যে ম্যাক্‌বেথের অবস্থায় সুপরিচিত, আগে তাহার পরিচয় দিয়া পরে তাঁহার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট কথার উল্লেখ করিতেছে, এই নিমিত্ত প্রথম যোনি উক্তি করিল;—

"All hail, Macbeth! hail to thee Thane of Glamis."

ম্যাক্‌বেথ্‌ জানিতেন যে, তিনি সাইনেলের মৃত্যু হওয়ায় গ্লামিসের থেন হইয়াছেন। অন্যথা মানুষ-সঙ্কুল সংসারের মধ্যে কাহার অবস্থা কে জানিয়া উঠিতে পারে? এমত স্থলে অদ্ভুত, অপরিচিত, অপার্থিব যোনিগণের নিকট তাঁহার অবস্থা যে অজ্ঞাত নহে, ইহাতে তাঁহার তাহাদের অপরাপর বাক্যের প্রতি অধিকতর আস্থা হওয়ার সম্ভব। (ক্রমশঃ)

যোগ।

কাশী।

হিন্দু শাস্ত্রে কাশীর বিষয় যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে কাশী দুই প্রকার। তন্মধ্যে যে কাশী কেবল জ্ঞানগম্য, তাহাকে জ্ঞান কাশী বলা যায়। আর যে কাশী ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, তিনি মহাপীঠ অর্থাৎ যে স্থানে দক্ষাত্মজা হরাঙ্গনার দুই হস্ত, একটী কুণ্ডল আর ধড় নিপতন হইয়াছিল সেই স্থানকে আর্য্যেরা বাহ্যজগতীয় প্রত্যক্ষ কাশী বলিয়া মান্য করিয়াছেন। বৃহৎ পীঠমালা ও মহাভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে। তৎসমুদায় পরে বলা যাইবে। এইক্ষণ জ্ঞান কাশীর বিষয় যথাশাস্ত্র বলা যাইতেছে।—

কাশী শব্দে ঈশ্বর জ্যোতিঃ। এই ঈশ্বর জ্যোতিকে যখন পুরীর বিশেষণ বলা যায়, তখন স্ত্রীলিঙ্গ চিহ্ন দীর্ঘ ঈকার ঐ জ্যোতিবোধক কাশ শব্দে যোগ হয়। ইহাতেই কাশীপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে কেবল জ্যোতির্ম্ময়ী পুরীকে কাশী পদে বোধ হয়। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী পুরী আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগী ভিন্ন অন্য সকলে দর্শন বা তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন না। কাশীখণ্ডের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থে ও তাহার তাৎপর্য্যে স্পষ্টই জানা যায়, যে কাশী শব্দে জ্ঞান কাশীকে বুঝায়। ঐ শ্লোক ঃ—

ভূমিষ্ঠাপি ন যাত্র ভূ-
স্ত্রিদিবতোপ্যুচ্চৈরধঃস্থাপি যা,
যা বদ্ধা ভুবি মুক্তিদা স্যু-
রমৃতঃ যস্যাং মৃতা জন্তবঃ।
যা নিত্যং ত্রিজগৎ-পবিত্র-
তটিনীতীরে সুরৈঃ সেব্যতে,
সা কাশী ত্রিপুরারিরাজ-নগরী,
পায়াদপায়াজ্জগৎ॥ ২॥

ইহার সংক্ষেপার্থ—যিনি ভূমিস্থিতা হইয়াও ভূমি নহেন, অধঃস্থিতা হইয়াও স্বর্গাপেক্ষা উচ্চ, ভূতলের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াও মুক্তিদা; জন্তুগণ যাহাতে মৃত হইলেও অমৃত হয়; গঙ্গাতীরে যিনি আছেন, এরূপ মহাদেবের রাজপুরী জগৎকে অপায় অর্থাৎ অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুন। এই শ্লোকের প্রকৃতার্থ অতি সহজ নহে। ভূমিস্থিতা হইয়াও, যিনি ভূমি নন, এমন পদার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শিবসংহিতা নামক যোগশাস্ত্র বলেনঃ— যোগীরা যখন কুম্ভক করিয়া ষট্‌চক্র ভাবনা করেন, তখন মূলাধার-স্থিতা কুণ্ডলিনীকে ষটচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে লইয়া গেলে পর, তথায় কেবল আত্ম জ্যোতিকে জ্ঞান চক্ষে সন্দর্শন করিতে থাকেন। ঐ সহস্রার মূলাধারের সহিত ক্রমান্বয়ে সংলগ্ন। মূলাধারকে যোগশাস্ত্র পৃথিবী বলিয়া ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। মূলাধারে কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা থাকেন; সহস্রারে ঐ কুণ্ডলিনীকে জ্ঞান দ্বারা লইয়া পরমাত্মাতে বিহার করান। ইহাই যোগীদিগের কার্য্য। মূলাধারে আর সহস্রারে যাহা যাহা আছে, বাহ্যজগতীয় কাশীতেও তাহা আছে। বাহ্যজগতীয় কাশীর প্রধান চিহ্ন গঙ্গা—আর অসি, বরণা ও মণিকর্ণিকা। অন্তর্জগতীয় সহস্রারস্থ কাশীতেও তাহাই অছে। ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় মধ্যবর্ত্তী যে পদার্থ আছে, যোগীরা সেই পদার্থ ও ঐ নাড়ীদ্বয়কে অসি, আর বরণা জ্ঞান করেন। সুষুম্না নাড়ীকে গঙ্গা বলিয়াও জানেন।

বাহ্যজগতীয় কাশীর দুই পার্শ্বে যেমন অসি, বরণা আর মধ্য-স্থলে গঙ্গা আছে, তদ্রূপ সহস্রারেও ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না আছেন। বাহ্যজগতীয় কাশীর অধী দেবতা যেমন বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা, অন্তর্জগতীয় সহস্রারস্থ জ্ঞান কাশীর অধিদেবতা পরমাত্মা ও পরমা মায়া। ইহার প্রমাণ। যথা।—

ইড়াহি পিঙ্গলাখ্যাতা, বরণাসীতিহোচ্যতে। বারাণসীতয়োর্ম্মধ্যে, বিশ্বনাথো এভাষিতঃ। এতৎ ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ; শাস্ত্রেষু বহুধাঃ প্রোক্তং, পরং তত্ত্বং সুভাষিতং। সুষুম্না মেরুণা যাতা ব্রহ্মরন্ধ্রং যতোহস্তি বৈ। ততশ্চৈষা পরাবৃত্যা তদাজ্ঞাপদ্ম দক্ষিণে। বামনাসাপুটং যাতি, গঙ্গেতি পরিগীয়তে। ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎপদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতং। অত্রকন্দেহি যা যোনি—স্তস্যাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ। ত্রিকোণাকারতস্তস্যা, সুধা ক্ষরতি সন্ততং। ইড়য়ামমৃতং তত্র সমঃ স্রবতি চন্দ্রমাঃ। অমৃতং বহতি ধারা, ধারারূপং নিরন্তরং। বামনাসাপুটং যাতি, গঙ্গেত্যুক্তা হি যোগিভিঃ।

আজ্ঞা-পঙ্কজ-দক্ষাংশা-
দ্বামনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহতি তত্রেড়া,
বরণা সা উদাহৃতা।
ততোদ্বয়মিহ স্থানে,
বারাণস্যাস্তু চিন্তয়েৎ।
তদাকারা পিঙ্গলাপি,
তদাজ্ঞাকমলান্তরে।
দক্ষনাসাপুটে যাতি,
প্রোক্তাস্মাভিরসীতি বৈ।
আজ্ঞা-পঙ্কজ-বামস্যা-
দ্দক্ষনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহা পিঙ্গলাপি,
পুরাসীতি প্রকীর্ত্তিতা।

অর্থ। দেবাদিদেব মহাযোগী মহাদেব যোগশাস্ত্রে বলিয়াছেন, শরীরের মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত যে প্রধানা নাড়ীত্রয় ষট্‌চক্র ব্যাপিয়া দেহে রস সঞ্চারণ, বায়ু পূরণ ও নিঃসারণ করাইতেছেন, সেই নাড়ীত্রয়কে অসি, বরণা আর গঙ্গা বলিয়া যোগীরা ধ্যান করেন। ঐ অসি বরণার মধ্যবর্ত্তী যে চক্র আছে, তৎসমুদায় পঞ্চক্রোশী বারাণসী। এই বারাণসী-সংলগ্ন সুষুম্না নাড়ীকে উত্তর-বাহিনী গঙ্গা বলিয়া

আত্মতত্ত্ববিদেরা জানেন। এই বারাণসী মহাদেবের ত্রিশূলোপরি আছে। এখানে মেরুদণ্ডকে ত্রিশূল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেমন ত্রিশূলের ঊর্দ্ধ ভাগ প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ, তেমনি মেরুদণ্ডের উপরিভাগ প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ। মেরুদণ্ডের উপরি ভাগে যেমন শরীরের উত্তমাঙ্গ, তদ্রূপ ত্রিশূলের অগ্র ভাগে উহার মস্তক আছে। সেই শূলের মস্তকে বারাণসী নিয়ত বাস করায়, বারাণসী ভূমিষ্ঠা হইয়াও ভূমি নহে। প্রমাণ—

ক্ষেত্রমেতৎ ত্রিশূলাগ্রে,
শূলিনস্তিষ্ঠতি সদা।
অন্তরীক্ষেণ ভূমিষ্ঠং,
নেক্ষন্তে মূঢ়বুদ্ধয়ঃ।
ভূর্লোকে ন চ সংলগ্ন-
মন্তরীক্ষে মমালয়ং।
বিমূঢ়াস্তং ন পশ্যন্তি,
মুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতসা ॥কাশীখণ্ড।

ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রকৃত কাশীকে অজ্ঞানীরা কোন প্রকারে দেখিতে পায় না। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সকল কেবল মন দ্বারা দেখিতে পান। উহা চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না।

যদ্যপি প্রকৃত প্রস্তাবে বারাণসীকে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানী ভিন্ন অন্যে দেখিতে নাই পায়, তবে "কীটাঃ পতঙ্গাঃ মশকাশ্চ বৃক্ষা, জলে স্থলে যে বিচরন্তি জীবাঃ। মণ্ডূকমৎস্যাঃ ত্রিময়োপি কাশ্যাং; ত্যক্তা শরীরং শিবমাপ্নুবন্তি" এই যে কাশীখণ্ডের প্রমাণ আছে, ইহার তাৎপর্য্য কি? যখন কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী কাশীতে দেহত্যাগ করিলে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর ফলের ইতর বিশেষ কি থাকিল? ইহার উত্তরে যোগীরা এইরূপ বলেন যে, অবিমুক্ত যে পদার্থ, তাই কাশী। কাশী যে অবিমুক্ত—তাহার প্রমাণ। সোঽবিমুক্তে উপাস্যো য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিতঃ—ইতি শ্রুতিঃ।

অন্যচ্চ।—কাশীতি অনাখ্যেয়ং

স্বপ্রকাশং চৈতন্যম্।
কাশতেঽত্র যতো জ্যোতি-
স্তদনাখ্যেয়মীশ্বরঃ।
অতো নাম্না পরং চাস্তু,
কাশীতি প্রথিতং প্রভো।

কৈলাসপতি পশুপতি যে স্থানে বিহার করেন, সে স্থানকেই শাস্ত্রকারেরা কাশী সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

ন যদা ভূমিবলয়
ন যদপাং সমুদ্ভবঃ।
তদাবিহর্ত্তুমীশেন
ক্ষেত্রমেতদ্ বিনির্ম্মিতং॥

অপরঞ্চ।—নাহো ন রাত্রির্ননভো ন ভূমি
র্নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদি বুদ্ধ্যাদ্যুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ॥
কাশীখণ্ড টীকা।

যেখানে দিবা রাত্রি নাই, যে স্থানে আকাশ বা ভূমি ও অন্ধকারের সম্পর্ক নাই, যে স্থান কেবল আত্ম-

জ্যোতিতে পরিপূর্ণ, সেই স্থানই কাশী। আর যেখানে ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধ্যাদি দ্বারা কেবল এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না, সেই স্থান কাশী; পদ বাচ্য। অপিচ—

অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রং
পঞ্চক্রোশী-পরিমিতং।
জ্যোতির্লিঙ্গং হি তৎ
ক্ষেত্রং পরং বিশ্বেশ্বরাভিধং॥

ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে জ্ঞানই কাশী—জ্ঞান হইলে জীব মাত্রই মুক্তিলাভ করিবে। সেই জ্ঞানকাশী ইহ শরীরে সিদ্ধযোগী ভিন্ন অন্যে দেখিতে পান না। তবে মহাপীঠ কাশীতে কীট পতঙ্গ মশকাদি প্রাণিগণ যে কোন প্রকারে কলেবর পরিত্যাগ করিলে, মৃতপ্রাণী তৎক্ষণাৎ কায়ব্যূহ হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগান্তে দিব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন অপূর্ব্ব যোগদেহ ধারণ করত অনায়াসে জ্ঞান-কাশী দর্শন করিয়া জীবন্মুক্ত হয়। ইহা মহাপীঠ কাশী মরণের চরম ফল। এতদ্ভিন্ন উহাতে নিষ্পাপ হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারিলে, শিবলোক প্রাপ্তি হইতে পারে। পরে পুনর্ব্বার মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া মহাযোগী হইয়া জ্ঞান-কাশী সন্দর্শন করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে পারেন।

যাঁহারা মূঢ় কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া অপমৃত্যুগ্রস্ত হইয়া ঐখানে দেহত্যাগ করেন, তাঁহারদিগের দেহত্যাগ মাত্রেই কালভৈরব কর্ত্তৃক ঐ কলেবর দূরীকৃত হয়। কেবল মায়াময় কল্পিত দেহটি ঐখানে থাকে; তাহাই সকলে দেখিতে পায়।

ফলতঃ মহাপীঠ কাশীতে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ও মহাপাপীর মরণ সময়ে কাল-ভৈরব-কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইলে, কলেবর পরিত্যাগ হইলে কায়ব্যূহ হইয়া যাবতীয় কর্ম্মফল ভোগ পূর্ব্বক শিবলোক লাভ হইয়া অনতিকাল বিলম্বে যোগদেহ লাভ হয়। যোগদেহ লাভ করিয়া যোগ সিদ্ধ হইয়া জ্ঞান-কাশী সন্দর্শন করত নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হয়। ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাংখ্য-দর্শন *। সঙ্কলয়িতা ১ম খণ্ডে পরীক্ষা কাণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডে পদার্থ কাণ্ড নিবেশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দুই খানিতে কেবল সাংখ্য-দর্শনের মত নিবদ্ধ করা হয় নাই; অন্যান্য দর্শনের মতও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তক দুই খানির ভাষা

* কালীবর বেদান্তবাগীশ-সঙ্কলিত। ১ম খণ্ড মূল্য ১৷০। ২য় খণ্ড মূল্য ১ টাকা। রায় প্রেসে মুদ্রিত।

অতি সরল। বহুকাল পরে এক জন উপযুক্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি একটী অভাব মোচনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন দেখিলে বড় আনন্দ হয়।

সাধারণতঃ সকলেই প্রায় দর্শন-শাস্ত্র ছয় খানি উল্লেখ করিয়া থাকেন। সাঙ্খ্য দর্শনের সঙ্কলন-কর্ত্তা তাহা ভ্রমময় প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক, গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। প্রথম খণ্ডের একটী সুন্দর ভূমিকা আছে। তাহাতে কাব্য নাটক পাঠে অপকার ও দর্শন পাঠে উপকার প্রভৃতি বিষয় অতি পরিপাটীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য ও অপরাপর দর্শনের কাল-নির্ণয়ে গ্রন্থকারের পুরাতত্ত্বে অভিজ্ঞতার অতিশয় বলবান্ প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থ দুই খানি যে দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষার মহামূল্য ভূষণ-স্বরূপ তাহার সন্দেহ নাই। ইহার মুদ্রাকার্য্যও কদর্য্য হয় নাই। পুস্তকের যেমন আকার, তদনুযায়ী ইহার মূল্য অধিক নহে। এই পুস্তক পাঠে আমরা সত্য সত্যই পুলকিত।

বঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। শ্রীরাজনারায়ণ ব সু কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত ও কলিকাতা বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা হইতে প্রকাশিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷০ আনা। ইহাতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিবৃত্ত আছে। পুস্তকখানিতে অনেক নূতন নূতন বিষয়ের সমাবেশ দেখিয়া আমরা যার পর নাই প্রীত হইলাম। আশা করি, বাঙ্গালার প্রত্যেক পাঠক ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিবেন। রাজনারায়ণ বাবুর স্বাভাবিক সরল ভাষা পুস্তকের উত্তমতা সম্পাদন করিয়াছে। পুস্তক আকৃতিতে প্রকাণ্ড না হউক, কিন্তু পড়িতে অত্যন্ত প্রীতিকর। আমরা এক বারের অধিক উহা পাঠ করিয়াছি।

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি। শ্রীরসিক লাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত, বসুপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা। এই পুস্তক-সম্বন্ধে ভাল মন্দ বলিতে হইলে, আমাদের নিজের বিষয়ই বলা হয়। কেন না, বৃন্দাবনদৃশ্যাবলি প্রথমে আর্য্যদর্শনেই প্রকাশিত হয়। যাহা হউক সত্যের অনুরোধে এইমাত্র বলিতে পারি, গ্রন্থকর্ত্তা এক নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেই নূতন প্রথা যে অরুচিকর নহে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এইমাত্র বলিতে পারা যায়, আর্য্যদর্শনের অনেক গ্রাহক ঐ রচনার পক্ষপাতী। কেহ কেহ তাঁহার রচনাকে জয়দেবের পদাবলির ন্যায় মধুরিমাময় বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। গ্রন্থে ব্রজভাষার টীকা করিয়া দেওয়ায় সাধারণের সুখবোধ হইয়াছে। ইহা প্রথম শ্রেণীস্থ কাব্যের অন্তর্ভূত।

কুসুম-কলাপ। ময়মনসিংহ ভারত মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য ।/০ আনা। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। পদ্যের

দৈনিক উন্নতির পরিচয় এইপ্রকার কাব্য প্রচারে সূচিত হয়। কুসুম-কলাপের কবিতা গুলি আমাদের অতি মধুর বোধ হইল। এ প্রকার পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইলে, বালকগণের চরিত্র সংগঠিত হয় এবং তদ্রূপ হওয়া বর্ত্তমান কালে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

মদিরা *। মদ্যের উৎপত্তি, তাহার উপকার অপকার ইহাতে বিবৃত। এই পুস্তকে গ্রন্থকারের বহু অধ্যয়ন, বহুদর্শন এবং বহু বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাও হৃদয়গ্রাহী। গবেষণা-বহুল এই প্রকার পুস্তকের নিকট দীনা বঙ্গভাষা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

লঘুচরিতমঞ্জরী †। ইহা একখানি জীবনবৃত্ত। সুন্দর ভাষায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণিত হওয়াতে পুস্তক সাধারণের পাঠোপযুক্ত হইয়াছে।

বিজয়চণ্ডী। শ্রীমতিলালরায় প্রণীত, শ্রীশ্রীরাম ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত; নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকর্ত্তা স্বনাম-খ্যাত প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার সুরুচি প্রকাশ পাইতেছে। গ্রন্থ খানি বড় ভাল হইয়াছে। ইহার গীতিকা গুলিও যৎপরোনাস্তি সুশ্রাব্য।

কুসুমারিন্দম। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ পাল প্রণীত; সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা। উপন্যাস গ্রন্থখানি স্বকপোলকল্পিত! ইহার ভাষা মন্দ হয় নাই। মধ্যে মধ্যে কল্পনা ভাল দেখা গেল। মুদ্রাঙ্কণ অতি উত্তম।

অঙ্কপ্রবেশ ১ম ভাগ। শ্রীমতিলাল দত্ত প্রণীত, সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৵০ আনা। পুস্তকের এই বার দ্বিতীয় সংস্করণ। ইংরাজি নিয়মে সহজ ভাষায় মিশ্রভাগহার পর্য্যন্ত এবং শুভঙ্করের আর্য্যা ও তাহার ব্যাখ্যাদি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। এই নাতিবৃহৎ পুস্তক খানিকে আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি। ইহা দ্বারা বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকগণের উপকার হইতে পারিবে। এদেশীয় পাঠশালার আর্য্যা এই পুস্তকে থাকায় ইহা উত্তম গ্রন্থমধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত।

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প *। মিস্ মেরি কার্পেণ্টারের লিখিত রাম মোহন রায়ের জীবনী ভিন্ন রামমোহন রায় সংক্রান্ত নূতন কথা, অন্য কোন পুস্তক, পত্রিকা বা প্রবন্ধে পাওয়া দুর্ঘট। সমালোচ্য পুস্তক খানিতে কয়েকটী নূতন ঘটনার উল্লেখ দেখিয়া আমরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। রাজার অন্যান্য জীবনবৃত্ত হয় অনুবাদ, না হয় ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ। কিন্তু এখানি তাহা

* শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র বিরচিত, সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা।

† শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বরাট যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵ টাকা।

* শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বরাট যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।০ আনা।

নহে। পুস্তকের মূল্য অবয়বের অনুরূপ। ইহার মুদ্রণকার্য্য আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল। পুস্তিকা খানিতে কতক গুলি অশুদ্ধি রহিয়াছে। আশা করি, আগামী সংস্করণে তাহা অপনীত হইবে। ফল, পুস্তকখানি মন্দ নহে। গ্রন্থকার রাজা রামমোহন রায়ের স্বসম্পর্কীয়; সুতরাং তাঁহার নির্দেশিত অধিকাংশ ঘটনা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। ইতি-পূর্ব্বে নন্দবাবু আর্য্যদর্শনে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান পুস্তিকা তাহারই পরিবর্দ্ধিত আকারে পুস্তকরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

বন্ধুপূজা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস ঘোষ প্রণীত। অর্ব্বান্ প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ৵৹ আনা। গ্রন্থ খানি রচনাবিষয়ে নিতান্ত অপকৃষ্ট হয় নাই। গদ্য পদ্যে পুস্তক রচিত হইয়াছে। বন্ধুর শোক, গ্রন্থের বিষয়। আমরা এরূপ গ্রন্থের আবশ্যকতা বুঝিলাম না।

হোমিওপেথিক সরল-চিকিৎসা ১ম ভাগ *। শ্রীরাধাকান্ত ঘোষ সঙ্কলিত। গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞাপন মধ্যে লিখিয়াছেন, "যাহাতে পুস্তক খানি গৃহস্থ, শিক্ষার্থী এবং চিকিৎসার্থী সকলেরই উপযোগী হইতে পারে এবং যাহাতে ডাক্তারের সাহায্য না লইয়া পাঠক স্বয়ং অনেক রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে।" রাধাকান্ত বাবুর এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আশা করি, অচিরে ইহার অন্যান্য খণ্ড প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থকারের নিকট আমাদের বক্তব্য, গ্রন্থমধ্যে ইংরাজী প্রতিশব্দ না দিয়া পুস্তকের পরিশিষ্টে অকারাদি ক্রমে সন্নিবিষ্ট করিলে ভাল হইত।

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা।

ওলাউঠা। ঐ প্রণীত, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।৵৹ আনা। এখানিও মন্দ নহে। সঙ্কলনকর্ত্তা এক জন উত্তম চিকিৎসক।

প্রকৃতিবাদ অভিধান। ৺ রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত; ৩য় সংস্করণ মূল্য ৫৲ টাকা। কাশীখণ্ডযন্ত্রে মুদ্রিত। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সর্ব্বগুণান্বিত বৃহদাকার উৎকৃষ্ট অভিধান এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে প্রকৃতি, প্রত্যয়, শিষ্ট প্রয়োগ, প্রত্যেক শব্দের ইতিবৃত্ত, নূতন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক শব্দ ও ইংরাজী প্রতিবাক্য সহিত তাহার অর্থ অতি সুন্দর ও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও বাঙ্গালার কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র পুস্তকে সংযোজিত দেখা গেল। তৃতীয় সংস্করণ দ্বারা পুস্তকের উত্তমতা প্রতিপন্ন হইতেছে। বিখ্যাত ওয়েবষ্টার, বমওয়েচ ও লও সাহেব প্রভৃতি ইউরোপীয়েরা ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ব্রজমোহন মল্লিক, কৃষ্ণকমল বিদ্যাম্বুধি, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি যে সময়ে (১ম প্রচারণে)

সুখ্যাতি করেন, তদপেক্ষা এখন পুস্তকের আয়তন তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অভিধান বঙ্গভাষার সাময়িক উন্নতির নিদর্শন। ফলতঃ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য ইহা অতি উপাদেয়। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নকল "প্রকৃতি নির্ণয়" প্রস্তুত হইয়াছিল; নকল প্রকাশকের আদালত হইতে অর্থ দণ্ড হইয়াছে—তাহারও বিবরণ পুস্তকে দৃষ্ট হইল। ছাপা ও কাগজও উত্তম। ওয়েবষ্টারের ন্যায় গ্রন্থে নানাবিধ চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে।

শারদীয় উৎসব। শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত প্রণীত, গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ।১০ আনা। পুস্তকখানি মন্দ নহে। স্থানে হেমবাবুর রীতি অনুসৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ভাল বর্ণনাও আছে। অনুকরণে কোন দেশের কেহ কখন কবি হইতে পারেন না। অনুকরণ বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত একটী সংক্রামক রোগ। আমরা অনুকরণের বিরোধী।

প্রকৃতি। (বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী সমালোচনী পত্রিকা) শ্রীকালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সুধাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত। পত্রিকাখানির আকৃতি ক্ষুদ্র হউক, গুণ ক্ষুদ্র নহে। এই পত্রে লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলি বেশ প্রীতিপদ। আশা করি, পত্রিকা চিরজীবী হয়।

ফুলবালা। (গীতিকাব্য) ১ম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। ষ্ট্যান্ হোপ প্রেসে মুদ্রিত; মূল্য ।০ আনা। পদ্যগুলি ভাল হইয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে কবিত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

মনুসংহিতা ও কুল্লূক ভট্ট। শ্রীকৈলাস চন্দ্র ঘোষ প্রণীত, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, কুল্লূকভট্ট স্থানে স্থানে মনুর মতানুযায়ী অর্থ করিতে বিরত। ইহা এক প্রকার বিচার পুস্তক। তুলনায় সমালোচন, ইহাকে বলা যাইতে পারে না। ভাষা সহজ—যুক্তিও ভাল। এরূপ গ্রন্থে সমাজের উপকার আছে। এই প্রকার উদ্যম প্রশংসনীয়।

পাসাণময়ী—(উপন্যাস) শ্রীরাখাল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা। পুস্তকখানির বর্ণনা কৌশল আছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল অথচ রমণীয়। এই পুস্তক সর্ব্বাংশেই সুন্দর। এইরূপ ইতিবৃত্ত সংবলিত অশ্লীলতাহীন নির্দোষ উপন্যাসে যুবকগণের কোন অপকার হওয়া সম্ভাবিত নহে।

উপহার। মাসিক পত্রিকা। শ্রীরাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ৩।৶০ আনা। পত্রিকার মূল্য প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রিকার ন্যায়, কিন্তু লেখা তত উৎকৃষ্ট নহে। রচনা পাঠ করিলে পুলকিত হওয়া যায় না। যাহা হউক ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকা। ইহার লেখা নিতান্ত মন্দ

হইতেছে না। আমাদের অনুরোধ, প্রকাশক ইহার মূল্যের খর্ব্বতা করেন।

সরল নীতিপাঠ—শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রকাশিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ আনা। ইহা পদ্য-ময় নহে, সরল নীতি বিষয়ক কয়েকটী পাঠ ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহার রচনাতে গ্রন্থকর্ত্তার সুরুচির প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত।

Representative System for India by Pundit, Luchmi Narain, Lucknow. গ্রন্থকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের উকীল। ভারত সভার সম্পাদককে লক্ষ্য করিয়া এই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতিনিধি শাসন প্রণালী সংস্থাপন করিতে লেখকের একান্ত ইচ্ছা। পুস্তক খানির আকার বড় নহে, ইহাতে পণ্ডিতের গভীর জ্ঞানের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। পুস্তক পাঠে আমাদের বিলক্ষণ আনন্দ হইয়াছে।

Speeches of Babu Surendra Nath Banerjee *। বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সকল উৎসাহোদ্দীপক সুমধুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও অপর সাধারণ আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইয়া থাকেন; বাবু রামচন্দ্র পালিত সেই গুলির অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। বক্তৃতা গুলির উৎকর্ষ এত অধিক যে তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক করে নাই। এই পুস্তকে ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের "ভারতীয় ইতিবৃত্ত পাঠ; ইংলণ্ড ও ভারত; লর্ডমেকলে ও ভারতে উচ্চশিক্ষা; ভারতীয় একতা; চৈতন্য; জোসেফ্ ম্যাটসিনি, ভার্নাকিউলার প্রেস্ এ্যাক্ট্ ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ; পব্লিক ওয়ার্কের ব্যয়; কার্পাস বস্ত্রের শুল্ক; এবং লিবারলগণের জয় ও ভারতের ভাবী আশা" এই বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। রামচন্দ্র বাবুর সম্পাদকতার গুণে পুস্তকের সংস্করণ উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে। পুস্তকের প্রারম্ভে একটী সুন্দর সুদীর্ঘ ভূমিকা সংযুক্ত। গ্রন্থ খানার মুদ্রাকার্য্যও মন্দ হয় নাই; মূল্যও স্বল্প। এইরূপ বক্তৃতা পাঠ না করিলে ভারতীয়গণের অন্তর কর্ত্তব্য-সাধনে তৎপর হইবে না। সুবক্তার এই সকল মনোহর বক্তৃতা অধ্যয়ন করিতে আমাদের শীতল শোণিত উষ্ণ হইয়াছিল। বক্তৃতা গুলিন যুবকগণের চরিত্র সংগঠনের বিলক্ষণ উপযোগী। ইহা সুরেন্দ্র বাবুর স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতার সাক্ষ্য দান করিতেছে। আমরা ইহার একান্ত পক্ষপাতী।

পার্থপরাজয় নাটক। শ্রীমনোমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

* ৩০১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ বসুপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ নাটক-লেখকের লেখনী-প্রসূত। মনোমোহন বাবুর নাটক গুলির বিশেষ গুণ এই যে, ইহা রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। আমাদের কৃতবিদ্য যুবকেরা আজ কাল প্রায়ই ভারত রামায়ণে শ্রদ্ধাবান্ নহেন! নাটকচ্ছলে তাঁহাদের কর্ণকুহরে ঐ প্রাচীন কাহিনী প্রবিষ্ট করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। সমালোচ্য নাটকের বর্ণনার বিষয় পুরাতন সত্য, কিন্তু রচনার গুণে উত্তম হইয়াছে। আর একটী গুণ, ইহাতে অশ্লীল ভাগ দেখিতে পাইলাম না।

রঙ্গমতী। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত; বসুপ্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ১।০ টাকা। পীড়ার উপর পীড়া, কষ্টের পর কষ্টেও যখন এই কাব্য এমন উত্তম হইয়াছে, জানি না, সুস্থ অবস্থায় থাকিলে কবি ইহা অপেক্ষা আরও কত সুন্দর বর্ণনা, সুন্দর কবিত্ব, সুন্দরভাব নিহিত করিতেন।

নীতিপদ্য। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু বিরচিত * গ্রন্থকার এক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। কবিতা গুলি পদ্যাংশে তত ভাল না হইলেও, নীতির গুণে শোভা পাইতেছে। ছন্দোময়ী রচনায় নীতি সমাবিষ্ট করায় আমরা ঈশান বাবুর সুরুচির প্রশংসা করি।

ভুবনমোহিনী-প্রতিভা—১ম ও ২য় ভাগ; প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা। শ্রীনবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ড ২য় সংস্করণে পদার্পণ করিয়াছে। এই গ্রন্থ-দ্বয় প্রথম শ্রেণীর গণনীয় কাব্য। ইহার কোন্ রচনা নিকৃষ্ট, কোন্টী উৎকৃষ্ট বলিব? সকলই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর—শ্রুতি-সুখকর। উন্মাদিনী, উপসংহার, বাঙ্গালীর জ্ঞান, দুঃখিনী মহিষী, হৃদয়োচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রথম ভাগের সন্দর্ভগুলি অতি চমৎকার। ভারত-রাজলক্ষ্মী, পরাধীনের প্রণয়, লক্ষ্মী রাণীর হৃদয়োচ্ছ্বাসাদি উচ্চ ভাবের উচ্চ বর্ণনা। এই সকল কবিতাতে কবির কবিত্বের দৃষ্টান্ত জীবন্ত ও জ্বলন্ত। 'কে তুমি' শৈশবের রচিত হউক, তাহাতেও কবিত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়। ফলতঃ গ্রন্থের "প্রতিভা" নাম অন্বর্থ হইয়াছে।

আর্য্যসঙ্গীত। ঐ, প্রণীত। মূল্য ১॥০ টাকা। ইহাতেও কবিকল্পনার অসদ্ভাব দেখিলাম না। কবি ইহাতেও লিপি-কুশলতা বজায় রাখিয়াছেন। উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে ইহা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া বোধ-হয় না। দ্রৌপদীর বিবরণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বিসূচিকা—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ সঙ্কলিত, বেঙ্গলসুপিরিয়র্ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ॥০ আনা। ইতিপূর্ব্বে আমরা যাঁহার "চিকিৎসা-সার-সংগ্রহের" সমালোচনা

* রায় যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।০ আনা।

করিয়াছি, বিসূচিকাও তাঁহারই প্রণীত। ওলাউঠার ন্যায় মানুষের আর কোন প্রবলতর পীড়া নাই। অতএব সেই রোগের উপশমের বিবরণ যে পুস্তকে আছে, তাহা আমাদের অতি আদরের। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এলোপাথি মতে সাত বৎসর এবং উভয় এলোপেথি ও হোমিওপেথি মতে তিন বৎসর পরীক্ষা করিয়া যে প্রসিদ্ধ পুস্তক "কলিকাতা জর্ন্যাল অব্ মেডিসিন" হইতে মুদ্রাঙ্কিত করেন, ইহা তাহারই অনুবাদ। মধ্যে মধ্যে মহেশ বাবু নিজের বহুদর্শিতার ফলও দর্শাইয়াছেন। ডাক্তার সরকারের বিসূচিকা অতি উত্তম পুস্তক, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। আমরা জানি, বিসূচিকার অন্যান্য তাবৎ পুস্তক এই পুস্তকের পর রচিত ও ইহা হইতে সংগৃহীত। এ পুস্তকের রচনা সহজ। ইহাতে বিসূচিকার ঐতিহাসিক যে বর্ণন সমাবেশিত আছে, তাহা পাঠ করিতে বড় আমোদ জন্মে।

শব্দ-সংজ্ঞা বিজ্ঞোলি*। এক খানি অভিধান। ইহা নূতন প্রণালীতে সংগৃহীত। একার্থ-প্রতিপাদক শব্দের অর্থ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। যথাঃ—অগ্নি শব্দের অর্থ স্থলে বহ্নি, আগুন প্রভৃতি যাবতীয় পর্য্যায়-শব্দ বিন্যস্ত করা আছে। পুস্তক খানি মন্দ হয় নাই। ইহা দ্বারা একটী অভাব দূরীকৃত হইল।

হিন্দুদর্শন।—(মাসিক পত্রিকা) শ্রীবিধুভূষণ মিত্র সম্পাদিত। এই ক্ষুদ্র আকারের পত্রিকা খানি ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। "মহাজন কুবেরের জীবন-বৃত্তের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার" ন্যায় চিন্তাশীল প্রবন্ধ যত বাহির হইবে, ততই পত্রিকাখানি উৎকৃষ্টতর হইতে থাকিবে। ইহার মূল্য খুব সুলভ।

চারুবার্ত্তা†।—(সাপ্তাহিক পত্র।) সেরপুর হইতে প্রকাশিত। ইহার লেখা উচ্চ দরের হইতেছে।

* শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র প্রণীত। অদ্বৈত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা।

† বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ৪৲ পশ্চাদেয় ৫॥• মাত্র। মফঃস্বলে ৫ অগ্রিম; অনগ্রিম ৬॥•।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর্য্যদর্শনের গ্রাহক মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহাদের নিকট মূল্য বাকী আছে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া টাকা পাওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত্তরও পাইলাম না। পত্রাদি লিখিয়া অনর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা আর্য্যদর্শনের শেষভাগে তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম, ধাম মাত্রও বিজ্ঞাপিত হইল। অন্য বারে প্রাপ্যটাকা লেখা যাইবে।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; লছিপুর—কোলিয়ারি, সীতারামপুরণ

„ অমৃতকৃষ্ণ সরকার; পুলিশষ্টেশন, মহিমাপুর, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; ক্যানিং কলেজ, লক্ষ্ণৌ।

„ উপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র; গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ্ আফিস্, ঢাকা।

„ উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় (জমিদার); খোদাবাদ, এলাহাবাদ।

„ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত; হেড্মাষ্টার ইংরাজী স্কুল; জামালপুর, ময়মনসিংহ।

„ কৃষ্ণগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্, এল্; শ্রীরামপুর গোলকচন্দ্র রায়ের বাটী।

„ কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়; শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধারক, কুচবিহার।

„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়; উকীল জজকোর্ট, মুর্শিদাবাদ।

„ গিরিশচন্দ্র সান্যাল রায়বাহাদুর; কাশিমপুর, নগর, রাজসাহী।

„ চন্দ্রমোহন মাল; কাঠনালাবাজার, কাঁথি, মেদিনীপুর।

„ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়; সেকেণ্ড ক্লার্ক, নওগাঁ, বুন্দেলখণ্ড।

„ জয়নারায়ণ দাস; সুপারভাইজার, বাঁকুড়া।

„ তারিণীচরণ ঘোষ; বরোটিয়া, গোয়ালন্দ, ফরিদপুর।

„ দীননাথ চট্টোপাধ্যায়; রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস্, কাকোরি লক্ষ্ণৌ।

পণ্ডিত দুর্গাচরণ কবিরত্ন; আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বাবু ধনকুমার দাস; সদরবিদ্যালয়, দিনাজপুর।

„ নীলমাধব দত্ত; তহসিলদার, খাসমহল, ভদ্রক, বালেশ্বর।

„ নবীনচন্দ্র ঘোষ; নেটিভ্ডাক্তার, কুষ্টিয়া।

„ নবীনচন্দ্র পাল; সেক্রেঃ পুরুলিয়া।

„ নবীনচন্দ্র দত্ত; এসিঃ সার্জ্জন, সীতাপুর, অযোধ্যা।

„ পরশুরাম মুস্তকী; উকীল গোয়াড়ি।

„ পূর্ণচন্দ্র পাল; ডিস্পেন্সরি, মুঙ্গের।

„ পঞ্চানন লাহিড়ী; দশমহাবিদ্যায় স্কুল, ময়মনসিংহ।

বাবু বিপিনচন্দ্র সেন; কালজিয়েট্ স্কুল, ২য় শ্রেণী, ঢাকা।
„ ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী; জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ।
„ বিহঙ্গনাথ দাস; পোষ্টআফিস্, গয়া।
„ বনমালী দে; চারাবাড়ী, ময়মনসিংহ।
„ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়; মুন্সেফী আদালত, টাঙ্গাইল, ঐ।
„ বিনদচন্দ্র দিহিঙ্গের অধিকারী গোস্বামী; বাহাচকী, আসাম।
„ মহেন্দ্রনাথ রায়; বেঙ্গলি বুক্‌ক্লব; মুরাদাবাদ।
মুন্সী মহম্মদ সেতারউদ্দীন; জলপাইগুড়ি।
বাবু মন্মথনাথ চৌধুরী; হেড্‌মষ্টার মহারাজ স্কুল যোধপুর।
„ মহিমাচন্দ্র ঘোষ; উকীল মুন্সেফী আদালত, জামালপুর, ময়মনসিং।
„ মধুসূদন সাহু; চাঁইপাট, গোপীগঞ্জ, মেদিনীপুর।
„ মোহিনীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; মেট্রোপলিটান স্কুল, কুচবিহার।
„ মহেশচন্দ্র দোবে; সেক্রেটরি বঙ্গবিদ্যালয, বেলডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।
মুন্সী মহাবীরপ্রসাদ; সেরেস্তাদার কমিসনার্স আফিস্ রাঁচী, ছোটনাগপুর।
মিস্ হল; সেগ্রা, কাশী। মিস্ গুড; বারাকপুর।
„ হেমিল্টন; জব্বলপুর। „ হার্ডিং; বোম্বাই।
বাবু মনোমোহন নিয়োগী; সিঙ্গাপুর, ঢাকা।
„ মধুসূদন সরকার শর্ম্ম; কুটীগাদি, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
„ যাত্রামোহন চৌধুরী; জজআদালত চট্টগ্রাম।
„ যদুনাথ শর্ম্মণ; শিবসাগর, আসাম।
„ রাজমোহন রায় চৌধুরী; টাকী, ২৪ পরগণা।
„ রজনীকান্ত চৌধুরী; কাশিমপুর, রাজসাহী।
„ রাজেন্দ্রনাথ দত্ত; রায়না, বর্দ্ধমান।

ভ্রমশুদ্ধি।

কলিকাতা।

১২৮৭ র মূল্য প্রাপ্তিতে।

বাবু মন্মথনাথ চৌধুরী ৩৲ হইবে না।
„ কুঞ্জলাল সাহা ৩৲; না হইয়া কুঞ্জলাল কুণ্ডু ৩৲ হইবে।

মফঃস্বল।

বাবু মন্মথকুমার বসু; সব্ ডেপুটী, সাতক্ষীরা ৮৫ তে ৪৸৵০; না হইয়া ঐ৮৪ তে ৪৸৶।
„ দুর্গাচরণ রক্ষিত; সোণার পুরা ১২৮৫ সালে ৩৲; না হইয়া ঐ ১২৮৭ তে ৩৲।
„ ললিতমোহন সেন; এঃ সার্জন ডিঙ্গাভাঙ্গা ৩৷৵০; না হইয়া ডিঙ্গা ৩৲ হইবে।
„ গৌরীকান্ত রায়; লাহোর ১৷০; না হইয়া ৩৷৵০ হইবে।
„ রাজেন্দ্রকুমার বসু; মুন্সেফ্; রাণাঘাট, ২৷০; না হইয়া ৩৷৵০ হইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

কলিকাতা।

[১২৮৮ সালের ২৬এ বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত]

১২৮৫ সাল।

বাবু ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	১॥০

১২৮৭ সাল

বাবু অম্বিকাচরণ রায়	১৲
,, কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৲
,, কালীচরণ পাল	১৲
,, গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার	১৲
,, দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী	৩৲
,, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৲
,, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়	১৲
বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৲
,, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৲
,, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৲
,, মহেন্দ্রনাথ হালদার	১৲
,, মতিলাল চৌধুরী	৩৲
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	১॥০
,, যদুনাথ ঘোষ	১৲
,, রমাপ্রসাদ বিশ্বাস	২৲
,, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, সিদ্ধেশ্বর অধিকারী	১৲
,, হরিনাথ বসু (নাজির)	২৲

মফঃস্বল।

১২৮২ সাল।

কুমার তারেশচন্দ্র পাঁড়ে ; পাকুড়	৪৸৵০
রাজা প্রমথ নাথ রায় বাহাদুর, জমিদার, দীঘাপতিয়া ...	৪৸৵০

১২৮৩ সাল।

বাবু কৈলাসচন্দ্র বাক্চী, শিক্ষক, পুঁটিয়া	২৶০
কুমুদবন্ধু বসু, ডেঃ ইন্‌সপেক্টর, মালদহ	৫৸৵০
বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ; রায়না	।৵০
কুমার তারেশ চন্দ্র পাঁড়ে ; পাকুড়	৪৸৵০
রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর ; জমীদার, দীঘাপতিয়া	৫৸৵০
বাবু বলদেব পালিত ; বাঁকীপুর	৪৸৵০
,, ষষ্ঠীদাস রায় ; কুড়ুলগাছি	৩৸৵০
,, সারদা প্রসাদ দত্ত ; হেড্‌মাষ্টার রায়না ...	।৵০
,, সঙ্কটচরণ মিত্র ; উকীল ভাগলপুর ...	৩।৵০

বাবু হরনাথ চট্টোপাধ্যায়; কুমড়াবেড়িয়া ... ৪৸৵০

১২৮৪ সাল।

বাবু অমৃতলাল চট্টো, সবজজ কৃষ্ণনগর ৪৸৵০
„ অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী; মাহিয়াড়ী ৪৸৵০
„ ঈশ্বরচন্দ্র পাঁড়ে; কুষ্টে ... ৩৲
„ কৈলাসচন্দ্র বাক্‌চী; শিক্ষক, পুঁটিয়া ২৸৵০
„ কেদার নাথ দত্ত; ডেঃমেঃ নড়াল ৪৸৵০
„ কুমুদবন্ধু বসু; ডেঃ ইঃ স্কুল, মালদহ ৪৸৵০
„ কালিদাস চট্টো; ঘাটিভোগ ৩৵০
„ কৈলাসচন্দ্র ঘোষ; রায়না ১॥৵০
„ বাবু গিরিশচন্দ্র চৌধুরী, সবজজ চট্টগ্রাম ... ৩।৵০
„ চণ্ডীচরণ মিত্র; ইন্দোর ৪৸৵০
কুমার তারেশচন্দ্র পাঁড়ে; পাকুড় ।০
„ দ্বারকানাথ রায়; মুলতান ৩৵০
রাজা প্রমথনাথ রায়; জমীদার দীঘাপতিয়া ... ৪৸৵০
বাবু বলদেব পালিত; বাঁকীপুর ৪৸৵০
„ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী; ডেঃ ইনঃ চুঁচুড়া ৩৵০
„ রাধানাথ রায়; জয়েন্ট ইনঃ স্কুল কটক ৪৸৵০
„ রামগোপাল খাঁ; বিএল, ধুবড়ি ৪৸৵০
বাবু শম্ভুচন্দ্র নাগ; মুন্সেফ সেরাজগঞ্জ ... ৪৸৵০
শম্ভুচন্দ্র দে; মুন্সেফ, ফটিকচারী ৩।৵০
„ ষষ্ঠীদাস রায়; কুড়ুলগাছি ৪৸৵০
—সাহিত্যসমালোচনী সভা; জয়দেবপুর ৪৸৵০
বাবু সঙ্কটচরণ মিত্র; উকীল, জজকোর্ট ভাগলপুর ... ৩।৵০
„ সারদাপ্রসাদ দত্ত; হেড্‌মাষ্টার রায়না ... ৪৸৵০
„ হরিবিলাস আগরওয়ালা; তেজপুর ... ... ৩।০
„ হরনাথ চট্টোপাধ্যায়; কুমড়াবেড়িয়া ... ৪৸৵০

১২৮৫ সাল।

বাবু অমৃতলাল চট্টো; সবজজ কৃষ্ণনগর ৪৸৵০
„ অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী; মাহিয়াড়ী ৪৸৵০
„ ঈশ্বরচন্দ্র পাঁড়ে; কুষ্টিয়া ৩৸০
„ কুলদাপ্রসাদ মুখো; উকীল, বাঁকুড়া ... ... ৪॥৵০
„ কেদারনাথ দত্ত; ডেঃ মেঃ নড়াল ৪৸৵০
„ কুমুদবন্ধু বসু; ডেঃ ইনঃ স্কুল মালদহ ... ... ।০
„ কালিদাস চট্টো; ঘাটিভোগ ২৸৵০
„ গিরিশচন্দ্র চৌধুরী; সবজজ, চট্টগ্রাম ... ... ৩।৵০

বাবু চণ্ডীচরণ মিত্র; ইন্দোর, ৪৸৴০
„ দ্বারকানাথ রায়; মুলতান ৩৵০
„ নফরচন্দ্র ভট্ট; সব্‌জজ, ঢাকা ৪৸৵০
„ নীলরত্ন অধিকারী; সেক্রেঃ
গোস্বামী দুর্গাপুর পুস্তকালয় ৩।৵০
„ প্রসন্নকুমার বসু, এম এ বিএল
উকীল গোয়াড়ি .. ৩।৵০
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ; ডেঃমেঃ
বোয়ালিয়া ... ...
রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর;
দীঘাপতিয়া ৪৸৵০
বাবু বলদেব পালিত; বাঁকীপুর ৪৸৵০
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; হেড্
পণ্ডিত চুয়াডাঙ্গা ... ১৲
„ বিনোদ বিহারী পাল; হেড্
মাষ্টার সাহাজাদপুর স্কুল ৩।৵০
„ যোগেশচন্দ্র চট্টো এমএ বিএল
মুন্সেফ, সুনামগঞ্জ ... ৪৸৵০
„ রামগোপাল বিদ্যান্ত; এঃ
ইন্স্পিঃ লক্ষ্ণৌ ... ৪॥৵০
„ রামেশ্বর রায়; মোক্তার
গোয়াড়ি ৪৸৵০
„ রাখালদাস অধিকারী; চন্দননগর
৩।৵০
„ রাধানাথ রায়; জয়েন্ট ইঃ স্কুল কটক
৪৸৵০
„ রামগোপাল খাঁ; বিএল, ধুবড়ি ২॥/০
„ ষষ্টীদাস রায়; বুড়ুলগাছি ৪৸৵০
—সাহিত্যসমালোচনী সভা;
জয়দেবপুর ৪৸৵০
বাবু সঙ্কটচরণ মিত্র; উকীল জজকোর্ট
ভাগলপুর ... ... ৩।৵০

বাবু সর্ব্বেশ্বর ঘোষ; জমিদার জাগুলি
৩।৵০
„ হরিবিলাস আগরওয়ালা; তেজপুর
৩।৵০
„ হরিকিশোর রায়; শ্যামগ্রাম ৪৸৴০
„ হরনাথ চট্টো; কুমড়াবেড়িয়া ৪৸৵০
„ হরচন্দ্র রায়; উকীল ছোটআদালত
বোয়ালিয়া ৪৸৵০

দিব ৷১২৮৭ সাল।

বাবু [illegible] চট্টো; সব্‌জজ
কৃষ্ণনগর ... ... ৪।০
„ অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী;
মাহিয়াড়ী ৪৸৵০
„ অতুলচন্দ্র বন্দ্যো সোদপুর স্কুল ১॥০
„ উমাশঙ্কর রায়; ভবানীপুর ৩৵০
„ কুলদাপ্রসাদ মুখো;
উকীল বাঁকুড়া ... ৪৸৵০
„ কেশবচন্দ্র মণ্ডল; ভোড়া ৩।৵০
„ কেদারনাথ দত্ত; ডেঃ মেঃ
নড়াল ... ২।৶০
„ গোপালচন্দ্র সান্ন্যাল;
ডোমার ... ৩।৵০
„ গিরিশ্চন্দ্র চৌধুরী; সবজজ
চট্টগ্রাম ... ৩।৵০
„ চণ্ডীচরণ মিত্র, ইন্দোর ৪৸৵০
„ দুর্গানারায়ণ চৌধুরী; নড়াল ১৲
„ দিগম্বর চৌধুরী;
পানাগোড় স্কুল ২॥১০
„ নন্দকৃষ্ণ বসু; এঃ মেঃ
বোয়ালিয়া ... ৩।৵০

বাবু নফরচন্দ্র ভট্ট; সবজজ ঢাকা ৩৷৶৹
" নীলরত্ন অধিকারী সেক্রেঃ গোস্বামী দুর্গাপুর পুস্তকালয় ৩৷৶৹
—পবলিক লাইব্রেরি; আলা ৩৲
রাজা প্রমথনাথ রায়বাহাদুর; দীঘাপতিয়া ... ৪৸৶৹
বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখো; জনাই ৩৷৶৹
" প্রসন্নকুমার বসু; এম এ, বিএল; উকীল গোয়াড়ি ৩৷৶
" প্রমথনাথ ঘোষ; ভবা ৩৲
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ; ডেঃ মেঃ কক্, ...লয়া ৩৷৶৹
" বসন্তকুমার মিত্র; জমিদার, রাজঘাট ... .. ১৲
" বলদেব পালিত; বাঁকীপুর ৩৷৶৹
" বসন্তকুমার চট্টো; হেড পণ্ডিত, চুয়াডাঙ্গা স্কুল ... ৩৲
বিধুভূষণ ঘোষ; চন্দনপুর ২৲
" বিনোদবিহারী পাল; হেড মাষ্টার সাহাজাদপুর স্কুল ৩৷৶৹
—মামুদ আলি স্কুল লাইব্রেরি; করোটীয়া ... ৩৷৶৹
রাজা মাধবগিরি মোহান্ত; তারকেশ্বর ৩৷৶৹
যুবরাজ, আগড়তলা; ... ৪৸৶৹
বাবু যোগেশচন্দ্র চট্টো; এমএ বিএল মুন্সেফ, সুনামগঞ্জ ৪৸৶৹
বাবু রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব; দিনাজপুর ... ৩৷৶৹
রায় রাজীবলোচন বাহাদুর; সয়দাবাদ ৪৸৶৹

বাবু রামগোপাল বিদ্যান্ত; এঃ ইঞ্জি লক্ষ্ণৌ ৪৸৶৹
" রসিকলাল দত্ত; ধরমতুল ৩৷৶৹
" রামেশ্বর রায়; মোক্তার গোয়াড়ি ২৷৶৹
" রাখালদাস অধিকারী; চন্দননগর ৩৷৶৹
" রাধানাথ রায়; জয়েঃ ইনঃস্কুল কটক ৷৹
" শ্যামাচরণ বিদ্যাচুঞ্চু; সোদপুর স্কুল ৷৹
" ষষ্ঠীদাস রায়, কুড়ুলগাছি ৩৷৹
মহারাণী স্বর্ণময়ী; কাসিম বাজার ৪৸৶৹
বাবু সঙ্কট চরণ মিত্র; উকীল জজকোর্ট, ভাগলপুর ৩৷৹
" সর্ব্বচন্দ্র ঘোষ; জমীদার, জাগুলি ৩৷৶৹
" সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোঃ মাঃ রায়বরেলি ৩৷৶৹
" হরকুমার সরকার; কড়চ-মাড়িয়া ৩৷৶৹
" হরিবিলাস আগরওয়ালা তেজপুর ৩৷৶৹
বাবু হরিকিশোর রায়; শ্যামগ্রাম ৩৶৹
" হরচন্দ্র রায়; উকীল ছোট আদালত বোয়ালিয়া ... ৪৸৶৹

—

১২৮৮ সাল।

বাবু যোগেশচন্দ্র চট্টো এম্ এ বিএল, মুন্সেফ, দুলালগঞ্জ ... ৶৹
রামগোপাল বিদ্যান্ত; এঃ ইঞ্জিঃ লক্ষ্ণৌ ... ... ৷৹

গাওরে আবার।

"Ada! Sole daughter of my house and heart."
—*Childe Harold's Pilgrimage*, C. III., S. I.

১

তুমি গাওরে আবার
প্রিয় বিহগি আমার!
সুধা কণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া,
বসুমতী কাঁপাইয়া
পরশিবে নীলিমায় তোমার সুস্বর,
জাগিবে শশাঙ্ক সহ তারকা নিকর।
এ সান্ধ্য সমীর ধীরে
দোলাইয়া তরু-শিরে
চুম্বিয়া কুসুম-কলি
পুলকে যাইবে চলি,
তবলিত স্বরময় হইবে অবনী—
প্রাণের আনন্দে তুমি গাও বিহঙ্গিনি!

২

এ নীল গগনতলে
বসি মন কুতুহলে,
তোমার মধুর স্বরে,
হৃদয় শীতল ক'রে,
শুনিব জীবন ভরি ভুলিয়া সংসার,
সুখেতে নাচিবে ভগ্ন মানস আমার।
স্বরগ বিহগী তুমি
আসিয়াছ মর্ত্ত্য-ভূমি,
পবিত্র শিশুর স্বরে
অভাগা মানব তরে
পাঠাইলা ভবে বিধি শান্তির কারণ,
শ্রবণে শীতল সদা তাপিত জীবন।

৩

শুনিয়া তোমার গীত
বিমল আনন্দে চিত
ভাসাইয়া, প্রীতিভরে
দিব চির দিন তরে
জীবন আমার ওই সঙ্গীতে ঢালিয়া,
গাও প্রিয় বিহগিনি! সুধা বরষিয়া।
অদূরে কুসুম বন,
তরুলতা অগণন,
কোমল পল্লব দিয়া
চারু তনু আবরিয়া
অদৃশ্যে থাকিয়া তুমি কর রে ঝঙ্কার,
আমার নয়নে করি জ্যোৎস্না সঞ্চার।

৪

চঞ্চল স্বর লহরী
কিবা দিবা বিভাবরী
শ্রবণ ভিতর দিয়া
মম প্রাণে প্রবেশিয়া
উজলিবে বিষাদিত জীবন আমার,
যাতনার অশ্রুবিন্দু রহিবে না আর।
ললিত মধুর-স্বরে
শীতল অমিয় ঝরে,
পানে পিপাসিত চিত
নিত্য সুখে পুলকিত,
তরল সঙ্গীত তুমি দেও রে ঢালিয়া,
বিশুষ্ক হৃদয় মম স্বরে শীতলিয়া।

৫

নিরমল স্নেহ দিয়া
চন্দ্রকর মিশাইয়া
সৃজি বিধি, প্রীতিভরে
পাঠাইলা শান্তিতরে
সুধা-বিনিন্দিত ওই সুস্বর তোমার,
আবার গাও রে প্রিয় বিহগি! আমার।
পবিত্র শিশুর হাসি
সুধাকণ্ঠে পরকাশি
ডাক এক বার তুমি,
আমার জীবন-ভূমি
কোমল কুসুমময় হইবে তাহায়,
স্নেহভরে ডাক প্রিয় বালিকা! আমায়।

৬

নিদাঘ নিশীথ কালে
বসিয়া ধরণী-কোলে,
সুদূর বাঁশরী গান
শ্রবণে প্রবাসি-প্রাণ
জাগি' উঠে, অভাগার শৈশব-স্বপন,
লহরে লহরে খেলে ভাসাইয়া মন
তেমতি তোমার গীতে
জাগেরে আমার চিতে
শৈশব-সুখের কথা
মরমে মরমে গাঁথা
ত্যজি যাহা, যার ছায়া জীবন-জড়িত,
শোণিতে শোণিতে নিত্য রয়েছে মিশ্রিত।

৭

তুমি প্রিয় বিহগিনী,
যেন চল-সৌদামিনী,
এই আছে, এই নাই,
সুদূরে শুনিতে পাই
মধুর সঙ্গীত তব, নয়ন আমার
ধরিতে না পারে ক্ষুদ্র মূরতি তোমার।
আবার মুহূর্ত্ত পরে
আসিয়া সোহাগ-ভরে
চারু ভুজ-লতা দিয়া
কণ্ঠ মম জড়াইয়া,
স্বপন-জড়িত শত সুখের কাহিনী
বরষ আমার প্রাণে দিবস-যামিনী।

৮

সুন্দর অলকা-গুলি
হাসির হিল্লোলে দুলি
খেলে রে বদনোপরে
অযতনে থরে থরে
আধ আবরিত করি নয়ন তোমার,
হৃদয়-আনন্দময়ী বালিকা আমার।
অস্ফুট মধুর স্বরে
ডাক শিশু প্রাণ ভরে,
বীণার সঙ্গীত সম
ও বচন নিরুপম,
যে দিকে শ্রবণ পাতি,—শ্রবণ ভরিয়া
শুনি নিত্য তব কণ্ঠ আপন ভুলিয়া।

৯

সঙ্গীতে কি মধু আছে,
তোমার স্বরের কাছে?
আধ, আধ কথা শুনি
অনন্ত যাতনা ভুলি,
শ্রবণে জুড়াই সদা ব্যথিত জীবন,
বিষাদের অশ্রুবারি করিয়া মোচন।
একবার আর বার,
বরষিয়া শান্তি-ধার
ডাক রে পরাণ খুলি
হাসির লহরী তুলি,

আমার নয়ন কাছে পুলকে নাচিয়া
গাও গীত, অবিরত হাসিয়া হাসিয়া।

১০

বিষাদ কখন যেন
প্রবেশি, তোমার মন
নাহি করে আঁধারিত,
এমনি আনন্দে গীত
গাইয়া, পবিত্র-ভাবে কাটাও জীবন,
সংসার-যাতনা শিশু পেও না কখন।

জগৎ ছাড়িয়া যবে
বিদায় লইতে হবে,
সে দিন শ্রবণে মম
স্বর্গীয় সুধার সম
বরষিবে শান্তি—ওই সঙ্গীত তোমার,
গাও রে আবন্ধ প্রিয়—বিহগি! আমার।

শ্রীপ্রঃ—

বীরবর ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

ল্যামিংটনের উত্তরাধিকারিণীর সহিত ওয়ালেসের বিবাহ—ইংরাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি কার্টলেন্ হইয়া ক্রেগসে আশ্রয় গ্রহণ করেন—হেসিল্‌রীগের হস্তে তদীয় নবোঢ়া পত্নীর মৃত্যু—ওয়ালেসের প্রতিজ্ঞা—তৎকর্তৃক হেসিলরীগের হত্যা—বিগারের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ—ওয়ালেস্ স্কট্‌লণ্ডের অভিভাবক মনোনীত—ক্রী-নদীর তীরবর্তী দুর্গ ও টরন্‌বরি দুর্গ গ্রহণ—ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি—ওয়ালেস্ কমুনক্ নগরে অবস্থিত।

১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ওয়ালেস্ ডনডাফ্ পরিত্যাগ করিয়া গিল্‌ব্যাঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বসন্তকাল সমাগত; পাদব-নিচয় রমণীয় হরিদ্বর্ণের পত্রনিকরে সুশোভিত; চতুর্দ্দিক্ বিহগকুলের অমৃতময় কূজনে বিমোহিত; প্রকৃতি নূতন সাজে সাজিয়া জগন্মনোমোহন করিতেছেন। এমন সময়ে কোন্ প্রণয়ীর চিত্ত অবিকৃত থাকিতে পারে? ওয়ালেসের অয়োহৃদয়ও বসন্তানিল ব্যজনে প্রণয়ানলে বিগলিত হইতে লাগিল। এত দিন সামরিক কার্য্যে সতত নিরত থাকায়, ল্যামিংটনের রমণীর চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ এই বিশ্রামাবাসে বসন্ত হিল্লোলে সেই অতুল রূপরাশির আধার নিরাশ্রয়া যুবতীর জন্য তাঁহার হৃদয় প্রমত্ত হইয়া উঠিল। তিনি আর বিচ্ছেদ সহিতে না পারিয়া সেই মহিলার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েক দিন তথায় যাতায়াতের পর, এবং প্রণয়, পরিণয়, ও সামরিক জীবনের পরস্পর সঙ্গতি-অসঙ্গতি-বিষয়ে বিবিধ তর্ক বিতর্কের অবসানে—ওয়ালেস্ তাঁহাকে প্রকাশ্যে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন।

ওয়ালেসের প্রিয় বন্ধু যাজকবর ব্লেয়ার্ এই বিবাহের পৌরহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন। নব দম্পতী কিছু দিন মনের সুখে মধুচন্দ্রিমা যাপিত করিলেন। যুবতী অচিরকাল মধ্যেই গর্ভবতী হইলেন। তাঁহাদিগের মূর্ত্তিমান্ মনোরথ-স্বরূপ যথাসময়ে একটী কন্যা জন্মিল।

এইরূপে ওয়ালেস্ যদিও মনের সুখে প্রিয়তমার সহবাসে কাল কাটাইতে লাগিলেন, তথাপি সে সুখের সময়েও দেশের দুর্গতির বিষয় স্মরণ হইয়া তাঁহার হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। যত দিন ইংরাজেরা স্কট্লণ্ডে আধিপত্য করিতেছেন, তত দিন ওয়ালেসের অন্তরে অবিমিশ্রিত সুখের আশা কোথায়?

এইরূপে হর্ষে ও বিষাদে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতেছে, ইত্যবসরে এক-দিন ওয়ালেস্ নগরের বহিঃস্থিত ভজনা-লয় হইতে প্রার্থনা শুনিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তাঁহার প্রিয় বন্ধু গ্রেহাম তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। তাঁহা-দিগের উভয়ের সহিত সর্ব্বশুদ্ধ চতু-র্ব্বিংশতি অনুযাত্রিক ছিল। এমন সময় হেসিল্রীগ ও সার্ রবার্ট থরন্ নামক এক জন নাইট্ পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে সবলে আক্রমণ করিলেন। ল্যামিংটনের উত্তরাধিকারিণীর পাণিগ্রহণ করায় ওয়ালেস হেসিল্রীগের মর্ম্মান্তিক যাতনার কারণ হইয়াছিলেন। পাণি-গ্রহণের দিন হইতেই হেসিল্রীগ ওয়া-লেসের বধ-বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া-ছিলেন। এত দিন কেবল সুবিধা খুঁজিতে-ছিলেন। আজ্ সেই সুবিধা উপস্থিত।

হেসিল্রীগের অন্যতম সৈনিক পুরুষ বিবিধ পরিহাস দ্বারা ওয়ালেস্কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছিল। ওয়ালেস্ এরূপ বিদ্রূপোক্তি শুনিয়া কখন এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করেন নাই। কিন্তু আজ ওয়ালেস্ রাজনৈতিক সন্ন্যাসী হইয়াও আশ্রমী। স্ত্রী কন্যার মায়ায় আজ তাঁহার প্রাণে মায়া জন্মিয়াছে। সুতরাং তিনি সহসা জীবন দিতে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। আজ তাঁহার পারৎ-পক্ষে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হইল না। তিনি অটল অচলের ন্যায় অবি-চলিত ভাবে আজ সেই বিদ্রূপ-ঝটিকা সহিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, ইংরাজেরা তাঁহাদিগের অভি-মুখে বেগে আসিতেছে, তখন আর বিলম্ব করা অনুচিত মনে করিয়া তাঁহারা প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় উল্লম্ফন পূর্ব্বক ইংরাজদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। নিমেষ-মধ্যে মৃতদেহে ও রুধির-স্রোতে রণভূমি প্লাবিত হইল। কিন্তু এত ইংরাজসৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা পঞ্চাশৎ ইংরাজ দেহ ভূতলশায়ী করিয়া ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক রণস্থল হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ওয়ালেস্ সদলে প্রিয়তমার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইংরাজেরা তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। ওয়া-লেস্-পত্নী, পতি ও তাঁহার সহচরবৃন্দের

বিপৎ দেখিয়া সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত করিতে আদেশ করিলেন। স্কটেরা সিংহদ্বার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যত ক্ষণ সমস্ত স্কট্‌সেনা খিড়কী দ্বারা কোন নিরাপদ স্থানে না পৌঁছিল, ততক্ষণ ওয়ালেস্ ও গ্রেহাম্ দুই জনে অদ্ভুত বীরত্বের সহিত সিংহদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে স্কটেরা কার্টলেন্ ক্রেগ্ নামক গুহায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই গুহা অদ্যাপি ওয়ালেস্-গুহা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অনুযাত্রিকগণ নিরাপদ স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে শুনিয়া, ওয়ালেস্ ও গ্রেহাম্ সিংহদ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই স্থানের উদ্দেশে গমন করিলেন।

প্রণয় রমণীকে দেবতা করিয়া তুলে। প্রণয় তাঁহাকে আত্ম ভুলিতে শিক্ষা দেয়। পতির আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া নিজের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া ওয়ালেস্-পত্নী পতীর রক্ষার্থ নিজ প্রাসাদের সিংহদ্বার খুলিয়া দেন। পতি ও তৎসহচর-বৃন্দকে তিনি খিড়্কী দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দেন। স্বদেশের উদ্ধার-সাধন করিবেন, প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে সুখিনী করিবেন এই আশায় আজ ওয়ালেস্-পত্নীর উপদেশ রক্ষা করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে প্রিয়তমার কি হইবে, এ ভাবনা তাঁহার মনে উদিত হইল না। তিনি স্বয়ং শত্রুপত্নীগণের প্রতি যেরূপ বীরোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, বোধ হয়, তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজ-সেনাপতিও তদীয় পত্নীর প্রতি সেইরূপ সদ্ব্যবহার করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল হইল। সতী পতির প্রাণরক্ষার অপরাধে পিশাচ-হৃদয় ইংরাজ-সেনাপতির আদেশে ধৃত ও তৎক্ষণাৎ শাণিত তরবারি-অগ্রে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ওয়ালেসের জীবন-গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সতী প্রাণত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চিরকাল ধরিয়া স্কট্‌রমণীদিগের উদ্দীপনাস্থল হইয়া রহিল।

পত্নীর হত্যা-সংবাদ তদীয় একান্তানুগতা এক দাসী কর্তৃক ওয়ালেসের নিকট আনীত হইল। এই শোচনীয় সংবাদে তাঁহার ও তদীয় প্রিয়বন্ধু গ্রেহামের ও অন্যান্য স্কট্‌গণের আর শোকের সীমা রহিল না। ওয়ালেসের নিজের হৃদয় যদিও শোকভরে ভগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তথাপি তিনি বীরোচিত ধৈর্য্যের সহিত গভীর শোকাবেগ সংবরণ করিয়া রোরুদ্যমান প্রিয়বন্ধু ও অন্যান্য অনুযাত্রিকবর্গকে এই উদ্দীপনা বাক্যে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন :—

"বীরগণ! শোক সংবরণ কর; এ শোক করায় আর কিছু ফল নাই; তোমরা রোদন করিয়া আর তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবে না (এই বলিতে বলিতে তদীয় নয়ন-যুগল হইতে সহস্র ধারায় শোকাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল); বন্ধুগণ! প্রতিজ্ঞা কর, যত

দিন তোমরা এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ না লইতে পারিবে, তত দিন তোমাদিগের নয়ন নিদ্রায় নিমীলিত হইবে না; আর অদ্য আমি আমার স্রষ্টাকে সাক্ষী করিয়া তোমাদিগের সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি এই শোচনীয় স্ত্রীবধের সমুচিত শাস্তি বিধান করিবই করিব; আমার এই শাণিত তরবারি ইংরাজদিগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহাকেও, অধিক কি যাজক-মণ্ডলীকেও—ক্ষমা করিবে না; প্রিয় ভাতৃগণ! আমার এই ভিক্ষা যে, যদি আমি মরি ত আমার এই প্রতিজ্ঞা যেন তোমাদিগ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; ভাই সার্‌জন! এ শোক রাখ, এখন শোকের সময় নয়; আইস আমরা দশ সহস্র ইংরাজের রক্তে প্রিয়তমার শোকানল নির্ব্বাপিত করিগে; কাপুরুষেরাই অশ্রুজলে শোকাপনোদনের চেষ্টা পায়; অশ্রুজলে বীরের সাহস কমিয়া যায়; কৃত অপকারের প্রতিশোধ গ্রহণের যে একমাত্র উদ্দীপক ক্রোধ, অশ্রুজলে তাহা বিধৌত হয়!"

অধিনায়কের এই উদ্দীপনা-বাক্যে সমস্ত স্কট হৃদয়ে শোণিত-স্রোত তাড়িত-বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই বীরদল একবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রতিহিংসা দ্বারা এই শোকানল নির্ব্বাপিত করিবেন। পিতৃব্য অচিঙ্‌-লেক্ ওয়ালেসের এই দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া সদলে কার্টলেন্ অরণ্যে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সেই মিলিত বীরদল প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া রজনীযোগে ল্যানার্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাদিগের আক্রমণ আশঙ্কা করেন নাই, সুতরাং নিশ্চিন্তভাবে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছেন। নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সেনাদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক দল লইয়া ওয়ালেস্ হেসিলরীগের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন; অপর দল লইয়া গ্রেহাম্ সার্ রবার্ট থরনের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সেরিফ্ হেসিল্‌রীগ্ উচ্চতম প্রাসাদে নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন, এমন সময় ওয়ালেস্ তদীয় নিদ্রাগৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেসের পদাঘাতে সেই গৃহদ্বার ভগ্ন হইল। সেই ভীষণ শব্দে হেসিল্‌রীগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। হেসিল রীগ ভয়ে সোপানাবলির দিকে যেমন ধাবিত হইবেন, অমনি ওয়ালেস্ তাঁহার গ্রীবা ধারণ করিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তদীয় প্রচণ্ড অসি তদীয় দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিল। অচিঙ্‌লেকের সন্দেহ ঘুচিল না; তিনি হেসিল্‌রীগের এখনও জীবন আছে সন্দেহ করিয়া, খড়্গাগ্র দ্বারা তাঁহাকে দুই বার বিদ্ধ করিলেন। হেসিল্‌রীগের পুত্র যেমন পিতার সাহায্যার্থ দৌড়িয়া আসিলেন অমনি ধরাশায়ী হইলেন। প্রাসাদোত্থিত "হা হতোঽস্মি" এই আর্ত্তনাদ কর্ণবিদারণ করিয়া রাজমার্গে গিয়া উপস্থিত হইলে

অসংখ্য লোক আসিয়া জমা হইল। এদিকে গ্রেহাম্ সার্ রুবার্ট থরনের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলে তিনি সেই অনল রাশিতে ভস্মীভূত হইলেন। নগর-বাসিগণ অধিকাংশই সেই অনলরাশিতে ভস্মীভূত হইলেন। নগরবাসিগণ অধি-কাংশই স্কট্, সুতরাং তাঁহাদিগের সহানুভূতি স্বতঃই ওয়ালেসের সহিত উদ্দীপিত হইল। সকলেই আসিয়া ওয়ালেসের সহিত যোগ দিল। শতাধিক ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। ল্যানার্ক এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে স্কটদিগের হস্তগত হইল। অচিরকালমধ্যে এই সংবাদ স্কট্লণ্ডের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অমনি দলে দলে অসংখ্য স্কট্ আসিয়া ওয়ালেসের পতকামূলে দণ্ডায়মান হইল। সকলে একবাক্যে ওয়ালেস্‌কে দলপতি ও অধিনায়ক মনোনীত করিল। তিনি এক্ষণে তদীয় অন্তর্নিগূহিত হৃদয়ভাব আর গোপন রাখিলেন না। তিনি আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিলেন যে স্কট্লণ্ডকে ইংরাজগণের ভীষণ শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত।

ল্যানার্কের অবদানের পরই ওয়ালেস্ সর্ব্বপ্রথমে ইতিহাসে আবির্ভূত হন। এখন হইতেই জাতীয় ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে সমবেত জাতীয় দলের অধি-নায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শিবজী যেমন প্রথমে দস্যু বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ওয়ালেস্ও প্রথমে দস্যু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত লোকে মহাত্মাগণের অলোকপ্রচলিত কার্য্যের কারণনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকে *। প্রত্যেক সমাজ-সংস্কারক, প্রত্যেক ধর্ম্ম-সংস্কারক, এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর জীবন এইরূপ অযথা নিন্দাবাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া থাকে। তাঁহারা যাহাদিগের দুঃখমোচন করিবার জন্য আপন আপন সুখে জলাঞ্জলি দেন, আপন আপন জীবন উৎসর্গ করেন, তাহারাই তাঁহা-দিগের উদ্দেশ্য বিষয়ে সন্দিহান হয়, এবং নানাপ্রকারে তাঁহাদিগের কার্য্য ব্যাহত করিতে থাকে। বিশেষতঃ রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর জীবন অধিকতর কষ্টযন্ত্রণা-ময়। তিনি শত্রু মিত্র, স্বজাতি বিজাতি —সকলেরই নির্য্যাতনের বিষয়ীভূত। যত দিন তিনি কৃতকার্য্য না হন, তত দিন তিনি শত্রুদিগের নিকট বিদ্রোহী, এবং স্বজাতির নিকট শান্তিভঙ্গকারী দস্যু। যদি অকৃতকার্য্যাবস্থায় তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন বা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত হন, তাহা হইলে তিনি ইতিহাসে এই চিত্রেই প্রদর্শিত হইয়া থাকেন। কৃতকার্য্য হইলে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উপাস্য দেবতা, এবং বিপক্ষ বিজাতির ভীতি ও বিস্ময়ের উদ্দীপক।

* অলোক-সামান্য মচিন্ত্যহেতুকং।
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং॥
(কুমার সম্ভব।)

ওয়ালেস্ ল্যানার্কের এই বিজয়ের পর স্বদেশ ও স্বজাতির উপাস্য দেবত', ও ইংরাজগণের ভীতি ও বিস্ময়ের ভাজন হইয়া উঠিলেন। ইংরাজেরা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বীরত্বের অনেক বিস্ময়কর পরিচয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহাকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করেন নাই। আজ চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য লোক প্রকাশ্যরূপে দলে দলে আসিয়া তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইতেছে, আজ স্কট্লণ্ডবাসিগণ প্রকাশ্যরূপে তাঁহাকে অধিনায়ক মনোনীত করিল, আজ তিনি প্রকাশ্যরূপে "সর্ব্বসমক্ষে ইংরাজ-উন্মূলন জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া উদ্ঘোষিত করিলেন—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, ওয়ালেস্ আর বিদ্রোহী বা দস্যু নহেন। স্কট্লণ্ডবাসিগণের প্রতিনিধি, স্কট্ সাধারণতন্ত্রের সভাপতি এবং ইংরাজগণের প্রতিদ্বন্দ্বী।

স্কট্লণ্ডের অদৃষ্টগগনে এইরূপ আবর্ত্তন চলিতেছে, এমন সময় এড্ওয়ার্ডের ক্রীতদাসস্বরূপ রথ্ওয়েলের অধীশ্বর সার্ আমের ডি ভ্যালেন্ এড্ওয়ার্ডের নিকট এই সকল সংবাদ পাঠাইল। এই ব্যক্তি স্কট্লণ্ডবাসী হইয়াও জাতীয় স্বাধীনতা এড্ওয়ার্ড চরণে বিক্রীত করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। এই জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ এড্ওয়ার্ড রথ্ওয়েলের প্রকৃত অধীশ্বর মরেকে বিদূরিত করিয়া তৎস্থানে এই পাষণ্ডকে স্থাপিত করেন। এই পাষণ্ডের পত্রে এড্ওয়ার্ড সর্ব্বপ্রথমে অবগত হইলেন যে, স্কটেরা এক্ষণে স্বদেশকে ইংরাজগণের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এই সংবাদে এড্ওয়ার্ড স্কট্লণ্ড পুনরায় অধিগত করিবার জন্য এক মহতী সেনা সহ স্কট্লণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এড্ওয়ার্ডের শিবিরে বিকার্টনবাসী জপ্নামক এক জন কৃষ্ণকায় স্কট্ ছিল। ইংরাজেরা তাহাকে গ্রিম্স্বী বলিয়া ডাকিত। সে ওয়ালেসের নাম ও গুণগ্রাম শুনিয়া তাঁহার অনুসন্ধানার্থ নির্গত হইল। অনুসন্ধান করিতে করিতে সে কাইল্ প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় স্কটিশ্ অধিনায়কের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ওয়ালেস্ সৈন্য সংগ্রহ করিবার মানসে তথায় গিয়াছিলেন। তিনি জপের প্রমুখাৎ ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও এড্ওয়ার্ডের অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইলেন। কার্য্যদক্ষতা ও বিশ্বস্ততা নিবন্ধন এই ব্যক্তি স্কটগণ কর্ত্তৃক স্কট্লণ্ডের অস্ত্রধারক পদে অভিষিক্ত হইলেন।

আয়র সায়র হইতে প্রত্যাগত হইয়া ওয়ালেস অচিরকাল মধ্যেই সেনা সমবেত করিলেন। তিনি পূর্ব্বকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কয়েদীদিগকে কারামুক্ত করিলেন। ইহারাই তাঁহার সেনার প্রধান অঙ্গীভূত হইল। তাঁহার

পিতৃব্য সার্ রেনাল্ডের ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি স্বয়ং প্রকাশ্য যুদ্ধে ইংরাজগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হন, এই জন্য ইংরাজেরা তাঁহার ভূসম্পত্তি এখনও আবদ্ধ রাখিয়াছেন। সুতরাং তিনি প্রকাশ্যরূপে ওয়ালেসের সহিত যোগ দিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু গুপ্ত ভাবে ওয়ালেস্কে ধন বা লোক দিয়া বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এ দিকে কনিংহাম্ ও কাইল হইতে এডাম্ ওয়ালেস্ ও রবার্ট বয়েড্ সহস্র অস্ত্রধারী পুরুষ সহ ল্যানার্কে ওয়ালেসের পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সার্ জন্ গ্রেহাম ও তদীয় উৎকৃষ্ট অশ্বসেনা, এবং অন্যান্য অসংখ্য স্কট্-পেট্রিয়ট্ ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। সর্ব্বসমেত প্রায় তিন সহস্র অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক জাতীয় পতাকার আশ্রয় গ্রহণ করিল। সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু অধিকাংশই অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত না থাকায় কার্য্যকালে সংখ্যাবাহুল্যে তত ফল দর্শিল না।

এ দিকে ইংলণ্ডেশ্বর এড্ওয়ার্ড বা তদীয় প্রতিনিধি ষাইট সহস্র সুসজ্জিত সেনা লইয়া ল্যাঙ্কাসায়ারের অন্তর্গত বিগার নামক গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে তিনি দুই জন দূত সহ আপনার ভাগিনেয় কিছুকে ওয়ালেসের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দেন যে, যদি ওয়ালেস্ কৃত অপরাধের নিমিত্ত এখনও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে ক্ষমা করা যাইবে ও পর্য্যাপ্ত পুরস্কার প্রদান করা হইবে। যদি তিনি তাহা না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজবিদ্রোহী বলিয়া গৃহীত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ওয়ালেস্ অতি অবজ্ঞাসূচক পত্রে ইহার উত্তর প্রদান করিলেন এবং আপনার শক্তি প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে এড্ওয়ার্ডের দূতদ্বয় ও ভা[illegible] র প্রাণবধ করিলেন।

ওয়[illegible] এ এড্ওয়ার্ডের সৈন্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ-মানসে রজনী-যোগে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ছদ্মবেশে এড্ওয়ার্ডের শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সার্জন্ টিন্টো কেবল তাঁহার সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিলেন। একমাত্র তিনিই কেবল ওয়ালেসের অভিপ্রায় জানিতেন। ওয়ালেস্ ইংরাজ-সৈনিকগণের অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ সহিয়া শিবিরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথা হইতে দ্রুত পলাইয়া আসিলেন। শীঘ্র পলায়ন না করিলে, তিনি নিশ্চয়ই ধরা পড়িতেন। কারণ, কেহ কেহ তাঁহাকে ওয়ালেস্ বলিয়া সন্দেহ করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছিল। এ দিকে আবার ওয়ালেস্ দ্রুত স্কটিশ শিবিরে ফিরিয়া না আসিলে, আর এক বিপদ ঘটিত। সার্জন্ গ্রেহাম্ অনেক ক্ষণ ওয়ালেস্কে না

দেখিয়া তাঁহার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। টিন্‌টোকে বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল। তিনি তাহাকে হস্ত পদ বদ্ধ করিয়া পুড়াইতে বা ফাঁশি কাষ্ঠে ঝুলাইতে আদেশ দিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ওয়ালেস্ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেস্ টিন্‌টোকে তৎক্ষণাৎ রজ্জুমুক্ত করিতে আদেশ দিয়া, আপনার ক্ষণিক অন্তর্ধানের কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। গ্রেহাম্ ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, সেনানায়কের এরূপ জীবন-সংশয়কর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় নাই। ওয়ালেস্ উত্তর করিলেন, স্কট্‌লণ্ডকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিতে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর বিপজ্জনক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

স্বাস্থ্য।

অবতরণ।

জগতে মনুষ্যগণের স্বাস্থ্যই বাঞ্ছনীয়। যাহার স্বাস্থ্য নাই তাহার কিছুই নাই! মহাধনী সুরম্যকারু-কার্য্যময় প্রাসাদে শারদীয় বিধু-কিরণোজ্জ্বল বাত্রে সুচারু-কারুময় দ্বিরদ-রদনির্ম্মিত রজতমণি-খচিত শয্যায় সুরম্য সুদৃশ্য খট্টায় শয়ন করিয়া যদি স্বাস্থ্যহীন হয়েন, নিশ্চয়ই তিনি অসুখী। বিরামদায়িনী নিদ্রা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, রজনীর স্নিগ্ধ রমণীয়তা তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে!—প্রকৃতির স্নিগ্ধচ্ছবি তাঁহার বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে! আর দুঃখী—ভিক্ষামাত্র উপজীবী তৃণাচ্ছাদিত কুটীরবাসী ভূশয্যাশায়ী দুঃখী, যদি স্বাস্থ্যহীন না হয়, তবে সেও সম্পূর্ণ সুখী!—দুঃখ-তাপ-হরা নিদ্রায় তাহার সকল ক্লেশ, সকল দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছে!—আয়ুর্ব্বেদের মূল সূত্র গম্ভীর ভাবে বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষা-ণামারোগ্যং মূলমুত্তমং রোগাস্ত স্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সোজীবিতস্য চ।"—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের আরোগ্যই মূল ও উত্তম; রোগ তাহার মঙ্গলের ও জীবনের সংহারক! সেই সর্ব্বজন-বাঞ্ছনীয় স্বাস্থ্য-বিষয়ে এই রোগ-সন্তপ্ত অন্নজীবী ভারতবাসীর যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তুমি ধনী, কৃতবিদ্য; যদি স্বাস্থ্যহীন হও, তবে তোমার কি প্রত্যাশা? তোমার সন্তান—যাহার জন্য তাহার প্রসূতি করুণাময় ঈশ্বরের নিকট কত প্রার্থনা করিয়াছেন, উদরে ধারণ করিয়া কত কষ্টভোগ করিয়াছেন, যাহার অল্প রোদনে অস্থির হইয়া নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কত রাত্রি অতিবাহন করিয়াছেন—সেই পুত্র স্বাস্থ্যহীন হইলে কি লাভ?—তাহার দ্বারা কি উপকারের

আশা? অসুস্থ শিশু কেবল জননীর যৌবন-চৌর-মাত্র। হয়তো শিশুকালে বা কৈশোরকালে জনক জননীর অশ্রুসহ বালক চির-নিদ্রার অঙ্কগত হইবে! কিম্বা প্রত্যেক মাসে রোগের দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া জনক জননীকে চিন্তায় অস্থির করিবে।

যে দিন ভারত হইতে দেশাচারের ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম অন্তর্হিত হইয়াছে—সমাজের দৃঢ়বন্ধন শিথিল হইয়াছে, সেই দিন হইতে ঐ স্বাস্থ্যের অবনতি!—আমাদের প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম সমস্তই স্বাস্থ্যের সহিত সংযত। প্রকৃত হিন্দু আচার পালন করিলে যে সুস্থ ও সবল থাকা যায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহাভাব। প্রাচীন আর্য্যকুল-তিলক মুনিগণের "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—এই স্বর্ণ অক্ষর কয়েকটী যে দিন হইতে ভারতে হীনজ্যোতিঃ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমাদের স্বাস্থ্যের অবনতি।

আমাদের সকল অবনতির মূল ও মুখ্য কারণই স্বাস্থ্যনাশ! কিন্তু সাধারণ দুঃখের বিষয় নহে, এ সময়ে কেহই স্বাস্থ্য-রক্ষায় যত্নবান্ হয়েন না।—আমি বিজাতীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি কেশরী—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি আমার মস্তিষ্ক উষ্ণ করিতেছে, আমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সমতুলনায় বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আমার স্বাস্থ্য কৈ? হয়তো আমি উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়া বিজাতীয়ের পরস্পর বিশেষ বিভিন্ন প্রকৃতি—ভিন্ন দ্বীপের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মে উত্ত্যক্ত!—হয়তো যে নিয়মের জন্য যত্নবান্—ব্যতিব্যস্ত হইতেছি, তাহা আমাকে বিষফল প্রদান করিতেছে! এ সময়ে আমাদের প্রাচীন মুনিগণের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপদ্ধতি চারি দিকে আলোচনা করা উচিত,—এই মঙ্গলময় প্রস্তাবের সমালোচনায় যে টুকু কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহাই পরম লাভ!—এই বিশ্বাসে—এই সাহসে অদ্য এই মূল্যবান্ প্রস্তাবের অবতরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্তানোৎপাদন।

সন্তানকে দীর্ঘজীবী, সুস্থশরীর ও বলবান্ রাখিতে হইলে সন্তানোৎপাদন-কার্য্যে আয়ুর্ব্বেদের মতানুবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য।—ক্ষণিক ইন্দ্রিয়বৃত্তির তৃপ্তি-সাধন বিবাহের উদ্দেশ্য নহে, যাহাতে প্রজা-বৃদ্ধি হয়, সন্তান সবল ও সুস্থকায় হয়,—স্বীয় বংশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, তাহাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন, (১)—"দম্পতি যেরূপ আহার, আচার ও চেষ্টাযুক্ত হয়েন, তাঁহাদিগের সন্তানও সেইরূপ হয়।" ইহা সকলেরই স্থির সিদ্ধান্ত, শুক্র-শোণিতের অসাধারণ সংযোগই সন্তানোৎপত্তির নিদান; সুতরাং সেই শুক্র শোণিতের কোন

(১) আচারাহারচেষ্টাভি র্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ। স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ॥

বিকৃতি-ভাব থাকিলে সন্তানও রুগ্ন, দুর্ব্বল এবং অচিরজীবী হয়। অশুদ্ধ বিকৃত শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন সন্তান যত সাবধানে রাখা যাউক না কেন,—যত স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম পদ্ধতি অবলম্বন করাইতে চেষ্টা করা যাক্ না কেন,—কখনই সুস্থ রাখিতে পারা যাইবে না।

প্রথম শুক্রের ও শোণিতের পরিপক্কতা বয়স সাপেক্ষ। আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ মতে (২) "পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স্ক পাত্রের দ্বাদশবর্ষীয়া পাত্রীর সহিত বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে পিতা মাতার ধর্ম্ম, অর্থ ও মনোবৃত্তি-বিশিষ্ট সন্তান জন্মে।" সেই বিবাহের অব্যবহিত পরেই সন্তানোৎপাদন কর্ত্তব্য নহে, দম্পতির পরস্পর প্রণয়বৃদ্ধি, মনোমিলন প্রভৃতি অগ্রে হওয়া কর্ত্তব্য; তজ্জন্যই দ্বাদশ বৎসর-বয়স্কার বিবাহের আদেশ। দম্পতির পরস্পর প্রেম না হইলে পরিমিত শুক্র শোণিতের অভাব হয়, পুরুষের মনোবৃত্তি উত্তেজিত না হইলে পরিমিত শুক্র ক্ষরণ হয় না। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—(৩) 'প্রসন্ন অন্তঃকরণে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে সকল দেহাশ্রিত শুক্র হর্ষে নিঃসারিত হয়।' প্রণয়ই মনোবৃত্তি উত্তেজনার প্রধান কারণ, প্রণয়হীন দম্পতি কখনই প্রসন্নমনা নহে (৪)। উনষোড়শ বৎসরাধিক বয়স্কা কামিনীর আর্ত্তব শোণিত ও পঞ্চবিংশতি বৎসরাধিক বয়স্ক পুরুষের শুক্র পরিপক্ক,—সেই গর্ভোৎপাদনের সময়, তাহার পূর্ব্বে শুক্র শোণিত অপক্ক থাকে, সুতরাং তৎপূর্ব্ব বয়সে সন্তানোৎপাদন করিলে সেই সন্তান গর্ভে মৃত বা অচিরজীবী অথবা চিররুগ্ন হয়। অপক্ক শুক্রশোণিতজ শিশুর জন্যই যে বঙ্গীয় কামিনীরা শূন্যক্রোড়ে হৃদয় বিদ্রাবণ-শব্দে জগৎকে কাঁদাইতেছেন, ভারতের ভাবী উন্নতির মূলে দারুণ আঘাত করিতেছেন, কে না স্বীকার করিবে? প্রত্যেক পদে তাহা প্রত্যক্ষ হইলেও কেহ কেহ দুই একটি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন,—তাঁহারা দুই একটি দ্বাদশ বর্ষীয়ার গর্ভজাত ষোড়শ বৎসর-বয়স্কের ঔরসজ সন্তান সবল ও সুস্থকায় দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহা বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অসার কাষ্ঠের কোন স্থানে চিরস্থায়িতা দৃষ্টে সেই কাষ্ঠই চিরস্থায়ী স্বীকার করা সুবুদ্ধির অননুমোদনীয়। আর এই যে বয়সের উল্লেখ হইল, ইহাই যে পরিপক্ক শুক্রশোণিতের একমাত্র কাল ইহাও বিবেচ্য নহে, সচরাচর যে সময়ে শুক্র

(২) পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমাবহেৎ, পিত্র্যধর্ম্মার্থকাম-প্রজাঃ প্রাপ্সতীতি।

(৩) কৃৎস্নদেহাশ্রিতং শুক্রং প্রসন্নমনসস্তথা। স্ত্রীষু ব্যায়চ্ছতশ্চাপি হর্ষাত্তৎ সম্প্রবর্ত্ততে। সুশ্রুতঃ।

(৪) উনষোড়শবর্ষীয়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং। যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্ত-বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।

ক্র শোণিতের পরিপক্কতা ঘটিয়া থাকে, ইহা তাহারই উল্লেখ মাত্র। যদি তৎপূর্ব্বে শুক্রশোণিত পরিপক্ক হয়, তবে সে কাল সন্তানোৎপাদনের সময়, এবং যদি তৎপরেও দুর্ব্বলতা নিবন্ধন বা অন্য কোন কারণে শুক্রশোণিত অপক্ক থাকে, তবে সে কালও সন্তানোৎপাদনের প্রকৃত সময় নহে। সুশ্রুতাচার্য্যের অভিপ্রায় কেবল বয়সের উপর নহে, পক্কাপক্ক বিবেচনা করিতেই তাঁহার বয়সের উল্লেখ। বীজের পক্ক অপক্ক নির্ণয় করা অতি কঠিন, সুতরাং যে সময়ে অধিকাংশ লোকের শুক্রশোণিতের পরিপক্কতা ঘটে, তাহাই জানাইয়াছেন।

শারীরিক পদার্থ কতকগুলি পিতৃজাত কতকগুলি মাতৃজাত। "পিতৃজাত (১) কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও রেতঃ প্রভৃতি দৃঢ় পদার্থ;"—শুক্র বিকৃত হইলে এই সকল পদার্থও বিকৃত হয়। মাতৃজাত (২) মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও গুহ্য প্রভৃতি কোমল পদার্থ। শোণিত দূষিত থাকিলে এ সকলও বিকৃত হয় (৩)। শুদ্ধ শুক্র কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, দ্রব, স্নিগ্ধ, মিষ্টরস-বিশিষ্ট ও মধুগন্ধি; কেহ কেহ তৈল ও মধুর ন্যায় শুক্রকে বিশুদ্ধ স্বীকার করেন। ইহা কোনরূপ বিকৃতি হইলেই অশুদ্ধ হয়। বায়ু জন্য দূষিত শুক্র বায়ুজনিত বেদনা ও বর্ণ-বিশিষ্ট হয়, পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত হইলে পিত্তজ বেদনা ও বর্ণ; শ্লেষ্মাতে দূষিত হইলে শ্লৈষ্মিক বেদনা ও বর্ণ; শোণিত জন্য দূষিত হইলে শোণিত বর্ণ, বেদনাযুক্ত, শবগন্ধি এবং অধিক পরিমাণ; শ্লেষ্মা-বায়ুতে গ্রন্থিল; পিত্তশ্লেষ্মায় দুর্গন্ধ পূযের ন্যায়; বাত পিত্তে দুর্গন্ধ পূযের ন্যায় ও ক্ষীণ এবং সন্নিপাতের দ্বারা দূষিত হইলে মূত্র বা পুরীষের গন্ধবিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে শবগন্ধি গ্রন্থিল দুর্গন্ধ পূযের ন্যায় এবং ক্ষীণ শুক্র অতি কষ্টে বহু চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। মূত্র বা পুরীষ-গন্ধি হইলে কোন মতে আরোগ্য হয় না। এতদ্ভিন্ন শীঘ্রই আরোগ্য হইতে পারে। এরূপ দূষিত শুক্রের প্রজোৎপাদিকা শক্তির শীঘ্রই হ্রাস হইয়া যায়—এবং যদিই তাহাতে সন্তান জন্মে, তাহা হইলে সে সন্তান অপুষ্টাবয়ব ও অল্পজীবী হইবে।

এইরূপ বায়ু পিত্ত কফ পৃথক্ ভাবে

(১) গর্ভস্য কেশ-শ্মশ্রু-লোমাস্থি-নখ-দন্ত-শিরা-স্নায়ু-ধমনী-রেতঃপ্রভৃতীনি স্থিরাণি পিতৃজানি।

(২) মাংস-শোণিত-মেদো-মজ্জ-হৃ ন্নাভি-যকৃৎ-প্লীহান্ত্র-গুদ্ প্রভৃতীনি মৃদূনি মাতৃজানি।

(৩) বাত-পিত্তশ্লেষ্মঃ কুণপ গ্রন্থি পূতি পূয়ক্ষীণ মূত্র পুরীষ রেতসঃ প্রজোৎপাদনে অসমর্থা ভবন্তি। তেষু বাতবর্ণ-বেদনং, বাতেন পিত্তবর্ণ বেদনং, পিত্তেন শ্লেষ্মবর্ণ বেদনং, শ্লেষ্মণা শোণিত বর্ণ বেদনং, কুণপ গন্ধ্যনল্পং রক্তেন, গ্রন্থিভূতং শ্লেষ্ম-বাতভ্যাং পূতি পূয়নিভং পিত্তশ্লেষ্মভ্যাং ক্ষীণং প্রাগুক্তং পিত্তমারুতাভ্যাং মূত্র-পুরীষ-গন্ধি সন্নিপাতেন। সুশ্রুত।

বা মিলনে ও রক্ত দূষিত হইলে আর্ত্তব শোণিতও দূষিত হয়(১)। আর্ত্তব শোণিত শশকের রক্তের ন্যায় বা লাক্ষা-রসের ন্যায় বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ আর্ত্তব বস্ত্রে লাগিলে ধৌত মাত্র উঠিয়া যায় (২)। এবংবিধ মেহ ও প্রদররোগেও শুক্র শোণিতের বিকৃতি ঘটে, প্রস্রাবের বহুলতা ও আবিলতাই মেহ রোগের সামান্য লক্ষণ (৩)। ঋতুকালে শোণিতের অতিরিক্ত স্রাব, কিংবা ঋতুকাল না হইলেও শোণিতস্রাব বা রক্তের অন্য লক্ষণ অর্থাৎ অন্য কোন রূপ স্রাবকে প্রদর রোগ বলে (৪)। যত দিন সুচিকিৎসায় অশুদ্ধ শুক্র শোণিত বিশুদ্ধ না হয়, তত দিন সন্তান জন্মান কর্ত্তব্য নহে। আর অতি বৃদ্ধা বা দীর্ঘকাল-রোগিণীর কিম্বা অন্য কোন বিকার-বিশিষ্টা স্ত্রীর গর্ভাধান অকর্ত্তব্য; পুরুষেরও ঐরূপ অবস্থায় গর্ভোৎপাদন অকর্ত্তব্য (৫)।

ঋতুই স্ত্রীলোকের সন্তান জন্মিবার উর্ব্বরা ক্ষেত্র। যেরূপ অসময়ে ক্ষেত্রে বীজবপন করিয়া তাহার ফল পাওয়া যায় না, সেইরূপ অসময়ে—ঋতুকাল অতীতে সন্তানোৎপাদন হয় না; দিবা অবসান হইলে পদ্ম যেরূপ মুদিত হয়, ঋতুকাল অতীত হইলে, সেইরূপ নারীর যোনি মুদিত হয় (৬)। স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঋতুর কাল। সেই বয়সে মাসে মাসে যোনি হইতে শোণিত ক্ষরণ হয়, সেই ক্ষরণের দিন হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভ গ্রহণের সময় (৭)। কিন্তু এরূপও অনেক দেখা যায়, পঞ্চাশ বৎসরের পরও বৃদ্ধা ঋতুমতী হইতেছে। আমি আমাদের দেশের প্রাচীনা পরিচিতা একটী পঞ্চান্নবৎসর-বয়স্কা ইউরোপীয় রমণীর ঋতু হইতে ও সন্তান প্রসূত হইতে দেখিয়াছি। আর আজ কাল এই বঙ্গে দশ বা এগার বৎসর বয়সই স্ত্রীলোকের ঋতুর কাল বলিয়া গণ্য হইতেছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, রক্তের প্রাবল্যই ঋতুর একমাত্র কারণ। সেই রক্তের প্রবলতা যে বয়সে হউক না কেন, সেই সময়েই ঋতু হইয়া থাকে, আবার যে বয়সে সেই

(১) সুশ্রুত শারীর স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায় দেখ।

(২) শশাসৃক্‌প্রতিমং যচ্চ যদ্বা লাক্ষারসোপমং তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ। সুঃ

(৩) "সামান্যং লক্ষণং তেষাং প্রভূতা-বিল-মূত্রতা।" নিদানং।

(৪) তদেবাতি প্রসঙ্গেন প্রবৃত্তমনৃতাবপি।
অসৃন্দরং বিজানীয়াদতোহন্যদ্রক্ত-লক্ষণাৎ।

(৫) অতিবৃদ্ধায়াং দীর্ঘরোগিণ্যামন্যেন বা বিকারেণোপসৃষ্টায়াং গর্ভাধানং নৈব কুর্ব্বীত, পুরুষস্যাপ্যেবংবিধস্য ত এব দোষাঃ সম্ভবন্তি। সুঃ

(৬) নিয়তং দিবসেঽতীতে সঙ্কুচত্যম্বুজং যথা, ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা। সুঃ

(৭) দ্বাদশ বৎসরাদূর্দ্ধমাপঞ্চাশৎ সমাঃ স্ত্রিয়ঃ,
মাসি মাসি ভগদ্বারাৎপ্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ।
আর্ত্তব-স্রাব-দিবসাদৃতুঃ ষোড়শরাত্রয়ঃ,
গর্ভগ্রহণযোগ্যস্তু সএব সময়ঃ স্মৃতঃ।

শোণিতের অল্পতা হয়, সেই বয়স হইতেই আর্ত্তব ধ্বংস হইয়া যায়। এই উদ্দেশেই আয়ুর্ব্বেদে কথিত আছে;—(১) আর্ত্তব শোণিত এক মাস সঞ্চিত হইলে বায়ু ধমনীদ্বয় দ্বারা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও নির্গন্ধ সেই আর্ত্তবকে যোনিমুখে আনে, দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলে—শোণিতের প্রাবল্য হইলে, প্রকাশ পায় এবং পঞ্চাশ বৎসরের পর জরা-পক্ক শরীর হইলে—রক্তের অল্পতা হইলে ক্ষয় পায়।"—এই উক্তি প্রণিধান করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়,—যদি আট বৎসর বয়স্কারও শোণিতের প্রাবল্য ঘটে, তবে সেই সময়েই ঋতু হইতে পারে, এবং যদি সপ্ততি বৎসর বয়স্কারও সেই শোণিতের দৌর্ব্বল্য না হয়, তবে সে সময়েও ঋতু হইতে পারে।

ঋতুকালে স্ত্রীলোকের মুখের স্থূলতা ও উল্লাস; আস্থা, মুখ ও দন্তের প্রফুল্লতা; পুরুষে অভিলাষ ও প্রিয়বাক্য কথনে আসক্তি; কুক্ষি চক্ষুঃ ও কেশের স্রস্ততা; হস্ত, কুচ, শ্রোণি, নাভি, উরু, জঘন ও স্ফিচের স্ফুরণ, আহ্লাদ ও ঔৎসুক্য হয় (২)।

বিশুদ্ধ আর্ত্তবা স্ত্রী (৩) আর্ত্তব-নির্গমের দিবস হইতে তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। অহিংসা, দর্ভ-শয্যায় শয়ন প্রভৃতি করণীয়; স্বামী দর্শনও করিবে না। করে শরাবে বা পর্ণে হবিষ্যান্ন আহার করিবে; রোদন, নখ-কর্ত্তন, তৈলমাখা, চন্দনাদি মাখা চক্ষুতে অঞ্জন, স্নান, দিবা-নিদ্রা, প্রধাবন, অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ, হাস্য, বহুবাক্য কথন, আয়াস, ভূমি-খনন ও অত্যন্ত বায়ুসেবন পরিত্যাগ করিবে। ইহা সাধারণ বুদ্ধির অনুমোদিত। প্রথম তিন দিবস এ সকল কার্য্যে লিপ্ত না হইলে, মনোবৃত্তি অনেক অনুত্তেজিত থাকে,—স্বভাবতই স্ত্রীলোকের কাম-প্রবৃত্তি বলবতী. তাহাতে সেই বৃত্তি ঋতুকালে আরও উত্তেজিত হয়। সুতরাং সে সময়ে যাহাতে তাহার কতক দমন থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সে সময়ে এই সকল কার্য্য করিলে গর্ভেরও বিকৃতি হয় (৪)। শারীরিক কার্য্যের সহিত শরীর-জাত আর্ত্তব শোণিতের

(১) "মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যান্তদার্ত্তবং,
ঈষৎকৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ,
তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক পুনঃ,
জরা-পক্ক-শরীরাণাং যাতি পঞ্চশতঃ ক্ষয়ং।"

(২) "পীন-প্রসন্নবদনাং প্রক্লিন্নাত্ম-মুখ-দ্বিজাং,
নর-কামাং প্রিয়কথাং স্রস্তকুক্ষ্যক্ষি-মূর্দ্ধজাং,
স্ফুরদ্ভুজ-কুচ-শ্রোণি নাভ্যূরুজঘনস্ফিচং,
হর্ষোৎসুক্যপরাঞ্চাপি বিদ্যাদৃতুমতীমিতি।"

(৩) আর্ত্তব-স্রাব-দিবসাদহিংসা-ব্রহ্মচারিণী,
শয়ীত দর্ভশয্যায়াং পশ্যেদপি পতিং ন চ,
করে শরাবে পর্ণে বা হবিষ্যং ত্র্যহমাচরেৎ,
অশ্রুপাতং নখচ্ছেদং মভ্যঙ্গমনুলেপনং,
নেত্রয়োরঞ্জনং স্নানং দিবাস্বাপং প্রধাবনং,
অত্যুচ্চ-শব্দ-শ্রবণং হসনং বহুভাষণম্,
আয়াসং ভূমি-খননং প্রবাতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
ভাঃপ্রঃ

(৪) অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা লৌল্যাদ্বা দৈবতশ্চ বা,
সা চেৎ কুর্য্যান্নিষিদ্ধানি গর্ভদোষাংস্তদাপ্নুয়াৎ।

নিকট সম্বন্ধ কে অস্বীকার করিবে? আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—"গর্ভস্থ বালক রোদনে বিকৃত লোচন; নখচ্ছেদে কুনখী; তৈলমর্দ্দনে কুষ্ঠরোগী; অনুলেপনে ও স্নানে দুঃখশীল; অঞ্জনে চক্ষু হীন; দিবা-নিদ্রায় নিদ্রা-শীল; প্রধাবনে চঞ্চল; অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণে বধির; হাস্যে তালু দন্ত শ্যামবর্ণ; অত্যন্ত বাক্য-কথনে বাচাল; পরিশ্রমে উন্মত্ত; ভূমি-খননে টাকযুক্ত ও বায়ু সেবনে উন্মত্ত হয় (১)।

এইরূপ তিন দিবসের পর চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া সদ্বসন পরিধান করতঃ অলঙ্কৃতা হইয়া আহ্লাদিত মনে সুপরিচ্ছদশোভিত স্বামী সন্দর্শন করিবে (২)। তৎকালে স্বামী নিকটস্থ না থাকিলে পুত্রাদি প্রিয়জনকে দেখা উচিত। যেহেতু (৩) ঋতু স্নানের পর যেরূপ মানব দৃষ্টি গোচর হয়, পুত্রও তদনুরূপ জন্মে। কেহ কেহ বলেন,—স্বামী দূরবর্ত্তী হইলে তাহার অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সূর্য্যদর্শন করিবে (৪)।

ঋতুর প্রথম তিন দিবস সহবাসে স্বামীরও বিষম অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসে স্বামীর আয়ু-ক্ষয় হয়; তৃতীয় দিবসে সন্তান স্বল্পায়ু ও বিকলাঙ্গ জন্মে। প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসে গর্ভ হইলেও জীবিত থাকে না(৫)। যে সময়ে আর্ত্তব শোণিতের প্রাবল্য থাকে, সে সময়ে বিক্ষিপ্ত রেত অধোগত হয় না। যেরূপ নদীর প্রবলস্রোতে জলজ ধান্যের বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা ভাসিয়া যায়, সেইরূপ প্রবল আর্ত্তব-স্রাব কালে নিক্ষিপ্ত বীজও অধোগত হয়(৬)। সেই বেগ অতিক্রম করিয়া যাহা অন্তঃপ্রবৃষ্ট হয়, তাহা কখনই যথেষ্ট বীজ হইতে পারে না; সুতরাং তাহাতে সন্তান জন্মিলেও যে বিকলাঙ্গ বা অপুষ্টাবয়ব

(১) এতস্যা রোদনাদ্গর্ভে ভবেদ্বিকৃতলোচনং,
নখচ্ছেদে চ কুনখী; কুষ্ঠীত্বভাঙ্গতো ভবেৎ,
অনুলেপাত্তথা স্নানাদ্দুঃখশীলোহঞ্জনাদদৃক্।
স্বাপশীলো দিবাস্বাপা চ চঞ্চলঃ স্যাৎ প্রধাবনাৎ,
অত্যুচ্চ-শব্দ-শ্রবণাদ্বধিরঃ সংপ্রজায়তে,
তালু-দন্তৌষ্ঠ-জিহ্বাসু শ্যাবো হসনতো ভবেৎ,
প্রলাপী ভূরিকথনাদুন্মত্তস্তু পরিশ্রমাৎ
খলতি র্ভূমিখননাদুন্মত্তো বাতসেবনাৎ।
ভাঃ প্রঃ।

(২) ততশ্চতুর্থে দিবসে স্নাতা সদ্বসনাদিভিঃ,
ভূষিতা সুমনা পশ্যেদ্ভর্ত্তারং সমলঙ্কৃতং। ভাঃ

(৩) পূর্ব্বং পশ্যেদৃতু-স্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ততঃ পশ্যেৎ পতিং প্রিয়ম্
প্রিয়মিতি ভর্ত্তর্য্যনাসন্নে পুত্রাদিকমপি পশ্যেৎ
ভাবপ্রকাশঃ

(৪) তৎস্নানানন্তরং ভর্ত্তৃবদনং দ্রষ্টব্যং নান্যস্য.
ভর্ত্তৃসন্নিধানে ভর্ত্তারং মনসি ধ্যাত্বা সূর্য্যং
বিলোকয়েৎ —কাশীখণ্ডের ঋতুস্নান শব্দের
অর্থ-স্থলে শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য।

(৫) আয়ুঃক্ষয়ো ভবেদ্ভর্ত্তা প্রথমে দিবসেস্ত্রিয়ং,
দ্বিতীয়েঽপি দিনে রত্যো ত্যজেদৃতুমতীং তথা।
তত্র যশ্চাহিতো গর্ভো জায়মানো ন জীবতি,
অহিতো যস্তৃতীয়েঽহ্নি স্বল্পায়ুর্বিকলাঙ্গকঃ।
ভাঃ প্রঃ।

(৬) বহতি সলিলে ক্ষিপ্তং দ্রব্যং গচ্ছত্যধো যথা,
তথা বহতি রক্তেতু ক্ষিপ্তং বীজমধোনয়েৎ। ভাঃ

হইবে, সহজেই উপলব্ধি হয়। ইহাতে স্পষ্ট জানা যায়, চতুর্থ দিবসেও যদি শোণিতের প্রাবল্য থাকে, তবে তাহাও গর্ভাধানের নিতান্ত অনুপযুক্ত সময়।

চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ দিবসে পুত্রকামনায় স্ত্রীসম্ভোগ বিধেয়। চতুর্থ হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত যত পরে সমাগম হইবে, সন্তান ততই সৌভাগ্যশালী, ঐশ্বর্য্যবান্ ও বলী হইবে, কন্যা কামনায় পঞ্চম, সপ্তম, নবম বা একাদশ দিবসে সহবাস কর্ত্তব্য, ত্রয়োদশ দিন হইতে সমাগম অকর্ত্তব্য (১)। শুক্র-বাহুল্যে পুত্র ও শোণিত-বাহুল্যে কন্যা জন্মে, শুক্র-শোণিতের সমতায় নপুংসক হয়। ঋতুর অযুগ্ম দিবসে নারীর আর্ত্তব শোণিতের প্রবলতা থাকে, সুতরাং সে সময়ে কন্যা জন্মে (২)। যুগ্ম দিবসে অল্পতা থাকে, সুতরাং পুত্র জন্মে।

স্বামী এক মাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভার্য্যার ঋতুকালের পূর্ব্বোক্ত অন্যতর দিবসে ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি শুক্র বৃদ্ধিকারক দ্রব্য ভোজন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক মাস ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুলম্বিনী তৈল-ম্রক্ষিতা তৈল মাষ-কলাই সংযুক্ত অন্ন-আহারকারিণী প্রণয়িনী সহবাস করিবে (৩)। স্ত্রী ও স্বামীর ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে আর্য্যশাস্ত্রের ভূরি ভূরি উল্লেখ। ইহার তাৎপর্য্য নিরন্তর সহবাসে শুক্র শোণিতের দুর্ব্বলতা হয় এবং মনোবৃত্তিও সন্তান জন্মাইবার কালে বিশেষ উত্তেজিত হয় না, সুতরাং তৎপূর্ব্বে একমাস ব্রহ্মচর্য্য, যুক্তির অনুমোদিত।

(৪) পুত্র জন্মাইতে হইলে স্বামীর স্নানকরা চন্দন সুগন্ধি কুসুম প্রভৃতিতে ভূষিত হওয়া শুক্র-বৃদ্ধিকারক দ্রব্য আহার করা সুন্দর বস্ত্র পরিধান করা, সুবেশ করা, চারু অলঙ্কৃত হওয়া, তাম্বুল ভক্ষণ করা, সেই স্ত্রীর প্রণয়ে আগ্রহান্বিত হওয়া এবং কামে উত্তেজিত হওয়া উচিত। শয্যাও পরিষ্কৃত থাকা বিধেয়। অত্যন্ত আহার করিয়া অধীর ক্ষুধা-বিশিষ্ট ব্যথিত, পিপাসিত বালক বৃদ্ধ

ক্রমশঃ

(১) ওর্থ্যাং ষষ্ঠ্যামষ্টম্যাং দশম্যাং দ্বাদশ্যাং চোপেয়াৎ পুত্রকামঃ, এষ উত্তরোত্তরং বিদ্যাদায়ুরারোগ্যমেবচ, প্রজা-সৌভাগ্যমৈশ্বর্য্যং বলঞ্চ দিবসেষু বৈ, অতঃপরং পঞ্চম্যাং সপ্তম্যাং নবম্যামেকাদশ্যাঞ্চ স্ত্রীকামঃ। ত্রয়োদশীপ্রভৃত্যায় নিন্দ্যাঃ। সুঃ

(২) যুগ্মেষু চ দিনেষ্বাসাং ভবেদল্পতরং রজঃ,
সংযোগং তত্র যা গচ্ছেৎ পুমাংসং সাপ্রসূয়তে।
অযুগ্মেষু দিনেষ্বাসাং ভবেদ্বহুতরং রজঃ,
সংযোগস্তত্র যা গচ্ছেৎ সা স্ত্রী কন্যাং প্রসূয়তে।
শুক্রাধিক্যাৎ পুরুষ প্রমদা চ রাজোধিকাৎ,
শুক্রশোণিত-সাম্যাচ্চ জায়তে ষণ্ড-সংজ্ঞিতঃ।

(৩) ততোঽপরাহ্নে পুমান্ মাসং ব্রহ্মচারী সর্পিঃ-স্নিগ্ধ-সর্পিঃ ক্ষীরাভ্যাং শাল্যোদনং ভুক্ত্বা মাসং ব্রহ্মচারিণীং তৈলস্নিগ্ধাং তৈলমাষোত্তর-হারাং নারীমুপেয়াদ্রাত্রৌ। সুঃ

(৪) স্নাতশ্চন্দন-লিপ্তাঙ্গঃ সুমনোচিতঃ,
ভুক্তবৃষ্যঃ সুবসনঃ সুবেশঃ সমলঙ্কৃতঃ,
তাম্বুলবদনস্তস্যা মনুরক্তোঽধিক-স্মরঃ,
পুত্রার্থী পুরুষো নারী মুপেয়াচ্ছয়নে শুভে।

কোন বেগ-প্রপীড়িত (অর্থাৎ মলমূত্রাদির বেগযুক্ত) রোগীস্ত্রী-সম্ভোগ করিবে না (১)। নারীও পুরুষের গুণযুক্তা বিহিত পরিমিত আহার-কৃতা ও পূর্ব্ব-বিহিত ঋতুমতী ও পুত্রার্থিনী হওয়া উচিত (২)। রজস্বলা, ব্যাধিমতী, বিশেষতঃ যোনি-রোগিণী, বয়ঃ-জ্যেষ্ঠা, কামশূন্যা, মলিনা ও গর্ভিণী কামিনী সম্ভোগে পুরুষের বিশেষ অনিষ্ট হয় (৩)।

(৪) ঋতুমতী স্ত্রী যথাকালে সম্ভোগ করিলে কামে উত্তেজিত হইয়া মেঢ্রযোনি সংঘর্ষণে শারীরিক উষ্ণতা অনিলের দ্বারা আহত হইয়া পুরুষের সর্ব্বশরীরস্থ শুক্র দ্রব হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক লিঙ্গ দ্বারা অঙ্গনার যোনিতে পতিত হয়, পরে গর্ভাশয়ের মুখ বিসারিত হইলে আর্ত্তবের সহিত সেই শুক্রের মিলন ঘটে। শুক্র সৌম্য ও আর্ত্তব আগ্নেয় অন্যান্য সকল ভূত ও পরস্পরের সাহায্যে ও পরস্পরের সংযোগে তাহাতে অবস্থিতি করে (৫)। ঘৃত-পিণ্ড যেমত অগ্নি সহযোগে দ্রবীভূত হয়, আর্ত্তবও সেই রূপ পুরুষ-সমাগমে বিসর্পিত হইয়া উঠে। সেই মিলনই সন্তানোৎপাদনের একমাত্র কারণ। সেই একমাত্র সন্তানোৎপাদনের নিদান শুক্র শোণিত যদি বিশুদ্ধ ও রীতিমত সংযোগে সন্তান উৎপাদন করে, তবে যে, সন্তান সবল, সুস্থকায় ও সর্ব্বাবয়ব পুষ্ট হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের স্বাস্থ্যের সহিত সংযত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ঋতুমতী স্ত্রী প্রথম দিবসে চাণ্ডালী; দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মঘাতিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী উল্লেখে অস্পর্শীয়া বলিয়া গিয়াছেন (৭)। এখনও প্রকৃত হিন্দুসম্প্রদায় রজঃস্বলা কামিনীকে স্বামীর পৃথক শয্যায় শয়ন করিতে দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসী

---

(১) অত্যাশিতোঽধৃতিঃ ক্ষুধান্ সব্যথাঙ্গঃ পিপাসিতঃ, বালো-বৃদ্ধোঽন্যবেগার্ত্তস্ত্যজেদ্রোগী চ মৈথুনং। ভাবপ্রকাশঃ

(২) পুরুষস্যগুণৈর্যুক্তা বিহিতাশূন ভোজনা, নারী ঋতুমতি পুংসাং সংগচ্ছেত সুতার্থিনী। ভাবঃ

(৩) রজঃস্বলা ব্যাধিমতী বিশেষাদ্‌যোনিরোগিণী, বয়োধিকা চ নিকামা মলিনা গর্ভিণী তথা, এতাসাং সংগমাৎ পুংসাং বৈগুণ্যানি ভবন্তীহি। ভাবঃ

(৪) ঋতৌ স্ত্রীপুংসয়োর্যোগে মকরধ্বজবেগতঃ, মেঢ্রযোন্যাভিঃ সংঘর্ষাচ্ছরীরোষতঃ নিলাহতঃ পুংসঃ সর্ব্বশরীরস্থঃ রেতোদ্রাবয়ন্তেঽথ তং বায়ুর্মেহন-মার্গেণ পাতয়ত্যঙ্গনাভগে, তৎসংক্রুত্য ঘ্যাতমুখং যাতি গর্ভাশয়ং প্রতি, তত্র শুক্রাদায়াত্তে নার্ত্তবেন যুতং ভবেৎ। ভাঃ প্রঃ

(৫) সৌমং শুক্রমার্ত্তব মাহেয়ামতরেষামপ্যত্র ভূতানাং সান্নিধ্যমস্ত্যনুনা বিশেষেণ পরস্পরে পকারাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানু প্রবেশাচ্চুস্ং। শাঃ ৩ অঃ।

(৬) "ঘৃতপিণ্ডোযথৈবাগিমাশ্রিতঃ প্রবিলীয়তে বিসর্পত্যার্ত্তবং নার্য্যাস্তথা পুংসাংসমাগমে। সু, শা ২ অঃ

(৭) "প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহি বিশুদ্ধতি।" ধর্ম্মশাস্ত্রং।

ক্রমশঃই হিন্দুধর্ম্মের অনাদরে কত অনর্থ উৎপাদন করিতেছে, তাহা লেখনাতীত। এই ভারতে কয় জন কেবল সন্তানোৎপাদনই স্ত্রী-সম্ভোগের কারণ বলিয়া স্মরণ রাখেন? ক্রমশঃ

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায়

যুদ্ধ।

(গত প্রকাশিতের পর।)

পাঠক মহাশয়গণের স্মরণার্থ পুনরপি বলিতেছি, আমরা কল্পনা-বহুল রামায়ণাদি প্রাচীন গ্রন্থাবলি হইতে আমাদের নিকট যাহা সত্যবৎ প্রতীয়মান হইবে, তাহাই মাত্র গ্রহণ করিব। রাবণানুজ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাকালীন গভীর নিশ্বাস আকর্ষণে সমীপবর্ত্তী বৃহৎকায় জন্তুগুলি বেগে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিত এবং বেগবান্ নিশ্বাসে তাড়িত হইয়া প্রচণ্ডগতিতে সুদূরে নিক্ষিপ্ত হইত। কল্পনার এই অসম্ভব ক্রীড়া হইতেও কি কিছুমাত্র সত্য নিষ্কাশিত হইতে পারে না? হাঁ! আমরা এতদ্দ্বারা অন্ততঃ এইমাত্র বিশ্বাস করিতে পারি যে, কুম্ভকর্ণ এক জন প্রকাণ্ডকায় ভীষণ-দর্শন অমিত-পরাক্রম বীরপুরুষ ছিল; সকল স্থানেই আমরা সাধ্যমত এইরূপ সত্যোদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইব।

রামায়ণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমাদের চক্ষু প্রথমেই বীরচূড়ামণি ধার্ম্মিকপ্রবর দাশরথির উপর পতিত হয়। তাঁহার অলৌকিক স্বার্থত্যাগ, অপ্রতিম ধর্ম্মভীরুতা, অসামান্য সত্যপ্রবণতা এবং অলোকসামান্য গুরুভক্তির বিষয় বর্ণন করা আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবের লক্ষ্য নয়, আমরা সুধু তাঁহার যুদ্ধসম্বন্ধীয় ব্যবহারের যথা কথঞ্চিৎ বর্ণন করিব।

খর-সুত মায়াবী মকরাক্ষ যখন গো-চর্ম্মে সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া এবং গোবাহিত রথে সমারূঢ় হইয়া রামচন্দ্রের পবিত্র শরীরে অজস্র শাণিত বাণ-নিচয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য দাশরথি সামর্থ্য-সত্ত্বেও গোচর্ম্ম পরিবৃত দুরাত্মা মকরাক্ষকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। "গোচর্ম্মে শরনিক্ষেপ করিলে ধর্ম্মনষ্ট হইবে," এই ভয়ে ক্ষণ-কাল অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, তথাপি অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেন না। পরিশেষে অস্ত্রবিশেষ প্রয়োগ দ্বারা দুরাত্মার গোচর্ম্ম-বিনির্ম্মিত বর্ম্ম এবং রথবাহক গো সকলকে সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া বাণান্তর-সংঘাতে তাহার অপবিত্র মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যখন ধর্ম্মভীরু বিভীষণাত্মজ তরণীসেন

রামচন্দ্রের হস্তে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম জ্ঞানে স্তুতি করিতে লাগিলেন, তখন শরণাগত-বৎসল শ্রীরামচন্দ্রের ভার্য্যা-বিরহ-বেদন-সংক্ষোভিত ক্রোধোদ্বেলিত হৃদয় নবনীতের ন্যায় গলিয়া পড়িল, সেই বজ্রমুষ্টি হইতে সগুণ ধনুক স্খলিত হইল। তিনি অমনি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা ভার্য্যাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন, তথাপি করুণ-স্তুতিপরায়ণ শত্রুর অঙ্গে কুশাগ্র সংস্পর্শ করাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু পরিশেষে নিয়তি-প্রণোদিত হইয়া যখন তরণীসেন তাঁহাকে অকথ্যরূপে ভর্ৎসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন রামচন্দ্র তাহাকে ভগুজ্ঞান করিয়া অস্ত্রাঘাতে সংহার করিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহু সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐ রূপ ঘটনা হইয়াছিল। তদনন্তর মূল শত্রু লঙ্কাধিপ রাবণ যখন অনেক যুদ্ধের পর স্বীয় মৃত্যু-বাণ রামচন্দ্রের ধনুকে যোজিত দেখিল, তখন আপনার মৃত্যু অবধারিত জানিয়া অস্ত্র ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া করযোড়ে তাঁহার স্তুতি আরম্ভ করিল। অনুগত-বৎসল সদুদার-চরিত দাশরথির নবনীত-কোমল হৃদয় অমনি বিগলিত হইল; অমনি দুরাত্মার সহস্র সহস্র অপরাধ বিস্মৃতি-সলিলে চির-নিমজ্জিত করিতে প্রয়াস পাইলেন। রক্ষঃকুল-ধ্বংস-াবশিষ্ট একমাত্র রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে এবং "প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী" পতিপ্রাণা অঙ্কলক্ষ্মী ভার্য্যা জানকীর উদ্ধার সাধন করিয়া দুঃখ-সঙ্কুচিত চিত্তকে আনন্দ-নীরে পরিপ্লুত করিতে, আপনাকে সম্পূর্ণ সক্ষম জানিয়াও, শরণাগতের প্রাণবধ করিতে বিরত হইলেন। জীবনকে ভার্য্যাবিরহ-বহ্নিতে চিরদগ্ধ করিতে শ্লাঘ্য মনে করিলেন, তথাপি শতদোষ-দুষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হইলেন!! কি অপ্রতিম ক্ষমাগুণ!! কি অতুল লোভবশীকরণ-ক্ষমতা! কি অনুপম মহত্ত্ব! ক্ষমাগুণ-বিভূষিত এমন কয়টী রত্ন পৃথিবীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন? কয়টী লোক ঈদৃশ করতল-সমাগত-প্রায় অতুল সাম্রাজ্যকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মহত্ত্ব জগতে বিঘোষিত করিতে পারিয়াছেন? যাহা হউক, যে বুদ্ধি তরণীসেন এবং বীরবাহুর শমন-সদন-গমনের কারণ হইয়াছিল, সেই কুবুদ্ধিই রাবণের জিহ্বাকে কটুভাষা উচ্চারণ করিতে প্রলোভিত করিল এবং রাবণ রামচন্দ্রকে অশেষ-প্রকার দুর্ব্বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। তখন রামচন্দ্র অগত্যা তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

যে যে যুদ্ধে রামচন্দ্রের অলৌকিক মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহাই মাত্র উল্লিখিত হইল। রামায়ণে যে অন্যায়-যুদ্ধ একেবারেই নাই, এমন

নয়। ইন্দ্রজিত ও মহীরাবণ-বধ প্রভৃতি স্থলে উপায়ান্তরাভাবে বীরধর্ম্ম উপেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তাদৃশ স্থলও অতি বিরল।

এখন চলুন পাঠক! আমরা কবিগুরু বাল্মিকীর জগদারাধ্য চরণারবিন্দে প্রণিপাত পুরঃসর তাঁহার সুগন্ধ-পরিপূরিত সুরম্য পুষ্পোদ্যান-সন্নিভ রামায়ণ ইহাতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, মহামহোপাধ্যায় জগৎ-পরিব্যাপ্ত-নামা অশেষ-জ্ঞানসাগর মহাত্মা বেদব্যাসের চিরকীর্ত্তি-নিকেতন-স্বরূপ মহাভারতের জ্ঞানরত্ন-প্রদ অতুল ভাণ্ডারে প্রবেশ করি এবং তথায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মূল্যবান্ বস্তুরাজি হইতে অভীপ্সিত বিষয়ের অনুকূল রত্নাবলির উদ্ধারার্থ সচেষ্ট হই।

মহাভারত অশেষ রত্নের আকর। যিনি জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তিনি উহাতে সর্ব্বতোমুখী অসামান্য প্রতিভা সন্দর্শনে বিমোহিত হন। ইহার কোথাও পবিত্র ভ্রাতৃবৎসলতা জহ্নু তনয়া জাহ্নবীর ন্যায় নির্ম্মল ধারায় কঠোর-সংসার পরিশ্রম-শ্রান্ত পান্থজনের ক্লিষ্ট অন্তঃকরণে শান্তি-বারি সেচন করিতেছে। কোথাও গুরুভক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সহস্র সহস্র যন্ত্রণায়ও পর্ব্বতবৎ অচল থাকিয়া অবনত মস্তকে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতেছে। কোথাও পবিত্র দাম্পত্য প্রীতি অন্তঃসলিলা ফল্গু স্রোতঃস্বতীর ন্যায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে নিহিত রহিয়াও অনুসন্ধিৎসু জনগণের অন্তঃকরণে অমৃতের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে। আবার কোথাও পরদুঃখ-কাতরতা গলদশ্রুলোচনে দুঃখিজনের দুঃখসমুদ্ভূত নেত্র-বারিমুঞ্চনে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই রূপ ইহার যে দিকে দৃষ্টি করিবে, সেই দিকেই তোমার নয়নদ্বয় পরিতৃপ্ত হইবে। ইহার ঈদৃশ অসামান্য বৈচিত্র্যই অস্মদ্দেশ-প্রচলিত সামান্য শব্দ-সংরচিত "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে" এই লোক-বিশ্রুতির মূল কারণ। সংক্ষেপত এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, মহাভারত মানবীয় মনোবৃত্তি-নিচয়ের যেমন সুস্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবির লেখনী তদ্রূপ চিত্র-অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছে কি না, গভীর সন্দেহের বিষয়। আবার সেই মনোরঞ্জন বহুবিধ অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রমধ্যেও বীরত্বের চিত্র খানি যেমন নয়নাভিরাম হইয়াছে, অন্যান্য চিত্র তদ্রূপ হয় নাই। এই চিত্রের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চিত্রকরের অলোকসামান্য জ্ঞান-গরিমার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে, যেমন ইহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব, তেমনিই ইহার বর্ণ-সামঞ্জস্য; কোথায়ও বিন্দুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না।

বীরত্বের বিলাস-ভূমি মহাভারতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আমাদের পুরোভাগে সর্ব্বপ্রথমেই মহানুভাব মহাত্মা ভীষ্মদেবের জ্বলন্ত তেজঃপ্রদীপ্ত মূর্ত্তি-খানি সমুদিত হয়। তাঁহার সেই

স্বভাব-সুন্দর বিনয়-বিনম্র অথচ সংগ্রাম-ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি যাঁহার মনোমন্দিরে একবারও কিঞ্চিন্মাত্র ছায়া প্রদান করিবে, সেই অমনি ভক্তি, প্রীতি এবং ভীতি-সংবলিত অন্তঃকরণে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিবে। বীরধর্ম্মে তাঁহার যেমন অলৌকিকী আস্থা ছিল, জগতে তাহার তুলনা সুদুর্লভ। ক্ষত্রিয়-কুলান্তক পরশুরাম কাশীরাজ তনয়া অম্বার ভীষ্মবধ-কামনা চরিতার্থ করণা-ভিলাষে ভীষ্মকে অম্বার পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ করিলে, যখন ভীষ্ম স্বীয় জনকের প্রীতিকামনায় তৎসন্নিধানে পূর্ব্বে যে চির-জীবন অবিবাহিত অবস্থায় যাপন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া-ছিলেন, সেই অমানুষী প্রতিজ্ঞার বিবরণ উল্লেখ করিয়া পরশুরামের আদেশ-প্রতিপালনে অপারগ হইলেন এবং যখন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার সেই ব্যপদেশ সফল হইলে, পরশুরাম শ্রদ্ধাসহকারে রোষ-কষায়িত-লোচনে ভীষ্মকে তদীয় আজ্ঞা অপালন-জনিত দোষে দোষী করিয়া যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন, তখন মহামতি ভীষ্ম বিনয়া-বনত বদনে স্বকীয় অব্যর্থ প্রতিজ্ঞার বিষয় পুনঃ পুনঃ পরশুরামকে অবগত করাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত রহিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভার্গবের রণ-পিপাসা তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিল না। অগত্যা ভীষ্মদেবকে গুরুর সহিত সমর-প্রাঙ্গণে সংগ্রামের ভীষণাভিনয়ে ব্রতী হইতে হইল। মহা-মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ভীষণ যুদ্ধ বহু দিবস চলিতে থাকিল। কেহই কাহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে ভীষ্ম যখন অব্যর্থ সায়ক-সন্ধানে পরশুরামের চির-প্রখ্যাত বিজয়-গৌরবের বিনাশ-সাধনার উপক্রম করিলেন, দেবগণ অমনি ভীষ্মকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পরশুরামের সেই অব্যাহত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার কামনায় ভীষ্মকে তাঁহার প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রের প্রতিসংহার করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবভক্ত মহাত্মা ভীষ্ম দেব-গণের সেই অনুরোধ পালন করিলেন—প্রযুক্ত সায়ক সংবৃত করিয়া ভার্গবের চির-প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়-বিজয়ী নাম অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। অনন্তর দেবগণ পরশু-রামকে রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাইয়া স্থানান্তরে গমন করিতে অনুরোধ করিলে, যখন নিজের অবমাননা নিবন্ধন পরশুরাম তদ্রূপ করিতে অস্বীকার করিলেন, তখন তাঁহারা শান্তনু-তনয়কেই তদ্রূপ করিয়া পরশু-রামের সম্ভ্রম-রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সত্যব্রত-পরায়ণ ভীষ্ম করযোড়ে বিনীতবাক্যে দেবগণের নিকট "এ জীবনে সমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাইব না" বলিয়া পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা-পাশে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞার অবস্থা বিজ্ঞাপিত করিয়া তাহাকে বিরত থাকিলেন। অগত্যা

ভার্গবই অগ্রে সমরাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। এখন চলুন প্রিয় পাঠক, আমরা ব্যাসদেবের কল্প-তুলিকা-সম্ভূতা প্রতিবিধিৎসার সজীব মূর্ত্তিরূপা অম্বা যখন পরশুরামের সাহায্যে ভীষ্মের পরাজয়-সংসাধনে অকৃতার্থা হইয়া কঠোর তপশ্চর্য্যার পর জন্মান্তরে ভীষ্ম-বিজয়ের বরপ্রাপ্ত হইলেন এবং বর্ত্তমান জীবনের হ্রস্বতা সাধনার্থ অমনি প্রজ্বলিত হুতাশনে পতঙ্গবৎ দেহ বিসর্জ্জন করিয়া দ্রুপদের অপত্যরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন এবং তদনন্তর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কুরুক্ষেত্রের ত্রিলোক-বিখ্যাত মনোহর রূপ রঙ্গভূমিতে স্বীয় অকর্ম্মণ্য অংশ অভিনীত করিতে আরম্ভ করিলেন; চলুন, তৎকালিক সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বিচিত্র চিত্র মনোনেত্রে সন্দর্শন করিয়া ভীষ্মের এতদপেক্ষাও অনেক সামান্য বীরবত্তার জ্বলন্ত প্রমাণ সংগ্রহে যত্নপর হই।

যখন দুর্ম্মতি দুষ্কৃতি-পরায়ণ দুরাত্মা শিখণ্ডী গঙ্গাসূনুর দেবোপম পবিত্র শরীরে সুতীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যখন সেই সুতীক্ষ্ণ শরজালও তাহার দুর্ব্বলহস্ত-পরিচালিত বিধায় ভীষ্মের বজ্র-কঠিন শরীরে প্রবেশ পথ মাত্র পাইতে সমর্থ হইল না দেখিয়া কুন্তী-তনয় পার্থ বাসুদেবের মন্ত্রণানুসারে শিখণ্ডীকে পুরোভাগে 'সাক্ষী গোপাল' স্বরূপ রাখিয়া স্বকীয় ধাপাধার হইতে বাছিয়া বাছিয়া শাণিত বাণ-নিচয় তাঁহার শরীরে অমিত বলের সহিত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, যখন অর্জ্জুনের দৃঢ় হস্তে পরিচালিত সেই শরজাল তাঁহার তেজঃপুঞ্জ গাত্র হইতে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় শোণিত-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং যখন সেই শাণিত বাণ-নিচয়ের সবল-সংঘাত জনিত অপরি-সীম বেদনায় তাঁহার মর্ম্মস্থল কুম্ভকারের পয়নের ন্যায় অদৃশ্য-বহ্নি-সন্তাপে বিদগ্ধ হইতে লাগিল, তখনও তিনি এক পদ পশ্চাদ্গমন করিলেন না; কিম্বা শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইলেন না, এবং প্রতিজ্ঞা বিচ্যুতির ভয়ে, কি দুরাচার শিখণ্ডীর দুর্ব্বল হস্ত প্রযুক্ত অস্ত্রজাল, কি শিখণ্ডী-ব্যপদেশে অর্জ্জুনের সবল হস্ত চালিত সায়ক-নিচয় কিছুই ছেদন করিতে প্রয়াস পাইলেন না। কি অপ্রতিম ধৈর্য্য। কি অপ্রতিম প্রতিজ্ঞাপালন!! কি অসাধারণ মহত্ত্ব!!! যদি তিনি তিলার্দ্ধের জন্যও স্বকীয় প্রতিজ্ঞাপালনে বিরত হইয়া অস্ত্ররাজিচ্ছেদনে যত্নপর হইতেন, তবে কি, অর্জ্জুন না হউন, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নীচাদপি নীচ শিখণ্ডী তাঁহার গাত্রে কুশাগ্রও বিদ্ধ করিতে ক্ষমবান্ হইত? শুধু কি ভীষ্মের অব্যর্থ প্রতিজ্ঞার প্রতি নির্ভর করিয়াই শিখণ্ডী তাদৃশ অসমসাহসিকতার কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ছিল না? যদি ভীষ্ম আপনার বধের উপায় আপনি পাণ্ডবদিগের নিকট বিবৃত না করিতেন, যদি তিনি অঙ্গীকার-পালনের বিনিময়ে দেহ বিসর্জ্জন

করাকেও শ্লাঘনীয় মনে না করিতেন, তবে কি শিখণ্ডী অকুতোভয়ে তাঁহার গাত্রে বাণবৃষ্টি করিতে সাহসী হইত? ক্ষীণজীবী সামান্য মৃগপোতক কি কথন ভ্রমেও মৃগেন্দ্রের ভীষণ দর্শন শরীরে নখাগ্র পর্য্যন্ত সংবিদ্ধ করিতে সাহসী হইতে পারে? কিন্তু, প্রিয় পাঠক! ভীষ্ম-চরিত বর্ণন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, নতুবা সর্ব্ববিষয়ে সেই মহাত্মার অলৌকিক মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে আমার ন্যায় একজনও অনেকাংশে সমর্থ হইত। *

সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ধার্ম্মিক-প্রবর শান্তনু-তনয়ের পরেই আমাদের চক্ষু বীরেন্দ্র কেশরী মূর্ত্তিমান ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মরূপী ভীমকায় ভীমসেনের উপর নিপতিত হয়। যেমন তাঁহার অমানুষিক ভীষণ-দর্শন প্রকাণ্ড কলেবর, তেমনই তাঁহার অলোক-সামান্য দিগন্তবিঘোষিত দেব-জন-স্পৃহনীয় বীর্য্যবত্তা। কুরুক্ষেত্রের চিরস্মরণীয় মহাসমরে সহস্র সহস্র বীর, সহস্র সহস্র প্রকারে স্বকীয় অসামান্য শৌর্য্য প্রকাশিত করিয়া দর্শক বৃন্দের বিস্ময় জন্মাইয়াছেন সত্য, কিন্তু বীর চূড়ামণি ভীমসেন যেমন অলৌকিক শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্য কেহই তদ্রূপ করিতে সমর্থ হন নাই। যে গঙ্গানন্দন স্বীয় অতুল জ্ঞান গৌরবে শুধু কুরুপাণ্ডবের কেন তৎকাল-বিদ্যমান যাবতীয় জনগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি অশ্রুত-পূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ নিবন্ধন দেবগণেরও বিস্ময় সমুৎপাদন করিয়াছিলেন, যিনি অতি মানুষিক শৌর্য্য-প্রভাবে বাসুদেবেরও প্রতিজ্ঞা ব্যর্থীকরণে সক্ষম হইয়াছিলেন, সংক্ষেপতঃ যিনি সর্ব্ববিষয়ে সকলের শীর্ষ-স্থানীয় ছিলেন, সেই মহামতি ভীষ্ম ব্যতীত বীর্য্যবত্তায় ভীমসেনের সহিত আর কাহারও তুলনা হইতে পারে না। বীরের হৃদয় যে সরলতার বিলাসভূমি, কপটতা তাহাতে ভ্রমেও যে পদার্পণ করিতে সাহসী হয় না, ভীম-চরিত তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহার সাবল্য-পরিপূর্ণ অগ্নিময় বাক্যাবলি চেতনাবিহীন গ্রন্থপত্রে পাঠ করিলেও নির্জ্জীব দেহ পর্য্যন্ত বীরমদে মাতিয়া উঠে; দাসত্বের সুদৃঢ় নিগড়-পরিহিত বাঙ্গালীরও শিথিল শোণিত-প্রবাহে তাড়িত বেগ সংক্রামিত হয়। যখন বীরশ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্ম অর্জ্জুনের রণ-কৌশলে ক্ষণকাল ব্যতিব্যস্ত রহিয়া অবশেষে অব্যর্থ সন্ধান নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, যখন সেই অমোঘাস্ত্র কালান্তক যমের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নক্ষত্রবেগে পাণ্ডব-সৈন্যদলে প্রবেশ করিল, যখন বাসুদেবের তার-স্বর-প্রদত্ত উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া একে একে সমস্ত বীরগণ শরাসন ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া অস্ত্রকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন

* আমরা পাঠক মহাশয়কে ভীষ্মচরিত অবগতির নিমিত্ত "নবপ্রবন্ধ" নামধেয় পুস্তকের "ভীষ্ম" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

করাইলেন, তখনও বীর্য্যবান্ ভীম-পরাক্রম ভীমসেন গদা হাতে অস্ত্রের প্রতীক্ষায় হিমাচলের ন্যায় অটল রহিলেন। বাসুদেবের সহস্রপ্রকার উপদেশ এবং অনুরোধ তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যথা-করণে সমর্থ হইল না। জাজ্বল্যমান দেখিলেন, প্রজ্বলিত হুতাশনোপম অব্যর্থ সায়ক একমাত্র তাঁহাকে তখনও অস্ত্র-সমন্বিত দর্শন করিয়া ভীষণাকারে দশ দিক পরিপূর্ণ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে হঠাৎ ভস্মীভূত করিবে, জাজ্বল্যমান বুঝিতে পারিলেন, বিনা পৃষ্ঠ প্রদর্শনে তখন জীবনের আশা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তথাপি অবাত-কম্পিত বিশাল শাল তরুর ন্যায় ঊর্দ্ধদৃষ্টে অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন!! যে মৃত্যুর নাম শ্রবণেও মনোমধ্যে বিষম ভীতি সমুৎপন্ন হয়, সমস্ত জীবন দুঃসহ দুঃখসন্তাপে বিদগ্ধ হইলেও যে মৃত্যুর নামে জীবগণ শশব্যস্ত হয়, সেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ভীমসেন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন!! যে প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত স্নেহময়ী জননী এক মুষ্টি তণ্ডুলের বিনিময়ে নয়নের আলোক-সদৃশ তনয়কেও দুর্জ্জনের হস্তে বিসর্জ্জন করিতে পারে, যে প্রাণ-রক্ষার জন্য পুত্র স্বকীয় জনকের গলদেশে শাণিত কর্ত্তরিকা সংবিদ্ধ করিতেও সঙ্কুচিত হয় না, এবং যে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত জগৎ ধর্ম্মের পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, সেই প্রাণ—সেই প্রিয়তম পদার্থ প্রাণকেও সত্য-রক্ষার নিমিত্ত, বীরধর্ম্ম প্রতি-পালনের নিমিত্ত অকুতোভয়ে তৃণবৎ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত রহিলেন!! ধন্য ভীমসেন! ধন্য তোমার প্রতিজ্ঞা, ধন্য তোমার বীরত্ব!! "দ্যাখরে জগৎ মেলিয়া নয়ন, দ্যাখরে চন্দ্রমা, দ্যাখ্‌রে গগন, স্বর্গ হতে সব্ দ্যাখ দেবগণ, অনল অক্ষরে রাখ গো লিখে" *। ইহা হইতেও যদি কবির প্রতিজ্ঞা আরও দীপ্তি পাইতে পারিত, ভীমসেনের বীর্য্য-বত্তা সম্বন্ধে তাহাও বর্ণে বর্ণে শোভা পাইত। যাহা হউক, যখন বাসুদেব স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, মৃত্যুও বীরের হৃদয়ে ভীতি সমুৎপাদন করিতে অকৃত-কার্য্য হইল, তখন তিনি ব্যগ্রচিত্তে এবং দ্রুতপদে ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং অসাধারণ কৌশলপ্রভাবে সেই ভীষণ অস্ত্রের অমোঘ শক্তিকেও ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগঙ্গাধর বসু।

---

* "জাতীয় সঙ্গীত" নামক গীতি-পুস্তিকায় স্বদেশানুরাগোদ্দীপক এইরূপ অনেক গুলি গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সমর শেখর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"Let us then be up-and-doing,
With heart for any fate,
Still achieving, still pursuing,
Learn to labour and to wait."—LONGFELLOW.

আমি কে? সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমি যেরূপ আসিয়াছি, সেইরূপই যাইব। সংসারের তাহাতে কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না?—এখন যেরূপ রহিয়াছে—তখনও সেইরূপ থাকিবে—চিরকাল সেইরূপ থাকিবে। আমার জীবনে সংসারের কিছুই লাভ নাই—মৃত্যুতেও কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। তবে আমার সংসারের সহিত সম্বন্ধ কি? আমি আশ্রয়হীন, সম্বলহীন, একাকী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনর্গল রোদন করিতেছি; হৃদয়-নিহিত প্রধূমিত অগ্নিকে দ্বিগুণতর উৎসাহিত করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শত শত উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস নির্গত হইতেছে, নয়নবিগলিত অজস্র অশ্রুধারে বক্ষ প্লাবিত হইতেছে, সংসার ভ্রমেও তাহা একবার দেখিতেছে না। যাহার নিকট আশ্রয় যাচ্ঞা করি—যাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, সেই ঘৃণা করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়; সেই অবিশ্বাস করিয়া উপহাস সহকারে গমন করে! দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই—দুস্তর পাপপঙ্কে লিপ্ত হই নাই,—ছলনা—মিথ্যা কথা—চৌর্য্য—কিছুই জানি নাই—কিছুতেই দূষিত হই নাই,—তবে কেন সকলে ঘৃণা করে? দোষী নই, তবে কেন অকারণ সকলের ঘৃণা সহিব?—অবিশ্বাসের বিষময় বাণে নিরন্তর বিদ্ধ হইব? সংসারের যখন এইরূপ আচরণ, তখন ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তখন কেন আমি ইহার জন্য কাঁদিব? স্বজাতি, হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু—সেই স্বজাতি লইয়া জন্মভূমি; আবার জন্মভূমি লইয়াই সংসার। স্বজাতি হারাইয়া জন্মভূমি হারাইয়াছি, জন্মভূমি হারাইয়া সংসার হারাইয়াছি। নতুবা আজ সংসারের জন্য কাঁদিব কেন? নতুবা আজ আমার সহিত সংসারের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে কেন? নতুবা যাহাকে আপনার বলিয়া ভাল বাসি, সেই জন কেন আমাকে শত্রু বলিয়া ঘৃণা করিবে? এখনও সেই হিন্দু মুসলমানে কঠোর জাতিভেদ রহিয়াছে; এখনও সেই বিংশতি কোটী হিন্দুসন্তানের

মধ্যে একজন বলিয়া পরিচয় দিতেছি;—কিন্তু সেই মহান্ জাতীয়ভাব কোথায়? যাহার দুর্ভেদ্য সহানুভূতি-সূত্রে প্রতি হিন্দুভ্রাতার হৃদয় দৃঢ়-সংবদ্ধ ছিল, যাহার এক বৈদ্যুতিক বলে সকলের হৃদয় সমভাবে স্পন্দিত হইত, তাহা কই? যদি তাহা থাকিবে, তবে আজ আমার এ দশা কেন? তবে যাহার জন্য কাঁদিতেছি, সেই কেন আমাকে ঘৃণা করিবে?—সেই কেন অবিশ্বাস করিবে? তবে সহস্র জনের মধ্যে থাকিয়া একাকী কেন? সংসারকে মরুময় শূন্যময় বোধ হইতেছে কেন? হৃদয়ের সে প্রিয়তম রত্ন স্বজাতি হারাইয়াছি; সেই সঙ্গে সকলই হারাইয়াছি। যখন সে সংসার হারাইয়াছি, তখন সে সংসারের আমি কে?—সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? সতীশ! আর কাঁদিও না।—এ জীবশূন্য মরুভূমিতে কাঁদিয়া কি হইবে? তুমি যাহাদের জন্য কাঁদিতেছ, তাহাদের মধ্যে কেহই তোমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে না—কিন্তু তোমার পার্শ্বে এক জন কাঁদিতেছে! সতীশ! তোমার যে দশা আমারও তাই। তবে চল ভাই! এ মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। বনে যাইয়া সকলে হৃদয় খুলিয়া কাঁদিব;—তুমি কাঁদিবে, তোমার এক জন কাঁদিবে,—আমিও কাঁদিব, আমারও একজন কাঁদিবে; আমাদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া বন্য পশু পক্ষী কাঁদিবে। সে ক্রন্দনে সুখ আছে। মানবের হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা ভুলিয়া যাইয়া বন্য জীব জন্তুর সহিত এক অভিন্ন সহানুভূতি-সূত্রে আবদ্ধ হইব। তবে চল, ভাই! এখনি আমরা বনে যাই।

না, সতীশ! বনে যাইয়া কাজ নাই।—বনে না যাও যখন রোদন করিতে হইবে, তখন তাহাতে ফল কি? যখন জানিতেছি চিরজীবনই রোদন করিতে হইবে, তখন বনে যাইয়া কি হইবে? জীবন অমূল্য ধন। সেই অমূল্য ধন যখন পাইয়াছি, যত দিন না তাহা হইতে বিচ্যুত হই, তত দিন তাহার কার্য্য করি। কেন বৃথা আলস্যে কাল হরণ করিয়া তাহার ক্ষয় করিব? সংসার হারাইয়াছি, অবশ্য কখন না কখন পুনর্লাভ করিব; কিন্তু এ অমূল্য রত্ন এক বার হারাইলে আর ত পাইব না। মনের বাসনা অনন্ত কালের জন্য মনেই রহিয়া যাইবে;—কার্য্যে ত কখনই পরিণত হইবে না;—তবে এ জীবনে ফল কি? রত্ন পাইয়া যদি তাহার উপযুক্ত ব্যবহার না করিলাম, তবে তাহাতে প্রয়োজন কি? লোকাচারের ভীষণ ভ্রূকুটি-ভয়ে যদি চিরকালই রোদন করিব, তবে মানব-জন্মের সার্থকতা কি? তবে পশু হইতে আমাদের কি প্রভেদ রহিল? সম্মুখে বিশাল কার্য্যক্ষেত্র—অগণ্য ভবিষ্য জীবনের অনন্ত সুখ-বীজ উহাতে অঙ্কুরিত হইতে না হইতে নিষ্ঠুর

লোকাচারের ভীষণ পদ-প্রহারে বিদলিত হইতেছে!—কেহ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না! কেহ তাহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাহাদের উদ্ধার সাধনে সাহসী হইতেছে না! না হউক, তাহার কাল্পনিক সুখের সোহাগে কাল অতিবাহিত করিতেছে; কিন্তু আমার কি সুখ? আমি যখন আজন্ম কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, তখন আমার সে সুখে প্রয়োজন কি? কেন আমি অমূলক সুখের আশায় প্রণোদিত হইয়া মরীচিকায় আত্ম-সমর্পণ করিতে যাইব, আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের পথে কণ্টকারোপিত করিব? এত দিন লোকাচারের নৃশংস অত্যাচার সহ্য করিলাম;—না হয়, আরও কিছু দিন করি—না হয়,চিরজীবনই করি; তথাপি কেন জীবনের মূলমন্ত্র-সাধনে পরাঙ্মুখ হই? লোকে নিন্দা করিবে?—ঘৃণা করিবে?—অবিশ্বাস করিবে?—করুক, অনেক সহ্য করিয়াছি;—আরও করিব; তথাপি নিজ অভীষ্ট-পথে অগ্রসর হইতে কেন বিরত হইব? সম্মুখে কার্য্যক্ষেত্র—ভীষণ শ্মশান—অতি কঠোর যোগসাধনভূমি—চতুর্দ্দিকে স্বজাতীয় ভ্রাতার শত শত শবদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! রাক্ষস লোকাচারের দুর্দ্ধর্ষ পিশাচানুচরগণ বিকট হাস্যে চারি দিকে উন্মত্ত ভাবে বিচরণ করিতেছে!—অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, যখন অগ্রসর হইয়াছি, তখন আর কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইব না। না হয়, এ কঠোর মন্ত্র-সাধনে জীবন উৎসর্গ করিব, তথাপি পাপ লোকাচারকে পরাজয় করিতে যদ্যপি সক্ষম হই, যদ্যপি ভবিষ্য জীবনের সুখের পথ কিয়ৎ পরিমাণে পরিষ্কার করিতে পারি; তাহা হইলে, জীবনের অপব্যয় হইবে না; মানব-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিব। তবে কাঁদি কেন?—না আর কাঁদিব না। সংসারের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিব না—সংসার আমার—আমি সংসারের,—সংসারকে পুনর্ব্বার লাভ করিব। সতীশ! আর কাঁদিও না; আর বনে যাইতে চাহিও না; মূলমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ কর—অবশ্যই তাহার সাধনে কৃতকার্য্য হইবে। তোমার সহায় আছে, সম্বল আছে। তুমি রাজপুত্র, ক্ষত্রিয় সন্তান, যুদ্ধজীবী; তোমার উন্নতির পথ কাহার সাধ্য প্রতিরোধ করে? তোমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এমন ক্ষমতা কাহার? যাও—অগ্রসর হও; সমর তোমার পশ্চাতে আছেন।

দিবা অবসান প্রায়। অস্তগামী দিবাকরের দুই একটী শেষ কিরণ রেখা নীলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গের স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতেছে। উচ্চে অনন্ত তুষাররাশি সূর্য্যরশ্মিস্পর্শে শত শত রামধনুর প্রতিভা বিকাশ করিতেছে; তন্নিম্ন হইতে নিম্নতন স্থান পর্য্যন্ত নির্ঝরিণী-প্রোৎক্ষিপ্ত বাষ্পরাশির গভীর ধূম্রবসনে আবৃত। স্বভাব নিস্তব্ধ ও গম্ভীর।

বায়ুর সংস্পর্শও নাই। বিহঙ্গমকুলের কলরব, দূর-পতিত নির্ঝরের ঝর্ ঝর্ শব্দ একত্রে মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রবণ-সুখকর শব্দ উৎপাদন করিয়া স্বভাবের গাম্ভীর্য্য দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিতেছে। অনন্ত আকাশ নিরবচ্ছিন্ন নীলিমায় মণ্ডিত। কেবল পশ্চিম দিকে এক খানি পাংশুবর্ণ মেঘ পশ্চিমাচলের উন্নত সানুদেশে সংলগ্ন হইয়া যেন গভীর যোগে নিমগ্ন রহিয়াছে। সতীশ প্রকৃতির সেই রমণীয় গম্ভীরমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে একাকী অশ্বারোহণে গমন করিতেছেন। অশ্বরশ্মি দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অনামিকা দ্বারা শিথিলভাবে ধৃত, বামহস্ত অশ্বের পৃষ্ঠদেশে পতিত, শূন্য নয়নদ্বয় নীলাচলের শিখরদেশে সংযত; সকলই আপনাপন কার্য্য করিতেছে, কিন্তু কিছুই করিতেছে না। দক্ষিণ হস্তে ঘোটকের রজ্জু ধরিয়া রহিয়াছেন সত্য, কিন্তু কি ধরিয়া রহিয়াছেন, হস্তদ্বয় কোথায় রহিয়াছে, তাহা কিছুই জ্ঞান নাই। স্থির-ব্যাপিত নয়নে গিরিশৃঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু কি দেখিতেছেন? অনন্ত তুষার-মণ্ডিত শিরোদেশে রামধনু-নিন্দিত নানা রঙ্গের লহরী তরঙ্গায়িত হইতেছে, আবার মুহূর্ত্ত পরেই নিম্নপ্রসারী ধূমময় বাষ্পরাশিতে বিলীন হইতেছে। তিনি কি সেই কবির কল্পনা-বিলসন দর্শন করিতেছেন?—তাঁহার হৃদয়ে যে শত শত চিন্তা উত্থিত হইতেছে,—বর্দ্ধিত হইতেছে, আবার সেই চিন্তা-রাশিতেই বিলীন হইতেছে, তিনি তাহাই দেখিতেছেন; এ বাহ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তিনি কিছুই দেখিতেছেন না। প্রিয় সুশিক্ষিত অশ্ব যেন প্রভুর চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া শূন্যহৃদয়ে অনবহিত পাদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে?—কোন দিকে যাইতেছে?—দুই চক্ষু যে দিকে লইয়া যাইতেছে—সেই দিকেই যাইতেছে। সতীশও সেইরূপ। তিনি কোথায় যাইতেছেন? কি জন্য যাইতেছেন? পদব্রজে কি অশ্বারোহণে যাইতেছেন?—সতীশের এতদ্বিষয়ে কিছুই জ্ঞান নাই; তিনি আপনার চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছেন। তাঁহার স্বকীয় বল নাই—সামর্থ্য নাই—তরঙ্গ যে দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—তিনি সেই দিকেই যাইতেছেন। সূর্য্য অস্তগত হইয়াছে; সমস্ত প্রদেশ অনতিগভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; দূরস্থ পর্ব্বতমালা ধূমরাশিতে আবৃত; বিহঙ্গম-কুল নীরবে আপনাপন নীড়ে সংস্থিত হইয়াছে; পশ্চিম দিক হইতে অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে, তাহার প্রবাহের ক্ষীণতা ও প্রাবল্য অনুসারে দূরপতিত নির্ঝরিণীর কলধ্বনি সুস্পষ্ট ও অস্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হইতেছে; সতীশ তাহা কিছুই দেখিতেছেন না,—কিছুই শুনিতেছেন না। বায়ু ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল, ক্রমে পশ্চিম গিরি-শিরস্থ সুপ্ত মেঘ-খণ্ড জাগরিত হইয়া

ধীরে ধীরে শিখর ছাড়িয়া উন্নত গগনে আপন বিরাট মস্তক তুলিতে লাগিল। অনন্ত আকাশে অনন্ত মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া অসীম লীলা সহকারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বায়ু ক্রমশ প্রবলতর হইল—ক্রমশ মেঘসমূহ গাঢ়তর হইয়া আকাশের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে বাসন্তী সন্ধ্যা প্রাবৃটের গভীর অমানিশায় পরিবর্ত্তিত হইল। সমস্ত জগৎ গভীরতম অন্ধকারে আবৃত হইল। সতীশের এখনও সংজ্ঞা নাই। তিনি আপন চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছেন। কোথায় যাইতেছেন?—কোন্ দিকে যাইতেছেন? কি জন্য যাইতেছেন? চিন্তাতরঙ্গ অনন্ত-বিসর্পী—অনন্তগতিশালী—অনন্ত লীলা-ময়—ইহার কূল নাই—তল নাই। সতীশ এ ভীষণ তরঙ্গে ক্ষুদ্র তৃণমাত্র; ইহা যে দিকে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—তিনি সেই দিকেই ভাসিয়া যাইতেছেন; ডুবিতেছেন—উঠিতেছেন—ভাসিয়া চলিতেছেন—আবার ডুবিতে-ছেন—আবার কিছু দূরে ভাসিয়া উঠিতে-ছেন। তাঁহার দেহ সেই প্রান্তরস্থ অশ্বপৃষ্ঠাসীন; কিন্তু তাঁহার মন অন্য-পথাবলম্বী—অন্য স্থানে সন্নীত। শূন্য-নয়নে পূর্ব্বগগনে চাহিয়া রহিয়াছেন। বপ্রকেলিমত্ত ঘোরদর্শন মাতঙ্গের মত মেঘের পর মেঘ ভীষণ পবন-প্রবাহে তাড়িত হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে নিবিড় অসিত আকাশে রাশীকৃত হইতেছে, তিনি তাহা কিছুই দেখিতেছেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় কল্পনার অন্য এক রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। বাসন্তী পূর্ণিমা রজনী। নির্ম্মল নীলাকাশে পূর্ণশশধর হাস্য করিতেছেন। শশ-ধরের হাস্যে সমস্ত প্রকৃতি হাসিতেছে। নক্ষত্রগণ আপনাদের প্রভুকে বেষ্টন করিয়া আনন্দে মধুর নিক্কণে সঙ্গীত আলাপন করিতেছে; সুধাংশু-ধবলিত নবকিসলয়শালী সুরভি মুকুলালঙ্কৃত পাদপসমূহের নিভৃত শাখায় নিদ্রিত কোকিল কোকিলা থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের স্বরে স্বর যোজনা করিয়া এক এক বার গাহিয়া উঠিতেছে। সুমন্দ সমীরণ বিকসিত পুষ্পসকলের মকরন্দ হরণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। সতীশ সেই বিমল কৌমুদী-ময় নিশীথ-সময়ে সেই প্রান্তর-মধ্যে একাকী পদচারে ধীর গমনে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার দেহ চিন্তা-ভারাক্রান্ত; পদদ্বয় তাহার ভারে প্রতিক্ষণে স্খলিত হইতেছে। তিনি সেই স্খলিত পদে উদাস হৃদয়ে সেই বিজন প্রান্তর দিয়া ধীরে ধীরে যাইতে-ছেন। যে দিকে চাহিতেছেন, সেই দিক হইতেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর উদাসভাব দ্বিগুণিত হইতেছে। পৃথিবীর দিকে চাহিলেন;—নির্জ্জন প্রান্তর ইতস্ততঃ-সঞ্জাত নিশ্চল বৃক্ষ-রাজিকে হৃদয়ে ধরিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তিনি-যেন একাকী

এক স্থলে নীরবে নিঃস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, প্রান্তর তাঁহাকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে। তিনি চমকিত হইলেন—চমকিত হইয়া এক বার আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ঃ—অনন্ত নীলাম্বুময় গগন-সাগরে চন্দ্রদেব একাকী ভাসিয়া চলিয়াছেন; নক্ষত্রগণ ক্ষীণ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার অনুগমন করিতেছে। সতীশকে উদাসীন দেখিয়া চন্দ্র যেন সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল; অমনি কে তাহার ভিতর হইতে সতীশকে ডাকিয়া বলিল "সতীশ! কাঁদিও না। এস আমার নিকট এই চন্দ্রলোকে এস; এখানে আসিলে আর তোমাকে কাঁদিতে হইবে না, পৃথিবীর অসীম দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইবে।" সতীশ আর থাকিতে পারিলেন না; পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রলোকে যাইতে তাঁহার একান্ত বাসনা হইল। তিনি সেই উচ্চ চন্দ্রলোকে উঠিতে যাইবেন, এমন সময়ে কাহার করুণ শোকস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিলেন, কে যেন হতাশাব্যঞ্জক স্বরে বলিতেছিল "আমি কে? সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ কি?——" এই ঔদাস্য-পূর্ণ বাক্যে সতীশ নিঃস্পন্দভাবে হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন এবং উন্নত কর্ণে সেই বাক্য সমুদায় শুনিতে লাগিলেন। সুশব্দায়মানা বীণাধ্বনির ন্যায় সেই মহাপুরুষের করুণ কণ্ঠস্বর সতীশের হৃদয়ে গাঢ় হতাশান্ধকার ঢালিয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সতীশ আর থাকিতে পারিলেন না; তিনি চন্দ্রলোকের কথা ভুলিয়া যাইয়া অন্য মনে সেই স্বর-নির্দ্দিষ্ট দিকে ছুটিয়া যাইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়াই অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সম্মুখেই সেই মহাপুরুষের দেবমূর্ত্তি! সুকুমার যুবক, গৌরাঙ্গ গৈরিক-রঞ্জিতবসন-পরিহিত উন্নত বক্ষঃস্থলের বামার্দ্ধ আবৃত করিয়া গ্রন্থিবদ্ধ উত্তরীয় শুভ্র যজ্ঞোপবীতের সহিত সুমন্দ বায়ুবেগে উড়িতেছে—পড়িতেছে, এবং কখন বা স্কন্ধদেশে যাইয়া সংসক্ত হইতেছে। নিবিড় কৃষ্ণ রুক্ষ সঙ্কীর্ণ কেশপাশ ঈষৎ কম্পিত। আয়ত ললাটদেশ ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত। বিশাল নয়নদ্বয় হইতে অজস্র অশ্রুবারি বিগলিত হইয়া সঙ্কীর্ণ গুল্ফ ও শ্মশ্রু ভিজাইয়া উত্তরীয়ের সহিত মিলাইয়া যাইতেছে! সতীশ সেই যুবকের বিষাদ-মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। যুবকের সেই সুন্দর তর্কাবলি তাঁহার অন্তরে গভীর অঙ্কিত হইতে লাগিল। সেই পূর্ণচন্দ্র-কর-প্রতিভাত প্রান্তরস্থ বৃক্ষতলাসীন মহাপুরুষের বাক্য-সুধা পান করিতে করিতে সতীশ ক্রমে তন্ময় হইয়া পড়িলেন—নিজের বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া যাইয়া সেই তরুণ তাপস মূর্ত্তিতেই লীন হইয়া যাইলেন। তাপস সংসার ছাড়িয়া বনে যাইতে চাহিলেন, সতীশকে তাঁহার অনুগামী হইতে কহিলেন—সতীশ

তাহাই করিলেন। আবার কি মনে হইল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। সতীশকে ফিরিতে বলিলেন—সতীশ অমনি ফিরিয়া আসিলেন। সেই মহাপুরুষের হৃদয় এবার অন্যতর মহান্ ভাবে উদ্বোধিত হইল। প্রথমে নৈরাশ্য,—তাহার পর ঔদাস্য; ঔদাস্যে সংসারকে বিষময় বলিয়া বোধ হইল; তিনি সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিলেন—অকস্মাৎ আবার নূতন আশার উদয়! নূতন আশার বৈদ্যুতিক বলে উত্তেজিত হইয়া ধীরে ধীরে সতীশকে উৎসাহিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সতীশ তাঁহার ওজস্বিতাপূর্ণ তর্কে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার অনুধাবনে দৌড়াইলেন—আর সেই মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন না! সেই বিমল সুধাংশু-শোভিত প্রান্তর অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল! অকস্মাৎ বিদ্যুতের বিকট-হাস্যে সমস্ত জগৎ চমকিত হইল—নিবিড় জলদ-সমূহের ঘোর তীব্র নাদে দিগ্বিদিক কম্পিত হইল! সতীশ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় অকস্মাৎ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চমকিয়া উঠিলেন!

শ্রীয—

নাটক চন্দ্রিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কৈশিকী, সাত্বতী, আরভটী ও ভারতী।

অথ কৈশিকী বৃত্তি।

যে বৃত্তি অতি মনোহর স্ত্রীজনোচিত ভূষণে বিভূষিত, রমণীবহুলা নৃত্যগীতাদিতে পরিপূর্ণা ও ভোগাদি বিবিধ-বিলাস যুক্তা তাহার নাম কৌশিকী-বৃত্তি। এই বৃত্তি আদ্য রস-প্রধান নাটকের উপযোগিনী।

অথ সাত্বতী বৃত্তি।

যে বৃত্তি দ্বারা শৌর্য্য, দান, দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রভৃতি বীরোচিত বিবিধ গুণান্বিতা আনন্দ বিশেষোদ্ভাবিনী, সামান্যবিলাসযুক্তা, বিশোকা ও উৎসাহ বর্দ্ধিনী বাগভঙ্গী নায়ক কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়, তাহার নাম সাত্বতী-বৃত্তি। বীররস প্রধান নাটকে ইহার আবশ্যকতা।

অথ আরভটী।

মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, আঘাত, প্রতিঘাত ও বন্ধনাদি বিবিধ রৌদ্রোচিত কার্য্যজড়িত যে বৃত্তি তাহার নাম আরভটী। রৌদ্ররস বর্ণন স্থলে এই বৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

অথ ভারতী।

সাধুভাষাবহুলা বৃত্তির নাম ভারতী-বৃত্তি। বীভৎস রস বর্ণন স্থলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

এখন বক্তব্য এই যে, নাটককর্ত্তা গ্রন্থ গুম্ফন করিতে গিয়া যদি আদ্য বস-প্রধান নাটক লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উক্ত কৈশিকী বৃত্তির সমস্ত ব্যাপারই তাঁহার লেখনী স্বতই উদ্গাব করিবে, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আদ্যরস বর্ণন করিতে গিয়া তাল ঠোকা, মুদ্গর ঘূরাণ বা অসিক্ষেপ প্রভৃতি বীরোচিত বিষয় কেহই বর্ণন করেন না, সুতরাং এরূপ স্থলে কৈশিকী বৃত্তি স্বতই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব কৈশিকী বৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আদ্যরসের অবতারণা করিবার প্রয়োজন কি? সাত্বতী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির পক্ষেও ঠিক এইরূপ।

অথ উপক্ষেপ। *

অভিনয়-কার্য্যের পূর্ব্বে সংক্ষেপে সমস্ত নাটকীয় বিবরণ কথনের নাম উপক্ষেপ।

পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া, রঙ্গস্থলে নট, নটী, সূত্রধার অথবা পারিপার্শ্বিক কর্ত্তৃক উপক্ষেপের উল্লেখ হইত। আজি কালি মুদ্রা যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, এখন আর সেরূপে নাটকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই; এখন উক্ত বিবরণ মুদ্রিত করিয়া রঙ্গ-চত্বরে সামাজিকদিগের হস্তে এক এক খণ্ড দিলেই যথেষ্ট হইল।

পূর্ব্বে সকল নাটকাভিনয়েই যে নটাদি কর্ত্তৃক উপক্ষেপ উপন্যস্ত হইত, এরূপ নহে; কারণ সকল নাটকে উপক্ষেপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বেণীসংহারে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্ত উপক্ষেপ ভীম কর্ত্তৃক উপন্যস্ত হইয়াছে। যথা, ভীমঃ—

"লাক্ষা গৃহানল-বিষান্ন-সভা-প্রবেশৈঃ
প্রাণেষু বিত্তনিচয়েষু চ নঃ প্রহৃত্য।
আকৃষ্য পাণ্ডব-বধূ পরিধান কেশান্
স্বস্থা ভবন্তি ময়ি জীবতি ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ* ?"

অথ প্ররোচনা।

যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা অভিনয় দর্শনে সামাজিকদিগের প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্ররোচনা। ইহা সূত্রধার, নট, পারিপার্শ্বিক কিম্বা নটী দ্বারা বিগীত হইয়া থাকে।

অথ নেপথ্য।

রঙ্গস্থলের পশ্চাদ্ভাগে যে একটী গুপ্ত স্থান থাকে, তাহার নাম নেপথ্য। অলঙ্কারবিৎরা এই স্থানে থাকিয়া, পাত্রগণের বেশ ভূষাদি করিয়া দেন। যখন রঙ্গ মধ্যে আকাশবাণী, দৈবী বাণী, অথবা অন্য কোন মানুষী বাণীর প্রয়োজন হয় যে, বাণীরূপ পবন-হিল্লোলে নাটকীয় রস তরঙ্গিত ও উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তখন নেপথ্য হইতেই ঐ বাক্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

* Programme.

* এই উপক্ষেপ কোন পাত্র কর্ত্তৃক উপন্যস্ত না হইয়া, সূত্রধার প্রভৃতি অভিনয় প্রয়োক্তৃগণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইলেই ভাল হয়।

অথ বস্তু।

নাটকীয় ইতিহাস অথবা কোন বিবরণ-বিশেষের নাম বস্তু। বস্তু দুই প্রকার; যথা—আধিকারিক বস্তু ও প্রাসঙ্গিক বস্তু।

অথ উদ্দেশ্য বীজ।

গুম্ফিত আখ্যায়িকার সমগ্র মর্ম্মের নাম উদ্দেশ্য বীজ। কথিত বস্তু যখন গ্রন্থাকারে পর্য্যবসিত হইবে, তখন দেখিতে হইবে যে, ঐ বস্তু দ্বারা আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে কি না—যদি তাহা না হয়, তবে উহা নাটক বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

অথ আধিকারিক বস্তু।

যিনি সমস্ত ইতিবৃত্তের প্রভু অর্থাৎ প্রধান নায়ক, তাঁহাকে অধিকারী কহে। এই অধিকারীকে আশ্রয় করিয়া যে বস্তু বিরচিত হয়, তাহার নাম আধিকারিক বস্তু; যেমন রামাভিষেক।

অথ প্রাসঙ্গিক বস্তু।

এই আধিকারিক ইতিবৃত্তকে রসপুষ্ট করিবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে যে বৃত্ত লিখিত হয়, তাহার নাম প্রাসঙ্গিক বস্তু; যেমন বালরামায়ণে সুগ্রীব বিভীষণাদির চরিত।

অথ মুখ্য উদ্দেশ।

প্রসঙ্গক্রমে নাটকমধ্যে অধিক শাখা প্রশাখাই বিস্তৃত হউক, আর গর্ভাঙ্কদ্বারা আখ্যায়িকার অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ই বা বর্ণিত হউক, যতই কেন হউক না, মূল প্রস্তাবকে নিষ্কম্প রাখিয়া, তাহাকে রসপুষ্ট ও বিস্ফারিত করাকেই মুখ্য উদ্দেশ কহে।

অথ অভিনয় †।

কাল-কৃত অবস্থাবিশেষের যে অনুকরণ, তাহার নাম অভিনয়। অবস্থা—যথা;—রামবনবাস, রামাভিষেক, সীতানির্ব্বাসন, দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ ইত্যাদি।

অথ পাত্র ‡।

যাঁহারা রাম যুধিষ্ঠিরাদির রূপ ধারণ করিয়া কথিত অবস্থা সকলের অনুকরণ করেন, তাঁহাদিগকে পাত্র কহে। নাটকের যে সকল অংশ স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়, যদি সেই সকল অংশের পাত্র বাস্তবিক স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে আর ভাব, হাব, হেলা প্রভৃতি স্ত্রীগণের যৌবন-সম্ভূত অষ্টাবিংশতি-প্রকার অলঙ্কার তাহাদের অভ্যাস

---

† মল্লিনাথ বলেন—রসাভিব্যঞ্জক চেষ্টাবিশেষের নাম অভিনয়। অভিনয়ের এই নিয়মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এ কথা পণ্ডিতবর হল্ সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন। যথা—Far better says Mallinatha; as "অভিনয়ো রসভাবাদি-ব্যঞ্জক-চেষ্টা-বিশেষঃ।"

‡ ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিব্বোক, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিভ্রম, ললিত, মদ, বিহৃত, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতূহল, হসিত, চকিত ও কেলি। এই আটাশ প্রকার অলঙ্কারের লক্ষণ ও উদাহরণ উজ্জ্বল রসাশ্রিত লহরীতে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

করিয়া, আয়ত্ত করিতে হয় না। পুরুষেরা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া অভ্যাস দ্বারা ঐ ভাবাদি আয়ত্ত করিলেও রঙ্গস্থলে দেখাইবার সময়ে রসজ্ঞ পণ্ডিতেরা সে গুলিকে অভ্যস্ত বলিয়া বুঝিতে পারেন, এজন্য স্ত্রীলোক দ্বারা স্ত্রীলোকের অংশ দেখাইতে পারিলে, পুরুষ অপেক্ষা উহা যে সুন্দর হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তবে এ বিষয়ের জন্য সচ্চরিত্র স্ত্রী পাত্র পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোক লইয়া নাট্যামোদ দেখান অপেক্ষা না দেখানই ভাল, এই বিবেচনায় পূর্ব্বতন কুশীলবেরা ভ্রকুংশ * সাজিয়া স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয় দ্বারা ব্যক্ত করিত।

অথ অভিনয় প্রকার।

অভিনয় চারি প্রকার; যথা—— আঙ্গিকাভিনয়, বাচিকাভিনয়, আহার্য্যাভিনয় ও সাত্ত্বিকাভিনয়।

অথ আঙ্গিকাভিনয়।

পাত্রবিশেষ কেবল অঙ্গভঙ্গী দ্বারা যে অভিনয়-কার্য্য সমাধান করেন, তাহার নাম আঙ্গিকাভিনয়। যেমন সতী নাটকে নন্দী। সতী শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে মহাবীর নন্দী যখন ত্রিশূল হস্তে করিয়া, রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে, তখন আঙ্গিকাভিনয় ভিন্ন তাহার আর কি সম্পত্তি আছে যে, সে তদ্দ্বারা সামাজিকদিগের মনস্তুষ্টি করিতে সমর্থ হইবে?

অথ বাচিকাভিনয়।

কেবল বাগ্বিন্যাস দ্বারা যে অভিনয় কার্য্য সমাহিত হয়, তাহার নাম বাচিকাভিনয়। যথা—তোত্‌লা গুরুমহাশয়। যিনি তোতলা গুরু সাজিবেন, বাচিকাভিনয় ভিন্ন তাঁহাকে আর কোন অভিনয়ই করিতে হয় না।

অথ আহার্য্যাভিনয়।

বেশভূষাদি-নিষ্পাদ্য যে অভিনয়, তাহার নাম আহার্য্যাভিনয়। যেমন উদয়পুরের রাজার অঙ্গ-রক্ষক ছট্টুরাম তেওয়ারী। এই তেওয়ারী অভিনয়-স্থলে যখন রাজার সহিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে, তখন ইহাকে কথাবার্ত্তা কিছুই কহিতে হয় না। কেবল আহার্য্য অভিনয় দ্বারা আত্মকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া রঙ্গস্থল হইতে নিষ্ক্রমণ করিতে হয়।

অথ সাত্ত্বিকাভিনয়।

* স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প ও অশ্রু প্রভৃতি দ্বারা যে অবস্থানুকরণ, তাহার নাম সাত্ত্বিকাভিনয়। যেমন সতীর মৃত দেহ দেখিয়া নন্দীর বৈবর্ণ্য ও অশ্রুপাত।

অথ বিমিশ্রাভিনয়।

একমাত্র পাত্র দ্বারা যখন কথিত অভিনয়ের মধ্যে দুটী কি তিনটী অথবা সমস্ত গুলিই প্রদর্শিত হয়, তখন

---

* নাট্যশাস্ত্রে স্ত্রীবেশধারী পুরুষকে ভ্রকুংশ কহে।

* স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথবেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃস্মৃতাঃ॥

তাহাকে বিমিশ্রাভিনয় কহে। যেমন নীলদর্পণে একমাত্র সাহেব দ্বারা আঙ্গিক, বাচিক ও আহার্য্য এই ত্রিবিধ অভিনয়ই প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

অথ অঙ্গাঙ্গিভেদ।

নাটকের মধ্যে যিনি প্রধান নায়ক, তাঁহাকে সমস্ত ইতিবৃত্তের অঙ্গী কহে। যেমন রামাভিষেকে রাম, দুর্গেশ-নন্দিনীতে জগৎসিংহ ইত্যাদি।

অথ অঙ্গ।

অঙ্গীর কার্য্যসাধক পাত্রগণকে অঙ্গ কহে। যেমন বীরচরিতে সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ ইত্যাদি।

অথ বৈষম্য-পাতদোষ।

নাটকে অঙ্গীকে অধোনত করিয়া অঙ্গের প্রাধান্য রক্ষা করিলে, বৈষম্য-পাত নামে দোষ হইয়া থাকে। যেমন মেঘনাদ-বধে ইন্দ্রজিৎ-বধাংশের প্রধান অঙ্গীস্বরূপ লক্ষ্মণের অবনতি-সাধন করিয়া, কবি অঙ্গস্বরূপ বধ্য ইন্দ্রজিতেরই প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য ঐ স্থানে বৈষম্যপাত নামে দোষ হইয়াছে।

অথ অঙ্ক-লক্ষণ।

নাটকের এক একটী বিভাগকে এক একটী অঙ্ক কহে। অঙ্কে বর্ণিত নায়ক-নায়িকাদি পাত্র-পরম্পরার চরিত ও আচার ব্যবহারাদি, দর্শক বা পাঠক-দিগের প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে; শব্দার্থগুলি বিশদ হইবে এবং অনাবশ্যক একটী কার্য্যেরও উল্লেখ থাকিবে না। কিন্তু আবশ্যক কার্য্য বিবিধপ্রকার হইলেও সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে তাহাদের উল্লেখ থাকিবে। অঙ্কমধ্যে অধিক পদ্যের সমাবেশ দূষণাবহ।

অথ অঙ্কাবয়ব।

নাটকের অবয়ব বৃহৎ হইলে, এক রজনীতে অভিনয়-কার্য্য সমাহিত হইবে না বলিয়া, দশ অঙ্কের অধিক অঙ্কে নাটক গুম্ফন-বিধি ও যুক্তি, উভয়ই বিরুদ্ধ। প্রথম অঙ্কের অবয়ব যতটুকু হইবে, দ্বিতীয়াঙ্কের অবয়ব তদপেক্ষা ন্যূন হইবে, এইরূপে ক্রমে ক্রমে অঙ্কের অবয়ব কম করিলে, অভিনয়-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়।

অঙ্কাবয়ব ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র না করিলে অভিনয় দর্শনে সামাজিকদিগের উৎসাহ থাকে না। তাহারা রাত্রি-জাগরণ করিয়া, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত অভিনয় দর্শন করেন; কিন্তু, যদি সেই সঙ্গে ইহা জানিতে পারেন যে, এ নাটকের অঙ্কাবয়ব ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে, তাঁহাদের শ্রবণে তত উৎসাহ থাকে না। অঙ্ক ছোট করিবার আরও একটী বিশিষ্ট কারণ এই যে, অভিনয় কার্য্য যত শেষ হইতে থাকে, রঙ্গস্থলে পাত্রগণে ও রঙ্গ-চত্বরে দর্শকদিগের সংখ্যা তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এজন্য অঙ্কাবয়ব ক্রমে ক্রমে ছোট করাই কর্ত্তব্য। অঙ্ক-সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা মহামুনি ভরতেরও এই মত।

অথ বিরোচক।

নাটকের মধ্যে যে সকল বিষয়ের বর্ণন করা নিষিদ্ধ, তাহাদের নাম বিরোচক।

উদাহরণ।

দূরাহ্বান, অতি বিস্তৃত যুদ্ধ, রাজ্য-দেশাদির বিপ্লব, প্রবল বাত্যা, দন্তচ্ছেদ, নখচ্ছেদ, অশ্বাদি বৃহৎকায় জন্তুর অতি-বেগে গমন, নৌকা পরিচালন ও নদীতে সন্তরণ প্রভৃতি অঘটনীয় বিষয় সকল অঙ্ক-মধ্যে বর্ণনীয় নহে। তবে চিত্রপট দ্বারা দেখাইতে পারিলে অঙ্কমধ্যে বিরোচক বিশেষের সমাবেশ তত দূষণাবহ হয় না।

অথ অপাত্র।

মূক, তোতলা, অতি স্থূলকায়, অন্ধ, কাণ, খঞ্জ, চিররোগী, শিত্ররোগী, কুষ্ঠী, মূর্খ ও নীচ লোকদিগকে নাট্যশাস্ত্র প্রণেতৃগণ অপাত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহারা অভিনয়-কার্য্যের নিতান্ত অযোগ্য।

অথ নায়ক-নির্ব্বাচন।

বিনয়, শীলতা, বদান্যতা, দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা, শৌর্য্য, স্থিরত্ব, প্রিয়ভাষিতা লোকরঞ্জকতা, মিতভাষিতা, বাগ্মিতা, ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণ সমূহ যে সদ্বংশ-সম্ভূত যুবাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, কবি তাহাকেই নায়ক-পদে অভিষিক্ত করিবেন। নায়কের ন্যায় নায়িকারও যথাসম্ভব ঐ সকল গুণ থাকা আবশ্যক। এরূপ নায়ক নায়িকা নাটকেরই যোগ্য। প্রহসনাদিরূপক বিশেষের নায়কাদি অন্য প্রকার।

অথ পরিচ্ছদ-বিবেক।

নাটকান্তর্গত কোন পাত্রের কিরূপ পরিচ্ছদ, তাহা গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উল্লিখিত হয় না এবং কোন প্রাচীন নাটককারও তাহার উল্লেখ করেন নাই, তবে কোন কোন নাটকের কোন কোন স্থানে বেশ-পরিবর্ত্তনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন কর্ণাট-কুমার নাটকে "তার পর কর্ণাটেশ্বরের সন্ন্যাসীবেশে প্রবেশ" অথবা হরিশ্চন্দ্র-চরিতে "দরিদ্রবেশে হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ" ইত্যাদি।

যখন এরূপ অবস্থা ভিন্ন স্পষ্টরূপে পরিচ্ছদের কথা কোন স্থানে উল্লিখিত থাকে না, তখন বেশ-রচক পাত্রগণের স্বভাব ও অবস্থা বিচার করিয়া বেশ রচনা করিয়া দিবেন। নেপথ্য কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য এক জন রসজ্ঞ বেশ-বিধায়কের আবশ্যক। বেশ-বিধানের গুণে রঙ্গস্থলবর্ত্তী রামকে দেখিয়া যদি অযোধ্যাধিপতি ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া যদি অজাতশত্রুর সহোদর বীর-চূড়ামণি তৃতীয় পাণ্ডব বলিয়া দর্শকদিগের প্রতীতি না হইল, তবে আর অভিনয়ের প্রয়োজন কি?

অথ দেশকাল-প্রবাহ।

অতি দীর্ঘকাল-সম্পাদ্য ঘটনা সকল নাটকে অল্প কালের মধ্যে বর্ণনা করা যদিও দূষণাবহ নহে, তথাপি নাটকে

দেশগত ও কালগত বৈলক্ষণ্য বর্ণন করা অতিশয় অনুচিত।

মনে কর, লঙ্কাধামে লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া, হতজ্ঞান হইয়াছেন; ইতোমধ্যে সুষেণ নামক বৈদ্যরাজ ছয় মাসের পথ হইতে তিন ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ পাইয়া লঙ্কাপুরীতে আগমন পূর্ব্বক কিরূপে বিশল্যকরণী নামক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। এবং অঞ্জনা-নন্দন হনুমানই বা কিরূপে ভারতবর্ষের দক্ষিণ বিভাগের শেষ হইতে অতি অল্প কালের মধ্যে একবারে পশ্চিম সীমায় গন্ধমাদন কুলাচলে আগমন করিয়া, ঔষধ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এজন্য দেশ ও কাল-গত বৈলক্ষণ্য এখানে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। মহাকবি বাল্মীকি কালগত এই বৈলক্ষণ্য নিবারণের জন্য সূর্য্যদেবকে হনুমানের কক্ষদেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

এই রূপ অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে শকুন্তলাকে পরিহারের পর যখন মহারাজ দুষ্মন্ত শাপ-বিমোচক অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হইলেন, তখনি তাঁহার শকুন্তলাকে মনে পড়িল। তিনি অমনি অধীর হইয়া, মৃগয়াচ্ছলে বাহির হইলেন এবং মৃগয়া করিতে করিতে ক্রমে হিমালয় পর্ব্বতের এক দেশে গিয়া একেবারে পঞ্চমবর্ষীয় ঔরস সন্তানের মুখাবলোকন করিলেন। অতএব এখানেও কালগত বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। এস্থলে মহারাজ দুষ্মন্ত হিমালয়ে গিয়া শকুন্তলার পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মুখ না দেখিয়া যদি শকুন্তলাকে গর্ভ-ভরে অলস দেখিতেন ও তথা হইতে সেই অবস্থায় আনিয়া যদি ভরতকে ক্রোড়ে করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর কাল-গত বৈলক্ষণ্য ঘটিত না; তখন ঐ বর্ণন যে কত মাধুর্য্য ব্যক্ত করিত, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গের অবিদিত থাকিত না।

অথ স্বর-বিবেগ।

উদাত্ত, অনুদাত্ত, তার এই তিন প্রকার স্বরে জগতের সমস্ত স্বর-কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। আঘাত প্রতিঘাতে যত প্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, সমস্তই এই ত্রিবিধ স্বরের অন্তর্গত; যদি কোন ঘটনা ক্রমে ইহার বৈলক্ষণ্য হয়, তাহা হইলেই স্বর বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা অভিনেতা, তাঁহারা যদি রঙ্গস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, দর্শক-মণ্ডলীর সন্তোষ-সম্পাদনার্থ আপনাদের স্বাভাবিক স্বর গোপন পূর্ব্বক উদাত্তের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম অনুদাত্ত স্বরে কথা বার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে অভিনয়-কার্য্য অতিশয় বিরক্তিজনক হইয়া উঠে। তখন দর্শকশ্রেণী রঙ্গ-চত্বর পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন। অভিনয় দেখিতে তাঁহাদের আস্থা অথবা উৎসাহ থাকে না। তবে যাঁহারা সহৃদয় ও রসজ্ঞ নহেন, তাঁহারাই কেবল রঙ্গস্থলের পার্শ্ববর্ত্তী কোন কাষ্ঠ-পুত্তলিকা বা প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় রঙ্গ-চত্বরে উপস্থিত থাকেন। ফল,

কথা এই যে, অভিনয় করিবার সময়ে পাত্রগণের স্বরবৈলক্ষণ্য অত্যন্ত নিষিদ্ধ। যথা—

"কার্য্যেষু নাটকাদীনাং"

স্বরভেদো বিড়ম্বনা। ইতি ভট্টমল্লঃ।

"কার্য্যেষু অভিনয়াদিকর্ম্মসু ইত্যর্থঃ।

অথ বিষ্কম্ভক *।

অভিজ্ঞান শকুন্তল, উত্তররামচরিত প্রভৃতি প্রাচীন নাটকে "বিষ্কম্ভক" নামে নাটকাঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্কম্ভকের অভিপ্রায় অতি নিগূঢ় ও সমধিক চমৎকারজনক। ইহার প্রয়োজন ও উপযোগিতা এই স্থানে বিবৃত হইতেছে।

নাটক-মধ্যে বিষ্কম্ভক প্রবেশ করাইবার তাৎপর্য্য এই যে, নাটকীয় বস্তু-রচনার মধ্যে যে সকল অংশ অত্যন্ত নীরস ও আড়ম্বরাত্মক অংশের আদ্যোপান্ত নাটকীয় বস্তু-রচনার মধ্যে যথাবৎ সন্নিবেশিত হইলে নাটকের সামগ্রী পরিপোষ সহৃদয় সামাজিকদিগের বিরক্তিজনক ও অরুচিকর হইয়া পড়ে; এই নিমিত্ত নাটক-প্রণেতৃগণ সেই সকল ঘটনা পাত্র-বিশেষের মুখ হইতে সংক্ষেপে বিনির্গত করাইয়া যে সকল সামগ্রী সুন্দরী ও প্রমাতৃগণের আনন্দদায়িনী, সেই সকল মনোহর সামগ্রীর অবতারণা করিয়াছেন সুতরাং নাটকীয় বস্তু-রচনা লোক-মনোহারিণী হইয়া উঠে।

উদাহরণ।

"তার পর নন্দীগ্রাম হইতে প্রাভঞ্জনি ভরত ও শত্রুঘ্নকে অযোধ্যায় আনিলেন। প্রাভঞ্জনির সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ" ইত্যাদি।

ইতি বিষ্কম্ভক।

এখন হনুমান ভরত ও শত্রুঘ্নকে আনয়ন করিতে যাত্রা করিয়া কোন্ কোন্ পথ দিয়া গেলেন, কোথায়ই ভোজনাদি করিলেন ও কোথাই বা রজনী যাপন করিলেন; নন্দীগ্রামে পৌঁছিলে, ভরত মহাশয় তাঁহাকে অযোধ্যাসম্বন্ধে কি কি কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ভগবান্ দাশরথি চতুর্দ্দশ বৎসর বন-ভ্রমণ করিয়া পশ্চাৎ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পৌঁছিয়াছেন কি না ইত্যাদি ঘটনার কথা এখানে উল্লিখিত হইল না। কিন্তু এ সকল ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল; প্রাভঞ্জনি নন্দীগ্রামে গমন করিলেন আর ভরত ও শত্রুঘ্ন মূক-ভাব অবলম্বন, করিয়া তাঁহার সঙ্গে অযোধ্যায় চলিয়াআসিলেন, ইহা কখনই হইতে পারে না। তবে ঐ সকল ঘটনার উল্লেখ হইল না কেন? তাহার কারণ এই যে, এস্থলে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীরস ঘটনার উল্লেখ করিতে গেলে, নাটক-রচনার পক্ষে নানাবিধ বিঘ্ন ঘটে এবং নাটকীয় ইতিবৃত্তের সামগ্রী পরিপোষও সহৃদয়গণের মনোজ্ঞ হয় না। সুতরাং নাটক

---

* "বিষ্কম্ভকো ভবেদ্ভাবি ভূতবস্তংশ সূচকঃ।"

প্রণেতৃগণ নাটক রচনার সময়ে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ না করিয়া ইতি "বিষ্কম্ভক" বলিয়া একটি নাটকাঙ্গের অবতারণা করিয়া দেন, তাহাতেই সামাজিক-মণ্ডলী বুঝিতে পারেন যে, এই স্থানে কথিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ন্যায় কতকগুলি ঘটনাবিশেষ অন্তর্ভূত আছে।

বিষ্কম্ভকের যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা বঙ্গীয় নাটক-প্রণেতৃগণ ও সহৃদয় যুবকমণ্ডলী অনুভব করিয়া দেখুন। তাহা হইলেই তাঁহারা উহার উপযোগিতা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

অথ নাটক-রচনা-প্রণালী।

নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, যিনি উদ্দেশ্য বস্তু-পরম্পরা হইতে চমৎকারজনক ও অতি সুমধুর বস্তুগুলি নির্ব্বাচন করিয়া একত্র সমাবিষ্ট করিতে যত্ন করেন, স্বাভাবিক সামগ্রী পরিপোষের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন না, নাটক নাটিকাদি দৃশ্যকাব্য লিখিতে প্রয়াস পাওয়া, তাঁহার উচিত নহে। নাটক যে আখ্যায়িকার ন্যায় শ্রব্য কাব্য নহে, ইহা নাটক-প্রণেতার সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা কর্ত্তব্য।

যেমন কোন একটী চিত্রকার্য্য একমাত্র বর্ণ দ্বারা চিত্র করিলে নয়নানন্দকর হয় না, যেমন অন্য কোন অলঙ্কার না পরাইয়া, কেবল একমাত্র মুক্তাহারে সাজাইলে, রমণীগণের নেপথ্য-কার্য্য মনোজ্ঞ হয় না; সেইরূপ কোন নাটকে স্বাভাবিক ঘটনার কিম্বা কোন কল্পিত ইতিবৃত্তের অবতারণা করিতে গিয়া, কেবল মনোহর বস্তুগুলি উপর্য্যুপরি রাশীকৃত হইলে, রচনা কখনই মনোহারিণী হয় না। কুৎসিত রমণীগণের অঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইলেও শঙ্খ সিন্দুরাদি সামান্য ভূষণ দ্বারা যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, নাটকাদি দৃশ্যকাব্যেও সেইরূপ অমৃতময় বস্তুসমাবেশের মধ্যে মধ্যে সামান্য সামগ্রীর পরিপোষ হইলেও সমধিক শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

নাটকের মধ্যে যে সকল পাত্রের প্রবেশ সূচিত হইবে, সহৃদয় নাটককর্ত্তা তাহাদিগের মুখ হইতে এরূপ স্বাভাবিক কথা সকল বিনির্গত করিয়া দিবেন যে, যে সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দর্শক-মণ্ডলীর অন্তঃকরণের ভাব সকল উচ্ছ্বলিত, কখন শোক-ভারে অবনত ও কখন বা স্বারসিক ভাবে আক্রান্ত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ বিতরণ করিতে থাকিবে; এমন কি, অভিনয়-কার্য্য দর্শন ও পাত্রদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, তাহাদিগের চিত্ত রঙ্গস্থলবর্ত্তী পাত্র-পরম্পরার আভিনায়িক ব্যাপারের প্রতি অথবা নাটকস্থ কোন একটী অযথাভূত সামগ্রী পরিপোষের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিবে না।

এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, গ্রন্থকর্ত্তা এরূপ চাতুরী ও নৈপুণ্যের

সহিত পাত্রগণের কথাবার্ত্তা রচনা করিয়া দিবেন যে, যে পাত্রের স্বভাব যেরূপ, তাহার কথাগুলিও যেন ঠিক সেই ভাবে বিরচিত হয়। যদি অন্য-মনস্কতা নিবন্ধন বা অন্য কোন কারণের জন্য ইহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিরচিত গ্রন্থ, নাটক না হইয়া অন্য কোন আখ্যায়িকা হইয়া পড়িবে। নাটকের মধ্যে বাচাল পাত্রের মিত-ভাষিতা, মিতভাষীর বাচালতা, মূর্খের বাক্‌পটুতা, পণ্ডিতের মৌনী ভাব একান্ত বিড়ম্বনার বিষয়।

পাত্রগণের নাম নিরন্তর স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে; কিন্তু ব্যক্তি লক্ষ্য নাই, এরূপ স্থলে যদি ঐ সকল পাত্রের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্যক্তিগ্রহ না হইল, তবে আর নাটকের সৌন্দর্য্য কোথায় রহিল? পাত্রের কথা শুনিয়া ব্যক্তিগ্রহ, নাটকের একটী প্রধান অঙ্গ।

এই জগতের ঘটনাবিশেষের অবিকল প্রতিকৃতি চিত্রিত করিতে যে প্রকার বর্ণের প্রয়োজন ও যেরূপ তুলিকার আবশ্যকতা, তাহার অভাবই নাটকরূপ চিত্রকার্য্যের প্রধান অন্তরায়।

অথ রস।

ভরত প্রভৃতি যে সকল সহৃদয় পণ্ডিত নাটকাদি-প্রণয়নের নিমিত্ত নানাপ্রকার সূত্র ও নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা নাটক-মধ্যে কেবল আদ্য ও বীর রসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, করুণ রসের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এস্থলে এরূপ বলাও কিছু অসঙ্গত নহে যে, আদ্য ও বীর রসের ন্যায় নাটকে করুণ রসের প্রাধান্য থাকিলে, তাহা সভ্য-সমাজে আদরণীয় হইত না। নাটকে করুণ রসের প্রবাহ প্রবাহিত হইলে, উহা অবশ্যই সামাজিকদিগের অন্তঃকরণে প্রচুর পরিমাণে আনন্দ বিতরণ করিত। যে রস স্বয়ং অঙ্গি-স্বরূপ, সে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বের ন্যায় অন্য রসের পার্শ্বচর থাকিয়া সৌকুমার্য্য সম্পাদন করিবে, ইহা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক।

করুণরস হাস্য রসের বিরোধী হইয়া মুখ্যভাবে নাটক-মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইলে, সামাজিকদিগের অন্তঃকরণে দুঃখ-শোকাদির আবির্ভাব হইতে পারে, এজন্য মুনিবর ঐ রসকে অঙ্গিস্বরূপ করিয়া নাটক প্রণয়ন করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ আশ্চর্য্যজনক রসকে বীর রসের পার্শ্বচর করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ঐ রসকে প্রধান অঙ্গী করিয়া নাটক রচনা করিলে, তাহা কখনই সভ্য-সমাজে অনাদর-ভাজন হইত না। কোন নাটকের মধ্যে মুখ্যরূপে করুণ-রসের স্রোতঃ প্রবাহিত হইলে, উহা সামাজিক-দিগের শোক-দুঃখের কারণ কেন হইবে? উহাতে প্রতিনিয়ত শোক-দুঃখের স্রোতঃ প্রবাহিত হইলেও বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবাদির অলৌকিক শক্তি দ্বারা উহা সমাজবর্ত্তী প্রমাতৃগণের এরূপ

আনন্দ-বর্দ্ধক হইয়া উঠে, যে, সে আনন্দ সহৃদয়-সম্প্রদায় ভিন্ন আর কাহারও অনুমেয় নহে।

যদি করুণ-রস-প্রধান নাটকে কেবল দুঃখ-স্রোতঃ প্রবাহিত হইত ও প্রতিনিয়ত শোকাগ্নির শিখা প্রজ্বলিত থাকিত এবং তদ্দারা সভাগণের যন্ত্রণার অবশেষ থাকিত না, তাহা হইলে, সভা-মধ্যে কুরুকুল পশু দুঃশাসন কর্ত্তৃক কুলকামিনী পাঞ্চালীর কেশাম্বরাকর্ষণ ও নিরপরাধে পূর্ণগর্ভা জানকীকে নিবিড় অরণ্য-মধ্যে পরিত্যাগ প্রভৃতি নিতান্ত শোকাবহ ও দুঃসহ ঘটনা-পরম্পরার অভিনয় দর্শনে অথবা ঐ সকল বিবরণ অধ্যয়নে কেহই উন্মুখ হইত না; এবং রাম, সতীত্বের পরীক্ষার নিমিত্ত একান্ত শুদ্ধচারিণী বৈদেহীকে যে অগ্নি প্রবেশ করান, জানকীর সেই অগ্নিপ্রবেশ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে তাঁহার পাতাল প্রভৃতি হৃদয়-বিদীর্ণ-কর ব্যাপার দেখিতে ও শুনিতে কাহারও রুচি হইত না, অতএব ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, যে করুণ রস নাট্য-সংশ্রিত হইলে, উহা অতি-ভূমি-গত কোন অভূতপূর্ব্ব আনন্দ বিতরণ করিতে থাকে, এজন্য করুণ রসকে নাট্যশাস্ত্রে বীরের অবয়ব স্বরূপ না বলিয়া, আদ্য ও বীর রসের ন্যায় উহাকেও প্রধান অঙ্গিস্বরূপ বলিলে সভ্যসমাজে কখনই অনাদর-ভাজন হইত না।

আদ্য, করুণাদি এক একটী রস নাটকরূপ চিত্র-কার্য্যের মসৃণতা-সম্পাদক তৈল বিশেষ। এই তৈল উক্ত চিত্রকার্য্যের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইলে অত্যন্ত শোভা-সংবর্দ্ধন করে। এমন কি, নাটকরূপ চিত্র-পটের যে স্থানে কোনরূপ বৈচিত্রের বা কারু-কার্য্যের পারিপাট্য নাই, সেখানে যদি এই রসরূপ তৈলের অভ্যঞ্জন থাকে, তাহা হইলে, কেহই তাহার অসৌন্দর্য্য দেখিতে সমর্থ হন না। ঐ অভ্যঞ্জনের গুণে উক্ত অসুন্দর স্থান সকলকেও অতি সুন্দর বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

নাটকের মধ্যে বাক্-প্রপঞ্চ একটী প্রধান দোষ। রস-বিশেষ দ্বারা দর্শকদিগের অন্তঃকরণকে উন্নত অথবা একেবারে শোকাবনত করিতে গিয়া সমধিক বাগাড়ম্বর করিলে, কোন রূপেই উদ্দেশ্য-বিষয় সুসিদ্ধ হয় না। নাটকে বাচালতা অপেক্ষা মিত-ভাষিতার সহিত বাগ্মিতারই সম্যক আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

নাটকে প্রপঞ্চরূপে কোন ভাব ব্যক্ত করার নাম, মুখ্য উপায় *। আর কৌশল-বিশেষ দ্বারা অল্প কথায় কোন গুরুতর ভাব ব্যক্ত করার নাম, গৌণোপায় †। ফলতঃ অল্প কথায় অধিক ভাবের অবতারণাই নাটক-জীবনের মহৌষধ। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই খানে দুইটি পাত্রের কথোপকথন লিখিত হইতেছে। মুখ্য উপায়ে কথোপকথন; যথা—

* Direct way. † Indirect way.

রাজা বিজয়কেতু মৃগয়া করিতে গিয়া হঠাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হইলে, সারথি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সভা-মণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিল—

"কুমার প্রণাম করি; আশীর্ব্বাদ করুন।

কুমার। সূত! মহারাজ কোথায়?

সূত। কুমার! আর কি বলিব, সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

কুমার। সূত! ইহার মধ্যে কি সর্ব্বনাশ হইল?

সূত। কুমার! মহারাজ চিত্রকূট পর্ব্বতে দক্ষিণ ভাগে রথ হইতে অবতরণ করিয়া ইতস্ততঃ—

কুমার। (ব্যগ্র ভাবে) সূত! তার পর, তার পর?

সূত। কুমার! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

কুমার। সূত! মহারাজ ত কুশলে আছেন?

সূত। (অধোবদনে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে গদগদস্বরে)—'আয়ুষ্মন্! মহারাজ'

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বাক্‌রোধ।

অনন্তর রাজ-কুমার সারথির মুখে মহারাজের আকস্মিক মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়া, ইত্যাদি।

এই স্থানে মহারাজ বিজয়কেতুর মৃত্যুটি বাক্‌প্রপঞ্চে চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া, নাট্যামোদী সামাজিকদিগের তাদৃশ মনোজ্ঞ হয় নাই। কিন্তু যদি এই ব্যাপারটী এখানে অল্প কথায় ব্যক্ত হইত, তাহা হইলে যে কত মনোহর হইত, তাহা সহৃদয় সামাজিক ভিন্ন অন্যের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। গৌণো পায়ে এই ভাবের অভিব্যক্তি যথা——

সূত। (সাশ্রুনয়নে) মহারাজ!

এই অর্দ্ধোক্তি করিতে না করিতে—

কুমার। সূত! মহারাজ কোথায়? তুমি হঠাৎ আসিয়া, এরূপ সর্ব্বনাশ-সূচক সম্বোধনে কেন আমায় আহ্বান করিলে? ইত্যাদি।

এই ক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, প্রথম প্রকার প্রপঞ্চিত রচনা অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকার সংক্ষিপ্ত রচনায় কত মাধুর্য্য ও কত শুচিমেধা ভাব প্রকাশ পাইতেছে! এই স্থানে সূত যখন "কুমার" এই সম্বোধন-বাক্য পরিহার করিয়া, "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, বুদ্ধিমান রাজকুমার ও অমাত্যগণ তখনি মহারাজ বিজয়কেতুর পরলোক গমনের বিষয়, অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছেন।

এইরূপ উত্তর-রাম-চরিতের এক স্থানে রাজর্ষিজনক ও কৌশল্যাতে কথোপকথন সময়ে কবিকুলতিলক ভবভূতি অল্প কথায় পর্ব্বত-সমান কোন গুরুতর ভাবের অবতারণা করিয়া কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। যথা—

অকারণে জানকী-পরিত্যাগ-রূপ হৃদয়-বিদারক ব্যাপারটি রাজর্ষি জনক রাম-জননী কৌশল্যার নিকটে একেবারে অনাবৃত ভাবে অথবা নানা প্রকার বাক্‌প্রপঞ্চে ব্যক্ত না করিয়া কহিলেন—

"সখি! আমার প্রজারঞ্জন রাম ত কুশলে আছেন?"

কৌশল্যা রাজ-দুহিতা ও রাজা দশরথের পট্টমহিষী; কোন গভীর অর্থযুক্ত বাক্যের মর্ম্মোদ্ভেদে তিনি কোনরূপেই অসমর্থ ছিলেন না। এই সময় আপনার বৈবাহিকের বদন বিগলিত "প্রজারঞ্জন" শব্দটি তাঁহার হৃদয়ে যেন শাণিত শেলস্বরূপ গিয়া আমূল বিদ্ধ হইল।

এখন সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, রাজর্ষি জনক এই রূপে ব্যঙ্গোক্তি না করিয়া, যদি ক্রোধপ্রকাশ পূর্ব্বক জামাতা কর্তৃক জানকী-নির্ব্বাসনরূপ শোকাপনোদনে কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেন, অথবা "আমার জানকী নিতান্ত সরলা ও একান্ত পতিপরায়ণা। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় অকারণে তাঁহাকে বনবাসিনী করিয়া রামের কি লাভ হইয়াছে?" ইত্যাদি প্রকার মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে অবলা জাতির নিকটে সেইরূপ বিদ্বৎ কুলতিলক ও নিঃসঙ্গ যোগি-প্রবর মহারাজ জনকের যে কিরূপ কাপুরুষত্ব ও নীচাশয়তা প্রকাশিত হইত, তাহা প্রমাতা পাঠক বর্গের অবিদিত থাকিত না।

অতএব অল্প কথায় গুরুতর মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া, নাটক লিখিতে পারিলে, উহা যে কত সুন্দর ও মনোহর হয়, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না।

লোকে যে সকল বিষয় চিন্তা করিয়াছে, অথবা চিন্তার বিষয়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে, কিম্বা যে সকল অদ্ভুত বা সহজ ঘটনা মানুষের চিত্ত-সরোবরে কখন আসিতেছে, কখন বা নিমগ্ন হইতেছে, সেই গুলি অনায়াসে ও অতি সহজে চিত্র করাই নাটককারের প্রধান উদ্দেশ্য; ঐ সকল ভাব চিত্র করিতে গিয়া যে নাটককার মানুষের বাহ্য ভাব সকল চিত্র করিয়া বসেন, তিনি কখনই নাটক লিখিবার যোগ্য পাত্র নহেন।

চিত্র কার্য্যের নিমিত্ত যে যে উপকরণের প্রয়োজন ও স্থান-বিশেষে যে উচ্চ নীচতার আবশ্যকতা, সেই সেই উপকরণ ও উচ্চ-নীচতা প্রদান পূর্ব্বক অতি সুন্দর-রূপে মনুষ্যের বাহ্য ভাব ও কার্য্য-প্রণালী চিত্র করা অপেক্ষা, সহজ ভাবে তাহার মানসিক ভাব ও কার্য্যপ্রণালী প্রশংসার বিষয়। যিনি এরূপ অন্যের অন্তর-ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ, তাঁহাকেও নাটককার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তবে যিনি সমীচীন মসৃণতার সহিত উচ্চতা ও নিম্নতা-বিশেষ দ্বারা লোকের আন্তরিক ভাব-পরম্পরা সুকৌশলে চিত্র করিয়া, দর্শক শ্রেণীর সম্মুখে ধরিতে পারেন, তাঁহার প্রণীত নাটকই নাটক বলিয়া পরিগণিত হয়।

নাটকে যে কিরূপে অন্তরের ভাব চিত্র করিতে হয়, তাহার একটি অতি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত এই স্থানে অভিজ্ঞান-শকুন্তল হইতে উদ্ধৃত হইল।

শকুন্তলা শ্বশুরালয়ে গমন করিবেন বলিয়া, ভগবান্ কণ্ব যেরূপে খেদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই——

কণ্ব। (মনে মনে চিন্তা করিয়া) আহা! আজি শকুন্তলা পতি-গৃহে যাইবেন বলিয়া, আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে, অন্তরে যে বাষ্পভরের উদ্গম হইয়াছে, তাহাতে বাগ্‌জড়তা হইতেছে ও দৃষ্টিশক্তি চিন্তায় জড়ীভূত হইতেছে। হায়! আমি বনবাসী তপস্বী হইলেও আমার এতাদৃশ বৈক্লব্য জন্মিতেছে! না জানি, তনয়াবিরহ জন্য অভিনব বিশেষ দুঃখে গৃহস্থেরা কতই পীড়িত হইয়া থাকে!

সহৃদয় পাঠক! আপনি একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এই স্থানে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস, কুলপতি কণ্ব ঋষির রূপ ধারণ করিয়া ঠিক তাঁর মানসিক ভাব ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন কি না? এস্থানে ঋষি যে প্রকার শোক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বনবাসীর যোগ্য হইয়াছে কি না, বিচার করিয়া দেখুন।

শকুন্তলা শ্বশুরালয়ে যাইবেন বলিয়া, ঋষি যেরূপ শোক করিতেছেন, যদি ইহা অপেক্ষা সেই নিঃসঙ্গ, তাপস-প্রধান অধিক শোক তাপ করিতেন, কি বুক চাপ্‌ড়াইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেন অথবা "ওরে আমি শকুন্তলা ব্যতীত কেমন ক'রে থাক্‌বোরে" বলিয়া চীৎকারের সহিত কাঁদিতেন, তাহা হইলে, পুরুষ-কারের সহিত তাঁহার ঋষিত্ব একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। আর যদি তাঁহার ঐ শোকাবেগ আর কিছু কম হইত, কিম্বা একেবারে হইত না, তাহা হইলেও মনুষ্যত্বের সহিত তাঁহার ঋষিত্ব একবারে অন্তর্হিত হইত; তখন তিনি বিশুষ্ক হৃদয় বলিয়া হয়ত তিরস্কৃত হইতেন। অতএব, কবি এখানে ঠিক ঋষির প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মনের ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন সুতরাং নাটকীয় রস ও ভাব অক্ষুণ্ণ ভাবে এই স্থানে বিরাজ করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজঃ—

আমার জীবনের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আয়োজন।

আমি বলিয়াছি যে সে দিন আর কোন কথা হইল না, কিন্তু এখন বোধ হইতেছে যে, দিনের বেলা না হউক, রাত্রিতে যেন মাতঙ্গিনীর সহিত তৎ-সম্বন্ধে পুনরায় কি কথা হইয়াছিল। স্বপ্ন বৃত্তান্তের মত অল্প অল্প মনে পড়ি-

তেছে যেন দিবা অবসান হইয়া, রজনীর সমাগম হইয়াছে; চারিদিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; নভোমণ্ডল নীল-কান্তি পরিত্যাগ করিয়া গাঢ় কালিমায় আবৃত হইয়াছে; এবং সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া অগণ্য তারকারাজি দীপ মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই নৈশ অন্ধকারে নৈশ গগন তলে উভয়ের মধ্যে অবিস্পষ্ট স্বরে কি পরামর্শ হইল, মনে পড়িতেছে না। আমার চক্ষু দিয়া দুই এক বিন্দু বারি বর্ষণ হইল; মাতঙ্গিনী অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইল না, অথবা দেখিয়াও দেখিল না। মাতঙ্গিনী আমাকে কত আশা দিল, কত ভরসা দিল। তাহার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরি-পূর্ণ হইল। প্রত্যুত্তরে আমি কত মিষ্ট কথা কহিলাম, কিন্তু তাহাতে তাহার হৃদয় কত দূর ভিজিয়াছিল, তাহা সেই বলিতে পারে।

সে দিন এই পর্য্যন্ত। ক্রমে রাত্রি অনেক হইয়া উঠিল, দেখিয়া আমি শয়ন করিতে যাইলাম, এবং শয্যার এক প্রান্তে গিয়া দেহ বিস্তার করিলাম। কিন্তু কোন মতেই ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। একটু নিদ্রাকর্ষণ না হইতে হইতে কি ছাই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, আর অমনি নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। যত বার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, তত বারই চেষ্টা বিফল হইল। ক্রমে নিশি অবসান হইয়া আসিল, এবং প্রভাত না হইতে হইতে, আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া মাতঙ্গিনীকে ডাকিলাম। মাতঙ্গিনীর সহিত আবার পরামর্শ—কি ছাই পরামর্শ—আর ফুরায় না। এইরূপে কয়েক দিন অতি বাহিত হইল। ক্রমে আশার ভার অসহ্য হইয়া উঠিল। এক দিন মাতঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিলাম—'তুই আমাকে কেবল মিছে আশা দিয়া ভুলাইতেছিস্, মাতু; মিছে আশা দিতে তোকে কে বলেছিল?'

'মিছে আশা যখন সত্য হবে, তখন জান্‌তে পার্‌বে। এখন সে কথায় কায কি।'

'আমি তোর কথা আর শুনিতে চাই না। আমি তোকে বেশ্ চিনেছি।'

'ওমা! সে কি কথা, এর মধ্যেই আমাকে চিনে ফেল্‌লে?'—মাতু যথার্থই বলিয়াছিলি 'এর মধ্যে আমাকে চিনিয়া ফেলিলে!' যে তোকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরিয়াছিল, বলিতে পারি না, সে কস্মিন্ কালে তোকে চিনিতে পারিয়াছিল কি না!—

—'এর মধ্যেই আমাকে চিনে ফেল্‌লে! এত তাড়াতাড়ি আমাকে চিন্‌লে চল্‌বে কেন? তা সে যা হোক্ যত অপরাধ, যেন আমারই! আমিই যত বিলম্ব কর্‌ছি, গাফিলি কর্‌ছি। কিন্তু তোমার যে এত তাড়া, তুমি কি যোগাড় করেছ বল দেখি?"

মাতু আমার দিকে চাহিয়া রহিল। 'আমার যোগাড় করিবার মাতু কি আছে?

কৈ কিছুত দেখি না। আমি তোর হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি; তুই যা করিবি তাই হইবে।'

'তা ত বটেই, কিন্তু তবু কি কিছু নেই?'

'কৈ মাতু কিছুইত দেখিতে পাই না।'

'যদি দেখ্‌তে না পেয়ে থাক, তবে কাযেই দেখিয়ে দিতে হবে। কলিকাতায় যাবার জন্য যে এত ব্যস্ত হয়েছ, তা টাকার যোগাড় কি করেছ বল দেখি।'

মাতু স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাতুর কথায় আমি অকস্মাৎ যেন অকূল সমুদ্রে পড়িলাম। আমি যে ভয়ানক সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহা যে অর্থসাপেক্ষ, ইহা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই। সুতরাং মাতু টাকার উল্লেখ করিবামাত্র আমার সমুদয় আশা ভরসা ঘুচিয়া গেল। আমি তখন উত্তর করিলাম—'কৈ মাতু এ কথাত আগে বলিস্‌নি।'

'এ কথা যে বল্‌তে হবে তা আমি বুঝ্‌তে পারিনি। সকল কাযেরই আগে টাকা, তা কি তুমি আজও জান না?—এখন কি স্থির কর্‌লে বল।'

'মাতু আমি কিছুই স্থির করি নি। জগতে আমার কি আছে মাতু, যে আমি আপনার বলে নিয়ে যাব? অধিক কি, মাতু আমি সিকি পয়সা সম্বল ক'রে যাব না, তাতে আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার আছে ঘটিবে।'

'তোমার সকলই ছেলে খেলা তা আমি জান্‌তে পারি নি। তবে আমাকে মিছে কেন ত্যক্ত কর্‌ছ?' এই বলিয়া মাতু উঠিবার উদ্যোগ করিল।

'আমার দিব্য মাতু উঠিস্‌নি। রাগ করিলি মাতু? মাতু সংসারে আমার আপনার বলিবার কেহ নাই, তাই তোকে এত কষ্ট দিতেছি। তোর ঋণ জন্মে ভুলিতে পারিব না। যত দিন এই পোড়া প্রাণ রহিবে, তত দিন তোর হইয়া রহিব। যে দিন মরিব—অভাগিনীর মরণ নাই, মাতু—পারিত সেই দিন ভুলিব, তার আগে নয়!—রাগ করিলি মাতু?'

'রাগের দরকার কি বল।'

'মাতু আর যাহা বলিবি, তাই করিব, কেবল টাকার কথা বলিস্‌নি মাতু।'

'টাকার কথা না বলি কেমন করে। বিনা সম্বলে বিদেশে গিয়ে কি শেষে বিপদে পড়্‌ব। তখন দোষের ভাগী হবে মাতি কালামুখী— এই ত?'

'যত বিপদ হয় হোক্ মাতু, আমি অম্লান বদনে সব সহিব। তুই সহায় থাকিলে বিপদে কি ভয় মাতু?—আর আমরা পাঁচ সাত দিনের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিতেছি। আমরা ত আর সেখানে—সেখানে চির দিনের জন্য বসতি কর্‌তে যাচ্ছিনি।'

'বিনা টাকায় যখন একদিন চলে না

তখন পাঁচ সাত দিন কেমন করে চল্‌বে?'

'মাতু যার সহায়, তার আবার কিসের ভয়?'

'ও কাযের কথা নয়। তোমাকে আমি ঠিক কথা বলি শোন। বাবু কিছু আজ বাড়ী থাক্‌ছেন না; যা বল্লেম তার জোগাড় এখনই দেখ্‌তে হবে। যদি যাবার ইচ্ছা থাকে ত আজ।'

মাতুর কথায় আমার গা শিহরিয়া উঠিল। কেন, এত আগ্রহ যখন, 'তখন ভয় কিসের? এক বার কলিকাতায় যাইতে পারিলে সর্ব্বদুঃখ নিবারণ হয়, হৃদয়ের উত্তাপ ঘুচিয়া যায়, প্রাণ শীতল হয়,—তবে এখন ভয়ের কারণ কি? কারণ কি বলিতে পারি না, আমার বুকের ভিতরে চমকিয়া উঠিল। আমি উত্তর করিলাম—'আজই মাতু?'

'আজই। হয় আজ আর না হয় এই পর্য্যন্ত।'

'দুই এক দিন পরে?'

'তবে আমাকে আর কোন কথা বোলো না। যে কায পারবে না, তা নিয়ে পরকে দিন নাই রাত্রি নাই ত্যক্ত করা কেন?'

'তুই যা বলিবি, মাতু তাই করিব। তুই যদি বলিস্ যে এই দণ্ডে যাইতে হইবে, ত আমি এই দণ্ডেই যাইব। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না।'

'শুধু গেলেই ত হবে না। যাওয়া মুখের কথা নয়। যা বল্লেম তার কি হ'ল?'

'মাতু শুধু ঐটি মাপ কর্; আর যা বলিবি সব করিব।'

'তবে তোমার যাবার ইচ্ছা নাই, তাই খুলে বল না কেন?'

'যাবার ইচ্ছা নাই মাতু?'

'তা বৈ কি? যাবার ইচ্ছা থাক্‌লে অবশ্যই এত ক্ষণ তার জোগাড় হ'ত। আমি বেসি আর বার বার বল্‌তে চাইনে। যদি যাওয়া মত হয়, তবে যা বল্লেম তার জোগাড় এইবেলা দেখ। আর সময় নাই। আজ হ'ল ত ভালই, আর নৈলে আমার দ্বারা হবে না। পষ্ট কথা ভাল।'

মাতু দৃঢ় পণ করিয়া রহিল। কত অনুনয় বিনয় করিলাম; কিছুতেই ঘাড় পাতিল না। উপায় কি! মাতুকে সন্তুষ্ট করা চাই—অগত্যা স্বীকার করিলাম। 'মাতু তবে আমার সঙ্গে আয়।' মাতঙ্গিনী আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। একটী বাক্‌স খুলিয়া আমি এক খানি নোট বাহির করিলাম—ঈশ্বর হে কাহার ধন কি কার্য্যে ব্যয় করিলাম!—এবং নোট খানি মাতঙ্গিনীর হস্তে দিয়া বলিলাম—'মাতু আমার কাছে যা ছিল তোকে দিলাম। এ টাকা যেন আমি আর চক্ষুতে না দেখি।' মাতঙ্গিনী হাত পাতিয়া লইল এবং কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল, কিন্তু আমার

মনের ভিতরে বড়ই কেমন করিতে লাগিল। এত দিন ধরিয়া হৃদয় যে উৎসাহ—আশা ভরসায় উন্মত্ত ছিল, হঠাৎ সে সকল অদৃশ্য হইল। মনে কেমন এক প্রকার ঔদাসীন্য জন্মিল এবং থাকিয়া থাকিয়া প্রাণের ভিতরে যেন কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। এত দিন ধরিয়া এক বারও যে আশঙ্কা হয় নাই, সেই আশঙ্কা দেখা দিল—'কুল ছাড়িয়া কোন্ অকূল পাথারে ঝাঁপ দিতেছি' 'কিন্তু সেই আশঙ্কায় ফল হইল কি? তাহাতে চক্ষু কি ফুটিল? সুমতি কি ফিরিয়া আসিল?' এই কথা আমি কাঁদিতে কাঁদিতে কত বার আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছি—এবং কোন উত্তর দিতে না পারিয়া কেবল অধিকতর কাঁদিয়াছি। কাঁদিবার জন্য এ যাত্রা আসিয়াছিলাম; কাঁদিবার জন্য আজও বাঁচিয়া আছি। যে দিন হইতে জ্ঞানোদয় হইয়াছে, সেই দিন হইতে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছি; যে দিন জ্ঞানের অন্ত হইবে, সেই দিন কান্না ঘুচিয়া যাইবে।

অধঃপতন।

'কাঁদিয়া আর ফল কি?'—এ কথার ভাই তোমাকে কি উত্তর দিব! কাঁদিয়া কোন ফল নাই, ইহা ত সকলেই জানে। যে দিন এক বার গিয়াছে, সেই দিনে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয়ই চির-কালের জন্য গিয়াছে। ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহারা আর ত ফিরিবে না। পৃথিবী শুদ্ধ লোক তাহাদের জন্য প্রাণত্যাগ করিলেও, তাহারা আর ফিরিবে না, ইহা ত সকলেই জানে। কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও লোক মূর্খ হয় কেন? এক বার যমের তাড়নে যাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়াছে—মোহান্ধকারে দিক্ হারাইয়া এক বার যে অনুতাপ-সাগরে ডুবিয়াছে, বল দেখি চিরদিনের জন্য তাহার চক্ষুতে জলধারা কেন?—ফল নাই, সে কি তাহা জানে না? কিন্তু তথাপি সে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না কেন? আর কাঁদিলেই বা তাহার প্রাণ শীতল হয় কেন? তবে কেমন করিয়া বলিব, কাঁদিয়া কোন ফল নাই—জগতে রোদন বৃথা? যাহার কোন আশা নাই, ভরসা নাই, উপায় নাই,—সংসার যাহার চক্ষুতে অন্ধকারে পরিপূর্ণ—জগতে আপনার বলিবার যাহার কেহ নাই—তাহার আশা ভরসা, বিশ্রাম—সকলই চক্ষুর জলে। চক্ষুর জলের সমান তবে জগতে আর কি আছে? অভাগিনীর উপরে বিরক্ত হইও না, আজি সেই চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিব, কেমন করিয়া জন্মের মত আপনাকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইলাম।

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল, কিন্তু মনের সে ব্যাকুলতা কিছুতেই ঘুচিল না। এক এক বার মনে হইতে

লাগিল, যেন নরহত্যা কি তদ্রূপ কোন ভয়ানক কর্ম্ম করিয়া লুক্কায়িত রহিয়াছি; পশ্চাতে পশ্চাতে গুপ্তচর ফিরিতেছে, এখনই ধরা পড়িব—এখনই প্রাণদণ্ড হইবে। এরূপ অবস্থায় একাকিনী আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া মাতঙ্গিনীকে ডাকিলাম; কিন্তু মাতঙ্গিনীর কোন উত্তর না পাইয়া অন্যমনস্ক হইবার অভিলাষে ছাদের উপরে উঠিলাম। ছাদের উপরে যাইয়া প্রকৃতির কি প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলাম! তখন বেলা একেবারে পড়িয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড অস্তোন্মুখ সূর্য্য জ্বলন্ত লৌহ-চক্রের রূপ ধরিয়া ধীরে ধীরে সুদূরস্থ অরণ্য-সাগরে ডুবিতেছিল, দেখিতে দেখিতে একেবারে অদৃশ্য হইল। ভূতলে আর রবি-কিরণের কিছুমাত্র রহিল না, কেবল গগনস্পর্শী তাল নারিকেল প্রভৃতির শ্যামল শীর্ষদেশ সুবর্ণ রঙ্গে ঈষৎ রঞ্জিত হইল। মস্তকের উপরে ব্যোমদেশ চতুর্দ্দিকে অসীম দেহ বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ ভূতলের সহিত মিশাইয়াছিল, এবং দূরস্থিত বৃক্ষ সকল সেই সুনীল বিশাল পটের প্রান্ত ভাগে সুকৌশলে চিত্রিত বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। আমি সেই হৃদয়-স্নিগ্ধকর দৃশ্য চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া এক দৃষ্টিতে অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। সান্ধ্য সমীরণে আমার কেশ কম্পিত হইতে লাগিল; অঞ্চল বার বার উড়িয়া ছাদের আলিশায় গিয়া পড়িল। আহা কি সুন্দর শোভা, এ জন্মে কি তাহা ভুলিব? হায় প্রাণ-বায়ু তৎকালে দেহ ছাড়িয়া অকস্মাৎ সেই সান্ধ্য সমীরণে মিশাইয়া দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইল না কেন? তাহা হইলে আজিও চক্ষুর জলে ভাসিতে হইত না—অনাথিনী হইয়া আজি হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে লুকাইতে হইত না! কিন্তু এখন আর সে কথায় কায কি! অদৃষ্টে যাহা লেখা ছিল, ঘটিয়াছে;—কে তাহা নিবারণ করিতে পারিত? তবে সে সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া, সেই সন্ধ্যার কথা বলিব।—কি মধুর দৃশ্য, কি অপূর্ব্ব শান্তি! হৃদয় মুগ্ধ হইল, সেই ব্যাকুলতা কিয়ৎ পরিমাণে ঘুচিল। কিন্তু সেই সুখ, সেই আত্ম-বিস্মৃতি, কত ক্ষণ রহিল?—যত ক্ষণই থাকুক, সে কথার প্রয়োজন নাই। এই হতভাগ্য জীবনে, বিশেষতঃ সেই ঘোর দুর্দ্দিনে, যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য—অধিক নহে, একটী মাত্র মুহূর্ত্তের জন্য—সুখাস্বাদন করিয়া থাকি, তাহাই যথেষ্ট, তাহাই আমার শত বর্ষ। ইহার অধিক আমি আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি।

ক্রমে আকাশে দুই একটী করিয়া রত্ন দেখা দিতেছে, এমন সময়ে নীচে মাতঙ্গিনীর মত কে কথা কহিল। তাহার কণ্ঠ-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র আমার বোধ হইল, আমি যেন হঠাৎ নিদ্রা হইতে উঠিলাম। অকস্মাৎ সেই মনোহর দৃশ্য অন্ধকারে বিলুপ্ত

হইল। অবিলম্বে সোপানে পদধ্বনি হইল, এবং মাতঙ্গিনী আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মাতঙ্গিনীর কুঞ্চিত কেশ-রাশি পবন-হিল্লোলে উড়িতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল 'এখানে একলা কি করিতেছ?'

'তোরে এইমাত্র কত খুঁজিলাম; কোথায় গিয়াছিলি?'

'তোমার মনে কি কোন অসুখ হয়েছে? মুখ-খানি শুক্‌নো শুক্‌নো কেন?'

'অসুখ কৈ?—না।'

'তা না হলেই ভাল। আজ্‌কার রাত্রিটা গেলে হয়। কাল দেখ্‌তে পাবে, কোথায় আসিয়াছ—স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে। কিন্তু অধিক দিন থাক্‌বে না তো?'

'না শীঘ্রই আসিব।'

'আমিও তাই বলিতেছি। অধিক দিন বাড়ী ছাড়া হ'য়ে থাক্‌লে চল্‌বে না।' এই বলিয়া মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল।

আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিলাম। দেখিতে দেখিতে চারি দিক অন্ধকারে পূরিয়া গেল, আকাশমণ্ডল নক্ষত্রমালায় পরিপূর্ণ হইল। সেই অন্ধকারে শ্রম-বিমুক্ত শ্রম-জীবীর গভীর গীত ধ্বনিতে চারি দিক বিকম্পিত হইতে লাগিল—তাহার হৃদয়ে কত সুখ! সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রম ও দুর্ভাবনা সে ভুলিয়া গিয়াছে—তাহার প্রিয়কারিণী প্রিয়-ভাষিণী গৃহ-লক্ষ্মীর মুখে সেই মধুর হাসি দেখিয়া সে সব ভুলিয়া গিয়াছে! তাহার সুখের সীমা নাই। হয় ত তাহার হৃদয়ে এখন যত সুখ, ক্রোরপতি যিনি, তাঁহারও তত সুখ নাই। অনুতাপ, দুরভিলাষ, দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুর্ভাবনা যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, হইতে পারে—সে ব্যক্তি পৃথিবী-পতি; হইতে পারে—তাহার অপেক্ষা পণ্ডিত জগতে কেহ নাই; কিন্তু হৃদয়ের শান্তি,—এক মুহূর্ত্ত যাহা না থাকিলে জীবনভার অসহ্য হইয়া উঠে—হৃদয়ের সেই শান্তি, কখনই তাহার নহে। যাহার শান্তি আছে, তাহার সকলই আছে; যাহার শান্তি নাই, তাহার কিছুই নাই। অধিক বলিব কি, এই হতভাগিনীর কথা এক-বার আদ্যোপান্ত মনে মনে ভাবিয়া দেখ।

ক্রমে একটু একটু করিয়া রাত্রি বাড়িতে লাগিল। আমি একাকিনী রহিয়াছি; কারণ সন্ধ্যার পর সকলেই গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত। এক বার বসিতেছি, এক বার শুইতেছি, এক বার দাঁড়াইতেছি। এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, মাতঙ্গিনীকে এক বার ডাকিলাম। মাতঙ্গিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ডাকিতেছ কেন?'

'আমাকে একটু জল আনিয়া দে, আমার বড় তৃষ্ণা বোধ হ'তেছে।'

'খাবার আন্‌তেছে; এখন জল খাবে?'

'না; আমি আজ্‌ কিছু খাব না। আমাকে একটু ভাল জল আনিয়া দে।'

'কিছু না খেলে অসুখ কর্‌বে যে।'

'না আমি কিছু খাব না।'

'উপবাস করে থাক্‌লে পথে বড় কষ্ট হবে।' মাতঙ্গিনী আমার কাণে কাণে বলিল। 'বার্‌বার্‌ কেন বলিতেছিস্‌ মাতু? আমার কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই, অক্ষুধায় কেমন করিয়া খাই বল দেখি।'

সুতরাং মাতু দ্বিরুক্তি না করিয়া একটু জল রাখিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি আরও বাড়িতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাহারা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, এক্ষণে তাহারা যথেচ্ছা বিশ্রাম করিতেছে—কেহ হাসিতেছে, কেহ কথা কহিতেছে, কেহ বা শয়নের আয়োজন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে এক জনের নাম ছিল কমল। কমলের বয়স অতি স্বল্প, কিন্তু তাহার ন্যায় সুশীলা ও প্রিয়কারিণী অতি অল্পই দেখিতে পাইয়াছি। আমি তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'কমল তুই কি আমাকে ভাল বাসিস্‌?' কমল মৃদুস্বরে উত্তর করিল—'আমি কেমন ক'রে বলব?' 'আমি যদি মরিয়া যাই কমল। তা হ'লে তুই আমার জন্য কাঁদিবি?' কমল বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল—'ছি ও কি কথা?' 'কাল সকালে উঠিয়া কমল যদি দেখিস্‌, আমি মরিয়া গিয়াছি, তা হ'লে আমার জন্য একটু কাঁদিস্‌, আর আমাকে এক এক বার মনে করিস্‌।' আমার কথায় কমল অত্যন্ত কুপিত হইয়া চলিয়া গেল। ইহার একটু পরে মাতঙ্গিনী আমার কাণে কাণে আসিয়া বলিল—'এই বেলা একটু ঘুমাও না কেন? আমি তোমাকে ঠিক্‌ সময়ে এসে জাগাব।' ক্রমে রাত্রি আরও বাড়িতে লাগিল, প্রায় ১০৷৷০টা হইবে। চারি দিক্‌ এমন নিস্তব্ধ যে, একটি পালথ পড়িলে শব্দ হয়। সকলে নিদ্রায় অভিভূত। যাহাদের মনে কোন উদ্বেগ নাই, ভাবনা নাই, তাহারা কি সুখেই নিদ্রা যাইতেছে। সব অন্ধকার, কেবল আমার শয্যার পার্শ্বে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, এবং অনতিদূরে মাতঙ্গিনী যে ঘরে রহিয়াছে, তাহার জানালার ভিতর দিয়া ঈষৎ-রক্তাভ আলোক বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি হস্তের উপরে গণ্ডদেশ রাখিয়া শয্যায় অর্দ্ধ শয়িতাবস্থায় প্রদীপের দিকে এক দৃষ্টিতে কি ভাবিতেছি। কি ভয়ানক নিস্তব্ধতা! আমার শিয়রের উপরে একটি ঘড়ি টিক্‌ টিক্‌ করিয়া চলিতেছে। তাহার নিদ্রা নাই, আমারও নিদ্রা নাই। এগারটা বাজিল। আমি সেই শব্দে চমকিয়া উঠিলাম—তেমন সজোর ঘড়ির শব্দ কখন শুনি নাই। আবার এক মনে কি ভাবিতে লাগিলাম। ঘড়ির সেই টিক্‌ টিক্‌ শব্দ আমার চিন্তা-স্রোতে মিশাইয়া গেল। ইতি-মধ্যে কখন একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল, বলিতে পারি না। আমার বোধ হইল, আমি যেন ঘোর নিশীথে জনশূন্য প্রান্তর-মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি। কিয়দ্দূর গিয়াছি—এমন সময়ে কে যেন আমার

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অমনি নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ করিতে লাগিল। তখন চক্ষু খুলিয়া দেখি যে সম্মুখে মাতঙ্গিনী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—'কে ও মাতু?'

'ঘুম ভাঙ্গিল?'

'এইমাত্র একটু ঘুম আসিয়াছিল; কেমন একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল।'

'সময় হয়েছে। এই বেলা।'

মাতঙ্গিনীর কথায় আমার বুকের ভিতরে কাঁপিয়া উঠিল। আমি উত্তর করিলাম—'এখনই?'

'দুপর বাজে যে; আর বিলম্ব উচিত নয়।'

'আচ্ছা মাতু; আর বিলম্ব করিব না। এই গহনাগুলা গা হইতে খুলিতে যে দেরি।'

'গহনা খুল্‌বে কেন? গায় থাক্‌লে ক্ষতি কি?'

'না মাতু, আমাকে আর কোন কথা বলিস্ নি। আমি তোর কথা কাটাতে পারিনে।'

'তবে গহনার বাক্স আনিয়া দিই, তাহাতে খুলিয়া রাখ।'

মাতঙ্গিনী বাক্স আনিয়া সম্মুখে রাখিল, আর দুপরবাজিল। একে একে সব খুলিয়া ফেলিলাম—'যাঁহার সামগ্রী তাঁহারই রহিল।' গায় আর কোন অলঙ্কার থাকিল না, কেবল দুই হাতে দুই গাছা বালা রহিল। 'ইহাও ত আমার নহে; আপনার বলিবার আমার সংসারে কি আছে?' সুতরাং বালা খুলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কে যেন হাত চাপিয়া ধরিল—'অকল্যাণ হইবে যে?'—হরি হরি, কি কল্যাণ করিতে বসিয়াছিলাম! আবার খুলিবার চেষ্টা করিলাম, অমনি কে যেন আবার হাত চাপিয়া ধরিল। সুতরাং হাতের বলয় হাতেই রহিয়া গেল। তখন বাক্সতে চাবি দিয়া মাতঙ্গিনীকে বলিলাম 'মাতু কোথায় রাখিবি রাখ্।' মাতু চাবি লইয়া কি করিল, ভাল করিয়া দেখিলাম না।

ক্রমে আরও প্রায় আধ ঘণ্টা অতীত হইল। 'মাতু যাহা করিবার হয়, শীঘ্র কর, আর পারি না।' 'একটু বিলম্ব কর' এই বলিয়া মাতু বাহিরে উঠিয়া গেল, চারি দিক সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, এবং বাটীর পশ্চাৎদ্বার খুলিয়া রাখিয়া ফিরিয়া আসিল। মাতু যত ক্ষণ না ফিরিয়াছিল, আমার এক এক মুহূর্ত্ত এক এক যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ঠিক্ পাষাণের মত আমার বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল; ঘড়ির সেই টিক্ টিক্ শব্দ অতি ভয়ানক কর্কশ শব্দের মত কর্ণে আঘাত করিতে লাগিল; এবং লোম-কূপ দিয়া যেন অগ্নি-শিখা বাহির হইতে লাগিল। অবিলম্বে মাতঙ্গিনী পুনরায় দেখা দিল, এবং কেমন এক প্রকার স্বরে বলিল।—'তবে আর কেন? দুর্গা দুর্গা বলিয়া চল।' অকস্মাৎ

আমার মস্তকের ভিতরে ঘুরিতে লাগিল। —'মাতু, তোকে সহায় করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম, দেখিস্ যেন চিরকালের জন্য মজিয়া না যাই।' 'ছি, কাঁদিতেছ কেন, ভয় কি?' আমি আর কোন কথা না বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিলাম, আর অমনি অঞ্চল বাধিয়া বসিয়া পড়িলাম। 'মাতু, উঠিতেই অলক্ষণ!' 'ভয় কি? সাহস করিয়া চল।' মাতুর কথায় সাহসে ভর করিয়া উঠিলাম এবং নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় এক বার দাঁড়াইলাম, এক বার শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম, এক বার—বলিতে লজ্জা করে—এক বার কাঁদিলাম। 'অনেক দিন এখানে ছিলাম; পিতা মাতা হারাইয়া আর কোন গতি ছিল না। আজি জনমের মত বিদায় লইতেছি। বহু অপরাধ করিয়াছি, এক বার মার্জ্জনা করিও।—তোমার সংসার তোমারই রহিল। চিরকাল মনের সুখে থেকো!'

মাতঙ্গিনী অগ্রে অগ্রে চলিল এবং আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। হঠাৎ এক বার বেগে নৈশ-সমীরণ বহিল এবং হুঙ্কার দিয়া যেন আমার কর্ণে আসিয়া বলিল—'সাবধান!' সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আবার দুই এক পা যাইতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়া অসংখ্য নক্ষত্রমালা বিভূষিত আকাশের দিকে এক বার চাহিয়া দেখিলাম। তারকা-রাজি চক্ষু ঠারিয়া যেন বলিল—'এখনও ঘরে ফিরিয়া যা।'—হায় ফিরিবে কে? ক্রমশঃ দুই চারি পা যাইতে যাইতে বাটীর পশ্চাদ্দ্বারে উপস্থিত হইলাম; এক বার ফিরিয়া চাহিলাম; এবং পর ক্ষণেই দ্বার অতিক্রম করিলাম—অকূল সমুদ্রের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। আবার দুই চারি পা গিয়াছি, এমন সময় মাতঙ্গিনী হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল—'বড় ভুলে এসেছি, একটু দাঁড়াও।' তাহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া আমি তাহার অঞ্চল ধরিলাম—'একলা রাখিয়া কোথা যা'স্!' 'চক্ষুর পলক না পড়্‌তে পড়্‌তে ফিরে আসব। এখানে দাঁড়াও, ভয় কি?' এই বলিয়া মাতঙ্গিনী অঞ্চল কাড়িয়া লইয়া বাটীর ভিতরে পুনরায় প্রবেশ করিল এবং আমি মৃতপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনতিবিলম্বে সে ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম, তাহার হস্তে—কাপড়ে বাঁধা কি কতকগুলা রহিয়াছে। 'ও কি আনিলি মাতু?' মাতু বলিল—'কিছু নয়, পরে দেখাব।' আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

আবার দুই জনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিলাম। জঙ্গল ও উদ্যানের ভিতর দিয়া অনেক ক্ষণ নিশাচরের মত যাইয়া অবশেষে সদর রাস্তায় উঠিলে পরে মাতঙ্গিনী বলিল—'ঐ দেখ, আমাদের গাড়ি রহিয়াছে।' আমি বিস্মিত হইলাম, কিন্তু কোন উত্তর দিলাম না। অবিলম্বে শকটের পার্শ্বে গিয়া উভয়ে উপস্থিত

হইলাম। কেহ কোন কথা কহিল না। মাতঙ্গিনী অগ্রে আমাকে তুলিয়া দিল, এবং পরে আপনি উঠিয়া বলিল 'হয়েছে।' অমনি চালক আর কোন কথার অপেক্ষা না করিয়া গাড়ি চালাইয়া দিল।

বেগে অশ্বদ্বয় ছুটিতে লাগিল। দেহ প্রাণ-শূন্য বোধ হইল; সর্ব্ব শরীর শিথিল হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না যে, জন্মের মত দুঃখ-নীরে ভাসিলাম। সেই শান্তি-নিকেতন, সেই সুখের আলয় অবহেলা করিয়া বিধাতা হে কোথায় চলিলাম? কি যন্ত্রণার জ্বালায়, কি বা সুখের আকাঙ্ক্ষায়, একেবারে অজ্ঞান হইলাম!--সেই স্নেহ, সেই মমতা, সেই প্রাণের ভালবাসা, একেবারে সমস্ত ভুলিলাম! একবার মনে ভাবিলাম না যে, যে আমাকে এক দণ্ড না দেখিলে চারি দিক্ অন্ধকার দেখিত, তাহার কি দুর্দ্দশা করিলাম; কি ক্ষোভ, কি অপমান, কি মর্ম্ম-বেদনায় তাহার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিলাম! হরি, হরি নারীর হৃদয় এমন পাষাণ হইল কেমন করিয়া!

শ্যাম—

কপিল-যোগ।

(গত প্রকাশিতের পর।)

অতি প্রাচীন সমীচীন যোগাচার্য্য, ভূতভাবন শ্রীমন্নারায়ণ কপিল-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় মাতা দেবী দেবহূতিকে যে সকল যোগোপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে যাহা সুবোধ্য ও সুখকর, তৎসমুদায় শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ হইতে সংগ্রহ করা গেল। দেবহূতি প্রশ্ন করিতেছেন এবং কপিলদেব উত্তর দিতেছেন।

দেবহূতি। পুত্র! আমি প্রকৃতি পুরুষের যাথার্থ্য জানিবার ইচ্ছায় তোমার শরণ লইলাম।

কপিল। জননি! যিনি সংসার-রচনায় সুনিপুণা এবং ত্রিগুণাত্মিকা বিষ্ণুমায়া, তিনিই প্রকৃতি। প্রকৃতি মায়াময়ী ইন্দ্রজাল-বিদ্যা সদৃশী। প্রকৃতির গুণ দ্বারা আব্রহ্ম-স্তম্ভপর্য্যন্ত যাবতীয় লোক সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ সমুদায়ই প্রকৃতির অধীন, অদৃষ্টের আয়ত্ত।

পরমাত্মাকে পুরুষ বলা যায়। পরমাত্মা সর্ব্ব প্রকার ভেদ-রহিত, প্রকৃতির অতীত,—অপরিচ্ছিন্ন, স্বপ্রকাশ, নিত্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকৃতি, কালের অনুগত, পরিবর্ত্তনশীলা, সারবিহীনা ও স্বপ্নতুল্যা।

প্রকৃতিঃ স্বপ্নতুল্যা হি,
রাগদ্বেষাদি-সংকুলা।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি,
প্রবোধে অসত্যবদ্ভবেৎ।

প্রকৃতি—স্বপ্নতুল্যা। যেহেতু তাহা রাগদ্বেষ-বিশিষ্টা। তন্নিমিত্ত স্বকালে অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থায় উহা সত্যবৎ প্রকাশ পায়। প্রবোধে অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায় অসত্য বলিয়া জানা যায়।

দেবহূতি।—বৎস! আমাকে আধ্যা-ত্মিক যোগের ফল বর্ণন করিয়া কৃতার্থ কর।

ভগবান্ কপিলদেব উত্তর করিলেন, মাতঃ! আমার বিবেচনায় আধ্যাত্মিক-যোগী, মনুষ্যের মোক্ষ-লাভের প্রকৃত উপায়। উহাতে সুখ-দুঃখের একে-বারেই অভাব হয়।

হে শুদ্ধচারিণি! পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যোগবিধির বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলে, আমি তাঁহাদিগকে যে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন যোগ বিধি উপদেশ দিয়া ছিলাম, তাহাও আপনাকে জানাইতেছি। জীবের অন্তঃকরণই বন্ধ ও মুক্তির কারণ। উহা যাবতীয় বিষয়ে আসক্ত হইলে, জীবের বন্ধন-দশা উপস্থিত হয়। আর উহা পরমাত্মায় ধাবিত হইলে, মুক্তিলাভ হয়। ফলতঃ জীব 'আমি ও আমার' এই প্রকার আভিমানিক জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণকে সুখ-দুঃখ-পরিশূন্য করত শুদ্ধ ও সমভাব অবলম্বন করিতে পারিলেই জ্ঞান-বৈরাগ্য-সমন্বিত ভক্তি-যুক্ত হৃদয়ে একমাত্র পরমাত্মা ও ক্ষীণবলা প্রকৃতিরে অবলোকন করিতে পারে। এথানে জীব-শব্দের অর্থ মনুষ্য। এতাদৃশী ভক্তি ব্যতীত যোগিদিগের ব্রহ্ম-সিদ্ধির সুখময় পথ আর নাই। জননি! যদি কেহ চিত্ত-বশীকরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যেন সাধু লোকের শরণ গ্রহণ করেন। যাঁহারা তিতিক্ষা ও করুণাতে আকৃষ্ট; সর্ব্বভূতের সুহৃৎ; অজাত শত্রু; শান্তপ্রকৃতি; শাস্ত্রানুশীলন-তৎপর ও একমাত্র সুশীলতাগুণেই ভূষিত;—যাঁহারা এক মনে ভগবানে অবিচলিত ভক্তি করেন, তাঁহার জন্য সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং স্বজন-দিগকে ভগবানের ভক্তির প্রতিবন্ধক বিবেচনায় তাহারদিগের সঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ মনন কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সাধু-পদ বাচ্য। এতাদৃশ সাধু-সঙ্গ মানব মাত্রেরি কর্ত্তব্য। সাধু-সহবাসে লোকের কুসঙ্গ দোষ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ সাধু-সহবাসে সাধুদিগের আচার-ব্যবহার দৃষ্টে ও তাঁহাদিগের কীর্ত্তিত ভগবানের মাহাত্ম্য-শ্রবণে—শ্রবণ, মন আনন্দে আপ্লুত হয়। এতাদৃশ সাধুরাই ভবার্ণবের কর্ণধার। অতএব সাধু সহবাসে থাকিয়া চরিত্র সংশোধন করিবে। শোধিত চরিত্র হইলে ঈশ্বর-মহিমায় দৃঢ় বিশ্বাস ও অচল প্রেম জন্মিবে। ভগবানে অচলা ভক্তি, আর গাঢ় প্রেম জন্মিলে, পুরুষ ঐহিক ও পারলৌকিক ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে বিরত হইয়া, উদ্যম সহকারে অনায়াসে যোগ-মার্গের অনুসরণ পূর্ব্বক চিত্ত-মলকে

বশীভূত করিয়া বিষয়-বাসনা পরিহার করিয়া বিজ্ঞান, যোগসিদ্ধি ও নির্ম্মল ভগবদ্ভক্তি লাভ করত এই বর্ত্তমান শরীরেই ভগবানকে সাক্ষাৎকার করিয়া মানব-জন্ম সফল করিতে পারে না।

দেবহূতি। পুত্র, ভগবানের প্রতি কি প্রকার ভক্তি করিতে হয়, আমায় বল। আর তুমি যে মুক্তি-সাধনের তত্ত্ব-প্রকাশক যোগের বিষয় বলিলে, তাহাই বা কিরূপ? এবং তাহার অঙ্গই বা কত প্রকার? আমাকে ঐ সকল গূঢ় ও কঠিন বিষয় সহজ রূপে জানাও। ভগবান্ কপিলদেব, স্বীয় জননীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, যাহাতে তত্ত্ব সকলের পরিসংখ্যা আছে, ভক্তি যোগ-সমন্বিত সেই সাংখ্য-শাস্ত্রের উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, লোকসকল বেদ-বিহিত কর্ম্মে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে, ভগবানে বিশুদ্ধ ভক্তি-জন্মাইতে পারে বলিয়া, উহা ভগবতী ভক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ভক্তিতে মুক্তি লাভ হয়। জঠরানল যেরূপ ভুক্তান্ন জীর্ণ করে, তদ্রূপ এই ভক্তি-প্রভাবে লিঙ্গ শরীর আশু বিশীর্ণ হইয়া যায়। লিঙ্গ শরীর থাকিতে কদাচ মুক্তি লাভ হয় না। মুক্তি চারি প্রকার। সারূপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্য। সাকার চিন্তায় সান্নিধ্য ব্যতীত সারূপ্যাদি তিন প্রকার মুক্তি লাভ হইতে পারে। পরম ভাগবতেরা কেবল ভক্তি দ্বারা ভগবানের মধুর মূর্ত্তির ধ্যান-পরায়ণ হইয়া সেবা-কার্য্য ভালবাসেন। তাঁহারা চতুর্ব্বিধ মুক্তির প্রয়াস করেন না। তথাপি কেবল বিশুদ্ধ ভক্তিই তাঁহাদিগকে (তাঁহাদিগের মুক্তির ইচ্ছা না থাকিলেও) মুক্তি প্রদান করেন। বেদে যে সকল কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক কর্ম্মই ভগবৎ-ভক্তির প্রধান হেতু। সাত্ত্বিক কর্ম্মে হিংসা-মাৎসর্য্যাদির সম্পর্ক নাই। পবিত্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সত্য, সরলতা প্রভৃতি পরম-হংসাচরিত যতি-ধর্ম্মকেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে। অতঃপর তত্ত্বের বিষয় বর্ণন করিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে তত্ত্বের আকর, স্বরূপ, মূল প্রকৃতি নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি অব্যক্ত, অথচ নিত্য; কার্য্য ও কারণ-স্বরূপ; স্বয়ং নির্ব্বিশেষ হইয়া সকলের বিশেষ আশ্রয়। ত্রিগুণ আর চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের নাম প্রকৃতি। ইহাকে সগুণ ব্রহ্মও বলা যায়। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যথা:—ভূমি, অপ, অনিল, বহ্নি, আকাশ ইহাদিগকে পঞ্চ মহাভূত বলা যায়। গন্ধ, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটীকে পঞ্চতন্মাত্র বলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও চর্ম্মকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থের কর্ম্মেন্দ্রিয় আখ্যা। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। তত্ত্ববিদ্গণ

এই প্রকারে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কালকেও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতিরিক্ত তত্ত্ব বলায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত হয় কেহ কেহ পরমপুরুষ পরমেশ্বরের প্রভাবকেই কাল বলেন। এই কাল হইতে গুণ-সমভাবাপন্ন নির্ব্বিশেষ প্রকৃতির জগৎ-উৎপাদিকা চেষ্টা সমুৎপন্ন হয়। কাল-স্বরূপ নারায়ণ নিজ মায়া-প্রভাবে পুরুষরূপে সকল প্রাণীর অন্তরে এবং কালরূপে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন। মাতঃ! সেই কালরূপী পরমাত্মা মূল প্রকৃতির গুণাবলি বিকার-প্রাপ্ত হইলে পর, মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। মহত্তত্ত্ব অক্ষয় জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশময়। মহত্তত্ত্বই বাসুদেব। উক্ত মহত্তত্ত্ব কাল-কর্ত্তৃক বিকৃত হইলে, তাহা হইতে বৈকারিক, তৈজস ও তামস এই তিন প্রকার অহঙ্কার প্রাদুর্ভূত হয়। এতাদৃশ অহঙ্কার হইতে মন, ইন্দ্রিয়-সমুদায় ও ও পঞ্চ-মহাভূত উৎপন্ন হয়। যিনি সহস্র-শিরা সাক্ষাৎ অনন্ত নামে অভিহিত হন, তিনি সঙ্কর্ষণ। যেমন মহত্তত্ত্বই বাসুদেব; তেমনি অহঙ্কার-তত্ত্বই সঙ্কর্ষণ। ইনি ইন্দ্রিয় সমুদয়ের ও মনের স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত। বিভাগানুসারে এই অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্ব, কারণত্ব, শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব এই ছয় প্রকার গুণ দেখা যায়।

বৈকারিক অহঙ্কার, বিকারগ্রস্ত হইলে তাহা হইতে মনস্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। ইহার ধর্ম্ম, সঙ্কল্প আর বিকল্প অর্থাৎ নিশ্চয় ও সংশয়-করণ। এতাদৃশ মন হইতে কাম সমুদ্ভূত হয়। এই কামকে প্রদ্যুম্ন বলে। মন, ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠাতা। যোগীসকল ইহারে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করেন। এই প্রকার তৈজস অহঙ্কার বিকৃত হইলে, বুদ্ধি-তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। বুদ্ধিতত্ত্বই বিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়গণের আধার। সংশয়, বিপর্য্যাস, স্মৃতি, আর নিদ্রা এই চারিটিও বুদ্ধির অন্তর্গত।

ইন্দ্রিয় সমুদায় তৈজস অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন হয়। সেই ইন্দ্রিয়সকল জ্ঞান ও ক্রিয়া উৎপাদন করে বলিয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এতদুভয় প্রকারে বিভক্ত। ক্রিয়া, প্রাণের জ্ঞান-বুদ্ধির শক্তি। ভগবানের বীর্য্য-প্রভাবে প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বসকল বিকৃতি-প্রাপ্ত হইয়া সংসার-বিরচনা হয়।

জগজ্জননি! পঞ্চ মহাভূতের মৌলিক তত্ত্বসকলের বিষয় যাহা বলা হইল, এতদ্ভিন্ন ভূত-তত্ত্বসকলের বিষয় বলা যাইতেছে, অনন্যমনে ইহা শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণে ধারণ করিলে বিজ্ঞান লাভ করত ভগবানে গাঢ় প্রেম ও ভক্তি জন্মিতে পারে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণী-কৃত হইতেছে যে, সংসার-জননী মূল প্রকৃতির পরবর্ত্তী পরমাত্মা নিত্য যে বিরাজ করিতেছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। অতঃপর যেরূপে মহাভূতাদির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বলিতেছি।

আর্য্যে, ভূতভাবন ভগবানের বীর্য্য-

প্রভাবে অহঙ্কার-তত্ত্ব বিকৃতি-প্রাপ্ত হইলে, সেই বিকৃত অহঙ্কার হইতে যে শব্দ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহাতে আকাশ ও শব্দ বোধক কর্ণ উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, আকাশের সূক্ষ্মত্বই শব্দের লক্ষণ। সেই শব্দ দ্বারা অর্থোপলব্ধি হয়। তন্মাত্র শব্দে ভূতসকলের মূলাংশকে বুঝায়।

সময়ানুসারে ভগবানের প্রভাবে ঐ আকাশ বিকৃত হইলে, তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্র ও বায়ু; আর স্পর্শবোধক ত্বক সমুদ্ভূত হয়।

মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, শৈত্য, উষ্ণত্ব এই সকল বায়ুর গুণ। বৃক্ষাদির সঞ্চালন, মেলন ও তৃণাদির সংযোগ দ্বারা বায়ুর কার্য্য জানা যায়। এই বায়ুই শব্দ ও দ্রব্যের নেতৃস্বরূপ সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করে। এই বায়ু দৈব-কর্ত্তৃক বিকৃত হইলে, তাহা হইতে যথা-ক্রমে রূপ, তেজ ও রূপ-গ্রহ-সাধন চক্ষু উৎপন্ন হয়। হে সাধ্বি, দ্রব্যসকলের আকার, সম্পর্ক ও বস্তুরূপে পরিজ্ঞান তেজের লক্ষণ। বস্তুসকলের বিদ্যোতন, অন্নাদির পরিপাক, পান, ভোজন, শোষণ, হিম মর্দ্দন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি তেজের কার্য্য।

রূপতন্মাত্র তেজ, দৈব-প্রভাবে বিকার-প্রাপ্ত হইলে তদ্দারা যে রস-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে জল ও রস-বোধক রসনা উৎপন্ন হয়। এতাদৃশ রস এক প্রকার হইয়াও সংসর্গ-গুণে ষট প্রকার বোধ হয়। ক্লেদন, পিণ্ডন, মৃদুকরণ, তাপাপনোদন, আপ্যায়ন, জীবন তৃপ্তি ও পুনঃ পুনঃ উদ্গমন জলের এই গুলি অসামান্য গুণ।

এই জল দৈব প্রভাবে বিকৃত হইলে, প্রথমে গন্ধ তন্মাত্র, তৎপরে পৃথিবী ও গন্ধগ্রাহক ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়। ঐ গন্ধ-সংসর্গী দ্রব্যাবয়বের বৈষম্য হেতু করম্ভ অর্থাৎ মিশ্র, পূতি, সৌগন্ধ, শান্তি, কটু প্রভৃতি বহু প্রকার হইয়া থাকে। প্রতিমাদির সাকার উৎপাদন, বিনা সাহায্যে দ্রব্যমাত্রেরই পৃথিবীতে অবস্থান, জলাদির আধারতা প্রভৃতি পৃথিবীর অসাধারণ ক্ষমতা। এই সকল মহাভূত হইতে ক্রমান্বয়ে যে যে মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের গুণসকলও যে যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সে তাহা প্রাপ্ত হওয়ায়, আকাশের এক, বায়ুর দুই, তেজের তিন, জলের চারি ও পৃথিবীর পাঁচ গুণ হইল। এই সকল মহাভূত, কালগতিকে যখন তিরোভূত হইবে, তখন আপন আপন গুণের সহিত স্ব স্ব কারণে মিলিত হইবে। যেমন মহাভূতসকল নিজ নিজ কারণে মিলিত হয়, তেমনি অন্যান্য তত্ত্বসকলও স্ব স্ব কারণে মিলিত হইলে, শেষে প্রকৃতি অবশিষ্ট থাকিবে। এই প্রকৃতিও ভগবানে প্রবেশ করিলে, এক ভগবান্ বৈ আর কিছুরই প্রকাশ থাকিবে না।

মাতঃ! তত্ত্বসমুদায়ের উদ্ভব আর তিরোভাব সর্ব্বদাই চিন্তা করিবেন।

ইহাকে বলে কার্য্যকারণ-জ্ঞান। এ জ্ঞান না জন্মিলে এবং অনবরত ইহা সুচিন্তিত না হইলে, আদি কারণ ভগবান্ নারায়ণে গাঢ় ভক্তি জন্মিতে পারে না। এ নিমিত্ত তত্ত্বসকল বিশেষ করিয়া বলা গেল। আপনি সর্ব্বদা ইহার অনুধ্যান করিবেন। ইতি কপিল যোগসার।

ষট্‌চক্র-ভেদ।

আধ্যাত্মিক বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করিতে যাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন হইবে, তিনি যেন আর্য্য যোগীদিগের অবলম্বা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র-ভেদ-রূপ নির্ম্মল পথ আশ্রয় করেন। এই পথ অবলম্বন না করিলে, আধ্যাত্মিক পদার্থসকল প্রত্যক্ষ করা অসাধ্য হয়। যে কোন পদার্থ হউক, অগ্রে তাহা মানস-প্রত্যক্ষ না হইলে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয় না। চিন্তাই মানস-প্রত্যক্ষ কারক। বুদ্ধি—চিন্তার সহযোগী। বুদ্ধি-বিরহিত প্রাণীর চিন্তা কোথায়? পশুপক্ষ্যাদির বুদ্ধির অভাবে চিন্তারও অভাব দেখা যায়। তবে স্বাভাবিক সংস্কার-বলে পশ্বাদির কার্য্য-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বুদ্ধি দ্বারা পদার্থের অনুভব হয়। অনুভব হইলে চিন্তা করা যাইতে পারে। পদার্থ সুচিন্তিত হইলে, তাহা মানস প্রত্যক্ষ হয়। যে পদার্থ ইন্দ্রিয়াতীত, সে পদার্থ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য, কল্পিত ষট্‌চক্র-ভেদ চিন্তা করিবে। এতাদৃশ উপায় যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা ষট্‌চক্রভেদ-চিন্তার যাহা প্রকৃত ফল, তাহা প্রাপ্ত হইয়া উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীতে যত দিন তন্ত্রশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তত দিন হইতে তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র-সাধনও চলিয়া আসিতেছে। বেদ, আর তন্ত্র, আর্য্যজাতির চক্ষু ও প্রাণ-স্বরূপ। যে আর্য্য এই উভয় শাস্ত্র-বিহিত আত্ম সাধনা করেন নাই ও করান না, তাঁহার চক্ষু ও প্রাণ থাকিতেও অন্ধত্ব ও নিষ্প্রাণতা দূর হয় না। এক্ষণে ষট চক্রের অথবা শারীর যোগ লেখা যাইতেছে।

গুহ্যদেশের ঊর্দ্ধ লিঙ্গ-মূলের অধোদেশে দেহস্থ তাবৎ নাড়ীর মূল; এই দুই মূল খগাণ্ডবৎ। ঐ পক্ষীর অণ্ডতুল্য মূল হইতে ৭২ হাজার নাড়ী সমুৎপন্ন হইয়াছে।

> মেঢ্রদেশে গুদাদূর্দ্ধং
> কন্দমূলং খগাণ্ডবৎ।
> তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ
> সহস্রানাং দ্বিসপ্ততি॥

এই ৭২ হাজার নাড়ীর মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী প্রধান। তন্মধ্যে আবার নাড়ীত্রয় প্রধান। যথা,

> শ্বাথদলে নাড্যঃ
> পরাস্তত্র চতুর্দ্দশঃ।
> তাসু ত্রিস্রঃ প্রধানাঃ স্যুঃ
> সর্ব্বতন্ত্রেষু সম্মতাঃ॥
>
> (সম্মোহন তন্ত্র, ২য় পটল।)

এই সর্ব্ব-প্রধানা নাড়ী-ত্রয়ের মধ্যে ইড়ানাম্নী যে নাড়ী, যোগীর শরীরস্থ

মেরুদণ্ডের বাম ভাগে উহা শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায়, শক্তিরূপা দেবী অমৃত-তুল্যা; উহার দক্ষিণে পুরুষাকার সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থান করিতেছে।

বামগা যাস্তিড়া নাড়ী
শুক্ল চন্দ্র-স্বরূপিণী।
শক্তিরূপা হি সা দেবী
সাক্ষাদমৃত-বিগ্রহা॥
দক্ষেতু পিঙ্গলা নাম
পুংরূপা সূর্য্য-বিগ্রহা।

অতঃপর মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে ঘোররূপা সর্ব্বজ্ঞানময়ী সুষুম্নানামক নাড়ী অবস্থিতা। এই নাড়ী দাড়িমী-কুসমোপমা রক্তবর্ণা। ইনি মূলাধার হইতে উৎপন্না হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন।

রৌদ্রাত্মিকা মহাদেবী
দাড়িমী-কুসুমোপমা।
মেরুমধ্য-স্থিতা যা তু
মূলাদাব্রহ্ম-বিগ্রহা॥
সর্ব্বজ্ঞান-ময়ী সা বৈ।
সুষুম্না কামরূপিণী॥

ঐ ইড়া নাড়ীতে চন্দ্র ও পিঙ্গলাতে সূর্য্যদেব বিচরণ করেন। যোগের নিদানজ্ঞ যোগী সূর্য্য উভয়কে বিচরণ করিতে দেখিবেন।

ইড়ায়াং সংচরেচ্চন্দ্রঃ
পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ।
জ্ঞাতৌ যোগনিদানজ্ঞৈঃ
সুষুম্নাস্থ জ্ঞাবুভৌ॥

এই সুষুম্না-নাড়ী-মধ্যে যোগীদিগের দুর্ল্লভা চিত্রিণী নামে যে নাড়ী আছে, সে অমৃতস্রাবিণী সর্ব্ব-দেবময়ী মঙ্গলদাত্রী। ইহা মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে।

মধ্যান্তরালে যা নাড়ী
চিত্রিণী যোগিদুর্ল্লভা।
অমৃত-স্রাবিণী দেবী
সর্ব্ব-দেবময়ী শুভা॥
বিসর্গাৎ বিন্দু-পর্য্যন্তং
ব্যাপ্য তিষ্ঠতি তত্বতঃ॥

এই চিত্রিণী-মধ্যগতা শঙ্খিনীনাম্নী অতি সূক্ষ্মা নাড়ী-চন্দ্র-সূর্য্য সম-প্রভা আর একসিঙ্গা নাড়ী আছে। তাহারই মধ্যে যে পথ আছে তদ্দ্বারা কুণ্ডলিনী যাতায়াত করেন। ইহা যোগীদিগের অতি গোপনীয়।

ঘটিতা শঙ্খিনী নালং
অবলম্ব্য গত্বা সুখং।
ব্রহ্ম-রন্ধ্রং বিদুস্তস্যাং
সূক্ষ্ম-সূত্রনিভং পরং॥

এই শঙ্খিনী নাড়ীকে যোগীরা ব্রহ্মরন্ধ্র বলেন; অর্থাৎ কুণ্ডলিনী দেবী যে পথ দিয়া পরব্রহ্মে মিলিত হন, ইহা সেই পথ বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র কহা যায়। এই পথ অতিসূক্ষ্মসূত্র-সদৃশ। কোন কোন তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ী মূলাধার অর্থাৎ কন্দ মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমমধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

ভ্রুবোর্ম্মধ্যে তু মিলিতা।
ত্রিবেণী কথ্যতে হ্যতঃ॥
ইড়ায়াং জাহ্নবী,
যমুনা পিঙ্গলান্তরে।
সরস্বতী সুষুম্নায়াং
বসতি দ্রবরূপিণী।
নাসাবিবরচারিণ্যাং
বাহ্যে সাধ্যে ধ্রুবং গতা॥

ইড়া নাড়ীতে জাহ্নবী; পিঙ্গলাতে যমুনা ও সুষুম্না নাড়ীতে সরস্বতী সর্ব্বদা প্রবহমান হইয়া নাসা-বিবর দিয়া ভ্রূ-যুগলে মিলিত হওয়ায়, ঐ স্থান প্রয়াগ তুল্য হইয়াছে।

পশ্চিমাভিমুখে যোনি-
গুদমেঢ্রান্তরালগা।
তত্র কন্দং সমাখ্যাতং
যত্রাস্তি কুণ্ডলী সদা।
সংবেষ্ট্য সকলা নাড়ী
সার্দ্ধং ত্রিকুটিলা কৃতিঃ।
মুখে নিবেশ্য সা পুচ্ছং
সুষুম্না বিবরে স্থিতা॥

গুহা আর লিঙ্গের মধ্যস্থলে নিম্নমুখী যোনি। এই যোনি-মণ্ডল কন্দ নামে খ্যাত। ইহার মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি সর্ব্বদা অবস্থান করে। ঐ কুণ্ডলিনী দেবী তত্রস্থ যাবতীয় নাড়ী-জালে বেষ্টিত হইয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গে সাড়ে তিন বেষ্টন করিয়া স্বপুচ্ছ মুখে দিয়া সুষুম্না নাড়ীর ছিদ্রের মধ্যে মুখ রাখিয়া নিদ্রা যান। যেরূপে ইহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তথাপি সামান্যাকারে লেখা প্রয়োজন বলিয়া লিখিত হইল। যোনি-মুদ্রা-বন্ধন করিলেই, কুণ্ডলিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। যোনি-মুদ্রা-বন্ধনে কুম্ভকের আবশ্যক।

নাসাবিবর-চারিণ্যাং
বাহ্যে মধ্যে ধ্রুবং গতা।
তন্মধ্যে চিত্রিণী নাড়ী
বিষতন্তুপমা স্মৃত।
সর্ব্ব দেবময়ী সা চ
সর্ব্ব-বর্ণযুতা যতঃ।
তয়া সংগ্রথিতান্যেব
ষট্ পদ্মানি ষড়ানন!

নাসারন্ধ্রের বাহিরে এবং ভিতরে মৃণাল-সূত্র-সমা চিত্রিণীনাম্নী নাড়ী গমন করিয়াছে। ইহা সর্ব্ব-দেবময়ী সর্ব্ব-বর্ণ-সংযুক্তা। এই নাড়ী দ্বারা ষট্চক্র গ্রথিত আছে।

ষট্চক্র। যথাঃ—

মূলাধারং তথা সাধিষ্ঠানঞ্চ,
মণিপূরক-মনাহতং
বিশুদ্ধাখ্যমাজ্ঞাখ্যা কথিতান্তরা॥

প্রথম মূলাধার; দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠান; তৃতীয় মণিপূর; চতুর্থ অনাহত; পঞ্চম বিশুদ্ধ; ষষ্ঠ আজ্ঞাখ্য। এই ছয়টি পথ যোগীদিগের নিতান্ত বিচিন্তনীয়; না করিলে মহান্ অভীষ্ট অসিদ্ধ থাকে।

গুদে লিঙ্গে তথা নাভৌ
হৃদয়ে কণ্ঠ-দেশকে।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে তথৈতানি।
পঙ্কজানি ষড়ানন!

গুহ্যদেশে মূলাধার; লিঙ্গ-মূলে স্বাধিষ্ঠান;

নাভিতে মণিপুর; হৃদয়ে অনাহত; কণ্ঠ-দেশে বিশুদ্ধ ও ভ্রূদ্বয়ে আজ্ঞাখ্য চক্র আছে।

কন্দোর্দ্ধে রক্তবর্ণং
সহস্রচ্ছদমম্বুজং।
কন্দ-লগ্ন-মূর্দ্ধমুখং
পঙ্কজাধারমুক্তমং॥

কন্দ স্থানের উপরি ভাগে আধার-পদ্ম অথচ উহা কন্দ-লগ্ন এই আধার পদ্ম রক্তবর্ণ সহস্র দল উর্দ্ধমুখী হইয়া আছে।

মূলাধারং তদূর্দ্ধে তু
রক্তবর্ণং চতুর্দ্দলং।
ব, শ, ষ, স চতুর্ব্বর্ণযুতং
কিঞ্জল্ক-শোভিতং॥
তদধশ্চ ক্ষিতেশ্চক্রং
চতুষ্কোণং সুশোভনং।
ঐরাবত-গজারূঢ়ো বসে-
ত্তত্র সুরেশ্বরঃ॥
ধরা-বীজাখ্য মধ্যে তু
শিশু-সৃষ্টিকরঃ সুখী।
বামা জ্যেষ্ঠা তথা রৌদ্রী
ত্রি-রেখা চ তদূর্দ্ধতঃ।
ত্রিকোণং তত্র বিজ্ঞেয়ং
শক্তি-পীঠং মনোহরং।
তদ্গহ্বরে কাম-বায়ু-
বীজরূপোঽতি চঞ্চলঃ।
অধোমুখীস্তত্র লিঙ্গং
স্বয়ম্ভুস্তেন চাল্যতে।
নীবার শূকর তুন্দী
কুণ্ডলী পর-দেবতা।
শঙ্খাবর্ত্তনিভা দেবী
সার্দ্ধং ত্রিবলয়াম্বিতা।
মুখেনাচ্ছাদ্য ব্রহ্মাধনং
তয়া সংবেষ্টিত প্রভুঃ।
ডাকিনী হ্যত্র বসতি
দ্বার-পালীশ যষ্টিকা॥

আধার-পদ্মের উর্দ্ধদেশে মূলাধার পদ্ম; ইহা চতুর্দ্দল ও রক্তবর্ণ। এই চতুর্দ্দলে ব, শ, ষ, স, বর্ণ চতুষ্টয় আছে। ইহার নিম্নদেশে ক্ষিতি-চক্র; উহা চতুষ্কোণ। এই খানে ঐরাবতারূঢ় দেবরাজ বিরাজ-মান। ইহার পর ধরা-বীজের ক্রোড়-মধ্যে শিশু-সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহার উর্দ্ধ দেশে বামা, জ্যেষ্ঠা, ও রৌদ্রী-নাম্নী রেখাত্রয়। এই রেখাত্রয়কে ত্রিকোণ শক্তি-পীঠ বলিয়া জানিতে হইবে। এই ত্রিকোণ-গহ্বরে বাঞ্ছিত বায়ু বীজরূপ অতি চঞ্চল। এই স্থানে অধোমুখী স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ নামে যে লিঙ্গ আছে, উক্ত বায়ু দ্বারা ঐ লিঙ্গ চালিত হয়।

এই লিঙ্গকে নীবার শুকর ওষ্ঠা কুণ্ডলিনী শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছেন। এই কুণ্ডলিনী দেবী নিজ আস্য দ্বারা ব্রহ্মমার্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে দ্বারপাল হইয়া ডাকিনী-শক্তি যষ্টি হাতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে।

যঃ সাধকোঽত্র বসতে,
স দিব্যো নৈব মানুষঃ।

যে সাধক কুম্ভক যোগাবলম্বন করিয়া এতাদৃশ মূলাধার চক্রে স্বীয় জীবাত্মাকে লইয়া যাইতে পারেন, তিনি দেবতা বৈ মনুষ্য নন।

স্বাধিষ্ঠানং তদূর্দ্ধেতু
অলক্ত-রুচি ষড়দলং।
ব, ভ, ম, য, র লৈ-
র্বর্ণ যুতং কিঞ্জল্কশোভিতং ॥
জলবম্বারুণং বীজং
ত্রিকোণঞ্চ তদূর্দ্ধকং।
বিন্দুরূপো মহালিঙ্গঃ
স একত্র প্রপূজকঃ॥
রাকিনী নাম বসতি
দ্বার-পালীশ যষ্টিকা ॥

মূলাধার পদ্মের ঊর্দ্ধ দেশে ষড়্দল অলক্তবর্ণ স্বাধিষ্ঠান পদ্ম। সেই পদ্মের প্রত্যেক দলে ব, ভ, ম, য, র, ল এই ষড়্বর্ণ সংযুক্ত।

ইহার ঊর্দ্ধদেশে ত্রিকোণ যন্ত্র আর বরুণ বীজ। এই খানে বিন্দুরূপী একটী প্রধান লিঙ্গ আছে, তাহাকে যোগী সকল যোগ দ্বারা আরাধনা করেন। যোগী ভিন্ন অন্যের এ লিঙ্গের দর্শন লাভ হয় না। এই স্বাধিষ্ঠান পদ্মে রাকিনী নামে যে শক্তি আছে, তাহা এখানকার দ্বার-পালীশ; ইহাও সযষ্টিকা।

মণিপূরং তদূর্দ্ধে তু
নীলং দশদলং শুভং।
ডাদিকান্তবর্ণ যুতং
বহ্নিবীজান্বিতং পরং ॥
কিঞ্জল্কস্থ ত্রিকোণে চ
রুদ্র লিঙ্গ ষড়ানন!
লাকিনী দ্বার-পালী চ
নিত্যং বসতি সুস্থিরা ॥

স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে নীলবর্ণ দশ দল মণিপূর নামক পদ্ম। এই পদ্মের প্রত্যেক দলে ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশটী বর্ণ আছে, মনে করিতে হইবে। ইহাতে আবার বহ্নি বীজ আর ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্র; রুদ্র লিঙ্গ ও লাকিনী শক্তি আছে। লিঙ্গের অর্থ ভৈরব; আর শক্তির অর্থ ভৈরবী।

অনাহতং তদূর্দ্ধে তু
পীতং দ্বাদশপত্রকং।
কাদিঠান্ত-বর্ণযুতং
স্বর্ণ-কিঞ্জল্ক-শোভিতং ॥
ত্রিকোণং তত্র বসতি
ঈশ্বরো নাম লিঙ্গকঃ॥
বায়ু-বীজং হংসরূপো
জীবো দীপ ইব জ্বলন্।
কাকিনী দ্বার-পালী চ
নিত্যমত্র সুখোষিতা।

মণিপূরের ঊর্দ্ধদেশে অনাহত নামে যে পদ্ম আছে, সেই পদ্ম পীতবর্ণ দ্বাদশ-দল; এই দল সকলে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, বর্ণে রঞ্জিত। ঐ পদ্ম মধ্যে ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্র; সেই যন্ত্রমধ্যে ঈশ্বর-নামক লিঙ্গ আছে। এ স্থানের বীজ বায়ুবীজ; হংসরূপ দীপ-শিখার ন্যায় জীব বাস করেন। এখান-কার দ্বারপালী কাকিনী নামক শক্তি নিত্য বাস করে।

বিশুদ্ধাখ্যং তদূর্দ্ধে তু
ষোড়শার্ণং সরোরুহং

ষোড়শস্বর-সংযুক্ত
ধূম্রবর্ণং ষড়ানন।।
ব্যোম-বীজঞ্চ কিঞ্জল্কে
ত্রিকোণমতি সুন্দরং।
সদাশিবোঽত্রবসতি
হাকিনী দ্বার-পালিকা।

অনাহত পদ্মের ঊর্দ্ধে বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম। এই পদ্ম ষোড়শ দল। এই দল সমূহ অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই সকল বর্ণে শোভিত। এই-পদ্ম ধূম্রবর্ণ। এখানকার বীজ ব্যোম বীজ। অত্রস্থ মন্ত্র ত্রিকোণ। এস্থানে সদাশিব নামে লিঙ্গ আর হাকিনী শক্তি সর্ব্বদা বাস করেন।

আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু
পুত্র! দ্বিদল-মণ্ডিতং।
কর্ব্বূরহ ক্ষলসিতং
মনোধিষ্ঠান-বঞ্জিতং।
ইতরো নাম লিঙ্গেঽত্র
সদা বসতি পূর্ব্ববৎ।
সর্ব্ব দেবালয়ে তত্র
কুরুতে রতিং।
সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা
নির্ব্বাণং সোঽধিগচ্ছতি।

বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের উপরি ভাগে ভ্রূদ্বয়-মধ্যবর্ত্তী দ্বিদল কর্ব্বূর বর্ণ; হ, ক্ষ,—এই দুই অক্ষরে রঞ্জিত আজ্ঞাখ্য পদ্ম। এখানে এই পদ্ম, মনের আধার। এখানে ইতর নামক লিঙ্গ সর্ব্বদা বাস করেন। ইতরানাম্নী শক্তি ঐ ইতর নামক শিবের সহিত এখানে সর্ব্বদা বিহার করেন।

যে যোগী এই সর্ব্ব-দেবালয় দ্বিদলে ক্রীড়া করেন, তিনি যাবতীয় সিদ্ধির ঈশ্বর হইয়া পরিণামে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।—

পৃথিবী ব্রহ্মণঃ শক্তি-
রাপো নারায়ণী তথা।
বহ্নিস্তু বৈষ্ণবী শক্তি-
রীশ্বরী বায়ুরীরিতা।
সদাশিবী স্বয়ং ব্যোম-
মনস্তিতর শক্তিকা॥

পৃথিবী ব্রহ্মার শক্তি; নারায়ণী শক্তি জল। অগ্নি বৈষ্ণবী শক্তি; ঈশ্বরী শক্তি বায়ু। ব্যোম সদাশিব শক্তি, ও ইতরা শক্তি মনঃ। এই ষট্‌চক্রের উপর উপর্য্যুপরি আর ছয়টি আধার আছে, তাহাদিগের বৃত্তান্ত। যথা:—

ইন্দুর্ল্লাটে তদূর্দ্ধং বোধিনী স্বয়ং
তদূর্দ্ধে চ মহানাদো লাঙ্গুলা
কৃতিরুজ্জ্বলঃ।
তদূর্দ্ধে চকলা প্রোক্তা যোগিনাং
যোগ-দুর্ল্লভা।
উন্মনী চ তদূর্দ্ধে তু যদ্যাত্মা ন
নিবর্ত্ততে।

ভ্রূদ্বয়ের উপরি ভাগে ললাটে পূর্ণচন্দ্র; ইহার উপরি ভাগে বোধিনী শক্তি। বোধিনী শক্তির উপরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাদ ৺; ইহার উপরে মহানাদ লাঙ্গুলাকৃতি / ইহার পর যোগদুর্ল্লভা কলা সকল। ইহার উপরে উন্মনী জ্ঞান-বিশেষ। ইহা গেলে আর নিবর্ত্ত হন না।

দ্বাদশান্তে দ্বাদশান্তং
দ্বাদশার্ণং সিতং শুভং।

কুণ্ডলী-রন্ধ্র কাণ্ডাস্তং
শ্রীগুরোরাসনং শুভং॥
সদা চোর্দ্ধ মুখং পদ্মং
তদ্বহিঃ পঙ্কজং শৃণু॥

মূলাধার হইতে উন্মনী পর্য্যন্ত দ্বাদশাধার আছে। সেই সকল অধারে যে যে বিষয় চিন্তা করিতে হয়, তাহা উপরে বলা হইল। ঐ সকল স্থান শ্রীগুরুর আসন। উক্ত দ্বাদশাধারের পর শুক্লবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম। এই পদ্ম সর্ব্বদাই উর্দ্ধমুখী হইয়া থাকে।

এই দ্বাদশদল পদ্মের উপরি ছত্রাকৃতি সহস্রদল শুক্লবর্ণ পদ্ম। এখানে যে তিনটি রেখা আছে, তাহাতে অ, ক, থ, এই বর্ণত্রয় শোভা পাইতেছে। এ স্থানে বিন্দুরূপী শিব অবস্থান করেন। এই পদ্মটি তালমূলে আছে। এই পদ্মের মূলদেশে অধোমুখ ত্রিকোণাকার একটি যন্ত্র। সেই যন্ত্রের মধ্যে সচ্ছিদ্র সুষুম্নানাড়ীর মূল; ইহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলে। সেই সুষুম্না-রন্ধ্রে কুণ্ডলিনী সর্ব্বদা অবস্থান করেন। এই ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সুষুম্না নাড়ীর মধ্যগতা কুণ্ডলিনীকে যে যোগী চিন্তা করেন, তাঁহারই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের ক্ষমতা জন্মে। এতদ্ভিন্ন অন্য রকমে ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষমতা জন্মিবার যো নাই।

করোতি রসনাং যোগী
প্রবিষ্টাং বিপরীতগাং।
লম্বিকোর্দ্ধেষু গর্ত্তেষু
ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহং।
অস্মিন্ স্থানে মনো যস্য
ক্ষণার্দ্ধং বর্ত্ততে চলং।
তস্য সর্ব্বাণি পাপানি
সংক্ষয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥

যে যোগী স্বীয় রসনাকে বিপরীতগামিনী করিয়া অর্থাৎ উল্টাইয়া উর্দ্ধলম্বিক গর্ত্তে অর্থাৎ তালুমূলস্থ গহ্বরে প্রবিষ্ট করিয়া যদি ক্ষণার্দ্ধকাল মনকে স্থিরভাবে রাখিয়া ঐ কুণ্ডলিনীকে ভাবনা করিতে থাকেন, তবে তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইতে পারেন।

ইহ স্থিতো যদা যোগী
ধ্যানং কুর্য্যান্নিরন্তরং।
তদা করোতি প্রতিমা-
প্রতিজল্প-মনর্থবৎ॥

যে সময় যোগসাধক স্বদেহস্থিত ষট্‌চক্র ও কুণ্ডলীকে নিরন্তর ধ্যান করেন, সে সময় তাঁহার যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়, তাহাতে তিনি প্রতিমা-পূজা ও জপ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপকে অনর্থবৎ বোধ করেন।

কুণ্ডলীকে যে রূপে নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া সুষুম্নার ছিদ্র হইতে তাঁহার মুখ-নির্গত করাইতে হয়, তাহাঃ—

প্রবেশিতাং চলাঙ্গুষ্ঠং
মুখে স্বস্য নিবেশয়েৎ।
তেনাত্র ন বহত্যেব
দেহচারী সমীরণঃ॥
যদা পূর্ণাসু সর্ব্বাসু
সংনিরুদ্ধানিলস্তদা।
বন্ধত্যাগে কুণ্ডলিন্যা
মুখং রন্ধ্রাদ্বহির্ভবেৎ॥

যে বায়ু নাসারন্ধ্র দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া দেহস্থ নাড়ী-সকলের মধ্যে সঞ্চরণ করত জীবের জীবনী-ক্রিয়া-সমাধা হয়, সেই প্রবিষ্ট দৈহিক সমীরণ যোনি-মুদ্রাদি মুদ্রাবন্ধনে অবরুদ্ধ হয়। তদ্ভিন্নও যোগী স্বীয় অঙ্গুষ্ঠকে আপন মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া চালনা করিলেই দেহস্থ বায়ু অবরুদ্ধ হইয়া তাবৎ নাড়ী বায়ুতে পরিপূরিত হইতে থাকে। ঐ সময় কুণ্ডলিনী বায়ুর বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সুষুম্নার ছিদ্র হইতে আপন মুখ বাহির করিয়া চৈতন্য লাভ করেন।

শিরঃস্থিত সহস্রার-পদ্ম-বৃত্তান্ত।

অত ঊর্দ্ধং সহস্রারং দিব্যরূপং সরোরুহং।
ব্রহ্মাণ্ডাখ্য দেহস্য বাহ্যে তিষ্ঠতি মুক্তিদং॥

তালুমূলের উপরে শিরোপরি এক অতি দিব্য শুক্লবর্ণ সহস্রদল কমল আছে; এই পদ্ম-চিন্তিত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেন। ইহা দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে আছে।

কৈলাসো নাম তস্যৈব
মহেশো যত্র তিষ্ঠতি।
অকুলাখ্যো বিনাশী চ
ক্ষয়-বৃদ্ধি-বিবর্জ্জিতঃ॥

এই শিরস্থ সহস্রদল পদ্মের নাম কৈলাস ধাম; এ স্থানে মহেশের বাস। অকুলাখ্য মহাদেবকে নকুল বলা যায়। ইনি নিত্য বিলাসী, ক্ষয়োদয়-রহিত। যোগীরা পরিশেষে ইহাঁকে চিন্তা করিয়া শিবত্ব লাভ করেন।

স্থানস্যাস্য জ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং
সংসারেঽস্মিন্ সম্ভবোনৈব ভূয়ঃ।
ভূতগ্রামাং সন্ততাভ্যাস যোগাৎ।
কর্ত্তুং হর্ত্তুং স্যাচ্চ শক্তিঃ সমগ্রাঃ॥

এই কৈলাস ধামকে যে যোগী জ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহার ইহ সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। এতাদৃশ যোগী ইহ সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তাদি সমস্ত কার্য্য-করণে ক্ষমবান হয়।

স্থানে পরে হংস-নিবাস-ভূতে
কৈলাস-নাম্নীহ নিবিষ্ট-চেতাঃ।
যোগী হত-ব্যাধি রধঃকৃতাধি
বায়ুশ্চিরং জীবতি মৃত্যু-মুক্তঃ॥

যে যোগিবরের কৈলাস নামক পরম-হংস-নিবাস শিরস্থিত সহস্রদল কমলে চিত্ত নিবিষ্ট হয়, তাঁহার আধি ব্যাধি নিধনাদি-রূপ যাতনা না হওয়ায় তিনি মৃত্যু পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরায়ু হন।

চিত্তবৃত্তি র্যদালীনঃ
কুলাখ্যে পরমাত্মনি।
তদাসমাধি সাম্যেন
যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ॥

যখন কুলাখ্য পরমেশ্বরেতে যে যোগি-বরের চিত্তবৃত্তি সকল বিলীন হয়, তখন সেই যোগিবর সমাধি-সাম্যতা-প্রযুক্ত নিশ্চলতা লাভ করিতে পারেন।

নিরন্তরং কৃত-ধ্যানাজ্জগদ্বিস্মরণং ভবেৎ।
তদা বিচিত্রসামর্থ্যং যোগিনো ভবতিধ্রুবং

ঐ সহস্র দল কমলস্থ কুলাখ্য শিবকে যে যোগী ধ্যান-যোগে সর্ব্বদা সন্দর্শন করেন, তিনি এই মায়াময় জগৎ বিস্মৃত হইয়া আশ্চর্য্য-ক্ষমতাশালী হন।

তস্মাদ্ গলিত পীযূষং
পিবেদ্যোগী নিরন্তরং।
মৃত্যোর্মৃত্যুং বিধায় স
কুলং জিত্বা বরাননে!

হে পার্ব্বতি! সেই দল পদ্ম হইতে বিগলিত অমৃত তুল্য মধু যে যোগী অনবরত পান করেন, তিনি মৃত্যুর মৃত্যু বিধান করিয়া, কুলজয় করত চিরজীবী হন।

অত্র কুণ্ডলিনী শক্তি র্লয়ং যাতি কুলাভিধা।
তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি র্লীয়তে পরমাত্মনি॥

এই সহস্রারে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান হেতু প্রথমে কুণ্ডলিনী শক্তির লয় হয়; তৎপর পরমাত্মাতে চতুর্ব্বিধা সৃষ্টিও বিলয়-প্রাপ্ত হয়—ইহা আত্মজ্ঞদিগের সম্বন্ধে; অন্যের নহে।

যজ্জ্ঞাত্বা প্রাপ্য বিষয়ং
চিত্ত-বৃত্তির্ব্বিলীয়তে।
তস্মিন্ পরিশ্রমং যোগী
করোতি নিরপেক্ষকঃ॥

যাহা জানিতে পারিলে, মন, বিষয় লাভ করিলেও মনোবৃত্তি সকল বিলয়-প্রাপ্ত হয়, সেই সহস্র দল কমলকে বিশেষরূপে জানিবার জন্য যোগী নিরপেক্ষ হইয়া পরিশ্রম করিবেন।

চিত্ত-বৃত্তি র্যদালীনা
তস্মিন্ যোগী ভবেদ্ধ্রুবং।
তদা বিজ্ঞায়তে খণ্ডং
জ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ॥

যখন যোগীদিগের চিত্তবৃত্তি সকল সহস্রদল কমলে বিলীন হয়, তখন যোগী অখণ্ড জ্ঞানরূপী নিরঞ্জনকে বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন। এতাবতা সহস্র-দল কমল অজ্ঞাত হইলে, অখণ্ড জ্ঞানরূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায় না। যোগী সকল যোগারূঢ় হইয়া নিরন্তর এই প্রকার স্বশরীরে সপ্ত লোক অর্থাৎ ভূ, ভুব, স্ব, জন, তপ, মহ, সত্য এই সপ্ত স্থান চিন্তা করিতে করিতে যখন সু-অভ্যস্ত হইল জানিলেন, তখন এই সপ্তলোকাতীত মহৎ শূন্যের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবেন। যথা—

ব্রহ্মাণ্ড-বাহ্যে সংচিন্ত্য
স্বপ্রতীকং যথোদিতং।
তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং
চিন্তয়েদবিরোধতঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অর্থাৎ সহস্রারের অতিরিক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বপ্রতীক চিন্তা করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, যোগী সেই স্বপ্রতীকে চিত্ত আবিষ্ট হইলে পর, অবিরোধে মহৎ শূন্যকে চিন্তা করিবেন।

আদ্যন্তমধ্য-শূন্যন্তু
কোটিসূর্য্য-সমপ্রভং।
চন্দ্রকোটী-প্রতিকাশ-
মভ্যাস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

যাহার আদিও শূন্য, মধ্যও শূন্য, শেষ শূন্য, অথচ কোটী সূর্য্যের আভায়

ন্যায় কেবল তেজোময় আর কোটী চন্দ্রের কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ পদার্থকে মহৎ শূন্য বলা হইয়াছে। সেই মহৎ শূন্যকে ধ্যান-যোগে যে পুণ্যাত্মা যোগী দেখিতে পান, তিনি পরমাত্মা-সিদ্ধ হন।

এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যা-
দনালস্যং দিনে দিনে।
তস্যস্যাৎ সকলা সিদ্ধি-
র্বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ॥

যে যোগী প্রত্যহ অনালস্য ভাবে এই মহৎশূন্য সর্ব্বদাই ধ্যান করেন, তিনি এক বৎসর কাল মধ্যে তাবৎ সিদ্ধিলাভ করেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা বলে।

ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র
মনো যস্য ভবেদ্ধ্রুবং।
স এব যোগী সদ্ভক্তঃ
সর্ব্ব-লোকেষু পূজিতঃ॥

যে যোগীর মন শূন্য ধ্যানে ক্ষণার্দ্ধকাল নিশ্চল হয়, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সাধু, তিনিই সদ্ভক্ত ও সর্ব্বলোকের পূজিত। ইতি শূন্য ধ্যান সমাপন। ইহারই নাম রাজযোগ।

অবিশ্বাসী ও অভক্ত ব্যক্তি ভিন্ন এ যোগে তাবতেই অধিকারী। ইহাতে আর্য্য অনার্য্য ও স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ নাই। সর্ব্বাবস্থায় এ যোগ-সাধনা হইতে পারে।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

সিন্ধু-দূত।

প্রথম স্তবক।

[ফরাসি বিপ্লবে বন্দীকৃত বীরের বিষয় অবলম্বন করিয়া]

নৈদাঘ মার্ত্তণ্ড মধ্য গগন-উপরে,
বরষে অনল রশ্মি দহিতে সংসারে!
বহিছে প্রচণ্ড বায়ু স্বনিয়া স্বনিয়া,
উড়িছে বালুকা তপ্ত দিক আবরিয়া।
দ্বীপ বাসী পশু পক্ষী আকুল উত্তাপে,
বনে ঝোড়ে বিবরে গহ্বরে কাল যাপে।
দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেল বৃক্ষ অগণন,
উজ্জল শ্যামল ফল পত্রে সুশোভন।
নির্ব্বাসিত জনের জীবন-সখাপ্রায়,
ভীষণ বিজন দ্বীপে রক্ষিতে আমায়,
সৃজিলেন বিধি এই পাদপ-সম্ভার,
ছায়া ফল জল এ'র জীবন আমার।
এ ভীষণ দ্বীপে আমি একা নির্ব্বাসিত,
জীবনের আশা নাই, রয়েছি জীবিত!
চতুর্দ্দিকে নীলানন্ত দুস্তর সাগর
শৈলাকৃতি উর্ম্মি-মালা গর্জ্জি ঘোরতর,
অবিরাম বেলা-ভূমে হ'তেছে প্রহৃত।
প্রলয়ের মেঘ যেন হুঙ্কারে সতত!
প্রত্যেক আঘাতে মনে হতেছে আমার,
দ্বীপ-বিন্দু রসাতল গেল এই বার!

স্থির হও মহাসিন্ধো ! রাখ নিবেদন
এ হেন প্রচণ্ড ভাব কর সম্বরণ।
নীচ নই, দস্যু নই, নই পাপাত্মন্,
কৃপার প্রত্যাশী নই, প্রাণের কারণ,
কোন রূপে অশ্রদ্ধার পাত্র নই আমি,
নির্ব্বাসিত বলি ঘৃণা করিও না তুমি।
যে কারণে নির্ব্বাসন ঘটেছে আমার,
শুনিলে সে কথা, দয়া হইবে তোমার,
নীচ কুলে জন্ম নহে, আছে পিতা মাতা,
আছে প্রাণ-সহোদর, ভ র্য্যা পতিব্রতা।
আছে ছোট ছোট প্রাণ-কন্যা ঘরে।
আছে প্রেমাস্পদ বন্ধু, আমার সংসারে।
আছে ধন-মান-ধর্ম্ম, যশঃ স্বদেশেতে
নির্ব্বাসিত বলি' ক্রোধ করিও না চিতে।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম সার সত্য " মানব-প্রেমেতে "
—হইয়া দীক্ষিত জেতৃ দস্যু-হস্ত হ'তে,
স্বদেশ, স্বজাতি-স্বত্ব উদ্ধারের তরে
ক'রেছি তুমুল যুদ্ধ 'বাক্যে' 'তলয়ারে।'
আশা ছিল মনে হয় জিনিব সমর,'
না হয় সংগ্রামে ম'রে হইব অমর !
জিনিতে যদ্যপি পারি, শত্রুর সংগ্রাম,
স্বদেশ-উদ্ধার হবে র'বে ভবে নাম,
পরাস্ত যদ্যপি হই, যুদ্ধে হই হত,
তাতেও মঙ্গল,—সবে দেখে শিখিবে ত,
স্বদেশ-উদ্ধার-তরে আত্ম-সমর্পণ,
করিলে অক্ষয় স্বর্গ—অভ্রান্ত বচন ?
তাও যদি মিথ্যা হয়, মনুষ্য সকলে
আপনার ন্যায্য স্বত্ব বুঝিবে ত কালে ?
দেখিবে ত আত্ম-ত্যাগ মানব-সংসার
শিখিবে ত স্বদেশীয়, স্বদেশ-উদ্ধার ?
শিখিবে সে ব্রতাহুতি আত্ম-সমর্পণ,
শিখিবে মানব-প্রেম গরিষ্ঠ কেমন !
শিখিবে মানব-স্বত্ব দস্যুতে হরিলে
এই রূপে উদ্ধারিতে হয় ধরাতলে।
এই ভাবি' জাতীয়ত্ব উদ্ধার করিতে
হয়েছিনু অগ্রসর ঘোর সংগ্রামেতে।
বিপক্ষের বহু সৈন্য করেছি বিনাশ,
পিয়েছি শত্রুর রক্ত মিটায়ে পিয়াস।
কিছু ক্ষণ এই ভাবে হ'ত যদি রণ,
নিশ্চয় হ'তাম জয়ী, জাতীয় কেতন,
উড়িত সগর্ব্বে শত্রু-দুর্গের উপরে,
একটী বিপক্ষ নাহি, থাকিত সংসারে।
বিজেতার সিংহাসন ভীম পদাঘাতে,
রেণু রেণু চূর্ণিতাম, সন্দেহ কি তাতে ?
থান থান করি দুর্গ উড়াতাম বলে
উপাড়িয়া বৈজয়ন্তী ফেলাতাম জলে !
কিন্তু কি বলিব হায় ! বিদরে হৃদয়,
আত্মীয়ের কৃতঘ্নতা প্রাণে নাহি সয়।
জাতীয় শোণিত-পানে পুষ্ট কলেবর
ছদ্মবেশী দস্যু ছিল, সৈন্যের ভিতর।
স্বজাতি স্বদেশী হ'য়ে কৃতঘ্ন পামর
ধন-লোভে ভঙ্গ দিয়া সম্মুখ সমর
কি করিল ? অহো ! সেই দারুণ ঘটনা
আত্মহত্যা-কথা আর বলিতে চাহি না।
নির্ব্বাসন-দুঃখ সহ্য হয় কোন মতে
স্বজাতির কৃতঘ্নতা পারি না সহিতে !
অহো যাদঃপতি ! মম, মিনতি চরণে
রুদ্র-মূর্ত্তি পরিহার করুন এক্ষণে।
স্বদেশ, স্বজাতি, আত্ম-বান্ধব প্রভৃতি
সকলের কাছে মাগি বিদায় সংপ্রতি !

মুক্ত কণ্ঠে আত্ম-কথা কহি সকলেরে,
তাহাদের কর্ণে কহ প্রতিধ্বনি ক'রে
তাতেও সম্মত যদি, না হও সাগর!
ক্ষণকাল স্থির হও, খুলিয়া অন্তর,
উচ্চ স্বরে গাই স্বীয় দুঃখের সঙ্গীত
মর্ম্মভেদী, শৈলভেদী, আমার সে গীত,
তোমার বিশাল বক্ষ অতিক্রম ক'রে
প্রবেশিবে জন্মভূমি শ্রবণ-কুহরে,
আর কোন আশা নাই, আমার সংসারে,
বক্তব্য যা আছে তাহা, শেষ হ'লে প'রে,
তোমার প্রশান্ত বক্ষে দিব সন্তরণ
লঙ্ঘিব উদ্দেশ্য, নহে অনন্ত জীবন
তোমার অনন্ত বক্ষে ভাসিব বারিধি!
স্থির হও, এই ভিক্ষা মাগি জল-নিধি!

ইতি প্রথম স্তবক সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় স্তবক।

১

এ কি এ? সাগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত না জানি ভেবেছি কত?
প্রভাত হইতে ব'সে রয়েছি এখানে, বাহ্য জগত পাসরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাই মোর; সব ত্যজেছে আমারে।

২

সাগর! শুনিলে না কি মিনতি আমার? তাই হয়েছ সুস্থির?
উত্তাল তরঙ্গ-মালা কম্পিত করে না বেলা,
অনন্ত নীলাম্বু-রাশি নীলাম্বর-সম এবে প্রশান্ত গম্ভীর!
নীরব প্রকৃতি, ধীরে বহিছে সুগন্ধ-সিক্ত প্রদোষ সমীর।

৩

শুভ্র ফেন পুষ্প-স্তূপে সজ্জিত সৈকত-বেলা দেখাই বা কায়?
দূর নীলাম্বর,পরে এক দুই তিন ক'রে
অসংখ্য তারকা-রাজি ফুটিছে নীরবে! ঐ গগন-সীমায়,—
উঠিতেছে পূর্ণ চন্দ্র আহা মরি মরি! শোভা কহা নাহি যায়;

৪

লুটায়ে পড়েছে নীল সাগরের জলে নীলাম্বর-পট-লেখা।
উপান্তে উঠিছে শশী নাশিয়া তিমির-রাশি,
জল-নিধি হ'তে যেন উঠে কলা-নিধি, চারু কৌমুদীর সখা।
লুটায়ে পড়েছে নীল সাগরের জলে নীলাম্বর-পট-লেখা!

৫

ভাতিছে সুধাংশু-করে সাগর-সৈকত-বেলা, দ্বীপ-তরুচয়,
নারিকেল বৃক্ষাবলি সায়াহ্ন-সমীরে ঢুলি,

চন্দ্র-করে চক্‌মক্‌ চাহি মোর পানে কিবা কহে সদাশয় ?
বুঝেছি বুঝেছি আর বলিতে হবে না ধন্য তুমি সহৃদয় !

৬

এ হেন দারুণ স্থানে বান্ধব আমার মাত্র তুমি তরুবর,
ক্ষুধা পাইয়াছে ব'লে ডাকিছ কি বাহু তুলে ?
ধন্য তুমি পুণ্যবান্ ধন্য তব ছায়া, ধন্য কোমল অন্তর।
এ হেন দারুণ স্থানে বান্ধব আমাব মাত্র তুমি তরুবর।

৭

গ্রীষ্মের আতপ-তাপে বরিষাব জলে যবে হই হে কাতর,
তুমি না থাকিলে পরে সে সময়ে কেবা মোরে
পিতৃ তুল্য পত্র রূপ বাহু বিস্তারিয়া রক্ষা করে তরুবর ?
আশ্রয়ে জনক-সম স্নেহ মম প্রতি, তুমি দয়ার সাগর,

৮

ক্ষুধানলে যখন জঠর জ্বলে যায় ফাটে তৃষ্ণায় হৃদয়।
এ দারুণ দ্বীপ-মাঝে কেবা জিজ্ঞাসিতে আছে ?
জননীর মত তুমি সুস্বাদু সুপেয় ফল জল সে সময়
যোগাও আমারে যত্নে এ জীবনে তব ঋণ শুধিবার নয়।

৯

দ্বীপ-চর ভীষণ শ্বাপদ কুল যবে, আসে নাশিতে আমায়।
দুর্ব্বলের বল হ'য়ে অভাগারে স্কন্ধে লয়ে,
সে সময়ে রক্ষা কর অতি সাবধানে জ্যেষ্ঠ সহোদর-প্রায়,
শঙ্কটে সহায় তুমি তব সম দুখে দুখী কে আছে হেথায় ?

১০

নির্ব্বাসন-ক্লেশ যবে অসহ্য হইয়া মোরে করে উৎপীড়ন,
আগে পাছে চারি ধারে মৃত্যু আসে গ্রাসিবারে,
সমস্ত সংসার পরে আশা তৃষ্ণা কিছুমাত্র থাকে না যখন,
প্রমোদা পত্নীর বেশ ধরি মনোরম, কর আশ্বস্ত তখন,

১১

কখনো সুধাংশু-রশ্মি মাখি শ্যামাঙ্গেতে, প্রেম ঢল ঢল চিতে
চাও অভাগার পানে কখনও সরল প্রাণে
কোমল শ্যামল পত্রহস্ত গাত্রে দিয়ে মোরে তোষ বিধিমতে,
কখনো সুকল-কণ্ঠ বিহঙ্গ-কুলেরে ডাকি আনি নিকুঞ্জেতে।

১২

গাহাও সঙ্গীত, পুনঃ যাগাও জীবন-আশা, স্মৃতি সুখময়,
প্রেমময়ী প্রিয়া-ধনে দেখি যেন সন্নিধানে,
ফুটে শুষ্ক হৃদি ফুল, ছুটে গন্ধবহ যেন বসন্ত উদয়!
জন্মভূমি আত্ম-বন্ধু গৃহ সুখ-রাশি চক্ষে দেখি সমুদয়।

১৩

আহা। কি বলিতেছিনু গিয়েছি ভুলিয়া নাই মনের বন্ধন,
আকাশ-কুসুম যাহা কেন চিন্তা করি তাহা?
কোথা জন্ম-ভূমি? কোথা প্রেয়সী আমার? আমি কোথায় এখন?
যা হ'বার নয় তাই উদ্ভ্রান্ত হইয়া কেন ভাবি অকারণ?

১৪

ক্ষণেক দাঁড়াও তরু। হ'য়েছে নীরব সিন্ধু এই অবসরে,
নাশিতে মর্ম্মের ব্যথা কহিব মনের কথা,
শুনে বা না শুনে কেহ সেই সে কারণে দুঃখ নাহিক অন্তরে,
অভাগার দুঃখ গীতি কে আর শুনিবে? যাবে মিশায়ে অম্বরে।

১৫

আহা। সেই সন্ধ্যা, সেই নক্ষত্র চন্দ্রমা, সেই সুনীল গগন,
সেই ধীর সমীরণে ফুলগন্ধ-বিতরণে
তুষিছে প্রকৃতি, সেই আমিও রয়েছি, তবু উদাস ভুবন।
জন্মভূমি আত্ম-বন্ধু ত্যজেছে আমায় এই দুঃখের কারণ।

১৬

মাতর্জন্মভূমে! বিশ্ব সুন্দরি আনন্দময়ি জননি আমার,
তোমার অভাবে মম সংসার শ্মশান সম,
সন্তানে চরণে কেন ঠেলিলা জননি? এই স্নেহ মা তোমার?
কি দোষে সন্ন্যাসি-বেশে দিলি মা বিদায় মোরে সাগরের পার?

১৭

এত যদি ছিল মনে, ভূমিষ্ঠ-কালেই কেন নাশিলা না মোরে?
শৈশবে করিয়া কোলে স্তন দুগ্ধ কেন দিলে?
কৈশোরে সাদরে শিক্ষা কেন দিলে মাতঃ! আত্ম-উদ্ধারের তরে?
যৌবনে সন্তানে যদি ভাসাইবে এ অকূল দুস্তর সাগরে?

১৮

কায়-মনঃ-প্রাণে তব চরণে বিকায়ে আছি চিরদিন তরে
কখনও ও চরণেতে দোষী নই কোন মতে,
বিজেতা দস্যুর হাতে উদ্ধারিতে তোমা, বলি দিয়াছি আত্মারে,
যেখানেই থাকি মাতঃ! তোমারি সন্তান, দয়া রাখিও আমারে!

১৯

জন্ম, বৃদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম তোমারি কৃপায়, মাতঃ! আশা ছিল চিতে,
য' দিন জীবিত রব তব ক্রোড়ে নিবসিব,
তব স্নেহ-সুধা পিব, মাখিব চরণ-ধূলি সাদরে অঙ্গেতে।
অন্তিমে তোমার কোলে করিয়া শয়ন সুখে মিশাব তোমাতে,—

২০

কিন্তু কি বলিব হায়! বিজেতা কুক্কুরে উঠি বক্ষের উপরে,
তব হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি আকণ্ঠ উদর পূরি,
রক্ত, মাংস খায় অস্থি চিবায় নির্ম্মল ইহা সহে কি অন্তরে?
যে সহে সে নরাধম, শৃগাল-সমান হীন মনুষ্য সংসারে!

২১

সহিতে না পারি তব দুঃখ নিদারুণ কক্ষে বাঁধি তরবার।
দুর্জ্জয় রসনা-বলে জাগায়ে জাতীয় দলে
জাতীয় গৌরবে মাতি শত্রু-সৈন্য তরঙ্গেতে দিলাম সাঁতার।
প্রতিজ্ঞা আছিল মথি সংগ্রাম-সাগর রত্ন করিব উদ্ধার।

২২

না হয় ডুবিব ঘোর অতল সলিলে! প্রাণ যাবে সংগ্রামেতে,
তুমি পুত্র-স্নেহ-ভরে কোলে তুলে লয়ে মোরে,
তব বীর-পুত্র-রক্ত-মাংস-অস্থি-আদি তব পবিত্র মাটিতে
অনন্ত কালের তরে মিশাবে, সুখ মাতঃ! নাই এ ভাগ্যেতে।

২৩

আত্মীয়-চক্রান্তে মাতঃ! পশুর সমান বন্দী করি কৌশলেতে,
অস্ত্রহীন ক'রে মোরে পাঠায়েছ দ্বীপান্তরে।
সাগরের পারে হীন তস্করের মত, মোরে হবে কি মরিতে?
তোমার এ বীর পুত্র বীরের মতন কার্য্য পারে না করিতে?

২৪

কেন না পারিব? আমি এতই কি হীন? তুচ্ছ সাগর-পরিখা,
কত ক্ষণ তরিবারে যদ্যপি প্রতিজ্ঞা ক'রে
সন্তরি এ সিন্ধু-বিন্দু, পারি কি না যেতে পারে যায় তাহা দেখা।
কে ডরে মৃত্যুরে? কিম্বা কে ডরে সাগরে? এত সামান্য পরিখা!

২৫

কিন্তু, ইচ্ছা নাই আর বিশ্বাস-ঘাতকদিগে দেখাইতে মুখ,
স্বদেশী স্বজাতি হ'য়ে আপনি আপনা খেয়ে,
নরক-কুক্কুর-কুল কি করিলি? অহো। মনে ঐ বড় দুখ!
যাব না ফিরিয়া আর বিশ্বাসঘাতকদিগে দেখাব না মুখ।

২৬

এই দ্বীপ-মাঝে প্রাণ-দীপ যা'ক নিভে'। তায় কি দুখ অন্তরে?
এই ত বিজন বনে ফুটে ফুল অকারণে
শুকাইছে খসিতেছে যাইতেছে কোথা? কেহ দেখে না উহারে,
আমিও উহার মত বিশুষ্ক বিচ্যুত হ'য়ে মিশাব অম্বরে।

২৭

কিছুই প্রার্থনা নাই তোমার চরণে, মাতঃ! বিদায় এক্ষণে,
য দিন জীবিত রব তোমারি মহিমা গা'ব,
তোমারি সন্তান আমি রহিব সংসারে, এই দ্বীপ-নির্ব্বাসনে
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তন্ময় সর্ব্বত্র মম হয়েছে এক্ষণে।

ইতি দ্বিতীয় স্তবক সমাপ্ত।

তৃতীয় স্তবক।

১

গভীর রজনী, স্থির নীরব প্রকৃতি, বিশ্ব ঘুমে অচেতন,
ঘুমায় গগন, পৃথ্বী, সিন্ধু, সমীরণ
নৈশ নীলাম্বর তলে প্রেয়সী কৌমুদী কোলে,
ঘুমায় সুধাংশু চারু শর্ব্বরী-রঞ্জন,
ফেন-পুষ্পহার-কণ্ঠ সাগর-সৈকত-বেলা ঘুমায় এখন,

২

ঘুমায় পাদপ লতা, পশু পক্ষী আদি; মাত্র আমিই জাগ্রত,
সবাই ত্যজেছে দীনে জনমের মত,
অভাগা ভাবিয়া মোরে নিদ্রাও অশ্রদ্ধা ক'রে
সম্ভাষে না, হায়! যদি ভ্রমে কদাচিত,
আসে নিদ্রা স্বপ্ন আসি বসিয়া শিওরে স্মৃতি ক'রে উদ্বোধিত।

৩

শত শত সুখ-চিত্র ধরিয়া সম্মুখে মোরে ভুলায় কুহকী।
যুগপৎ সম্পদ সৌভাগ্যে করে সুখী,
পর ক্ষণে হায় হায়! নিদ্রা যবে ছেড়ে যায়,
শূন্য-প্রায় সকল সংসার চক্ষে দেখি!
আশা-ভঙ্গে সুখ-ভঙ্গে মর্ম্ম ভেঙ্গে যায় মৃত-প্রায় পড়ে থাকি।

৪

হায়! সে কথায় কার্য্য কি আছে এখন? এই গভীর নিশীথে
একাকী বসিয়া আমি সাগব-সৈকতে,
ঐ বাড়বাগ্নি-প্রায় কেন জ্বলে মরি হায়?
চিন্তানলে আত্ম-ভস্ম করি কি জন্যেতে?
যা হ'বার হইয়াছে, কে পারে সংসারে নিজ অদৃষ্টে লঙ্ঘিতে?

৫

পারে না লঙ্ঘিতে? তবে চিন্তা করিব না? না না শুনি না সে কথা,
উহা ন্যায় দর্শনের প্রবোধ বারতা!
কার্য্যে অপারগ যেই অদৃষ্টের দাস সেই,
কার্য্যের জীবন চিন্তা, চিন্তা শাস্তি হেথা।
চিন্তা প্রাণ-সখী যদি না র'ত সংসারে তবে দাঁড়া'তাম কোথা?

৬

এস চিন্তে! প্রিয়তমে! স্বদেশের সুখ-স্বপ্ন করি হে স্মরণ,
যদিও স্বদেশ মোরে ত্যজেছে এখন,
যদিও স্বদেশীগণে বারম্বার অকারণে
করেছে আমারে ঘোরতর নির্য্যাতন,
তথাপি আমার তারা, স্বদেশীয় একারণে নিতান্ত আপন।

৭

সকলেই কিছু দোষী নহেক, অনেকে মম বন্ধু প্রিয়তম,
অনেকে মানস শিষ্য প্রিয় প্রাণোপম,
অনেকে সত্যের লাগি যথার্থই অনুরাগী
ছিল মোর, কিন্তু তারা ভীরু ফেরু সম
আশঙ্কায় অপ্রকাশ থাকুক, তথাপি তারা স্নেহাস্পদ মম।

৮

স্বদেশীয় শত্রুমিত্র সমান সকলে, অহো প্রিয় ভ্রাতৃগণ!
গত কর্ম্ম কত আর করিব স্মরণ?
স্বদেশ উদ্ধার-তরে কহি পুনঃ সকাতরে,
কহি নাই আপনার উদ্ধার কারণ,
আমার যা হইবার গেছে হ'য়ে র'য়ে ইহ জন্মের মতন!

৯

স্বদেশে সমান স্বত্ব স্বার্থ সকলের বুঝে দেখ মনে মনে,
ধর্ম্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় থাকুক এখানে।
যারা এক দেশবাসী সুখদুঃখে একভাষী,
এক রাজনীতি সূত্রে আবদ্ধ জীবনে।
জন্ম মৃত্যু জীবিকার একই মৃত্তিকা, দেহ এক উপাদানে।

১০

তাহারা স্বতন্ত্র নহে এক পরস্পরে ইহা অভ্রান্ত বচন,
স্বদেশের তরে সম দায়ী সর্ব্বজন,
যোষা, শিশু, বৃদ্ধ, জরা পীড়িত আতুর যারা,
তারা ছাড়া স্বদেশীয় প্রৌঢ় যুবাজন,
সকলে জাতীয় স্বত্ব-রক্ষার কারণে কর আত্ম-সমর্পণ।

১১

ধর্ম্ম বর্ণ সম্প্রদায় ত্যজি পুনর্ব্বার কর উত্থান সকলে
জয় পরাজয় ইহা আছে সর্ব্বকালে।
হও যদি পরাজয় তাতেই কি আছে ভয়?
পরাজয়ে সহিষ্ণুতা শিখিবে সকলে।
পরাজয় তোমাদিগে জয়ের দুন্দুভি-শব্দ শুনাইবে কালে।

১২

আমার এ নির্ব্বাসনে হ'ও না হতাশ, ইথে আমিই গিয়েছি।
প্রকৃতির অণু আমি খসিয়া এসেছি।
আমার অভাবে ভাই কারো কিছু ক্ষতি নাই,
সকলি তাহাই আছে দেখিতে পেতেছি,
আমার এ নির্ব্বাসনে হ'ও না হতাশ ইথে আমিই গিয়েছি।

১৩

তাতেই কি ক্ষতি ভাই? ইহাই ত বীরত্বের দিব্য পুরস্কার,
রণে নির্যাতনে মৃত্যু বাঞ্ছাই আমার
তাহে কৃতকার্য্য হ'লে পুরুষত্ব বীর ব'লে!
বিজয়ীর সুখোন্মাদ কহে সাধ্য কার?
অভাগার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না, এই দুঃখ রহিল এবার।

১৪

তোমা সবাকারে ভাই এসেছি রাখিয়া জন্মভূমি শ্মশানেতে,
কর শাক্ত অনুষ্ঠান গভীর নিশীথে,
সাধিতে সাধিতে ভাই সিদ্ধকাম হবে যাই
অমনি করিবে শব-সাধন যত্নেতে।
আশঙ্কা কি সফলতা সম্মুখে প্রত্যক্ষে আমি পেতেছি দেখিতে।

১৫

অহো ভ্রাতৃগণ! পূর্ব্বে যা ছিল তা ছিল, এবে থাকিবে না আর।
এক ব্যক্তি অসংখ্যের ন্যায্য অধিকার,
আত্মসাৎ করি ব'লে এই বসুন্ধরা-তলে
ক'দিন তিষ্ঠিবে? এই মনুষ্য-সংসার
ক'দিন থাকিবে অন্ধ আতুরের মত? অহো! কি কহিব আর?

১৬

সাগরের পারে প্রাণ যাবে অকারণ, যদি পারে যেতে পারি।
দেখি পুনর্ব্বার ভাই পারি কি না পারি!
না পারি মরিয়া রণে ভক্তি-পুলকিত প্রাণে,
জন্মভূমি-পদে যদি বলি দিতে পারি,
তা হ'লে এ হ'তে মৃত্যু হইবে সফল তাহে সন্দেহ না করি।

১৭

কিন্তু সে দুরাশাময়, তোমরা সকলে ভাই বীর-অবতার,
সকলে মিলিয়া যদি কর মহামার,

কার সাধ্য রোধিবারে ক্ষিপ্ত সিন্ধু-তরঙ্গেরে ?
অসংখ্য প্রচণ্ড উল্কা ধাঁধিয়া সংসার,
পড়ে যদি ভীম বেগে আকাশ হইতে তাহা রোধে সাধ্য কার ?

১৮

ত্যজি হিংসা অবিশ্বাস ভীরুতা আলস্য সবে মিলি এক প্রাণে,
আত্ম-বলি দাও জন্মভূমির চরণে,
চর্ম্ম-বর্ম্ম-তরবার বল্লম করাল ধার
সংগ্রাম-পতাকা আর বন্দুক সঙ্গীণে
সাজিয়া সত্বর ভাই ! হও অগ্রসর পুনঃ মহাঘোর রণে।

১৯

স্বদেশ-উদ্ধার যদি পার করিবারে ভাই ! পার করিবারে,
পুরুষত্ব, মহত্ব রহিবে এ সংসারে,
জীবিতে যদ্যপি ভাই যথার্থই ঘটে তাই,
শুনাও সে কথা তবে এই অভাগারে,
সে কথা শুনিয়া যদি এই দ্বীপ-মাঝে আমি পারি মরিবারে।

২০

তা'হলেই মনোরথ পূর্ণ হবে মোর, মৃত্যু হইবে সুখেতে।
ভুলিব সমস্ত দুঃখ হাসিতে হাসিতে !
এ মোর প্রার্থনা ভাই ! আর কোন আশা নাই,
দয়া করি অভাগায় রাখিও মনেতে।
যদ্দিন বাঁচিব ভাই ! তোমাদরি র'বে ইহ সংসার-মাঝেতে।

ইতি তৃতীয় স্তবক।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ম্যাট্‌সিনি ও নব্যইতালী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দ সুইস্‌-ক্ষেত্রে ভবিষ্য জাতীয় সমবায়ের ভিত্তি-ভূমি 'নব্য ইউরোপ' সমাজ প্রতি-ষ্ঠাপিত করিলেন বটে, কিন্তু উপ্ত বীজ

অঙ্কুরে পরিণত হইতে না হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে নির্যাতন-স্রোত সুইস-ক্ষেত্রে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল। নির্ব্বাসিত-গণ দলে দলে ধৃত হইয়া অপরাধিগণের ন্যায় কতক সীমান্ত-প্রদেশে, কতক ইংলণ্ডে ও কতক আমেরিকায় প্রেরিত হইতে লাগিলেন। কতকগুলি নির্ব্বাসিত কৃত্রিম নাম গ্রহণ করিয়া সুইস্ ক্যাণ্টন সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী গ্রামসকলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইতালীয় নির্ব্বাসিতগণ অধিকতর অনুসৃত হইলেও অতি কষ্টে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। ম্যাট্‌সিনি জেনিভা পরিত্যাগ করিয়া রুফিনি নামক ভ্রাতৃদ্বয় ও মেলিগারি সমভিব্যাহারে লসন্ ক্যাণ্টনে পলায়ন করিয়া অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা কিছু দিন পরেই বারণ-নগরে বাস করিবার অনুমতি পাইলেন।

নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা দ্বি-শতের অধিক ছিল না, তথাপি সমস্ত ইউরোপ ইহাঁদের ভয়ে সমাকুল! সমস্ত ইউরোপীয় রাজ্যই ইহাঁদিগের উন্মূলনে বদ্ধ-পরিকর। সমস্ত রাজ্য হইতেই দলে দলে পুলিশ কর্ম্মচারী, দূত, রাজ-নৈতিক কর্ম্মচারী সকল বিবিধ গুপ্তবেশে আসিয়া সুইজর্লণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

এই সকল নর-কুক্কুর আসিয়া নির্ব্বাসিত-গণের অনুসরণ আরম্ভ করিল। শকুনী গৃধিনী প্রভৃতি যেমন মৃত গো-দেহের উপর আসিয়া পড়ে, সেইরূপ ইহারা আসিয়া তাহাদিগের উপর পড়িল। চতুর্দ্দিক হইতে সুইজর্লণ্ডের উপর আদেশ আসিতে লাগিল যে, অবিলম্বে নির্ব্বাসিতদিগকে দূরীকৃত করিয়া দেও, নতুবা তোমার উপর আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।

কিন্তু ইউরোপ বাহ্যিক দেখাইতেন যে, নির্ব্বাসিতগণকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। রাজকীয় পত্রিকা সকল ইহাঁদিগকে অনভিজ্ঞ, বিদ্যালয় হইতে নব-বহির্গত বালকমাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিত; বাঁজাকাবে ষড়যন্ত্রী, নৈতিক উন্মাদগ্রস্ত, স্বপ্নদর্শী এবং অসম্ভবানুসারী বলিয়া পরিহাস করিত; বলিত, যে ইহাদিগের শিক্ষার জন্য ইহাদিগকে শাস্তি দেওয়া উচিত বটে, কিন্তু ইহাদিগ হইতে কোন আশঙ্কা নাই।

ভ্রান্ত ইউরোপ! যাহাদিগকে তোমরা অনভিজ্ঞ বালক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলে, আজ তোমরা তাহাদিগের ভয়ে আকুল। যাহাদিগকে অনতিপ্রৌঢ় যুবা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ, ঐ দেখ! তোমাদিগের দৌরাত্ম্যে তাহাদিগের অকাল-বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ! তাহাদিগের ললাটে গভীর চিন্তার রেখা এবং মুখ-চ্ছবি বিষাদে মাখা। কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিও না যে, তাঁহাদের হৃদয় আনন্দপূর্ণ নয়। যদিও মাতৃস্নেহে ও পারিবারিকাদি সুখে

রক্ষিত, তথাপি তাঁহাদিগের অন্তর ভবিষ্য পবিত্র সুখের আশায় সমুজ্জ্বলিত। তাঁহারা নূতন জগতের, নূতন মন্ত্রের, ও নূতন তীর্থের যাত্রী। তাঁহাদের তীর্থযাত্রার প্রারম্ভে যেন কোন দেবতা আসিয়া তাঁহাদিগের কাণে কাণে বলিলেন 'বৎসগণ! তোমাদের হৃদয়ে আত্মম্ভরিতা নাই বলিয়া এবং তোমরা স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গলোদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিয়াছ বলিয়া, আমি তোমাদিগের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আজ আমি তোমাদিগকে একটী নবীন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আসিয়াছি। এই ধর্ম্মের লক্ষ্য বিশ্ব-জনীন ভ্রাতৃত্ব-ভাব ও বিশ্বব্যাপী প্রেম; এবং ইহার সাধন হৃদয়ের পবিত্রতা। এই ধর্ম্মের মোহিনী শক্তি-বলে তোমরা সমকালিক লোকবৃন্দ হইতে সমধিক সমুন্নত হইবে।'

দেবীর এই আশ্বাস-বাক্যে তাঁহাদিগের নয়ন উন্মীলিত হইল। এখন এক অলৌকিক দৃশ্য তাঁহাদিগের নয়ন সমক্ষে আবির্ভূত হইল। অশীতিবর্ষ-বয়স্কেরাও যাহা দেখিতে না পান, আজ তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, নবজগৎ প্রাচীন সামন্ততন্ত্রী রাজ্য-সকলের ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়াইয়া নব ধর্ম্মের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। তাঁহারা দেখিলেন, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, পরস্পর-বিদ্বিষ্ট জাতিনিচয় এই নব ধর্ম্মের প্রভাবে ভ্রাতৃত্বভাবে, পরস্পর বিশ্বাসে, ও আনন্দে বিগলিত হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছে। স্বাধীনতা, সাম্য ও মানব-প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেন তাঁহাদিগের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন!

এই দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা উহা হইতে নয়ন ফিরাইয়া দেবীর দিকে তাকাইলেন; বলিলেন 'দেবি! অতঃপর আমাদিগকে কি করিতে হইবে?' তিনি বলিলেন 'বৎসগণ! আইস, আমার সহিত আইস; আমি তোমাদিগকে নিদ্রিত জাতি-নিচয়ের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছি। আজ আমার নিকট যে বীজমন্ত্র পাইয়াছ, তোমরা আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বীজমন্ত্র উহাদিগের মধ্যে প্রচার করিবে; দীনদুঃখী উৎপীড়িত-দিগের অন্তরে শান্তি বিতরণ করিবে। এ পৃথিবীতে তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিবার কেহ নাই সত্য; এ জীবনে প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা ভিন্ন আর কিছু পাইবার আশা নাই সত্য; কিন্তু মৃত্যুর পর, আমি তোমাদিগকে এই সকল কষ্ট যন্ত্রণার সবিশেষ পুরস্কার প্রদান করিব।'

দেবীর এই উদ্দীপনা-বাক্যে উদ্দীপিত হইয়া তাঁহারা জাতি-নিচয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যেখানেই উৎপীড়িত বীর-জাতির আর্ত্তনাদ তাঁহাদিগের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের হৃদয় আহত করিয়াছে, সেই দিকেই তাঁহারা ধাবিত হইলেন।

যেখানেই পতিত জাতির ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহাদিগের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, সেইখানেই তাঁহারা তাহাদিগকে এই উদ্দীপনা-বাক্যে উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন—'উঠ, ভ্রাতৃগণ উঠ! আপনার অন্তরে যে বল নিহিত আছে, তাহার উপর নির্ভর কর।'

দেবী যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। তাঁহারা যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কৃতঘ্নতা ও নিন্দার বিষে তাঁহাদিগের শরীর জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগের অগ্র গতি স্খলিত হইল না। যে সকল জাতি প্রথমে তাঁহাদিগের মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাঁহারাও ইহার মোহিনী মূর্ত্তিতে ক্রমে বিমুগ্ধ হইয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং ইহার প্রভাবে অধিকতর যোগ্য হইয়া উঠিল।

এই সকল যে ঘটিবে, রাজারাও তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন; এবং বুঝিয়া ছিলেন যে, অচিরকালমধ্যে এই নব জগতের সহিত তাঁহাদিগকে ঘোরতর সমরানলে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই জন্যই উৎপীড়ক রাজামাত্রেই নির্ব্বাসিত-দিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ইতালীর চতুর্দ্দিকে সীমান্তপ্রদেশে ফাঁশি কাষ্ঠের শ্রেণী প্রোথিত করা হইল। যাঁহারা ইতালী পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহাদিগকে সেই সকল ফাঁশি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। জর্ম্মণী ইহার কৃষ্ণ অরণ্য তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন, যদি কোন উদ্ভ্রান্ত যুবক তথায় লুক্কায়িত থাকে। স্বাধীনতা-ভূমি ফ্রান্স, নির্ব্বাসিতদিগকে ইহার মধ্য দিয়া দেশান্তরে যাইতে দিল বটে, কিন্তু সেই যাত্রায় তাঁহাদিগের কষ্টের আর সীমা রহিল না, তাঁহাদিগের দীর্ঘ নিশ্বাসে ফরাশি ভূমি দগ্ধ হইয়া গেল। তাঁহারা সেই পুণ্যভূমির উপর দিয়া দেশান্তরে অনাহারে ও যাতনায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে যাইতে লাগিলেন, তথাপি স্বাধীনতা-প্রিয় ফ্রান্স সেই নিরাশ্রয় নির্ব্বাসিতগণকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না। আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, নির্ব্বাসিতগণের জন্য তাঁহাদিগের স্বদেশের রাজা যে পাথেয় প্রদান করিয়াছিলেন, নৃশংস ফ্রান্স তাহা হইতেও কিঞ্চিৎ কর্ত্তন করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত নির্ব্বাসিতই সুইস্ ক্ষেত্র হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। কয়েক জনমাত্র জর্ম্মাণ নির্ব্বাসিত—যাঁহাদের একমাত্র অপরাধ যে, তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন সংবাদপত্রে গুটিকত উদ্দীপনা বাক্য লিখিয়াছিলেন— অবশিষ্ট ছিলেন, সুইস কোটালেরা তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া ক্যালে পার করিয়া দিয়া আসিবার জন্য ফরাশি কোটালদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা সুইস ক্ষেত্রের উপর তিরস্কার-সূচক ও শোক-পূর্ণ

দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। যে সুইস বীরবৃন্দ এক দিন ইউরোপীয় নির্ব্বাসিতদিগকে আশা ও অভয় দিয়া আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, আজ ইউরোপীয় যথেচ্ছাচারীদিগের ভয়ে তাঁহারা সেই প্রতিজ্ঞা-বাক্য লঙ্ঘন করিলেন। যে সুইস্ গিরি-শ্রেণীকে বিধাতা স্বাধীনতার আশ্রয়-ভূমি করিয়া সৃজন করিয়াছেন, আজ সেই গিরি-শ্রেণী রাজনৈতিক দলের দুর্ভেদ্য কৌশলে বৈদেশিক যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের পাদপীঠরূপে পরিণত হইয়াছে। যে সুইস্ বীরবৃন্দ আশা-দিনে নির্ব্বাসিতদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বীর্য্য ও আত্ম-ত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন, আজ বিপদের দিনে, পরাজয়ের দিনে—তাঁহারা সেই নিরাশ্রয় নির্ব্বাসিতদিগকে অকাতরে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে লাগিলেন। সুইসেরা জানিতেন যে, ঐ নির্ব্বাসিতেরা শুদ্ধ স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য নহে—সকল দেশেরই স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; প্রত্যেক সাধু ব্যক্তির অন্তরে ঈশ্বর যে স্বাতন্ত্র্যের ভাব নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উদ্ধারের জন্য তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; প্রত্যেক মানবের প্রাকৃতিক স্বত্ব উদ্ধারের জন্য তাঁহারা ধৃত-ব্রত। সংক্ষেপতঃ মানব-জাতির উন্নতি-সাধনে তাঁহারা গৃহীত-ব্রত জানিয়াও সাধারণতন্ত্রবাদী সুইজর্লণ্ড এই বিপদের সময় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। 'না আমরা এ বিপদের সময় আতিথ্য-ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া আশ্রিত নির্ব্বাসিতদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি না; আশ্রয় দিয়া এখন আমরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিব না; যদি তোমরা বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঈশ্বর, আল্‌পস পর্ব্বত ও আমাদিগের অস্ত্র—আমাদিগকে তোমাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে।'—কোন সুইস্ এই বীরোচিত বাক্যে ইউরোপীয় যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের দুর্নীতিকর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করিলেন না।

"সুইস্ ভ্রাতৃগণ! তোমাদের মুখে এরূপ বীরোচিত বাক্য শুনিলে ইউরোপীয় রাজবৃন্দ নিশ্চয়ই পশ্চাৎপদ হইতেন, সন্দেহ নাই। যে ভীরু ইউরোপ দুই শত-মাত্র নির্ব্বাসিতের ভয়ে আজ চারি মাস ধরিয়া ব্যতিব্যস্ত, তাহারা কখনই তোমাদের মত বীর জাতির ক্রোধানলের সম্মুখীন হইতে সাহস করিত না। যে জাতির হৃদয় হইতে এখনও সেম্পাক্ ও মর্টগার্টন রণের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই, সে জাতির সহিত জাতীয় সমরে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইত না।

"যদিও ভ্রাতৃগণ! তোমরা এখন বৈপ্লবিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তথাপি ইউরোপ কি জানে না যে, বিপ্লব হইতেই

সুইস্ জাতির উৎপত্তি। আজ ১৮৩১ সালে তোমাদিগকে সমরের নামে কম্পিত-কলেবর দেখিয়াই কি তোমাদের প্রতি ইউরোপ এরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছে না? যে দিন লোক-তান্ত্রিক মত সকল সাধারণতন্ত্রের বীজনিকর—একে একে সুইজর্লণ্ডের প্রত্যেক ক্যাণ্টনে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তখন ইউরোপ কি মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ-বীর্য্য সর্পের ন্যায় এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল না? তখন কি তোমরা অটল ও অবিচলিত ভাবে—অপরের উপর ভ্রূক্ষেপও না করিয়া—শুদ্ধ আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলে না? অষ্ট্রিয়া সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিয়া ছিল, তখন তোমাদের সাধারণ-তন্ত্রী সেনাদল জাতীয় উদ্দীপনা-বাক্যে উদ্দীপিত হইয়া সিংহ-পরাক্রমে তাহাদিগকে সুদূর প্রাচ্যে তাড়াইয়া দিয়া আসিয়াছিল কি না? তখন তোমরা সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিয়াছিলে কি না যে, যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা মাতৃভূমির রক্ষা করিবে। বীর জাতির এই বীরোচিত বাক্যে এক দিন সমস্ত ইউরোপ স্তব্ধীভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল! আজ, তোমরা আবার সেইরূপ হও, দেখিবে ভীরু ইউরোপ পলায়ন করিবে। কারণ ইউরোপ জানে না যে, জাতীয় স্বাধীনতা-সমরানল প্রজ্বলিত হইলে, কত রাজ-মুকুট সে আগুনে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইবে। সেই অগ্নি-তরঙ্গে কত জাতি বিপ্লব-প্রবণ হইয়া উঠিবে। বৈপ্লবিক তুলাকেন্দ্র তোমাদিগেরই হস্তে; তাহার এক প্রান্ত ইতালীতে, ও অপর প্রান্ত জর্ম্মণীতে পড়িয়াছে।

"সাহস কিরূপে করিতে হয়, তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ। সেই জন্যই আজ তোমরা রাজতান্ত্রিক নির্যাতনের জঘন্য সাধন-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছ। বিপন্নের রক্ষারূপ ব্রতে তোমরা এক্ষণে জলাঞ্জলি দিয়াছ। তোমরা শরণাগতকে শত্রুহস্তে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছ। যে দয়া মানবকে ঈশ্বরের সহিত অনুস্যূত করিয়া রাখিয়াছে, তোমরা সেই দয়াগন্থিও ছিন্ন করিয়াছ।

"যখন জাতীয় কর্ত্তব্য-নিচয়ের প্রতিভূগণ জাতীয় ন্যস্ত বিশ্বাস পরিরক্ষণে অক্ষম হন, তখন জাতির কর্ত্তব্য হইয়া উঠে প্রথমে প্রতিভূগণকে তিরস্কার করা; তাহাতেও যদি চৈতন্য না হয়, তবে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া ন্যস্ত কর্ত্তব্য-ভার আবার আপনাদিগের মস্তকে লওয়া।

"নির্ব্বাসিতগণ একে একে সকলেই প্রস্থান করিয়াছেন। এ বিপদের সময় ঈশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন; তাঁহাদিগের ব্যথিত-হৃদয়ে শান্তি-বারি সিঞ্চিত করুন, নির্দ্দয় ইউরোপ তাঁহাদিগকে যে কষ্ট-যন্ত্রণাময় তীর্থ-যাত্রায় প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন তাঁহাদিগের আর গতি নাই।

"নির্ব্বাসিত যুবকবৃন্দ! তোমরা

হতাশ্বাস হইও না। যে ভবিষ্যৎ বিজয় তোমাদিগের হৃদয়-ফলকে জ্বলদক্ষরে লিখিত আছে, তোমরা তাহাতে সন্দিহান হইও না। তোমাদিগের তীর্থ-পর্য্যটন নব ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে ব্যয়িত করিও না। তোমরা যে নব বিশ্বাসের প্রচারক-পদে নিযুক্ত হইয়াছ, আত্ম-বলিদান ব্যতীত তাহার বিজয় প্রতিষ্ঠাপিত করার সম্ভাবনা নাই। যে বীর অবিচলিত অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের সহিত এই সকল বাধা বিপত্তি ও কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করেন, বিজয়লক্ষ্মী তাঁহারই মস্তকে মুকুট প্রদান করেন। তোমরা যে দিনের অবশ্যম্ভাবী আগমন প্রতীক্ষা করিতেছ, তাহা অদূরবর্ত্তী। বিশ্বজনীন নৈতিক বিধি, মানবজাতির ক্রমিক উন্নতি—জ্বলদক্ষরে বিশ্বগগনে অঙ্কিত আছে। সে উন্নতির স্রোত রোধ করে, সে বিধি লঙ্ঘন করে, কাহার সাধ্য? প্রলয়-বায়ু যেমন গগন-ভাল হইতে রবি-চন্দ্র থাল উড়াইয়া লইয়া যাইতে অক্ষম, সেইরূপ রুস্ সম্রাটের অলঙ্ঘ্য শাসন, বা অন্যান্য শাসন-সমিতির কঠোর আদেশও সেই উন্নতির স্রোত রোধ করিতে বা সে বিধি পরিবর্ত্তিত করিতে অক্ষম। আর, জগতে আর একটী শক্তি আছে, যাহা রাজকীয় অত্যাচার বহু দিন দমিত করিয়া রাখিতে অক্ষম। সে শক্তি জন-সাধারণ। জন-সাধারণের ভবিষ্যৎ সংযমিত করা মানবের অসাধ্য। জন-সাধারণের ললাটে যাহা লিখিত আছে, তাহা হইবেই হইবে। যদিও রাজবৃন্দ জন-সাধারণের পায়ে শৃঙ্খলের উপর শৃঙ্খল পরাইতেছেন, যদিও তাঁহাদিগের চক্ষে ঠুলি দিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত ঘটনা দেখিতে দিতেছেন না, এবং মনে মনে মুচকে মুচকে হাসিয়া ভাবিতেছেন, ইহারা অচিরাৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে, সেই জন-সাধারণ এক দিন নয়নের ঠুলি ছিঁড়িয়া কাতর নয়ন ঈশ্বরের দিকে নিক্ষেপ করিবে, এবং প্রার্থনায় বলীয়ান্ হইয়া কর-প্রহারে তাহাদিগের লৌহ-শৃঙ্খল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে, এবং সমস্ত বাধা বিপত্তি বিদূরিত করিয়া উন্মুক্ত ও স্বাধীন হইয়া জগতের রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে।

"আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি জনসাধারণ উঠিবেই উঠিবে! সাম্য, একতা ও জাতিসমবায় মানব-জাতির এই পবিত্র বিধি-নিচয়—নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে! জন-সাধারণের নয়ন দিয়া অতীত-কষ্ট-জনিত শোকাশ্রু ও ভবিষ্যৎ সুখের আশা-জনিত আনন্দাশ্রু সমকালেই বিগলিত হইবে।

"যদি এই দ্বি-শত নির্ব্বাসিত—মানব-জাতিকে, স্বদেশকে অতিশয় ভাল বাসার জন্য যাঁহাদিগকে স্বদেশ হইতে নিষ্কাশিত করা হইয়াছে—যদি এই দ্বিশত নির্ব্বাসিতের এক জনও তখন জীবিত থাকেন, তাহা হইলে, মানবজাতি তাঁহার মস্তকে বিজয়-মুকুট পরাইয়া দিবে, আর তিনি

এই পবিত্র রণে হত ভ্রাতৃগণের সমাধি স্থলে গিয়া নতজানু হইয়া তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আহ্বান করিবেন 'ভ্রাতৃগণ, উঠ! দেবীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, আমরা প্রাচীন জগৎকে পরাস্ত করিয়াছি।' অতঃপর জগতে আর কেহ মানব-জাতি কি স্বদেশকে ভাল বাসার অপরাধে স্বদেশ হইতে নিষ্কাশিত হইবে না; কারণ, এখন জন-সাধারণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠাপিত হইল।"

ম্যাক্‌বেথ্।

গত প্রকাশিতের পর।

প্রথম যোনী আশ্চর্য্য রূপে ম্যাক্‌বেথের প্রত্যয় ও অবস্থা আকর্ষণ করিলে পর, দ্বিতীয় যে উক্তি করিল, তাহাও প্রকৃততঃ ভবিষ্যৎ বাণী নহে, দূরস্থানে যে কার্য্য-সিদ্ধ হইয়াছে, ম্যাক্‌বেথ এখানে তাঁহার যে সুসিদ্ধ অদৃষ্ট ফল অবগত নহেন, দ্বিতীয় যোনী তাঁহার সেই আশু সুসিদ্ধ ফলের কথা তাঁহাকে জানাইতেছে। দ্বিতীয় যোনী যে উক্তি করিল, তাহা এইরূপ;—

All hail, Macbeth! hail to thee,
thane of Cawdor.

ফরেসের নিকটবর্ত্তী শিবিরে রাজা ডন্‌ক্যান্ যখন শুনিলেন, কডরের থেন, বিদ্রোহী হইয়া নরওয়ের রাজার সহিত যোগে তাহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া সমরে বন্দী হইয়াছে, তখন তিনি আহ্লাদিত-চিত্তে দূতের প্রতি আদেশ করিলেন, 'যাও, কৃতঘ্ন কডারের থেনের মৃত্যু ঘোষণা করিয়া তাহার পদে ম্যাক্‌বেথকে অভিষেক কর'। ম্যাক্‌বেথ্ তাঁহার প্রতি রাজার এই শুভাদেশ এখানে অবগত নহেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা অবগত হইবেন। দ্বিতীয় যোনীর এই বাণী হাতে হাতে ফলিতে দেখিলে, তৃতীয় যোনীর অবশিষ্ট শেষ বাণীর সুসিদ্ধির প্রতি তাঁহার সন্দেহের ভিত্তি কত দূর দুর্ব্বল হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। তৃতীয় যোনীর ভবিষ্যৎ বাণী—

"All hail, Macbeth, that shall be
king hereafter."

তৃতীয় যোনীর এই বাণী ম্যাক্‌বেথের কর্ণ স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার শরীর-যন্ত্র কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সহচর ব্যাঙ্কো তাঁহার এই চমক দেখিয়া কহিলেন—

Good sir, why do you start, and
seem to fear,
Things that do sound so fair?

তৃতীয় যোনীর বাণী ম্যাক্‌বেথের মহত্ব-চূড়াকে আঘাত করিবামাত্র উহা কম্পিত হইয়া উঠিল এইকম্পন আঘাত জন্য নহে, কিন্তু আঘাতের প্রতিঘাত

প্রদান জন্য উন্নতির অভিলাষাভিষিক্ত কোমল অন্তঃকরণে, রাজ্যপদ-প্রাপণের আশাময় ভবিষ্যৎ বাণী তড়িদ্‌গতি উহার আভ্যন্তরীণ হইল; কিন্তু আভ্যন্তরীণ হইয়া উহা তথায় স্থান পাইল না; মহত্বের বল সকল উহার বিরুদ্ধে সেইরূপ তড়িদ্‌গতি উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদূরিত করিয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। ম্যাক্‌বেথ জানিতেন, রাজা ডন্‌ক্যানের জীবন-নাশ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে প্রবঞ্চিত না করিলে, তাঁহার রাজ্য-প্রাপণের আশা কখনই ফলবতী হইতে পারে না। কিন্তু রাজার অন্তর রাজ্য-বিষয়ে তাঁহার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসে স্থির; এবং রাজার রাজভাবে তাঁহার প্রতি যে মর্য্যাদা ও উন্নতির অনুগ্রহ ও বন্ধুভাবে যে প্রণয়-ব্যবহার নিয়ত বিতরণ করিতেছেন, তাহা অতুল্য। এরূপ সানুকূল প্রভুর জীবন-নাশ কি কৃতঘ্নতা, কি বিশ্বাসঘাতকতা! ভবিষ্যৎ বাণী এই কৃতঘ্নতার ও বিশ্বাসঘাতকতার আঁধার, অন্তরে বিকাশ করিতে না করিতে উহার মহত্ব-জ্যোতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দূরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিজ স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে স্থিরমূর্ত্তি ধারণ করিল। এই ঔজ্জ্বল্যের স্থিরমূর্ত্তি ক্ষণস্থায়িমাত্র হইল। উজ্জ্বল শিখা এখন আর স্থির-ভাবে জ্বলিতে সমর্থ হইল না, পাকস্থলীতে বিষ প্রবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ উদ্গীর্ণ হইয়া গেলেও যেমন উহার মাদকতা কিয়ৎক্ষণ শোণিতে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তেমনি দৈববাণীর ভয়ঙ্কর জ্ঞান অন্তর হইতে উদ্গীর্ণ হইয়া গেলেও উহার স্পর্শ-গুণে এক প্রকার প্রভুত্বোপ-ভোগ-আশায় মৃদু-মাদকতা অন্তরে সঞ্চরিত হইতে লাগিল। মহত্বের স্থিরোজ্জ্বল শিখা এই সঞ্চরণে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছিল। এই আন্দোলনের বাহ্যস্ফুরণ সহচর ব্যাঙ্কের কাছে দুই একটী প্রকাশিত হইয়া পড়িল। যোনীগণ অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলে,তাহাদের অসম্পূর্ণ বাণীর পূর্ণ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ম্যাক্‌বেথের ইচ্ছা অতিশয় বলবতী হওয়ায়,সেই ইচ্ছার ভাব ব্যাঙ্কোর কাছে এইরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি কহিলেন—

"Would they had staid!"

কিন্তু যোনীগণ তখন অদৃশ্য, তাহারা নিজ কার্য্য সাধনান্তে অন্তর্হিত হইয়াছে। অপরিতৃপ্ত ইচ্ছার বেগ স্বভাবতই প্রবল হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত উহার আরো দুই একটী স্ফুরণ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারিল না। পুনরায় ম্যাক্‌বেথ নিজ মনের ভাব গোপন করিয়া যেন আমোদ-উপহাসচ্ছলে ব্যাঙ্কোর প্রতি কহিতেছেন—"Your children shall be kings."

নিজ সৌভাগ্য-সূচক দৈববাণীর প্রতি ব্যাঙ্কোর অভিপ্রায় কি জানিবার নিমিত্ত কৌশলে তাঁহারই শুভবাণীর কথা আগে আপনি কহিতেছেন। কেন না, তার প্রত্যুত্তরে ব্যাঙ্কো তাহার প্রতি শুভ

বাণীর অভিপ্রায় অবশ্যই প্রকাশ করিবেন। ব্যাঙ্কো তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—"You shall be king." ব্যাঙ্কো ম্যাক্‌বেথের রাজ্য-প্রাপণের ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতি নিজ বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিলেন না, বরং সেইরূপ উপহাস-কৌশলেই নিজ অনুকূল ভাবই প্রকাশ করিলেন! ম্যাক্‌বেথ্ বুঝিলেন, নিজ অনুগত বন্ধুও তাঁহার প্রতি অনুকূল নহেন।

এইরূপ হৃদয়ের আশার সুমন্দ আন্দোলন-সময়ে ঐ স্থানে সহসা রাজা ডনক্যানের শিবির হইতে রস্ ও অ্যাঙ্গস্ দূত-দ্বয় আসিয়া তাঁহার প্রতি রাজার অভিনন্দন জানাইয়া, রাজাদেশানুসারে তাঁহাকে কডরের থেন্ বলিয়া সম্বোধন করিয়া কডরের থেনের প্রতি রাজার কঠিন আজ্ঞা ও তাঁহার প্রতি কডরের সম্পদ প্রদানের বৃত্তান্ত অবগত করাইল। মন যখন আশার মাদকতায় ঈষদুন্মত্ত, এমন সময়ে দ্বিতীয়যোনীর বাক্য প্রকৃততঃ হাতে হাতে ফলিতে দেখিয়া ম্যাক-বেথের অন্তর বিশ্বাসের উপর একরূপ স্থির ভাব ধারণ করিল। এবং আশা তাহার নিজ পথে অনেক দূর অগ্রসর হইল। এই সময় স্বগত ম্যাক্‌বেথ্ কহিলেন :—

"Glamis, and thane of Cawdor:
The greatest is behind."

দ্বিতীয় যোনীর বাণী এরূপে প্রকৃততঃ ফলবতী হইতে দেখিয়া ব্যাঙ্কোর অন্তর কিরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে, জানিবার নিমিত্ত পূর্ব্বরূপ কৌশলে ব্যাঙ্কোকে কহিলেন—

"Do you not hope that your children shall be kings,
While those, that gave the thane of Cawdor to me,
Promised no less to them?"

প্রত্যুত্তরে ব্যাঙ্কোও তৎক্ষণাৎ কহিলেন—

"That, trusted home,
Might yet enkindle you unto the Crown,
Besides the thane of Cawdor."

ব্যাঙ্কো এইরূপে আশার পথে ম্যাক্‌বেথ্‌কে দৃঢ়তর করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি প্রবঞ্চনার গুরুতর ভয় দেখাইলেন। তিনি কহিলেন,—সামান্য সত্যের ফলে প্রলোভিত করিয়া পাপ-যোনীরা গুরুতর অনিষ্টে নিয়ত আমা-দিগকে নিপাতিত করিয়া থাকে। কিন্তু এই সময় ম্যাক্‌বেথের অন্তঃকরণ অমোঘ প্রলোভনের অস্ত্রাঘাতে মুহ্যমান; সামান্য সতর্ক বাণী এক্ষণে আর তাঁহার কর্ণগোচর হইবার যোগ্য নহে। প্রবল-তর দৈবশক্তি এক্ষণে মল্লযুদ্ধে ম্যাক্‌-বেথকে বাহু-পাশে একরূপ আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু আবদ্ধ করিলেও উহা উহাকে ভূপাতিত করিতে সমর্থ নহে। ম্যাক্‌বেথের শক্তি উহার সহিত কিরূপ দ্বন্দ্বে মত্ত, তাহা এই স্থলে দেখ;—

"Two truths are told,
As happy prologues to the swelling act,

Of the Imperial theme:—I thank you, gentlemen.
This supernatural soliciting
Cannot be ill ; Cannot be good : If ill,
Why hath it given me earnest of success,
Commencing in a truth? I am Thane of Cawdor.
If good, why do I yield to that suggestion.
Whose horrid image doth unfix my hair,
And make my seated heart knock at my ribs.
Against the use of nature? Present fears
Are less than horrible imaginings.
My thought, whose murder yet is fantastical,
Shakes so my single state of man, that function
Is smothered in surmise ; & nothing is,
But what is not."

এইরূপ দ্বন্দ্বের পর ম্যাক্‌বেথ্‌ দৈবশক্তির পাশ আর উন্মোচন করিতে পারিলেন না এবং দৈবশক্তিও উঁহাকে ভূপতিত করিতে সমর্থ হইলনা। অবশেষে ম্যাক্‌বেথ্‌ দৈবের প্রযুক্ত বল দৈবেরই প্রতি প্রতি-নিক্ষেপ করিয়া আপনি একরূপ স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যথা ;—"যদি দৈববাণীই আমার পক্ষে শুভই হয়, তবে কেন আমি সেই অস্বাভাবিক কার্য্যের কল্পনায় বশীভূত হইব, যাহার ভয়ঙ্কর ভাবনায় আমার লোম সকল শিথিল হইয়া যাইতেছে? যদি দৈবই আমাকে রাজা করাইতে যায়, তবে আমার চেষ্টার অভাবেও দৈবই সেই কার্য্য সাধন করুক"।

দৈবশক্তি ম্যাক্‌বেথকে এই পর্য্যন্তই অধিকার করিতে সমর্থ হইল ; ইহার অধঃপাতনে এক্ষণে অন্য শক্তি সকলের নিয়োগ প্রয়োজন। কবি ম্যাক্‌বেথের বিরুদ্ধে যে দ্বিতীয় শক্তি প্রযুক্ত করিলেন, উহা মানব শক্তি। এই শক্তি দৈবশক্তি অপেক্ষা ন্যূন নহে।

মানব অন্তরের উপর মানব অন্তরের যেরূপ অধিকার, বাহ্যবস্তুর অধিকার সেরূপ কখনই নহে। আবার সেই মানুষের মধ্যে অসমজাতি অর্থাৎ পুরুষের উপর স্ত্রীর ও স্ত্রীর উপর পুরুষের যেরূপ স্বাভাবিক প্রাদুর্ভাব, সেরূপ সমজাতির উপর নহে। এজন্য যিনি সংসারের গৃহিণী, অন্তরের প্রণয়িনী, পুরুষের অদৃষ্টের পক্ষে তিনি একমাত্র অদ্ভুত কুহকিনী। মানবশক্তির চূড়ান্ত এই মায়াময়ী সর্ব্বশক্তিময়ী নারীশক্তি এক্ষণে ম্যাক্‌বেথের বিরুদ্ধে দৈবশক্তির সহিত প্রযুক্ত হইতেছে ; বাহ্যবল বা বাহ্য-ঘটনা-সকলও এখন ইহাদের সহায় হইতেছে। দৈব, মানব ও বাহ্য এই ত্রিবিধ শক্তির ব্যূহ-বেষ্টন-আক্রমণে ম্যাক্‌বেথের মহৎপ্রকৃতির ঘোরতর

ভয়-দৃশ্য অতিশয় গভীর ও ভীষণ।

যোগিগণের দৈববাণী-বিষয়ক ঘটনা ম্যাক্‌বেথ্‌ তাঁহার প্রণয়িনীকে সবিশেষ এক পত্রে লিখিয়া ছিলেন। দৈববাণীর পরক্ষণেই কিরূপে তিনি উহার দ্বিতীয় উক্তি হাতে হাতে ফলবতী হইতে দেখিয়া ছিলেন, তদ্বিষয়ক শুভ-সংবাদও ঐ পত্রের বিষয় ছিল। পত্র-প্রাপ্তে তাঁহার ভার্য্যার প্রভুত্ব-উপভোগ-লালসা একে বারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই নারীর হৃদয়, প্রভুত্ব-উপভোগ-লালসায় এরূপ লোলুপ যে, উহার প্রাপ্তির পথে উহা মহাপাপ সকলের দৃশ্যে একেবারে অন্ধ। বিশ্বাস-ঘাতকতা, নরহত্যা প্রভৃতি ভীষণ পাপ সকল কেহই তাঁহার বিরোধী নহে; বরং তাহারা অনুগত সহায়; কেবল তিনি তাঁহার স্বামীর নির্ম্মল বিবেক ও কোমল হৃদয়কে ভয় করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার স্বামীর হৃদয় প্রভুত্ব-বাসনা-বিবর্জ্জিত নহে; কিন্তু উহা বিবেকের অনুমোদিত পথ অতিক্রম করিয়া বা হৃদয়-শূন্য কার্য্য দ্বারা উহার উপভোগে একান্ত কুণ্ঠিত। লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌ তাঁহার স্বামীর প্রকৃতিকে দমন ও বশীভূত করিবার নিমিত্ত প্ররোচনা, তিরস্কার প্রভৃতি উপায় সকল মনোনীত করিলেন। লেডি ম্যাক্‌বেথের অন্তরান্দোলন এইরূপ;—

Glamis thou art, and Cawdor; and shalt be.
What thou art promised:—Yet do I fear thy nature;
It is too full 'o the milk of human kindness,
To catch the nearest way: Thou wouldst be great;
Art not without ambition but without,
The illness should attend it. What thou wouldst highly,
That wouldst thou holily; wouldst not play false.
Yet wouldst wrongly win, thou'dst have, great Glamis,
That which cries: Thus thou must do, if thou have it.
And that which rather thou dost fear to do,
Than wishest should be undone. Hie thee hither.
That I may pour my spirits in thine ear.
And chastise with the valour of my tongue
All that impedes thee from the golden round,
Which fate and metaphysical aid doth seem.
To have thee crowned withal."

এই সময়ে বাহ্য ঘটনাও আসিয়া অনুকূল হইল; অর্থাৎ দূত আসিয়া লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌কে সংবাদ দিল, রাজা ডন্‌ক্যান্‌ ম্যাক্‌বেথের সহ সেই রাত্রে তাঁহার আলয়ে আসিয়া আতিথ্য-স্বীকার

করিতেছেন। লেডি ম্যাক্‌বেথ্ এই সংবাদে একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ যেন আপনাকে সমস্ত স্কটলণ্ডের মহারাণী মনে করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সময়ে নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, হত্যা প্রভৃতি মহাপাতক কার্য্যের সাহসে আপনাকে সংযত ও দৃঢ় করিতেছিলেন, এমন সময় ম্যাক্‌বেথ্ আসিয়া গৃহে উপনীত হইলেন। ম্যাক্‌বেথ্‌কে দেখিবামাত্র তাঁহার পত্নী তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত এইরূপ ভাবে সম্বোধন করিলেন;—

"—Great Glamis! worthy Cawdor!
Greater than both by the all-hail hereafter!"

তিনি ঐ বিষয়ে আপন উৎসাহ ও সহিষ্ণুতা জানাইবার নিমিত্ত আরো কহিলেন;—

"Thy letters have transported me beyond
This ignorant present, and I feel now
The future in the instant."

ম্যাক্‌বেথ্ নিশ্চয় জানিতেন যে, ডন্‌ক্যানের প্রাণনাশ ব্যতীত তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির কোন আশা নাই; এবং সেই রাত্রিতে যে ডন্‌ক্যান্ আসিয়া তাঁহার আলয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাও সেই কার্য্যের একটী সুযোগ। তিনি নিজ পত্নীর ইহাতে উৎসাহ ও সুপ্রস্তুততা জানিয়া নিজ মনের ভাব-প্রকাশ-ছলে বলিলেন;—

"My dearest love
Duncan comes here to-night."

লেডি ম্যাক্‌বেথ্ কহিলেন,—

"And when goes hence?"

Macb. "To-morrow,—as he purposes."

লেডি ম্যাক্‌বেথের নিকট তাঁহার স্বামীর মনের ভাব আর জানিতে বাকি রহিল না, এজন্য তিনি একেবারেই সেই সুযোগে কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন; যথা;—

"O, never
Shall sun that morrow see!"

তিনি স্বামীকে সেই কার্য্যে উৎসাহী ও সাহসী করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ তাঁহাকে কেবল কপট ভাব ধারণ করিয়া থাকা পর্য্যন্তই প্রস্তুত করিতে চেষ্টা পাইলেন এবং বুঝাইলেন ও সাহস দিলেন যে, অপরাপর গুরুতর কার্য্য সকল তাঁহার হস্তে ভার থাকিলেই অতি সহজেই হইতে পারিবে। এজন্য বলিলেন;—

"——To beguile the time,
Look like the time; bear welcome in your eye,
Your hand, your tongue: Look like the innocent flower
But be the serpent under it. He that's coming

Must be provided for : And you shall put
This night's great buisiness into my despatch ;
Which shall to all our nights and days to come
Give solely sovereign sway and master-dom.

* * * * *

Only look up clear ;
To alter favour ever is to fear ;
Leave all the rest to me."

ম্যাক্‌বেথ্‌ কহিলেন,—

" We shall speak further."

এই বলিয়া তখন অপসৃত হইলেন।

এই স্ত্রীর সংসর্গ হইতে কিঞ্চিৎ অন্তর্হিত হইবামাত্র ম্যাক্‌বেথের স্বাভাবিক মহত্ত্ব আবার প্রবল হইয়া উঠিল ; তিনি আত্মগত চিন্তায় বিশদরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, এই কার্য্য, কি সংসারিক সুখ, কি ধর্ম্ম উভয়েরই বিরোধী। রাজা ডন্‌ক্যান্‌ যেরূপ প্রজাবৎসল ও লোকপ্রিয়, তাহাতে তাঁহার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে রাজ্যে বহুতর বিপ্লব উত্থিত না হইয়া কখন সুস্থির থাকিতে পারিবে না। আবার ধর্ম্মতঃ দেখিতে গেলে, ইহা গুরুতর অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা। রাজা নিত্য নূতন মর্য্যাদায় তাঁহাকে অনুগৃহীত করিতেছিলেন, এই সকল অনুগ্রহ বিস্মৃত হইয়া অনুগ্রহদাতার সর্ব্বনাশ করা অতিশয় অকৃতজ্ঞতা ; অপিচ যাঁহার তিনি অধীনস্থ প্রজা ও আত্মীয়, এবং যে ব্যক্তি সবিশ্বাসে তাঁহার গৃহে সেই দিন অতিথি, যাঁহাকে অপর শত্রুর হস্ত হইতে প্রাণসঙ্কল্পে রক্ষা করা ধর্ম্মবাক্য তাঁহার কণ্ঠায় স্বহস্তে ছুরিকা প্রদান করা কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! ম্যাক্‌বেথ্‌ এখন একবার স্থিরতর হইলেন, এমন কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হইবেন না ; এমন সময় তাঁহার নির্জ্জন চিন্তাস্থলে তাঁহার সেই প্রবলা গৃহিণী আসিয়া দেখা দিলেন। ম্যাক্‌বেথ্‌কে তিনি যে পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন, নির্জ্জন চিন্তায় পাছে সেই টুকু বিলয় পাইয়া যায়, এজন্য তিনি ম্যাক্‌বেথ্‌কে চক্ষের অন্তরাল হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছিলেন না। ম্যাক্‌বেথ্‌ ভোজন-গৃহ সহসা পরিত্যাগ করিয়া আসায়, তিনিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, এবং কহিলেন, কেন তিনি সহসা ভোজনাগার পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। ম্যাক্‌বেথ্‌ কহিলেন, আর তাঁহাদের সে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। তিনি সর্ব্বপ্রকার লোকের নিকট হইতে সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল যশোরাশি সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যশোরাশিকে সহসা অবহেলা না করিয়া তাহারই ধারণে পরিতৃপ্ত থাকা উচিত।

লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌ স্বামীর বিরুদ্ধে একেবারেই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং

কহিলেন, তাঁহার সকল আশা-ভরসাই কি এইরূপে বিলুপ্ত হইল? তিনি তিরস্কারে ম্যাক্‌বেথ্‌কে জর্জ্জরিত করিতেছিলেন ও ম্যাক্‌বেথ্‌ উহা নম্রমুখে সহ্য করিতেছিলেন; পরিশেষে তাঁহার ভার্য্যা যখন তাঁহাকে কহিলেন যে, তাঁহার অন্তর যাহা অভিলাষ করে, তাহা তিনি আয়ত্ত করিতে ভীরু। এই 'ভীরু' বাক্য বীরবর ম্যাক্‌বেথের অন্তরে সহ্য হইল না; তিনি ঈষৎ কোপন ভাবে কহিলেন:—

"Pr'y thee, peace:
I dare do all that may become a man,
Who dares do more, is none."

লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌ দেখিলেন, তাঁহার 'ভীরু' বাক্য-বাণ-প্রয়োগ বিশেষ কার্য্যকারী হইল না; তখন তিনি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গহেতু 'অপৌরুষ' বাক্যবাণ তাঁহার উপর বর্ষণ করিলেন; এবং আত্ম-উপমায় কহিলেন, ম্যাক্‌বেথ্‌ যেরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলে ক্রোড়স্থ স্তনপায়ী শিশুর মুখ হইতে স্তন-মোচন করিয়া লইয়া অনায়াসেই আছাড়িয়া তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া মস্তিষ্ক বাহির করিতে পারেন। আরো কহিলেন, যখন স্থান এবং কাল অনুকূল ছিল না, তখন যে কার্য্য করিতে তাঁহার সাহসের অভাব ছিল না, এখন স্থান এবং কাল আপনিই আসিয়া সহায় হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের এই সুন্দর সহযোগেই এক্ষণে তাঁহাকে হীন-সাহস করিতেছে!

ম্যাক্‌বেথের যে প্রকৃতি এত কাল এই সকল ভীষণ আক্রমণের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হইতেছিল, এত ক্ষণে এই স্থলে আসিয়া উহা বিকল দশা প্রাপ্ত হইল। তিনি দেখিলেন—দৈব, সংসার এবং সুযোগ সকলেই যেন আপনা হইতে আসিয়া অভিলষিত পথে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে; যে দিকে চাহেন, দেখেন,সকলেই তাঁহার সহায়; সকলেই উদ্যত হস্তে তাঁহার সাহায্যে অনুকূলভাবে তাঁহাকে বেষ্টনে দাঁড়াইয়া আছে। এই সকলের ঘনঘটা-সজ্জায় ম্যাক্‌বেথের বিবেক-সূর্য্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাঁহার বিশাল হৃদয়াকাশ আঁধার হইয়া উঠিল। এক্ষণে তিনি আত্মপথে পথহারা, দুর্দ্দশাগ্রস্ত অন্ধ। এই অন্ধ এক্ষণে আর আপন অভিলষিত পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক নহে; চতুর্দ্দিকে বিভীষিকায় এবং পতনের ভয়ে সে আর পাদক্ষেপ করিতে চাহে না, কিন্তু এক্ষণে সে পশ্চাৎ হইতে প্রবলা সংসার-শক্তি-কুহকিনী ভার্য্যার লৌহ-শলাকাবেধ-যাতনায় কাতর, উদ্ধত ও ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিতে লাগিল। সে কোন্‌ পথে ছুটিতেছে, তাহার সে কিছুই জানে না। সে কখন শূন্যে তরবারি লম্বিত দেখিতেছে, কখন ভয়ঙ্কর আকাশ-বাণী-শ্রবণে ত্রস্ত ও চমকিত হইয়া উঠিতেছে, তথাপি সে চলিতেছে। চলিতেছে,

অবশেষে তাহার হস্ত সেই গুরুতর ভয়ঙ্কর কার্য্য সাধন করিল। অভিলষিত-লাভে কাহার না সুখ হয়, কিন্তু অভিলষিত-লাভে, ম্যাক্‌বেথের সুখ অনন্ত কালের নিমিত্ত নষ্ট হইয়া গেল। কার্য্য-সাধনান্তে এই উন্মত্ত আপন হস্তের রক্ত সকল দেখিয়া কহিতেছে—

"Will all great Neptune's ocean wash this blood
Clean from my hands?"

আবার কহিতেছে,—

"Macbeth shall sleep no more."

মত্ত হস্তী পঙ্কে পতিত হইলে, যেমন আপন শক্তির চালনায় আপনি অধিকতর পঙ্কে নিমগ্ন হইতে থাকে ও পরিশেষে একেবারে তলাইয়া অদৃশ্য হয়, এই অন্ধ প্রমত্ত বারণ সেইরূপ হৃদয়-বাত্যার আবেগে পাপ হইতে অধিকতর পাপে ডুবিতে ডুবিতে, ক্রমে নিজ ভয়ঙ্কর জীবনের অবসান করিল।

কবিকৃত ম্যাক্‌বেথের ভয়ঙ্কর পতন-চিত্রের তুল্য ঘোর গভীর চিত্র সংসারে অতুল্য; কাব্যরসজ্ঞ বিশেষ সূক্ষ্মানুভব ব্যক্তিই ম্যাক্‌বেথ্-পাঠে এই ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। সামান্য-বুদ্ধি ব্যক্তিরা ম্যাক্‌বেথ্‌কে যেরূপ লঘু মনে করিয়া থাকে, কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তিরা তদ্‌বিরুদ্ধে ম্যাক্‌বেথ্‌কে গুরু হইতেও গুরুতর মনে করিয়া থাকেন। ম্যাক্‌বেথ্-চরিত্রের মহত্ত্ব-বিচার পর্য্যন্তই আমাদের অদ্যকার এই সমালোচনার উদ্দেশ্য। সমস্ত কাব্য-সমালোচনা পরে করা যাইবে।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ভারতকোষ। (১) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় ও শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বাঙ্গালা ভাষায় এত কাল Encyclopœdea ছিল না, কেবল ও'ব্রায়েন্ স্মিথ্ সাহেবের প্রণীত পৌরাণিক ইতিবৃত্তের এক খণ্ড-মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে পুরাণোক্ত বিষয়েরই অবতারণা ও আধিক্য ছিল। তাহার যাহা ত্রুটি ছিল, এই দুই সংগ্রাহকের উদ্যোগে তাহা পূর্ণ হইতেছে। সংক্ষেপের মধ্যে ইহাতে বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত দেবতাদির বিষয়; ধর্ম্ম-নীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত-বিদ্যা; ইতিহাস, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি নিতান্ত ব্যবহার্য্য বিষয়ের বিবরণ ও ভৌগলিক ও ইতিবৃত্তঘটিত ব্যক্তি-ব্যূহের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্ত এই খণ্ডশঃ-প্রকাশ্যমান অভিধান গ্রন্থে বর্ণিত হইতেছে। "Beeton's Dictionary of Universal Information" বা "Chamber's

(১) ১ম খণ্ড আলবার্ট ও ২য় খণ্ড চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ৷৹ আনা।

Encyclopœdea'র ন্যায় বঙ্গ ভাষায় এক খান প্রকাণ্ড গ্রন্থ দেখিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছা আজ পূর্ণ হইল। ইহার মূল্য অধিক নহে। আমাদের ভরসা হইতেছে, এই পুস্তক নিশ্চয় সম্পূর্ণাবয়ব হইতে পারিবে। ভারত-কোষের উপকারিতা ও উপযোগিতা এত অধিক যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী ও অপর সাধারণের ইহা দ্বারা গবেষণার যে বিস্তর সাহায্য হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই প্রকার পুস্তক-সঙ্কলনে যাদৃশ পরিশ্রমের প্রয়োজন, সংগ্রহিতা-দ্বয় তাহা পূর্ণ মাত্রায় করিতেছেন দেখিয়া, আমরা অতীব সুখী হইয়াছি। জাতীয় অভ্যুদয় এই রূপে কার্য্যে যত অগ্রসর হয়, ততই আহ্লাদের বিষয়।

কল্পতরু। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত-সম্পাদিত। বিষ্ণুযন্ত্রে মুদ্রিত। ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা পাইয়াছি। ভাষা মন্দ নহে। ছাপা ভাল হওয়া আবশ্যক। ইহার প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু গোপনচন্দ্র। যিনি গোপন, তিনি কেমন করিয়া প্রকাশক হইতে পারেন? কল্পতরুর লেখা আশাকর হওয়া উচিত। "অপূর্ব্বের" কাজ অপূর্ব্ব হওয়া চাই।

নির্ম্মল নলিনী। শ্রীরাধাকৃষ্ণ মণ্ডল সঙ্কলিত। কাশীখণ্ড যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲। ইহা এক খানি উপন্যাস-গ্রন্থ। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল। বর্ণনাবিষয়ে রাধাকৃষ্ণ বাবুর বিলক্ষণ গুণপণা প্রকাশ পাইতেছে। ইহার মুদ্রণ যারপর নাই উত্তম। উপাখ্যান-ভাগে মনোহর শব্দ-যোজনার চাতুর্য্যে গ্রন্থের অঙ্গ-সৌষ্ঠব অতীব শ্রেষ্ঠভাব ধারণ করিয়াছে।

শ্মশানে মিলন (২)। পুরাণোল্লিখিত, অতিদান-জনিত নিঃস্ব রাজা হরিশচন্দ্র রাজ্য-নির্ব্বাসিত হইয়া স্বীয় পত্নী সব্যার সহিত শ্মশানে সম্মিলিত হন। সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া এই পুস্তিকা বিরচিত হইয়াছে। ইহার পদ্যময় রচনা ভাল বটে। কবিতা পড়িতে কোন স্থানে বাধে না।

বাল্মিকী রামায়ণ (৩)। (সচিত্র ও সটীক) শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র দ্বারা অনুবাদিত। কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য রামায়ণের মূল, ভাষান্তর সহ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার অনুবাদিত অংশ স্বতন্ত্র না থাকায় সংস্কৃতানভিজ্ঞের তাদৃশ ব্যবহারে আসিতেছে না, অনেকে এই অনুযোগ করেন। কিন্তু তাঁহার অনুবাদিত ভাগের ভাষা মন্দ, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। এই পুস্তকে কেবল গদ্য অনুবাদ প্রকটিত করা হইতেছে। ইহার অনুবাদ সরল ও মূলের অনুগত। যাহাতে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হয়, প্রকাশক যেন তাহার সুব্যবস্থা করেন। আমরা এরূপ পুস্তকের আবশ্যকতা স্বীকার করি। কিন্তু এই এক রামায়ণ লইয়া কত কাণ্ড হইতেছে।

(২) শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্তৃক বিরচিত, বসু প্রেস, মূল্য /০ আনা।

(৩) ৩৮নং হরিতকী বাগান লেন, শ্রীরামকুমার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

বেদ ও উপনিষৎ, দর্শন ও গণিত শিল্প ও জ্যোতিষাদি প্রয়োজনীয় বিদ্যার আলোচনা অচর্চ্চিত রহিয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদ, কৃষ্ণযজুঃ, অথর্ব্ব বেদের অদ্যাবধি বঙ্গানুবাদ হইল না, ইহা হইতে আমাদের অধিকতর দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে?

সুলোচনা কাব্য। শ্রীমাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; কাশীখণ্ড যন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য ১৲ টাকা। উপাখ্যানাংশ সুপাঠ্য ও সুবিন্যস্ত।

বীণা; কবিতাময়ী ও সমালোচনী পত্রিকা, শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১২৮৫ ও ১২৮৬ সাল বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতের বিপ্লব-কাল গিয়াছে। ঐ সময় বান্ধব, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শনাদির সাংঘাতিক ব্যাধি হইয়াছিল। 'বীণাও' সেই রোগ-ভোগ করিতে শয্যাশায়িনী হন। এখন উল্লিখিত পত্রগুলির ন্যায় "বীণারও" নব জীবন লাভ হইয়াছে। পুনঃ-প্রকাশিত ১২৮৮র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের পত্রে কতকগুলিন নূতন সুন্দর কবিতা সন্নিবেশিত আছে।

Industrial Art. গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক এই অত্যুৎকৃষ্ট বৃহৎ পুস্তক আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে প্রাচীন ভারতের বৈদিক ও পৌরাণিক দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তির প্রতিরূপ ও অস্ত্রের মধ্যে তাহাদের পরিচয়; দাক্ষিণাপথের নানা দ্রব্যাদির প্রকৃত চিত্র ও বর্ণনা এবং বহু বিষয়ক প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ভারতের পারিশ্রমিক শিল্পে ভারতের কত গৌরব ও উন্নতি হইয়াছিল, বার্‌উড্ সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন। এ গ্রন্থে প্রত্নতত্ত্বেরও কিঞ্চিৎ আলোচনা দেখা গেল। দাক্ষিণাত্যের পিত্তলময় প্রতিকৃতিতে পুরাকালিক শিল্পীর কারুকার্য্যের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। ধন্য ইংরাজ! তোমায় ধন্য! বিলাতে বসিয়া তুমি যাহা করিতেছ, ভারতীয় আমরা ভারতে থাকিয়াও তাহা করিতে অশক্ত!

কাশীখণ্ড (৪)। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থের মূল, টীকা ও বাঙ্গালা গদ্য অনুবাদ প্রচারিত হইতেছে। কাশীখণ্ডে কালীকৃষ্ণ বাবুর কীর্ত্তি চিরস্থায়ী থাকিবে। তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-সাগরে এক অপূর্ব্ব রত্ন বিনিবেশিত করিতেছেন, এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে দিন দেখিব, বাঙ্গালার প্রত্যেকে তাঁহার এই উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিতেছেন, সেই দিন জানিব, আমাদের যথার্থ জাতীয় অভ্যুত্থান হইতে বড় বিলম্ব নাই। আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার নিয়োজিত নবদ্বীপ মণি পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি ও নবকুমার তর্কপঞ্চানন অতি উপযুক্ত ব্যক্তি। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, ইহা বাস্তবিকই এক শ্রেষ্ঠ পদার্থ হইতেছে। আমরা প্রতি হিন্দুর গৃহে এই গ্রন্থ বিরাজিত দেখিলে সুখী হইব। অনুবাদক পাঠান্তর পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া দিতেছেন। যে যে উপায়ে ইহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে, তাহার অভাব নাই। পুস্তকের মুদ্রণ সুচারু; অনুবাদ বিমল প্রসাদ গুণোপেত। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুবাদ প্রচারের পর সাধারণ হিতকর কার্য্য এই দেখিলাম, তজ্জন্য আমাদের এত আনন্দ। এই বিস্তৃত গ্রন্থের যে কয়েক সংখ্যা প্রকটনাবশিষ্ট আছে, আশা করি, তাহা অচিরেই প্রকাশিত হইবে।

(৪) টালিগঞ্জ কাশীখণ্ড যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২ সংখ্যার মূল্য ৩৲ টাকা।

মূল্য-প্রাপ্তি-স্বীকার।

কলিকাতা।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে আর্য্যদর্শনের মূল্য পাওয়া গিয়াছে।

[১২৮৮ সালের ২৭এ বৈশাখ হইতে ২৯সে আষাঢ় পর্য্যন্ত।]

১২৮৫ সাল।

শ্রীমতী কল্পনাকুমারী দাসী	৩৲
—আড়কুলি নিউস্ পেপার ক্লব্	১॥০

১২৮৭ সাল।

বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	১৲
" গোবর্দ্ধন চট্টোপাধ্যায়	১৲
—আড়কুলি নিউস পেপার ক্লব্	৩৲
শ্রীমতী কল্পনাকুমারী দাসী	৩৲
বাবু কেদারনাথ কোঙার	১৲
,, নগেন্দ্রনাথ দে	১৲
,, [illegible] হালদার	১৲
বাবু বিহারিলাল মিত্র	১৲
,, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য	৩৲
,, দুর্গামোহন দাস (হাইকোর্ট উকীল) ...	৩৲
,, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১॥০
,, রমানাথ বড়াল	১॥০
,, রামধন বড়াল	১॥০
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	১৲
,, সত্যকৃষ্ণ বসু	২৲
,, বিহারিলাল মুখোপাধ্যায়	১॥০
,, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়	২৲
,, ত্রৈলোক্যনাথ সরকার	॥০
,, শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১॥০

মফঃস্বল।

১২৮৪ সাল।

বাবু শচীনন্দন দত্ত ; উকীল, কাটোয়া	॥/০
বাবু শচীনন্দন দত্ত ; উকীল, কাটোয়া	৩৷৵০
,, যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী ; সাতগেছিয়া	৪৲

১২৮২ সাল।

বাবু জগচ্চন্দ্র দাস, বি, এল্ ; এসিঃ একষ্ট্রা কমিঃ শিবসাগর	৩৷০

১২৮৩ সাল।

বাবু জগচ্চন্দ্র দাস, বি, এল্ ; এসিঃ একষ্ট্রা কমিঃ শিবসাগর	৪৸৵০

বাবু গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর সাহেব ;
আগড়তলা ৪৸৶০
,, গোপীমোহন ঘোষ, সদরঘাট ৶১০
,, কালীকুমার চক্রবর্ত্তী ; কালেক্টরি
চট্টগ্রাম ... ৪৸৶০
,, প্যারীমোহন চৌধুরী ; মাদলা ৩৷৶০
,, শচীনন্দন দত্ত ; উকীল,
কাটোয়া ১৷০

১২৮৪ সাল।

বাবু জগচ্চন্দ্র দাস, বিএল্ ; এসিঃ
একষ্ট্রা কমিঃ শিবসাগর ৪৸৶০
,, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায, মেনেজার্স
অফিস, ইটা ৪৸৶০
,, গিরিশচন্দ্র বসু ; অধ্যাপক, কটক
কলেজ ... ৩৷৶০
,, বিপিনবিহারী মিত্র ; উকীল,
জজকোর্ট, কটক ৩৷৶০
,, গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর সাহেব ;
আগড়তলা ৪৸৶০
,, তিনকড়ি রায় ; পাঁচপাড়া ৪৸৶০
,, নীলমাধব মুখো ; সব্ ইনঃ
কৃষ্ণনগর .. ৸৶০
,, গোপীমোহন ঘোষ ; সদরঘাট ৪৸৶০
বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী, কালেক্টরি
চট্টগ্রাম ৪৸৶০
,, দয়ালচন্দ্র বন্দ্যো ; শিক্ষক ইছাপুর
স্কুল ১৷৷৶০
,, হরচন্দ্র চৌধুরী ; জমি, সেরপুর ৩৷৶০
,, প্যারীমোহন চৌধুরী ; মাদলা ৩৷৶০

১২৮৫ সাল।

বাবু জগচ্চন্দ্র দাস, বিএল্ ; এসিঃ
একষ্ট্রা কমিঃ শিবসাগর ২৲
,, গিরিন্দ্রচন্দ্র বসু ; অধ্যাপক, কটক
কলেজ . ৩৷৶০
,, বিপিনবিহারী মিত্র ; উকীল
জজকোর্ট, কটক ৩৷৶০
,, গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর সাহেব ;
আগড়তলা ৪৸৶০
,, তিনকড়ি রায় ; পাঁচপাড়া ৪৸৶০
,, নীলমাধব মুখো, সব ইনঃ অব
স্কুল, নদীয়া ৪৶০
,, ভূপতি সর্ব্বাধিকারী, শিক্ষক,
হরিরপুর ৩৲
,, সীতাকান্ত মুখো ; ডেঃ মেঃ কটক ৩৲
,, কালীকুমার চক্রবর্ত্তী ; কালেক্টর,
চট্টগ্রাম ।০
,, দয়ালচন্দ্র বন্দ্যো ; শিক্ষক, ইছাপুর
স্কুল ৩৷৶০
,, হরচন্দ্র চৌধুরী ; জমিঃ সেরপুর ৩৶০
,, প্যারীমোহন চৌধুরী ; মাদলা ১৷০

১২৮৭ সাল।

বাবু কালীময় ঘটক, প্রঃ শিক্ষক, রাণাঘাট
স্কুল ৩৷৶০
,, কালীরঞ্জন লাহিড়ী ; পুঁটীয়া ৩৷৶০
,, রঘুনাথ দাস ; জমিঃ ডাইলবাজার
৪৸৶০
মহারাজ বৰ্দ্ধমান ৪৸৶০
বাবু বিপিনবিহারী মিত্র ; উকীল,
জজ-কোর্ট, কটক ৩৷৶০

বাবু গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর সাহেব; আগড়তলা ৩।৶০
„ তিনকড়ি রায়; পাঁচপাড়া ।০
„ যদুনাথ ভট্টাচার্য; আর্কেডিয়া ৪৸৶০
„ হরদয়াল ঘোষ; তাজহাট ৩।৶০
„ সীতাকান্ত মুখো; ডেঃ মেঃ কটক ৪৸৶০
—পব্লিক্ লাইব্রেরি; সাতক্ষীরা ২॥/০
বাবু সারদাপ্রসাদ মুখো; পোঃ মাঃ রায়বেরিলি ৩।৶০
„ হরেরাম ঘোষ চৌধুরী; জমিঃ জগদানন্দপুর ৩৲
„ দয়ালচন্দ্র বন্দো; শিক্ষক, ইছাপুর স্কুল ৩।৶০
„ মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার কাশীপুর ৩।৶০

কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে; রাজনগর ৩।৶০
রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর; জমিদার, আজিমগঞ্জ ৩।৶০
„ মেঘরাম বাহাদুর; ঐ ১॥৶০
বাবু যদুনাথ ঘোষ; ডেঃ কমিঃ অফিস ধুবঁড়ি ২৲
„ কৃষ্ণ গোপাল সানাল, গবর্ণমেণ্ট রীডার, জজকোর্ট, মৈনপুরী ৩৲

১২৮৮ সাল।

মহারাজ বর্দ্ধমান ৩।৶০
বাবু সীতাকান্ত মুখো; ডেঃ মেঃ কটক ২৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদিগের নিকট হইতে, আর্য্যদর্শনের মূল্য পাওয়া যাইতেছে না, তাঁহাদের নিকট যে টাকা পাওয়া যাইবে, নিম্নে লিখিত হইল।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দো; লচ্ছিপুর, সীতারামপুর ৭৸৶১০
„ অমৃতকৃষ্ণ সরকার; পুলিস ষ্টেশন, মহিমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৯॥/০
„ অক্ষয়কুমার দাস; স্কুল পণ্ডিত, কাকিনিয়া, রঙ্গপুর ১৭/০
„ আশুতোষ মুখো; ক্যানিং কলেজ; লক্ষ্ণৌ ৯৸/০

„ আশুতোষ বসু; চোঁয়া—হরিরপাড়া মুর্শিদাবাদ ১১৲
„ আনন্দকিশোর দাস; মঙ্গলাই আসাম ১৯॥০
মুন্সি আবদুল রেজ্জাক্; ক্যাম্প, সাহেবগঞ্জ ১৩৲
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; দীনহাটা, রঙ্গপুর ২৲৸৶০

বাবু উমাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় ; জমিঃ মাহেশতলা ১৯॥৵
„ উপেন্দ্রনাথ চট্টো ; গোবরডাঙ্গা ... ... ১৪॥৵১০
„ উমানাথ চক্রবর্ত্তী ; মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর ... ৬৷৴০
„ উমাচরণ ঘোষ ; গবর্ণঃ টেলিগ্রাফ, মড্ পইণ্ট ডায়মণ্ডহার্বার ৯৷৶০

বাবু উমাচরণ রায় ; কালেক্টরি, চট্টগ্রাম ... ৯৷৶০
„ উপেন্দ্রনাথ রায় ; পুঁড়া ২৪ পরগণা ৭৷৵০
„ উপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র ; গবর্ণঃ টেলিগ্রাফ, ঢাকা ১৪॥৵০
„ উমাচরণ চক্রবর্ত্তী (বরাবর পুলিষ ইনস্পেক্টার মহিমবাবু) রামপুর হাট, বীরভূম—১৬৵০

গত সংখ্যার ভ্রান্তি শোধন।

মফঃস্বল।

বাবু শ্যামাচরণ বিদ্যাচুঞ্চু,	... ...	॥০ পরিবর্ত্তে ১॥০ হইবে।
„ উমাশঙ্কর রায়	... ..	৩৷৴০ „ ৩৷৵০ „।
„ ললিত মোহন সেন	....	৩৲ „ (ভিপ্পী) ৩৷৵০ „।

নূতন প্রকাশিত হইয়াছে।

অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক।

আর্য্যদর্শন-সম্পাদক প্রণীত :—

হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলি		...	১৲	ডাক মাশুল ৴০
শিক্ষাসোপান	১ম ভাগ	... ...	৷০	„ ৴১০
„	২য় „	..	৷১০	„ ৴১০
„	৩য় „	... ...	৷৵০	„ ৴১০

২৫, ২৬ ও ২৭ নং করনওয়ালিস ষ্ট্রীট্ বি, বানর্জ্জি কোং নিকটেই প্রাপ্তব্য।

Hridayochchhvas (হৃদয়োচ্ছ্বাস); or, Papers on India. By Jogendra Nath Bandopadhyaya, Vidyabhushan, M. A. Compiled by Mahendranath Roy. The nine papers, embodied in the work before us, were originally published by their writer in the columns of the *Aryadars'an*, of which he is the editor. These have now been published as a separate work, partly to give them a permanent stability, and partly to prevent plagiarists from appropriating and using them, as has already been done with some of these papers, as their own. The papers are all on the present and past condition of India and cognate subjects and have been, for the most part, written with marked ability and with an eye to effect, and though there is much

in them with which we may not be prepared to be at one, the fact cannot be denied that they are characterised by a good deal of thoughtfulness, researching powers, and above all, unflinching patriotism.—*Indian Mirror. April* 21, 1881.

We have to acknowledge with thanks the receipt of a copy of Hridayochchhvas (হৃদয়োচ্ছ্বাস) a collection of essys on Indian subjects reprinted from the Aryadars'hana. The work has been edited by Babu Mahendra Nath Roy and publised by Messrs. B. Banerjee & Co The essays are all very interesting and treat of subjects of varied importance. We have much pleasure in recommending the book to the reading public.—*Bengalee, The 2nd April,* 1881.

হৃদয়োচ্ছ্বাস—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম,এ-প্রণীত। ইহাতে ভারতের অবস্থা ও উন্নতি-সম্বন্ধে কএকটী প্রবন্ধ আছে। আমরা সে গুলি পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইলাম। ইহার সুন্দর ভাষা, লেখকের সহৃদয়তা ও উন্নত-ভাব দ্বারা যার পর নাই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অতীত ও বর্ত্তমান ভারতবিষয়ক প্রস্তাবে গ্রন্থকার স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধে যে উদার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পত্রিকায় উদ্ধৃত করিবার নিতান্ত মানস ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে তাহাতে অসমর্থ হইয়া দুঃখিত হইলাম। লেখকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতের সহিত যদিও আমাদিগের আকাশ পাতাল প্রভেদ; পবিত্রতা ও প্রেমের পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর-বিশ্বাস ও অনুরাগ ভিন্নও নর-নারীর চরিত্র সম্পূর্ণ গঠিত ও সমাজের উন্নতি প্রকৃতরূপে সাধিত হইতে পারে, এ মত যদিও আমরা ভ্রান্ত মনে করি; তথাপি পুস্তকের এত গুণ আছে, যে আমরা পাঠিকাগণকে এতৎ-পাঠে অনুরোধ করিতে পারি।

বামাবোধিনী পত্রিকা; জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ সাল।

S'iksha Sopana. (শিক্ষাসোপান) By Jogendranath Bandopadhyaya Vidyabhushan, M.A. Great pains seem to have been taken by the author, with reference to the getting-up of the series, to meet the wishes and likenesses of the juvenile readers.—*Indian Mirror. April* 22, 1881.

এ দুই খানি নূতন ধরণের শিশুশিক্ষা। প্যারী বাবুর ফার্ষ্ট বুক্ অব্ রিডিং যে প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, এ দুই খানিও সেই প্রণালীতে রচিত। শিক্ষা-সোপান শিশুদের পাঠোপযোগী হইয়াছে। (১২মাঘ, ১২৮৭ সাল) নববিভাকর।

শিক্ষাসোপান—শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। এই পুস্তকের তিন খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বালক-বালিকাদিগের প্রথম শিক্ষার উপযোগী করিবার জন্য গ্রন্থকার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রয়াস সফল হইয়াছে।

ইহাতে সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। পাঠসকল অতি সুবিন্যস্ত। এ শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে ইহা উৎকৃষ্ট বলিয়া গননীয়। (বৈশাখ, ১২৮৮) বামাবোধিনী পত্রিকা।

নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ক্যানিং লাইব্রেরি, বায় প্রেস্ ডিপজিটরি ও বি, বানার্জির নিকটে পাওয়া যায়।

আর্য্যদর্শন-সম্পাদক-প্রণীত ঃ—

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন বৃত্ত (সচিত্র) ... ১।০

ম্যাট্‌সিনির জীবন-বৃত্ত ১০

৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত

বাসবদত্তা (৩য় সংস্করণ)...... ৸০

বসন্ত তরঙ্গিনী ... ॥০

আর্য্যদর্শন হইতে উদ্ধৃত, পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত ঃ—

সামুয়েল হানিমানের জীবনী (যন্ত্রস্থ) ৷৶০

আবশ্যকতা অনুভব করিয়া যোগেন্দ্র বাবু ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিয়াছেন। ইনি যেরূপ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা যে সাধারণের হৃদয়ের দেশানুরাগ-উদ্দীপনের প্রধান সাধনভূত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। * * * ভারতবাসিগণের সমক্ষে ম্যাট্‌সিনির জীবনী অমূল্য ও আদর্শনীয়। নববিভাকর (২৯ ভাদ্র, ১২৮৭।)

কাব্যসুন্দরী—বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ... ১৲ টাকা।

OPINIONS OF THE PRESS.

Indion Mirror 29*th September* 1880.

"The author of the *Kabya Sundari* appears to have read the works of Babu Bunkim Chunder with great care, and to have entered thoroughly into the spirit of that successsul novelis. The style of this work is, we are glad to note, not characterized by that kind of long windedness and heaviness, which is intended by some writers and mistaken by some readers, for the acme of rhetorical excellence and the model of sublime eloquence. The language is simple and pleasant, and the author has therein displayed a happy nack of bringing his readers to a quick realization of the beauties and qualifications of the characters taken up for criticism."

নববিভাকর। ৭ই ভাদ্র, ১২৮৭।

"বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী পাঠকগণকে এই পুস্তক খানি পাঠ করিবার জন্য আমরা বিশেষ অনুরোধ করি। পূর্ণবাবু

নিজে ভাবুক ও হৃদয়ালু পাঠকের মনে সেই ভাবুকতা ও হৃদয়ালুতা সিঞ্চন করিয়া দিতেও বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

কাব্যসুন্দরী বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, পূর্ণবাবুর কাব্যসুন্দরী না পড়িলে, তাহাদের অধ্যয়ন-বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে।

৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত	...	...	।৶০
ফাষ্ট বুকের অর্থ পুস্তক (সানুবাদ ও ২য় সংস্করণ)		...	৶০
সেকেণ্ড বুকের ,, ,,	...	...	।/০
থার্ড বুকের ,, ,,	..		৷০
ফোর্থ বুকের ,, ,, (যন্ত্রস্থিত)	...	...	

নলোপাখ্যান	...	.	...	...	৸০
বসন্তকুমারী	...	..	..	...	৸০
কুসুমমালিকা (বঙ্গকামিনী-রচিত)			...	...	।০
কমলাবতী	...	..	..	...	৸০

বালকগণের প্রথম শিক্ষার্থ :—

শিক্ষাসোপান ৪র্থ ভাগ (শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।)

ব্যবসায়িগণ অর্থ পুস্তকে শতকরা ৫০৲ টাকা কমিশন পাইয়া থাকেন।

অধ্যক্ষ।

সমর-শেখর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।" মেঘদূত।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে সেই উন্নত নীলগিরির এক উচ্চ প্রশস্ত শৃঙ্গের উপর এক খানি বৃহৎ অসিত শিলাসনে বসিয়া এক ব্যক্তি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছিল। তাহার পশ্চাতে অভ্রভেদী গিরিরাজি স্তরে স্তরে স্থাপিত, সম্মুখে বিশাল দাক্ষিণাত্য-ক্ষেত্র সুদূর বিস্তৃত। সেই গাঢ় জলদাবৃত সান্ধ্য গগনের গভীর ছায়া নীলগিরির সমস্ত অঙ্গে পতিত হইয়াছে। সেই গভীর ছায়া—গভীর গিরিগহ্বরে, নির্ঝরিণী-প্রোৎক্ষিপ্ত বায়ু-সমূহে পতিত হইয়া আরও গভীরতর হইতেছে; তথাপি তাহার সংজ্ঞা নাই! সে সেই বিজন পর্ব্বতোপরি উপবিষ্ট হইয়া, সেই গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট রহিয়াছে! কি চিন্তা? এই ভীষণ জীবশূন্য সানুদেশে আরূঢ় হইয়া কি চিন্তা করিতেছে? জগতে কি আর তাহার চিন্তা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই?

গৃহ—প্রান্তর—দেবালয়—তপোবন—গহন-কানন—পর্ব্বত-কন্দর—কোন স্থানই কি তাহার চিন্তার উপযোগী হইল না? তবে এ দুর্গম প্রোত্তুঙ্গ সানুদেশে কেন?

প্রকৃতি, স্থির—গম্ভীর—নিস্তব্ধ! ধীরে ধীরে গাঢ় মেঘমালা পর্ব্বত-গাত্রে গড়াইয়া যাইতে লাগিল—তাহার পরিধেয় বসন ও সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উচ্চে উঠিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে প্রকৃতি সচেতন হইতে লাগিল, আস্তে আস্তে বাতাস বহিতে লাগিল—তাহার ভরে মেঘ সকল নিম্নে নামিতে নামিতে ক্রমে ক্রমে ছুটিতে আরম্ভ করিল। এক খানি—দুই খানি—তিন খানি—ক্রমে অসীম মেঘরাশি পরস্পর সংসৃষ্ট হইয়া বিদ্যুদগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে গভীর নাদে চারি দিকে ছুটিয়া চলিল! দেখিতে দেখিতে বায়ু প্রবল হইয়া ভীষণ বেগে পর্ব্বতগাত্রে প্রতিহত হইতে লাগিল—সে বেগে সমস্ত পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল—তাহার শিখর-জাত শালবৃক্ষ সমূহ মর্ মর্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল! সেই শিখরাসীন মহাপুরুষের এই বার ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি প্রচণ্ড বায়ুর প্রবলতম উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন! এক বার বিস্ফারিত নয়নে চারি দিক চাহিয়া দেখিলেন এবং সেই

গভীর-নিনাদী বাত্যার সহিত সমস্বর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। সে চীৎকার কে শুনিবে? ভীষণ বায়ু ও মেঘগর্জ্জন সে চীৎকার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিল—তিনি স্বয়ংই তাহা শুনিতে পাইলেন না। শুনিতে পাউন্, আর নাই পাউন্, তিনি সে বিষয়ে দৃক্‌পাত না করিয়া সেই উচ্চ স্বরে আপন হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিলেন। "রাজ্য—ধন—গৌরব—সন্তান-সন্ততি! পলাইও না!—ভয় নাই!——উড়িয়া যাইবে না! আবার পাইব!—ভয় নাই! ঝড়—বৃষ্টি—বজ্র! একত্রিত হও—ছুটিতে থাক—জগৎ উড়াইয়া দাও—ভাসাইয়া দাও—দগ্ধ কর—পলাইও না!—আবার পাইব!——ভয়—না—ই—ই—ই——" বায়ু প্রবলতর হইল! মেঘদল ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল! হঠাৎ একটী শৃঙ্গ গভীর-নিনাদে ভূতলে পতিত হইল!—সে মহাপুরুষ কোথায় অদৃশ্য হইলেন!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

Amidst the bustle he seemed to hear,—
"Stay, Villain!—for thy death prepare!"
—DRYDEN.

সতীশ চমকিত হইলেন। সবিস্ময়ে চারি দিক চাহিয়া দেখিলেন! কিন্তু কি দেখিবেন? এরূপ অন্ধকার যে, নিকটস্থ বস্তুকেও চিনিতে পারা যায় না। তিনি যে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় আছেন, তাহাকেই দেখিতে পাইতেছেন না। সতীশ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে বিমল-কৌমুদী-দীপ্ত সুরম্য প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে ছিলেন; কিন্তু এ ভয়ানক স্থানে কি প্রকারে আসিলেন? তাঁহার বোধ হইল, যেন কে তাঁহাকে ঘোর অন্ধকার-ময় অতল অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিল! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। অকস্মাৎ অশ্বপৃষ্ঠ চ্যুত হইয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। অমনি সুশিক্ষিত অশ্ব দাঁড়াইল। এই সময় এই ঘোর অন্ধকার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া সহস্র অনল তরঙ্গের ন্যায় বিদ্যুৎ বিকাশিত হইল। সতীশ এই অবকাশে নিজ অশ্বে পুনরারূঢ় হইয়া গন্তব্য পথ জানিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু বৃথা! সমস্ত প্রকৃতি ভূকম্পনের ন্যায় এক বার চমকিত হইয়া উঠিল। আকাশ ও পৃথিবী এক বার বিকট নীরব হাস্য করিল, পুনর্ব্বার সে ভীমাকৃতি দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইল! ও দিকে জলদ-দল ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, এবং তৎপরেই শন্ শন্ শব্দে মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। পথিক এই বার বিষম বিপদে পড়িলেন। যখন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন তিনি আপন বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া লইয়া ছিলেন। দেখিয়াছিলেন যে, তিনি এক দুরন্ত প্রান্তর দিয়া গমন করিতেছেন—কিন্তু কোন্ স্থান, তাহার কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

ক্ষণকাল পরে বৃষ্টির প্রাবল্য অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হইল; কিন্তু সে ঘোর অন্ধকারের কিছুই বিকৃতি ঘটিল না। বৃষ্টি থামিল,—সতীশ কিয়ৎ-পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। যেরূপ বল-সহকারে বৃষ্টি ধারা পতিত হইতেছিল, যদ্যপি এক দণ্ড কাল সেই ভাবে থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে সেই স্থানে গত-জীবন হইতে হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ক্ষণকাল পরেই তাহা একেবারে হ্রাস হইয়া যাইল। সতীশ আশ্বাসিত হইলেন। কিন্তু যখন সেই অনন্ত প্রান্তর ও জগতের বর্ত্তমান সংহারমূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া তাঁহার মানস-দর্পণে প্রতিফলিত হইল, তখন একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়াও তথাপি নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি স্বহস্ত হইতে রশ্মি শ্লথ করিলেন, অশ্ব নিজ যথেচ্ছ পদে চলিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া অশ্ব অকস্মাৎ স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। সতীশ ভাবিলেন, সম্মুখে কোন নদী বা অন্য কোন প্রতিরোধ থাকিবে। তিনি রজ্জু আকর্ষণ করিয়া অশ্বকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে এক পাও সরিল না। সুশিক্ষিত অশ্ব—যাহাকে কখন কশাঘাত করিতে হয় না, স্বল্পমাত্র ইঙ্গিত করিলে অমনি বায়ুবেগে গমন করে,—সে অশ্ব আজ্ সতীশের বারংবার উত্তেজনা মানিল না। সতীশ অতীব বিস্মিত হইলেন; বুঝিলেন, তবে কোন প্রকারে ভীত হইয়া থাকিবে। তিনি ভয়ের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইবেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে এক বিকট হ্রেষারব শুনিতে পাইলেন। ত্রস্ত ভাবে ফিরিয়া দেখিলেন,—কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল সেই ঘন অন্ধকার-জাল সমগ্র জগতকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে! পুনশ্চ সেই হ্রেষারব ঘন ঘন শ্রুত হইতে লাগিল।

সতীশ পুনশ্চ ফিরিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও কোন অশ্বকে দেখিতে পাইলেন না; অবশেষে যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রবল বিস্ময়বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, জলন্ত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় এক জ্যোতির্ম্ময় আলোক-খণ্ড শূন্যপথ আলোকিত করিয়া তীব্র বেগে তদ্দিকে ধাবমান হইতেছে। সতীশ বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। দেখিতে দেখিতে আলোক তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। আলোক-বিক্ষিপ্ত গাঢ়োজ্জ্বল আভা তদবলম্বী ব্যক্তির প্রতি অস্থির ভাবে পতিত হওয়াতে, সে অশ্বারোহী কে—সতীশ চিনিতে পারিলেন না। কেবল দেখিলেন, এক অশ্বারূঢ় ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে প্রচণ্ড মশাল ধারণ করিয়া নিক্ষিপ্ত-তীর বেগে অশ্বচালনা করিতেছে। এই বার আলোক-ধারী তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইল। প্রোৎসাহিত ঘোটকের তীব্র প্রস্থান-বেগে ভূমিতল কাঁপিয়া উঠিল।

"সতীশ সিংহ! শীঘ্র এই আলোকের অনুধাবন কর।" স্পষ্ট ও অত্যুচ্চ স্বরে বলিয়া সেই অপরিচিত ব্যক্তি তৎপার্শ্ব অতিক্রম করিল এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া যাইল। এ কে? কেনই বা এই গভীরান্ধকারাবৃত ভীষণ প্রান্তর দিয়া এরূপ ভয়ানক সময়ে যাইতেছে? কেনই বা সতীশকে তাহার অনুধাবন করিতে বলিল? তবে কি এ ব্যক্তি সতীশের কোন শত্রু? সতীশ অতীব বিস্মিত হইলেন। তথাপি অণুমাত্র সংশয় ব্যতিরেকে স্বীয় তুরঙ্গ তৎক্ষণাৎ চালিত করিয়া তিনি তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যতক্ষণ আলোক তাঁহার দৃষ্টি-পথ অতিক্রম না করিল, ততক্ষণ তিনি সমভাবে ঘোটক সঞ্চালিত করিলেন;—অবশেষে নিরুদ্দেশ ও নিরুপায়! সতীশ স্তব্ধ ভাবে অশ্বের গতিরোধ করিলেন এবং চঞ্চল নয়নে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। কোন দিকেই তাঁহার অন্তঃকরণ আশ্বাসিত হইল না। "অদ্য কি কুক্ষণেই কার্য্যে বহির্গত হইয়াছি। প্রবল বাত্যা ও নিবিড় অন্ধকারই আমার কাল হইল। সমরের সহিত সাক্ষাৎ হইল না;—না জানি, ইহাতে কত মহৎ অনিষ্টই বা সংঘটিত হইয়া থাকিবে; সমর আমার প্রতি কতই বিরক্ত হইতেছেন! কতই ক্রুদ্ধ হইতেছেন—আর এ আবার কি? যেরূপ তীব্র বেগ, তাহাতে দিবাভাগ হইলেও চিনিয়া লওয়া দুষ্কর—"সতীশ এরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দূর-পতিত বজ্রনাদের তুল্য গম্ভীর বন্দুকধ্বনি সুদূরে শ্রুত হইল;—সতীশ চমকিত হইলেন। পুনশ্চ সেই আলোক অনুজ্জ্বল ভাবে দূরদেশে পরিদৃশ্যমান হইল। সতীশ পুনশ্চ তদ্দিকে সবেগে অশ্ব চালিত করিলেন। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই আলোককে তাঁহার নিকটস্থ বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রোশান্তরে, পরে ক্রোশার্দ্ধান্তরে অনুমিত হইল। সতীশ সাশ্বাসে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ ক্রোশ অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু সে আলোক কোথায়? তাহা যেখানকার, সেই স্থানেই রহিল! তিনি মনে করিলেন—আরও ক্রোশার্দ্ধ গমন করিলে, আলো পাওয়া যাইবে; যাহাহউক, অশ্বকে পুনর্ব্বার তাড়িত করিলেন। ক্ষণকাল-মধ্যে অনুমিত ক্রোশাংশও অতিক্রম করিলেন, কিন্তু এখনও আলোক পাইলেন না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কত যে অর্দ্ধ ক্রোশ অতিক্রম করিলেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। সতীশ নিরস্ত হইলেন; ভাবিলেন, তাঁহার দৃষ্টির ভ্রম হইয়া থাকিবে; অঙ্গাবরণি দ্বারা চক্ষুদ্বয় দৃঢ়রূপে মার্জ্জিত করিলেন। আবার সেই দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; এত ক্ষণ যাহা দেখিতেছিলেন, এক্ষণেও তাহা দেখিতে পাইলেন, অস্তির্ন্য

কোন বস্তুই তাঁহার নয়নগোচর হইল না। স্থির করিলেন, ইহা তাঁহার নয়নের ভ্রম-বিজৃম্ভিত নহে, অবশ্যই একটী আলোক কোন স্থানে রক্ষিত থাকিবে। রাত্রির ঘোরতা ও প্রান্তরের আদিগন্ত-বিস্তৃতি বশত ঐরূপ প্রতীয়মান হইতেছিল। তিনি অশ্বকে পুনর্ব্বার তাড়না করিলেন। কিয়ৎকালান্তরে অশ্ব নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইল। সতীশ দেখিলেন, এক অনত্যুচ্চ গিরি গুহাদ্বারে সেই প্রচণ্ড মশাল পবিদীপ্ত হইতেছে। আলোক-দণ্ড পর্ব্বতস্থ এক রন্ধ্র-মধ্যে প্রোথিত। অতি মৃদু সমীরণ-সঞ্চারে উৎসাহিত হইয়া আলোক উচ্চ শিখা নির্গত করিয়া সবেগে জ্বলিতেছে। সতীশ গুহাদ্বার-সমীপস্থ হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত এক বৃহৎ পাষাণ-খণ্ডে অশ্ব-রজ্জু সংলগ্ন করিয়া স্বয়ং গুহাদ্বার-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, তন্মধ্যে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক অপরিচিত পুরুষ গুহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া, বিনীত স্বরে কহিল, "মহাশয়! আমাদের প্রভু এতক্ষণ আপনার অপেক্ষায় থাকিয়া সম্প্রতি আপনারই প্রত্যুদ্গমনে বহির্গত হইয়াছেন। আপনি ঐ পরিষ্কৃত শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট হউন; আমি শীঘ্র তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।" অপরিচিত ব্যক্তি গুহামধ্যস্থ এক পরিষ্কৃত শ্বেত শিলাখণ্ড দেখাইয়া দিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। গুহামধ্যে আর একটী ক্ষুদ্র মশাল অল্পোজ্জ্বল শিখা বিক্ষেপ করিতেছিল। তন্নিক্ষিপ্ত আলোক শুভ্র শিলাখণ্ডে পতিত হইয়া মন্দ মন্দ দীপ্তি পাইতেছিল। সতীশ অসন্দিগ্ধ চিত্তে গুহা প্রবেশ করিয়া সেই শিলোপরি উপবিষ্ট হইলেন। এবং বৃষ্টি-সিক্ত গাত্রাবরণ-গুলি একে একে উন্মোচন করিয়া পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টি-প্রহারে এবং অসীম পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তিনি তদুপরি শয়ন করিলেন। ক্রমে আলস্যবশত নিদ্রা আসিয়া অলক্ষিত ভাবে তাঁহার নয়নদ্বয়কে আক্রমণ করিল। সতীশ নিদ্রিত হইলেন। হঠাৎ এক ভীষণ শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শশব্যস্তে উত্থিত হইয়া একান্ত মনে তাহা শুনিতে লাগিলেন। যেন এক প্রলয়-প্রভঞ্জন উত্থিত হইয়া প্রবল বেগে পর্ব্বত-গাত্রে আঘাত করিতেছে। সমস্ত পর্ব্বত কাঁপিতে লাগিল। সতীশ ত্রস্ত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, গুহা হইতে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিলেন। দ্রুত পদে দ্বারদেশ-ভাগে গমন করিবেন, অমনি স্তম্ভিত হইয়া মৃৎপুত্তলীর ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিলেন,—দ্বার রুদ্ধ! স্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিবার জন্য গুহা-শোভী মশাল লইয়া পরীক্ষা করিলেন—বুঝিলেন, এক প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ডে গহ্বর-দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। কে করিল,—কিছুই স্থিরতা নাই। সতীশ কাঁদে পড়িলেন।

এই সময়ে বহ্নিবিপ্লব অনেকাংশে মন্দীভূত হইল। সতীশ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, এক বিকট চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন "রমেশ—নর-পিশাচ—পলায়ন করিস্ না—পলায়ন করিস্ না।" সতীশ বিস্মিত হইলেন। এ স্বর তাঁহার চির-পরিচিত। তিনি বিস্মিত, ভীত ও চিন্তিত হইলেন; ভাবিলেন, এত দিনে বুঝি, সমরসিংহ তাঁহার চির-পালিত জিঘাংসাবৃত্তি সফল করিলেন। রমেশ যদিচ দুরাচার, তথাপি এরূপ ঘোর প্রতিহিংসার যোগ্য নয়। সমর না বুঝিয়া বড় গর্হিত কার্য্যই করিলেন।" সতীশ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গুহা-মধ্যে একটী শব্দ শ্রুত হইল; চমকিয়া দেখিলেন, উপর হইতে কি নিক্ষিপ্ত হইল। হস্তস্থিত আলোক-সাহায্যে অনুসন্ধান করিলেন; পরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়, ভয় ও চিন্তা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। এক বিশিরস্ক শবদেহ সম্পূর্ণ যোদ্ধৃবেশ-পরিহিত,—কটিবন্ধে শূন্য কোষ লম্বমান। সতীশ দেখিলেন, এই বেশে রমেশ তাঁহাকে সেই দিন আক্রমণ করিয়াছিল!

যোগ।

ষট্ চক্র-ভেদের ফল-বর্ণন।

[শিবসংহিতা ও সম্মোহন তন্ত্র।]

মূলাধার চক্রাদি ভেদ-ফল লিখিবার পূর্ব্বে ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না নামক নাড়ী-ত্রয়ের চিন্তনের ফল লেখা যাইতেছে। এই নাড়ীত্রয়কে যে প্রকারে ভাবনা করিতে হইবে, তাহা লেখা আবশ্যক।

মূল-পদ্ম-স্থিতা যোনি-
র্বাম দক্ষিণ-কোণতঃ।
ইড়া-পিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে,
সুষুম্না-যোনি-মধ্যগা॥
সুষুম্নায়াং সদৈবায়ং,
বহেৎ প্রাণ-সমীরণঃ।
ব্রহ্মরন্ধ্রঞ্চ তত্রৈব
সুষুম্নাধার-মণ্ডলে।
যো জানাতি স মুক্তঃ স্যাৎ
কর্ম্ম বন্ধাদ্বিচক্ষণঃ॥

মূলাধার পদ্মের মধ্যস্থলে যে যোনি-যন্ত্র আছে, সেই যোনি-যন্ত্রের বাম ও দক্ষিণ কোণ হইতে যে ইড়া আর পিঙ্গলা নাড়ী বাহিত আছে, সেই নাড়ী-দ্বয়ের মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ীও আছে। ঐ নাড়ীত্রয় মূলাধার হইতে ঐরূপে নির্গত হইয়া সহস্রার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। সেই সুষুম্না নাড়ীতে প্রাণবায়ু গতায়াত করে। যে যোগী

ইহা জানেন, তিনি কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন।

ব্রহ্মরন্ধ্-মুখে তাসাং,
সঙ্গমঃ স্যাদসংশয়ঃ।
যস্মিন্ স্থানে স্নাতকানাং,
মুক্তিঃ স্যাদধিরোধতঃ॥
গঙ্গা-যমুনয়োর্ম্মধ্যে,
বহত্যেষা সরস্বতী।
তস্যাস্তু সঙ্গমে স্নাত্বা,
ধন্যো যাতি পরাং গতিং॥

মূলাধার হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয় নির্গত হইয়া ষট্‌চক্র ধারণ করত ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া মিলিত হইয়াছে। যোগীরা ঐ স্থানকে প্রয়াগ বলিয়া জানেন। ঐ প্রয়াগে মানসে স্নান করিলে, নির্ব্বিবাদে মুক্তি হয়। গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থলে সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। এই সঙ্গমে যিনি স্নান করেন, তিনিই ধন্য হইয়া পরম গতি লাভ করেন।

সিতাসিতে সঙ্গমে যো,
মনসা স্নানমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো,
যাতি ব্রহ্ম-সনাতনং॥

সিতা অর্থাৎ শুক্লবর্ণা ইড়াতে, অসিতা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা যমুনা নামে পিঙ্গলাতে যে সঙ্গম হইয়াছে, তাহাতে যে ব্যক্তি মনে মনে স্নান করে, সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা,
পিঙ্গলা চার্ক-পুত্রিকা।
মধ্যা সরস্বতী প্রোক্তা,
তাসাং সঙ্গোঽতি দুর্লভঃ॥

ইতঃপূর্ব্বে ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা, আর পিঙ্গলাকে যমুনা বলা হইয়াছে; এবং মধ্যস্থলে সুষুম্না নামে যে নাড়ী আছে, তাহাকে সরস্বতী বলা গিয়াছে। ইহাদিগের মিলন অতি দুর্লভ।

ত্রিবেণ্যাং সঙ্গমে যো বৈ,
পিতৃকর্ম্ম সমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো,
যাতি ব্রহ্ম সনাতনং॥

এতাদৃশ ত্রিবেণী-সঙ্গমে যে যোগী মন দ্বারা স্নান করিয়া পিতৃকার্য্য সমাধা করেন, সেই যোগী সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া, সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

নিত্য নৈমিত্তিকং কাম্যং
প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
মনসা চিন্তয়িত্বা তু
সোঽক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ॥

এই সঙ্গম-স্থানের চিন্তা করিয়া যে ব্যক্তি ঐ থানে প্রত্যহ মনে মনে নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম-সকল বিধি-বোধিত-রূপে নির্ব্বাহ করেন, তিনি অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হন।

সঙ্গমে যঃ কুরুতে স্নানং
স্বর্গে সৌখ্যং ভুনক্তি সঃ।
দগ্ধান্ পাপান্ শেষান্ বৈ,
যোগী শুদ্ধমতিঃ স্বয়ং॥

এই সঙ্গম-স্থানে যে যোগী এক বার-মাত্র মানস-স্নান করেন, সেই যোগী স্বর্গীয় সৌখ্য-ভোগ করত অশেষ পাপ দগ্ধ করিয়া পবিত্র-মতি হন।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা,
সর্ব্বাবস্থাং গতোপি বা।
স্নানাচরণ-মাত্রেণ
পূতো ভবতি নান্যথা॥

অশুচি হউক, বা শুচি হউক, সকল অবস্থাতেই ঐরূপ মানসে স্নান করিবা-মাত্রেই যোগী পবিত্র হন, ইহার অন্যথা নাই। লোক মনে মনে কত কর্ম্ম করে; অতএব এতাদৃশ স্নান করার বাধা কি? কর্ম্ম তিন প্রকার; কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। মানসিক কর্ম্মে আড়ম্বর নাই, হিংসা নাই, জনসমাজের অনিষ্ট নাই। এজন্য যোগীদিগের পক্ষে মানসিক কার্য্য অতি আদরণীয়।

মৃত্যুকালে প্লুতং দেহং,
ত্রিবেণ্যাঃ সলিলে সদা।
বিচিন্ত্য যস্ত্যজেৎ প্রাণান্,
স তদা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তি ত্রিবেণীর জলে আপন দেহ মগ্ন করিয়া দেহ ত্যাগ করিতেছি ইহা ভাবিবে, সে ব্যক্তির ঐ সময় মোক্ষ-পদ প্রাপ্তি হয়। তাহার আর জন্ম-মরণ-জনিত যাতনা হয় না। চিন্তার অসাধ্য কি আছে? ফল, জীব মৃত্যুকালে যাহা চিন্তা করিয়া মরিবে, তাহাই হইবে। এখানে ত্রিবেণী চিন্তাফলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-লাভ হয়, এবং তাহাতেই মুক্তি-পদলাভ হয়।

মূলাধার-চক্র-মাহাত্ম্য,——
বপুষঃ কান্তিরুৎকৃষ্টং
জঠরাগ্নি-বিবর্দ্ধনং।
আরোগ্যঞ্চ পটুত্বঞ্চ,
সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে॥
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ,
বেত্তি সর্ব্বং স কারণম্।
অশ্রুতান্যপি শাস্ত্রাণি,
সরহস্যং বদেদ্ ধ্রুবং॥
বক্ত্রে সরস্বতী দেবী,
সদা নৃত্যন্তি নির্ভরা।
মন্ত্র-সিদ্ধির্ভবেত্তস্য,
জপাদেব ন সংশয়ঃ॥

যে যোগী যোগশাস্ত্রানুসারে মূলাধার-পদ্ম ভাবনা করিতে পারেন, তাঁহার শরীরের উৎকৃষ্ট কান্তি ও জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়; এবং আরোগ্য লাভ করিয়া শরীর সুপটুতা ও সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করে।

সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হইলে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জানা যায়। এতদ্ভিন্ন কারণও বোধ হয়।

অপিচ অশ্রুত শাস্ত্র সকলের রহস্যও নিশ্চিত রূপে বলিতে পারা যায়। যেহেতু, তাহার জিহ্বাতে বাগ্বাদিনী দেবী সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন।

মূলাধার চিন্তাকারী ব্যক্তি ইষ্ট-মন্ত্র যাহা জপ করেন, বিনা পুরশ্চরণে তাঁহার যে তাহা সিদ্ধ হয়,তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই। মহাকবি ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি মূলাধার চিন্তা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা অসাধারণ কবি হইতে পারিয়াছিলেন।

ইদং ধ্যানং সদা কার্য্যং,
পবনাভ্যাসিনা পরং।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো
মুচ্যতে সর্ব্ব-কিল্বিষাৎ॥

যাঁহারা প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেছেন, তাঁহারা মূলাধার-চক্র-ধ্যান সর্ব্বদা করিবেন। এই ধ্যান করিবা-মাত্রেই সকল রকম পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

যৎ যৎ কাময়তে চিত্তে,
তৎ তৎ ফলমবাপ্নুয়াৎ।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ,
তং পশ্যতি বিমুক্তিদং॥

যিনি যে কামনা করিয়া মূলাধার-চক্র চিন্তা করিবেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইবেন। আর যিনি সর্ব্বদা মুক্তিপ্রদ মূলাধার চিন্তা করেন, তিনি অভ্যাস-ক্রমে মন দ্বারা মূলাধার দেখিতেও পান।

বহিরভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠং,
পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ।
ততঃ শ্রেষ্ঠতমং হ্যেতৎ,
নান্যদস্তি মতং মম॥

যে সাধক যত্নপূর্ব্বক নিরন্তর মূলাধার পথের আর স্বয়ম্ভু লিঙ্গের ধ্যান-যোগাভ্যাস করিয়া কৃতকার্য্য হন, তিনি বহির্ন্তর-ব্যাপক পরম শ্রেষ্ঠ, পরম পূজনীয় মুক্তিপ্রদ পরমাত্মাকে অন্তরে ও বাহিরে সন্দর্শন করেন; এ নিমিত্ত মহাদেব এই ধ্যান-যোগকে শ্রেষ্ঠতম যোগ বলিয়াছেন।

আত্মলিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যা-
দনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সফলা সিদ্ধি-
র্নাত্র কার্য্য-বিচারণা॥

যে সাধক প্রত্যহ আপন দেহস্থ পরমাত্মার আরাধনা করেন, তাঁহার তাবৎ ফল সিদ্ধ হয়।

নিরন্তর-কৃতাভ্যাসাৎ,
ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্য বায়ু-প্রবেশোঽপি,
সুষুম্নায়াং ভবেদ্ধ্রুবং॥

স্বশরীরস্থ আত্মার উপাসনা যে সাধক ক্রমাগত ছয় মাস কাল করেন, তিনি সিদ্ধ হন। এবং তাঁহার সুষুম্না নাড়ীর ছিদ্র-মধ্যে নিশ্চয় বায়ু প্রবিষ্ট হয়। বিনা কুম্ভকে আত্মার উপাসনা করিতেও নিষেধ নাই। এ সকল কার্য্যে ষট্‌কর্ম্ম আর মুদ্রা-বন্ধনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মনোজয়ঞ্চ লভতে,
বায়ু-বিন্দু-বিধারণং।
ঐহিকামুষ্মিকী সিদ্ধি-
র্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ॥

উক্তরূপ পরমাত্মার ধ্যান-বলে মন বশীভূত হইতে পারে। আর বায়ু ও বিন্দু-ধারণের ক্ষমতা জন্মে। ইহাতে ইহলোক ও পরলোক এই উভয়

লোকেই সিদ্ধিলাভ করে, তাহার কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই।

স্বাধিষ্ঠান চক্র।

যো ধ্যায়তি সদা দিব্যং
স্বাধিষ্ঠানারবিন্দকং।
তস্য কামাঙ্গনা সর্ব্বা
ভজন্তে কামমোহিতাঃ
বিবিধঞ্চাশ্রুতং শাস্ত্রং
নিঃশঙ্কো বৈ বদেদ্ধ্রুবং।
সর্ব্বরোগ-বিনির্ম্মুক্তো
লোকে চরতি নির্ভয়ঃ॥
মরণং খাদ্যতে তেন,
স কেনাপি ন খাদ্যতে।
তস্য স্যাৎ পরমা সিদ্ধি-
রণিমাদি-গুণান্বিতা॥
বায়ুঃ সঞ্চরতে দেহে,
রসবৃদ্ধি র্ভবেদ্ধ্রুবং।
আকাশ-পঙ্কজ গলৎ
পীযূষমপি বর্দ্ধতে॥

যে সাধক বিধি-মতে সর্ব্বদাই দিব্য স্বাধিষ্ঠান পথ চিন্তা করেন, কাম-মোহিতা দিব্যাঙ্গনারা তাঁহাকে ভজনা করেন। এতদ্ভিন্ন অশ্রুত শাস্ত্রসকলের অর্থ অতি নির্ভয়ে বলিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাবৎ রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া অকুতোভয়ে বিচরণ করেন। ইহা ব্যতীত সেই সাধক মৃত্যুকেও গ্রাস করেন, কিন্তু মৃত্যু কর্ত্তৃক তিনি কদাপি ভক্ষিত হন না। তাঁহার অণিমাদি গুণেরও পরম সিদ্ধি হয়। তাঁহার শরীরস্থ তাবৎ নাড়ীতে উত্তমরূপে বায়ুসঞ্চরণ হইয়া থাকে; সুতরাং দেহে রসবৃদ্ধি অর্থাৎ লোহিত বর্দ্ধিত হয়। আর আকাশ-পঙ্কজ অর্থাৎ সহস্রার-পতিত পীযূষ পান করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকেন।

মণিপুর চক্র।

অস্মিন্ ধ্যানং সদা যোগী,
করোতি মণি-পূরকং।
তস্য পাতালসিদ্ধিঃ স্যা-
ন্নিরন্তর-সুখা-বহা॥
ঈপ্সিতঞ্চ ভবেল্লোকে,
দুঃখরোগ-বিনাশনং।
কালস্য বঞ্চনঞ্চাপি,
পরদেহ-প্রবেশনং।
জাম্বুনদাদি-করণং,
সিদ্ধানাং দর্শনং ভবেৎ।
ঔষধী-দর্শনঞ্চাপি,
নিধীনাং দর্শনং ভবেৎ।

যে ব্যক্তি এই মণিপুর চক্র সর্ব্বদা ধ্যান করেন; তাঁহার নিরন্তর সুখাবহ পাতাল-সিদ্ধি হয়। তিনি ইহলোকে সকলের বাঞ্ছিত হন। তাঁহার তাবৎ দুঃখ ও রোগ বিনষ্ট হয়, তাঁহা দ্বারা কাল বঞ্চিত হয় অর্থাৎ তিনি কাল কর্ত্তৃক কবলিত হন না; এবং পর দেহে প্রবেশ করিতে পারেন, এমন ক্ষমতাও জন্মে। এতদ্ভিন্ন জাম্বুনদাদি করিতে শক্ত হন অর্থাৎ সুবর্ণাদি উৎপন্ন করিতেও পারেন। তিনি দেবতাদিগের সহিত, সাক্ষাৎ

করিতে ও পৃথিবীস্থ সমস্ত ঔষধ ও নিধি দেখিতে পান ইত্যাদি।

অনাহত চক্র।

এতস্মিন্ সততং ধ্যানং
হৃৎ-পাথজে করোতি যঃ।
ক্ষুভ্যন্তে তস্য কান্তা বৈ,
কামার্ত্তা দিব্যযোষিতঃ॥
জ্ঞানঞ্চাপ্রতিমং তস্য,
ত্রিকাল-বিষয়ন্তবেৎ।
দূরশ্রুতির্দূর-দৃষ্টিঃ
স্বেচ্ছয়া খগতাং ব্রজেৎ॥
সিদ্ধানাং দর্শনঞ্চাপি,
যোগিনী-দর্শনং তথা।
ভবেৎ খেচর-সিদ্ধিশ্চ,
খেচরাণাং জয়স্তথা॥
যো ধ্যায়তি পরং নিত্যং,
বাণলিঙ্গং দ্বিতীয়কং।
খেচরী-ভূচরী-সিদ্ধি-
র্ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ॥
এতস্য ধ্যানমাহাত্ম্যং,
কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা,
গোপয়ন্তি পরন্থিদং॥

হৃৎ-পদ্মে যে সকল চিন্তনীয় বিষয় আছে, তাহা যে ব্যক্তি নিরন্তর ধ্যান করেন, তাঁহার কাছে কামার্ত্তা দেবাঙ্গনা-গণ সংক্ষোভিত হন। আর সেই ব্যক্তির অপরিমিত জ্ঞান ও ত্রিকালজ্ঞত্ব জন্মে। ত্রিকালজ্ঞত্ব অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান কালের জ্ঞান জন্মে। এতদ্ভিন্ন দূর-শ্রুতি ও দূর-দর্শন-ক্ষমতাও হয় এবং স্বীয় ইচ্ছানুসারে আকাশে যাতায়াত করা চলে। সিদ্ধ পুরুষদিগকে ও যোগিনী সকলকেও দেখিতে পান। আর খেচর-সিদ্ধিও হয় এবং খেচর সকলকে জয় করিতে পারেন। যে ব্যক্তি অত্রত্য বাণাখ্য দ্বিতীয় লিঙ্গকে নিত্য ধ্যান করেন, তাঁহার অসংশয় খেচরী ও ভূচরী-সিদ্ধি হয়। এই হৃৎ-পদ্মের চিন্তন-ফল মহাদেব বলিতে অক্ষম; অধিক কি, ব্রহ্মাদি দেবগণ এই পরাৎপর যোগকে গোপন করেন।

অতঃপর বিশুদ্ধ ফল বর্ণিত হইতেছে ঃ—

ধ্যানং করোতি যো নিত্যং,
স যোগীশ্বর-পণ্ডিতঃ।
কিন্তস্য যোগিনো হন্যত্র,
বিশুদ্ধাখ্যে সরোরুহে॥
চতুর্ব্বেদা বিভাসন্তে,
রহস্যা নিধিরেব চ।
রহঃস্থানে স্থিতো যোগী,
যদা ক্রোধবশো ভবেৎ।
তদা সমস্তং ত্রৈলোক্যং
কম্পতে নাত্র সংশয়ঃ॥
ইহ স্থানে মনো যস্য,
দৈবাদ্ যাতি লয়ং যদা।
তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য,
স্বান্তরে রমতে ধ্রুবং।
তস্য ন ক্ষতিমায়াতি,
স্ব-শরীরস্য শক্তিতঃ।

সংবৎসর-সহস্রেঽপি,
বজ্রাতি-কঠিনস্য বৈ॥
যদা ত্যজতি তদ্ধ্যানং,
যোগীন্দ্রোঽ বনি-মণ্ডলে।
তদাবর্ষ-সহস্রাণি,
তৎক্ষণং মন্যতে কৃতী॥

যে ব্যক্তি এই বিশুদ্ধ চক্রে যাহা যাহা আছে, তাহা যদি নিত্য নিত্য ধ্যান করেন, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি যোগি-সকলের কর্ত্তা ও সুপণ্ডিত হয়। অধিকন্তু, সরহস্য বেদ ও বেদার্থ তাঁহার নিকটে রত্নবৎ প্রকাশ পায়।

এতাদৃশ যোগী যখন নির্জন স্থানে বসিয়া যোগ-সাধন করিতে করিতে যদিস্যাৎ কোন প্রকারে ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে সমস্ত ত্রৈলোক্য কম্পিত হইতে থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই পথে যে যোগীর মন যে সময়ে লয় হয়, সেই যোগী সেই সময়ে বাহ্য জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় অন্তর্জগতে নিশ্চয় ক্রীড়া করেন। এতদ্ভিন্ন এই সাধকেব দেহ আপন ক্ষমতাক্রমে বজ্রা-পেক্ষা কঠিন হয়, আর আধি-ব্যাধি হইতে ঐ শরীরের কোন ক্ষতি হয় না এবং সহস্র বৎসর কালেও ঐ দৃঢ়তার ব্যাঘাত জন্মে না। যে সময় ঐ যোগী ঐ চিন্তা হইতে বিরত হন, তখন সহস্র বৎসর এক ক্ষণমাত্র বোধ হইবে। অর্থাৎ হাজার বৎসর যদি ঐ চিন্তা করেন, তাহা হইলে ধ্যান ভঙ্গানন্তর ঐ কালকে এক ক্ষণকালের ন্যায় বোধ হয়। এতাবতা সুখের সময়কে লোক অল্প জ্ঞান আর দুঃখের সময়কে অধিক বিবেচনা করে।

আজ্ঞাখ্য চক্র।

যানি যানীহি প্রোক্তানি,
পঞ্চ পদ্মে ফলানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি সুতরা-
মেতজ্জ্ঞানাদ্ভবন্তি হি।
যঃ করোতি সদাভ্যাস-
মাজ্ঞাপদ্মে বিচক্ষণঃ।
বাসনায়া মহাবন্ধং
তিরস্কৃত্য প্রমোদতে।
প্রাণ প্রয়াণ-সময়ে,
তৎ পদ্মং যঃ স্মরন্ সুধীঃ।
ত্যজেৎ প্রাণান্ স ধর্ম্মাত্মা,
পরমাত্মনি লীয়তে॥
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ জাগ্রন্,
যো ধ্যানং কুরুতে নরঃ।
পাপ-কর্ম্ম-বিকুর্ব্বাণো,
ন হি মজ্জতি কিল্বিষে॥

যে সকল পদ্মের ফল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই সকল ফল এই এক আজ্ঞাখ্য দ্বিদল পদ্ম-চিন্তনে লাভ হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আজ্ঞা-পদ্ম-চিন্তা অভ্যাস করিবেন, তিনি বিচক্ষণ। তাঁহার এই ফল হইবে যে, যে ব্যক্তি আজ্ঞা পদ্মে স্বীয় মনঃ-সংযম করিবার জন্য সর্ব্বদা অভ্যাস করেন, তিনি বিষয়-বাসনা সকল পরিত্যাগ করত আনন্দিত হন। মরণকালে যে ব্যক্তি এই পদ্ম

চিন্তা করিয়া, প্রাণ ত্যাগ করেন, সেই যোগী একেবারে ভগবানে লীন হন। মরণ-সময়ে যে যাহা ভাবিবে, সে তাহাই হয়। কি উপবেশন-কালে, কি গমন-সময়ে, কি স্বপ্নাবস্থায় কি জাগ্রৎ সময়ে যে যোগী আজ্ঞাখ্য পদ্মের চিন্তা করেন, তিনি পাপী হইলেও, তাহাতে লিপ্ত হন না। অর্থাৎ এতাদৃশ যোগীর পাপ কোথায়? যদিও কোন রূপ পাপ করা হয়, তাহা ঐ চিন্তার গুণে যোগীর আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যোগী বন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ
স্বীয়য়া প্রভয়া স্বয়ং।
দ্বিদল-ধ্যান-মাহাত্ম্যং
কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদি-দেবতাশ্চৈব,
কিঞ্চিন্মাত্রং বিদন্তি তে॥

দ্বিদলধ্যায়ী যোগী স্বকীয় ক্ষমতা দ্বারা যাবতীয় সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। শিবও এতাদৃশ দ্বিদল পদ্মের মাহাত্ম্য বলিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। দেব দেব মহাদেবের নিকটে ব্রহ্মাদি দেবতা সকল দ্বিদলের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, যৎকিঞ্চিন্মাত্র জানিয়াছিলেন।

তালু-মূলস্থ সহস্রদল পদ্মের ফল-বিবরণ।

যস্য স্মরণমাত্রেণ,
ব্রহ্মজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি,
ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ।

তালু-মূলস্থ সহস্রার পদ্মস্থ বিষয় সকল ধ্যান-যোগে প্রত্যক্ষ করিলে, তৎক্ষণাৎ পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞান জন্মে, আর সমস্ত পাপ-পুঞ্জ ক্ষয় হয়। এতদ্ভিন্ন জীবের আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

পুরা ময়োক্তা যা যোনিঃ,
সহস্রার-সরোরুহে।
তদধো বর্ত্ততে চন্দ্র-
স্তদ্ধ্যানং ক্রিয়তে বুধৈঃ॥

ইহার পূর্ব্বে সহস্র-দল পদ্মে যে যোনি-মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহার নিম্নে যে চন্দ্র আছে, বুদ্ধিমান্ যোগীরা চন্দ্রের সেই ধ্যান করিবেন।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

নরসিংহ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—হিমালয় পর্ব্বতের উপর নরসিংহের আবাস ভবন।

সময় নিশীথ।

নরসিংহ একাকী উপবিষ্ট।

নর।

এ দীপের ক্ষীণালোক প্রোজ্বলিত করি
সম্মুখে, অনন্ত কাল এমনি করিয়া
তার প্রতি স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিব।
কিন্তু পুনরুদ্দীপিত সে আলো কি কভু
জ্বলিবে অনন্ত কাল অভাগার তরে?
সুনিদ্রা ত অভাগারে গিয়াছে ছাড়িয়া,
দারুণ হৃদয়ভেদী ভাবনার স্রোত
তন্ত্রা সহ অহরহ হইয়া মিলিত
বিষাদের সুভীষণ তরঙ্গ-কম্পিত
এ মনঃ-সাগর মাঝে পশি'ছে আমার!
সে ভাবনা-স্রোত হায়, এত যত্ন করি
নিবারিতে না পারিনু এ কি ঘোর দায়!

উঃ—

যখনি নয়ন মুদি তখনি অন্তরে
কি ভীষণ দৃশ্য অহো হয় প্রকাশিত!
এ যাতনা সহিয়াও র'য়েছি জীবিত!
জীবন্ত মানব মুখ দেখিতেছি পুন!

(কিঞ্চিৎ পরে।)

দুঃখই কেবল কিন্তু, মানবের মনে
জ্ঞানের সঞ্চারে শক্ত; বিষাদ(ই) বিজ্ঞান
মহাজ্ঞানী মহাদুঃখী; সেই শুধু জানে
জ্ঞান-বৃক্ষ-ফলে সুধা কখন(ও) থাকে না
দর্শন বিজ্ঞান কিবা—বিস্ময় নির্ঝর,—
মানবের জ্ঞান-স্রোত কোথা সমুত্থিত,
কোথা প্রবাহিত, কোথা পতিত সকলি
বিদিত আমার কাছে; এ মনো মাঝারে
এখন(ও) এমন শক্তি নিবসে সতত
যাহার প্রভাবে আমি পারি এ সকলে
করিবারে বশীভূত।—অঙ্গুলি-চালনে
সসম্ভ্রমে মানি সদা সে স্রোত-নিচয়
লঙ্ঘিবে স্বভাব-গতি বহিবে উজান।
অসীম ক্ষমতা মম সকলি বিফল।
পর-উপকার তরে নিজ স্বার্থ আমি
ত্যজিয়া ভুগেছি কত দুঃসহ যাতনা
সংসার পৃথিবী'পরে নর-চিন্তাকাশে
কতই সুন্দর-গ্রহে উদিত হইতে
দেখেছি নয়নে, কিন্তু সকলি বিফল।
বহু বৈরী ছিল মোর—কিন্তু পরাজিত
কখন(ও) কাহার(ও) কাছে হইনি জনমে।
এ গর্ব্ব উন্নত শির বিজিত হইয়া
অবনত কারো কাছে হয় নি কখন।
এই বাহু-বলে আমি কৈনু নিস্তেজিত
কত শত্রুবল—কিন্তু সকলি বিফল।

উত্তম অধম কিবা—জীবন মরণ—
ক্ষমতা বা রিপু-চয়—যা কিছু জগতে
নর-ভোগ্য সকলি ত বৃথা মোর কাছে,
উত্তপ্ত বালুকা-মাঝে জলবিন্দু সম;
সেই কু-ঘটনা এই যাতনা-প্রসূতি।
বুঝি নাই ভীতি কিবা—স্বভাব এ মনে
সে ভাব ভুলেছে দিতে।—হৃদয়ে আমার
বাসনা কি আশা আর হয় না উদিত।
হেন দ্রব্য পৃথিবীতে নাহি রে আমার—
অহো দুরদৃষ্ট মম—যার তরে মন
ক্ষণেকেরো তরে এবে হয় লালায়িত।
উঃ!
(কিঞ্চিৎ পরে।)
কিন্তু—
দেখি আজি পারি কি না একার্য্য সাধিতে
অসীম জগৎ আত্মা আইস সকলে—
কি আলোকে কি তমসে—দিবসে
নিশিথে—
ডাকিযাছি কত বার—পুন আজি ডাকি।
পৃথিবীতে অবিরত করি'ছ ভ্রমণ,
নিবসি'ছ কখন বা আকাশ উপরে।
দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ—সমুদ্রের ভীম
উন্নত তরঙ্গ-রাজি—পর্ব্বত-গহ্বর—
দুর্ব্বল সাধিতে বিঘ্ন তব গতি পথে।
কেন বিলম্বিছ? এস তোমরা সকলে
স্বৈরগতি, ডাকি আমি আইস সত্বরে।
অধীন আমার সবে যেই মন্ত্র-বলে
তোমরা, সে মন্ত্র আমি করি উচ্চারণ
ডাকিতেছি, অবিলম্বে হও আবির্ভূত!
(কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া, পরে।)

এখনও অনাগত? এত গৌণগতি?
বুঝিতে নারিনু কেন? দেখিব কেমনে
কি সাহসে মম আজ্ঞা বিলম্ব পালিতে?
এই চিহ্ন যার নামে আতঙ্কে শিহর—
দেখ এই চিহ্ন হবে।—মৃত্যুঞ্জয় দেব
তোমাদের প্রভু যিনি, মম মন্ত্রদাতা
তাঁহার পবিত্র নামে ডাকিতেছি আমি
এসগো জগৎ-আত্মা এস গো সকলে।
তবুও কি আসিবে না? জানি না কেমনে
কোন্ বলে এত স্পর্দ্ধা মন্ত্রাধীন জীবে?
প্রচণ্ড প্রভাব পুন করিব প্রয়োগ,
আরো মহত্তর বল হ'বে প্রকাশিত,
দেখিব তাহাতে তারা না আসে কেমনে!
উঠ হে ব্রহ্মাণ্ড-আত্মা আইস সকলে।
যে চিন্তা অন্তরে মোর চিরন্ত চেতন,
প্রবল শাপাগ্নি, যাহা দহিছে অন্তরে,
সর্ব্বদা, তা'দের নামে ডাকি পুন আমি
তোমাদিগে, উঠ সবে, এস ত্বরা করি।
(নেপথ্যে প্রথম আত্মা।)

প্র, আ।

মানব! আইনু তোমার আদেশে,
ত্যজিয়া আমার আকাশ ভবন;
গোধূলি তপন কিরণে উজল
লোহিতাভা কিবা মানস-রঞ্জন!
নিদাঘ প্রদোষ রবি-কর যার
ললাট-রঞ্জনে যতনে নিরত;
নীলমেঘ-আভা কেশ বিধানিলে
সিঁদূরের রেখা আঁকে যে সতত।
যদিও তোমার আদেশ লঙ্ঘিতে
ক্ষমতা, হে নর! আছিল আমার;

তারকা-কিরণ রথে আরোহিয়া
এসেছি তথাপি সকাশে তোমার।
(নেপথ্যে দ্বিতীয় আত্মা।)

দ্বি, আ।
পর্ব্বত-প্রধান হিমালয় গিরি
অদ্রিরাজ বলি জগতে বিখ্যাত,
শিলা সিংহাসনে আকাশ বসনে
তুষার মুকুটে চির বিরাজিত!
কটিদেশ সদা কাননে বেষ্টিত,
দীর্ঘ শিলাখণ্ড বাজদণ্ড করে;
সেই হিমাচল, পর্ব্বতের রাজা
আমার আদেশে আতঙ্কে শিহরে।
নিয়তই শিলা পড়ি'ছে খসিয়া,
গলিয়া যেতেছে অবনীর পানে,
পর্ব্বত সামগ্রী, পৃথিবীর মাঝে,
সবাই আমার আদেশে সম্মানে।
মহীধর-আত্মা আমি হে সকল,
পারি তাহাদের বিনত করিতে,
কেন হে মানব! ডাকিলে আমারে,
কি কার্য্য আমায় হইবে সাধিতে?
(নেপথ্যে তৃতীয় আত্মা।)

তৃ, আ।
সুশীতল গভীর জলধি-গরভে
তরঙ্গ-ভঙ্গিমা নাহিক যথায়,
পবনের সহ করিয়া বিবাদ
আঘাতে না যথা তরঙ্গ, বেলায়।
যাদোগণ যথা করে সুখে বাস,
সাগর-কামিনী সুহাসে যেখানে
কৃষ্ণ ঘন কেশ মুকুতা-জড়িত
করিতেছিলেন; বসিয়া সেখানে
দেখিতেছিলাম, সে সৌন্দর্য্যরাশি
কৃষ্ণ মেঘে আহা! তারকা যেমনি;
সহসা পশিল শ্রবণ-বিবরে
তব মন্ত্র, ত্বরা, আইনু অমনি।
জলধি-নিচয় অধিষ্ঠাতৃদেব
আসিয়াছে নর! তোমার নিকটে,
কি বাসনা তব উদিয়াছে মনে?
বল মোরে ত্বরা, বল অকপটে।
(নেপথ্যে চতুর্থ আত্মা।)

চ, আ।
ভূমিকম্প যথা, নিবসে নিয়ত,
অগ্নিস্তূপ যথা, বিরাজে সতত;
তপ্ত ধাতু যথা, সাগর যেমন
ধরিছে বক্ষেতে তরঙ্গ ভীষণ;
মহীধর মূল বিস্তৃত যেখানে,
মহীধর-চূড়া যেমন বিমানে,
সেই দেশে আমি সদা করি বাস,
মন্ত্রবলে নর আমি তব দাস;
আসিয়াছি তাই তোমার নিকটে
পড়িয়াছ তুমি বল কি শঙ্কটে?
(নেপথ্যে পঞ্চম আত্মা।)

প, আ।
আসিয়াছি আমি, পবন-বাহন,
ঝঞ্ঝা-প্রবর্ত্তক—তোমার সকাশে;
ঝটিকা প্রবাহ উনমত্ত হ'য়ে
বিদ্যুতের সহ খেলি'ছে আকাশে;
ত্যজি তাহাদের, তব মন্ত্র-বলে
আইনু মানব ধরণী উপর;
বল ত্বরা করি কি প্রার্থনা তব,
কোন্ দ্রব্য-লাভে ব্যাকুল অন্তর?
(নেপথ্যে ষষ্ঠ আত্মা।)

য, আ।

প্রশান্ত রজনী ছায়া কান্ত মম কাছে
দুর্গম কান্তার কিম্বা ঘোর অন্ধকার
কেন তব মন্ত্র আলো, হে ভূতল-বাসী,
বল আজি প্রবেশিল আবাসে আমার?

(নেপথ্যে সপ্তম আত্মা।)

স, আ।

যে নক্ষত্র-বশে অদৃষ্ট তোমার
সে নক্ষত্র নর! অধীনে আমার;
ছিল সে তারকা নবীন সুন্দর
ছড়াইত আভা নেত্র-তৃপ্তিকর;
একটী তারাও উজ্জ্বল তেমন,
আকাশ কখন করেনি দর্শন;
একটী তারকা তেমন সুন্দর,
আলিঙ্গন-বদ্ধ করেনি অম্বর:
স্বাধীন সরল ছিল তার গতি,
সহসা তাহার ফিরিল নিয়তি;
সে সুন্দর তারা হ'ল পরিণত
অগ্নিশিখা-রূপে; ঘুরি'ছে সতত
বক্র ভাবে তারা, ব্রহ্মাণ্ডের লোক
বিস্মিত চকিত হেরি সে আলোক।
নির্দ্ধারিত গতি নাহিক তাহার;
জগতের মনে ভয়ের সঞ্চার
করিয়া রয়েছে উপর গগনে,—
তাহারি ক্ষমতা তোমার জীবনে;
তুচ্ছ কীট তুমি, তব মন্ত্র-বলে
মানি তোমা; কিন্তু ক্রোধে দেহ জ্বলে;
যে ক্ষমতা-বশে অধীন তোমার
হয়েছি আমরা, নহে তা তোমার।
মহীতল-বাসী বল কি কারণ
সহসা মোদের করেছ স্মরণ?

(সকল আত্মা মিলিয়া—নেপথ্যে।)

মেদিনী, সাগর, বায়ু, ভূধর, রজনী
ঝটিকা, অদৃষ্টতারা অথবা তোমার;
সকলি অধীন তব এ ঘোর নিশিতে
কি বাসনা বল ত্বরা করিয়া বিস্তার।

নর। বিস্মৃতি——

১ম আ। কিসের তরে? কেন? কি
কারণ?

নর।—অন্তর হইতে মোর দুরন্ত চিন্তারে
দূর কর—এরি তরে চাহি গো বিস্মৃতি।
দেখহ হৃদয়ে মোর নিরখি তোমরা
সর্ব্ববিদ্—বাক্যে আমি নারি
প্রকাশিতে।

১ম।

প্রদান করিতে তোমা পারি সে সকল
প্রভুত্ব মোদের আছে যা'দের উপরে;
অবনীর আধিপত্য ইচ্ছা কর যদি,
কিম্বা পঞ্চভূতে চাহ করিতে অধীন,
দিতে পারি—এ সকল আমাদের বশে।

নর।

বিস্মৃতি—আত্ম-বিস্মৃতি যাচি তব কাছে,
ক্ষমতা, প্রভুত্ব—মোর ইথে অভিলাষ
নাহি কিছু, নাহি চাহি এ সকল কভু।
তোমাদের অধিকৃত প্রদেশ হইতে—
(প্রদানিতে পার যার প্রভুত্ব আমারে)
পারে না কি দিতে মোরে আত্ম-
বিস্মরণ?

১ম।

আমাদের সাধ্যাতীত সামগ্রী কেমনে
দিব তোমা? কিন্তু তুমি পার ত মরিতে।

নর।

মরিলে কি পাব মম প্রার্থিত সে ধন?

১ম।
অমর আমরা সবে, বিস্মৃতি-বিহীন।
এ আত্মা জান ত নর! অনন্তে ধাবিত;
ভূত ভাবী বর্ত্তমান আমাদের কাছে
সকলি সমান, নর! পারিলে বুঝিতে?
নর। পরিহাস করিবার এই কি সময়?
কিন্তু যেই মন্ত্র তোমা আনিয়াছে হেথা
সে মন্ত্র-প্রভাবে সবে অধীন তোমারা
আমার, সাহসে কিবা আমার বাসনা
বিফল করিতে চাই? উপহাস কর?
আমার হৃদয়, আত্মা, চির-গর্ব্বশালী
এ প্রাণ বিদ্যুৎছটা চির-সমুজ্জ্বল,
দূর-প্রসারিত সদা মহাশূন্য দেশে
যদিও এ ক্ষুদ্র দেহ আকাশ সম্ভবা।
জিজ্ঞাসিনু যা'তোমারে কহ শীঘ্র করি।
আমার ক্ষমতা নহে অবিদিত কভু
তব কাছে, কহ শীঘ্র নতুবা এখনি
সে প্রভাব-ফল তব হইবে ভুগিতে।
১ম।
কি আর কহিব তোমা, হে সুভগ নর,
সংসারে আমরা সদা সৌভাগ্য সুফল;
না চাহ সে সব তুমি—তব সমীহিত
সামগ্রী-প্রদানে মোরা অক্ষম, কহিনু।
তবে কেন বৃথা দোষী ভাবি'ছ মোদের?
কি ফল তোমার সহ পরিহাস করি
সুকৃতী?—
নর। কেন বা তবে বলি'ছ এমন?
১ম। ভাবি দেখ মনে মনে আয়ত্তি
অতীত
কোন্ দ্রব্য কি প্রকারে দিব বল তোমা
পুণ্যভাক্! মৃত্যু নহে আমাদের দাস।
তব উপকারে আর কি করিব বল
ধাম-নিধি, মন্ত্র-বলে অধীন আমরা।
নর।
বৃথা তবে তোমা সবে আনিনু হেথায়
মম উপকার, হায়, তোমাদের দিয়া
দেখিতেছি কখন না হ'বে সম্পাদিত
তবে আর বৃথা কেন?—
১ম।— আমরা যা' কিছু
প্রদানিতে পারি, নর! সকলি তোমার।
স্থির মনে ভাবি তুমি দেখদেখি পুন
রাজত্ব, শাসন, বল, দীর্ঘায়ু—
নর।— কি হবে
দীর্ঘায়ু লইয়া মোর? জীবন-ধারণে
কি যাতনা কে বুঝে তা? যাও সবে যাও
১ম।
পুন ভাবি দেখ মনে কিছুই কি আর
জগতে প্রার্থিত ধন নাহিক তোমার?
নর।
কিছুই নাহিক—কিন্তু তিষ্ঠ ক্ষণকাল।
দেখিতে বাসনা করি তোমা সবাকারে,
তোমাদের কণ্ঠস্বর, বিষাদ-কম্পিত,
অথচ মধুর কিবা; এখনও যেন
শুনিতেছি, সঙ্গীতের রব শ্রোতা যথা
নীরবিলে গীতগায়ী; এ স্বর-লহরী
তরঙ্গিণী উর্ম্মিমালা সহ যেন মিশি
সুদূর হইতে মৃদু আসি'ছে কেমন!
একটী তারকা অই দেখিতেছি আমি,
বিমল, সুন্দর স্থির উজ্জ্বল আকৃতি।
আইস তোমরা সবে আমার সকাশে
পরিগ্রহি নিজমূর্ত্তি—
১ম।— আকৃতি মোদের

আত্মা মোরা নাহি কিছু এ কথা কি তুমি
জানিতে না? কিন্তু, পারি ধারণ করিতে
যে মূর্ত্তি বলিবে তুমি। কি বাসনা তব?

নর।——

কিছুই বাসনা নাই, যাহা ইচ্ছা কর।
এরূপ আকৃতি কিছু নাহি পৃথিবীতে
বিরক্তি বা সুখ যাহে প্রদানিতে পারে
এ পোড়া অন্তরে মম। তোমাদের মাঝে
মহাশক্তি-শালী যেই, আসুক সম্মুখে
আমার, বিহিত মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।

(সপ্তম আত্মার একটী রমণী-বেশে প্রবেশ।)

স, আ। দেখ এবে নিরখিয়া——

নর।—— হা ঈশ্বর একি!

এ মূরতি সত্য যদি হইত তা হ'লে,
সেই সুখ পুন আসি পশিত হৃদয়ে
হায় রে এরূপে কেন অভাগার সনে
পরিহাস? আমারে কি উন্মত্ত করিতে?
কিন্তু, না, আইস তোমা তেমনি করিয়া
বাঁধিব আবার আমি ভুজলতা-পাশে।
প্রিয়তমে, পুন দোঁহে তেমনি রহিব,

(ধরিতে অগ্রসর ও মূর্ত্তির তিরোভাব।)

একি! একি! কোথা গেল সে সুখ মূরতি?
সুখের স্বপন মম গেল যে মিলায়ে!
পরাণে দারুণ ব্যথা লাগিল সহসা,
হৃদয়-পিঞ্জর মোর গেল যে ভাঙ্গিয়া,
অন্তর-শোণিত সব শুকাইল হায়!
একি! উহুঃ সহে না যে এ বিষম জ্বালা।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

আকাশ-সম্ভবা দৈববাণী——

যখন রজনী-কান্ত তটিনী-উরসে
শত মূর্ত্তি ধরি যেন খেলেন হাসিয়া;
বিটপী শরীর যবে খদ্যোত ঝলসে,
নীরব কানন-পতি বেশে উজলিয়া;
যখন প্রকৃতি সতী ঘুমে অচেতন,
চন্দ্রমা তারকা করে সুধা বরষণ—
নিঃস্বার্থ জীমূত-বৃন্দে যতন করিয়া
মস্তকে ধরিয়া সুখী হিমাদ্রি যখন;
সুপ্ত দিগঙ্গনাগণ।—থাকিয়া থাকিয়া
পাপিয়া মধুর রবে জুড়ায় শ্রবণ—
সমগ্র মানব যবে সুষুপ্ত রহিবে,
তখন (ও) তোমার মন বিষাদে কাঁদিবে।
শান্তি কি নিদ্রারে আর জনমে কখন,
পাবে না দেখিতে তুমি হতভাগা নর!
শাপাগ্নিতে ভস্ম হ'বে তোমার জীবন;
বিবাদ প্রকৃতি সনে হবে নিরন্তর;
মহাপাপী, কি করিবে? মুছ নেত্র-জল;
শান্তি ভাগ্যে নাহি তব, বিষাদ (ই) কেবল।
মরণ জীবন্ত-দুঃখ করে সংহরণ,
তাই মৃত্যু তব ভালে নাহিক স্থবায়;
ভীষণ পাপের নর! শাস্তিও ভীষণ,
ভুঞ্জ দুঃখ অবিরত থাকিয়া ধরায়।
শাপের উপরে শাপ করিনু প্রদান,
জনমে না হ'বে তব দুঃখ অবসান।
দেখিতে আমারে তুমি পাবে না নয়নে;
আমার ক্ষমতা কিন্তু সতত ভুঞ্জিবে;
শুনিতে আমার কথা পেলে না শ্রবণে,
কিন্তু কার সাধ্য মম আদেশ লঙ্ঘিবে?
জীবন্তে নিরয়-বাস হ'য়েছে তোমার,
শান্তিতে পাপীর কভু নাহি অধিকার।

(পটক্ষেপণ)

নাটক চন্দ্রিকা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

নাটক-নিহিত ক্রিয়াকলাপ যদি নায়ক নায়িকা কি অন্য কোন পাত্র দ্বারা ঝটিতি ও সংক্ষেপে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে, নাটকের সামগ্রী পরিপোষের সৌন্দর্য্য অতি রমণীয় হইয়া দর্শক-মণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকে। আর এরূপ না হইয়া যদি নাটকস্থ পাত্রগণের কার্য্য-কদম্ব বিলম্বে অভিনীত ও অন্যমনস্কতা নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে, ঐ সকল কার্য্য যার পর নাই অসুখ বিতরণ করিতে থাকে।

নায়ক নায়িকা দ্বারা কোন একটী কার্য্য-বিশেষের অবতারণা করিয়া, সেটী অপরিসমাপ্ত রাখা অথবা অন্য কোন ব্যাপারের অবতারণা করিতে গিয়া সেটীর মূলোচ্ছেদ করা নাটকের উদ্দেশ্য নহে। যে নাটকের উত্তরোত্তর কার্য্য-প্রণালী সন্দর্শন করিয়া দর্শকগণ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কার্য্য বিস্মৃত হইয়া যান, সে নাটক কখন প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। যে নাটকের কার্য্য-প্রণালী, পরস্পরা-সম্বন্ধে নিবদ্ধ, সেই নাটকই যথার্থ নাটক-নামের অভিধেয়।

কাব্য-নাটকাদি উপাদেয় বস্তুর-রচনার উদ্দেশে সামাজিক-শিরোমণি মহাত্মা কবি কর্ণপূর যেরূপ একটী নিয়ম লিখিয়া লোক-শিক্ষা বিধান করিয়া গিয়াছেন, সেটী এই স্থানেরই যোগ্য; অতএব এই খানেই লিখিত হইল। যথা—

"যথা তথাস্তু: কুসুমানি মালা
চিত্রায়তে গুম্ফন-কৌশলেন।
তত্রাপি চেত্তানি সুসৌরভানি
ভবন্তি রম্যাণি তদা পুনঃ কিম্?"

কর্ণপূর গোস্বামী কাব্যগুম্ফন-সম্বন্ধে যে এই কবিতাটী লিখিয়াছেন, ইহা কাব্য-গুম্ফনের উপযোগিনী হউক বা না হউক, নাটক-রচনার পক্ষে আপনার অন্বর্থ ব্যক্ত করিতেছে, সন্দেহ নাই।

উক্ত কবিতার তাৎপর্য্য এই যথা— ফুল যেরূপ কেন হউক না, কেবল গাঁথিবার কৌশলে মালা মনোহারিণী হয়; তবে যদি ঐ সকল ফুল সৌরভযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে মালা অতি মনো-হারিণী হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কেশ ও অলক্তক রাগ অতি সামান্য বস্তু বটে, মণি-মাণিক্যাদি অলঙ্কারের নিকট উহারা অতি অকিঞ্চিৎকর, তথাপি রমণীগণের চরণে অলক্তক রাগ ও পৃষ্ঠদেশে কুসুমমণ্ডিত লম্বমান বেণী থাকিলে, তাহার অলঙ্কারে যেরূপ শোভা সম্পাদন করে, কেবল অলঙ্কারে কি সেরূপ হয়, কেশমুণ্ডন করিয়া তাহার

ললাট-ফলকে কহিনুর মণি দিলেও উহাতে সেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয় না, সুতরাং উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য অঙ্কারের মধ্যে সামান্য অলঙ্কারেও কখন কখন শোভাতিশয় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; এজন্য নাটক-রচনা করিতে গিয়া, যিনি উৎকৃষ্ট বস্তুগুলি বাছিয়া বাছিয়া একত্র গুম্ফন করেন, তাঁহার গুম্ফিত বস্তু অপেক্ষা, যিনি উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ সামগ্রী নির্ব্বাচন করিয়া প্রকৃতির ভাব-ভঙ্গী উত্তম-রূপে চিত্রিত করিতে সক্ষম, তিনিই কাব্যামোদী রসজ্ঞ-মণ্ডলীকে অপূর্ব্ব আনন্দ বিতরণ করিতে পারেন। কালিদাস, ভবভূতি ও সেক্‌সপিয়র্ প্রভৃতি কয়েক জন নাটককার এই নিমিত্ত পৃথিবীতে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

কোন প্রকার সামগ্রী সংগ্রহ নাই, অথচ নাটক লিখিতে হইবে,এরূপ অলীক সংকল্প করিয়া, যাঁহারা নাটক লিখিতে লেখনী ধারণ করেন, তাঁহারা যে নাটক লিখিতে পারেন না, ইহা বলা বাহুল্য-মাত্র। 'চক্ষুঃস্থির নাটক' প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গালা নাটক ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।

যদি কাহারও নাটক লিখিতে বাসনা থাকে, নাটক কাহাকে বলা যায়, যদি কেহ ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন; আর জগতের বাহ্য কার্য্য চিত্র করা যদি নাটকের উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে, নাটক লিখিবার পূর্ব্বে নাটক-রচয়িতাকে সূক্ষ্মরূপে ও ওতপ্রোত ভাবে মনুষ্যের প্রকৃতি আলোচনা করিতে হইবে। যিনি অনালোচিত-মানব-প্রকৃতি, তাঁহা দ্বারা মানবজাতির আন্তরভাব সকল যে বিশুদ্ধরূপে চিত্রিত হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই কারণে কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও সেক্‌সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ্ ও হাম্‌লেট্ এত বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই প্রায় পবিভ্রমণ করিতেছে।

মানব-প্রকৃতির সমালোচন করিতে হইলে, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার লোকের সহিত কিছু দিন বাস করিতে হয় ও সেই সঙ্গে নানা প্রকার সমাজে গমন করিয়া বহুবিধ কথার আলাপন ও নানা প্রকার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়; এমন কি, সময়ে সময়ে অশ্বরক্ষক, গোরক্ষক, পাচক, নিষাদী, দস্যু, তস্কর ও বণিক্ প্রভৃতি নীচপ্রকৃতি ও সামান্য লোকের সহিত কথোপকথন করাও আবশ্যক হইয়া উঠে। ইহা না করিলে,মানবপ্রকৃতি সমালোচন করিবার আর কোন সরল উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

মনুষ্যদিগের মানসিক বৃত্তি-পরম্পরা যে প্রকার অদৃশ্য, তাহাদিগের হৃদয়স্থ ভাবগুলিও সেইরূপ অপ্রত্যক্ষ; কেবল বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালনা দ্বারা ও জগতের কতকগুলি বাহ্য কার্য্যের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া, তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হয়, নতুবা অন্য কোন উপকরণ

দ্বারা নাটক লিখিয়া কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, আন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি, সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি রাজগুণ; মন্ত্রণা, চাতুরী, আদ্য, করুণ প্রভৃতি আট প্রকার রস; বিভাব (১) অনুভাব (২) ব্যভিচারী ভাব (৩) ও সাত্বিক ভাব (৪) এবং ক্ষয়, বৃদ্ধি, স্থান * প্রভৃতি ত্রিবর্গের সমালোচন করিতে সম্যক্‌রূপে সমর্থ হইলে, তবে নাটক লিখিতে লেখনী ধারণ শোভা পায়, নতুবা নাটক লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র।

স্বদেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় সামাজিক রীতি-পদ্ধতির ন্যায় ঐ সকল দেশ-বিদেশ-প্রচলিত ব্যবহারিক রীতি-পদ্ধতির নিদান, ফল ও পরিণাম এই তিনটীর বিশিষ্ট অনুসন্ধান, নাটক-রচনার আর একটি উৎকৃষ্ট উপায়। ইহাতে অনুসন্ধান বা অনুসন্ধিৎসা না থাকিলে, নাটকাদি লিখিতে লেখনী ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে।

দেশীয় শাসন-প্রণালী রক্ষা করিবার জন্য, রাজার আদেশানুসারে যখন যে বিধি লিপিবদ্ধ হইবে, নাটক-কারের তৎক্ষণাৎ তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে, নাটক লিখিয়া সামাজিকদিগের চিত্ত-বিনোদন করিতে পারা যায় না। নাটক লিখিতে গিয়া, কোন আখ্যায়িকা বা ইতিহাসের অবতারণা করা বিড়ম্বনা-মাত্র।

নাটকের মধ্যে যে স্থানে যে পাত্রের প্রবেশ হইবে, সেই স্থানে বর্ণ ও তূলিকা ব্যতীত তাহার আন্তর ভাবগুলি চিত্র করিতে হইবে। এই ব্যাপারটী নিরন্তর মনে রাখিয়া, যে লেখক নাটকাদি দৃশ্য-কাব্য প্রণয়ন করেন, সামাজিকগণ তাঁহাকেই সান্ধি-বিগ্রহিক নাটক-রচয়িতা বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। পাত্র-প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ সকল পাত্রের সূচনা থাকা আবশ্যক, সূচনা ব্যতীত পাত্র প্রবিষ্ট হইলে, রসভঙ্গ হইয়া যায়।

যখন যে পাত্র প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহার বাক্-প্রবন্ধের প্রতি গ্রন্থকারের দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রামা চাকরের বাক্-প্রবন্ধ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের

(১) রতি হাসাদি স্থায়ী ভাবের উদ্বোধককে বিভাব কহে। (২) রত্যাদি স্থায়ী ভাবের কার্য্যকে অনুভাব কহে। (৩) যে সকল ভাব রত্যাদি স্থায়ী ভাবের মধ্যে কখন ভাসে, কখন ডুবিয়া যায়, তাহাদিগকে ব্যভিচারী কহে। নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ-জড়তা প্রভৃতি সমুদয়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ-প্রকার ব্যভিচারী ভাব। (৪) স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি আট প্রকার সত্ত্ব-সম্ভূত ভাবকে সাত্বিক ভাব কহে। কোন কোন পণ্ডিত ইহা-দিগকে অনুভাব বলিয়া ব্যক্ত করেন।

* অষ্ট বর্গের অপচয়ের নাম ক্ষয়; তাহার উপ-চয়ের নাম বৃদ্ধি; এবং তাহার সমভাবের নাম স্থান। অষ্ট বর্গ যথা—কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, হস্ত্যাদি পশুবর্দ্ধন, শস্যাদি সংগ্রহ, বল-সঞ্চয়, ব্যূহ-শিক্ষা। প্রমাণ যথা—রায়মুকুটে:—"অষ্ট-বর্গাপচয়:-ক্ষয়:। তস্যোপচয়ো বৃদ্ধিঃ। তস্যা-নাপ্যপচয়ো নাপ্যুপচয়ঃ স্থানং। অষ্টবর্গাঃ যথা—"কৃষি-বণিক্‌পথো দুর্গং সেতুঃ কুঞ্জর-পোষণং। শস্য-গ্রহোবলাদানং সৈন্যানাঞ্চ নিবেশনং॥" ইতি।

ন্যায়,কিংবা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথোপকথন রামা চাকরের ন্যায় হইল,নাটক নিতান্ত উপহাসের স্থল হইয়া পড়ে।

গ্রন্থকর্ত্তা যদি এই সকল নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া, স্বেচ্ছাচারী গ্রন্থকারের ন্যায় কিংবা তরল-প্রকৃতি বালকের ন্যায় আধুনিক অধিকাংশ নাটকের মত যাহা ইচ্ছা লিখিয়া বসেন, তাহা হইলে তৎ-প্রণীত নাটক অভিনয়-যোগ্য না হইয়া, উপহসনীয় হইয়া উঠে।

কিরূপে নাটক লিখিয়া সামাজিকদিগের চিত্ত হরণ করিতে হয়, তাহার নিয়ম ও লক্ষণ সকল মহামুনি ভরত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহা দ্বারাই প্রথমে নাটক-প্রণয়নের দুর্গম পথ সকল পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছে; এ জন্য আর্য্যগণ তাঁহার নিকটে একটী অনিক্ষেয় ঋণ-পাশে আবদ্ধ রহিয়াছেন, ইহা যথার্থ হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় কোন নাটক লিখিবার সময়ে সেই সমস্ত রীতি ও লক্ষণেরই যে বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে,তাহা নহে। তবে যে গুলি বঙ্গ ভাষার পক্ষে উপযোগী, সেই লক্ষণ ও সূত্র গুলির অনুসরণ করা আবশ্যক বটে। এ কথা পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারত-নাট্য-শাস্ত্রের মধ্যে যে সকল নিয়ম বাঙ্গালা নাটকের উপযোগী,সেই গুলি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইবে।

সংস্কৃত ভাষায় নাটকাদি লিখিবার সময়ে নান্দী-সম্বন্ধে যে সকল কঠিন নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সেই সকল নিয়ম কোন সংস্কৃত নাটকের পক্ষে উপযোগী হউক বা না হউক, তাহা দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু, বঙ্গ-ভাষায় কোন নাটক লিখিবার সময়ে ঐ সকল নিয়মের কোন আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালা নাটকের সহিত অত নিয়মবদ্ধ নান্দীর কোন সম্বন্ধ নাই। মহাত্মা ভরত নান্দী লইয়া তত পীড়াপীড়ি করেন নাই। ভরতের পর যাঁহারা নাটকের নিয়ম ও সূত্র করিয়াছেন,তাঁহারাই কেবল নান্দী লইয়া অত টানাটানি করিয়াছেন। ফলত, এক কথায় গ্রন্থের আদি ভাগে মঙ্গলাচরণ করিলেও উহা নান্দী (১) বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত। বঙ্গীয় নাটকে নান্দীর তত প্রয়োজনই নাই।

মহাত্মা ভরত নান্দীকে এত কঠিন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই; ভরতের পরবর্ত্তী কয়েক জন পণ্ডিত এই ব্যাপার করিয়া গিয়াছেন; এই নিমিত্ত ধাবক, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবি-প্রণীত নাটকে নিয়মবদ্ধ নান্দীর উল্লেখ দেখা যায় না।

বঙ্গীয় নাটকে নান্দী, প্রবেশক, চুলিকা অঙ্কাবতার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া,যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র

(১) "আশীর্ব্বচন-সংযুক্তা নিত্যং যস্মাৎ প্রযুজ্যতে। দেব-দ্বিজ নৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা॥ মঙ্গল্য-শঙ্খ-চন্দ্রাব্জ-কোক-কৈরব-শংসিনী। পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভি রষ্টভির্ব্বা পদৈরুত॥

হৃদয়ের ন্যায় দর্শক-মণ্ডলীর হৃদয়-নিহিত ভাব-পরম্পরা বিস্ফারিত হইয়া উঠে, সেই সকল উপায় ও পথ অবলম্বন করাই উচিত।

অধুনাতন বঙ্গীয় নাটক-মাত্রেই প্রায় বিদূষক নামে একটী পাত্রের প্রবেশ দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু বিদূষক কি এবং কেনই বা নাটক-মধ্যে উহার প্রবেশের প্রয়োজন, তাহা বিশেষরূপে অবগত না হইয়াই অনেক নাটক-কর্ত্তা বিদূষকের প্রবেশ সূচনা করিয়াছেন; এবং উহা না করিলেই নয়, এইরূপ একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিয়া, নাটককর্ত্তা উহার প্রবেশ-সংসাধনে যত্নবান্ থাকেন; কিন্তু সকল সময়ে বিদূষকের প্রবেশের প্রয়োজন হয় না। স্থল-বিশেষে ও নাটক-বিশেষে বিদূষকের পরিবর্ত্তে প্রিয়সখা, নর্ম্ম সখা, প্রিয়নর্ম্ম সখার প্রবেশ সূচিত হইলে, নাটকীয় ইতিবৃত্তের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় কি না, কোন গ্রন্থকারই প্রায় সে বিষয়ে অভিনিবেশ পূর্ব্বক কোনরূপ অনুসন্ধান করেন না। আধুনিক অনেক নাটক-কারের সংস্কার আছে যে, নাটক লিখিলেই তন্মধ্যে বিদূষকের প্রবেশ করাইতে হয়, কিন্তু সেটী ভ্রান্তি-বিলসিত-মাত্র।

সংস্কৃত নাট্যসূত্রে বিদূষকের যেরূপ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা লিখিত হইল; যথা—

"কুসুম-বসন্তাদ্যভিধঃ
কর্ম্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহ-রতি-
র্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ॥"

(সাহিত্য দর্পণ।)

অথবা—

বামনোদন্তুরঃ কুব্জো
দ্বি-জন্মা বিকৃতাননঃ।
স্খলদ্গতিঃ পিঙ্গলাক্ষঃ
সংবিধেয়ো বিদূষকঃ॥"

" ভারত নাট্যশাস্ত্র। ১০৭—৮।

সাহিত্যদর্পণ-ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, বসন্ত-কালের অথবা কোন পুষ্পের নামে যাহার নামকরণ হয়, যিনি কর্ম্ম, বপু, বেশ ও ভাষাদি দ্বারা হাস্যকারী হয়েন এবং কলহ-প্রিয় ও ও ভোজন-পটু; অধুনাতন নাট্য-শাসন-প্রণেতৃগণ তাঁহাকেই বিদূষকের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

মুনি-প্রণীত বচনের তাৎপর্য্য; যথা—

(১) বামন, দন্তুর, কুব্জ, বিকৃতানন, স্খলদ্গতি ও পিঙ্গলাক্ষ ব্রাহ্মণকে বিদূষকের পদে অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য।

বীররস বা করুণরস প্রধান নাটকে বিদূষকের প্রয়োজন হয় না; এই জন্য বীর-চরিত ও বেণীসংহার প্রভৃতি

(১) বিদূষকের প্রতি প্রাচীন পণ্ডিতেরা এত নিয়ম যে কেন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। তবে বিদূষক হাস্যকারী ও দর্শকদিগের কৌতুকোদ্দীপক বলিয়া মুনি যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা একরূপ মন্দ নহে। ফল, বাঙ্গালা নাটককারদিগের বিদূষকের প্রতি অত নিয়ম খাটান ভাল নহে।

নাটকে বিদূষকের প্রবেশ সূচিত হয় নাই। যে সকল নাটকে আদ্য রসের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই কেবল বিদূষকের প্রবেশ সূচিত হইয়া থাকে; সুতরাং রত্নাবলী প্রভৃতি নাটিকায় বিদূষকের প্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বোধ হয়, কুসুম ও বসন্ত-নামে বিদূষকের নামকরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কুসুম, বসন্ত প্রভৃতি শুচিমেধা বিষয়গুলি আদ্য রসের উদ্দীপক; সুতরাং নাট্যামোদী পণ্ডিতগণ ঐ ঐ নামে বিদূষকের নামকরণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

জটিল সন্ন্যাসী।

গুরু নানকের জীবন-চরিত।

যখন কোন দেশের উপপ্লব জন্মায়, তখনই তাহার সংস্করণ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। দেশের অধিবাসী ত অনেকেই থাকে, কিন্তু যিনি সমধিক হৃদয়বান, সমধিক পর-দুঃখ-কাতর, তাঁহারই প্রাণ দেশের দুর্দ্দশায়, স্বজাতির দুর্গতিতে কাঁদিয়া উঠে; সুতরাং বিপ্লব-শান্তির আশায় প্রাণমনে তিনি কর্ত্তব্যের প্রতি ধাবিত হন। শিখ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক গুরু-নানকের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। শিখজাতির ন্যায় যিনি একটী উৎসাহশীল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা, তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সাধারণ্যে অজ্ঞাত থাকা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। সেই জন্য আজ্ আমরা সেই মহাপুরুষের চরিত-ভাগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু যে শিখজাতি নানক-প্রদত্ত মন্ত্র-বলে উত্তরকালে তেজীয়ান্ বৈদ্যুতিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কি ভয়ানক দুর্গতির দুর্গম, গভীর গহ্বর হইতে উত্তোলিত করিতে হইয়াছিল, নানক-জীবনে তাহার একটী বিকাশ-প্রাপ্ত বিশ্বস্ত পূর্ণ ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মহাবীর তৈমুরলঙ্গের প্রপৌত্র ও ভারতীয় মোগল সম্রাটগণের আদি-পুরুষ বাবরের রাজত্ব-কালে খৃষ্টীয় ১৪৬৯ অব্দে পঞ্জাবের অন্তর্বর্ত্তী তলবন্দী নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে নানকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কালু। নানক যে বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাহা 'বেদীগোত্র' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতা তাদৃশ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়-বর্ণ; স্বগ্রামের এক জন প্রধান মণ্ডল (মুখ্য) বলিয়া তাঁহার অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল। কালুর জনকের নাম শিবরাম। শিবরামের

কালু ভিন্ন অন্য এক পুত্র ছিল, তাহাকে লোকে লালু নামে আহ্বান করিত। নানকের পিতামহীর নাম বুনাসী। ইনি অতি ভাগ্যবতী রমণী। কেননা, দেশ-মধ্যে সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসা শুনা যাইত। সে যাহা হউক, প্রস্তাবিত বিবরণে বংশ-বর্ণনা নিষ্প্রয়োজনীয়, সুতরাং তাহা উপেক্ষিত হওয়াই ভাল। নানকের ভগ্নী নানকী, ভ্রাতার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবতী ছিলেন এবং নানকও তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা স্নেহ করিতেন। বোধ হয়, বিশেষ সাদৃশ্য বশতই তাঁহাদের ভ্রাতা ভগিনীর আখ্যা একবিধ হইয়াছিল। সুলতানপুর (১) নামক স্থানের জনৈক শস্য-বিক্রেতা জয়রাম এই কামিনীর সহিত উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। নানকের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পঞ্জাব-অঞ্চলের একটী যথাযোগ্য চিত্র পাঠকের হৃদয়-পটে প্রতিফলিত হওয়া চাই। তাঁহার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ও সমকালে ভারতের নানা স্থানে বিশেষত, পঞ্জাব দেশে অবিচ্ছিন্ন উপদ্রবের একশেষ। কি ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কি রাজ্য-সম্বন্ধে এবং কি নীতি-সম্বন্ধে সকল বিষয়েই ঘোর বিপ্লব গিয়াছে। নিরন্তর বিশৃঙ্খলায়, লোকের মন হইতে বিনয়, দয়া, বিশ্বাসাদি ধর্ম্ম-গুণ একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। অতি সহজ ও সরল বিশ্বাস, যে ধর্ম্মের প্রাণ—তাহাদের মধ্যে, তাহারও অস্তিত্ব বিলুপ্ত ছিল। সুতরাং হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে বিজাতীয় বিদ্বেষভাব অনুক্ষণ বর্দ্ধমান হইয়া উঠে। তখনকার পঞ্জাবের নৈসর্গিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। অপ্রসিদ্ধ অসভ্য তলবন্দীর ত কথাই নাই। তলবন্দী অত্যন্ত জলা-জঙ্গলে পরিপূর্ণ—চতুর্দ্দিকে কেবল অকৃষ্ট অনুর্ব্বর বিভিষীকাময় ক্ষেত্র, মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। তাহার উপকণ্ঠে কৃষিকার্য্যের অনুপযুক্ত সুবিস্তৃত জঙ্গল প্রদেশ সুদূর প্রসারিত। এই তলবন্দী চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদী-দ্বয়ের মধ্যগত প্রদেশ। তদানীং তথাকার পথ ঘাট অপকৃষ্ট থাকায় ইহা দস্যু-গণের অধ্যুষিত ছিল। যে দেশের প্রাকৃতিক দশা এইরূপ, তথাকার দুর্গতি সহজেই অনুমেয়। পুরাকাল হইতে এখানে যে জট্ জাতীয় লোক বসতি করিয়া আসিতেছিল, তাহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। পরে আর এক জাতি ক্রমশ বদ্ধমূল হয়, তাহারা ভট্টিজাতীয় এবং ইমাম ধর্ম্মে নব-দীক্ষিত। এই দুই দলের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ চির-বিরাজিত ছিল। পরে বহু দিন বিগত হইলে, স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় শিখজাতি কর্ত্তৃক পঞ্জাব অধিকৃত হইলে, তৎ-পরবর্ত্তী

---

(১) জলন্ধর দো-আবের অন্তর্গত কপূরতলার রাজবংশীয়গণ সম্প্রতি ঐ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। লাহোর হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে রাজপথ প্রচারিত, ইহা তাহার পার্শ্বদেশে অবস্থিত। রাজপথের বিবিধ দৃশ্যে বোধ হয়, ইহা কোন প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরীর ভগ্নাবশেষ-মাত্র।

কাল হইতেই, পঞ্জাবের ভাগ্য-নেমির গতি পরিবর্ত্তিত হয়।

অনির্দ্দেশ্য কাল হইতে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, ব্রাহ্মণেরা এই অঞ্চলে আপনাদের ভূরিপ্রমাণ ভুজ-বল বিস্তার করিয়া আসিতেছিলেন। স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত উন্নত বৌদ্ধমত যে ভারত-ভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, তাহা ঐ দ্বিজগণের ক্রমিক চেষ্টার ফল। অদ্ভুত "আত্মীকরণ-নৈপুণ্য," জ্ঞান ও ভক্তির আপাত-পরিদৃশ্যমান সামঞ্জস্য-বিধানই ব্রাহ্মণগণের অভ্যুত্থানের কারণ। অন্য দিকে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উদ্যমের অভাবে, বৌদ্ধমতের অধঃপাতন সংঘটিত করে। যদি বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সুবিমল অকলঙ্ক উন্নত মত—স্বাধীন চিন্তা সুশৃঙ্খলায় থাকিত, নানকের জন্মে প্রয়োজন হইত না। কিন্তু, হায়! ভারতে দুঃখ-সূর্য্যের উদয় এক বার নিয়মিত হইয়াছিল বলিয়াই কি সংস্কারের পর সংস্কার, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে বার বার ভারত-বক্ষ প্লাবিত হইতেছে না? আহা! কি বলিতে বসিয়া কি বলিতেছি?

গুরু নানকের পূর্ব্ব যুগে ব্রাহ্মণেরা অধীনস্থ ব্যক্তি-নিচয়ের ধারণা জন্মাইয়াছিলেন—হিন্দুই একমাত্র জাতি—তাহার ধর্ম্মই (তৎকাল-প্রচলিত) সত্য, সার ধর্ম্ম।

তদানীন্তন শৈব ও বৈষ্ণবেরা সেই সুযোগে আপনাদিগকে সর্ব্বে সর্ব্বা ভাবিতেন। সুখের বিষয়, সেই কুসংস্কার-জনক ঐ মত তাহাদের অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ না হইতেই, অসংখ্য যবন, সিন্ধুনদ পার হইয়া পঞ্জাব দেশে পাদবিক্ষেপ করে এবং তজ্জন্য, তাহাদের বিশ্বাস ও ধর্ম্ম সুতরাং শিথিলিত ও উপপ্লুত হইয়া যায়। এই সময়ে নানা উপায়ে মুসলমানেরা আপনাদের দলপুষ্টি বিধান করে। বলা বাহুল্য, তদ্বিষয়ে তৎকালে তাহাদের কৃতকার্য্যতাও হয়। ম্লেচ্ছগণের তদ্বিধ দল-বৃদ্ধিতে যে এক সঙ্কর ধর্ম্ম-দল সমুৎপন্ন হইল, তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা অক্ষুণ্ণ ছিল। সৈয়দ দল, সহিদ সম্প্রদায় এবং পীর-মতাশ্রয়িগণ, হিন্দু যোগী মুনির মত সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতে লাগিলেন।

তখন মুসলমান এবং হিন্দুগণের প্রধান ধর্ম্ম পুস্তক বেদ এবং কোরাণ সাধারণের অনালোচিত ও অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। আশ্চর্য্যাত্মক (Miraculous) আখ্যানে ও দুর্বোধ ধর্ম্ম-তথ্যে লোকের মনোরঞ্জন করাই একমাত্র রীতি ছিল। সুতরাং, ধর্ম্মশাস্ত্রের অবশ্য-জ্ঞাতব্য অতি সরল তত্ত্বও সকলের জানা থাকিত না। সেই সময়কার যাঁহারা কিঞ্চিৎ বিবেক-বান্, তাঁহারা অন্যের চক্ষে ধূলি-মুষ্টি প্রক্ষেপ না করাকেই পুণ্য মনে করিতেন।

যে সময়ের কথা আলোচনা করা যাইতেছে, তৎকালে স্বর্ণভূমি ভারতভূমির অভ্যন্তরে কবীর, রামানন্দ, গোরখনাথ প্রভৃতির সাম্প্রদায়িক মত এত প্রবল

ছিল যে, তখন এ দেশের প্রত্যেক স্থানে ধর্ম্মগীতির তান বাজিয়া উঠে—প্রতি অধিবাসীর চিত্ত-তন্ত্রী নাচিতে থাকে। অতি সংক্ষেপে সেই সময়ের একটী চিত্র আঁকিয়া, সম্প্রতি নানকজীবনের ঐতিবৃত্তিক ঘটনায় প্রবেশ করিতেছি। নানকের জন্ম-গ্রহণ, শিথ-পুরাবৃত্তের এক নূতন কাণ্ড। তাঁহার বাল্য ও কিশোর কাল, কৌমার ও যৌবন এবং প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থার কার্য্যাবলি অত্যাশ্চর্য্য ও দুর্জ্জেয় ক্রিয়াময়। তাহা প্রত্যেক শিখের বিশ্বাসের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু আমাদের অথবা পাঠক-শ্রেণীর যৌক্তিক বোধ হইবে না বলিয়া, সেই অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক বিবরণের সম্পূর্ণ ভাগ বর্ণন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। যাহা কিছু বলা যাইতেছে, আমাদিগের বোধ হয়, পাঠক তাহার আখ্যানিক অসত্য বা অতিরিক্ত অংশ অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

যে ধাত্রী নানকের জন্ম-সময়ে সূতিকা গৃহে অবস্থান করিয়াছিল, সে বলিয়া গিয়াছে, নানকের জন্ম-পরিগ্রহের সময় নিকটস্থ কোনও স্থলে লোক-সমারোহের গম্ভীর কলরব তাহার কর্ণগোচর হয়। অদ্যাবধি সে স্থান একটী পীঠ তুল্য হইয়া রহিয়াছে। কোন বৈদেশিক, নানকের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে গেলে, অথবা কেহ তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ জানিতে ইচ্ছা করিলে, যে যে ব্যাপার তিনি দেখিতে পান, ঐ জনরবের নির্দ্দিষ্ট ভূভাগ তন্মধ্যে একটী প্রধান দৃশ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। শিখেরা সেই স্থলে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন; তাহা "নানকনা" নামে পরিচিত। নানক, বয়স্য সঙ্গে শৈশবে যে স্থানে নিয়ত ক্রীড়ায় প্রমত্ত রহিতেন, এক্ষণে তাহা সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। সেই প্রদেশের কোন সুমহৎ দীর্ঘিকার সান্নিধ্যে ক্রীড়া-ভূমি ছিল। ক্রীড়া-ভূখণ্ড সম্প্রতি 'শৈশব-ক্রীড়ন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার বাল্য-কালের এই দুই মাত্র ঘটনা জানা গিয়াছে। অতঃপর তিনি অধ্যয়ন জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। শুনা যায়, স্বল্পকালের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রে ও পারস্য ভাষায় নানকের আসক্তি জন্মে এবং কতিপয় বর্ষ যাপিত না হইতেই, উক্ত দুই বিদ্যায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি লাভ হয়। বাল্য-কাল হইতে তাঁহার মুখমণ্ডলে সংসারিক কার্য্যের প্রতি কেমন এক প্রকার বিতৃষ্ণার চিহ্ন দৃষ্ট হইত। গৃহস্থ ভাবে লোক যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নানকের জীবন সৃষ্ট হয় নাই,—কার্য্যে তাহা দেখা যাইবে। যাঁহারা তাঁহার স্বসমকালীন, তাঁহাদের বংশ-পরম্পরা দ্বারা ঐ বিষয় অবগত হওয়া যায়। নানকের জনক, পুত্রের বিপরীত ভাব-দর্শনে হতাশ্বাস হন। তিনি নানা উপায়ে তনয়ের মনের গতি ফিরাইবার জন্য যত বিপরীত পন্থা অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে একটী মাত্র নির্দ্দেশিত

হইতেছে। কোন সময়ে নানক-জনক পুত্রকে গো-চারণের ভার দিয়া মাঠে পাঠাইয়া দেন। অভ্যাস এবং প্রবৃত্তি না থাকায় নানক কিয়ৎকাল পরে নিদ্রাভূত হইয়া পড়েন। এ দিকে গো-বৎস সেই অবসরে সমীপবর্ত্তী কৃষকের শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া বিলক্ষণরূপ শস্য নাশ ও ভক্ষণ করিতে লাগিল। অসহায় বালক একাকী ক্ষেত্রে পতিত; কেহ রক্ষক নাই দেখিয়া, এক বিষধর ফণা বিস্তার করিয়া বালক নানকের মস্তকদেশ রক্ষা করিতে থাকে। এই বিবরণ পাঠ করিতে করিতে নন্দালয়ে কৃষ্ণগমন-সময়ে ফণিরাজ অনন্তের কথা স্মরণ হয়। যাঁহাদের এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহাদের নিকটে শুনিয়া পঞ্জাবীরা উত্তর-কালে তথায়ও এক সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইয়াছেন। সেই মন্দির "কারামাহিব" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ দিকে যাহার ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইয়াছিল, কালুর গোচর করিলে, তিনি তাহার ক্ষতি-পূরণ করিয়া দেন। এ বারেও তিনি সন্তানের সংশোধন-বিষয়ে এককালে ভগ্নাশ না হইয়া, উপায়ান্তর উদ্ভাবন করিতে মনঃস্থ করিলেন।

মণ্ডল কালু ক্রমাগত চিন্তা, বিবেচনা দ্বারা পুত্রকে বাণিজ্য-ব্যবসায় শিক্ষোপযোগী করিতে ব্যগ্র হইলেন। তিনি 'বল' নামে এক ব্যক্তি সিন্ধুদেশীয় জটকে সঙ্গে দিয়া নানককে দেশান্তরে পাঠাইলেন এবং ব্যবসায়ের মূলধন ৪০ চল্লিশ মুদ্রা পুত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। পথিমধ্যে এক দল সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, নানকের মনে দয়ার উদয় হইল। তিনি দেখিলেন,—ফকীরদের পরিধেয় বসন, গাত্র-বস্ত্র বা উত্তরীয় কিছুই নাই—দেহ শীর্ণ বিশীর্ণ। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার দিব্য জ্ঞান জন্মিল। শাক্যসিংহের মত নানক পঞ্জাবের সহরকেই পৃথিবী জানিতেন। সহরের বাহির বিষয়ে তাঁহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান। চঞ্চলচিত্ত হইয়া তিনি ফকীরদিগকে অর্থ প্রদান করিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহারা অর্থ গ্রহণে অসম্মত হইলেন। তৎপরে তাঁহাদের ইচ্ছামতে নানক তাহাদিগকে উত্তম আহারীয় প্রদান করিলেন। যে ৪০ চল্লিশ টাকা পুঁজি লইয়া বাটী হইতে বাণিজ্যে বাহির হইয়াছিলেন, সেই টাকাগুলি তাবৎ ব্যয় করিয়া পুরুচারু রূপে ভোজন দিলেন। এই রূপে অর্থ-নাশ করায়, পিতার সহিত সাক্ষাৎকারে সাহস হয় নাই; অতএব তিনি গুপ্ত বেশে লুক্কায়িত রহিলেন।

কিন্তু পিতার মন সুস্থির নহে। তিনি অনুসন্ধান করিতে করিতে সহসা এক দিন দেখিলেন, নানক এক বিশাল বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাভ্যন্তরে নিস্তব্ধ-ভাবে সংগোপনে উপবিষ্ট। পিতা তাঁহাকে আহ্বান করিলে, তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচরে জানাইলেন।

এবং এই বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করিলেন যে,—'আপনি আমায় এক মহৎ উদ্দেশে বিষয় কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমিও ঈশ্বরের আজ্ঞা-প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছি।' কালু ঐ কথা শুনিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া পুত্রকে গৃহে লইয়া চলিলেন।

বাটীতে লইয়া গিয়া তিনি নানককে অনেক গালাগালি দিলেন। কালুর স্বভাব সহজেই অতি ক্রোধন ছিল। রায় ভোলার ভট্টি নামে এক ব্যক্তি ঐ গ্রামের ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি লোক-মুখে যুবক নানকের এই অসাধারণ মহীয়সী ক্রিয়ার কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি নানকের পিতাকে ৪০৲ টাকা দিয়া বলিলেন, তোমার পুত্রের চরিত্র অতি সাধু। তুমি কোন মতে তাহাকে ভর্ৎসনা করিবে না। ভাগ্যে এক জন উন্নতমনা জমীদার ছিলেন, তাই নানকের এ যাত্রা নিস্তার হইল।

যে স্থানে নানক কর্ত্তৃক ফকীর-ভোজন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, "খরা সৌদা" অর্থাৎ অধুনা "যথার্থ লাভ" নামে তাহার প্রসিদ্ধি হইয়াছে। আর যে গাছের অন্তরালে সংগোপনে ছিলেন, তাহা আজও "মল্ সাহিব" আখ্যায় আহূত হইতেছে। পর্য্যটকেরা তীর্থ-ভ্রমণে দেশ দেশান্তরে বহির্গত হইয়া সাগ্রহে এ স্থান দর্শন করিয়া থাকেন। বড় বড় বট বৃক্ষের ন্যায় ইহার শাখা চারি ধার বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা ভূ-বিলুণ্ঠিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের উৎপাদক হইয়াছে। প্রথম দর্শনে দর্শকের মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

কালু এক জন পরিপক্ক গৃহস্থ ব্যক্তি। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পুত্রটিকে তদনুরূপ করেন। কিন্তু, কার্য্যে তাহার বিপর্য্যয় ঘটিল। কি করেন, অগত্যা সুলতান-পুরে স্বীয় জামাতার নিকট নানককে পাঠাইয়া দিলেন। নানকের মাতার ইচ্ছা নহে, তিনি পুত্রকে নয়নের অন্তরালে রাখেন। পুত্রকে স্বমতে আনয়ন করিতে—তাহার মন ফিরাইতে নানক-জননীর তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। ঐ সুলতানপুরে নানকের ভগিনীপতি অবস্থিতি করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহা চির-প্রসিদ্ধ স্থান।

দিল্লীর সম্রাট বাবরের পরমাত্মীয় দৌলৎ খাঁ লোডি ঐ সময়ে এই স্থানকার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি অধিক দিন ঐ পদে স্থায়ী থাকিতে পারেন নাই। যোগ্যতা-বিষয়ে তাঁহার অপ্রমেয় প্রতিপত্তি ছিল। একটী আকস্মিক অত্যাচারের পর দৌলৎ অধিক কাল জীবিত ছিলেন না। এই ব্যক্তির অধীনে নানকের ভগিনীপতি জয়রাম, সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত কর্ম্ম করিতেন। জয়রামের উদ্যোগে নানক, সম্রাটের কার্য্যে নিয়োজিত হন। এই উপলক্ষে বিস্তর অর্থ নানকের হস্তগত হয়। তিনি মুনি ও

ফকিরদিগকে অজস্র ধন বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কথা রাজকীয় গোচরে উপস্থিত হইল। বাদশাহের আদেশে যখন তাঁহার নিকট হইতে হিসাব-নিকাশ লওয়া হইয়াছিল, তখন কিন্তু তাঁহাকে কিছুরই জন্য দায়িক হইতে হয় নাই—ইহা বড় বিস্ময় ও আনন্দের কথা। আশৈশব যিনি উচ্চ ভাব—উন্নত মনের ক্রিয়া-কলাপ দর্শাইয়া আসিতেছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ একান্ত অবৈধ। যদি সেই অভিযোগের আবার মূল কিছুমাত্র থাকিত, তবে সাধু-শ্রেণীর নামে এক গভীর কলঙ্ক-রেখা পড়িত। নানক নিজে মিতব্যয়িতা এবং মিতাচারিতার গুণে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বিলাসিতার দিকে আদৌ আকৃষ্ট হইত না—সুতরাং তিনি বেতন অক্লেশে জমাইতেন। দীন-দুঃখীর প্রতি তিনি অমুক্ত-হস্ত ছিলেন; তাহার কারণ, তাঁহার নৈসর্গিক সাধুতা। যাহা হউক, সম্রাটের আদিষ্ট হিসাব-গ্রহণে তিনি দায়ী না হইয়া, বরং বাবর তাঁহার বেতন দানে দায়ী হইলেন।

ইহার অব্যবহিত পরে চুণা-বংশীয় সুলক্ষণী নাম্নী কোন সুলক্ষণা ক্ষত্রিয়-ললনা-সহ নানকের ঔদ্বাহিকী ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সুলক্ষণীর পিতার নাম মৌলা। ইনি জেলা গুরুদাসপুরের মধ্যবর্ত্তী বুটালা পরগণার লোখোকী গ্রামের অধিবাসী ও অতি সচ্চরিত্রশালী পুরুষ। পাণিগ্রহণের কিয়ৎকাল বিগত হইবারপর, নানক-পত্নীর গর্ভ-সঞ্চার হয়। সাধ্বী সুলক্ষণী যথাকালে দুই অপত্য-বত্ন প্রসব কবিলেন; একের নাম শ্রীচন্দ এবং অপরের নাম লক্ষ্মীদাস। এই লক্ষ্মীদাস বেদী-বংশের পূর্ব্বপুরুষ। দুঃখের বিষয়, সেই বংশে নানক-ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু, গুণের মধ্যে—তাহারা সদাচার-নিরত। অগ্রজ শ্রীচন্দ হইতে উদাসীন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। পঞ্জাবীয় প্রত্যেক ধর্ম্ম-মঠ ও আখড়ায় সেই সাম্প্রদায়িক লোক বাস করে। এই দুই পুত্র ব্যতিরেকে নানকের আর কোন পুত্র বা কন্যা ছিল কি না জানা যায় না।

পঞ্জাব দেশে পুত্র-কন্যা হত্যা করিবার হৃদয়-বিদারক অপকৃষ্ট প্রথা প্রবল ছিল। নানক স্বীয় সন্তান-সন্ততিদিগকে বিশেষ-রূপে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তাহারা ঐ ঘৃণাকর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত না হয়। প্রত্যুত তদঞ্চল-অধিবাসি-কুলকে যেন ঐ গর্হিত ব্যাপারের দোষ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। আমরণ নানক-জীবন যে কেবল সংস্করণ-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে, এই প্রকার শত শত ঘটনা তাহার সাক্ষী। পঞ্জাব প্রদেশের যদি অতিশয় জঘন্য কোন কাণ্ডের শোধন নিমিত্ত নানকের নেত্র, অকপটে অশ্রুবারি ত্যাগ করিয়া থাকে ত তাহা এই হত্যাব্যাপারের আমূল বিশোধন জন্য —না, রহিত করিবার জন্য। যখন যেখানে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধিত হইত,

নানক সেই থানে উপস্থিত হইতেন। তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে কত উপদেশ দিতেন! শুধু বক্তৃতা বা উপদেশক যুক্তিকে মহাস্ত্র ভাবিয়া নানক কদাপি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই—মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নিজ জীবনে ভয়ানক ভয়ানক পরীক্ষার মধ্যেও নিপতিত হইতে হইত। ভবিষ্য কালে যে ঐ ভয়াল কাণ্ড তিরোহিত হয়, সাধুশীল নানকের কার্য্য—নানকের শিক্ষা—নানকের আগ্রহ, তাহাব নিদান।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, বিবাহ করিতে প্রথমত নানকের স্পৃহা ছিল না। কেবল মাতা পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, সন্তানোৎপাদনে তাঁহার মূলেই অভিপ্রায় ছিল না। বোধ করি, পঞ্জাবের যুবকগণের নৈতিক অবনতিতে নানক স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, সংসর্গ-দোষে তাঁহার পুত্রেরাও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িবে। নানকের ঐ অনুমান ব্যর্থ হয় নাই। সন্তানদ্বয় তাঁহার মনোমত না হওয়ায়, তিনি পরিভ্রমণ-কালে কদাপি পুত্রগণকে সঙ্গে লইতেন না। অধিক কি, যে সার্ব্বভৌমিক শিক্ষা-প্রভাবে শিখজাতি এক নব জীবন লাভ করিয়াছে, সেই উদার শিক্ষায় শ্রীচন্দ ও লক্ষ্মীদাস বঞ্চিত ছিল।

পাণি-পীড়নের কিঞ্চিৎ পরেই, নানককে সাংসারিকতায় আবদ্ধ হইতে হয়। তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা পাইতেন, সংসার হইতে অবসর লইবেন। কার্য্যে কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। স্ত্রী-পুত্র-পরিবেষ্টিত হইলে, তাঁহার দিব্য জ্ঞান হইল—সংসার ছাড়িয়া স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য কার্য্য থাকিতে পারে, সাংসারিকতা কিন্তু প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সুলতানপুরে অবস্থান-কালে নানক একদা তত্রত্য বেইল নদীতে স্নানার্থ গমন করেন। শুনা যায়, তিন দিন তিনি সেই নদী-নীরে দেহ নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। যে ঘাটে অবগাহন করিতেন, ইদানীং "শান্ত ঘাট" আখ্যায় তাহা অভিহিত হইতেছে। নদীর নিকটেই এক বৃক্ষ। সময়ে সময়ে নানক সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিতেন; লোকে সেই স্থানকে "বারাকী বীর" বলিয়া থাকে।

যুবাবয়সে যখন তিনি পিতা কর্ত্তৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, তাৎকালিক তুলা যন্ত্র এবং যে দোকানে তাঁহার বিক্রয়-স্থান ছিল, শিখজাতি তাহাকে আজও এক তীর্থ মধ্যে গণনা করে। মহাপুরুষের মৃত্যুর পর অতি ভক্তি প্রদর্শন কবা, ভারতবর্ষীয়গণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উহা এ দেশের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশিত হইলেও দূষ্য হয় না।

কিয়ৎকাল সমাতীত হইবার পর, গৃহ ছাড়িয়া নানক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কোনও হৃদয়-বন্ধু সংসারাশ্রম ত্যাগ না করিতে বিশিষ্টরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেও, তাঁহাকে তাহা হইতে

বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 'জননীকে অবলম্বন করিয়া যেমন জীব প্রাণ-ধারণ করে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করে, আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বিতীয় আশ্রম (গৃহস্থ-ধর্ম্ম) তাদৃশ আবাস-স্থল *।' অটল নানক বন-গমন করিলেন। এ দিকে অর্থাভাবে পুত্র ও বনিতার কষ্টের সীমা রহিল না। নানকের শ্বশুরের হৃদয়ভেদী বিলাপ ও অনুনয় বিনয়ে দৌলৎ খাঁর মন বিগলিত হয়। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও নানককে অধ্যবসায় হইতে ফিরাইতে অসমর্থ হইলেন। দৌলৎ খাঁকে নানক সেই সময় বলিয়া পাঠান—'আমি জগৎ-পাতা পরমেশ্বরের ভৃত্য, পৃথিবীর রাজাকে চিনি না। রাজার রাজা যিনি, তাঁহাকেই পাইতে আমার এই *প্রয়াস ইত্যাদি*—।' নানক-প্রদত্ত উত্তর বলিয়া শিখজাতির ধর্ম্মগ্রন্থে গুরুমুখী ভাষায় বিবিধ ছন্দোবদ্ধ কবিতার আকারে রাশি রাশি শ্লোক রচিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, সেই সকল কথা বা তাহার ভাব, নানকের কণ্ঠ-নিঃসৃত কি না জানি না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।

* উক্ত উপদেশ মনু-বাক্যের সহিত প্রায় অভিন্ন। মনু বলিয়াছেন :—

যথা মাতরমাশ্রিত্য, সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
বর্ত্তন্তে গৃহিণস্তদ্বদাশ্রিত্যেতর-আশ্রমাঃ॥

এখন আমরা কি চাই?

আজ কাল স্বাধীনতা লইয়া বঙ্গ-সমাজে তুমুল কাণ্ড ও মহান্ সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইতেছে। বঙ্গ-সন্তান-মাত্রই আপনাদিগের আধুনিক অবস্থা-বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দাসত্ব-পীড়িত হৃদয়ে আশা-প্রোৎফুল্ল নয়নে সেই মোক্ষ-প্রদ স্বর্গীয় রত্নের দিকে চাহিতেছেন। এমন দিন নাই, যে দিন এ বিষয়ের কিছু না কিছু আন্দোলন চলিতেছে, এমন গৃহই নাই, যাহাতে ন্যূনতঃ এক জন-মাত্রও দিনান্তে এক বার এ বিষয়ের চিন্তায় নিবিষ্ট না হইতেছেন। আজ দীন ভারতের দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী কালান্ধকার-ময়ী অমানিশার অপগম হইবার লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রতীত হইতেছে—সুখময়ী উষার শান্তোজ্জ্বল আভা ভারতের প্রাচী-দ্বারে ক্ষীণ ও চঞ্চলভাবে থাকিয়া থাকিয়া প্রতিভাত হইতেছে। সেই আভায় উৎসাহিত হইয়া, সহস্র সহস্র ব্যক্তি আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। "কবে ভারতের বিষাদময়ী কাল-নিশা প্রভাত হইবে? সুখ-সূর্য্যের হাস্যময় কিরণে ভারত প্রফুল্লিত হইবে?

আশার এই কুহকমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া নির্জ্জীব ভারত-সন্তানের হৃদয়ে নূতন জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে, ক্ষণস্থায়ী বৈদ্যুতিক বলে বলীকৃত হইয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ এক বার কাঁপিয়া উঠিতেছে!—কিন্তু, তৎপরেই অবসাদন—গভীর অবসাদন! আবার সেই সাংক্রামিক জ্বরা আসিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে আক্রমণ করিল; আবার তাহার দৃঢ় হৃদয়-গ্রন্থি ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া পড়িল—বীরপুঙ্গবের সমস্ত বীরত্ব প্রিয়তমার অঞ্চলে যাইয়া পর্য্যবসিত হইল! কি আশ্চর্য্য! কি বিষম ভ্রম! আজ্ হতভাগ্য ভারত সন্তানগণের এ ভ্রম কেন ঘটিল? কেন তাহারা প্রকৃত সুখ ভুলিয়া কাল্পনিক সুখের কুহকে মুগ্ধ হইয়া মরীচিকায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইতেছে? সুখ কিসে?—স্বাধীন জীবনে—স্বাধীন বিচরণে—স্বাধীন কার্য্য-করণেই প্রকৃত সুখ। স্বাধীনতাই সুখের আস্পদ ও নিদান।

আজ কয় জন ভারত-সন্তান ইহার যাথার্থ্য বুঝিয়া ইহার জন্য লালায়িত হইয়াছেন? আজ্ মহাত্মা মিল্ যে স্বাধীনতার * বিমল-শিক্ষা-সুধা-স্রোত য়ুরোপে ঢালিয়াছেন; যাহার মৃত্যু-সঞ্জীবনী ক্ষমতা-প্রভাবে সমগ্র পাশ্চাত্য-মণ্ডল উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিতেছে; যাহার প্রচণ্ড বেগ প্রতিরোধ করিতে যাইয়া কত কত নৃপতি,স্বীয় প্রজাসমূহের কোপ-বহ্নিতে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতেছে। স্বদেশের প্রতি মমতা নাই, স্বজাতির স্নেহ নাই,বরং ভীষণ মরু-প্রান্তরে—দুর্গম গিরি-গহনে যাইয়া বাস করিবে, তথাপি সে জীবনতোষিণী সুখের প্রতিমাকে প্রাণান্তেও বিসর্জ্জন দিতে পারিব না। আজ্ কয় জন স্বাধীনতা-বাদী বঙ্গ-ভ্রাতা ইহার যথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? যদি না হইয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য লালায়িত কেন? তবে তাহার জন্য এত বাক্‌বিতণ্ডা কেন? এত বাহ্যাড়ম্বর কেন? যাহা বুঝিলাম না, যাহার প্রকৃত অবস্থা অনুমান করিতে পারিলাম না, তাহাকে কোথায় পাইব?—কি করিয়া খুঁজিয়া লইব?—যাহা আমার বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা প্রণিধানীকৃত হইল না, বিবেক-শক্তির সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইল না,—আকাশ-কুসুমের ন্যায় তাহার অনুধাবন করিয়া ফল কি?—তবে করি কেন?—বিষম ভ্রম! আজ অধিকাংশ ভারত-সন্তান এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।—তাঁহারা স্বাধীনতা চাহিতে শিখিয়াছেন; কিন্তু, প্রকৃত স্বাধীনতা কি, তাহা অনেকেই বুঝিতে শিখেন নাই। তাঁহারা হীরক ফেলিয়া কাচের আদর করিতে শিখিয়াছেন, সেই জন্যই আজ ভারতের ক্ষতি কিছুতেই পূরিত হইতেছে না। আজ যদি এই অসংখ্য আর্য্যসন্তানের মধ্যে প্রত্যেক শতে এক জন করিয়াও ইহার যাথার্থ্য প্রণিধান করিতে পারিতেন,

* ব্যক্তিগত (Individual)

তাহা হইলে, আমাদিগকে এই সুদীর্ঘ অবতারণিকা অবতারিত করিয়া অনেকের বিরক্তি-ভাজন হইতে হইত না। তাহা হইলে আমরা, আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া মনের সুখে আলোচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু, বলিতে কি, আজ আমরা তাহাই করিব; আমরা স্বাধীনতা-পক্ষে এক্ষণে আর কিছুই বলিব না; আপাততঃ যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি তদনুরূপ স্বাধীনতার আরাধনা করুন; আমাদের তদ্বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য নাই; এইমাত্র বলি, যেন ইহার মৌলিক ভাবার্থের বিপর্য্যয় না ঘটে। যেন তাঁহার স্বাধীনতা পরাধীনতার নামান্তর না হয়। যেন তাঁহার স্বাধীনতা, স্বদেশানুরাগের নিদানীভূত চরমোৎকর্ষ ও অনন্ত নিত্য সুখের আধার-স্বরূপ হয়, এই আমাদের একান্ত অনুনয়।

আমরা স্বাধীনতা † চাই; কিন্তু এখন নহে। কারণ, এক্ষণে আমাদের স্বাধীনতা-সংরক্ষণ-সমর্থক বল ও ক্ষমতা নাই। রোগ-কর্শিত দেহের অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক প্রবলতম আনন্দোদ্গমের ন্যায় আমাদের ভারতের হঠাৎ দারুণ পতন হইবে; সে ভীষণ পতন হইতে আর কেহ কখনই ভারতকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। বহুকাল-ব্যাপী যন্ত্রণাময় দাসত্ব-পীড়নে ভারত অন্তঃসার-শূন্য হইয়াছে। তাহাতে আবার পরস্পরবিসংবাদী আমমূ-প্রচলিত দুরন্ত কুসংস্কার ও কদাচার-নিচয়ের ভীষণ শেল-প্রহারে তাহার অর্দ্ধাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; সেই সমুদায় ক্ষত আরোগ্য করিয়া ভারতের নব বলোপায় করিতে অনেক দিন লাগিবে। অগ্রে সেই সমস্ত ক্ষতের প্রতিবিধান কর, পরে ভারতের বল স্বতঃই উপচিত হইবে। সেই সমস্ত দারুণ ক্ষত-সংঘ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের শোণিত শোষণ করিতেছে;—আজি সেই জন্যই ভারত কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট, তাহার মুমূর্ষু অবস্থা! এরূপ দীন ও শোচনীয় অবস্থায় ভারত এ গুরু ভার কখনই বহন করিতে পারিবে না। পরন্তু, যে উপকরণ-পরম্পরা জাতীয়-জীবন-গঠনের একমাত্র উপাদানীভূত, যাহা স্বাধীনতার মূলভিত্তি, তাহার একটীও এক্ষণে ভারতে নাই। সেই জন্যই বলিতেছি, ভারতের এখন স্বাধীনতার আবশ্যক নাই। ভারত এক্ষণে প্রতিকূল তরঙ্গ-মধ্যস্থ ক্ষীণ তৃণবৎ। তাহার স্বকীয় বল নাই—সামর্থ্য নাই। যে তরঙ্গ যখন প্রবল হইতেছে, সেই তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া আপন আয়ত্তাধীন করিতেছে। আজ সুসভ্য ইংরাজগণ যদ্যপি ভারতকে ছাড়িয়া যান, কাল হয়ত আবার এক ভীষণ জাতি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে। সুদক্ষ ইংরাজগণের সুন্দর শাসন-প্রভাবে ভারত, ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে যে বলের চয়ন করিতেছিল, এক

† জাতীয় (National)

দিনে এক মুহূর্ত্তে তাহার সূক্ষ্ম পরমাণু-নিচয় চিরকালের জন্য রসাতলে প্রোথিত করিয়া ফেলিবে। ভাগ্যে এই ভারত আজি ইংরাজ-শাসন-কর্ত্তাদিগের কর-তল-গত, তাই আমরা তাঁহাদের অনুগ্রহে আজ এই মহতী শিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম; তাই আজ আমরা তাঁহাদের গরীয়ান্ আদর্শে প্রকৃত স্বাধীনতার মর্ম্ম-গ্রহণে সক্ষম হইলাম। তাই আজ আমরা তাঁহাদের ঐতিহাসিক জীবনের জ্বলন্ত স্বজাতি-প্রেমোদাহরণ দেখিয়া সোৎসাহে তাহার অনুকরণ করিতে শিক্ষা করিতেছি। শিক্ষা করিতেছি; কিন্তু এ শিক্ষা কবে কার্য্যে পরিণত হইবে? কবে আমরা ইংরাজদিগের স্বজাতিপ্রেমের প্রদীপ্ত উদাহরণে তন্ময় হইয়া ছিন্নভিন্ন হীনবল ভারতীয় ভ্রাতৃগণ এক অভিন্ন সহানুভূতি-সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিব? কবে সকলের হৃদয়-তন্ত্রী এক স্বরে বাজিয়া উঠিবে? কবে কন্যাকুমারিকাস্থ এক ভ্রাতার বেদনা তাড়িত-প্রভাবে সুদূর হিমাদ্রিস্থিত আর এক ভ্রাতার হৃদয়ে প্রতিহত হইবে? কবে আমরা ইংরাজ ও য়ুরোপীয় অন্যান্য সর্ব্বলোক-স্মরেণ্য স্বদেশানুরাগী মহাত্মাগণের জীবন্ত আদর্শ হৃদয়ে ধরিয়া একতা ও আত্ম-ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশের কুসংস্কার-রাশি দূরীকৃত করিতে পারিব? পারিব কি? অবশ্য পারিব। যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট দেবতা আমাদের কর্ণে বলিতেছেন—"পারিবে, অবশ্য পারিবে; একতা ও আত্মত্যাগ অবলম্বন কর, স্বদেশের কুসংস্কার দূরীভূত কর, তবে পারিবে।" হে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন শূন্যবিহারী দেবতা! কে আপনি? আপনাকে প্রণাম করি। সর্ব্বমঙ্গলময়! আপনি এই মহামন্ত্র প্রত্যেক ভারত-বাসীর প্রতি কর্ণে প্রতিধ্বনিত করুন, এই আমাদের সবিনয় নিবেদন, এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। তাই বলি, একতা ও আত্মত্যাগ অবলম্বন কর, স্বদেশের কুসংস্কাররাশি দূরীভূত কর, তবে মাতৃভূমির উদ্ধার-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে; তবে এক দিন স্বজাতি-প্রেমিক স্বাধীনজাতি বলিয়া জগতী-তলে অভিহিত হইতে পারিবে। আইস, ভাই! ভয় খাইও না, রাগ করিও না; এ হতভাগ্যকে পাগল বলিয়া ঘৃণা করিও না; এক বার আইস, দেশীয় বদ্ধমূল কুসংস্কার ও দুর্নীতি-নিচয়ের উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবান্ হই। যদি না বিশ্বাস কর, তবে সন্ন্যাসি-প্রবর ম্যাট-সিনীর জীবনী আলোচনা—সাম্যাবতার বুদ্ধদেবের কীর্ত্তি-সাগর মন্থন কর, বীর-পুঙ্গব প্রতাপ ও ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত উদ্ঘাটন কর, দেখিবে—তাহার প্রতি পত্র প্রতি পংক্তি, প্রতি অক্ষর এই জ্বলন্ত উদাহরণে অগ্নি-পরীত হইয়া সেই মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে কি না।

কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক,

কি ধর্ম্মনৈতিক যে কোন সংস্করণ-ব্রতে দীক্ষিত হও, অগ্রে আত্মত্যাগ-মন্ত্র গ্রহণ না করিলে, কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। আত্মত্যাগ-মন্ত্র কর্ম্মকাণ্ডে ব্যাপৃত হইলে পর, একতার অবতারণা করে; তাহাতেই বৈপ্লবিক সংঘর্ষ স্বতঃ-সমুদ্ভূত হইয়া সকল প্রকার সংস্কার সাধন করে। আত্মত্যাগের পর, জাতীয় একতা সমীত হইলে, বিপ্লব আপনা হইতেই সমুত্থিত হয়, এবং উপযুক্ত অধিনায়ক পাইলে, ইহা আপনা হইতেই জাতীয় জীবন-সংস্কার-সাধনে কৃতকার্য্য হয়। এ কার্য্যে ইহা অন্যের সাহায্য সাপেক্ষ নহে। ইহা আপন একীভূত বল-প্রয়োগেই আপনি কার্য্যক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

ভারতে এক্ষণে সমাজিক সংস্করণ সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজ্য। এ সংস্করণ ভিন্ন ভারত কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। এই সাধনার অভাবেই ভারতের আজ এত দুর্দ্দশা; ভারত,জেতৃদলক্ষিপ্ত কঠিন দাসত্ব-শৃঙ্খলে আজ সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া আবদ্ধ। আজ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঘোর অমানিশা বিরাজ করিতেছে, এই সাধনার তীব্র দীপ্তি ভিন্ন তাহাকে কেহই দূরীকৃত করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে যে সকল ভীষণ কুসংস্কার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব করিতেছে; তাহার এক একটীকে উচ্ছিন্ন করিতে এক একটী যুগের অবতারণা করিতে হইবে; কারণ, তাহার অধিকাংশই চিরন্তন ও বহুকাল-প্রচলিত। বোধ হয়, ভারতের সর্ব্বনাশ-সাধন করিবার জন্যই প্রাচীন আর্য্যগণ এই সকল অপরিণাম-দর্শিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন! তাঁহাদের সেই সকল কুসংস্কার-ভ্রমময়ী অবিমৃষ্যকারিতার বিষময় ফল তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ ভোগ করিতেছে। তাঁহারা ভাবী ফলাফল গণনা না করিয়াই তাৎকালিক হিন্দু-সমাজের উন্নতি-সাপেক্ষ যে সকল নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় আধুনিক সমাজে যে মহামারাত্মক সাংক্রামিক রোগের সৃজন করিয়াছে, তাহার আক্রমে ভারত আজ কম্পিত-কলেবর; তাহার প্রতিকার-সাধন ভিন্ন ভারত অল্প দিনের মধ্যে রসাতলশায়ী হইবেই হইবে।

আধুনিক হিন্দু-সমাজে যে সমস্ত কুসংস্কার বিরাজিত রহিয়াছে, তৎ-সমুদায়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা গেল;——

১। জাতিগত, ২। প্রেমগত, ৩। পরিবারগত।

এই তিনটীর মধ্যে একের সংস্করণাভাব হইলে, জাতীয় জীবন কখনই সংগঠিত হইতে পারে না। আমরা এই তিন ভাগের সংক্ষিপ্ত সমালোচন করিয়া সংস্করণ-বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিব।

১। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে জাতি-বিভাগ প্রচলিত রহিয়াছে। যে সময় আর্য্যগণ সিন্ধুনদ পার হইয়া এই সুবিস্তৃত ভারতভূমির আধিপত্য-লাভার্থ অত্রত্য আদিম অধিবাসীদিগের বিরুদ্ধে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত করেন, তখন এ ভাব তাঁহাদের মধ্যে ছিল না; পুনশ্চ যখন তাঁহারা ইহার কিয়দংশ করতলস্থ করিয়া অদমিত উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব জীবিকোপায় নির্ব্বাহের জন্য সহস্তে হল-চালনা করিতেন, তখনও এই বিষময় জাতি-বিভাগ-প্রণালী তাঁহাদের অতীব পবিত্র জীবনক্ষেত্রে স্থান পায় নাই। আহা! সেই, কাল কত সুখের ছিল। তখন একতা-সূত্র-নিবদ্ধ সুখ-শান্তি-তৃপ্ত আর্য্য-সন্তানগণ কেমন সুন্দর ভ্রাতৃভাবে কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন! কেমন তাঁহারা এক কেন্দ্রীভূত নীতি সমুদায়ের সমীকরণ করিয়া জগতে স্বজাতি-প্রেমিকতার জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন! কিন্তু কার্য্য-পরম্পরার অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন-প্রভাবে তাঁহাদের ব্যবহারা-বলীর প্রভেদ ও অনৈক্য পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে সেই এক জাতির মধ্যে চারি বর্ণ বিভক্ত হইল। ক্রমে তাহা হইতে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বহির্গত হইয়া সেই অভিন্ন এক জাতিকে পরস্পর-বিদ্বেষী অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি-রূপে বিভক্ত করিয়া ফেলিল। আজি সেই বিভাগ-সকলের মধ্যে যে অতল নিখাত, তাহা আর পরিপূরিত হইল না। সেই নিখাত দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি-য়াছে। এখন এক বর্ণ, অন্য বর্ণের প্রতি চাহিয়া দেখে না; অন্য বর্ণের জন্য একের হৃদয় কাঁদে না! ইহার উপর আবার চতুর ব্রাহ্মণগণ একাধিপত্য লাভ করিয়া যে বিষম অনল জ্বালিয়া দিল, তাহা আজিও নির্ব্বাপিত হইল না! তাহার নির্ব্বাপণ ও শান্তীকরণ ভিন্ন ভারতের অবনতি কিছুতেই ঘুচিবে না।

২। প্রেম মানবের জীবন। প্রেম ভিন্ন সাংসারিক ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন শূন্য ও অন্ধকারময়। যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, যে আপনাকে ভাল বাসিতে জানে না, সে জগতে কাহাকেও ভাল বাসিতে পারিবে না। তাহা দ্বারা সংসারের কোন উপকার সাধিত হয় না। বিবাহ, প্রেমের প্রকাশ্য ধর্ম্ম স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার-মাত্র। প্রেম-বন্ধনাবদ্ধ পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম-সুখ-সম্ভোগী ব্যক্তিগণের জীবনই ধন্য। প্রেমেই ভক্তি, স্নেহ ও অনুরাগের উৎপত্তি। প্রেম, স্বর্গীয় সুধা-সিঞ্চিত হইয়া প্রেমিকের পূত হৃদয়ে স্বতঃই উৎপন্ন হয়; যেখানে উৎপন্ন হয়, অগ্রে তাহাকে অমৃতময় করে; পরে অমৃত-ধারা বাহিয়া স্বাধীন পথে প্রবাহিত হইয়া অভীষ্ট পাত্রে মিলিত হয়। প্রেম স্বাধীন—স্বতন্ত্রী—স্বাবলম্বী। প্রেমের

প্রবল স্রোত যখন প্রথমে নিঃসৃত হয়, ইহা বাধা মানিবে না—বিপত্তি মানিবে না,—অভীষ্ট-পাত্রের রূপ গুণ কিছুই অপেক্ষা করিবে না—সময়াসময় কিছুই বিবেচনা করিবে না—প্রশংসা, কুৎসা কিছুই গ্রাহ্য করিবে না। ইহা স্বাধীন ভাবে অনিবার্য্য-বেগে নিজ মনোনীত পাত্রের নিকট উপস্থিত হইবে। যদি তাহার নিকট আশ্রয় পাইল, উপযুক্ত প্রতিদান পাইল; যদি পরস্পরের প্রেমের দ্বৈত ভাব যাইয়া অদ্বৈত ভাবে মিলিত হইয়া একীভূত হইল, হৃদয়ে হৃদয়—আত্মায় আত্মা মিশিল; তবেই প্রেম পরিস্ফুট হইবে, তাহার সুবিমল সুধা-ধারা শতমুখী হইয়া জগতময় ছড়াইয়া পড়িবে—সর্ব্ব জীবে বিলীন হইবে। আর যদি তাহা না হইল, যদি প্রেমে প্রেম, হৃদয়ে হৃদয়, আত্মায় আত্মা মিশিতে না পাইল, তবেই প্রেম আপনিই শুকাইয়া যাইবে, তাহার অমৃতময়ী অমৃতনিস্যন্দিনী ধারা যাইয়া বিষময়ী বিষোদ্গারিণী অনলধারা উৎপন্ন হইবে; তাহাতে তাহার আধারকে বিষময় করিবে—জগতকে পুড়াইবে! আজ সেই ভীষণ অনলে বঙ্গসমাজ দগ্ধ হইতেছে, প্রতিগৃহেই এই অনলের উৎপত্তি হইতেছে; ক্রমেই ইহার সর্ব্বসংহারক অনন্ত স্রোত সমস্ত ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে! আজ ভারতের প্রলয় কাল! আজ এ প্রলয়-সর্ব্বনাশ হইতে কে রক্ষা করিবে? কে আজ এ ভীষণ অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাপণ করিবে? এ অনলে কত হত-ভাগিনী রমণী পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতেছে; কত হতভাগা পুরুষ সজীবনে ভস্মীভূত হইতেছে! হায়! কি কুক্ষণে দেবীবর বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন! তাঁহার একের নির্ব্বুদ্ধিতা বশত আজ সমস্ত বঙ্গভূমি কাঁদিতেছে!

৩। পরিবার-গত কুসংস্কার-নিচয় কতক শাস্ত্রমূলক—কতক ব্যবহার-মূলক। পরিবার মধ্যে পিতা পরম গুরু। পিতৃ-ভক্ত ও পিতার বাধ্য হইলেই পরম ধর্ম্ম, স্বর্গ ও শ্রেষ্ঠ তপ অর্জ্জন করা হইল। পিতা যাহা বলিবেন, সন্তানকে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান করিতে হইবে। ন্যায়ান্যায়—ধর্ম্মাধর্ম্ম—ইচ্ছানিচ্ছা—সুখ-দুঃখ বিচার না করিয়া, কর্ত্তব্যের গুরুতর অনুরোধে সন্তানকে তাহা পালন করিতে হইবে। পিতা যদি মূর্খ হইলেন, তাহা হইলে পুত্রের আর সর্ব্বনাশের সীমা নাই; তাহাকেও পিতৃ-আচরিত পদবী অনুসরণ করিতে হইবে, কুসংস্কারের ঘোরতর পঙ্কে পতিত হইতে হইবে। সেই পঙ্কে তাহার পুত্রপৌত্রানুক্রমে আবার নিমগ্ন হইতে হইবে!—নতুবা পিতৃধর্ম্মের বিবর্জ্জন হয়, পিতৃকুলের অবমাননা হয়! পুত্র বিবাহোপযুক্ত হইল। পিতা অনু-সন্ধান করিয়া একটী কন্যা স্থির করিলেন এবং লগ্নানুসারে তাহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন! পুত্রের সে বিষয়ে কিছু-মাত্র ক্ষমতা নাই! পিতা যেরূপ বুঝিলেন, আপন ইচ্ছামত, সুবিধানুযায়ী

কুরূপাই হউক—সুরূপাই হউক, কন্যা স্থির করিলেন। তাহার জীবনের কোমল প্রেম-গ্রন্থি বাঁধিল কি না তাহা তিনি দেখিলেন না—জানিলেন না। সে বিবাহের আগে পুত্র কন্যা কেহই জানিল না যে কে কাহাকে বিবাহ করিবে—কাহার জীবনসহচর কে ও কিরূপ হইবে—বিবাহের রাত্রেও তাহারা পরস্পরকে বিশেষরূপ দেখিতে পাইল না। বৈবাহিক নানা প্রকার ধুমধামে—বাজনা বাদ্যে—বাহ্যাড়ম্বরে—তাহাদিগের চিত্ত নানা কারণে বিকৃত থাকে। সে দিবস তাহারা সে বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিল না! তাহাদের ভবিষ্য জীবন তাহাদের অজ্ঞাতে এইরূপ জঘন্য নৃশংসাচরণের সহিত তাহাদের নিষ্ঠুর কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংগঠিত হইল! হায়, কি ভ্রম! কি সর্ব্বনাশকর কুসংস্কার! এই কি বিবাহ? এই কি প্রেমের ধর্ম্ম্য অঙ্গীকার? ধর্ম্ম্য স্বীকরণ? এই কি ভবিষ্যজীবনের সুখবীজ রোপণ? কে না বলিবে, কে না স্বীকার করিবে, হতভাগ্য বাঙ্গালীর এ বিবাহ ত বিবাহই নয়, ইহা ব্যভিচারের নামান্তর। আবার হতভাগিনী রমণীগণ কি কুক্ষণেই হিন্দু বাঙ্গালীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের জীবন আরও কঠোরতর যন্ত্রণাময়, আরও ভীষণতর নিষ্ঠুরতার বিলাসময়। দুর্ভাগিনীগণ কোন কালেই কোন সুখের আস্বাদন পায় না। জন্মাবধিই গুরুজনের ও লোকাচারের ক্রীডা পুত্তলী-স্বরূপ অবস্থান করে। বাল্যে পিতামাতার—যৌবনে ভর্ত্তার—বার্দ্ধক্যে পুত্র-কন্যাদের গলগ্রহ হইয়া অতি শোচনীয় অবস্থায় জীবন যাপন করে। আবার যদ্যপি বিধবা হইল, তবে আর হতভাগিনীর যন্ত্রণা রাখিতে পৃথিবীতে স্থান নাই; তখন সকল প্রকার পৈশাচিক ক্লেশদায়ক কুসংস্কার তাহাকে জড়ীভুত করিবে। কঠোর লোকাচারের নিশিত শেলে তাহাকে দিবানিশি বিদ্ধ হইতে হইবে! হায়! আজ ইহাদের দুঃখে সমস্ত ভারত কাঁদিতেছে—সমস্ত জগতে হা হা রব পড়িয়া গিয়াছে! য়ুরোপ! আমেরিক-ক্ষেত্র! কোথায় তোমরা? তোমরা জগতের দুঃখহরণ হইয়া, বিশ্ব-প্রেমিক হইয়া ভারতের এ যন্ত্রণা কেমন করিয়া দেখিতেছ? এক বার তোমাদের সৌভাগ্যবতী রমণীগণের পদধুলি ভারতের হতভাগিনীদের মস্তকে অর্পণ কর; তাহাদের সকল যন্ত্রণা দুরীভূত হউক; তাহারা এক বার স্বাধীন জীবনে স্বাধীন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া উঠুক। এক বার তোমাদের ত্রিলোক-পূজ্য স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মাগণের জ্বলন্ত জীবনী সকল হতভাগ্য, ভ্রমান্ধ,—প্রতারিত ভারত সন্তানগণের মুদিত চক্ষের উপর ধারণ কর দেখি, তাহাদের মোহ-নিদ্রাময় কুসংস্কার-নিচয় দুরীভূত হয় কি না।—হইবে—অবশ্যই হইবে! তোমাদের জীবন্ত উদাহরণে কত শত

অসভ্য দেশ অসভ্যতার উন্নত সোপানে আরূঢ় হইয়াছে; কত শত নর-মাংসাশী রাক্ষস প্রকৃত মানব-নামে প্রখ্যাত হইয়াছে; তবে কি ভারত আজ্ সে সকল উদাহরণে অন্ধ থাকিবে? তবে কি পুণ্যভূমি ভারত আজ পিশাচ-ভূমি বলিয়া বিশ্বের নয়নে ঘৃণিত হইবে? তবে কি ভারতীয়গণ আজ রাক্ষস অপেক্ষাও অধম? "হাঁ রাক্ষসগণ ত কখন জীবন্ত আত্মীয়গণের মাংস ভক্ষণ করে না; কিন্তু আজ ভারতীয়েরা দুরন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া তাহাই করিতেছে! এ সমস্ত ভীষণ কুসংস্কার-নিচয়ের কে মূলোচ্ছেদ করিবে? এ যন্ত্রণাময় জাতীয় জীবনের কে পুনরুদ্ধার-সাধন করিবে? - যে মহাত্মা আত্ম-ত্যাগ অবলম্বন করিতে পারিবেন, তিনিই করিবেন—এ কথা অতি বিশ্বাস্য। স্বাধীনতালিপ্সু বঙ্গভ্রাতৃগণ! এ সময় তোমরা 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' করিয়া আর বারংবার চীৎকার করিও না। এখন স্বাধীনতা লইয়া কি করিবে? কাহাকে লইয়াই বা স্বাধীনতা স্থাপন করিবে? অগ্রে আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সামাজিক কুসংস্কার-রাশি দূরীভূত করিয়া জাতীয় সমীকরণ সাধন কর—একতার অবতারণা কর—জাতীয় জীবন সংগঠন কর, স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হও—তবে এক দিন স্বাধীন হইতে চাহিও। তখন চাহিলে পাইবে; পাইয়া রক্ষা করিতেও পারিবে। এ মহৎ জাতীয় সংস্করণে হিন্দুজাতির পুনর্গঠন আবশ্যক। ইহাতে নূতন বিধ প্রণালীর প্রয়োজন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে আর একটী নূতন যুগের অবতারণা করিতে হইবে—বর্ত্তমান হিন্দুসমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিতে হইবে—পরে ইহার ভগ্নাবশেষ উপকরণ-নিচয়ে নূতন সমাজ গঠিত করিতে হইবে—তবে জাতীয় সংস্করণ সাধিত হইবে। তবে ভারতের উদ্ধার-সাধনে কৃতকার্য্যতা হইবে। স্বজাতি-প্রেমিকতার প্রদীপ্ত উদাহরণ—জগতে রাখিতে পারিবে—অনন্ত সুখময় স্বাধীন জীবন-ধারণে কৃতার্থ হইবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হও। এ মহামন্ত্রের সাধন ভিন্ন কখনই এ মহদ্ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

সংস্করণ দুই প্রণালীতে সাধিত হইতে পারে। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য।

প্রকাশ্য প্রণালীতে অগ্রে অদম্য সাহসের সহিত বর্ত্তমান কুসংস্কারাচ্ছন্ন জঘন্য সীমার দূরবর্ত্তী হইয়া আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, সেই খানেই সমাজের সহিত প্রথম তুমুল সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইবে। সেই ভীষণ বিপ্লবে কত বিপদ, কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। মহতী সহিষ্ণুতা ও উদ্যমশীলতা ভিন্ন কখনই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। সে সময় চিন্তার সময় নয়—ভীতির সময় নয়—নৈরাশ্যের সময় নয়; কিন্তু তাহা

সহিষ্ণুতা, উদ্যম-শীলতা এবং সাধনার সময়। সোণার সংসার—বৃদ্ধ পিতা মাতা—জীবন-সহচরী বনিতা—হৃদয়া-নন্দ-বর্দ্ধন সুকুমার সন্তান—বিপুল আশা—ভবিষ্য জীবনের মহতী যশোলিপ্সা রহিয়াছে। যদি তাহাতে না সফল হইতে পার, কদাপি সে আশা পূরিবে না। বৃদ্ধ জনক জননীর জরাভারাক্রান্ত দুর্ব্বল হৃদয়ে কেমন করিয়া ক্লেশ দিব? প্রিয়তমার চক্ষের জল কেমন করিয়া দেখিব? হৃদয়ের ধন সন্তানের ক্রন্দন কেমন করিয়া সহ্য করিব? যদি এক বার দূরে যাই—আর ত ফিরিতে পারিব না—বন্ধু-বান্ধব সকলে ত্যাগ করিবে—নিতান্ত ঘৃণা করিবে—সমাজ-চ্যুত করিয়া দিবে—সে অবস্থায় পুত্র-কন্যার কেমন করিয়া বিবাহ দিব—কেমন করিয়া সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়া জীবন ধারণ করিব? সে যন্ত্রণা কেমন করিয়া সহ্য করিব? তবে কাজ নাই, যেরূপ আছি, সেইরূপই থাকি। এরূপ অমূলক ভীরু-সুলভ তর্ক করিলে চলিবে না। অগ্রে "মন্ত্রের সাধন চাই—" "হয় মন্ত্রের সাধন করিব নয় সেই সাধনায় আত্ম-জীবন উৎসর্গীকৃত করিব—শরীর পাতিত করিব—তথাপি হতাশ হইয়া আর গৃহে ফিরিব না। পৃথিবীতে যত বাধা—যত বিপদ, যত যন্ত্রণা আছে—সকলে একত্রীকৃত হইয়া আক্রমণ করুক; তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিব। ইন্দ্রের বজ্র আপনি বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিব—তথাপি হতাশ হইব না। নৈরাশ্যের যত প্রকার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি আছে, সকলই আসুক, সকলই ভয় প্রদর্শন করুক, তথাপি আর ফিরিব না। আমার জীবনে আমি না কৃত-কার্য্য হই, আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া অন্য এক জন মহাত্মা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।" না ভাই! এ ভয় করিও না। তুমি আত্ম-ত্যাগ অবলম্বন কর, বুদ্ধদেবের—চৈতন্যের—লুথারের—ম্যাটসিনির জ্বলন্ত উদাহরণ অনুকরণ কর, অবশ্যই এই জীবনেই কৃতকার্য্য হইবে।

বুদ্ধদেব মহৎ ধর্ম্ম সংস্করণ করিলেন—ম্যাটসিনি বিশাল জাতীয় সংস্কার সাধিলেন—তুমি আর একটী সামাজিক সংস্করণ সাধিতে পারিবে না? অবশ্য পারিবে। সন্দেহ করিও না—আশঙ্কা করিও না। মূলমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাধনা ও সিদ্ধির উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, অবশ্যই ফল হইবে। আবার বলি, এখন সন্দেহের কাল নয়, ভীতির সময় নয়—নৈরাশ্যের সময় নয়, কিন্তু ইহা সাধনার সময়—সহিষ্ণুতার সময়—উদ্যমশীলতার সময়। এক বার বুদ্ধদেবের জীবন্ত আদর্শের দিকে চাহিয়া দেখ দেখি। ঐ দেখ, ভারতের সে ভীষণ প্রলয় হইতে কেমন করিয়া তিনি ভারতকে উদ্ধার করিলেন—স্বজাতীয়গণের সুখের পথ কেমন করিয়া বিস্তার করিলেন—জগতে লোকের

বীজ রোপণ করিলেন! ভারত তখন রসাতলের নিম্নতম কূপে ধীরে ধীরে পড়িতেছিল—ভারতীয়গণ তখন প্রকৃত রাক্ষসের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরস্পরের মাংস ভক্ষণ করিতে ছিল, ধূর্ত্ত-শ্রেষ্ঠ পদ-দৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ লৌহ-মুদ্গর ধারণ করিয়া নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতম জাতি-নিচয়কে ভীষণরূপে পীড়ন করিতেছিল; তখন একের দুঃখে অন্যে কাঁদিত না—একের যন্ত্রণায় অন্যের সহানুভূতি ছিল না! এই ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিশাচ-প্রপীড়িত হতভাগ্য ভারতীয়গণের উদ্ধার-সাধনে শাক্যসিংহ একাকী অবতীর্ণ হইলেন। সেই ভীষণ কার্য্য ক্ষেত্রের বিভীষিকাময়ী প্রতিচ্ছায়া তাঁহার মানস-পটে প্রতিফলিত হইল। কৈ তখন ত তিনি একবারও সন্দেহ করিলেন না—একবারও ভয় করিলেন না—এবং এক বারও ভাবিলেন না। রাজসংসার, জরাজীর্ণ পিতামাতা; স্বয়ং বিপুল বিভবের একমাত্র উত্তরাধিকারী; পার্শ্বে প্রেমময়ী বনিতা; ক্রোড়ে সুকুমার শিশু! কেমন করিয়া এ সকল ধ্রুব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অধ্রুবের অন্বেষণে ধাবিত হইব? কেমন করিয়া নিষ্ঠুর হইয়া এ সকলের মায়া পরিত্যাগ করিব? যদি না সফল হই, তাহা হইলে কি হইবে? এ নবীন আশাময় তরুণ জীবন বৃথাই বাহিত হইবে? তবে কাজ নাই, কেন বৃথা বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিব? আমি রাজসন্তান; আমার অভাব কিসের? আমার ভাবনা কিসের? কেন আমি পরের জন্য আত্ম-জীবন হারাইতে যাইব? কৈ এরূপ চিন্তা, এরূপ সন্দেহ, এরূপ ভয়, এরূপ নৈরাশ্যের গভীর ছায়া শাক্য-সিংহের মনে ত উদয় হয় নাই! হইলে, ভারতের ঐতিহাসিক জীবন-স্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হইত, কে বলিতে পারে? শাক্যসিংহ তখন যদি এরূপ সন্দেহ-ভীত চিত্তে সেই মহতী সাধনা হইতে, সেই কঠোর কার্য্যক্ষেত্র হইতে প্রতিগত হইতেন, তাহা হইলে কে ভারতের উদ্ধার-সাধনে কৃতকার্য্য হইত? কে জগতে সাম্যের অবতারণা করিত? ইতিহাস দেখ, শাক্যসিংহের মনে এ সব নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক সন্দেহ আদৌ স্থান পায় নাই। তিনি একাকী অমানুষী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সাহায্যে গভীর কুসংস্কার-তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারতম রসাতল হইতে ভারতকে জ্ঞানালোক-দীপ্ত মোক্ষের স্বর্গীয় আসনে উত্থাপিত করিয়াছিলেন; জগতে সাম্য ও একতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। প্রতারিত, প্রপীড়িত ভ্রাতৃগণকে পবিত্র পথে আনিয়াছিলেন! জগতে আত্ম-ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন! এ দিকে এক বার সুদূর য়ুরোপ-ক্ষেত্রের পুণ্য ভূমি ইতালীর দিকে চাহিয়া দেখ। ইতালি, সন্ন্যাসি-প্রবর ম্যাটসিনির অমানুষী স্বর্গীয় কীর্ত্তি-নিচয় কেমন ঘোষণা করিতেছেন! কেমন

ইতালি আজ সর্ব্বপ্রকার সুখসৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ! কেমন ইতালি আজ অবাধে স্বাধীনতা সুখ সম্ভোগ করিতেছেন! ম্যাটসিনি—নিঃস্ব, দরিদ্র-সন্তান, সহায়-হীন, সম্বলহীন। বাটীতে একমাত্র বৃদ্ধা দীনা জননী। তথাপি তাঁহার দারিদ্র্য-নিপীড়িত দুর্ব্বল হৃদয়ে এই মহতী কল্পনা স্থান পাইয়াছিল; তিনি কঠোর আত্ম-ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছিন্নভিন্ন স্বজাতীয়গণের মধ্যে একতা-সৃজনে, জাতীয়-জীবন-সংগঠনে, স্বদেশের উদ্ধার-সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন! জগতে বিপুল স্বদেশানুরাগের—স্বজাতি-প্রেমিকতার দীপ্তিময় উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ম্যাটসিনি, একাকী, নিঃসম্বল, নিঃসহায়। অষ্ট্রিয়ারাজ প্রবল প্রতাপশালী, ভীষণ অত্যাচারী। তথাপি তিনি স্বদেশের অনুরোধে জীবের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন!. কৈ তাঁহার মনে কখনও ত কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয় নাই! তিনি একাকী; তাঁহার সহায় নাই, সম্বল নাই। তবে কি করিয়া এই কঠোর ব্রত-সাধনে কৃতকার্য্য হইব? যদি না সফল হই, তাহা হইলে ত যন্ত্রণার পরিসীমা থাকিবে না। স্বজাতীয়গণ ঘৃণা করিবে, নিষ্ঠুর শত্রুপক্ষীয়েরা ভীষণ যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিয়া প্রাণসংহার করিবে—হায়! তাহা হইলে আমার দুঃখিনী জননীর দশা কি হইবে? তিনি যে পুত্রগত-প্রাণা। হয় ত তিনি আমার শোকে আত্মঘাতিনী হইবেন। উঃ, তাহা হইলে আমাকে যে মাতৃহত্যার পাতক গ্রহণ করিতে হইবে!—না, তবে কাজ নাই—আমি দরিদ্র—সহায়-বিহীন সম্বল-বিহীন—আমার এ সকল উচ্চ বিষয়ে হাত দিবার আবশ্যক নাই। আমি যেরূপ আছি, সেইরূপই থাকি।" কৈ! এ সকল সন্দেহ—এ সকল নৈরাশ্যময় দুর্ভাবনা উক্ত ম্যাটসিনির উন্নত হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত স্থান পায় নাই। যদি পাইত, ইটালির দশা আজ কি হইত, বল দেখি? তিনি তিলার্দ্ধের জন্যও ভয় করেন নাই, চিন্তা করেন নাই; কিন্তু, আত্মত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, মহতী সিদ্ধির উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া, এই কঠোর ব্রত ধারণ করিলেন—আত্ম-জীবনকে ভীষণ বৈপ্লবিক স্রোতে নিক্ষেপ করিলেন একে অষ্ট্রিয়ার ভয়ানক অত্যাচার, তাহাতে আবার স্বজাতীয়গণের বিশ্বাস-ঘাতকতা। কত বাধা—কত বিপদ—কত যন্ত্রণা—কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না;—সুদৃঢ় অধ্যবসায় এবং গরীয়সী সহিষ্ণুতার বলে সেই কঠোর যোগ-সাধনে কৃতকার্য্য হইলেন—জগতে স্বদেশানুরাগী সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বোচ্চ-আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন! তাই বলিতেছি, ভাই! সন্দেহ করিও না—ভয় করিও না—নৈরাশ্যের ছায়া হৃদয়ে স্থান দিও না;—মূলমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ কর—দৃঢ় প্রতিজ্ঞার লৌহবর্ম্ম অঙ্গে পরিধান কর—সাধনার তীক্ষ্ণ অসি হস্তে ধারণ

কর—দেখিবে, তোমার সম্মুখে কু-সংস্কারের ছায়া মাত্রও দাঁড়াইতে পারিবে না। তোমাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে না—সংসার-ত্যাগ করিতে হইবে না—আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করিতে হইবে না—তোমাকে সংসারে থাকিয়া সন্ন্যাসি-ভাব অবলম্বন করিতে হইবে। আপাতত বিষয়-বাসনা, ভোগাভিলাষ, বিলাস-লালসা ত্যাগ করিতে হইবে। আত্মাভিমান—আত্ম-সুখ-লিপ্সা—হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা—সকলই বর্জ্জন করিতে হইবে; এবং স্বজাতিপ্রেম-সুধায় সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতে হইবে। তোমার আত্মীয় কুটুম্বগণ তোমাকে ত্যাগ করিবে; বন্ধুবান্ধবগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে; স্বজাতীয়গণ ঘৃণা করিবে; ফলত কিছুতেই ভীত হইও না—কিছুতেই নিরুদ্যম হইও না। এ সকল ত্যাগ-স্বীকার কিছু দিনের জন্য সত্যের আলোকে আপনিই বিদারিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত করিয়া দিবে। আবার তোমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকেই পাইবে; সকলে আসিয়া ভক্তি-সহকারে তোমার নিকটে প্রণত হইবে; তোমার সহিত অভিন্ন একতা ও সহানুভূতি-সূত্রে আবদ্ধ হইবে; এবং বিমল-সুখ সম্ভোগ করিবে। ভাই! সে সুখ নিত্য, নির্ম্মল, অনন্ত ও স্বর্গীয়।

আর এক কথা! যদি একবারে এ ব্রত-ধারণে তোমার হৃদয় আপাতত প্রস্তুত না থাকে, তবে ধীরে ধীরে তাহাকে গঠিয়া লও, অল্পে অল্পে তাহাকে সহিষ্ণুতাপ্রবণ করিয়া লও; এবং ক্রমে ক্রমে তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে নিয়োজিত করিতে আরম্ভ কর। আপাতত তোমাকে কোন কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। তুমি স্বাধীন ভাবে আপন অবিগত পরিবার মধ্যে অগ্রে স্বাধীনতা ও সাম্যের অবতারণা কর। পরে ক্রমে ক্রমে যতই সমাজের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য ও ঘনীকৃত হইয়া আসিবে, ততই সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে শিখিবে—ততই আত্ম-ত্যাগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ জগতকে দেখাইতে পারিবে,—সুতরাং সন্ন্যাসি-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা সহজ হইবে। তখন অপ্রকাশ্য সংস্করণ প্রকাশ্যরূপে পরিণত হইবে—পরিবার-গত সংস্কারাবলী সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়িবে। তাই, ভাই! আবার বলি, সন্দেহ করিও না—ভয় করিও না—নৈরাশ্যের ছায়া হৃদয়ে স্থান দিও না;—মূল মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ কর—দৃঢ় প্রতিজ্ঞার লৌহ-বর্ম্ম অঙ্গে পরিধান কর—সাধনার তীক্ষ্ণ অসি হস্তে ধারণ কর—দেখিবে, তোমার সম্মুখে কুসংস্কারের ছায়া-মাত্রও দাঁড়াইতে পারিবে না। সর্ব্বাগ্রে সামাজিক সংস্করণ সাধন কর—পরে স্বাধীনতা চাহিও—তখন চাহিলে পাইবে—পাইলে রাখিতে পারিবে। তখন এই প্রপীড়িত পিশাচ-ভূমি স্বাধীন সুখের পুণ্য ভূমি হইবে।

বঙ্গ-ধনি-বৃন্দ! তোমরা আর অকারণে

পাপ বিলাস-লালসায় তোমাদের অপরিমিত ধন-রাশি ব্যয় করিও না। ভ্রাতৃগণ! বল দেখি, তোমরা ইহাতে কি সুখ পাইতেছ? অকাতরে রাশি রাশি ধন ঢালিয়া দিতেছ; কিন্তু,তাহাতে তোমদের কি সুখ হইতেছে? কু-সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অত্যাচারে তোমা-দিগকেও কম্পিত হইতে হইতেছে। ভাই! তোমরা ধন-গৌরব ভুলিয়া যাও। ভুলিয়া গিয়া দরিদ্রদিগের সহিত এক সহানুভূতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সাম্যের অবতারণা করিতে চেষ্টা কর। সামাজিক কুসংস্কার-রাশি বিদূরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হও; তাহা হইলে এক দিন সুখ কি, তাহা জানিতে পারিবে। তবে এক দিন মানব-জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে—স্বদেশের উদ্ধার-সাধনে কৃতকার্য্য হইবে। ভাই! ভাবিয়া দেখ, তোমাদের এ ধন-গৌরব কিসের? যাহাতে জীবনের প্রকৃত সুখ-লাভ করিতে পারিলে না, তাহার প্রয়োজন কি? গৃহে যে বিধবা হতভাগিনী-দের উষ্ণ নিশ্বাসে আমাদের হৃদয় পুড়িতেছে—দুর্ভাগিনী সধবাগণ যে দাম্পত্য প্রেমাভাবে দিবানিশি রোদন করিতেছেন, তাহাতে কি তোমাদের দয়ার উদ্রেক হইতেছে না? তাহাতে কি তোমাদেরও প্রাণ কাঁদিতেছে না। তবে তোমরা ধনগৌরব লইয়া কি করিতেছ? ব্রাহ্মণকুলিন ও ভট্টাচার্য্যগণ! তোমাদের জাতি-মাহাত্ম্য ও কুলগৌরব ভুলিয়া যাও! তোমাদের এ সর্ব্বসং-হারিণী জিঘাংসাবৃত্তি ও ভীষণ পৈশাচিক আচার-সমুদায় সম্বরণ কর। তোমাদের ঐ দোর্দ্দণ্ড শাস্ত্রীয় প্রতাপ ত্যাগ কর। এই দেখ! তোমাদের এ পুণ্য প্রতাপে আজ সমস্ত ভারতভূমি কাঁপিতেছে! তোমাদের নৃশংস অত্যাচারে ভারতীয় সমাজের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আর কেন? চারি যুগ ধরিয়া সমান অত্যাচার ও একাধিপত্য করিতেছ, ইহাতেও কি তোমাদের দারুণ জিঘাংসা ও জিগীষা-বৃত্তির পরিতৃপ্তি হয় নাই? ইহাতেও কি তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই? তোমরা আপন পরিবারের দিকে এক বার চাহিয়া দেখিতেছ না—আপন সমাজের দিকে চাহিয়া দেখিতেছ না—আপন জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিতেছ না! কেবল উন্মাদিনী পৈশাচিকী বৃত্তি-নিচয়-প্রণোদিত হইয়া অন্ধপিশাচের ন্যায় কার্য্য করিতেছ! একবার তোমাদের দীন পরিবারের দিকে সকরুণ কটাক্ষে চাহিয়া দেখ।—একবার তোমাদের হতভাগিনী রমণীগণের দিকে কৃপাবলোকন কর—একবার তোমাদের দুর্ভাগ্য বংশজ ভ্রাতৃগণের যন্ত্রণা-ময় জীবন আলোচনা কর—দেখিবে, তোমরা আপনাদের অত্যাচারে আমা-দের সুখের রঙ্গভূমে কি জবনিকা নিক্ষেপ করিয়াছ! জান, ভীষণ জগতের মঙ্গল-হেতুই রমণীর সৃষ্টি হইয়াছে। রমণীর নৈতিক উন্নতি ভিন্ন কোন রাজ্যের

কখনই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। সেই সর্ব্বশক্তিময়ী রমণীর প্রতি তোমরা যে ভীষণ অত্যাচার করিতেছ, তাহা স্মরণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী হাহারব করিতেছে। তাই বলি, ভাই! আর কেন? তোমাদের এ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সংহার কর। আজ কুলীন-বংশজ শ্রোত্রিয় বৈদিক সকলে মিলিয়া এক অভিন্ন সহানুভূতি-সূত্রে সংবদ্ধ হইয়া এই সমস্ত অনর্থকারী সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত কর। আপনাদের ও রমণীগণের স্বাধীন জীবন ও স্বাধীন প্রেম-সম্ভোগের পথ পরিষ্কার কর আর জগতে স্বজাতি-প্রেমিকতার প্রদীপ্ত আদর্শ রাখিয়া যাও!

শ্রীযঃ——

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সটীক পদ্য রামায়ণ—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ মূলের অবিকল অনুবাদিত গ্রন্থ নহে। তজ্জন্য রাজকৃষ্ণ বাবু এই গুরুভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। পদ্যে মূল সংস্কৃতের ভাষান্তর করা সুদুরূহ ব্যাপার। কিন্তু, রাজকৃষ্ণ বাবু তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। টীকাভাগে যে সকল প্রমাণ-প্রয়োগ উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের মহামূল্য ধন। কবিত্বের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বানুশীলন মণি-কাঞ্চন-যোগ-বিশেষ। অনুবাদিত অংশে হীন মিলন দৃষ্ট হইল না, অনুবাদকের পক্ষে ইহা এক অসাধারণ কৃতকার্য্যতা বলিতে হইবে। এখন কিন্তু, দেশবাসিগণ অনুবাদককে উৎসাহিত করিলেই আমরা আনন্দিত হই।

লুক্রেশিয়া—(খণ্ডকাব্য।) শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভবানীপুর সুধাকর যন্ত্র, মূল্য ৷৹ আনা। গ্রন্থকার "বি, এস্, এসোশিয়েশন" হইতে বিদেশীয় রমণীর চরিত উপলক্ষ করিয়া, এই কাব্য রচনা করায়, মেডল পাইয়াছেন। বাস্তবিক কবিতাগুলি অতি চমৎকার। ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লিটন বাহাদুরকে কাব্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটী ভট্টাচার্য্য ধরণের ভাব না থাকিলেই ভাল হইত। কালী বাবুর বেশ কবিত্ব আছে, অতএব আমাদের অনুরোধ—ভারতীয় কোন উচ্চ-প্রকৃতি মহিলার চরিত্র লইয়া গ্রন্থকার আর এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

চিকিৎসক। উক্ত নামে এক পত্র বাহির হইবে, তাহার অনুষ্ঠান আমরা পাইয়াছি। বাঙ্গালায় এইরূপ এক খানি পত্রের অভাব আছে। কতকগুলি ডাক্তার এই পত্রিকার লেখক নিযুক্ত হইয়াছেন। এল্ এম্ এসের সংখ্যা কিছু অধিক, এম্ বি ও এম্ ডিও কয়েক জন আছেন। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও দেশীয় চিকিৎসা-তত্ত্ব ইহাতে প্রকাশিত

হইবে। আমরা এরূপ পত্রের পক্ষপাতী। আমাদের ইচ্ছাও হয়—ইহা দীর্ঘজীবী হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপ উদার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য "Calcutta Journal of Medicine" বাহির করেন। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারও দুই এক জন ইহার লেখক-শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট আছেন। বম্বের থিওসফিষ্ট পত্রের মত অগ্রিম মূল্য লইয়া কার্য্য করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে ঘটিলে সুখী হইব। নতুবা আমাদের ন্যায় গ্রাহকদের অত্যাচারে জ্বালাতন হইতে হইবে মাত্র। পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (পশ্চাদ্দেয় নাই) ডাক মাশুল সমেত ৬ টাকা।

প্রাকৃতিক ভূ-বিবরণ—শ্রীগৌরকিশোর কর, বি এ, কর্তৃক প্রণীত। বসু যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।/০ আনা। "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধার করিয়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্ব্ব প্রথমে "প্রাকৃত ভূগোল" প্রস্তুত করেন। তৎপরে বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের উক্ত বিষয়ক এক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি গৌর বাবুর বিরচিত উল্লিখিত বিষয়ের তৃতীয় পুস্তক আমাদের নয়নগোচর হইল। প্রথমোক্ত গ্রন্থের ভাষা নিতান্তই নীরস। রাধিকা বাবুর গ্রন্থে যদিও আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, তথাপি এই গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়বত্তা ও বিদ্যাবত্তার গুণে, ভাষার সারল্য ও মার্জ্জিত রুচি-প্রভাবে "প্রাকৃতিক ভূ-বিবরণ" অতি সুপাঠ্য গ্রন্থ তালিকার প্রথম শ্রেণীস্থ হইয়াছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালায় কথোপকথন করা, বক্তৃতা করা, এবং পুস্তক প্রচার করা, অর্দ্ধ-শিক্ষিতের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত ছাত্র-মাত্রেই মাতৃভাষার দিকে আকৃষ্ট। গ্রন্থকার পুস্তক-মধ্যে অনেক গুলি নূতন শব্দ সঙ্কলন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তাঁহার উদ্ভাবিত কোন কোন পারিভাষিক শব্দে ত্রুটি আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রথম প্রয়াস জন্য হইয়াছে; সুতরাং মার্জ্জনীয়। ফল, আমাদের সংস্কার—গ্রন্থখানি নিম্ন-শ্রেণীস্থ বালকগণের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের বিশেষ উপযোগী।

বিশ্বাসী*—মাসিক পত্র। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে কয় খানি পত্রিকা দেখা যায়, তাবৎগুলি কোন না কোন সমাজ দ্বারা পরিচালিত। "বিশ্বাসী" পত্র কোন সমাজের মুখ-পাত্র নহে। ইহাতে সম্পাদকের নাম দেখিতে পাইলাম না। "ভক্তদাসের আখ্যান," "কুসংস্কার ও সংশয়" এবং "ভিক্ষুধর্ম্মের গূঢ় অর্থ" প্রবন্ধ ত্রয় সাবধানতা সহকারে লিখিত হইয়াছে। "বিশ্বাসীর" নেতৃগণ পত্রিকা মধ্যে ধর্ম্ম সংক্রান্ত গল্প সমাবিষ্ট করিয়া বুদ্ধিমত্তার কার্য্য করিয়াছেন। ইহার কার্য্যপ্রণালী আশাজনক হইতেছে; প্রত্যেক রচনায় চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

* ১০১ নং মসজিদ্ বাড়ি ষ্ট্রীট, সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত, বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা।